Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 15
Submission title:	Philosophy 1st Paper Part 1
File name:	Philosophy_1st_Paper_Total_Book_2013.pdf
File size:	1.53M
Page count:	164
Word count:	93,854
Character count:	327,175
Submission date:	29-Jul-2022 07:05AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876567123

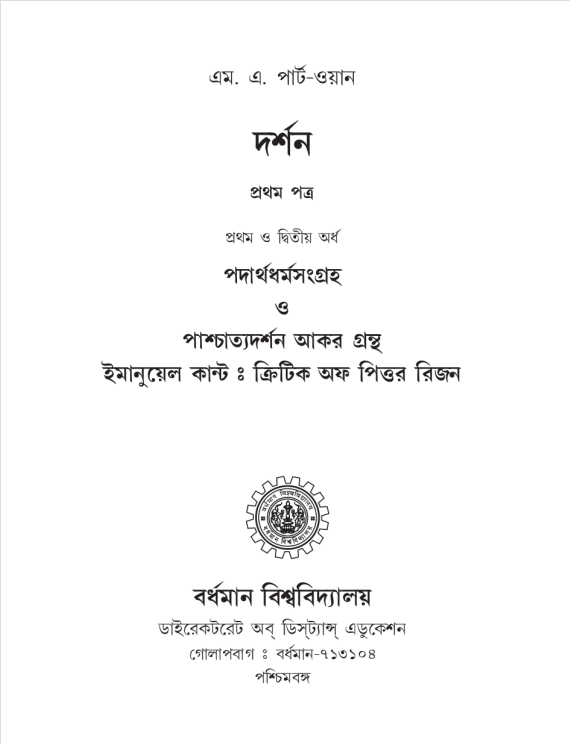

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

প্রথম পত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

পদার্থধর্মসংগ্রহ
ও
পাশ্চাত্যদর্শন আকর গ্রন্থ
ইমানুয়েল কান্ট ঃ ক্রিটিক অফ পিত্তর রিজন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন
গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 1st Paper Part 1

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:05AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876567123
File name: Philosophy_1st_Paper_Total_Book_2013.pdf (1.53M)
Word count: 93854
Character count: 327175

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

প্রথম পত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

পদার্থধর্মসংগ্রহ
ও
পাশ্চাত্যদর্শন আকর গ্রন্থ
ইমানুয়েল কান্ট ঃ ক্রিটিক অফ পিত্তর রিজন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন

গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপিকা সবুজ কলি সেন, দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী
অধ্যাপিকা মনিদীপা সান্যাল, দর্শন বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান-পুনর্মুদ্রন-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যেগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বতমার্ন উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন প্রথম পত্রের সংকলনে রয়েছে প্রথম পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে '' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

পদার্থধর্মসংগ্রহ

দার্শনিকদের মতানুযায়ী বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের পূর্ববর্তী। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ক্রমশঃ এই দর্শন ন্যায় দর্শনের সঙ্গে মিশে যেতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী দার্শনিকগণ দুটি দর্শনকে সমানতন্ত্ররূপে একসঙ্গে বিবৃত করেছেন, যেমন তর্কসংগ্রহে অন্নংভট্ট, ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন। ইতিহাসে জানা যায় যে প্রাচীন কালে বৈশেষিক দর্শনের একটি বিশেষ স্থান ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের টীকাকার মল্লিনাথ একস্থানে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন - আমি সেই ব্যাক্তি যে অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে 'বানীং কাণভুজীং অজীগণৎ' — অর্থাৎ কণভুকের বাণীও পাঠ করেছে। কণভুক অর্থাৎ কণাদ, যিনি বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্তক বা সূত্রকার। এই দর্শন যে একসময়ে উচ্চ সম্মান লাভ করেছিল মল্লিনাথের বক্তব্যে তা বোঝা যায়। সেকালে যিনি পান্ডিত্যের অভিমান করতেন বৈশেষিক দর্শন তাঁকে পড়তে হত।

আলোচ্য পুস্তকটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম. এ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৈশেষিক দার্শনিক প্রশস্তপাদাচার্যের পদার্থধর্ম সংগ্রহ গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পাঠ্য অংশ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ থেকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের সাধর্ম্য পরীক্ষা পর্যন্ত। অধ্যাপক শ্রী প্রদ্যোত কুমার মন্ডল পাঠক্রম অনুসারে পাঠ্য বিষয়কে পাঁচটি এককে ভাগ করেছেন। প্রতিটি এককের শেষে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সারসংক্ষেপ, প্রয়োজনীয় শব্দপরিচিতি, সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (ছোট প্রশ্ন এবং রচনাধর্মী প্রশ্ন সমেত), এবং সহায়ক পুস্তকের নাম। প্রতিটি এককেই প্রতিপাদ্য বিষয় এবং তার ছাত্রদের উপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সন্দর্ভে ন্যায় বৈশেষিক অন্যান্য দার্শনিকদের গ্রন্থ যেমন কিরণাবলী, ভাষাপরিচ্ছেদ এর প্রয়োজনীয় আলোচনাও করা হয়েছে।

প্রতিটি এককে ক্রমানুসংখ্যানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাঠ্য বিষয় সম্পূর্ণ আলোচিত, ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত, ভাষা ছাত্রোপযোগী হয়েছে। প্রতিটি এককের শেষের সারসংক্ষেপে এককের অর্ন্তভুক্ত বিষয় গুলির আলোচনা আছে। শব্দপরিচয় ছাত্রসহায়ক হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ এই পাঠ উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। যথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। দূরশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক ড. মোহন পাল, সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষ এর সহায়তা এবং দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টি শ্রী মলয় রায়ের উদ্যোগ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল এবং কর্মসচিব ড. ষোড়শী মোহন দাঁ-র নিরন্তন সতর্ক দৃষ্টি ও আগ্রহ ছাড়া এই কর্মকান্ড সাফল্যে পৌঁছতে পারত না। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। দূরশিক্ষা বিভাগের কর্মীদের প্রসন্ন সহযোগিতা ও মুদ্রন সংস্থার কর্মীদের নিষ্ঠার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবুজকলি সেন

দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী

সম্পাদকের নিবেদন
ইমানুয়েল কান্ট ঃ ক্রিটিক অফ পিত্তর রিজন

দর্শনে আধুনিকতাবাদ বিষয়ক চিন্তনের চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাওয়া যায় ইম্যানুয়েল কান্টের দার্শনিক বিশ্লেষণে। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ বাহ্যিক জীবন এবং আলোকিত অন্তর্জীবনের এক অনন্য অধিকারী। বহু দার্শনিকের চিন্তা সমৃদ্ধ পরিমণ্ডলে তাঁর দার্শনিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল পূর্ব-প্রাশিয়ার কোনিগ্‌স্‌বার্গে কান্টের জন্ম হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কোনিগ্‌স্‌বার্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতের অধ্যাপকরূপে কর্মরত ছিলেন। এই সময়েই দার্শনিক কান্টের খ্যাতি ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়েই তাঁর যুগান্তকারী তিনটি রচনা — তিনটি ক্রিটিক্ গ্রন্থ প্রকাশিত এবং মানুষের চিন্তার জগত আলোকিত হয়ে ওঠে। এরপর থেকেই তাঁর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশিত রূপ বিভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

সাধারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা — এই সমস্ত গুণাবলী কান্ট তাঁর পিতা-মাতার থেকে উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রতি প্রবল অনীহা তাঁকে ধর্মানুষ্ঠান বিমুখ করে তোলে। একই সাথে ধর্মাচরণে গভীর বিশ্বাসী এবং ধর্মানুচারী সৎ ব্যক্তিদের প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এই বিপরীতমুখিতা আপাতদৃষ্টিতে অসংগতিপূর্ণ মনে হলেও কান্টের রচনায় ধর্মমত ও নৈতিকতার আলোচনায় তিনি এই দুটির মধ্যে এক অদ্ভুত মেলবন্ধন তৈরী করেন। পুরোহিততন্ত্রের বিরোধী এবং ইচ্ছার স্বাধীনতার পতাকাধারী কান্ট সর্বশেষে ঈশ্বরের আদেশকেই কর্তব্যধর্ম বলে মনে করেছেন। হয়তো বা অল্প বয়সে মাতৃহারা কান্টের মনের গভীরে ধর্মপরায়না মায়ের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাই তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

কান্টের চিন্তাধারার ওপর বহু দার্শনিকের প্রভাব থাকলেও দু'জন চিন্তাবিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানের উৎস হিসাবে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা এবং একই সঙ্গে অপরিহার্যতা বিষয়ে কান্টীয় চিন্তাধারাকে তথাকথিত ''নির্বিচারবাদী নিদ্রা'' থেকে জাগ্রত করার কৃতিত্ব হিউমের। ফরাসী দার্শনিক রুশোর বিভিন্ন তাত্ত্বিক আলোচনা কান্টীয় চিন্তাকে সার্বিকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রতি শর্তহীন সমর্থন কান্টকে সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ে সচেতন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে। ইউরোপের স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে মতপ্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী কান্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষে স্নাতকোত্তর স্তরে প্রথম কান্ট রচিত গ্রন্থ পাঠ প্রবর্তন হয়। এই সজীব ও উজ্জ্বল দার্শনিকের দর্শনভাবনা বহুকাল ভাষার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করলেও এই বিষয় পঠন-পাঠনের একটি বিশেষ অন্তরায় হল আকর গ্রন্থের মূল জার্মান ভাষা থেকে সরে এসে অন্য ভাষায় তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রকাশের প্রয়াস। কান্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা কেউই জার্মান ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন নি। সে সময় চিন্তাবিদরা ফরাসী বা লাতিন ভাষাকেই গ্রন্থরচনার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতেন। কান্টই প্রথম দুরূহ দার্শনিক আলোচনায় জার্মান ভাষা ব্যবহার করে উত্তরসূরী চিন্তাবিদ্‌দের মাতৃভাষায় দর্শনচর্চার পথ সুগম করেন।

ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে Distance Education এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যন্তবাসী ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহন করতে পারছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সচেতন এবং ১৯৯৪ সাল থেকে শুরু করে এই পাঠক্রম এখানে ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় Distance Education এ দর্শনশাস্ত্রের পাঠক্রমে প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অর্ধে কান্টের 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থটি পাঠ্য। এই পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে সরাসরি পাঠ নেওয়ার সুযোগ কম। কান্টের মত দার্শনিকের দূর তত্ত্বে প্রবেশের জন্য তাঁদের যে সাহায্য প্রয়োজন, গ্রন্থরচয়িতার ক্লান্ত প্রয়াস সে আশা পূর্ণ করবে বলে আশা রাখি। আলোচক বিভিন্ন প্রাবন্ধিক ও বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগে জার্মান শব্দের ভাষান্তর করবার চেষ্টা করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায়, বর্তমান গ্রন্থকার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী গোপাল চন্দ্র খান তাঁর পাশ্চাত্য দর্শনের গভীর বুৎপত্তি ও বিভিন্ন বিদেশী ভাষাজ্ঞানের প্রয়োগে এই গ্রন্থে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। ভাষান্তরের অসুবিধাকে মনে রেখে ব্যবহৃত সমার্থক শব্দমণ্ডলীকে অনুসরণ করলে বর্তমান গ্রন্থরচয়িতার উৎকর্ষ স্বীকার করতেই হয়।

গ্রন্থটির নামকরণের দিকে প্রথমেই দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। ''ক্রিটিক'' (Critique) শব্দের আক্ষরিক অর্থ কোনো বিষয় সম্পর্কে সবিচার সমীক্ষণ। কান্টের যুগান্তকারী চিন্তনের ফল হল জ্ঞানের উৎস এবং গঠন বিষয়ে বুদ্ধি ও অনুভবের অপরিহার্য যৌথপ্রয়োগের জ্ঞান। কান্টীয় চিন্তন এখানে আবর্তিত হয়েছে প্রজ্ঞাকে ঘিরে এবং একই সাথে প্রজ্ঞার সাহায্যে। অর্থাৎ এখানে চিন্তনের বিষয় এবং কর্তা উভয়ই হল প্রজ্ঞা। এক অর্থে এ হল প্রজ্ঞারই আত্মসমীক্ষা।

আকর গ্রন্থের Transcendented Analytic অংশ পর্যন্ত পাঠ্যাংশটি ছয়টি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতিটি পর্বে পাঠসংকেতে আলোচ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন উপপর্বে ভাগ করা হয়েছে। কান্টীয় দর্শনের অবদান প্রাথমিক ভাবে দুটি আলোচনায় স্পষ্ট হয় ঃ

১) জ্ঞান জ্ঞাতানির্ভর

২) অতিক্রান্তী অধিবিদ্যা অসম্ভব।

এখানে জ্ঞান সম্পর্কে 'বিষয়' এবং দ্বিতীয় আলোচনায় 'অধিবিদ্যা' — এই দুটি শব্দের কান্টীয় ব্যাখ্যা দার্শনিক চিন্তার জগতে নতুন মাত্রা এনে দেয়। বর্তমান পাঠক্রমে এই প্রধান দুটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত দর্শনচিন্তা থেকে পৃথক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি বিষয় গ্রন্থকার দক্ষতার সঙ্গে সর্বমানের ছাত্র-ছাত্রীদের বোধের উপযুক্ত করে পরিবেশন করেছেন।

কান্টের দর্শন আলোচনার আগে তাঁর জীবনী এবং রচনার ওপর সমপরিমান গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। যে কোনো দার্শনিক আলোচনায় দার্শনিকের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কান্টীয় তত্ত্বের পটভূমিকা তৈরী করা হয়েছে। গ্রন্থের শিরোনাম বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এবং কান্টীয় দর্শনে এই গ্রন্থটির স্থান — এই দুই আলোচনা গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে র প্রাসঙ্গিকতার অভাব দূর করেছে। শুধু তাই নয়, কান্ট রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকার সংযুক্তি বিদ্যানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিশেষ প্রাপ্তি। গ্রন্থের প্রতিটি পর্বে স্পষ্ট এবং কাঙ্খিত উত্তরের নমুনা রেখে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে কান্টীয় চিন্তার মূল বক্তব্য সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে

পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি পর্বের শেষ অংশে রয়েছে পাঠ্যাংশের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগী পুস্তকাবলীর নামোল্লেখ যা উৎসাহী অধ্যবসায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের দার্শনিক চর্চার পথে অগ্রসরিত করে। পর্বশেষে প্রস্তাবিত সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী সাধারণ মানের পরিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য সাধন করবে। যেখানেই উদ্ধৃতিবাক্য ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানেই নিপুণতার সাহায্যে তথ্যসূত্রের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ্যবিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সার্বিকভাবে উপযুক্ত হবে বলে আশা করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করেছেন। যথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। দূরশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক ড. মোহন পালের সহায়তা, সহ-অধিকর্তা শ্রী নব কুমার ঘোষ এবং দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টি শ্রী মলয় রায়ের প্রতিমুহূর্তের শ্রম এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল এবং কর্মসচিব ড. ষোড়শীমোহন দাঁ-র নিরন্তন সতর্ক দৃষ্টি ও আগ্রহ ছাড়া এই কর্মকাণ্ড সাফল্যে পৌঁছতে পারত না। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। দূরশিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের প্রসন্ন সহযোগিতা ও মুদ্রণ সংস্থার কর্মীদের নিষ্ঠার জন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মণিদীপা সান্যাল
দর্শন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অর্ধ

পদার্থধর্মসংগ্রহ

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ

পাশ্চাত্য দর্শন : আকর গ্রন্থ

ইমানুয়েল কান্ট : ক্লিটিক্ অফ পিত্তর রিজন

অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র খান
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম অর্ধ

পদার্থধর্মসংগ্রহ

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ ও মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা	৩-১৫
২।	নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ও দ্রব্যের লক্ষণ	১৬-৩৩
৩।	গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের স্বরূপ	৩৪-৫৭
৪।	সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-১	৫৮-৭১
৫।	সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-২	৭২-৮৯

দ্বিতীয় অর্ধ

ইমানুয়েল কান্ট : ক্রিটিক্ অফ পিত্তর রিজন

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**Immanuel Kant** – জীবনী ও রচনা	৯৩-১০১
২	কোপার্নিকীয় দৃষ্টিভঙ্গি	১০২-১১২
৩	**'Critique of Pure Reason'** গ্রন্থের কেন্দ্রীয় সমস্যা	১১৩-১২১
৪	ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরাতত্ত্ব	১২২-১৩৪
৫	পরা-যুক্তিশাস্ত্র বা অধিবিদ্যাগত যুক্তিশাস্ত্র	১৩৫-১৪৭
৬	প্রকৃতির কয়েকটি মূল নীতি ও প্রকৃত-বহির্ভূত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জগৎ	১৪৮-১৫৩

প্রথম অর্ধ

পদার্থধর্মসংগ্রহ

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মন্ডল

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পত্র

প্রথম অর্ধ : পদার্থধর্মসংগ্রহ

ঃ একক ১- গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ ও মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা-

১.০০.০০ - প্রেক্ষাপট

১.০১.০০ - গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি

১.০২.০০ - গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

১.০৩.০০ - পাঠ্যাংশ

১.০৪.০০ - আলোচ্য বিষয়

১.০৪.০১ - গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ

১.০৪.০২ - প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা

১.০৫.০০ - সারসংক্ষেপ

১.০৬.০০ - কতিপয় শব্দপরিচিতি

১.০৭.০০ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.০৮.০০ - সহায়ক পুস্তক

১.০০.০০ প্রেক্ষাপট

পাঠ্য অংশ পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কেন্দ্রিক। পদার্থ ধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ ভারতীয় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম সম্প্রদায় বৈশেষিক দর্শন ভিত্তিক। বৈশেষিক দর্শনের 'পদার্থতত্ত্ব' বা 'বিশ্বতত্ত্বে'র জ্ঞান প্রাচীনকালে যেকোন ছাত্রের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করা হত। বিশ্বতত্ত্বের আলোচনাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান আলোচনা। ন্যায় সম্প্রদায়ের অনুরূপ বৈশেষিক-সম্প্রদায়ও মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থে বলে মনে করেন। ন্যায় দর্শনে যেমন ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হয়, বৈশেষিক দর্শনে তেমনই দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যহেতুক তত্ত্বজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতুরূপে গণ্য করা হয়।

মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক দর্শন-সম্প্রদায়ের আদি প্রবক্তা। বুদ্ধদেবের জন্মের আনুমানিক ৮০০ বৎসর (মতান্তরে ৪০০ বৎসর) পূর্বে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহর্ষি কণাদ 'কণভুক্, 'কণভক্ষ', 'উলুক', 'কাশ্যপ' প্রভৃতি নামে পরিচিত। ন্যায়-কন্দলীতে উল্লেখ আছে, তিনি ক্ষেত্রে প'ড়ে থাকা শস্যকণা ভক্ষণ করে অর্থাৎ একপ্রকার ভিক্ষাবৃত্তির

দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন ব'লেই তাঁর নাম কণাদ হয়েছে। প্রবক্তার নাম যেমন বিবিধ, বৈশেষিক দর্শনও তেমনি নানা নামে পরিচিত। 'কণাদ' নাম অনুসরণ করে এই দর্শন 'কণাদ দর্শন' ও 'উলুক' নাম অনুসরণ করে এই দর্শন 'ঔলুক্য দর্শন' নামে পরিচিত। বিশেষ পদার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করায় এই দর্শন 'বৈশেষিক দর্শন' নামেও পরিচিত। কোন কোন মতে আবার পদার্থের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই এই দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন। যাই হোক, পরবর্তীকালে এই দর্শন সম্প্রদায় 'বৈশেষিক দর্শন' নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

বর্তমান আলোচনা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম. এ. ডিগ্রীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত। পাঠক্রম অনুযায়ী পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম (মঙ্গলাচরণ শ্লোক) থেকে পৃথিবী আদি নব দ্রব্যর সাধর্ম্য পরীক্ষা পর্যন্ত অংশ প্রথম পত্রের প্রথম অর্ধের পাঠ্য অংশ। ক্রমান্বয়ে এই পাঠ্য অংশ আলোচিত হবে। এই অংশের পরীক্ষায় যেমন একসঙ্গে ষোল নম্বরের বড় প্রশ্ন হতে পারে তেমনি আবার আট চার প্রভৃতি নম্বরের ছোট প্রশ্ন হতে পারে। এই অংশে মোট পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রশ্নপত্রে অনেকগুলি বিকল্প প্রশ্ন দেওয়া হয়। সুতরাং এই অংশের সব প্রশ্ন প্রথমে পড়ে নিয়ে কোন্ কোন্ প্রশ্নের উত্তর সবথেকে ভালোভাবে দেওয়া যাবে তা নির্ধারণ করে নিয়ে লেখা শুরু করা উচিৎ।

১.০১.০০ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি :-

গ্রন্থপরিচিতি :

বৈশেষিক প্রস্থানের কণাদ সূত্রের পরবর্তী অন্যতম গ্রন্থ হল 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'। আচার্য প্রশস্তপাদ কৃত এই গ্রন্থ বৈশেষিক সূত্রের উপর ভাষ্যস্থানীয় গ্রন্থ এবং 'প্রশস্তপাদভাষ্য' নামে সমধিক পরিচিত। এই গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে কণাদসূত্রের থেকেও বেশী প্রামাণিক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ কণাদসূত্র বলে পরিচিত সূত্রসমূহের মধ্যে কোন কোন সূত্র প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়।

কণাদ প্রাথমিকভাবে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি মাত্র পদার্থকে অর্থপদবাচ্য বলে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য তিনি অভাব সহ অন্য পদার্থগুলিরও উল্লেখ করেছেন। প্রশস্তপাদাচার্য দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সঙ্গে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থ যুক্ত করে বৈশেষিক সম্মত পদার্থের সংখ্যা ছয় বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী বৈশেষিকাচার্যগণ এই ছয় পদার্থের সঙ্গে অভাব পদার্থ যুক্ত করে বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থের তালিকা পেশ করেছেন। শিবাদিত্য তো তাঁর গ্রন্থের নামই 'সপ্তপদার্থী' দিয়েছেন। এই সকল তথ্য থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে পদার্থের তালিকায় পদার্থসংখ্যা ছয় বলে উল্লেখিত হলেও (ষন্নাং পদার্থানাং) অভাব পদার্থকে ধরে সপ্তপদার্থই যে বৈশেষিক সম্মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রশস্তপাদ অন্যত্র অভাব পদার্থের বারংবার উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি কেন পদার্থের উদ্দেশ তালিকায় অভাবের উল্লেখ করেননি তা নিয়ে পণ্ডিতসমাজে বহুবিধ যুক্তি প্রচলিত আছে। যাই হোক্ না কেন, বৈশেষিক প্রস্থানে পদার্থধর্মসংগ্রহ যে সব থেকে মূল্যবান ও প্রামাণিক গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাক্, 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' এই শিরোনামের অর্থ কি ? 'পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পদের দ্বারা যা অভিধেয় তাকেই পদার্থ বলা হয়। অমরকোষে বলা হয়েছে, ''অর্থঃ অভিধেয়োরৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু''। অর্থাৎ 'অর্থ'

শব্দ অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও নিবৃত্তি বোধক। অভিধেয়ত্বের সঙ্গে জ্ঞানবিষয়ত্বও পদার্থের লক্ষণ বলে বিবেচিত হয়। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে এই পদার্থ ষড়বিধ। 'পদার্থধর্ম' বলতে বোঝায় পদার্থের ধর্ম। পদার্থসমূহ পরস্পর পরস্পরের ধর্ম হতে পারে, যেমন গুণ, কর্ম, জাতি হল দ্রব্যের বিশেষণ বা ধর্ম। আবার গুণত্ব হল গুণের ধর্ম। এইভাবে ছয়টি পদার্থই কোন স্থলে কোন পদার্থের ধর্ম আবার কোন স্থলে কোন পদার্থের ধর্মী হতে পারে। তাই পদার্থ সমুহই এক অর্থে পদার্থধর্ম। এই সকল পদার্থ ও পদার্থের ধর্মসমূহ বৈশেষিক শাস্ত্রের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। এই সকল পদার্থ ও পদার্থধর্ম এই গ্রন্থে একত্র সংকলিত হয়েছে বলে গ্রন্থের নাম হয়েছে 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'।

পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর যেসকল টীকা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে দশম শতাব্দীতে রচিত শ্রীধরাচার্য্যের ন্যায়কন্দলী পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর একটি উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ন্যায়কন্দলীর পর উদয়নাচার্য্যের কিরণাবলী পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর রচিত উল্লেখযোগ্য টীকাগ্রন্থ। উদয়নাচার্য্য ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। তাঁর সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি তাঁকে মুখ্যতম আচার্য্য রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিরণাবলীর পরবর্তী গ্রন্থ সমূহের মধ্যে বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী, বর্ধমান উপাধ্যায়ের প্রকাশটীকা, পদ্মনাভমিশ্রের সেতুটীকা, শংকর মিশ্রের উপস্কার টীকা, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

গ্রন্থকার পরিচিতি ঃ

পদার্থধর্মসংগ্রহের রচনাকাল তথা প্রশস্তপাদাচার্যের আবির্ভাবকাল সঠিকভাবে আজও নির্ধারিত হয়নি। প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয় যে, প্রশস্তপাদাচার্য যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী এবং সম্ভবত ৩০০ থেকে ১০০ পূর্বাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এরূপ অনুমানের প্রধান ভিত্তি হল উদ্দ্যোতকর, শঙ্করাচার্য এবং বোধায়ন তাঁদের গ্রন্থে প্রশস্তপাদের নাম উল্লেখ করেছেন। উদ্দ্যোতকর সপ্তম শতাব্দীর, শঙ্করাচার্য ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং বোধায়ন খ্রীষ্টের সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। সুতরাং প্রশস্তপাদাচার্য যে খ্রীষ্টের পূর্ববর্তী তা সহজেই বলা যেতে পারে। আরো অনুমান করা হয় যে, তিনি মিথিলার লোক ছিলেন। কারণ, মিথিলা ছিল তৎকালে বৈশেষিক শাস্ত্রালোচনার পীঠস্থান। প্রশস্তপাদ তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'। কিন্তু বহুকাল যাবৎ এই গ্রন্থ বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত ভাষ্যগ্রন্থ বলেই পরিগণিত হয়েছে এবং এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে 'প্রশস্তপাদভাষ্য' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। তবে প্রশস্তপাদ রচিত এই গ্রন্থ যথার্থই ভাষ্যস্থানীয় কিনা তা নিয়ে মতবিরোধ ঘটেছে। চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থকে ভাষ্যের মর্যাদা দিতে রাজি নন। তাঁর মতে এহট গ্রন্থ বৈশেষিকসূত্র তথা প্রাচীনতর ভাষ্যাদি গ্রন্থের সারসংকলনাত্মক গ্রন্থ মাত্র। ভাষ্যগ্রন্থের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষণ এই গ্রন্থে প্রযোজ্য নয়। বরং সংগ্রহ গ্রন্থের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষণই এই শাস্ত্রে প্রযোজ্য হয়। ভাষ্যগ্রন্থে সূত্রোক্ত প্রতি পদের ব্যাখ্যাপূর্বক ভাষ্যকারের স্বকীয় ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। সেক্ষেত্রে গ্রন্থকারকে সূত্রগ্রন্থের ক্রম ও বিষয়বস্তুকেহট অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু পদার্থধর্মসংগ্রহে বৈশেষিক সূত্রের ক্রম অনুসৃত হয়নি। সৃষ্টি-সংহার প্রকরণ, প্রমাকরণ, দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজবিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে সূত্রের সঙ্গে ভাষ্যের কোনো সম্বন্ধ নেই। বস্তুতঃ এই বিষয়গুলি সূত্রে সেভাবে আলোচিতই হয়নি। এজন্য একে যথার্থ ভাষ্য না বলে সংগ্রহ গ্রন্থ বলাই শ্রেয়। সংগ্রহ গ্রন্থে সূত্রের সঙ্গে সূত্র অসংশ্লিষ্ট এবং সম্প্রদায়ের প্রচলিত অন্যান্য গ্রন্থের বহু বিষয়ই সংগৃহীত হয়ে থাকে। বরং সেক্ষেত্রে গ্রন্থাকারের স্বকীয় অবদান সে তুলনায় কম, অপরাপর শাস্ত্রের

অবদানই বেশী। তবে পদার্থধর্মসংগ্রহ বৈশেষিক সূত্রের উপর যথার্থ ভাষ্য বলে গৃহীত হোক্ বা না হোক্, এই গ্রন্থ যে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের উপর গুরুত্বপুর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ এবং পাঠকবর্গের নিকটট অতিমাত্রায় আদৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রচিত গ্রন্থের ন্যায় প্রশস্তপাদের নিজ নাম নিয়েও বহুমত দেখা যায়। তাকে বিভিন্ন স্থানে 'প্রশস্ত' 'প্রশস্তকর' 'প্রশস্তদেব', 'প্রশস্তপাদ' ও 'প্রশস্তমতি' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১.০২.০০ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ :

প্রথম শ্লোকের শেষার্ধে প্রশস্তপাদ পদার্থধর্মসংগ্রহের প্রতিপাদ্য বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের কথা বলেছেন। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল মহর্ষি কণাদ স্বীকৃত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাব পদার্থের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। পদার্থধর্মসংগ্রহে গ্রন্থকার প্রথমে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের উদ্দেশ এবং পরে তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের বিভাগ ও পরীক্ষা করেছেন। ভারতীয় দর্শনে বিষয়বস্তুর আলোচনায় তিন প্রকার উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। এই তিন প্রকার উপদেশ হল ঃ উদ্দেশ, লক্ষণ, ও পরীক্ষা। বাৎস্যায়ন তাঁর শাস্ত্র আলোচনায় বলেছেন ''ত্রিবিধা চাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিরুদ্দেশো লক্ষণং পরীক্ষা চেতি''। পদার্থের নামমাত্র কথনকে বলে উদ্দেশ। নাম কথনকালে পদার্থের বিভাগ ও নির্দেশ করা হয়। তাই পদার্থের বিভাগকে উদ্দেশের অন্তর্গত করা হয়। ইতর-ব্যাবর্তক ধর্মের দ্বারা পদার্থের নির্দেশকে বলা হয় লক্ষণ। লক্ষণকে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব এই ত্রিবিধ দোষমুক্ত হতে হয়। লক্ষণের যাথার্থ্য বিচারকে বলা হয় পরীক্ষা।

ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ বা নি:শ্রেয়স লাভ হয় – এটাই সূত্রকারের অভিমত। জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি যে সব মৌল তত্ত্বকে স্বীকার করেন সেগুলিকে পদার্থ বলা হয়। বৈশেষিক দর্শনে এরূপ সাতটি মৌলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই মৌলতত্ত্বগুলি হল : (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব। এহট সাতটি পদার্থের মধ্যে প্রথম ছয়টি পদার্থকে বলা হয় ভাবপদার্থ এবং সপ্তমটিকে বলা হয় অভাব পদার্থ। প্রশস্তপাদভাষ্যে পদার্থের তালিকায় অভাব পদার্থের উল্লেখ নেই, ছয়টি ভাব পদার্থেরই কেবল উল্লেখ আছে। অভাব পদার্থ যেহেতু ভাবপদার্থ-নির্ভর সেহেতু অভাব পদার্থকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আচার্য প্রশস্তপাদের মতে উক্ত ছয়টি ভাবপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানই নি:শ্রেয়সের হেতু। ফলে উক্ত ছয়টি ভাবপদার্থ এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের সংগ্রহই হল এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্রব্য সকল পদার্থের আশ্রয়। অবয়ব দ্রব্য অবয়বী দ্রব্যের আশ্রয়, গুণবান দ্রব্য গুণের আশ্রয়, কর্মবান দ্রব্য কর্মের আশ্রয়, ব্যক্তিদ্রব্য সামান্যের আশ্রয়, পরমাণু দ্রব্য বিশেষের আশ্রয় এবং সমবায়ের সম্বন্ধী দ্রব্য সমবায়ের আশ্রয়। আশ্রয়ের কথা না বলে আশ্রিতের কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। এইজন্য উদ্দেশভাষ্যে প্রথমে দ্রব্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

কর্মের তুলনায় গুণের সংখ্যা বেশী বলে দ্রব্যের পর গুণের কথা বলা হয়েছে। সামান্য পদার্থ দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে বলে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের পর সামান্যের উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ পদার্থ সমবায়ের সম্বন্ধী হওয়ায় পঞ্চম পদার্থ রূপে বিশেষের উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ পদার্থে থাকে বলে সর্বশেষ বা ষষ্ঠ পদার্থরূপে সমবায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রয়োজন না থাকলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় জানতে প্রবৃত্তি হয় না। এজন্য বিষয়ের উল্লেখের পর গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রয়োজন উল্লেখ করতে বলেছেন 'মহোদয়ঃ'। অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় জানলে মহোদয় বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। আবার তত্ত্বজ্ঞান হল মোক্ষের হেতু। তাই তত্ত্বজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। জীবমাত্রেরই পরম পুরুষার্থ হল মোক্ষ। মোক্ষ সাধক রূপে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন তাই অনস্বীকার্য।

আবার এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বাচ্য পদার্থসমূহ এবং বাচক পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের সম্বন্ধের জ্ঞান প্রয়োজন। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্গে পদার্থ সমূহের সম্বন্ধ হল বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে পদার্থ ও পদার্থ সমূহের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। পদার্থ ও পদার্থধর্মসমূহের তত্ত্বজ্ঞান থেকে মিথ্যা জ্ঞানাদির নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষ লাভ হয়। ছয়টি ভাব পদার্থের স্বরূপ এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় - এটা সূত্রকারের অভিমত। সুতরাং মোক্ষ হল সাধ্য, পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ হল সাধন। এবং গ্রন্থের সঙ্গে মোক্ষের সম্বন্ধ হল সাধ্য-সাধন ভাব সম্বন্ধ।

১.০৩.০০ পাঠ্যাংশ

পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের মঙ্গলশ্লোক থেকে (প্রথম থেকে) শুরু করে পৃথিবী সাধর্ম্যপরীক্ষা পর্যন্ত বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে এম.এ. কোর্সের প্রথমপত্রের প্রথম অর্ধের পাঠ্যাংশ। এই অংশে ৫০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

১.০৪.০০ আলোচ্য বিষয়

১.০৪.০১ - গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ

১.০৪.০২ - পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে প্রদত্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা

১.০৪.০১ গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থকার প্রথমে ঈশ্বর এবং তারপর কণাদমুনির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এই ধরনের শ্রদ্ধা নিবেদনকে বলা হয় মঙ্গলাচরণ।

মঙ্গলাচরণ কি ?

সাধারণভাবে ইষ্টদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকে বলা হয় মঙ্গলাচরণ। মঙ্গলাচরণ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র রচনার ক্ষেত্রে একটি প্রচলিত রীতি। এই রীতি বেদ অনুমোদিত এবং আচার্যগণ কর্তৃক শিষ্টাচাররূপে পরিগণিত। তিনভাবে মঙ্গলাচরণ করা হয় : প্রথমত, ঈশ্বর বা গুরুকে প্রণাম জানানো হয়; দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর বা গুরুর কাছে কিছু প্রার্থনা করা হয় এবং তৃতীয়ত, কোন প্রসিদ্ধ, পদার্থের বর্ণনা করা হয়। এই মঙ্গলাচরণ আবার কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। প্রথমত, দুই হাত সংযুক্ত করে, মস্তক নত করে, আলিঙ্গন করে বা করমর্দনের মাধ্যমে কায়িক বা শারীরিক মঙ্গলাচরণ

সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয়ত, 'প্রণাম', 'নমস্কার', 'ওঁ', 'অথ', 'শুভম্' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করে বা লিপিবদ্ধ করে বাচিক মঙ্গলাচরণ করা হয়। তৃতীয়ত, মনে মনে চিন্তা, ধ্যান, শ্রদ্ধা বা ভক্তির মাধ্যমে মানসিক মঙ্গলাচরণ করা হয়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন শাস্ত্রের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে যদি মঙ্গলাচরণ করা হয় তাহলে সেই শাস্ত্র যাঁরা রচনা করেন বা অধ্যয়ন করেন তাঁরা অপরাজেয় পণ্ডিত হন, দীর্ঘায়ু লাভ করেন এবং সেই শাস্ত্র ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে মঙ্গলাচরণের ফল দ্বিবিধ : (১) বিঘ্ননাশ এবং (২) নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি।

মঙ্গলাচরণের বিরুদ্ধে আপত্তি ঃ

মঙ্গলাচরণের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি তুলতে পারেন যে, এইরূপ আচরণ নিষ্ফল। মঙ্গলাচরণের সঙ্গে যদি গ্রন্থ সমাপ্তির কার্য-কারণ ভাব স্বীকার করা হয়, তাহলে মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ–সমাপ্তির অন্বয় ও ব্যতিরেকও স্বীকার করতে হবে। কারণের উপস্থিতিতে কার্যের উপস্থিতিকে বলে অন্বয়। অপরদিকে কারণের অনুপস্থিতিতে কার্যের অনুপস্থিতি হল ব্যাতিরেক। কিন্তু মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ–সমাপ্তির অন্বয়-ব্যতিরেক নেই। এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে মঙ্গলাচরণ করা সত্ত্বেও গ্রন্থ সমাপ্ত হয়নি ; যেমন বানভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থ। আবার এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে মঙ্গলাচরণ না করা সত্ত্বেও গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে; যেমন নাস্তিকদের গ্রন্থসমূহ। এই সকল ব্যভিচার দৃষ্টান্ত অন্বয়-ব্যতিরেকীর ব্যাঘাতক। অন্বয়-ব্যতিরেকীর অভাবে তাই মঙ্গলাচরণকে গ্রন্থ-সমাপ্তির কারণ বলা যায় না। মঙ্গলাচরণের অন্যকোন ফলও দৃষ্ট হয় না। এইসকল কারণে পূর্বপক্ষীগণ মঙ্গলাচরণকে নিষ্ফল বলেছেন।

আপত্তির নিরসন ঃ

মঙ্গলাচরণের বিরূদ্ধে উক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, মঙ্গলাচরণ নিষ্ফল নয়। বস্তুত: মঙ্গলাচরণ একটি শিষ্টাচার এবং শিষ্টাচার কখনও নিষ্ফল হয় না। পূর্বপক্ষীগণ যে সকল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, সে সকল দৃষ্টান্ত মঙ্গলাচরণকে নিষ্ফল বলে প্রমাণ করতে পারে না। মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ-সমাপ্তির কার্য-কারণ ভাব থাকলেই যে, যে কোন পরিমাণ মঙ্গলাচরণ যে কোন পরিমাণ বিঘ্নধ্বংসপূর্বক গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হবে এমন দাবি করা যায় না। মঙ্গলাচরণ ও বিঘ্নধ্বংসের মধ্যে একটিপরিমাণগত সম্বন্ধ আছে। বিঘ্ন যদি প্রচুর হয় এবং মঙ্গলাচরণ যদি অতি অল্প হয় তাহলে সেই মঙ্গলাচরণ গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হতে পারে না। কিন্তু তার জন্য উভয়ের মধ্যে কার্য-কারণ ভাব নেই একথা আমরা বলতে পারি না। আবার নাস্তিকদের গ্রন্থ-সমাপ্তির যে দৃষ্টান্ত পূর্বপক্ষীগণ দিয়েছেন তাও যথার্থ নয়। মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংসপূর্বক গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি বিঘ্ন না থাকে সে ক্ষেত্রে মঙ্গলাচরণ বিনাই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এর জন্য মঙ্গলাচরণকে নিষ্ফল বলা চলে না। তাছাড়া যদি আমরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি তাহলে এক জন্মের মঙ্গলাচরণের ফল অন্য জন্মে ভোগের কথা সহজেই বলতে পারি। এ জন্মে যিনি নাস্তিক তিনি যে পূর্বজন্মেও নাস্তিক ছিলেন এমন কোন নিয়ম নেই। সুতরাং নাস্তিকদের ক্ষেত্রে পূর্বজন্মে কৃত মঙ্গলাচরণের ফলের দ্বারাই এ জন্মে রচিত গ্রন্থের বিঘ্ননাশ সম্ভব। তাই পুনরায় ইহজন্মে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন সবসময় হয় না। এর ফলে বর্তমান জন্মে মঙ্গলাচরণ ব্যতীতই গ্রন্থের সমাপ্তি হতে পারে।

মঙ্গলাচরণের ফল সম্বন্ধে দ্বিমত ঃ

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, মঙ্গলাচরণ নিষ্ফল নয়। তবে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ যেভাবে মঙ্গলাচরণকে গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতি কারণ বলেছেন নব্য ন্যায়- বৈশিষিকাচার্যগণ সেইরূপ বলেননি। নব্য ন্যায়-

বৈশিষিকাচার্যগণ মঙ্গলাচরণকে বিঘ্ন ধ্বংসের প্রতি কারণ বলেছেন, গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতি নয়। নব্য মতে গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হল, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদি। অন্যভাবে বলা যায়, প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকমতে মঙ্গলাচরণের ফল হল নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি। কিন্তু নব্যমতে মঙ্গলাচরণের ফল হল বিঘ্ননাশ। নব্যমতে বিঘ্ননাশ ছাড়াও গ্রন্থের সমাপ্তি বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদির অপেক্ষা রাখে। বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদি না থাকলে কেবল মঙ্গলাচরণের মাধ্যমে গ্রন্থ সমাপ্ত হতে পারে না। বস্তুতঃ মঙ্গলাচরণ একটিশিষ্টাচার। শিষ্টাচার বিঘ্ন-ধ্বংস পূর্বক মঙ্গলের সূচনা করে, কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদি না থাকলে কারোর পক্ষে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়।

১.০৪.০২ পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে প্রদত্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ

মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গ্রন্থকার বলেছেন :

''প্রণম্য হেতুমীশ্বরং মুনিং কণাদমন্বত: ।

পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ: প্রবক্ষ্যতে মহোদয়: ॥''

অর্থাৎ জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে এবং তারপর (অত: অনু) কণাদ মুনিকে প্রণাম জানিয়ে তত্ত্বজ্ঞানের জনক (মহোদয়:) পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ কথিত হচ্ছে।

প্রশস্তপাদাচার্য গ্রন্থারম্ভে প্রথমে ঈশ্বরকে এবং তারপর কণাদ মুনিকে প্রণাম জানিয়েছেন। ঈশ্বর যেহেতু সর্বময়কর্তা এবং সবকিছুর হেতু সেই কারণে ঈশ্বরকে প্রথমে প্রণাম জানানো হয়েছে। আবার প্রশস্তপাদভাষ্য যেহেতু বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত ভাষ্য এবং কণাদ মুনি সেহট সূত্রেরই রচয়িতা সেহেতু ঈশ্বরকে প্রণাম জানানোর পর কণাদ মুনিকেও গ্রন্থকার প্রণাম জানিয়েছেন। বস্তুত বৈশেষিক সূত্র রচিত না হলে প্রশস্তপাদভাষ্য রচিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। সেহেতু ঈশ্বর যেমন পদার্থধর্মসংগ্রহ রচয়িতার প্রণম্য তেমনি কণাদ মুনিও প্রণম্য।

কণাদ মুনির কোনো বিশেষণ গ্রন্থাকার দেননি। কিন্তু ঈশ্বরের বিশেষণরূপে তিনি 'হেতু' পদটিউল্লেখ করেছেন। 'হেতু' পদের অর্থ কারণ। ঈশ্বর জগৎ তথা কার্যমাত্রেরই কারণ। বস্তুতঃ তিনি সবকিছুর আদি কারণ কিন্তু নিজে অকারণ। ঈশ্বর সবকিছুর কারণ রূপে পরমগুরু। গ্রন্থারম্ভে সেই পরমগুরুকেই প্রথমে এবং তারপর বৈশেষিক সূত্র-প্রণেতা কণাদ মুনিকে প্রণাম জানিয়ে মঙ্গলাচরণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি।

'প্রণাম' বলতে প্রকৃষ্ট নমস্কারকে বোঝানো হয়। ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক যে নমস্কার তাই প্রকৃষ্ট নমস্কার। ঈশ্বর ও কণাদ মুনিকে প্রকৃষ্ট নমস্কার করা হল এই কারণে যে এর দ্বারা বাঞ্ছিত লক্ষ্যের পক্ষে বিঘ্ন থাকলে তা নাশ হবে এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে।

ঈশ্বরের বিশেষণে বলা হয়েছে 'হেতু'। 'হেতু' শব্দের অর্থ কারণ। কিরণাবলীকার মঙ্গলাচরণে উল্লিখিত 'হেতু' পদের একাধিক অর্থ নির্দেশ করে ঈশ্বর কোন্ অর্থে এখানে 'হেতু' পদের দ্বারা বিশেষিত তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন ঃ

প্রথমত 'হেতু' পদের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ-কারণ তাকে বোঝান হয়েছে। বৈশেষিক মতে ঈশ্বর জগতের

উপাদান কারণ নন, তিনি জগতের নিমিত্তকারণ। তাই 'হেতু' শব্দের দ্বারা পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বও সাধিত হয়। বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও প্রযত্নে পরমাণুসমূহে গতি সঞ্চারিত হয়। এর ফলে প্রথমে দুটি দুটি পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়। দুটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় একটি দ্ব্যণুক। এরূপ তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে উৎপন্ন হয় একটি ত্রসরেণু বা ত্র্যণুক। অসংখ্য দ্ব্যণুকের দ্বারা উৎপন্ন হয় অসংখ্য ত্রসরেণু। আবার অসংখ্য ত্রসরেণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় ঘট-পট্টাদি সাবয়ব পদার্থ সমূহ। তাই দেখা যায় যে, জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈশেষিকগণ পরমাণু সমূহকে সমবায়ী কারণ, পরমাণু সমূহের সংযোগকে অসমবায়ী কারণ এবং ঈশ্বর তথা ঈশ্বরের ইচ্ছাদিকে নিমিত্ত কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা পরবর্তী বৈশেষিকাচার্যগণ প্রমাণ করেছেন যে এই জগৎ একটি কার্য এবং একমাত্র ঈশ্বরই এই কার্যের নিমিত্তকারণ হতে পারেন। ঈশ্বর যে জগতের নিমিত্তকারণ তা বোঝানোর জন্যই ঈশ্বরকে হেতু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'হেতু' পদের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের সূচনা করা হয়েছে। 'ঈশ্বর' পদের দ্বারাই ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। তাই 'হেতু' পদের দ্বারা পুনরায় তাঁর জগৎ কর্তৃত্ব সিদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। বরং, জগতের কর্তারূপে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণের নিমিত্তই 'হেতু' পদ প্রযুক্ত হয়েছে।

তৃতীয়ত, 'হেতু' পদের অর্থ শ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির কারণ। ঈশ্বর-উপদিষ্ট ধর্মের দ্বারা যে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তা ভাষ্যকার নিজেই ব্যক্ত করেছেন। এই অর্থে ঈশ্বর হলেন শ্রেয়ঃ বা নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির হেতু।

চতুর্থত, 'হেতু' পদের অর্থ হল কণাদ সূত্র বা বৈশেষিক সূত্রের কারণ। বিভিন্ন কাহিনী থেকে জানা যায় যে মহেশ্বরের আজ্ঞা ও অনুগ্রহ ক্রমেই কণাদ বৈশেষিক সূত্র রচনা করেছিলেন। এই কারণেই ভাষ্যকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে গুরুতম-গুরুতর-গুরু ক্রমে প্রণাম জানিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যায়যে, ঈশ্বর একাধারে জগতের এবং কণাদ মুনির বৈশেষিকসূত্র গ্রন্থের নিমিত্ত কারণ। তাঁরই ইচ্ছায় জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এবং তাঁরই ইচ্ছায় কণাদ মুনি কর্তৃক বৈশেষিক সূত্র রচিত হয়েছে। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ বৈশেষিক সূত্র-নির্ভর। বৈশেষিক সূত্র রচিত না হলে এই শাস্ত্র রচিত হতে পারত না। তাই বৈশেষিক সূত্রের রচয়িতাকেও প্রশস্তপাদাচার্য নমস্কার জানালেন। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে বৈশেষিক সম্মত পদার্থ তত্ত্ব ও তাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য আলোচিত হয়েছে। এই কারণেই গ্রন্থের নাম হয়েছে পদার্থধর্মসংগ্রহ। এই গ্রন্থ পাঠ করলে পদার্থ তত্ত্বের সম্যক্ বোধের উদয় হবে। বৈশেষিক সূত্রকার কণাদ বিভিন্ন স্থলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থের উল্লেখ করেছেন। প্রশস্তপাদাচার্যও সেইমত ছয়টি ভাবপদার্থের উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী বৈশেষিকাচার্যগণ অভাবকেও পদার্থতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং বৈশেষিক সম্মত ষট্‌পদার্থ বা সপ্তপদার্থ ও তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের সম্যক্ বোধই হল তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানকেই গ্রন্থকার 'মহোদয়' শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। 'মহোদয়' শব্দের অর্থ মহান উদয়। যার উদয়ে মহান বস্তু লাভ হয় তাই মহান উদয়। বৈশেষিকমতে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষোপসাধক। তাই গ্রন্থকার পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানকেই মহোদয় বলেছেন। এর অর্থ যার দ্বারা মোক্ষ বা অপবর্গরূপ মুক্তি লাভ হয় তাই মহোদয়। 'মহোদয়' পদের তাৎপর্য নিয়ে ন্যায়কন্দলীকার ও কিরণাবলীকারের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। কন্দলীকার 'মহোদয়' বলতে অপবর্গরূপ মুক্তিকেই বুঝিয়েছেন। এই অর্থে পদার্থধর্ম-সংগ্রহ গ্রন্থের লক্ষ্য হল অপবর্গ বা মুক্তি। মোক্ষই হল মহান উদয় বা মহোদয়।

কিন্তু মঙ্গলাচরণ শ্লোকে 'মহোদয়' পদটি পদার্থধর্মসংগ্রহের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় যা থেকে মোক্ষ বা অপবর্গ লাভ হয় 'মহোদয়' পদের এরূপ অর্থই সংগত হয়। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে পদার্থসমূহ এবং পদার্থসমূহের ধর্মের জ্ঞান হয়। পদার্থসমূহ ও পদার্থসমূহের ধর্মের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। যোগ ও ঈশ্বর উপদিষ্ট ধর্ম সমূহের পালনের মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং মিথ্যাজ্ঞানাদি বিনষ্ট হলে সর্বকর্মফল সমাপ্তান্তে দুঃখের আত্যান্তিক নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ লাভ হয়। কিরণাবলীকার তাই তত্ত্বজ্ঞানকেই মহোদয় বলেছেন। 'মহোদয়' পদটি পদার্থধর্মসংগ্রহের বিশেষণ হওয়ায় এর অর্থ হয় যা থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় সেই গ্রন্থই হল পদার্থধর্ম-সংগ্রহ। তত্ত্বজ্ঞান বা মহোদয় হল মোক্ষসাধক। পরবর্তীভাষ্যে এতথ্য আরো স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

প্রশস্তপাদাচার্যের মতে মহোদয় হ'ল মোক্ষের হেতু। পরবর্তী ভাষ্যে তিনি আরো স্পষ্ট ভাষায় তা ব্যক্ত করতে বলেছেন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান নি:শ্রেয়সের হেতু। প্রশ্ন উঠতে পারে গ্রন্থ কিভাবে নিঃশ্রেয়সের হেতু হয় ? পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের সম্বন্ধই বা কিরূপ ? এর উত্তরে বলতে হয়, গ্রন্থের সঙ্গে নিঃশ্রেয়সের প্রযোজ্য-প্রযোজক সম্বন্ধ। গ্রন্থ সাক্ষাৎ মোক্ষের হেতু হতে পারে না, তবে গ্রন্থ পাঠ করলে পদার্থসমূহের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় সেই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের হেতু। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়, মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে প্রবৃত্তি, দোষ, জন্ম ও দু:খ পরম্পরাক্রমে বিনষ্ট হয়। দু:খের আত্যন্তিক বিনাশই যেহেতু বৈশেষিকমতে মোক্ষ, সেহেতু মোক্ষলাভের প্রতি উক্ত শাস্ত্র পরম্পরাক্রমে হেতু বলে গৃহীত হয়।

১.০৫.০০ সারসংক্ষেপ

পদার্থধর্মসংগ্রহ কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত ভাষ্যস্থানীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য প্রশস্তপাদ। গ্রন্থকার ও গ্রন্থের আবির্ভাবকাল নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

গ্রন্থকার প্রথমে ঈশ্বর এবং তারপর কণাদ মুনির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। এই ধরনের শ্রদ্ধা নিবেদনকে বলা হয় মঙ্গলাচরণ। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রচলিত রীতি। এই রীতি বেদ অনুমোদিত এবং আচার্যগণ কর্তৃক শিষ্টাচাররূপে পরিগণিত। তিনভাবে মঙ্গলাচরণ করা হয় ঃ প্রথমতঃ ঈশ্বর বা গুরুকে প্রণাম জানান হয়, দ্বিতীয় ঃ ঈশ্বর বা গুরুর কাছে কিছু প্রার্থনা করা হয় এবং তৃতীয়তঃ, কোন প্রসিদ্ধ, পদার্থের বর্ণনা করা হয়। এই মঙ্গলাচরণ আবার কায়িক, বাচিক এবং মানসিক ভেদে ত্রিবিধ। মঙ্গলাচরণের প্রত্যাশিত ফল দ্বিবিধ ঃ (১) বিঘ্ননাশ এবং (২) নির্বিঘ্নে গ্রন্থ সমাপ্তি।

মঙ্গলাচরণের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীগণ আপত্তি তুলেছেন যে, এইরূপ আচরণ নিস্ফল। মঙ্গলাচরণের সঙ্গে যদি গ্রন্থ-সমাপ্তির কার্য-কারণ ভাব স্বীকার করা হয় তাহলে মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ সমাপ্তির অন্বয় ও ব্যতিরেক স্বীকার করতে হবে। কিন্তু মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ-সমাপ্তির অন্বয়-ব্যতিরেক নেই। এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে মঙ্গলাচরণ করা সত্ত্বেও গ্রন্থ সমাপ্ত হয়নি। যেমন বানভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থ। আবার এমনও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে মঙ্গলাচরণ না করা সত্ত্বেও গ্রন্থ সমাপ্ত হয়েছে। যেমন নাস্তিকদের গ্রন্থসমূহ। অন্বয় ব্যতিরেকীর অভাবে তাই মঙ্গলাচরণকে গ্রন্থ-সমাপ্তির কারণ বলা যায় না এবং মঙ্গলাচরণকে নিস্ফল বলতে হয়।

মঙ্গলাচরণের বিরুদ্ধে উক্ত আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, মঙ্গলাচরণ নিস্ফল নয়। বস্তুতঃ মঙ্গলাচরণ একটি শিষ্টাচার এবং শিষ্টাচার কখনও নিস্ফল হয় না। পূর্বপক্ষীগণ যে সকল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন সে সকল দৃষ্টান্ত

মঙ্গলাচরণকে নিস্ফল প্রমাণ করতে পারে না। মঙ্গলাচরণের সঙ্গে গ্রন্থ সমাপ্তির কার্য-কারণ ভাব থাকলেই যে, যে কোন পরিমাণ মঙ্গলাচরণ যে কোন পরিমাণ বিঘ্নধ্বংসপূর্বক গ্রন্থ-সমাপ্তির কারণ হবে এমন দাবি করা যায় না। বিঘ্ন যদি প্রচুর হয় এবং মঙ্গলাচরণ যদি অতি অল্প হয় তাহলে সেই মঙ্গলাচরণ গ্রন্থ-সমাপ্তির কারণ হতে পারে না। মঙ্গলাচরণ বিঘ্নধ্বংসপূর্বক গ্রন্থ-সমাপ্তির কারণ হয়। কোন ক্ষেত্রে যদি বিঘ্ন না থাকে সে ক্ষেত্রে মঙ্গলাচরণ বিনাই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। তার জন্য মঙ্গলাচরণকে নিস্ফল বলা চলে না। তাছাড়া পূর্বজন্মে কৃত মঙ্গলাচরণের ফলের দ্বারাই এ জন্মে রচিত গ্রন্থের বিঘ্ননাশ সম্ভব হওয়ায় ইহজন্মে মঙ্গলাচরণের প্রয়োজন সবসময় হয় না। এর ফলে বর্তমান জন্মে মঙ্গলাচরণ ব্যতীতই গ্রন্থের সমাপ্তি হতে পারে।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, মঙ্গলাচরণ নিস্ফল নয়। তবে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ' যেভাবে মঙ্গলাচরণকে গ্রন্থ সমাপ্তির প্রতি কারণ বলেছেন নব্য ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ সেইরূপ বলেননি। নব্য ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ মঙ্গলাচরণকে বিঘ্ন ধ্বংসের প্রতি কারণ বলেছেন, গ্রন্থ-সমাপ্তির প্রতি নয়। নব্য মতে গ্রন্থ সমাপ্তির কারণ হল, বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদি।

প্রশস্তপাদাচার্য গ্রন্থারম্ভে প্রথমে ঈশ্বরকে এবং তারপর কণাদ মুনিকে প্রণাম জানিয়েছেন। ঈশ্বর যেহেতু সর্বময়কর্তা এবং সবকিছুর হেতু সেই কারণে ঈশ্বরকে প্রথমে প্রণাম জানানো হয়েছে। আবার প্রশস্তপাদভাষ্য যেহেতু বৈশেষিক সূত্রের উপর রচিত ভাষ্য এবং কণাদ মুনি সেই সুত্রেরই রচয়িতা সেহেতু কণাদ মুনিকেও তিনি প্রণাম জানিয়েছেন। বস্তুত বৈশেষিক সূত্র রচিত না হলে প্রশস্তপাদভাষ্য রচিত হওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না।

''পদার্থধর্মসংগ্রহঃ প্রবক্ষতে মহোদয়ঃ'' মঙ্গলাচরণে উক্ত এই বাক্যাংশের মাধ্যমে গ্রন্থাকার একই সঙ্গে বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ও অধিকারী এই অনুবন্ধ চতুষ্টয়েরই সূচনা করেছেন। পদার্থসমূহ ও পদার্থসমূহের ধর্মসমূহ হল বৈশেষিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মোক্ষ হল বৈশেষিক দর্শনের প্রয়োজন। মোক্ষের সঙ্গে গ্রন্থের সম্বন্ধ হল প্রযোজ্য-প্রযোজক সম্বন্ধ। মোক্ষকামী বা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ হলেন এই শাস্ত্রপাঠের অধিকারী।

১.০৬.০০ কতিপয় শব্দ-পরিচিতি ঃ

(ক) **শিষ্টাচার ঃ** 'শিষ্টাচার' বলতে বোঝায় শিষ্ট ব্যক্তিগণের আচরণ। 'আচরণ' বলতে যেমন অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে বোঝানো হয়, তেমনই আবার ক্রিয়ার প্রতি প্রবৃত্তিকে বোঝানো হয়। শিষ্ট পদের অর্থ সঠিক, সৎ, বা অভ্রমমূলক। সুতরাং যে ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি সঠিক, সৎ বা অভ্রমমূলক তাকেই বলা হয় শিষ্টাচার। শিষ্টাচার সাধারণতঃ অবিগীত বা অনিন্দনীয়। শিষ্টাচার প্রশংসনীয় কারণ তা মঙ্গলসূচক। শিষ্টাচার যখন প্রবৃত্তি বশে করা হয় তখন তা সকাম কর্ম এবং তার ফল অবশ্যম্ভাবী।

(খ) **হেতু ঃ** 'হেতু' পদটি অনেকার্থক। 'হেতু' বলতে হেতুপদকে বোঝানো হয়, হেতু অবয়বকে বোঝানো হয় আবার কোন কার্যের করণ, ব্যাপার, কারণ, কারক বা জ্ঞাপককেও বোঝানো হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে 'হেতু' পদটিট কারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যা কার্যের উৎপাদক তাই কারণ বা কারকহেতু। ন্যায়-বৈশেষিকমতে কারণ তিনপ্রকার- সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ। এই

ত্রিবিধ কারণই কার্যের হেতু হয়। একটি ঘটের উৎপত্তিতে কপালদ্বয় হল সমবায়ী কারণ, কপালদ্বয় সংযোগ হল অসমবায়ী কারণ এবং এই দুটি কারণ ভিন্ন কুম্ভকার প্রভৃতি যাবতীয় কারণই হল নিমিত্তকারণ। ন্যায়-বৈশেষিকমতে ঈশ্বর হলেন জগতের নিমিত্তকারণ।

(গ) **অন্বয় - ব্যতিরেক ঃ** অন্বয় ও ব্যতিরেক হল কার্য-কারণ ভাবের নিয়ামক। দুটি পদার্থের মধ্যে কার্য-কারণ ভাব অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্বয় হল তৎসত্ত্বে তৎসত্তা। অর্থাৎ কোন কিছুর উপস্থিতিতে অপর কোন কিছুর উপস্থিতি যেমন, কুম্ভকারের উপস্থিতিতে ঘটের উপস্থিতি। ব্যতিরেক হল তদসত্ত্বে (তৎ অসত্ত্বে) তদসত্তা (তৎ অসত্তা)। অর্থাৎ কোন কিছুর অনুপস্থিতিতে কোনকিছুর অনুপস্থিতি যেমন, কুম্ভকারের অনুপস্থিতিতে ঘটের অনুপস্থিতি। অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যেই দুটি জিনিসের মধ্যে কার্য-কারণভাব জানা যায়। অন্বয় ও ব্যতিরেকের ব্যভিচার দর্শনে কার্য-কারণ ভাব অসিদ্ধ হয়। যদি কোন কিছুর উপস্থিতিতে কার্য না ঘটে এবং তার অনুপস্থিতিতেও কার্য ঘটে তাহলে সেই দুটি জিনিসের মধ্যে কার্য-কারণ ভাব থাকতে পারে না।

(ঘ) **নাস্তিক ঃ** ভারতীয় দর্শনে বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে তথা দার্শনিকদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এই দুটি বিভাগের একটি হল আস্তিক এবং অপরটি হল নাস্তিক। যে সকল সম্প্রদায় বা দার্শনিক বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন তাদের বলে আস্তিক। অপরদিকে যে সকল সম্প্রদায় বা দার্শনিক বেদের প্রামাণ্যে বিশ্বাস করেন না তাদের বলা হয় নাস্তিক।

(ঙ) **অনুবন্ধ ঃ** অনুবন্ধ হল কোন শাস্ত্র পাঠের এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি। অনুবন্ধের জ্ঞান না হলে কোন শাস্ত্র পাঠে পাঠকের প্রবৃত্তি হয় না। অধিকারী বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন এই চারটিকে শাস্ত্রের অনুবন্ধ চতুষ্টয় বলে। যেকোন ব্যক্তির যেকোন শাস্ত্র পাঠে অধিকার নেই। কোন শাস্ত্র পাঠের অধিকারীকে কতকগুলি নির্দিষ্ট গুণ অর্জন করতে হয় এবং দোষ বর্জন করতে হয়। ব্যক্তির দোষ বর্জন এবং গুণ অর্জন হল শাস্ত্রপাঠের অধিকারীর নির্ণায়ক। প্রতিটি শাস্ত্রেরই একটি প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ই হল ঐ শাস্ত্রের বিষয়। বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্রের ও প্রয়োজনের সম্বন্ধ আছে। শাস্ত্র পাঠের জন্য এই সম্বন্ধের জ্ঞান আবশ্যক। একটি গ্রন্থ কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করে। প্রয়োজন না থাকলে কেউ কোন শাস্ত্র পাঠে আগ্রহী হয় না। এই জন্য শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনকেও অনুবন্ধের অন্তর্গত করা হয়েছে।

১.০৭.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

ছোটপ্রশ্ন ঃ

(a) What is the meaning of the term '*Vaiœṣika*' ?

(b) What is menat by Padā rthadharmasaṁgraha ?

(c) Who is the founder of *Vaiœṣika* School ?

(d) What are the other names of *Vaiœṣika* School of Philosophy?

(e) Why Kānada is so called ?

(f) Who is the author of *Vaiśeṣika* sūtra ?

(g) Who is the author of Padārthadharmasaṁgraha ?

(h) Can Padārthadharmasaṁgraha be treated as a bhāsya on *Vaiśeṣika* sūtra ?

(i) What is *maṅgalācaraṇa* ?

(j) What is expected from the performance of *maṅgalācaraṇa*?

(k) What are the different forms of *maṅgalācaraṇa* ?

(l) Why is Iśvara characterised by the term *'hetu'* in *maṅgalācaraṇa ślloka* ?

(m) What is *mahodaya* ?

(n) How *mahodaya* can be attained ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

1. Why does Praśastapāda decide to write a treatise on *Vaiśeṣika* sūtra ? Answer indicating the viṣaya, *sambandha* and *proyajana* of the treatise.

2. (a) What is *maṅgalacāraṇa* ?

(b) Clearly explain the *maṅgalacāraṇa ślloka* of *Padārthadharmasaṁgraha.*

3. Is there any necessity of *maṅgalacāraṇa* for writing a book? Discuss fully.

4. Explain the *maṅgalacāraṇa* verse of *Padārthadharmasaṁgraha*. Why is Iśvara characterised by the *viśeṣaṇa* 'hetu' ? Discuss.

5. What is the intention of the author for writing a book on *Vaiśeṣika* sutra ? How a teatise can lead to the goal ? Discuss.

১.০৮.০০ সহায়ক পুস্তক

১. বৈশেষিক দর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮২৮ শকাব্দ।

২. বৈশেষিক দর্শনম্, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

৩. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (সুক্তি, সেতু ও ব্যোমবতী টীকা সহ), গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪।

৪. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা।

৫. প্রশস্তপাদভাষ্য, পণ্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।

৬. প্রশস্তপাদভাষ্য, কালিপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত।

৭. বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৮. কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৯. ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ), পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।

১০. ভাষা পরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১. Vaiṣeṣika Philosophy, Ui.

১২. Tarkasaṁgraha Dipikā on Tarkasaṁgraha - Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers.

একক ঃ ২

নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ও দ্রব্যের স্বরূপ

বিষয়সূচী

২.০০.০০ - প্রতিপাদ্য বিষয়

২.০১.০০ - নিঃশ্রেয়স

২.০১.০১ - নিঃশ্রেয়স স্বরূপ

২.০১.০২ - নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়

২.০২.০০ - পদার্থ পরিচয়

২.০২.০১ - দ্রব্য পরিচয়

২.০২.০২ - দ্রব্যের লক্ষণ

২.০২.০৩ - অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব খণ্ডন

২.০২.০৪ - দ্রব্যের বিভাগ

২.০২.০৫ - নিত্য ও অনিত্য দ্রব্য সমূহ

২.০২.০৫.০১- পৃথিবী

২.০২.০৫.০২- জল

২.০২.০৫.০৩- তেজ

২.০২.০৫.০৪- বায়ু

২.০২.০৫.০৫- আকাশ

২.০২.০৫.০৬- কাল

২.০২.০৫.০৭- দিক্

২.০২.০৫.০৮- আত্মা

২.০২.০৫.০৯- মন

২.০৩.০০ - সারসংক্ষেপ

২.০৪.০০ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

২.০৫.০০ - সহায়ক পুস্তক

২.০০.০০ প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

'প্রশস্তপাদভাষ্য' গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল মহর্ষি কণাদ স্বীকৃত ছয়টি ভাব পদার্থের উদ্দেশ্য, লক্ষণ ও পরীক্ষা। ছয়টি ভাব পদার্থের স্বরূপ এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় - এটাই সূত্রকারের অভিমত। জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি যেসব মৌলতত্ত্বকে স্বীকার করেন সেগুলিকে পদার্থ বলা হয়। বৈশেষিক দর্শনে এরূপ সাতটি মৌলতত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই মৌলতত্ত্বগুলি ঃ (১) দ্রব্য, (২) গুণ, (৩) কর্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় ও (৭) অভাব। এই সাতটি পদার্থের মধ্যে প্রথম ছয়টি পদার্থকে বলা হয় ভাবপদার্থ এবং সপ্তমটি হল অভাব পদার্থ। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে পদার্থের তালিকায় অভাব পদার্থের.উল্লেখ নেই, ছয়টি ভাব পদার্থেরই কেবল উল্লেখ আছে। আচার্য প্রশস্তপাদের মতে উক্ত ছয়টি ভাবপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানই নিঃশ্রেয়সের হেতু। বৈশেষিক সম্মত এই নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ এবং যে ষড় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের হেতু তার মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্যের স্বরূপ ও বিভাগের ব্যাখ্যাই এই এককের প্রতিপাদ্য বিষয়।

২.০১.০০ নিঃশ্রেয়স

মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে প্রশস্তপাদাচার্য গ্রন্থের প্রয়োজন রূপে উল্লিখিত মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের সূচনা করতে বলেছেন, ''দ্রব্যগুণ কর্ম সামান্যবিশেষ সমবায়ানাং ষন্নাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানম্ নিঃশ্রেয়হেতু তচ্চেশ্বরচোদনাভিব্যক্ত ধর্মাদেব''। এর দ্বারা তিনি নিঃশ্রেয়সের উপায়কেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি বৈশেষিক সম্মত নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি। সূত্রকার নিজে এবং পরবর্তীকালের টীকাকারগণ অবশ্য এই অভাব পূরণ করে নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

২.০১.০১ নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ

'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ সবথেকে শ্রেয়। পরামুক্তি বা মোক্ষই সবথেকে শ্রেয়। তাই নিঃশ্রেয়স বলতে পরামুক্তিকেই বুঝতে হয়। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায় নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। চার্বাক সম্প্রদায়ের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের সম্ভোগই পরম সুখ বা মুক্তি। বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানধারার নিরোধ বা নির্বাণই মুক্তি বা অপবর্গ। সাংখ্য ও যোগমতেও ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি। ভাসর্বজ্ঞ ও একদেশী মীমাংসামতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই মুক্তি। অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মস্বারূপ্য ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্রহ্মসাজুয্যই মুক্তি। ন্যায়মতে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অপবর্গরূপ মুক্তি। বৈশেষিক মত ন্যায়মতের অনুরূপ। এই মতেও দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স।

মোক্ষ সম্পর্কে মহর্ষি কণাদ ৫/২/১৮ সূত্রে বলেছেন, ''তদভাবে সংযোগাভাবাৎ প্রাদুর্ভাবশ্চ মোক্ষ-।'' অর্থাৎ তার অভাবে শরীরের সঙ্গে সংযোগের অভাব এবং ভবিষ্যতেও তার পুনঃ-প্রাদুর্ভাব বা পুনরুৎপত্তির অভাবই মুক্তি বা মোক্ষ। পূর্ববর্তীসূত্রে অদৃষ্ট আলোচিত হওয়ায় বুঝতে হবে যে অদৃষ্টের অভাবে বা অদৃষ্ট ভোগ সমাপনান্তে পূর্ব শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগ বিনষ্ট হয় এবং পরবর্তী শরীরের পুনরুৎপত্তির অভাবে আত্মার সঙ্গে পরবর্তী শরীরের সংযোগের কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। শরীরের সঙ্গে সর্বপ্রকার সংসর্গবিচ্ছিন্ন আত্মার স্বরূপাবস্থাই হল মোক্ষাবস্থা বা মুক্তি।

শংকর মিশ্র তাঁর উপস্কার টীকায় বলেছেন জীবের আত্মসাক্ষাৎকারে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে দোষ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) বিনষ্ট হয়। দোষ বিনষ্ট হলে প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। প্রবৃত্তি বিনষ্ট হলে জন্মের নিবৃত্তি হয়। পরিশেষে জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখের এই নিবৃত্তিই মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে কারণের বিনাশেই কার্যের বিনাশ হয়। দোষ, মিথ্যাজ্ঞান জন্য বলেই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষের বিনাশ হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তি দোষ জন্য, জন্ম প্রবৃত্তি জন্য, বলেই দোষের বিনাশে প্রবৃত্তির বিনাশ, প্রবৃত্তির বিনাশে জন্মের বিনাশ এবং জন্মের বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়। মনে রাখতে হবে যে, দোষের বিনাশে নতুন ধর্মাধর্ম উৎপন্ন না হলেও পূর্বে উৎপন্ন ধর্মাধর্ম বশতঃ কর্মফল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অপবর্গ বা পরামুক্তি সম্ভব নয়। কর্মফল ভোগের দ্বারাই নিঃশেষ হতে পারে। পরামুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য জীবকে তাই নানা শরীর ধারণ করে কর্মফল ভোগের দ্বারা শেষ করতে হয়। দোষের নিবৃত্তিতে নতুন ধর্ম ও অধর্ম উৎপন্ন হতে পারেনা। এইরূপ অবস্থাতেই নতুন শরীরের আর উৎপত্তির প্রশ্ন থাকে না এবং পূর্বশরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগের অভাবে আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তি ঘটতে পারে। সূত্রকার পূর্বশরীরের সঙ্গে আত্মার এইরূপ সংযোগের অভাব এবং নতুন শরীরের অপ্রাদুর্ভাব বা অনুৎপত্তিকে মোক্ষ বলেছেন। উপস্কার টীকাকার আরো বলেছেন যে, মোক্ষাবস্থার ন্যায় প্রলয়কালেও শরীরের সঙ্গে আত্মার সংযোগাভাব ঘটে। কিন্তু প্রলয়কালীন সংযোগাভাবের সঙ্গে মোক্ষাবস্থার সংযোগাভাবের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রলয়কালীন সংযোগাভাব অনন্ত নয়। এইরূপ সংযোগাভাবের পর পুনরায় শরীরের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। কিন্তু মোক্ষকালীন সংযোগাভাব অনন্ত। নতুন শরীরের অপ্রাদুর্ভাবে এবং পূর্বশরীরের বিনাশে শরীরের সঙ্গে আত্মার যে অনন্ত সংযোগাভাব তাই মোক্ষ।

মুক্তি সইর্কে অপর একটিপ্রাচীন বৈশেষিক মত হল আত্মার সকল প্রকার বিশেষগুণের উচ্ছেদই মুক্তি। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনা এই নয়টি হল আত্মার বিশেষ গুণ। মোক্ষাবস্থায় আত্মার এই বিশেষ গুণগুলির উচ্ছেদ হয়। এইকারণে আত্মার সকল প্রকার বিশেষগুণের উচ্ছেদকেই বৈশেষিকমতে মুক্তি বলা হয়।

২.০১.০২ নিঃশ্রেয়সের লাভের উপায়

এখন প্রশ্ন হল বৈশেষিকমতে নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভের উপায় কি ? প্রশস্তপাদ মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের দুটি উপায় নির্দেশ করেছেন। (১) দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টিপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং (২) ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্ত ধর্মাচরণ। অর্থাৎ দ্রব্যাদি ছয়টিপদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বর উপদিষ্ট বেদপ্রতিপাদিত ধর্মসমূহের প্রতিপালন এই দুইয়ের সমন্বয়েই মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ন্যায়কন্দলীকারের মতে বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত ষড়্পদার্থের এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষের দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম এই উভয়ের সমুচ্চয় থেকেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কেবল ষট্পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান থেকে বা কেবল ঈশ্বরেচ্ছাভিব্যক্ত ধর্ম থেকে মুক্তি হয়না। যোগভাষ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রকেই সাধকের মুক্তির বিকল্প উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক মতে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম - এহট দুহট এর সমন্বয়ে মুক্তি। এককভাবে এদের কোনটিই মুক্তি-সাধক নয়।

আচার্য প্রশস্তপাদ বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্যারম্ভে বলেছেন 'দ্রব্যগুণকর্ম সামান্যবিশেষ সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যাবৈধর্ম্ম্যভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতু'। অর্থাৎ ষট্ ভাব পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়স বা

মোক্ষের হেতু। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দের দ্বারা সব থেকে শ্রেষ্ঠ বস্তুকেই বোঝান হয়। মোক্ষই বৈশেষিক মতে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সুতরাং পদার্থ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং ঐ ষট্ পদার্থের পারস্পরিক সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের জ্ঞানই হল তত্ত্বজ্ঞান। জগদীশসূত্রে অবশ্য বলা হয়েছে যে, প্রথমতঃ শাস্ত্র দ্বারা পদার্থতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করে পরে শ্রুতি, স্মৃতি ও ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রে উপদিষ্ট যোগবিধি দ্বারা দীর্ঘকাল আগ্রহের সঙ্গে নিবৃত্তি ঘটক ধর্মের সেবা করলে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তর্কামৃতগ্রন্থেও জগদীশ পরমেশ্বরের যোগশক্তিবশতঃ ইতর পদার্থের ভেদজ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলেছেন। পরমাত্মাতে ইতর ভেদের জ্ঞান আবার ইতর পদার্থের জ্ঞান-নির্ভর। অতএব মুক্তি বা মোক্ষের হেতু যে তত্ত্বজ্ঞান তা বস্তুতঃ সকল পদার্থের যথার্থজ্ঞান। তাই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞানের মাধ্যমে নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ বা অপবর্গ লাভ হয়ে থাকে। মোটকথা বৈশেষিক মতে কেবলমাত্র পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান থেকে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না। ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্মও নিঃশ্রেয়সের হেতুরূপে স্বীকৃত। ভাষ্যকার তাই বলেছেন 'তচ্চেশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্ধর্মাদেব'।

বস্তুতঃ বৈশেষিক মতে ছয়টি পদার্থ ও তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বিনাশ করলেও তার দ্বারা সর্বকর্মফল বিনষ্ট হয় না। স্মৃতি বা শ্রুতি নির্দিষ্ট নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং সঞ্চিত কর্মফল ভোগের মাধ্যমে সর্বকর্মফল বিনষ্ট হয়। শ্রুতি ও স্মৃতিতে ঈশ্বরেচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। তাই ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অনুগৃহীত তত্ত্বজ্ঞান বৈশেষিকমতে নিঃশ্রেয়সের হেতু। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, বৈশেষিক মতে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের মুখ্যকারণ হলেও **শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন** মোক্ষের সহকারী কারণ। শ্রবণ হল আত্মবিষয়ক শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ, মনন হল শাস্ত্র বাক্যের বিচার পূর্বক অর্থগ্রহণ এবং সেই অর্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। যোগ ও সাধন প্রক্রিয়ায় সতত ধ্যান হল নিদিধ্যাসন। এই ত্রিবিধ স্তরের সমন্বয়ে দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত এক শুদ্ধ আত্মার উপলব্ধি হয়। আত্মোপব্ধিতে মিথ্যাজ্ঞান ও তৎ হেতু দোষ ও প্রবৃত্তির চিরবিলুপ্তি ঘটে। প্রবৃত্তির বিনাশে নতুন কর্মফল আর উৎপন্ন হতে পারে না এবং সঞ্চিত পূর্বকর্মফল ভোগের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। সর্বকর্মফলের সমাপ্তিতে পুনর্জন্ম রোধ হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, কেবলমাত্র পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান নয় শাস্ত্রাদিবাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সহকৃত তত্ত্বজ্ঞানই বৈশেষিক মতে মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের হেতু।

বোমশিবাচার্য এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন গ্রন্থাদি থেকে যেমন তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তেমনি বেদপ্রতিপাদিত ধর্মের দ্বারাও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হতে পারে। তাঁর মতে, ঈশ্বর-সংকল্প রূপ চোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজন। ন্যায়কন্দলীকার অবশ্য ধর্মসহকৃত তত্ত্বজ্ঞানকেই মুক্তির প্রযোজকরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' গ্রন্থের সাহায্যে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তা নিঃশ্রেয়সের হেতু হলেও ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত যে ধর্ম তার অপেক্ষা করে। ঐরূপ ধর্ম থেকেই মুক্তি হয়। সুতরাং কন্দলীকারের মতে প্রশস্তপাদোক্ত 'তচ্চ' এই শব্দের চ-কারের দ্বারা সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম এই উভয়ের সমুচ্চয়কে মুক্তির কারণ বলা যেতে পারে। এককভাবে তত্ত্বজ্ঞান বা ধর্ম মুক্তির কারণ নয়। উপস্কার টীকায় শঙ্কর মিশ্র ও সেতুটীকায় পদ্মনাভ মিশ্র নিঃশ্রেয়স ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে কার্য-কারণ ভাবের উল্লেখ করেছেন। তবে জগদীশ তর্কালঙ্কার সূক্তি টীকায় তত্ত্বজ্ঞান ও নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম এই দুটির সমুচ্চয়কেই নিঃশ্রেয়সের হেতু বলে বর্ণনা করেছেন।

কিরণাবলীর এই ভাষ্যাংশের আলোচনায় তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণ হিসাবে উল্লেখ করে তত্ত্বজ্ঞানের সহায়করূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্মের কথা বলেছেন। তার মতে ভাষ্যাংশে উল্লিখিত 'তৎ' শব্দ তত্ত্বজ্ঞানের নির্দেশক। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হলেও তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক উপায়ে উৎপন্ন হয়না। ঈশ্বর চোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্মের (যোগ) সাহায্যেই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। ঈশ্বর যেহেতু বেদের রচয়িতা সেহেতু ঈশ্বরচোদনা বলতে বেদকেই বুঝতে হয়। সেই বেদের দ্বারা অভিব্যক্ত বোধিত যে ধর্ম অর্থাৎ যোগজ শুভ অদৃষ্ট বিশেষ তাই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক। বেদের দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম বলতে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকেই বোঝানো হয়েছে। প্রথমতঃ শ্রুতিবাক্য থেকে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করতে হয় বা জানতে হয়। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্র নির্দিষ্ট সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য অবলম্বন করে আত্মতত্ত্বের মনন করতে হয়। পরিশেষে শ্রুতিস্মৃতিবিহিত ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসনরূপ যোগের আশ্রয় নিতে হয়। এরূপ নিদিধ্যাসনকেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম বলা হয়। এই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুভ অদৃষ্ট বিশেষ লাভ হয়। এইরূপ নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মানুষ্ঠানপূর্বক যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় সেই তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের হেতু। এই প্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্মত মোক্ষের স্বরূপ খণ্ডন করে বৈশেষিক সম্মত মোক্ষের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২.০২.০০ পদার্থ পরিচয়

বৈশেষিক মতে ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান নিঃশ্রেয়সের হেতু। এখন প্রশ্ন হল ঃ এই পদার্থগুলি কি কি এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যই বা কোন্‌গুলি ?

সাধারণতঃ পদের অর্থকেই বলা হয় পদার্থ (পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ)। ন্যায় বৈশেষিক মতে পদমাত্রই অর্থবোধক। শক্তি বা লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি ঘটানোই পদের কাজ (শক্তম্ পদম্)। সূত্রে ও ভাষ্যে 'পদার্থ' বলতে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। এই ছয়টি পদার্থই বৈশেষিক মতে 'ধর্ম' বলে কথিত হয় কারণ দ্রব্যাদি পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ বা ধর্ম হয় (পদার্থ দ্রব্যাদয়স্তেষাং ধর্ম্মাস্ত এব পরস্পরং বিশেষণীভূতাস্তেন..... কিরণাবলী।) আবার অনারোপিত ধর্মরূপে পদার্থগুলিই বৈশেষিক সম্মত তত্ত্ব। সুতরাং দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এক অর্থে পদার্থতত্ত্বেরই জ্ঞান।

২.০২.০১ দ্রব্য পরিচয়

সূত্রকার মহর্ষি কণাদ ও ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতু বলে গণ্য করে দ্রব্যাদির স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইনয়টি পদার্থকে বলা হয় দ্রব্য। 'দ্রব্য' নামটি এই নয়টি পদার্থের সামান্য সংজ্ঞা, অর্থাৎ এই নয়টি হল দ্রব্য পদার্থ। 'দ্রব্য' এই পদার্থগুলির সামান্য নাম। 'পৃথিবী', 'জল' প্রভৃতি হল এই পদার্থগুলির বিশেষ নাম। প্রশস্তপাদাচার্য এই ভাবে দ্রব্যের সামান্য সংজ্ঞা ও বিশেষ সংজ্ঞা উল্লেখ করে বলেছেন মহর্ষি কণাদ এই নয়টি দ্রব্যের বিশেষ সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য সংজ্ঞা না দেওয়ায় দ্রব্য নয়টি এবং কেবলমাত্র নয়টি বলেই জানতে হবে। কিরণাবলীকার এই প্রসঙ্গে অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব সবিস্তারে খণ্ডন করেছেন।

২.০২.০২ দ্রব্যের লক্ষণ

প্রশস্তপাদভাষ্যে স্বতন্ত্রভাবে দ্রব্যের লক্ষণ নির্দেশ করা হয়নি। তবে সূত্রে ও ভাষ্যে নব দ্রব্যের সংজ্ঞাতে যে

'দ্রব্যানি' পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকেই দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ সূচিত হয় বলে পরবর্তী আচার্যগণ মনে করেন। 'দ্রব্যানি' পদ থেকে দ্রব্যের যে লক্ষণ সূচিত হয় তাহল 'দ্রব্যত্ববত্ত্ব'।

যা দ্রব্যত্ববৎ বা দ্রব্যত্ববান তাই দ্রব্য। কোনো কোনো মতে দ্রব্যত্ব দ্রব্যের লক্ষণ হতে পারে না। যেহেতু ইতরভেদানুমিতিতে দ্রব্যটি পক্ষ হয় বলে পক্ষতাবচ্ছেদক (লক্ষ্যতাবচ্ছেদক) ও লক্ষণ অভিন্ন হয়ে পড়ে। 'দ্রব্যং ইতরভিন্নং দ্রব্যত্বাৎ' এই অনুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক (দ্রব্য পক্ষ হওয়ায় দ্রব্যত্ব এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক) ও হেতু অভিন্ন। অর্থাৎ এখানে দ্রব্যত্ব পক্ষতাবচ্ছেদক এবং দ্রব্যত্বই হেতু। যদি লক্ষতাবচ্ছেদক এবং লক্ষণ অভিন্ন হয় তাহলে অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্যের ইতরভেদানুমিতিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত হয় সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞান নয়, ব্যাতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান। অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকার করলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কিন্তু ব্যাতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানে তা হয় না।

কেউ কেউ বলেন দ্রব্যত্ব বলে কিছু নেই কারণ গোত্ব প্রভৃতির ন্যায় তার উপলব্ধি হয়না। বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন অনুরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করতে বলেছেন ''ননু দ্রব্যত্ব-জাতৌ কিং মানং, ন হি তত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণং ঘৃত-জতু-প্রভৃতিষু দ্রব্যত্বাগ্রহাদিতি।''[২] অর্থাৎ দ্রব্যত্বজাতিতে কি প্রমাণ ? এর পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ থাকতে পারে না কারণ ঘৃত, জতু প্রভৃতি অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থে প্রত্যক্ষের দ্বারা কোন সাধারণ ধর্ম গৃহীত হয় না।

রহস্যকার শঙ্কর মিশ্র মনে করেন দ্রব্যত্বজাতির নিষেধ অসঙ্গত। পূর্বপক্ষী যে গোত্বাদি জাতির ন্যায় উপলব্ধি হয় না বলে দ্রব্যত্বজাতিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন তা স্ববিরোধী। দ্রব্যত্ব জাতিকে পক্ষ করে তার নিষেধ সম্ভব নয়। দ্রব্যত্বজাতিকে পক্ষ করলে তার অস্তিত্বই স্বীকৃত হয়। আর দ্রব্যত্ব যদি না থাকে তাহলে তাকে পক্ষ করে তার নিষেধ করা চলে না, কারণ অলীকের নিষেধ হয় না।

উপরিউক্ত পূর্বপক্ষ খণ্ডনার্থে কিরণাবলীকার ও মুক্তাবলীকার অনুমান প্রমাণের আশ্রয় নিয়েছেন। কিরণাবলীকার বলেছেন সাস্নাদিরূপ সংস্থানের দ্বারা অভিব্যক্ত গোত্বাদির ন্যায় কার্যাশ্রয়তারূপ আশ্রয়ে বিদ্যমান সাধর্ম্যের দ্বারা অভিব্যক্ত দ্রব্যত্ব সামান্যেরও প্রতীতি হয়। মুক্তাবলীকার বলেছেন কার্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্মরূপে দ্রব্যত্ব জাতির সিদ্ধি হয়।

মহর্ষি কণাদ ১/১/১৫ সূত্রে দ্রব্যের আরো একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এই লক্ষণটি হল 'ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্'। বস্তুতঃ এই সূত্রে দ্রব্যের তিনটি বিকল্প লক্ষণ দেওয়া হয়েছে ঃ (১) যা ক্রিয়ার আশ্রয় বা ক্রিয়াবৎ তাই দ্রব্য, (২) যা গুণের আশ্রয় বা গুণবৎ তাই দ্রব্য এবং (৩) যা গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য। বলাই বাহুল্য যে, এই তিনটি লক্ষণের কোনটিই এককভাবে নির্দোষ লক্ষণ হতে পারে না। বৈশেষিক মতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চারটি দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এই চারটি ক্রিয়াহীন দ্রব্যে 'ক্রিয়াবত্ত্বং দ্রব্যত্বং' এই লক্ষণ প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। 'গুণবত্ত্বং দ্রব্যত্বং' এই লক্ষণটিও নির্দোষ নয়। বৈশেষিক মতে দ্রব্য নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবী, তেজ, জল ও বায়ু এই চারটি দ্রব্যের পরমাণু, আকাশ কাল, দিক্, আত্মা ও মন এগুলি হল নিত্যদ্রব্য। এগুলির উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু পরমাণু ভিন্ন সকল পার্থিব,

জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয় দ্রব্যই উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্যদ্রব্য। এই সকল অনিত্য দ্রব্য স্ব স্ব উৎপত্তিক্ষণে গুণহীন থাকে। বৈশেষিকমতে অনিত্য দ্রব্যের কারণসামগ্রী কেবল দ্রব্যই উৎপন্ন করতে পারে, গুণ উৎপন্ন করতে পারে না। দ্রব্যের উৎপত্তির পর সেই দ্রব্য গুণ উৎপন্ন করে। উৎপত্তিকালীনদ্রব্য তাই নির্গুণই হয়। এই উৎপত্তিকালীন দ্রব্য নির্গুণ হওয়ায় 'গুণবত্বং দ্রব্যত্বং' এই লক্ষণটিও অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। গুণকর্মসমবায়িকরণত্ব এই লক্ষণটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে গুণের আশ্রয়যোগ্যতা এবং গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণতার যোগ্যতা অর্থে শেষোক্ত লক্ষণদুটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। উৎপত্তিকালীন দ্রব্য গুণাভাবের এবং সমবায়িকারণতার অভাবের অধিকরণ হলেও প্রতিযোগিব্যাধিকরণ হয়না। প্রতিযোগিব্যাধিকরণে প্রতিযোগী কখনই অধিকরণ হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তিকালীন দ্রব্য গুণবান বা গুণের সমবায়িকারণ না হলেও তাতে গুণের সমবায়িকারণতার যোগ্যতা বর্তমান থাকে। এই অর্থে গুণের ও কর্মের সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলা যায়।

২.০২.০৩ অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব খণ্ডন

মহর্ষি কণাদ ১/১/৫ সূত্রে পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টিদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন। সংখ্যার দিক থেকে সূত্রকার নয়টি দ্রব্যের উল্লেখ করলেও নববোধক কোনো শব্দ তিনি এইসূত্রে উল্লেখ করেননি এবং এর অতিরিক্ত দ্রব্য যে নেই সেকথাও বলেননি। প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে নয়টিদ্রব্যের নামোল্লেখান্তে দ্রব্য যে নয়টি এবং তার বেশী দ্রব্য যে নেই (নবৈবেতি) তা স্পষ্টতঃ ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পক্ষে তিনি বলেছেন নয়টির অতিরিক্ত কোনো দ্রব্যের নাম সূত্রকার বলেননি। 'নবৈব' শব্দ-ব্যবহারের অন্য কোন তাৎপর্যের নির্দেশ আমরা ভাষ্যে পাই না। তবে এই ভাষ্য থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নয়টির অতিরিক্ত দ্রব্য অন্য কোনো সইদায় স্বীকার করেন এবং সেই মত খণ্ডনের নিমিত্তই ভাষ্যকার 'নবৈব' পদটির উল্লেখ করেছেন। কিরণাবলীকার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে নয়টির অতিরিক্ত দ্রব্যের সম্ভাবনা নস্যাৎ করেছেন।

কিরণাবলীকার ভাষ্যোক্ত 'নবৈব' শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে দুটি পথ অনুসরণ করেছেন। প্রথমত, তিনি দেখিয়েছেন যে এমন কোন দ্রব্য নেই যা এই নয়টিদ্রব্যের অতিরিক্ত হতে পারে। যেমন স্বর্ণ একটিপ্রসিদ্ধ দ্রব্যপদার্থ কিন্তু তিনি স্বর্ণের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে স্বর্ণ তেজদ্রব্যের অন্তর্গত। দ্বিতীয়ত, তিনি দ্রব্য নয় এমন পদার্থের দ্রব্যত্ব নিষেধের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যেন নয়টিদ্রব্যের অতিরিক্ত কোনো দ্রব্য নেই, যেমন অন্ধকার। অন্ধকার আদৌ দ্রব্য নয়। সুতরাং অন্ধকারের দ্রব্যত্বের আশঙ্কা খণ্ডন করা প্রয়োজন। কিরণাবলীকার তাঁর নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করার পূর্বে যাঁরা অন্ধকারকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলেন তাঁদের মত উপস্থাপন করেছেন।

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন যে, অন্ধকার একটি অনুভবসিদ্ধ পদার্থ। অনুভবসিদ্ধ পদার্থের অপলাপ করা যায় না। আবার দ্রব্য ছাড়া অন্ধকার অন্য কোনো পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব অন্ধকার দ্রব্য। অন্ধকার দ্রব্য হলেও বৈশেষিক সম্মত নব দ্রব্যের অন্তর্গত না হওয়ায় তাকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলেই স্বীকার করতে হয়।

নানা যুক্তিতে মীমাংসকগণ অন্ধকার যে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন, তেজ, জল ও পৃথিবীর অন্তর্গত হতে পারে না তা প্রদর্শন করেছেন। অতএব অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলতে হয়। অন্ধকার সম্বন্ধে মীমাংসকদের এটাই সিদ্ধান্ত।

উপরিউক্ত মীমাংসক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিরণাবলীকারের বক্তব্য এই যে অন্ধকার যদি বাস্তবিক পক্ষে দ্রব্য হত তাহলে তা রূপবান ও ক্রিয়াবান হত। আবার অন্ধকার যদি ক্রিয়াবান বা রূপবান হত তাহলে তা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হত। পুনরায় অন্ধকার যদি চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হত তাহলে তার উপলব্ধিতে আলোকের প্রয়োজন হত। কিন্তু অন্ধকার যখন আলোক নিরপেক্ষভাবেই গৃহীত হয় তখন তাকে রূপবান বা ক্রিয়াবান দ্রব্য বলা যায় না। এভাবে কিরণাবলীকারের দ্বারা অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব খণ্ডিত হয়। বস্তুতঃ বৈশেষিকমতে অন্ধকার অভাব পদার্থ, দ্রব্য পদার্থই নয়।

অন্ধকারকে অভাব পদার্থ বলার পক্ষে যুক্তি এই যে, অন্ধকারের প্রতীতি ভাবরূপে বা বিধিমুখে হয় না, নিষেধমুখেই হয়। 'নঞ্' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত না হলেই যে কোন প্রতীতি ভাবরূপ বলে বিবেচিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রকাশকার অন্ধকারের বিধিমুখত্ব খণ্ডন করতে বলেছেন প্রতীতির বিধিমুখত্ব নির্বাচন তিনভাবে হয়, ভাবত্ব, নিষ্প্রতিযোগিকত্ব ও নিষেধাবিষয়ক ধীবিষয়ত্ব। এই তিনটির কোনটির দ্বারাই অন্ধকারের বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হয় না। সুতরাং অন্ধকারকে ভাবপদার্থ বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

এখন প্রশ্ন হল বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্ধকারকে যদি আলোকাভাবই বলা হয় তাহলে অন্ধকারের গতি ও রূপের কি ব্যাখ্যা হবে ? কেবল মূর্ত দ্রব্যই সচল হয় কিন্তু অন্ধকারকে যদি দ্রব্য পদার্থ না বলা হয় তাহলে তার এই গতি থাকতে পারে না। এর উত্তরে কিরণাবলীকার বলেছেন অন্ধকার আদৌ গতিশীল পদার্থ নয়। ভ্রান্তিবশতঃই অন্ধকারের গতি দর্শন হয়ে থাকে। চাক্ষুষ দ্রব্যে যদি বাস্তবিক ক্রিয়া থাকে তাহলে তার স্পর্শও থাকে। ঘট, পটপ্রভৃতি ক্রিয়াশীল চাক্ষুষদ্রব্য তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু অন্ধকারের কোনো স্পর্শ না থাকায় তাকে ক্রিয়াশীল বলা যায় না। আর অন্ধকার যদি ক্রিয়াশীল না হয় তাহলে তার গতিপ্রতীতিকে ভ্রান্ত বলা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

গতি-প্রতীতির ন্যায় অন্ধকারের রূপ-প্রতীতিও ভ্রান্ত। তেজের যে শুক্লভাস্বর রূপ তার অভাবই অন্ধকারে নীলরূপের প্রতীতির কারণ। কিরণাবলীকারের মতে অন্ধকার আলোকাভাব এবং নীলরূপ আলোকাভাবে আরোপিত গুণ। নীলরূপ স্বয়ং অন্ধকার নয়, বরং আলোকাভাবই অন্ধকার।

মহর্ষি কণাদ বলেছেন ''দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদভাবস্তমঃ'' (বৈঃ সুঃ ৫/২/১৯)। এই সূত্রে সূত্রকার অন্ধকার যে অভাব পদার্থ তা স্পষ্টই ব্যক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের উৎপত্তির বৈধর্ম্য যে অন্ধকারে আছে তাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। বৈশেষিক মতে অভাব পদার্থ গুণবান বা কর্মবান হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল অন্ধকার যে গুণবান এবং কর্মবান নয় তা প্রমাণিত হয় কিভাবে। কিরণাবলীকার ও মুক্তাবলীকার উভয়ে অন্ধকারে নীলরূপের প্রতীতি বা গমনাগমন কর্মের প্রতীতিকে ভ্রান্ত বলেছেন। এরূপ ভ্রমকে তারা আরোপিত ভ্রম বলেছেন। তাদের মতে রূপবান ও কর্মবান তেজের গুণ ও কর্ম বিপরীতভাবে অন্ধকারে আরোপিত হয় বলে অন্ধকারকে রূপবান ও গতিমান বলে মনে হয়। যেমন তেজের রূপ হল শুক্লভাস্বর। তেজের অভাবে শুক্লভাস্বররূপের বিপরীতভাবে নীলরূপের আরোপ ঘটে। অনুরূপভাবে তেজের অপসারণই অন্ধকারের আগমন বলে বোধিত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এরূপ ভ্রম কেন হয়। সাধারণতঃ বাধকপ্রতীতিই ভ্রমের সাধক। রজ্জুতে সর্পভ্রম রজ্জুতে রজ্জুত্বের বাধক-প্রতীতির দ্বারা সিদ্ধ হয়। কিন্তু অন্ধকার যদি দ্রব্য না হয় তাহলে তাতে কোনো রূপ বা কর্মের বাধক-প্রতীতি সম্ভব নয়। তাহলে অন্ধকারের রূপ ও গতির প্রতীতি যে ভ্রান্ত তা সিদ্ধ হয় কিরূপে? এর উত্তরে বলা যায় যে, বৈশেষিক মতে প্রতীতির প্রমাত্ব শুধুমাত্র বাধক-প্রতীতির অভাবের উপর নির্ভর করে না। বাধক-প্রতীতির দ্বারা যেমন প্রতীতির ভ্রমত্ব সিদ্ধ হয় তেমনি বাধক-প্রতীতি না থাকলে যে তার প্রমাত্ব সিদ্ধ হবে একথা বলা যায় না। 'আকাশ নীল' এইরূপ প্রতীতির

বাধক-প্রতীতি হয় না। কিন্তু তাই বলে 'আকাশ নীল' এইরূপ প্রতীতিকে প্রমা বলা যায় না। অনুরূপভাবে বাধক-প্রতীতি ব্যতিরেকে অন্ধকারের রূপ ও গতির প্রতীতি ভ্রম বলে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুতঃ যে যুক্তিতে বৈশেষিকগণ অন্ধকারের রূপ ও গতির প্রতীতিকে ভ্রান্ত বলেছেন তাহল অন্ধকারের স্পর্শাভাবের যুক্তি। বৈশেষিক মতে চাক্ষুষ দ্রব্য গতিবিশিষ্ট হলেই তা স্পর্শবিশিষ্ট হয়। আবার কোনো দ্রব্য রূপবিশিষ্ট হলে তা স্পর্শবিশিষ্ট হয়। অন্ধকারকে দ্রব্য বলা হলে এই নিয়ম ব্যাহত হয়। অন্ধকারের স্পর্শ নেই। স্পর্শহীন অন্ধকার রূপবান হতে পারে না।

বৈশেষিক মতে অন্ধকার আলোকভাব হলেও যেকোনো প্রকার আলোকাভাবই অন্ধকার নয়। রাত্রিতে আমরা যখন অন্ধকার দেখি তখন সেখানে অনেক তৈজস পরমাণুও থাকে। তৈজস পরমাণুর উপস্থিতিতেও আলোকাভাবরূপ অন্ধকার কি করে থাকতে পারে ? এজন্য বলা হয় যে, যে-কোনো প্রকার তেজের অভাব নয়, মহত্ত্ববৎ তেজের অভাবই হল অন্ধকার।

প্রকৃষ্ট মহত্ত্ববৎ উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপবৎ তেজের অভাব হল অন্ধকার। অর্থাৎ প্রকৃষ্ট মহত্ত্বসমানাধিকরণ উদ্ভূত ও অনভিভূত রূপবৎ আলোকের অভাব হল অন্ধকার। মোটকথা, যেরূপ আলোকের অভাবে অন্ধকার প্রত্যক্ষ হয় সেইরূপ আলোকের অভাবকেই অন্ধকার বলা হয়।

২.০২.০৪ দ্রব্যের বিভাগ

উদ্দেশপ্রকরণে পদার্থের নামোল্লেখমাত্রই কর্তব্য। বৈশেষিক সূত্রকার ও ভাষ্যকার এবং তাদের অনুগামী আচার্যগণ সেই প্রথাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু নামোল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা বিভাগেরও সূচনা করেছেন যথা; দ্রব্য নয় প্রকার, গুণ চব্বিশ প্রকার, কর্ম পাঁচ প্রকার, সামান্য পর ও অপরভেদে দুই প্রকার, বিশেষ বহু, এবং সমবায় এক - এইরূপ পদার্থ পরিচয়ের দ্বারা তাদের বিভাগও সূচিত হয়। আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে উক্ত নয়প্রকার দ্রব্যের আলোচনা করবো।

মহর্ষি কণাদের মতে দ্রব্য নববিধ। এইনয়টি দ্রব্য হলঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্‌কে **ভূত দ্রব্য** এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মনকে **মূর্ত দ্রব্য** বলা হয়। অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ **ভূত দ্রব্যও** বটে আবার **মূর্ত দ্রব্যও** বটে। কাল, দিক্ ও আত্মা ভূতও নয় আবার মূর্তও নয়। মন **মূর্ত দ্রব্য** কিন্তু **ভূত দ্রব্য** নয়। ব্যোম্ **ভূত দ্রব্য**, কিন্তু **মূর্ত দ্রব্য** নয়। **ভূত দ্রব্যের** সমন্বয়ে ভৌতজগৎ সৃষ্ট হয়েছে। যে দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ আছে তাকে ভূত দ্রব্য বলে। সীমিত পরিমাণমুক্ত দ্রব্যকে বলে মূর্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটি **ভূত দ্রব্য** যথাক্রমে গন্ধ, রস, (স্বাদ), রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি বিশেষ গুণের অধিকারী। বিশেষ গুণ নির্দিষ্ট দ্রব্য ছাড়া অন্যত্র থাকে না। গন্ধ ক্ষিতির বিশেষ গুণ। তাই ক্ষিতি ছাড়া গন্ধ অন্য কোথাও উৎকর্ষ রূপে থাকতে পারে না। অন্য দ্রব্য যখন ক্ষিতির সঙ্গে মিলিত হয় তখন ক্ষিতির গন্ধ অন্য দ্রব্যের বলে মনে হয়। যেমন শুদ্ধ জলের কোন গন্ধ নেই কিন্তু জল যখন ক্ষিতি দ্রব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তখন জল গন্ধবান বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গন্ধের উৎকর্ষ ক্ষিতিতেই থাকে, জলে থাকে না। একই ভাবে স্বাদ জল ব্যতীত, রূপ তেজ ব্যতীত, স্পর্শ বায়ু ব্যতীত এবং শব্দ আকাশ ব্যতীত কোথাও উৎকর্ষ রূপে থাকে না, পাঁচটি ভূত দ্রব্যের পাঁচটি বিশেষ গুণ যথাক্রমে ঘ্রাণেন্দ্রিয় (নাসিকা), রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা), চক্ষুরিন্দ্রিয় (চক্ষু), ত্বগেন্দ্রিয় (ত্বক্) ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের (কর্ণ) দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এক একটি

বিশেষ গুণ এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। বৈশেষিক মতে যে যে বিশেষ গুণ যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য, সেই সেই বিশেষ গুণের আশ্রয় ভূতদ্রব্যের উপাদানে সেই সেই ইন্দ্রিয় গঠিত। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় যে **ভূত দ্রব্যের** উপাদানে গঠিত, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই **ভূত দ্রব্যের** বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিকগণের সঙ্গে একমত। এই কারণেই ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে ভৌতিক বলা হয়েছে। অভৌতিক দ্রব্যগুলিরও বিশেষ গুণ আছে কিন্তু এই বিশেষ গুণগুলি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যেমন জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণ কিন্তু জ্ঞান কোন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অভৌতিক ইন্দ্রিয় মন এই গুণকে প্রত্যক্ষ করে।

ভৌত পদার্থসমূহ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সাবয়ব ভৌত দ্রব্য অনিত্য এবং আদি উপাদান রূপ প্রত্যক্ষের অগোচর পরমাণু দ্রব্য নিত্য।

পরমাণু বলতে পরম অণু বা চরম-সূক্ষ্ম জিনিসকে বোঝান হয়। সাবয়ব বস্তুর অবিভাজ্য চরম-সূক্ষ্ম অংশসমূহই এই হল পরমাণু। ন্যায় বৈশেষিক মতে চতুর্বিধ পরমাণু (পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়) জগতের উপাদান স্বরূপ। ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির হচ্ছায় এই পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়ার দ্বারা প্রথমে দুটি দুটি সমজাতীয় পরমাণুর মিলন হয়। এর ফলে অসংখ্য পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। জীবের অদৃষ্ট ও ঈশ্বরের প্রযত্নে এইসব দ্ব্যণুকে আবার ক্রিয়া উৎপন্ন হয়ে ত্রসরেণু ও অন্যান্য পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় জগতের সংহারের সময় দ্ব্যণুকের উপাদান পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়ার দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ হয়। এইবিভাগের ফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়ে তদাশ্রিত ত্রসরেণুসহ মহৎ, পৃথিব্যাদি ও স্থূলতম কার্য দ্রব্যগুলি পরমাণুতে পর্যবসিত হয়।

২.০২.০৫ নিত্য ও অনিত্য দ্রব্যসমূহ

২.০২.০৫.০১ পৃথিবী

ক্ষিতি বা পৃথিবী হল গন্ধবতী দ্রব্য। পৃথিবীতে মোট ১৪টি গুণ থাকে যথাঃ গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব ও সংস্কার (বেগ ও স্থিতিস্থাপক)। পৃথিবীতে গন্ধ গুণেরই উৎকর্ষ তাই গন্ধ পৃথিবীর বিশেষ গুণ। পৃথিবীর পরমাণু হল নিত্য। অনিত্য পৃথিবী, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ।

২.০২.০৫.০২ জল

শীতস্পর্শবান দ্রব্য হল জল। পৃথিবীর ন্যায় জল ও ১৪টি গুণের আশ্রয়। তবে পৃথিবীর গন্ধনামক গুণটি জলে থাকে না। তার পরিবর্তে জলে স্নেহ গুণটি থাকে। পরমাণুরূপ জল নিত্য। অনিত্য জল, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে ত্রিবিধ। রস জলের বিশেষ গুণ।

২.০২.০৫.০৩ তেজ

উষ্ণস্পর্শবান দ্রব্য হল তেজ। পৃথিবী ও জলের বিশেষ গুণ যথাক্রমে গন্ধ ও রস তেজদ্রব্যে থাকে না। পৃথিবীর ১৪টি গুণের মধ্যে মোট ১১টি গুণ তেজদ্রব্যে থাকে। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য। অনিত্য তেজ পৃথিবী ও জলের ন্যায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় ভেদে ত্রিবিধ। বিষয়রূপ তেজ আবার চতুর্বিধ ঃ ভৌম, দিব্য, উদর্য ও আকরজ। অগ্ন্যাদি তেজ হল ভৌম তেজ। বিদ্যুৎ, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি হল দিব্য তেজ। অন্নাদি পরিপাকের জন্য উদরস্থিত তেজ হল উদর্য তেজ এবং সুবর্ণ রত্নাদি হল আকরজ তেজ।

২.০২.০৫.০৪ বায়ু

রূপরহিত স্পর্শবান দ্রব্য হল বায়ু। পৃথিবী, জল ও তেজ দ্রব্যে রূপ থাকে এবং স্পর্শও থাকে কিন্তু বায়ুতে স্পর্শ থাকলেও রূপ থাকে না। স্পর্শ সংখ্যা, পরমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার (বেগ) এই নয়টি গুণ বায়ুতে থাকে। প্রাচীনমতে বায়ু স্পর্শাদি গুণের আশ্রয়রূপে অনুমেয় কিন্তু নব্যমতে বায়ু ত্বাচ্প্রত্যক্ষসিদ্ধ। পৃথিব্যাদি দ্রব্যের ন্যায় পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য। অনিত্যবায়ু শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে ত্রিবিধ। স্পর্শ বায়ুর বিশেষ গুণ।

২.০২.০৫.০৫ আকাশ

বৈশেষিকসম্মত পঞ্চমদ্রব্য হল আকাশ বা ব্যোম্। বৈশেষিক মতে আকাশ হল এক, বিভু, নিত্য, ভূতদ্রব্য। আকাশ অতীন্দ্রিয় হওয়ায় পরিশেষানুমানের দ্বারা আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে শব্দ অনিত্য গুণ পদার্থ। এই মতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য অথচ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য জাতিমান পদার্থ হল গুণ পদার্থ। শব্দ চক্ষুদ্বারা গ্রহণের অযোগ্য এবং বহিরিন্দ্রিয় কর্ণের দ্বারা গ্রাহ্য শব্দত্ব জাতির আশ্রয় হওয়ায় তা গুণ পদার্থ। শব্দ গুণ হওয়ায় তা কোন না কোন দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে সংবদ্ধ হবে। আবার তা অনিত্য হওয়ায় তার সমবায়ী কারণ রূপে কোন দ্রব্য স্বীকার করতে হয়। শব্দ আকাশের বিশেষ গুণ। শব্দ একটি বিশেষ গুণ হওয়ায় তা কাল, দিক্ ও মনে আশ্রিত হতে পারে না। কারণ এই তিনটি দ্রব্য কোন বিশেষ গুণের আশ্রয় হয় না। আবার শব্দ যেহেতু শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সেহেতু তা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আত্মার গুণ হতে পারে না। পৃথিব্যাদি দ্রব্যের গুণ শ্রোত্রেন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় না। এভাবে পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যের শব্দাশ্রয়ত্ব বা শব্দ সমবায়ি কারণতা অস্বীকৃত হওয়ায় নবতম দ্রব্য আকাশকেই শব্দাশ্রয় বা শব্দের সমবায়ী কারণরূপ দ্রব্য বলে স্বীকার করতে হয়। এভাবে পরিশেষানুমানের সাহায্যে আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

২.০২.০৫.০৬ কাল

বৈশেষিক স্বীকৃত ষষ্ঠ পদার্থ হল কাল। কালকে অতীতাদি ব্যবহারের হেতু বলা হয়। কাল বৈশেষিক মতে এক, বিভু ও নিত্য।

কালের অস্তিত্ব সাধনে বৈশেষিক দর্শনে দ্বিবিধ প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) ইদানিং প্রতীতির হেতুরূপে এবং (২) পরত্বাপরত্ব প্রতীতির হেতুরূপে। আমরা প্রায়শই 'ইদানীং ঘটঃ' এরূপ বাক্য ব্যবহার করি। এর দ্বারা কোন এক নির্দিষ্ট কালে ঘটের অস্তিত্বকে বোঝানো হয়। 'ইদানীং' পদের দ্বারা অতীতাদি ব্যবহারকেও বোঝানো হয়। ইদানীং বা অতীতাদি ব্যবহারের হেতু, কাল ছাড়া অন্য কোন দ্রব্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, পরত্ব-অপরত্ব বা জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্ব প্রতীতির হেতুরূপেও কালকে স্বীকার করতে হয়। পরত্ব-অপরত্ব ভাব কার্য বলে তার সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ স্বীকার করতে হয়। যে দ্রব্যে পরত্ব বা অপরত্ব প্রতীতি উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য হল তার সমবায়ী কারণ। এখন প্রশ্ন হলঃ পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়ী কারণ কোন্‌টি? দ্রব্যের উপাধি, গুণ, বা অন্য কোন পদার্থ পরত্ব বা অপরত্বের অসমবায়ী কারণ হতে পারে না। তাই পরত্ব-অপরত্ব প্রতীতির অসমবায়ী কারণরূপে কালকে স্বীকার করতে হয়।

২.০২.০৫.০৭ দিক্

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পরত্ব এবং অপরত্ব দুটি গুণ পদার্থ স্বীকৃত। পরত্ব এবং অপরত্ব গুণদ্বয়ের ব্যবহার আবার দুই প্রকার। এক প্রকার পরত্ব এবং অপরত্বের দ্বারা জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বের উপপত্তি হয়। অপর প্রকার পরত্ব এবং অপরত্বের দ্বারা দূরত্ব এবং নিকটত্বের উপপত্তি হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে প্রথম প্রকার ব্যবহারের দ্বারা কাল অনুমিত হয় এবং দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারের দ্বারা দিক্ অনুমিত হয়।

আমরা প্রাচী (পূর্ব), প্রতীচী (পশ্চিম), উদীচী (উত্তর) এবং অবাচী (দক্ষিণ) প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে দূরত্ব নিকটত্বের প্রতীতি লাভ করি। দূরত্ব-নিকটত্ব দৈশিক অবস্থান নির্দেশক। এই দৈশিক অবস্থানই পরত্ব-অপরত্বের একটি অর্থ। 'বর্ধমান বোলপুরের নিকটে এবং কলকাতার দূরে' এরূপ বাক্যের দ্বারা আমরা স্থানের দৈশিক অবস্থানকে নির্দেশ করি। যে স্থান আগে প্রাপ্ত তা নিকট এবং যে দেশ পরে প্রাপ্ত তা দূর। এই দূরত্ব ও নিকটত্ব আমরা ফুট্ গজ, মাইল, কিলোমিটারের দ্বারা নির্দেশ করি। ন্যায়-বৈশেষিক মতে পরত্ব এবং অপরত্ব গুণপদার্থ। এই গুণদ্বয় অনিত্যদ্রব্যেও থাকে বলে তাকে নিত্য বলা যায় না। অনিত্য এই পরত্ব-অপরত্ব গুণদ্বয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকায় তাদের সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ স্বীকার করতে হয়। যে দ্রব্যদ্বয়ে পরত্ব-অপরত্বের বোধ জন্মে সেই দ্রব্যই তাদের সমবায়ী কারণ। দিক্-সংযোগ পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়ী কারণ। আকাশ-সংযোগ বা কাল-সংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের অসমবায়ী কারণ হতে পারে না। আকাশ পরধর্মের অসমবায়ী কারণ সংযোগের আশ্রয় হয়। কাল কালিক পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়ী কারণ হওয়ায় দৈশিক পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়ী কারণ হতে পারে না। এইরূপে বৈশেষিকাচার্যগণ দৈশিক পরত্ব-অপরত্বের অসমবায়ী কারণরূপে দিক্ নামক সপ্তম দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈশেষিক মতে দিক্ এক ও বিভু।

২.০২.০৫.০৮ আত্মা

বৈশেষিক মতে আত্মা জ্ঞানের অধিকরণ। পরমাত্মা ও জীবাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ। আত্মা বিভু ও নিত্য।

পরমাত্মা ঈশ্বর এক, কিন্তু জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। প্রচলিত মত অনুযায়ী জীবাত্মাতে চৌদ্দটিও পরমাত্মাতে আটটিগুণ থাকে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এই চৌদ্দটি জীবাত্মার গুণ। এর মধ্যে প্রথম পাঁচটি সামান্য গুণ এবং অবশিষ্ট নয়টি গুণ আত্মার বিশেষগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন এইট আটটি পরমাত্মার বিশেষ গুণ। মতান্তরে ইচ্ছা ও প্রযত্ন পরমাত্মার গুণ নয়। তাই পরমাত্মার ছয়টি গুণ। ঈশ্বরের গুণসমূহ নিত্য, কিন্তু জীবাত্মার গুণসমূহ অনিত্য। ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানের তথা চৈতন্যের অধিকরণত্ব নিরাস করে আত্মাকে জ্ঞানাধিকরণ স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে প্রমাণ করেছেন।

আত্মাকে সুখ-দুঃখাদিগুণের অধিষ্ঠানরূপে অনুমেয় বলা হলেও কোন কোন আচার্য আত্মাকে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেন। 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' এরূপ প্রতীতিতে সুখ, দুঃখ যেমন মানস জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনি তাদের আশ্রয় আত্মাও মানসজ্ঞানের বিষয় হয়। তবে ন্যায়মতে আত্মা জ্ঞানস্বরূপ নয়। জ্ঞান নামক আগন্তুক গুণের আশ্রয়মাত্র। জ্ঞানাদির মাধ্যমে আত্মার প্রতীতি হলেও জ্ঞানাভাবেও আত্মা অস্তিত্বশীল থাকে। মুক্ত আত্মা জ্ঞানহীনভাবে অস্তিত্বশীল, মুক্ত আত্মাতে সংখ্যা, পরিমাণ ও পৃথক্ত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ বর্তমান থাকে। একদেশী (ভাসর্বজ্ঞ) মতে আত্মায় নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নয়। বরং প্রচলিত ন্যায়মতে আত্মা নিত্য সুখের অধিষ্ঠান হতে পারে না। আত্মায় নিত্য সুখ স্বীকার করলে তার জ্ঞানও স্বীকার করতে হয়। আবার জ্ঞান স্বীকার করলে সেই জ্ঞানের অসমবায়ী কারণ আত্ম-মনোসংযোগ এবং তার কারণরূপে অদৃষ্ট স্বীকার করতে হয়। অদৃষ্টের অধিষ্ঠানরূপ আত্মা কখনো মুক্ত হতে পারে না।

২.০২.০৫.০৯ মন

মন বৈশেষিক সম্মত নবম দ্রব্য এবং অন্তিম দ্রব্য। এই মতে মন অণুপরিমাণ, সংখ্যায় বহু এবং নিত্য। স্পর্শরহিত ক্রিয়াবান দ্রব্যত্বই মনের লক্ষণ। পৃথিবী, তেজ, জল, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যই ক্রিয়াবান। এরমধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু স্পর্শবানও বটে। মন যেহেতু স্পর্শশূন্য সেহেতু স্পর্শরহিত ক্রিয়াবান দ্রব্যত্ব মনের সংগত লক্ষণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে মনে আটটি গুণ থাকে। কিন্তু এই গুণগুলির কোনটিই বিশেষগুণ নয়। এই আটটি গুণ হল, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও সংস্কার (বেগ)।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মন অন্তরিন্দ্রিয়ও বটে। ইন্দ্রিয়মাত্রই যেহেতু অতীন্দ্রিয় সেহেতু মনও অতীন্দ্রিয়। এই অতীন্দ্রিয় মনের অস্তিত্ব সাধনে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দ্বিবিধ যুক্তি লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বিবিধ যুক্তির এক প্রকার যুক্তি দ্রব্যরূপ মনের সাধক এবং অপর এক প্রকার যুক্তি অন্তরিন্দ্রিয়রূপে মনের সাধক। প্রথম প্রকার যুক্তিতে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় থাকলেও যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয় না। এই অভিজ্ঞতা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। এখন প্রশ্ন হল বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রয়ের যুগপৎ সম্বন্ধ থাকলেও কেন যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান হয় না। আত্মা বিভু হওয়ায় আত্মার সঙ্গে হটন্দ্রিয়ের সংযোগ সর্বদাই বর্তমান। তৎসত্ত্বেও যুগপৎ বিভিন্ন বিষেয়র জ্ঞান না হওয়ার জন্য আত্মার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সরাসরি সংযোগ স্বীকার করা যায় ন। উভয়ের মধ্যবর্তী তৃতীয় একটি কারণের অনুসন্ধান করতে হয়। এই তৃতীয় কারণটি হল মন নামক দ্রব্য। আত্মার সঙ্গে সরাসরি মনের

সংযোগ হয় এবং মনের সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়গুলির সংযোগ হয়। বহিরিন্দ্রিয়গুলি যুগপৎ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেও কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষণে মনের সঙ্গে একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্ভব। কারণ মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ দ্রব্য একক্ষণে একাধিক দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে না। যেক্ষণে মনের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় তখন কেবল সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ বিষয়েরই প্রত্যক্ষ হয়। অন্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংবদ্ধ বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই দ্রব্যরূপে মন বহিরিন্দ্রিয়গুলির দ্বারা বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের নিয়ন্ত্রক। মনের অস্তিত্ব স্বীকারে দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তি হল এই যে জন্য প্রত্যক্ষ মাত্রের প্রতি ইন্দ্রিয় কারণ। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ ব্যতীত প্রত্যক্ষজ্ঞান হতে পারে না; যেমন চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ। চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই করণ। সেরূপ সুখ-দুঃখাদি আন্তর বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতিও একটি ইন্দ্রিয়কে করণরূপে স্বীকার করতে হয়। মানস-প্রত্যক্ষের করণরূপ এই ইন্দ্রিয়ই হল মন। এজন্যই মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। ভাট্টমীমাংসা ও পাতঞ্জল দর্শন মনের অণুপরিমাণ স্বাকীর করেন না। তাঁদের মতে মন বিভু।

২.০৩.০০ সারসংক্ষেপ

মঙ্গলাচরণ সমাপনান্তে প্রশস্তপাদাচার্য গ্রন্থের প্রয়োজন রূপে উল্লিখিত মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের সূচনা করতে বলেছেন, ''দ্রব্যগুণ কর্ম সামান্যবিশেষ সমবায়ানাং ষন্নাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানম্ নিঃশ্রেয়হেতু তচ্চেশ্বরচোদনাভিব্যক্ত ধর্মাদেব।'' এর দ্বারা তিনি নিঃশ্রেয়সের উপায়কেই নির্দেশ করেছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি বৈশেষিক সম্মত নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেননি। সূত্রকার নিজে এবং পরবর্তীকালের ইকাকারগণ অবশ্য এই অভাব পূরণ করে নিঃশ্রেয়সের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। 'নিঃশ্রেয়স' শব্দের অর্থ সবথেকে শ্রেয়। পরামুক্তি বা মোক্ষই সবথেকে শ্রেয়। তাই নিঃশ্রেয়স বলতে পরামুক্তিকেই বুঝতে হয়। জীবের আত্মসাক্ষাৎকারে মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হলে দোষ (রাগ, দ্বেষ ও মোহ) বিনষ্ট হয়। দোষ বিনষ্ট হলে প্রবৃত্তি বিনষ্ট হয়। প্রবৃত্তি বিনষ্ট হলে জন্মের নিবৃত্তি হয়। পরিশেষে জন্মের নিবৃত্তিতে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। দুঃখের এই নিবৃত্তিই মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ন্যায়-বৈশেষিকমতে কারণের বিনাশেই কার্যের বিনাশ হয়। দোষ, মিথ্যাজ্ঞান জন্য বলেই মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশে দোষের বিনাশ হয়। অনুরূপভাবে প্রবৃত্তি দোষ জন্য, জন্ম প্রবৃত্তি জন্য, বলেই দোষের বিনাশে প্রবৃত্তির বিনাশ, প্রবৃত্তির বিনাশে জন্মের বিনাশ এবং জন্মের বিনাশে দুঃখের বিনাশ হয়। মনে রাখতে হবে যে, দোষের বিনাশে নতুন ধর্মাধর্ম উৎপন্ন না হলেও পূর্বে উৎপন্ন ধর্মাধর্ম বশতঃ কর্মফল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত অপবর্গ বা পরামুক্তি সম্ভব নয়। কর্মফল ভোগের দ্বারাই নিঃশেষ হতে পারে। পরামুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য জীবকে তাই নানা শরীর ধারণ করে কর্মফল ভোগের দ্বারা শেষ করতে হয়।

প্রশস্তপাদ মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়সের দুটি উপায় নির্দেশ করেছেন। (১) দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং (২) ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্ত ধর্মাচরণ। অর্থাৎ দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বর উপদিষ্ট বেদপ্রতিপাদিত ধর্মসমূহের প্রতিপালন এই দুইয়ের সমন্বয়েই মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। ন্যায়কন্দলীকারের মতে বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত ষট্‌পদার্থের এবং তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষের দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম এই উভয়ের সমুচ্চয় থেকেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়। কেবল ষট্‌পদার্থের

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান থেকে বা কেবল ঈশ্বরেচ্ছাভিব্যক্ত ধর্ম থেকে মুক্তি হয়না। যোগভাষ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান বা ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্রকেই সাধকের মুক্তির বিকল্প উপায়রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বৈশেষিক মতে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এবং ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম - এই দুই এর সমন্বয়ে মুক্তি। এককভাবে এদের কোনটিই মুক্তি-সাধক নয়।

সাধারণতঃ পদের অর্থকেই বলা হয় পদার্থ (পদস্য অর্থঃ পদার্থঃ)। ন্যায় বৈশেষিক মতে পদমাত্রই অর্থবোধক। শক্তি বা লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি ঘটানোই পদের কাজ (শক্তম্ পদম্)। সূত্রে ও ভাষ্যে 'পদার্থ' বলতে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের নামোল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। এ ছয়টি পদার্থই বৈশেষিক মতে 'ধর্ম' বলে কথিত হয় কারণ দ্রব্যাদি পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের বিশেষণ বা ধর্ম হয়। সুতরাং দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান এক অর্থে পদার্থতত্ত্বেরই জ্ঞান।

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয়টি পদার্থকে বলা হয় দ্রব্য। 'দ্রব্য' নামটি এই নয়টি পদার্থের সামান্য সংজ্ঞা, অর্থাৎ এই নয়টি হল দ্রব্য পদার্থ। 'দ্রব্য' এই পদার্থগুলির সামান্য নাম। 'পৃথিবী', 'জল' প্রভৃতি হল এইট পদার্থগুলির বিশেষ নাম। প্রশস্তপাদাচার্য এই ভাবে দ্রব্যের সামান্য সংজ্ঞা ও বিশেষ সংজ্ঞা উল্লেখ করে বলেছেন মহর্ষি কণাদ এই নয়টি দ্রব্যের বিশেষ সংজ্ঞা ব্যতীত অন্য সংজ্ঞা না দেওয়ায় দ্রব্য নয়টি এবং কেবলমাত্র নয়টি বলেই জানতে হবে। কিরণাবলীকার এই প্রসঙ্গে অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব সবিস্তারে খণ্ডন করেছেন।

যা দ্রব্যত্ববৎ বা দ্রব্যত্ববান তাই দ্রব্য। কোনো কোনো মতে দ্রব্যত্ব দ্রব্যের লক্ষণ হতে পারে না। যেহেতু ইতরভেদানুমিতিতে দ্রব্যটি পক্ষ হয় বলে পক্ষতাবচ্ছেদক (লক্ষ্যতাবচ্ছেদক) ও লক্ষণ অভিন্ন হয়ে পড়ে। 'দ্রব্যং ইতরভিন্নং দ্রব্যত্বাৎ' এই অনুমানে পক্ষতাবচ্ছেদক (দ্রব্য পক্ষ হওয়ায় দ্রব্যত্ব এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক) ও হেতু অভিন্ন। অর্থাৎ এখানে দ্রব্যত্ব পক্ষতাবচ্ছেদক এবং দ্রব্যত্বই হেতু। যদি লক্ষতাবচ্ছেদক এবং লক্ষণ অভিন্ন হয় তাহলে অনুমানে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্যের ইতরভেদানুমিতিতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত হয় সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞান নয়, ব্যাতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান। অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকার করলে সিদ্ধসাধন দোষ হয়। কিন্তু ব্যাতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানে তা হয় না।

দ্রব্যের অপর একটি লক্ষণ হল ''ক্রিয়াগুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্''। বস্তুতঃ এই সূত্রে দ্রব্যের তিনটি বিকল্প লক্ষণ দেওয়া হয়েছে ঃ (১) যা ক্রিয়ার আশ্রয় বা ক্রিয়াবৎ তাই দ্রব্য, (২) যা গুণের আশ্রয় বা গুণবৎ তাই দ্রব্য এবং (৩) যা গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য।

ভাট্ট মীমাংসকগণ বলেন যে, অন্ধকার একটি অনুভবসিদ্ধ পদার্থ। অনুভবসিদ্ধ পদার্থের অপলাপ করা যায় না। আবার দ্রব্য ছাড়া অন্ধকার অন্য কোনো পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতএব অন্ধকার দ্রব্য। অন্ধকার দ্রব্য হলেও বৈশেষিক সম্মত নব দ্রব্যের অন্তর্গত না হওয়ায় তাকে অতিরিক্ত দ্রব্য বলেই স্বীকার করতে হয়।

নানা যুক্তিতে মীমাংসকগণ অন্ধকার যে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন, তেজ, জল ও পৃথিবীর অন্তর্গত হতে

পারে না তা প্রদর্শন করেছেন। অতএব অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলতে হয়। অন্ধকার সম্বন্ধে মীমাংসকদের এটাই সিদ্ধান্ত।

উপরিউক্ত মীমাংসক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিরণাবলীকারের বক্তব্য এই যে অন্ধকার যদি বাস্তবিক পক্ষে দ্রব্য হত তাহলে তা রূপবান ও ক্রিয়াবান হত। আবার অন্ধকার যদি ক্রিয়াবান বা রূপবান হত তাহলে তা চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হত। পুনরায় অন্ধকার যদি চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ হত তাহলে তার উপলব্ধিতে আলোকের প্রয়োজন হত। কিন্তু অন্ধকার যখন আলোক নিরপেক্ষভাবেই গৃহীত হয় তখন তাকে রূপবান বা ক্রিয়াবান দ্রব্য বলা যায় না। এভাবে কিরণাবলীকারের দ্বারা অন্ধকারের অতিরিক্ত দ্রব্যত্ব খণ্ডিত হয়। বস্তুতঃ বৈশেষিকমতে অন্ধকার অভাব পদার্থ, দ্রব্যপদার্থই নয়।

বৈশেষিক মতে অন্ধকার আলোকভাব হলেও যেকোনো প্রকার আলোকাভাবই অন্ধকার নয়। রাত্রিতে আমরা যখন অন্ধকার দেখি তখন সেখানে অনেক তৈজস পরমাণুও থাকে। তৈজস পরমাণুর উপস্থিতিতেও আলোকাভাবরূপ অন্ধকার কি করে থাকতে পারে ? এজন্য বলা হয় যে, যে-কোনো প্রকার তেজের অভাব নয়, মহত্ত্ববৎ তেজের অভাবই হল অন্ধকার।

মহর্ষি কণাদের মতে দ্রব্য নববিধ। এই নয়টিদ্রব্য হলঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্‌কে **ভূত দ্রব্য** এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মনকে **মূর্ত দ্রব্য** বলা হয়। অর্থাৎ ন্যায়-বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ **ভূত দ্রব্যও** বটে আবার **মূর্ত দ্রব্যও** বটে। কাল, দিক্ ও আত্মা ভূতও নয় আবার মূর্তও নয়। মন **মূর্ত দ্রব্য** কিন্তু ভূত দ্রব্য নয়। ব্যোম্ **ভূতদ্রব্য,** কিন্তু মূর্ত দ্রব্য নয়। **ভূত দ্রব্যের** সমন্বয়ে ভৌতজগৎ সৃষ্ট হয়েছে। যে দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ আছে তাকে **ভূত দ্রব্য** বলে। সীমিত পরিমাণ মুক্ত দ্রব্যকে বলে মূর্ত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটি **ভূত দ্রব্য** যথাক্রমে গন্ধ, রস, স্বাদ, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ এই পাঁচটি বিশেষ গুণের অধিকারী। বিশেষ গুণ নির্দিষ্ট দ্রব্য ছাড়া অন্যত্র থাকে না। গন্ধ ক্ষিতির বিশেষ গুণ। তাই ক্ষিতি ছাড়া গন্ধ অন্য কোথাও উৎকর্ষ রূপে থাকতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতে এক একটি বিশেষ গুণ এক একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। বৈশেষিক মতে যে যে বিশেষ গুণ যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য, সেই সেই বিশেষ গুণের আশ্রয় *ভূত দ্রব্যের* উপাদানে সেই সেই ইন্দ্রিয় গঠিত। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় যে **ভূত দ্রব্যের** উপাদানে গঠিত, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই **ভূত দ্রব্যের** বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করা যায়।

ভৌত পদার্থসমূহ নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সাবয়ব ভৌত দ্রব্য অনিত্য এবং আদি উপাদান রূপ প্রত্যক্ষের অগোচর পরমাণু দ্রব্য নিত্য।

বৈশেষিক মতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চারটি দ্রব্য নিষ্ক্রিয়। সুতরাং এই চারটি ক্রিয়াহীন দ্রব্যে 'ক্রিয়াবত্ত্বং দ্রব্যত্বং' এই লক্ষণ প্রযোজ্য হতে পারে না। তাই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। 'গুণবত্ত্বং দ্রব্যত্বং' এই লক্ষণটিও নির্দোষ নয়। বৈশেষিক মতে দ্রব্য নিত্য ও অনিত্যভেদে দ্বিবিধ। পৃথিবী, তেজ, জল ও বায়ু এই চারটিদ্রব্যের পরমাণু, আকাশ কাল, দিক্, আত্মা ও মন এগুলি হল নিত্যদ্রব্য। এগুলির উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কিন্তু পরমাণু

ভিন্ন সকল পার্থিব, জলীয়, তৈজস, ও বায়বীয় দ্রব্যই উৎপত্তি-বিনাশশীল অনিত্যদ্রব্য।

২.০৪.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

ছোট প্রশ্ন ঃ

(a) What is *mahodaya* ?

(b) What is *Īœvaracodanā* ?

(c) What is *tattvajñāna* ?

(d) What is *niḥœreyasa* ?

(e) What are the *bhūta dravyas* ?

(f) What are the *mtūrtadravyas* ?

(g) Which *dravya* is both *bhūta* and *mūrta* ?

(h) Which *dravya* is *bhūta* but not *mūrta* ?

(i) Which *dravya* is *mūrta* but not *bhūta.*

(j) What are the *nitya dravyas* ?

(k) At what state is substance *nirguṇa* and *niskriya* ?

(l) Which *dravyas* are nither *bhūta nor mūrta* ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

(a) What is meant by *niḥœreyasa* ? Can *niḥœreyasa* be attained by *tattvajñāna alone*? Discuss.

(b) State and explain the nature of *niḥœreyasa* after *Praœastapāda*.

(c) What is *tattvajñāna* ? How does *tattvajñāna* lead to liberation ? Discuss.

(d) What is *dravya* ? How many *dravyas* are admitted by the *Vaiœeṣikas* ? Can *tamaḥ* be regarded as an additional *dravya? Discuss.*

(e) *What is tamaḥ* (darkness)? Discuss the controversy between the *Vaiœeṣikas* and the *Mimāṁsakas* regarding the status of *tamaḥ* .

(f) Define *dravya*. What are the *nityadravyas* in *Vaiœeṣika* metaphysics ? Explain the nature of *ātman* and *manas* as eternal substances.

(g) What is *ākāśa* ? How is the existence of *ākāśa* known ?

(h) State and explain *kāla* and *dika* after the *Vaiœeṣiks*.

২.০৫.০০ সহায়ক পুস্তক

১. বৈশেষিক দর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮২৮ শকাব্দ।

২. বৈশেষিক দর্শনম্, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

৩. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (সুক্তি, সেতু ও ব্যোম্বতী টীকা সহ), গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪।

৪. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা।

৫. প্রশস্তপাদভাষ্য, পণ্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।

৬. প্রশস্তপাদভাষ্য, কালিপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত।

৭. বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৮. কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৯. ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ), পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।

১০. ভাষা পরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১. Vaiṣeṣika Philosophy, Ui.

১২. Tarkasaṁgraha Dipikā on Tarkasaṁgraha - Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers.

একক ঃ ৩

গুণ, কর্ম, সামান্য পদার্থ, বিশেষ পদার্থ ও সমবায়ের পদার্থের স্বরূপ

বিষয়সূচী

৩.০০.০০ - প্রতিপাদ্য বিষয়

৩.০১.০০ - গুণ

৩.০১.০১ - রূপ

৩.০১.০২ - রস

৩.০১.০৩ - গন্ধ

৩.০১.০৪ - স্পর্শ

৩.০১.০৫ - পরিমাণ

৩.০১.০৬ - সংযোগ

৩.০১.০৭ - বুদ্ধি

৩.০১.০৮ - সংস্কার

৩.০১.০৯ - শব্দ

৩.০২.০০ - কর্ম

৩.০২.০১ - কর্মের বিভাগ

৩.০৩.০০ - সামান্য পদার্থ

৩.০৩.০১ - সামান্যের ধারণা

৩.০৩.০২ - সামান্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব

৩.০৩.০৩ - সামান্য পদার্থের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

৩.০৩.০৪ - সামান্যের লক্ষণ

৩.০৩.০৫ - সামান্যের স্বরূপ

৩.০৩.০৬ - সামান্যের বিভাগ

৩.০৩.০৭ - জাতিবাধক

৩.০৪.০০ - বিশেষ পদার্থ

৩.০৪.০১ - বিশেষের লক্ষণ

৩.০৪.০২ - বিশেষ অন্ত্য ব্যাবর্তক

৩.০৪.০৩ - বিশেষ স্বতোব্যাবর্তক

৩.০৪.০৪ - বিশেষ স্বীকারের যুক্তি

৩.০৪.০৫ - বিশেষত্ব জাতি নয়

৩.০৫.০০ - সমবায় পদার্থ

৩.০৫.০১ - ভূমিকা

৩.০৫.০২ - সমবায়ের লক্ষণ

৩.০৫.০৩ - সমবায়ের ক্ষেত্র

৩.০৫.০৪ - সমবায়ের অস্তিত্বসাধক প্রামাণ

৩.০৬.০০ - সারসংক্ষেপ

৩.০৭.০০ - কতিপয় শব্দের অর্থ

৩.০৮.০০ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.০৯.০০ - সহায়ক পুস্তক

৩.০০.০০ প্রতিপাদ্য বিষয়

বৈশেষিক সম্মত ষ্‌টপদার্থের মধ্যে গুণ কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের আলোচনা এই এককের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

৩.০১.০০ গুণ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কর্ম ভিন্ন দ্রব্য যার সমবায়ী কারণ সেই পদার্থ হল গুণ। কেবল গুণ ও কর্মের সমবায়ী কারণ হল দ্রব্য। সুতরাং কর্মভিন্ন দ্রব্য যার সমবায়ী কারণ সেই পদার্থই হল গুণ পদার্থ। মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণে বলেছেন দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান, সংযোগ-বিভাগের নিরপেক্ষ অকারণ পদার্থ হল গুণ (দ্রব্যাশ্রয়ীঅগুণবান্‌সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ - বৈঃ সূঃ ১/১/১৬)। গুণের গুণ বা কর্ম হয় না। একমাত্র দ্রব্যই গুণবান ও কর্মবান। এজন্য গুণকে অগুণবান বলা হয়েছে। কর্মের দ্বারাই সংযোগ বা বিভাগ সম্ভব, গুণের দ্বারা নয়। তাই গুণকে সংযোগ-বিভাগ-অকারণ-নিরপেক্ষ পদার্থ বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'দ্রব্যাশ্রয়ী-অগুণবান' ও

'সংযোগ-বিভাগ-অকারণ অনপেক্ষ' এই দুটি পদের দ্বারা গুণকে যথাক্রমে দ্রব্য ও কর্ম থেকে পৃথক করা হয়েছে। অন্যভাবে গুণকে দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন জাতিবিশিষ্ট পদার্থও বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই কেবলমাত্র জাতিবিশিষ্ট, অন্য কোন পদার্থ জাতিবিশিষ্ট নয়। তাই দ্রব্য ও কর্ম ব্যতিরেকে যা জাতিমান তাই গুণ। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ, (৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথক্ত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ ও (১৭) প্রযত্ন - এই সতেরটি গুণের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রশস্তপাদ (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রবত্ব, (২০) স্নেহ, (২১) সংস্কার, (২২) ধর্ম, (২৩) অধর্ম ও (২৪)শব্দ - এই সাতটিট গুণও সূত্রকারের অভিপ্রেত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বৈশেষিক দর্শনে মোট চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত। নব্যনৈয়ায়িকগণও এই চব্বিশ প্রকার গুণকে স্বীকার করেছেন। কোন কোন নব্যনৈয়ায়িক আবার ত্রিবিধ সংস্কারকে (বেগ, ভাবনাখ্য সংস্কার ও স্থিতিস্থাপকত্ব) ভিন্ন ভিন্ন হিসাবে গ্রহণ করে এবং দৈশিক ও কালিক ভেদে পরত্ব ও অপরত্বের পৃথক পৃথক সত্তা স্বীকার করে মোট আটশ প্রকার গুণ স্বীকার করেছেন (দীঃ জাঃ)। বৈশেষিক দর্শনে যে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত তা মৌলিক গুণ। বৈশেষিক মতে মৌলিক গুণ চব্বিশ প্রকারের কম বা বেশী নয়। এই চব্বিশ প্রকার মৌলিক গুণের পারস্পরিক সংযোগে কোন কোন নতুন গুণের আবির্ভাব হতে পারে কিন্তু মৌলিক গুণের তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত নয়।

বৈশেষিকগণ মৌলিক গুণগুলির নানা উপবিভাগও স্বীকার করেন; যেমন, রূপ সপ্তবিধ - লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি ; রস ষড়বিধ - অম্ল, মধুর প্রভৃতি; গন্ধ দ্বিবিধ - সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ; স্পর্শ ত্রিবিধ শীত, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ; শব্দ দ্বিবিধ - ধ্বনি ও বর্ণ; সংখ্যা দ্বিবিধ - নিত্য ও অনিত্য, পরত্ব ও অপরত্ব দ্বিবিধ - দৈশিক ও কালিক; বুদ্ধি দ্বিবিধ - প্রত্যক্ষ ও অনুমান; দ্রবত্ব দ্বিবিধ - সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক; সংস্কার ত্রিবিধ - বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক।

গুণমাত্রই গুণত্বের আশ্রয়, দ্রব্যে সমবেত, গুণরহিত ও ক্রিয়াশূন্য। বৈশেষিক সম্মত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগরূপসংস্কার এই দশটি গুণ হল মূর্ত দ্রব্যের গুণ। অর্থাৎ এরা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যের গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ এই দশটি হল অমূর্ত দ্রব্যের গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি মূর্ত এবং অমূর্ত উভয়প্রকার দ্রব্যের গুণ। সংযোগ, বিভাগ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি গুণ একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত হতে পারে। আবার রূপ, রস প্রভৃতি গুণ কেবলমাত্র একটি দ্রব্যেই উদ্ভূতরূপে আশ্রিত।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রবত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ, এই ষোলটি গুণ হল বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগরূপসংস্কার এই দশটি হল সামান্যগুণ।

গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্যসংস্কার এই চারটি গুণ হল অতীন্দ্রিয় গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই ছয়টি গুণ অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য

গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও বেগ এই নয়টি গুণ হল দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণ।

আমরা এখন অতি সংক্ষেপে বৈশেষিক সম্মত কয়েকটি গুণের আলোচনা করব।

৩.০১.০১ রূপ

রূপের লক্ষণ হল 'রূপং চক্ষুরর্গ্রাহ্যম্'। অর্থাৎ যে গুণই কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হয় তাকে রূপ বলা হয়। ক্ষিতি, অপ্ এবং তেজ এই তিনই দ্রব্যে রূপ থাকে, অন্য দ্রব্যে থাকে না। রূপ সাত প্রকার - শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ এবং চিত্র। ক্ষিতিতে সকল প্রকার রূপই থাকে কিন্তু অপ্ ও তেজে শুধু শুক্লরূপ থাকে। রূপকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা উদ্ভূত এবং অনুদ্ভূত। 'উদ্ভূত' শব্দের অর্থ প্রকাশিত এবং 'অনুদ্ভূত' শব্দের অর্থ অপ্রকাশিত। রূপকে আবার অন্যদিক থেকে দুভাগে ভাগ করা হয় - নিত্য এবং অনিত্য। কারণ তেজঃ সংযোগে ক্ষিতির পরমাণুতে পাক হয়ে থাকে এবং রূপ পরিবর্তিত হয়। বায়ুর পরমাণুতে রূপ থাকে না।

৩.০১.০২ রস

রসের লক্ষণে বলা হয়েছে 'রসোরসনাগ্রাহ্যঃ'। অর্থাৎ রসনা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণই রস। এই গুণটি জল ও পৃথিবী এই দুই দ্রব্যে থাকে। রস ছয় প্রকার - মধুর, অম্ল, লবণ, কটু কষায় ও তিক্ত। পৃথিবীতে সকল প্রকার রসই থাকে কিন্তু জলে কেবল মধুর রস থাকে। জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, কিন্তু অনিত্য জলের রস অনিত্য। পৃথিবীর রস অনিত্য।

৩.০১.০৩ গন্ধ

গন্ধের লক্ষণ হল 'ঘ্রাণগ্রাহ্যো গুণো গন্ধঃ'। অর্থাৎ ঘ্রাণ বা নাসিকা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয় তার নাম গন্ধ। কেবল পৃথিবীই গন্ধের আশ্রয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য। গন্ধ দ্বিবিধ - সুরভি ও অসুরভি।

৩.০১.০৪ স্পর্শ

স্পর্শের লক্ষণ হল 'স্পর্শস্ত্বগিন্দ্রিয় গ্রাহ্যঃ'। অর্থাৎ স্পর্শ হল ত্বগিন্দ্রিয় মাত্র গ্রাহ্য গুণ। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারটিটদ্রব্যে স্পর্শ থাকে। স্পর্শ ত্রিবিধ, যথা- উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। তেজের স্পর্শ উষ্ণ, জলের স্পর্শ শীত এবং পৃথিবী ও বায়ুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত। পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ হওয়ায় তা অনিত্য। তবে জল, তেজ ও বায়ুর স্পর্শ অপাকজ। জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণুর এই অপাকজ স্পর্শ নিত্য। কিন্তু অনিত্য জল, তেজ ও বায়ুর দ্ব্যণুক, ত্র্যণুকের স্পর্শ অনিত্য।

৩.০১.০৫ পরিমাণ

পরিমাণের লক্ষণ হল 'পরিমাণং মানব্যবহার অসাধারণং কারণম্'। অর্থাৎ মান বা পরিমিতি ব্যবহারের অসাধারণ কারণই হল পরিমাণ। পরিমাণ সকল দ্রব্যেই থাকে। পরিমাণ একটি সামান্য গুণ। পরিমাণ চতুর্বিধ - অণু, হ্রস্ব, মহৎ এবং দীর্ঘ। প্রত্যেক পরিমাণ আবার নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ। নিত্য দ্রব্যের পরিমাণ নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য। অনিত্য পরিমাণ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয় - (১) কারণের সংখ্যার দ্বারা কার্যের পরিমাণ

উৎপন্ন হয়, (২) কারণের পরিমাণের দ্বারা কার্যদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয় এবং (৩) পরিমাণাশ্রয় দ্রব্যের অবয়বসমূহের প্রচয় বা শিথিল সংযোগের দ্বারা ঐ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে নিত্যমহত্ব (পরমমহত্ব) আশ্রিত থাকে। অনিত্য মহত্ব এ্যাণুক থেকে শুরু করে যাবৎ অবয়বী দ্রব্যের গুণ। নিত্য অণুত্ব মন ও পরমাণুর গুণ। অনিত্য অণুত্ব কেবল ত্র্যণুকেই থাকে। দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব গুণদ্বয় মহত্ব এবং অণুত্বের আশ্রয়ে সমবেত হয়। অনিত্য পরিমাণগুলি সংখ্যা, পরিমাণ ও শিথিল সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়।

৩.০১.০৬ সংযোগ

সংযোগের লক্ষণ হল 'সংযুক্ত প্রত্যয় নিমিত্তম্' অর্থাৎ সংযুক্ত প্রত্যয়ের হেতু হল সংযোগ। সংযোগ তিন প্রকার- (১) অন্যতর কর্মজ (২) উভয় কর্মজ এবং (৩) সংযোগজ। অন্যতর কর্মজ হল দুটি দ্রব্যের একটির ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন। যেমন গাছের সঙ্গে বানরের সংযোগ। এই সংযোগ বানরের দ্বারা উৎপন্ন। উভয় কর্মজ দুটি দ্রব্যের উভয়ের ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন। যেমন পরস্পরের দিকে ধাবমান দুটিমেষের সংযোগ। সংযোগজ সংযোগ হল সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন সংযোগ। এই সংযোগজ সংযোগ একটি সংযোগ বা একাধিক সংযোগ থেকে হতে পারে। যেমন দুটো সুতোর সংযোগ থেকে উৎপন্ন পটের সঙ্গে তুরীর সংযোগ এবং বহুতন্তুর সঙ্গে তুরীর সংযোগ থেকে উৎপন্ন পটের সঙ্গে তুরীর সংযোগ। সংযোগ উৎপন্ন দ্রব্য, গুণ ও কর্মের হেতু হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সংযোগ অনিত্য গুণ।

৩.০১.০৭ বুদ্ধি

বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন হল আত্মার বিশেষগুণ। বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান ও প্রত্যয় ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে পর্যায়শব্দ। অর্থাৎ যাকে বুদ্ধি বলা হয় তাকেই জ্ঞান, উপলব্ধি ও প্রত্যয় বলা হয়। এই জ্ঞান হল ইচ্ছার সাক্ষাৎ কারণ, আত্মার বিশেষ গুণ এবং জ্ঞানত্ব জাতিমান। ইষ্টসাধনতা জ্ঞান থেকেই ইচ্ছা হয়। এজন্য জ্ঞানকে ইচ্ছার সাক্ষাৎকারণ বলা হয়। 'ঘটম্ অহম্ জানামি' এইরূপ অনুব্যবসায়ের দ্বারা আত্মার বিশেষ গুণরূপে জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয়। আবার জ্ঞানত্ব জাতি জ্ঞানে থাকে বলে জ্ঞানকে জ্ঞানত্বজাতিমানও বলা হয়।

বুদ্ধির বিষয় অনন্ত তাদের কারণও ভিন্ন ভিন্ন এবং তার প্রকারও অনেক। নানাভাবে বুদ্ধির প্রকারভেদে করা হয়। অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধি দুই প্রকার। অনুভূতি আবার প্রত্যক্ষ এবং লৈঙ্গিক বা অনুমিতিভেদে দ্বিবিধ। অন্য একভাবে জ্ঞানকে বিদ্যা ও অবিদ্যাভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। বিদ্যা মানে যথার্থজ্ঞান এবং অবিদ্যা মানে অযথার্থজ্ঞান। ভাষ্যকার চারপ্রকার বিদ্যা ও চার প্রকার অবিদ্যার উল্লেখ করেছেন। চারপ্রকার বিদ্যা হল- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, স্মৃতি ও আর্য। চার প্রকার অবিদ্যা হল- সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও স্বপ্ন।

জ্ঞানকে নিত্য ও অনিত্য ভেদেও দ্বিবিধ বলা হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য। জীবাত্মা অনিত্যজ্ঞানের সমবায়িকারণ, এবং আত্মমনোসংযোগ জ্ঞানের অসমবায়িকারণ। ত্বগেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ। সুষুপ্তি কালে আত্মায় কোনো জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এর কারণরূপে ত্বগেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগকে জ্ঞানের নিমিত্তকারণ বলা হয়। সুষুপ্তিতে যেহেতু এই সংযোগ থাকে না সেহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

৩.০১.০৮ সংস্কার

সংস্কারের লক্ষণ হল 'সংস্কারত্ব জাতিমত্ব'। অর্থাৎ সংস্কারত্ব জাতিমান পদার্থই সংস্কার নামক গুণ। সংস্কার তিন প্রকার - বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক।

বেগ সংস্কার ঃ

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মেরুৎ ও মন এই পাঁচটি মূর্ত্তদ্রব্যে বেগ থাকে। বেগ দ্বিবিধ - কর্মজন্য বেগ ও বেগজন্য বেগ। একটা ঢিল উপরে ছুঁড়লে হাতের ক্রিয়ার দ্বারা ঢিলটিতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া আবার ঢিলটিতে বেগ উৎপন্ন করে। ঐ বেগ ঢিলটির পূর্বক্রিয়াকে নষ্ট করে এবং অন্য একটি বেগকে উৎপন্ন করে। এইভাবে নিক্ষিপ্ত ঢিলটি দ্রুত একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌঁছায়।

বলাই বাহুল্য যে, বেগ মূর্ত্তদ্রব্যে ক্রিয়া ও নিমিত্ত কারণের সহায়তায় উৎপন্ন হয়। ফলে ; দিক্, কালাদি প্রভৃতি যেসব দ্রব্য ক্রিয়াহীন তাতে বেগ উৎপন্ন হয় না। আবার কেবল ক্রিয়াও বেগ উৎপন্ন করতে পারে না। ক্রিয়া নোদন ও অভিঘাতাদি সংযোগ বিশেষকে অপেক্ষা করেই বেগ উৎপাদন করে। স্পর্শবান দ্রব্যের নিবিড় অবয়বের সংযোগ বেগকে বিনষ্ট করে। মন্দবেগ স্পর্শ বা দ্রব্যের সংযোগ মাত্রই বিনষ্ট হয়। যে স্থলে কারণের বেগ থেকে কার্যের বেগ উৎপন্ন হয়, তাকে বেগজন্য বেগ বলে। যেমন বেগ বিশিষ্ট কপালের বেগজন্য ঘটের বেগ। বেগ প্রত্যক্ষগোচর।

ভাবনা সংস্কার ঃ

'ভাবনা' নামক সংস্কার হল আত্মার গুণ। এইরূপ সংস্কারই স্মৃতির জনক। ভাবনাখ্যসংস্কার প্রত্যক্ষ গোচর নয়। স্মৃতির কারণরূপে তা অনুমান করা হয়। অনুভব আত্মায় সংস্কার উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। এই সংস্কার আত্মায় সমবেত থাকে এবং পরে তা উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মাতে স্মৃতি উৎপন্ন করে। স্মৃতিকালে যেহেতু অনুভব থাকে না, সেহেতু স্মৃতির কারণরূপে সংস্কারকে অনুমান করা হয়। অভ্যাস-প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রত্যয়ের বারবার আবৃত্তি করা হয় এবং অতিশয় প্রযত্নের দ্বারা ভাবনাখ্যসংস্কার উৎপন্ন হয় আবার প্রতিপক্ষজ্ঞান, মত্ততা ও দুঃখাদির দ্বারা তা বিনষ্ট হয়।

ভাবনাখ্য নামক সংস্কার কেবল জীবাত্মারই গুণ। পরমাত্মায় সংস্কার থাকে না। পরমাত্মার জ্ঞান নিত্যপ্রত্যক্ষমূলক। সুতরাং সেখানে স্মৃতিজনক সংস্কারের কোনো স্থান নেই।

স্থিতিস্থাপক সংস্কার ঃ

নিবিড় অবয়বের দ্বারা সন্নিবিষ্ট স্পর্শবান দ্রব্যের গুণ হল স্থিতিস্থাপক সংস্কার। এই সংস্কার কেবলমাত্র পৃথিবীতেই থাকে। স্থাবর ও জঙ্গম উভয়প্রকার পৃথিবীরই গুণ হল স্থিতিস্থাপক সংস্কার। স্থিতিস্থাপক সংস্কার তার আশ্রয়কে পূর্বাবস্থায় স্থাপন করে। যেমন একটি গাছের ডালকে অবনমিত করে ছেড়ে দিলে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। অনুরূপভাবে ধনুককে বাঁকিয়ে তা ছেড়ে দিলে তা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার নিত্য দ্রব্যের গুণ হলে তা নিত্য এবং অনিত্য দ্রব্যের গুণ হলে তা অনিত্য। বেগের সঙ্গে স্থিতিস্থাপক সংস্কারের পার্থক্য এই যে বেগ যে ক্রিয়া উৎপন্ন করে সেই ক্রিয়ার ফলে উত্তর দেশের সঙ্গে বেগবানের সংযোগ হয়। অন্যদিকে স্থিতিস্থাপক যে ক্রিয়া উৎপন্ন করে তার দ্বারা সংস্কারবান পূর্বদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

বেগ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার হল দ্রব্যের সামান্য গুণ। কিন্তু ভাবনা নামক সংস্কার হল দ্রব্যের বিশেষ গুণ।

৩.০১.০৯ শব্দ

শব্দের লক্ষণে বলা হয় 'শব্দঃ অম্বর গুণঃ শ্রোত্রগাহ্যঃ'। অর্থাৎ শব্দ আকাশের গুণ এবং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়। শব্দের আশ্রয় আকাশ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ যেমন ব্যপ্যবৃত্তি, শব্দ কিন্তু সেরূপ নয়। শব্দগুণ তার আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করে থাকে না। কোনো শব্দ যখন উৎপন্ন হয় তখন আকাশের এক বিশেষ অবচ্ছেদেই উৎপন্ন হয়। সারা আকাশ জুড়ে কোনো শব্দ থাকে না। যেমন ধরা যাক দূরে কেউ শাঁখ বাজাল। তার ফলে সেখানের আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হল। এই শব্দ তার পূর্ববর্তী আকাশে আর একটা শব্দ উৎপন্ন করল। ঐ শব্দ থেকে আর একটি শব্দ, তার থেকে আর একটি শব্দ এইভাবে শব্দ পরইরা ক্রমে আমাদের কর্ণবিবরবর্তী আকাশে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাই আমরা শুনি। শব্দের কর্ণবিবরবর্তী হওয়ার এই প্রক্রিয়া কদম্বমুকুল-ন্যায় বলে পরিচিত। শব্দের এই উৎপত্তি প্রক্রিয়া বীচীতরঙ্গ-ন্যায়ের দ্বারাও ব্যাখ্যাত হয়। শব্দের সমবায়ী কারণ আকাশ এবং সংযোগবিভাগাদি হল তার নিমিত্তকারণ।

শব্দ অনিত্য। ধ্বনি ও বর্ণ ভেদে শব্দ দ্বিবিধ। আকারাদি (অ, আ, ক, খ ইত্যাদি) শব্দ বর্ণাত্মক এবং শঙ্খাদিবাদ্য নিমিত্তক শব্দ ধ্বন্যাত্মক। এরমধ্যে বর্ণাত্মক শব্দের ক্ষেত্রে আত্মমনোসংযোগ এবং পূর্বানুভুত বর্ণের স্মৃতিজন্য বক্তার প্রথমে বর্ণ উচ্চারণের ইচ্ছা হয় তারপর বর্ণ উচ্চারণের প্রযত্ন হয়। এবং এই প্রযত্ন জন্য আত্মা ও বায়ুর সংযোগ ও তন্য উদরস্থিত বায়ু শরীরে উত্থিত হয়ে কন্ঠ, তালু প্রভৃতি স্থানে অভিঘাত করে। এবং তার ফলে মুখদেশাবচ্ছিন্ন আকাশে বর্ণাত্মক শব্দ উৎপন্ন হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ, ভেরী প্রভৃতির সঙ্গে দণ্ডাদির সংযোগ এবং ভেরী প্রভৃতির সঙ্গে আকাশের সংযোগ এই উভয়বিধ সংযোগ থেকে উৎপন্ন হয়।

৩.০২.০০ কর্ম

বৈশেষিকসূত্র, প্রশস্তপাদভাষ্য, ভাষাপরিচ্ছেদ ও তার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় কর্মের উদ্দেশ প্রকরণে পঞ্চবিধ কর্মের নামোল্লেখমাত্রই পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হল এই পঞ্চবিধ কর্মের পরিচয় কি এবং এর অতিরিক্ত কর্ম কেনহট বা স্বীকৃত হয় না। উর্ধ্বদেশসংযোগের অনুকূল ব্যাপারকে বলে উৎক্ষেপণ, অধোদেশ সংযোগের অনুকূল ব্যাপারকে বলে অবক্ষেপণ, স্বশরীরের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট দেশে সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার তাকে বলে প্রসারণ এবং এতদ্ভিন্ন উত্তরদেশের সঙ্গে সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার তাকে বলে আকুঞ্চন, স্বশরীর থেকে বিপ্রকৃষ্ট দেশের সঙ্গে সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার তাকে বলে প্রসারণ এবং এতদ্ভিন্ন উত্তরদেশের সঙ্গে সংযোগের অনুকূল যে ব্যাপার তাকে বলে গমন। অন্যভাবে উৎক্ষেপণকে উর্ধ্বদেশ-সংযোগের, অবক্ষেপণকে অধোদেশ-সংযোগের, আকুঞ্চনকে স্বাভিমুখ দেশ-সংযোগের, প্রসারণকে তির্যগ্‌দেশ-সংযোগের এবং গমনকে অনিয়ত দেশ-সংযোগের অসমবায়ী কারণ বলা হয়।

গুণের ন্যায় কর্মও দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ। তবে গুণ দ্রব্যের নিষ্ক্রিয় ও স্থিতিবোধক বিশেষণ কিন্তু কর্ম দ্রব্যের সক্রিয় ও গতিবোধক বিশেষণ। কর্ম কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপ, তেজ প্রভৃতি মূর্ত্ত দ্রব্যেই থাকে, আকাশ, কাল, আত্মা প্রভৃতি অমূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে না। মহর্ষি কণাদ কর্মের লক্ষণে বলেছেন সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণরূপ পদার্থই হল কর্ম (সংযোগ বিভাগেস্বনপেক্ষাকারণমিতি কর্মলক্ষণম্)। কর্মই এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর সংযোগ এবং এক বস্তু থেকে অপর বস্তুর বিভাগ করে থাকে। গুণ নিষ্ক্রিয় হওয়াই বেগের কারণ হতে পারে না। কর্মই বেগের কারণ।

অন্যভাবে কর্মকে দ্রব্য ও গুণভিন্ন জাতিমান পদার্থও বলা যায়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন প্রকার জাতিমান পদার্থ থেকে দ্রব্য ও গুণকে বাদ দেওয়া হলে কর্মই জাতিমান পদার্থরূপে গণ্য হতে পারে।

কোন কোন মতে সংযোগ ভিন্ন সংযোগের অসমবায়ি কারণই হ'ল কর্ম। সংযোগ এবং কমই সংযোগের অসমবায়ি কারণ। 'সংযোগভিন্ন' বিশেষণ যুক্ত হওয়ায় কর্মহট এই লক্ষণের লক্ষ্য হয়। লাঘব যুক্তিতে অবশ্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর্মত্ব জাতিকেই কর্মের সামান্য লক্ষণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.০২.০১ কর্মের বিভাগ

বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার ঃ (১) **উৎক্ষেপণ,** (২) **অবক্ষেপণ,** (৩) **আকুঞ্চন,** (৪) **প্রসারণ** ও (৫) **গমন**। বস্তুর উর্ধ্বমুখী সঞ্চারক ক্রিয়া হ'ল উৎক্ষেপণ। উপরের দিকে যখন ঢিল ছোঁড়া হয় তখন ঢিলটি উপরের দিকে উঠতে থাকে। এইরূপ ক্রিয়াই হ'ল উৎক্ষেপণ। সম্প্রতি রকেট উৎক্ষেপণের কথা আমাদের কাছে সুপরিচিত। অবক্ষেপণ হ'ল বস্তুর নিম্নমুখী গতিসঞ্চারক ক্রিয়া। একটি আম বা আমড়ার নিম্নমুখী ক্রিয়াকে বলে অবক্ষেপণ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য সকল পদার্থই বাধা না পেলে পৃথিবীমুখী হয়। পৃথিবীমুখী এই সকল কর্মই অবক্ষেপণের দৃষ্টান্ত। আকুঞ্চন হল বস্তুর সংকোচন ক্রিয়া। একটি বায়ুপূর্ণ বেলুন থেকে যখন বায়ু নির্গত হয় তখন বেলুনটি সঙ্কুচিত হয়। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সংযোগের জন্য আকুঞ্চন ক্রিয়া প্রয়োজন। প্রসারণ বস্তু থেকে বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্রিয়া। একটি বায়ুশূন্য বেলুনকে যখন বায়ুপূর্ণ করা হয়, তখন বেলুনটি প্রসারিত হয়। বেলুনের এই প্রসারিত হওয়ারূপ ক্রিয়াকে বলে প্রসারণ। উপরিউক্ত চার প্রকার কর্ম ছাড়া ভ্রমণ, রেচন প্রভৃতি গতিবিশেষ সকল কর্মই গমনের অন্তর্গত। গমন ক্রিয়ার সঙ্গে উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ ক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, শেষোক্ত চতুর্বিধ ক্রিয়া গতি বিশেষ নয়, গতির অনুকুল ব্যাপার বিশেষ, কিন্তু গমনক্রিয়া স্বয়ং গতিবেশেষ।

৩.০৩.০০ সামান্য পদার্থ

সামান্য বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত চতুর্থ পদার্থ। সকল সম্প্রদায় এই পদার্থ স্বীকার করেননি। এখন দেখা যাক্, এই পদার্থের ধারণা কিভাবে নানা দর্শনে আবির্ভূত হয়েছে।

৩.০৩.০১ সামান্যের ধারণা

যে বহির্বিশ্ব আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত, সে বিশ্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ। নানা রূপ-রসে পূর্ণ বিচিত্র বস্তু সকলই আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু এই বিচিত্র বস্তুসকল আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। রাম, শ্যাম প্রভৃতি ব্যক্তি যেমন মানুষ শ্রেণীর অর্ন্তগত, তেমনি নন্দিনী, ধবলী প্রভৃতি গাভী গরু শ্রেণীর অর্ন্তগত। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এই শ্রেণীকরণের সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকগণ এক নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এই সমস্যা হ'ল সামান্য সম্বন্ধীয় সমস্যা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিশ্বেহট এই সমস্যা দার্শনিকদের যুক্তি ও মননকে আকৃষট করেছে। তাই পাশ্চাত্যে প্লেটো থেকে শুরু করে রাসেল এবং রাসেলের পরবর্তী দার্শনিকগণ যেমন এই সমস্যার উপর আলোকপাত করেছেন, তেমনি

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়- বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় নানা সমাধান উপস্থাপন করেছেন।

৩.০৩.০২ সামান্য সম্বন্ধীয় তত্ত্ব

সামান্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলিকে প্রধানত তিনটি তত্ত্বে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এই তিনটি তত্ত্ব হ'ল **নামবাদ**, **প্রত্যয়বাদ** এবং **বস্তুবাদ**।

নামবাদ - বৌদ্ধ সম্প্রদায় মনে করেন বিশ্বে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুরই সত্তা আছে সামান্য ধর্মের কল্পনা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তু জগতে সামান্য বলে কিছু নেই। সামান্য অস্তিত্বশীল স্বলক্ষণের উপর মানবমনের আরোপিত কল্পনা। সুতরাং জাতি বা সামান্যের অস্তিত্ব নামের জগতেই সীমাবদ্ধ। কল্পিত নাম ভিন্ন এদের পৃথক কোন সত্তা নেই। জাতি সম্বন্ধে এই মতবাদ '**অপোহবাদ**' নামে পরিচিত। 'অপোহ' শব্দের অর্থ 'নিষেধ'। এখানে 'অপোহ' বলতে অন্যাপোহ বা অন্য-ইতর বস্তুর নিষেধকে বোঝান হয়েছে। বৌদ্ধ মতে যেহেতু প্রবহমান স্বলক্ষণই একমাত্র সত্য, সেহেতু সামান্য বা জাতি বলে কোন পদার্থ নেই। শব্দ বা বস্তুর নাম সরাসরি ক্ষণিক স্বলক্ষণকে নির্দেশ করতে পারে না। যে মুহূর্তে নাম বস্তুকে নির্দেশ করে, বস্তু ক্ষণিক হওয়ায়, সে মুহূর্তে তা অস্তিত্বহীন। তাই অন্য বস্তুর নিষেধের দ্বারাই শব্দ অর্থকে বোঝাতে পারে। শব্দের এই পরোক্ষ অভিধেয়ত্বই বৌদ্ধ পরিভাষায় 'অপোহ' নামে পরিচিত।

প্রত্যয়বাদ - জৈন সম্প্রদায় মনে করেন সামান্য ধারণা মাত্র। বিশেষ বিশেষ বস্তু দেখে মনের সাহায্যে এই ধারণা আমরা গঠন করি। জৈনমতে সামান্য ব্যক্তি-নির্ভর। কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তিকে অপর কতকগুলি বস্তু বা ব্যক্তি থেকে পৃথক করার জন্য আমরা বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ গুণগুলিকে মানসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে একত্রিত ক'রে একটি সামান্য ধারণা গঠন করি। এই সামান্য ধারণাই সামান্য বা জাতি রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে সামান্য ধারণার অনুরূপ কোন সামান্যবস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ব্যক্তিই সামান্যের ভিত্তি এবং ব্যক্তির সঙ্গে সামান্যের সম্বন্ধ হ'ল তাদাত্ম্য সম্বন্ধ।

বস্তুবাদ - ন্যায় -বৈশেষিক সম্প্রদায় সামান্যকে কেবল নাম বা ধারণা বলে মনে করেননি। তাঁরা সামান্যকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর মত বাস্তব সত্তাবান বলে মনে করেন। ন্যায়-বৈশেষিক সইদায় জগতের ব্যাখ্যার জন্য যে সাতটিমৌলিক পদার্থ স্বীকার করেছেন, সামান্য তাদের অন্যতম। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য ব্যক্তি থেকে ভিন্ন নিত্য বস্তুস্বরূপ। ব্যক্তি সামান্যের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হলেও সামান্য ব্যক্তির অতিরিক্ত নিত্য পদার্থ। এই পদার্থ একই জাতীয় একাধিক বস্তুর মধ্যে বর্তমান সাধারণধর্ম। সাধারণ ধর্মের জন্যই একাধিক বস্তু একই জাতীয় ব'লে প্রতিভাত হয় (সমানানং ভাবঃ)। তাই সামান্যকে অনুগত প্রতীতির হেতু বলা হয়। সাধারণ ধর্ম বা সামান্য দুই প্রকার - জাতি ও উপাধি। জাতি সামান্য নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে এবং উপাধি-সামান্য নিজ আশ্রয়ে সাধারণত স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে।

৩.০৩.০৩ সামান্য পদার্থের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

বৈশেষিকগণ মনে করেন যে সামান্য বলে কোন পদার্থ স্বীকার করা না হলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না। 'মানুষ', 'গরু', 'অশ্ব' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা এক এক জাতীয় পশু বা প্রাণী নির্দেশ করি। কিন্তু জগতে সকল মানুষ বা সকল গরু বা সকল অশ্ব একরূপ নয়। এমন কি দুটি মানুষ বা দুটি গরু বা দুটি অশ্বও সর্বৈর্ণ এক হতে পারে না। অথচ 'মানুষ', 'গরু', 'অশ্ব' প্রভৃতি পদের দ্বারা প্রাণী বা পশুর শ্রেণীকরণ ব্যবহার সিদ্ধ। এইরূপ ব্যবহারকে বলা হয় 'অনুগত ব্যবহার'। এই অনুগত ব্যবহার একটি অনুগত প্রতীতি বা জ্ঞান নির্ভর। অনুগত-প্রতীতি ব্যতীত অনুগত ব্যবহার যথার্থ হতে পারে না। আবার অনুগত বিষয় ভিন্ন অনুগত প্রতীতিও সম্ভব নয়। তাই অনুগত ব্যবহারের হেতুরূপে আমাদের একটি অনুগত বিষয়কে স্বীকার করতে হয়। অনুগত বিষয়রূপে যে অনুগত ধর্ম স্বীকৃত সেই ধর্মই হল সামান্য পদার্থ। মানুষের ক্ষেত্রে এই অনুগত ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব, গরুর ক্ষেত্রে গোত্ব এবং অশ্বের ক্ষেত্রে অশ্বত্ব। জাতিবাধকের দ্বারা আক্রান্ত অনুগত ধর্মগুলি উপাধিরূপে গণ্য হয়, কিন্তু জাতিবাধকের দ্বারা অনাক্রান্ত অনুগত ধর্মগুলি জাতিরূপে গণ্য হয়, জাতি-সামান্য নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে এবং উপাধি-সামান্য নিজ আশ্রয়ে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। বৈশেষিকগণ প্রদত্ত সামান্যের এই প্রমাণ বস্তুতপক্ষে প্রশস্তপাদাচার্য প্রদত্ত সামান্যের লক্ষণ দ্বারাই সূচিত হয়েছে। প্রশস্তপাদ বলেছেন 'অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্ সামান্যম্'।

৩.০৩.০৪ সামান্যের লক্ষণ

মহর্ষি কণাদ সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, ''সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্''।

সামান্যও বিশেষ অপেক্ষা বুদ্ধির বিষয়। মহর্ষির এই সামান্য-লক্ষণ-সূত্র সম্বন্ধে পরবর্তীকালের ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনেকে মনে করেন 'বিশেষ' শব্দের দ্বারা অপর সামান্য এবং 'সামান্য' শব্দের দ্বারা পরসামান্যকে নির্দেশ করা হয়েছে। তবে যাই হোক্, মহর্ষির সূত্র থেকে একথা পরিষ্কার যে সামান্য বিশেষের ধারণা অপেক্ষা বুদ্ধিগ্রাহ্য।

প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন- ''অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্ সামান্যম্''। অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের কারণ হ'ল সামান্য। অর্থাৎ পদার্থের অনুগতরূপে যে প্রতীতি হয় (যেমন, দ্রব্যত্বরূপে সকল দ্রব্যের) সেই প্রতীতির কারই হ'ল সামান্য। প্রশস্তপাদাচার্যের এই লক্ষণই সামান্যের অস্তিত্বের প্রমাণ সূচনা করে।

আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলীতে' সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, 'সমানানাং ভাবঃ স্বাভাবিকোনাগন্তুকো ধর্মঃ সামান্যমিত্যর্থঃ''। তুল্য পদার্থসমূহের সমভাবাত্মক স্বাভাবিক বা অনাগন্তুক ধর্মই হ'ল সামান্য। তিনি এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন- ''নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণং সূচিতং ভবতি''। অর্থাৎ নিত্যত্ব, একত্ব ও অনেক বৃত্তিত্বই সামান্যের লক্ষণ। সামান্যের এই লক্ষণ থেকে মনে হয় জাতি ও উপাধি, এই উভয়বিধ সামান্যই আচার্যের লক্ষণের লক্ষ্য, কারণ উপাধি আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না।

বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে সামান্যের লক্ষণে বলেছেন ''নিত্যত্বেসতি অনেক সমবেতত্বম্''। যে ধর্ম নিত্য এবং

অনেকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান তাই সামান্য।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় প্রদত্ত সামান্যের লক্ষণগুলিতে চারটি পদ প্রযুক্ত হয়েছে। এই চারটি পদ হল ঃ 'নিত্য', 'অনেক', 'সমবেত' ও 'এক'।

'নিত্য' পদের দ্বারা সংযোগদি গুণে 'অনেক' পদের দ্বারা পরমাণুর পরিমাণাদিতে এবং 'সমবেত' পদের দ্বারা অত্যন্তাভাবে সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। 'এক' পদের দ্বারা সামান্যের স্বরূপ সূচিত হয়েছে।

সংযোগাদি সম্বন্ধ দুটি পদার্থের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে কিন্তু সংযোগদি নিত্য নয়। তাই 'নিত্য' পদের দ্বারা সংযোগাদিতে সামান্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়েছে। গগনপরিমাণ কিংবা অণুপরিমাণ নিত্য এবং তা অধিকরণে সমবেত কিন্তু গগন এক হওয়ায় এবং অণুসকল বিশেষ বিশেষ হওয়ায় তারা এক সমবেত হয়। 'অনেক' পদের দ্বারা গগন-পরিমাণে এবং অণুপরিমাণে সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারণ করা হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে অত্যন্তাভাবের 'নিত্যত্ব সমানাধিকরণবৃত্তিত্ব' আছে কিন্তু অভাব কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলে অত্যন্তাভাবে 'নিত্যত্ব-অনেক সমবেতত্ব' নাই। তাই 'সমবেত' পদের দ্বারা অত্যন্ত্যাভাবে সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ হয়েছে।

৩.০৩.০৫ সামান্যের স্বরূপ

বৈশেষিক মতে সামান্য এক ও নিত্য। সামান্য যে ব্যক্তিতে আশ্রিত সেই ব্যক্তি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে সামান্যর উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, ব্যক্তির বিনাশে সামান্য কালাশ্রিত থাকে। বস্তুতঃ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্য কালেই আশ্রিত থাকে। যখন ঘট-পটাদির উৎপত্তি হয় তখনই কালাশ্রিত স্ব স্ব সামান্য ঐ সকল ঘট-পটাদিতে উপলব্ধ হয়। অন্য দিকে সামান্যের উৎপত্তি যদি স্বীকার করা হয় তাহলে সেই সামান্য হয় ব্যক্তির উৎপত্তির পূর্বক্ষণে অথবা ব্যক্তির উৎপত্তিক্ষণে অথবা ব্যক্তির উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হবে।

কিন্তু এই তিনটি বিকল্পের কোনটিই যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই সামান্যকে এক ও নিত্য বলতে হয়।

৩.০৩.০৬ সামান্যের বিভাগ

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য 'পর'ও অপর' ভেদে দ্বিবিধ। বিশ্বনাথ ও ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের কোন কোন দার্শনিক 'পরাপর' নামক তৃতীয় এক প্রকার সামান্যের উল্লেখ করেছেন। যে সামান্য সমস্ত জাতির ব্যাপক তাকে 'পর' সামান্য বলে। যে সামান্য কেবল ব্যাপ্য কিন্তু ব্যাপক নয় তাকে 'অপর' সামান্য বলে। আর যে সামান্য কোন এক সামান্যের তুলনায় ব্যাপ্য আবার কোন এক সামান্যের তুলনায় ব্যাপক তাকে 'পরাপর' সামান্য বলে।

সত্তা পর সামান্য । ঘটত্ব-পটত্ব ইত্যাদি অপর সমান্য। দ্রবত্ব প্রভৃতি পরাপর সামান্য। সত্তার দ্বারা দ্রব্য-গুণাদির পারস্পরিক ভেদবুদ্ধি জন্মায় না। এ জন্য সত্তা সামান্যমাত্র, বিশেষ নয়। সত্তা ভিন্ন অন্য সব জাতি সামান্য-বিশেষ।

৩.০৩.০৭ জাতিবাধক

এখন প্রশ্ন হল, কোন একটি অনুগত ধর্ম জাতি হয় কিন্তু অন্যটি হয় না কেন ? আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলী'তে এই প্রসঙ্গে ছয়টি জাতিবাধকের উল্লেখ করেছেন। এই জাতিবাধকগুলির দ্বারা আক্রান্ত সামান্যধর্ম জাতি হয় না, অনাক্রান্ত ধর্মগুলি জাতি হয়। এই ছয়টি জাতিবাধক হল ব্যক্তির-অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনবস্থা, রূপহানি ও অসম্বন্ধ।

ব্যক্তির অভেদ - 'ব্যক্তির অভেদ' পদের অর্থ হ'ল আশ্রয়ের ঐক্য। ধর্মের আশ্রয়ী ভূত ব্যক্তি এক হ'লে সে ধর্ম আর জাতি হয়না। যেমন, আকাশ এক হওয়ায় আকাশত্ব জাতি নয়।

তুল্যত্ব - 'তুল্যত্ব' পদের অর্থ হল তুল্য আশ্রয়ত্ব। দুটি জাতির আশ্রয় যদি তুল্য হয় সেখানে দুটি জাতি স্বীকৃত হয় না। যেমন ঘটত্ব ও কলসত্ব। ঘট ও কলসের আশ্রয় এক হওয়ায় ঘটত্ব ও কলসত্ব ভিন্ন জাতি নয়। অপর এক ব্যাখ্যায় বলা হয় জাতিমান পদার্থের আর জাতি হয় না। ঘটত্ব জাতিমান পদার্থে তাই কলসত্ব জাতি সম্ভব নয়।

সঙ্কর - 'সঙ্কর' পদের অর্থ হল পরস্পরের অভাবের সঙ্গে সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতি। মন মূর্ত্ত দ্রব্য, কিন্তু ভূত দ্রব্য নয়। সেইজন্য মনে মূর্ত্তত্ব ও ভূতত্বাভাব আছে। আবার গগন ভূত দ্রব্য, মূর্ত্ত দ্রব্য নয়। সেজন্য গগনে ভূত ও মূর্ত্তত্বাভাব আছে। এইরূপে মূর্ত্তত্ব ভূতত্বাভাবের সঙ্গে ও ভূতত্ব মূর্ত্তত্বাভাবের সঙ্গে সমানাধিকরণ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিব্যাদি ভূত-চতুষ্টয়ে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব সমানাধিকরণ হয়। ফলে ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্ব সঙ্কর দোষে দুষ্ট হয় এবং তারা জাতি হতে পারেনা।

অনাবস্থা - কোন জাতিতে অপর একটি জাতি স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ হয়। এইজন্য ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতির জাতি স্বীকার করেন না।

রূপহানি - যাকে জাতিরূপে স্বীকার করলে তার স্বরূপের হানি হয় তার জাতি স্বীকার করা যায় না। বিশেষ পদার্থে জাতি স্বীকার করলে বিশেষ পদার্থের স্বরূপের হানি হয়। এইজন্য বিশেষত্ব জাতি নয়।

অসম্বন্ধ - 'অসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ হ'ল সম্বন্ধের অভাব। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হ'ল সমবায় সম্বন্ধ। সমবায় ও অভাব পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। এই জন্য সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব জাতি হয় না।

৩.০৪.০০ বিশেষ পদার্থ

'বিশেষ' শব্দের অর্থ ভেদক বা ব্যাবর্তক। যা কোন বিষয়কে অন্য বিষয় থেকে পৃথক বা ভিন্ন করে তাই তার ব্যাবর্তক। এই অর্থে নাম, জাতি, ক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাবর্তক পদবাচ্য। তবে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' শব্দটি একটি বিশেষ ধরনের ভেদককে সূচিত করে। এই ভেদক হল অন্ত্য ভেদক বা কেবল ভেদক। এই ধরনের ভেদকই বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের মর্যাদা পেয়েছে। বৈশেষিক সূত্রে পদার্থের বিন্যাসে বিশেষকে সামান্যের পর রাখা হয়েছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিতে সামান্য থাকে বলে এই তিনটির পরে সামান্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আবার সামান্যর জ্ঞানের পর বিশেষ জ্ঞান হয় বলে সামান্যের পর বিশেষকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩.০৪.০১ বিশেষের লক্ষণ

বিশেষের উদ্দেশ প্রকরণে প্রশস্তপাদ বলেছেন- 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো'ন্ত্যা বিশেষাঃ' অর্থাৎ যা নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবান ও অন্তে বর্তমান তাই বিশেষ। যা নিত্য দ্রব্যেই থাকে, নিত্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে থাকে না তাই নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবান। দ্রব্য, গুণ, কর্ম বা সামান্য যেমন নিত্য দ্রব্যে থাকে, তেমনি অনিত্য দ্রব্যেও থাকে। কিন্তু বিশেষ শুধুই নিত্যদ্রব্যে থাকে। কাজেই- ''নিত্যদ্রব্যবৃত্তিত্বে সতি নিত্যেতরাবৃত্তিত্বম্''- এভাবেও বিশেষের লক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ লক্ষণ নির্দোষ হবে না। কারণ আত্মত্ব ও মনস্ত্বজাতি নিত্য এবং নিত্যদ্রব্যে থাকে, ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিও তাই। এজন্য জাতিভিন্নত্বেসতি জাতিমদ্ভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বং বিশেষত্বম্ এভাবে বিশেষের লক্ষণ করা হয়। অর্থাৎ যা জাতি ভিন্ন ও জাতিমান ভিন্ন হয়ে সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাই বিশেষ। এভাবে লক্ষণ করলে জাতি বা সামান্যে এবং জাতিমান দ্রব্য, গুণ ও কর্মে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। 'সমবেত' শব্দের দ্বারা সমবায় ও অভাবে অতিব্যাপ্তি বারণ হয়। কেননা সমবায় বা অভাব সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, থাকে স্বরূপ সম্বন্ধে। পক্ষান্তরে প্রতিটি নিত্যদ্রব্যে একটি করে বিশেষ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। যা নিত্য, নিত্যদ্রব্যে বর্তমান, নিত্যদ্রব্যদ্বয়ে অবর্তমান এবং গুণভিন্ন পদার্থ তাই বিশেষ - এভাবেও বিশেষের লক্ষণ করা হয়। আবার যা জাতিরহিত এবং যার একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি তাকেও বিশেষ বলা যায়।

৩.০৪.০২ বিশেষ অন্ত্য ব্যাবর্তক

আচার্য প্রশস্তপাদ বিশেষকে 'অন্ত্য ব্যাবর্তক' বলেছেন। এটি বিশেষের প্রকৃত লক্ষণ সূচক। ''নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' বিশেষণটি বিশেষের অধিকরণকে সূচিত করে মাত্র। বিশেষের পরীক্ষা প্রকরণে প্রশস্তপাদ বলেছেন, অন্তে থাকে বলে বিশেষ হল 'অন্ত্য' আবার নিজের আশ্রয়কে বিশেষিত করে বলে তার নাম বিশেষ। অন্ত্য বলতে নিরবয়ব দ্রব্যকেও বোঝানো যেতে পারে। এই অর্থে নিরবয়ব দ্রব্য অর্থাৎ নিত্যপরমাণুতে যা থাকে তাই অন্ত্য। তাহলে 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ নিত্যদ্রব্যবৃত্তিও হয়। কিন্তু এই বিশেষণ নিছক পুনরুক্তি নয়। মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মতে বিশেষ অপেক্ষা যেহেতু অন্য কোন ভেদক ধর্ম নেই, সেহেতু বিশেষ হ'ল অন্ত্য।

৩.০৪.০৩ বিশেষ স্বতোব্যাবর্তক

বিশেষ প্রতিটি নিত্যদ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে। এইভাবে বিশেষ নিজ আশ্রয়ের ব্যাবর্ত্তক। বিশেষ আবার স্বতোব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ একটি বিশেষ অপর একটি বিশেষ থেকে নিজ ভেদের জন্য অন্য কোন ব্যাবর্তকের অপেক্ষা করে না। বিশেষ নিজেই নিজের ও নিজ আশ্রয়ের ভেদের হেতু।

এখন প্রশ্ন হল, বিশেষকে স্বতোব্যাবর্ত্তক না বলা হলে ক্ষতি কি ? এর উত্তরে বলা যায় বিশেষ যদি স্বতোব্যাবর্ত্তক না হয় তাহলে একটি বিশেষ থেকে অপর বিশেষের ভেদের জন্য পদার্থান্তরের সাহায্য নিতে হবে। সেই পদার্থান্তরটি বিশেষের ব্যাবর্ত্তক হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐ ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক এবং বিশেষের মধ্যে ভেদের কারণ হিসাবে অন্য কোন পদার্থকে স্বীকার করতে হবে। এইভাবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হবে। কিন্তু বিশেষকে স্বতোব্যাবর্তক বলা

হলে ঐ দোষ হয় না। কেউ বলতে পারেন স্বতোব্যাবৃত্তির দ্বারা যদি বিশেষ বিশেষান্তর থেকে ভিন্ন হয় তাহলে নিত্যদ্রব্যগুলিকে স্বতোব্যাবর্ত্তক বললেই তো হয়। সেক্ষেত্রে নিত্যদ্রব্যগুলির পারস্পরিক ভেদের জন্য বিশেষ স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। উত্তরে বলা যায় যে, জাতিমান পদার্থ কখনো ব্যাবর্তক-স্বভাববিশিষ্ট হতে পারে না। নিত্য দ্রব্যগুলি দ্রব্যত্ব ও সত্তাজাতিবিশিষ্ট হওয়ায় তাদের মধ্যে স্বতোব্যাবৃত্ত ধর্ম থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে বিশেষ জাতিমান না হওয়ায় বিশেষের ক্ষেত্রে স্বতোব্যাবৃতত্ব সিদ্ধ হয়।

৩.০৪.০৪ বিশেষ স্বীকারের যুক্তি

বৈশেষিক সম্প্রদায় বিশেষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে দুটি সজাতীয় পরমাণুর পাস্পরিক ভেদ সিদ্ধির জন্যই বিশেষ স্বীকার করা হয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা দুটি পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করি নানা ভেদক ধর্মের দ্বারা, যেমন একটি ঘও একটি পটের মধ্যে পার্থক্য করি তাদের আকার ও জাতির দ্বারা। কিন্তু দুটি ঘটের ভেদ ঐভাবে সিদ্ধ হয় না; কারণ তাদের আকার এক এবং দুটি ঘটেই ঘটত্ব জাতি বর্তমান। দুটি ঘটের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি তাদের অবয়বের সাহায্যে। যে কপালদ্বয়ের দ্বারা একটি ঘট উৎপন্ন, অন্য ঘটটি সেই কপালদ্বয় দ্বারা উৎপন্ন নয়। যে কোন সাবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের ক্ষেত্রে এইভাবে অবয়বের ভেদের দ্বারা তাদের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয় এমন কি দ্ব্যণুকের ক্ষেত্রেও এইভাবে ভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু দুটি পরমাণুর ভেদ এইভাবে সিদ্ধ হয় না। কেননা পরমাণু মাত্রই নিরবয়ব। তাহট অবয়বের দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ হবে কিভাবে ? এহট সমস্যার সমাধানে আমরা বলতে পারি যে পরমাণুদ্বয়ের গুণ ও জাতিগত পার্থক্যই ঐরূপ ক্ষেত্রে ভেদের জনক হবে। একটি পার্থিব পরমাণু এবং একটি জলীয় পরমাণু গুণগত ভাবেই পৃথক হবে, তাদের ভেদের জন্য বিশেষের অপেক্ষা করতে হবে না, কিন্তু দুটি সজাতীয় পরমাণুর ক্ষেত্রে ঐ ভেদক কার্যকরী হয় না। যেমন দুটি পার্থিব পরমাণু বা দুটি জলীয় পরমাণুর মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রতিটি পার্থিব পরমাণুর মধ্যে এবং প্রতিটি জলীয় পরমাণুর মধ্যে আমাদের পৃথক পৃথক বিশেষ স্বীকার করতে হবে। বিশেষ নামক একটি অতিন্দ্রীয় পদার্থের স্বীকৃতি ছাড়া দুটি সজাতীয় পরমাণুর ভেদ সাধন সম্ভব নয়। এই যুক্তিতেই বৈশেষিক দার্শনিকেরা বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেছেন। শুধুমাত্র পরমাণুতে নয়। প্রতিটি নিত্যদ্রব্যেই একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে। কাল, দিক্ প্রভৃতির কোন বিশেষ গুণ বা জাতি নেই। তাই তাদের পারস্পরিক ভেদ এবং আকাশের সঙ্গে তাদের ভেদের জন্য কাল ও দিকে একটি করে বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মুক্তিকালে আত্মার কোন বিশেষ গুণ না থাকায় মুক্ত জীবাত্মাগুলির পারস্পরিক ভেদের জন্য বিশেষ স্বীকার করা হয়েছে।আবার বিভিন্ন মুক্ত মনের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যার জন্য প্রতিটি মনে একটি করে বিশেষ স্বীকৃত হয়েছে। এইভাবে অসংখ্য নিত্যদ্রব্যের ভেদক ধর্ম হিসাবে অসংখ্য বিশেষ স্বীকৃত হয়েছে।

৩.০৪.০৫ বিশেষত্ব জাতি নয়

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন ওঠে বিশেষ অনেক হওয়ায় তাদের সাধারণ ধর্মরূপে বিশেষত্বকে জাতি বলা যায় কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বৈশেষিকগণ বলেন যে বিশেষত্বকে জাতি বলে স্বীকার করা যায় না। সত্তা ভিন্ন জাতিমাত্রই যেমন

অনুগত প্রতীতির কারণ হয় তেমনি আবার ব্যাবৃত্তি বুদ্ধিরও হেতু হয়। গোত্ব যেমন সকল গোর মধ্যে অনুগত প্রতীতির জনক তেমনি গো ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ থেকে গরুর ভেদবুদ্ধিরও জনক। এখন সকল বিশেষ পদার্থের মধ্যে যদি বিশেষত্ব বলে একটি জাতি স্বীকার করা হয় তাহলে ঐ ধর্ম যেমন একদিকে অন্য পদার্থ থেকে সকল বিশেষের ভেদবুদ্ধির জনক হবে তেমনি তা সকল বিশেষের মধ্যে অনুগত বুদ্ধির কারণ হবে। সে ক্ষেত্রে বিশেষের স্বরূপের হানি হবে। স্বরূপতঃ বিশেষ কেবলমাত্র ব্যাবৃত্তি প্রতীতিরই জনক, অনুগত প্রতীতির জনক নয়। এই কারণে বিশেষত্বকে জাতি বলা যায় না।

৩.০৫.০০ সমবায় পদার্থ

৩.০৫.০১ ভূমিকা

ন্যায়-বৈশেষিক বস্তুবাদে দ্রব্যাদি পঞ্চ ভাব পদার্থের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে তেমনি এই পঞ্চ ভাব পদার্থই যে বিশেষ এক প্রকার সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয় সেই সম্বন্ধটিও একটি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে (ষষ্ঠ পদার্থরূপে) স্বীকৃত হয়েছে। এই পদার্থই 'সমবায়' নামক ষষ্ঠ ভাব পদার্থ। 'সম্' উপসর্গপূর্বক 'বন্ধ্' প্রত্যয়ান্ত 'সম্বন্ধ' পদটির অর্থ বন্ধনের ভাব বা সংসর্গ। 'বন্ধ্' ধাতুর অর্থ বন্ধন করা। সুতরাং বোঝা যায় যে, সমবায় দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের কোনো একটি পদার্থকে পদার্থান্তরের সঙ্গে বন্ধন করে।

৩.০৫.০২ সমবায়ের লক্ষণ

সমবায় বৈশেষিকসম্মত ষষ্ঠ পদার্থ। এই পদার্থ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃকও অনুমোদিত। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে সমবায়ের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন ''ইহদমিতি যতঃ কার্য-কারণয়োঃ স সমবায়ঃ।'' কার্যকারণের মধ্যে এই আধারে এই আধেয়রূপ যে সম্বন্ধ, তাই সমবায়। মহর্ষির এই উক্তি অস্পষ্ট। 'কার্য-কারণ' পদের দ্বারা তিনি যে অযুতসিদ্ধ পদার্থকেই বোঝাতে চেয়েছেন তা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায়।

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন ''অযুতসিদ্ধনামাধার্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ।'' অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ পদার্থের 'আধার-আধেয়' ভাববোধক জ্ঞানের কারণীভূত সম্বন্ধই সমবায়। লক্ষণটিতে 'অযুতসিদ্ধ', 'আধার্যাধার', 'ইহ প্রত্যয় হেতু' এবং 'সম্বন্ধ' - এই চারটি পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখন দেখা যাক্, সন্নিবিষ্ট এই পদগুলি তাৎপর্য কি ?

'অযুতসিদ্ধ' পদটির সরল অর্থ হ'ল অংসবদ্ধের অভাব। অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয় কখনোই অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে না। তাদের অসংবদ্ধ করলে যে কোন একটি সম্বন্ধীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। উপস্কারকার বলেছেন- ''অসম্বন্ধদ্বয়োর-বিদ্যমানত্বং অযুতসিদ্ধঃ।'' অর্থাৎ পদার্থদ্বয়ের অসম্বন্ধ অবস্থায় অবর্তমানত্বই অযুতসিদ্ধির স্বরূপ।

বৃক্ষে বানরের যে সংযোগ তার সম্বন্ধীদ্বয় পূর্বে অসম্বন্ধ থাকে। সেই অসম্বন্ধের বর্তমানত্বটি বৃক্ষ ও বানরের সংযোগে থাকে ব'লে বৃক্ষ ও বানরের সম্বন্ধ অযুতসিদ্ধ হ'ল না। কিন্তু সুতো ও বস্ত্র এই দুটি পদার্থ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ তারা অসম্বন্ধ থাকে না। এমন কোন কাল পাওয়া যাবে না যখন বস্ত্র বিদ্যমান অবস্থায় স্বসংবদ্ধ বস্ত্র থেকে সুতো পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে। অন্ততঃ বস্ত্রটি সুতোকে বাদ দিয়ে কখনও বিদ্যমান থাকে না। এই জন্য সুতো ও বস্ত্রের মধ্যে যে সইর্ক তাকে 'অযুতসিদ্ধ' এবং তৎসম্পর্কিত বস্ত দুটিকেও 'অযুতসিদ্ধ' বলা হয়। এইরূপ দ্রব্য ও গুণ, দ্রব্য ও কর্ম, জাতি ও ব্যক্তি, অবয়ব ও অবয়বী, নিত্য দ্রব্য ও বিশেষ এই যুগ্ম-পদার্থগুলিও অযুতসিদ্ধ। সমবায়ের লক্ষণে 'অযুতসিদ্ধ' পদটি সন্নিবিষ্ট না হলে সমবায়ের লক্ষণ সংযোগে অতিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

'অযুতসিদ্ধদ্বয়ের সম্বন্ধ' এইটুকুই সমবায়ের লক্ষণ বললে সুখ ও ধর্মের মধ্যে এবং দুঃখ ও অধর্মের মধ্যে যে কার্যকরণ সম্বন্ধ থাকে তাতে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। সুখ বা দুঃখ আত্মাতেই আশ্রিত। সুখ ও ধর্ম, দুঃখ ও অধর্ম তাই অযুতসিদ্ধ। কিন্তু সুখ ও ধর্ম এবং দুঃখ ও অধর্মের সম্বন্ধ সমবায় সম্বন্ধ নয়। এইজন্য অযুতসিদ্ধের বিশেষণে বলা হয়েছে ; ''আধার্যাধার ভূতানাম'' আধার ও আধেয়রূপ অযুতসিদ্ধদ্বয়ের সম্বন্ধই সমবায়। সুখ ও ধর্ম বা দুঃখ ও অধর্ম পরস্পর আধারাধেয় স্বরূপ নয়। সুখ ধর্মের আধার নয় বা ধর্ম সুখের আধার নয়। এরূপ দুঃখ অধর্মের আধার নয় বা অধর্ম দুঃখের আধার নয়। সুতরাং 'আধার্যাধার' শব্দ সন্নিবেশে উপরিউক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহার হল।

''আধার্যাধার ভূতানাম্ অযুত সিদ্ধানাং সম্বন্ধ'' অর্থাৎ আধারাধেয় ভূত অযুতসিদ্ধদ্বয়ের সম্বন্ধহট সমবায় - এই মাত্র সমবায়ের লক্ষণ বললে আকাশ ও 'আকাশ' শব্দের মধ্যে যে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ আছে তাতে সমবায়ের লক্ষণের পুনরায় অতিব্যাপ্তি হয়। শব্দ মাত্রেরই একমাত্র আশ্রয় হচ্ছে আকাশ। অতএব আকাশ ও 'আকাশ' শব্দ এই দুই পদার্থ পরস্পর ভিন্ন আশ্রয়ে আশ্রিত নয় বলে অযুতসিদ্ধ লক্ষণ প্রাপ্ত হয়। আকাশ ও 'আকাশ' শব্দের সম্বন্ধ হল বাচ্য-বাচক রূপ সম্বন্ধ। 'আকাশ' শব্দটি বাচক আর আকাশ বাচ্য। সুতরাং আধার-আধেয়ভুত অযুতসিদ্ধদ্বয়ের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য প্রশস্তপাদাচার্য সমবায়ের লক্ষণের ঘটকরূপে ''হইহ প্রত্যয় হেতু'' অর্থাৎ 'এই আধারে এই আধেয়' এইরূপ জ্ঞানের হেতু এই বিশেষণ দিয়েছেন। আকাশ ও 'আকাশ' শব্দের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ থেকে 'এই আকাশে এই শব্দ' -এইরূপ জ্ঞান কারও হয় না। অতএব উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণ হল।

পরিশেষে 'সম্বন্ধ' শব্দটি না বললে 'তন্তু-পট' এইরূপ জ্ঞানের হেতু যে তন্তু ও পট তাতে অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। 'এইখানে ইহা' - এইরূপ জ্ঞানের হেতু যেমন সম্বন্ধটি হয়, সেইরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ও হয় বলে সম্বন্ধিদ্বয়ে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। অতএব 'সম্বন্ধ' পদটি লক্ষণের ঘটক বলতে হবে। 'সম্বন্ধ' পদটি সন্নিবিষ্ট হলে সম্বন্ধিদ্বয়ে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি আর হয় না।

শ্রীধরাচার্য প্রশস্তপাদের উক্ত ভাষ্যের সমস্ত পদগুলিকে লক্ষণের ঘটকরূপে উল্লখ করার পর কিরণাবলীর ব্যাখ্যা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। আচার্য উদয়ন বলেছেন সমবায় এক বলে তার বিভাগ হতে পারে না। এই হেতু প্রশস্তপাদাচার্য সমবায়ের লক্ষণে বলেছেন- 'অযুতসিদ্ধানাম' ইত্যাদি। তাঁর মতে 'এই প্রত্যয়হেতু' এই পদটি সমবায়ের

লক্ষণের ঘটক নয়; কিন্তু সমবায়ের অস্তিত্বের প্রমাণ-বোধক। অবশ্য 'প্রমাণ' বলতে এখানে অনুমান প্রমাণই বুঝতে হবে। কারণ বৈশেষিকগণ সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন না। আচার্য উদয়ন বলেছেন, যে দুটি পদার্থ পরস্পর পরস্পরকে পরিত্যাগ করে কোনআশ্রয়ে আশ্রিত হয় না সেই দুটি পদার্থ হল অযুতসিদ্ধ এবং তাদের সম্বন্ধ হ'ল সমবায়। সংযোগ প্রভৃতি অপ্রাপ্তদ্বয়ের প্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ বলে তাতে সমবায়ের লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। সমবায় সম্বন্ধটিকে প্রাপ্তের সম্বন্ধ বলায় তা যে নিত্যপ্রাপ্তি তা বোঝা যায়। সুতরাং নিত্যসম্বন্ধত্বই সমবায়ের লক্ষণ।

৩.০৫.০৩ সমবায়ের ক্ষেত্র

সমবায়ের আধার-আধেয় ভাব একপাক্ষিক। দ্রব্য, গুণ ও কর্মের আধার, কিন্তু আধেয় নয়। বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে সমবায়ের বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলিকে উল্লেখপূর্বক সমবায়ের পরিচয় করতে গিয়ে বলেছেন-

''ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্মণোঃ।

তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্তিতঃ॥''

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায়ের দৃষ্টান্ত হ'ল পঞ্চবিধ। 'দৃষ্টান্ত' বলতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ জোড়া সম্বন্ধীয় কথা বোঝানো হয়েছে। এইগুলি সমবায়ের ক্ষেত্র বলেও পরিচিত। এই পাঁচ জোড়া দৃষ্টান্ত হ'ল ঃ (১) দ্রব্য ও গুণ (যেমন, ঘট ও ঘটরূপ), (২) দ্রব্য ও কর্ম (যেমন, ঘট ও ঘটক্রিয়া), (৩) জাতি ও ব্যক্তি (যেমন, ঘট ও ঘটত্ব), (৪) অবয়ব ও অবয়বী (যেমন, ঘট ও কপালদ্বয়), (৫) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ (যেমন, পরমাণু ও বিশেষ)। বিশ্বনাথের মতে দ্রব্য ও গুণ, দ্রব্য ও কর্ম, জাতি ও ব্যক্তি, অবয়ব ও অবয়বী, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাই হ'ল সমবায় সম্বন্ধ। এখানে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধী হলেও তার অধিকরণ নয়। দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অধিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় প্রত্যক্ষগোচর হয় মাত্র।

৩.০৫.০৪ সমবায়ের অস্তিত্বসাধক প্রামাণ

বৈশেষিক সম্প্রদায় প্রদত্ত সমবায়সিদ্ধক অনুমানটিকে বিশ্বনাথ নিম্নরূপে উপস্থাপন করেছেন ''গুণ-ক্রিয়াদিবিশিষ্ট বুদ্ধি বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ বিষয়া বিশিষ্ট বুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডীপুরুষ ইতি বিশিষ্ট বুদ্ধিবদিত্যনুমানম্''।

যে জ্ঞানে বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয় হয় তার নাম বিশিষ্ট-বুদ্ধি। এই অনুমানে সাধ্য হল বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয়কত্ব ; হেতু হল বিশিষ্ট বুদ্ধিত্ব এবং দৃষ্টান্ত হল দণ্ডীপুরুষরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি। দণ্ডীপুরুষরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিতে দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, বিশিষ্টবুদ্ধি হলেই তা বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয়ক হবে। সুতরাং 'গোত্ববান গৌঃ' এইরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধিও যে বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয়ক তা অবশ্য স্বীকার্য। সেইরূপ 'রূপবান ঘট' বা 'ক্রিয়াবান নরঃ' এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি

বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে সম্ভব হয়। গুণ, ক্রিয়া বা জাতি দ্রব্য নয় বলে এবং নিজেদের আধার দ্রব্য থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না বলে দ্রব্যের সঙ্গে তাদের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। আবার দ্রব্য ও গুণাদি পরস্পর ভিন্ন বলে তাদের তাদাত্ম্য সম্বন্ধও হয় না। এইরূপে অন্যান্য সম্বন্ধের বাধজ্ঞানের দ্বারা পূর্বোক্ত অনুমানের সাহায্যে যে বিশেষ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় তাই সমবায়। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন ''এতেন সংযোগাদিবাধাৎ সমবায় সিদ্ধি।''

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিশিষ্টবুদ্ধির ক্ষেত্রে স্বীকৃত সম্বন্ধ সমবায় না হয়ে স্বরূপ হলেই বা ক্ষতি কি ? এর উত্তরে বিশ্বনাথ বলেছেন এই সম্বন্ধ স্বরূপ হতে পারে না। এই সম্বন্ধকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলা হলে বিভিন্ন দৃষ্টান্তে অনন্ত স্বরূপ স্বীকারের ফলে মহা গৌরব হয়। সেই তুলনায় বিভিন্ন দৃষ্টান্তে বর্তমান দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, অবয়ব-অবয়বী, জাতি-ব্যক্তি, নিত্যদ্রব্য ও বিশেষের মধ্যে একটিমাত্র নিত্য সমবায় স্বীকার করা হ'লে লাঘব হয়। এইরূপ লাঘব যুক্তিতে প্রমাণিত হয় যে 'গোত্ব' ও 'গৌঃ' এর মধ্যে তথা উপরিউক্ত পাঁচটি ক্ষেত্রে যে সম্বন্ধ বর্তমান তা সমবায়। এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ বলেছেন ''লাঘববাদেক সমবায় সিদ্ধিঃ''। এইরূপ যুক্তিতে বৈশেষিক সইদায় অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যস্থিত সম্বন্ধ যে বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ নয় তাও সাধন করেছেন।

এখানে আপত্তি উঠতে পারে যে, সমবায় যদি এক হয় তাহলে বায়ুতে স্পর্শ-সমবায়ের প্রতীতিকালে বায়ুতে রূপ-সমবায়ের প্রতীতিও স্বীকার করতে হয়। কারণ স্পর্শ-সমবায় ও রূপ-সমবায় একই সমবায়। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে বায়ুতে স্পর্শ-সমবায়ের প্রতীতি স্বীকৃত হলেও রূপ-সমবায়ের প্রতীতি স্বীকৃত নয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে রূপ-সমবায় ও স্পর্শ-সমবায় এক হলেও বায়ুতে রূপের ব্যঞ্জক না থাকায় ঐ সমবায় 'রূপ সমবায়' আখ্যা পায় না। কিন্তু বায়ুতে স্পর্শের ব্যাঞ্জক থাকায় ঐ সমবায় 'স্পর্শ সমবায়' আখ্যা পায়। রূপ সমবায়ই যথার্থ রূপ-প্রতীতির হেতু। বায়ুতে রূপের ব্যঞ্জক না থাকায় 'বায়ু রূপবান' এইরূপ যথার্থ প্রতীতি হতে পারে না। কিন্তু বায়ুতে স্পর্শের ব্যঞ্জক থাকায় 'বায়ু স্পর্শবান' এইরূপ যথার্থ প্রতীতি হয়।

উক্ত যুক্তিতে বৈশেষিক সইদায় অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। এই নিত্য সম্বন্ধই বৈশেষিক সইদায় স্বীকৃত ষষ্ঠ ভাব পদার্থ।

৩.০৬.০০ সারসংক্ষেপ

গুণ ঃ

মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণে বলেছেন দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান, সংযোগ-বিভাগের নিরপেক্ষ অকারণ পদার্থ হল গুণ (দ্রব্যাশ্রয়ীঅগুণবান্‌সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্ - বৈঃ সূঃ ১/১/১৬)। গুণের গুণ বা কর্ম হয় না। গুণমাত্রই গুণত্বের আশ্রয়, দ্রব্যে সমবেত, গুণরহিত ও ক্রিয়াশূন্য। অন্যভাবে গুণকে দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন জাতিবিশিষ্ট পদার্থও বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই কেবলমাত্র জাতিবিশিষ্ট, অন্য কোন পদার্থ জাতিবিশিষ্ট নয়। তাই দ্রব্য ও কর্ম ব্যতিরেকে যা জাতিমান তাই গুণ। মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে (১) রূপ, (২) রস, (৩) গন্ধ,

(৪) স্পর্শ, (৫) সংখ্যা, (৬) পরিমাণ, (৭) পৃথক্ত্ব, (৮) সংযোগ, (৯) বিভাগ, (১০) পরত্ব, (১১) অপরত্ব, (১২) বুদ্ধি, (১৩) সুখ, (১৪) দুঃখ, (১৫) ইচ্ছা, (১৬) দ্বেষ ও (১৭) প্রযত্ন - এই সতেরটি গুণের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। প্রশস্তপাদ (১৮) গুরুত্ব, (১৯) দ্রবত্ব, (২০) স্নেহ, (২১) সংস্কার, (২২) ধর্ম, (২৩) অধর্ম ও (২৪)শব্দ - এই সাতটি গুণও সূত্রকারের অভিপ্রেত বলে উল্লেখ করেছেন। তাই বৈশেষিক দর্শনে মোটচব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত। নব্যনৈয়ায়িকগণও এই চব্বিশ প্রকার গুণকে স্বীকার করেছেন। কোন কোন নব্যনৈয়ায়িক আবার ত্রিবিধ সংস্কারকে (বেগ, ভাবনাখ্য সংস্কার ও স্থিতিস্থাপকত্ব) ভিন্ন ভিন্ন হিসাবে গ্রহণ করে এবং দৈশিক ও কালিক ভেদে পরত্ব ও অপরত্বের পৃথক পৃথক সত্তা স্বীকার করে মোট আটশ প্রকার গুণ স্বীকার করেছেন (দীঃ জাঃ)।

বৈশেষিক দর্শনে যে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত তা মৌলিক গুণ। বৈশেষিক মতে মৌলিক গুণ চব্বিশ প্রকারের কম বা বেশী নয়। এই চব্বিশ প্রকার মৌলিক গুণের পারস্পরিক সংযোগে কোন কোন নতুন গুণের আবির্ভাব হতে পারে কিন্তু মৌলিক গুণের তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। বৈশেষিকগণ মৌলিক গুণগুলির নানা উপবিভাগও স্বীকার করেন। বৈশেষিক সম্মত চব্বিশ প্রকার গুণের মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ এবং বেগরূপসংস্কার এই দশটি গুণ হল মূর্ত দ্রব্যের গুণ। অর্থাৎ এরা পরিচ্ছিন্ন পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যের গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ এই দশটি হল অমূর্ত দ্রব্যের গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি মূর্ত এবং অমূর্ত উভয়প্রকার দ্রব্যের গুণ। সংযোগ, বিভাগ, পৃথক্ত্ব, সংখ্যা প্রভৃতি গুণ একাধিক দ্রব্যে আশ্রিত হতে পারে। আবার রূপ, রস প্রভৃতি গুণ কেবলমাত্র একটি দ্রব্যেই উদ্ভূতরূপে আশ্রিত।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রবত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ, এই ষোলটি গুণ হল বিশেষ গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব এবং বেগরূপসংস্কার এই দশটি হল সামান্যগুণ। গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্যসংস্কার এই চারটি গুণ হল অতীন্দ্রিয় গুণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন এই ছয়টি গুণ অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য গুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ ও বেগ এই নয়টি গুণ হল দুইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য গুণ।

কর্ম ঃ

গুণের ন্যায় কর্মও দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ। তবে গুণ দ্রব্যের নিষ্ক্রিয় ও স্থিতিবোধক বিশেষণ কিন্তু কর্ম দ্রব্যের সক্রিয় ও গতিবোধক বিশেষণ। কর্ম কেবলমাত্র ক্ষিতি, অপ্, তেজ প্রভৃতি মূর্ত্ত দ্রব্যেই থাকে, আকাশ, কাল, আত্মা প্রভৃতি অমূর্ত্ত দ্রব্যে থাকে না। মহর্ষি কণাদ কর্মের লক্ষণে বলেছেন সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণরূপ পদার্থই হল কর্ম (সংযোগ বিভাগেস্বনপেক্ষকারণমিতি কর্মলক্ষণম্)। কোন কোন মতে সংযোগ ভিন্ন সংযোগের অসমবায়িকারণই হ'ল কর্ম। বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার ঃ (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ ও (৫) গমন।

সামান্য ঃ

সামান্য বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত চতুর্থ পদার্থ।সকল সম্প্রদায় এই পদার্থ স্বীকার করেননি। এখন দেখা যাক্, এই পদার্থের ধারণা কিভাবে নানা দর্শনে আবির্ভুত হয়েছে। সামান্য সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলিকে প্রধানতঃ তিনটি তত্ত্বে অন্তর্ভূক্ত করা যায়। এই তিনটি তত্ত্ব হ'ল **নামবাদ**, **প্রত্যয়বাদ** এবং **বস্তুবাদ**। নামবাদ – বৌদ্ধ সম্প্রদায় মনে করেন বিশ্বে কেবল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুরই সত্তা আছে সামান্য ধর্মের কল্পনা নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বস্তু জগতে সামান্য বলে কিছু নেই। জাতি সম্বন্ধে এই মতবাদ 'অপোহবাদ' নামে পরিচিত। প্রত্যয়বাদ– জৈন সম্প্রদায় মনে করেন সামান্য ধারণা মাত্র। বিশেষ বিশেষ বস্তু দেখে মনের সাহায্যে এই ধারণা আমরা গঠন করি। জৈনমতে সামান্য ব্যক্তি-নির্ভর। বস্তুবাদ– ন্যায় -বৈশেষিক সম্প্রদায় সামান্যকে কেবল নাম বা ধারণা বলে মনে করেননি। তাঁরা সামান্যকে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর মত বাস্তব সত্তাবান বলে মনে করেন। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় জগতের ব্যাখ্যার জন্য যে সাতটি মৌলিক পদার্থ স্বীকার করেছেন, সামান্য তাদের অন্যতম। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য ব্যক্তি থেকে ভিন্ন নিত্য বস্তুস্বরূপ।

বৈশেষিকগণ মনে করেন যে, সামান্য বলে কোন পদার্থ স্বীকার করা না হলে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না। 'মানুষ', 'গরু', 'অশ্ব' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা এক এক জাতীয় পশু বা প্রাণী নির্দেশ করি। কিন্তু জগতে সকল মানুষ বা সকল গরু বা সকল অশ্ব একরূপ নয়। এমন কি দুটি মানুষ বা দুটি গরু বা দুটি অশ্বও সর্বৈব এক হতে পারে না। অথচ 'মানুষ', 'গরু', 'অশ্ব' প্রভৃতি পদের দ্বারা প্রাণী বা পশুর শ্রেণীকরণ ব্যবহার সিদ্ধ। এইরূপ ব্যবহারকে বলা হয় 'অনুগত ব্যবহার'। এহট অনুগত ব্যবহার একটিট অনুগত প্রতীতি বা জ্ঞান নির্ভর। অনুগত-প্রতীতি ব্যতীত অনুগত ব্যবহার যথার্থ হতে পারে না। আবার অনুগত বিষয় ভিন্ন অনুগত প্রতীতিও সম্ভব নয়। তাই অনুগত ব্যবহারের হেতুরূপে আমাদের একটি অনুগত বিষয়কে স্বীকার করতে হয়। অনুগত বিষয়রূপে যে অনুগত ধর্ম স্বীকৃত সেই ধর্মই হল সামান্য পদার্থ। প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন- ''অনুবৃত্তিপ্রত্যয়কারণম্ সামান্যম্''। অনুবৃত্তি প্রত্যয়ের কারণ হ'ল সামান্য। অর্থাৎ পদার্থের অনুগতরূপে যে প্রতীতি হয় (যেমন, দ্রব্যত্বরূপে সকল দ্রব্যের) সেই প্রতীতির কারণই হ'ল সামান্য। প্রশস্তপাদাচার্যের এই লক্ষণই সামান্যের অস্তিত্বের প্রমাণ সূচনা করে।

আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলীতে' সামান্যের লক্ষণে বলেছেন, 'সমানানাং ভাবঃ স্বাভাবিকোনাগন্তুকো ধর্মঃ সামান্যমিত্যর্থঃ''। তুল্য পদার্থসমূহের সমভাবাত্মক স্বাভাবিক বা অনাগন্তুক ধর্মই হ'ল সামান্য। তিনি এই লক্ষণের ব্যাখ্যায় বলেছেন- ''নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণং সূচিতং ভবতি''। অর্থাৎ নিত্যত্ব, একত্ব ও অনেক বৃত্তিত্বই সামান্যের লক্ষণ। সামান্যের এই লক্ষণ থেকে মনে হয় জাতি ও উপাধি, এই উভয়বিধ সামান্যহট আচার্যের লক্ষণের লক্ষ্য, কারণ উপাধি ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। বৈশেষিক মতে সামান্য এক ও নিত্য। সামান্য যে ব্যক্তিতে আশ্রিত সেই ব্যক্তি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির উৎপত্তি ও বিনাশে সামন্যের উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, ব্যক্তির বিনাশে সামান্য কালাশ্রিত থাকে। ন্যায়-বৈশেষিক মতে সামান্য 'পর'ও 'অপর' ভেদে দ্বিবিধ। যে সামান্য সমস্ত জাতির ব্যাপক তাকে 'পর' সামান্য বলে। যে সামান্য কেবল ব্যাপ্য কিন্তু ব্যাপক নয় তাকে 'অপর' সামান্য বলে। সত্তা পর সামান্য । ঘটত্ব-পটত্ব হটত্যাদি অপর সমান্য। কোন কোন মতে দ্রব্যত্বাদি হল পরাপর সামান্য। আচার্য উদয়ন তাঁর 'কিরণাবলী'তে এহট প্রসঙ্গে ছয়টি জাতিবাধকের উল্লেখ করেছেন। এই জাতিবাধকগুলির দ্বারা আক্রান্ত সামান্যধর্ম জাতি হয় না, অন্যক্রান্ত ধর্মগুলি জাতি হয়। এই ছয়টি জাতিবাধক হল ব্যক্তির-অভেদ, তুল্যত্ব, সঙ্কর, অনাবস্থা, রূপহানি ও অসম্বন্ধ।

বিশেষ ঃ

বিশেষের উদ্দেশ প্রকরণে প্রশস্তপাদ বলেছেন- 'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়ো'ন্ত্যা বিশেষাঃ'' অর্থাৎ যা নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবান ও অন্তে বর্তমান তাই বিশেষ। যা নিত্য দ্রব্যেই থাকে, নিত্যদ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে থাকে না তাই নিত্যদ্রব্যবৃত্তিবান। দ্রব্য, গুণ, কর্ম বা সামান্য যেমন নিত্য দ্রব্যে থাকে, তেমনি অনিত্য দ্রব্যেও থাকে। যা নিত্য, নিত্যদ্রব্যে বর্তমান, নিত্যদ্রব্যদ্বয়ে অবর্তমান এবং গুণভিন্ন তাই বিশেষ - এভাবেও বিশেষের লক্ষণ করা হয়। আবার যা জাতিরহিত এবং যার একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি তাকেও বিশেষ বলা যায়। আচার্য প্রশস্তপাদ বিশেষকে অন্ত্য ব্যবর্তক বলেছেন। এটি বিশেষের প্রকৃত লক্ষণ। ''নিত্যদ্রব্যবৃত্তি' বিশেষণটি বিশেষের অধিকরণকে সূচিত করে মাত্র। বিশেষের পরীক্ষা প্রকরণে প্রশস্তপাদ বলেছেন, অন্তে থাকে বলে বিশেষ হল 'অন্ত্য'। একটি নিত্যদ্রব্যকে অন্যান্য নিত্যদ্রব্য থেকে পৃথক করে বলে বিশেষ হল ব্যাবর্তক। আবার নিজের আশ্রয়কে বিশেষিত করে বলে তার নাম বিশেষ। অন্ত্য বলতে নিরবয়ব দ্রব্যকেও বোঝানো যেতে পারে। এহট অর্থে নিরবয়ব দ্রব্য অর্থাৎ নিত্যপরমাণুতে যা থাকে তাই অন্ত্য।

বিশেষ প্রতিটি নিত্যদ্রব্যকে অন্য নিত্য দ্রব্য থেকে পৃথক করে। এইভাবে বিশেষ নিজ আশ্রয়ের ব্যাবর্ত্তক। বিশেষ আবার স্বতোব্যাবর্ত্তক, অর্থাৎ একটি বিশেষ অপর একটি বিশেষ থেকে নিজ ভেদের জন্য অন্য কোন ব্যাবর্তকের অপেক্ষা করে না। বিশেষ নিজেই নিজের ও নিজ আশ্রয়ের ভেদের হেতু। বিশেষ ছাড়া অন্য কোন ব্যাবর্তক স্বতোব্যাবর্তক নয়।

বৈশেষিক সম্প্রদায় বিশেষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে দুটি সজাতীয় পরমাণুর পাস্পরিক ভেদ সিদ্ধির জন্যই বিশেষ স্বীকার করা হয়। ব্যবহারিক জীবনে আমরা দুটি পদার্থের মধ্যে পার্থক্য করি নানা ভেদক ধর্মের দ্বারা, যেমন একটি ঘট একটি পটের মধ্যে পার্থক্য করি তাদের আকার ও জাতির দ্বারা। কিন্তু দুটি ঘটের ভেদ ঐভাবে সিদ্ধ হয় না; কারণ তাদের আকার এক এবং দুটি ঘটেইট ঘটত্ব জাতি বর্তমান। দুটি ঘটের মধ্যে আমরা পার্থক্য করি তাদের অবয়বের সাহায্যে। যে কপালদ্বয়ের দ্বারা একটি ঘট উৎপন্ন, অন্য ঘটটিটসেই কপালদ্বয় দ্বারা উৎপন্ন নয়। যে কোন সাবয়ব দ্রব্যদ্বয়ের ক্ষেত্রে এইভাবে অবয়বের ভেদের দ্বারা তাদের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয় এমন কি দ্ব্যণুকের ক্ষেত্রেও এইভাবে ভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু দুটি পরমাণুর ভেদ এইভাবে সিদ্ধ হয় না। কেননা পরমাণু মাত্রই নিরবয়ব। তাই অবয়বের দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ হবে কিভাবে ? এই সমস্যার সমাধানে আমরা বলতে পারি যে পরমাণুদ্বয়ের গুণ ও জাতিগত পার্থক্যই ঐরূপ ক্ষেত্রে ভেদের জনক হবে। একটি পার্থিব পরমাণু এবং একটি জলীয় পরমাণু গুণগত ভাবেই পৃথক হবে, তাদের ভেদের জন্য বিশেষের অপেক্ষা করতে হবে না, কিন্তু দুটি সজাতীয় পরমাণুর ক্ষেত্রে ঐ ভেদক কার্যকরী হয় না। যেমন দুটি পার্থিব পরমাণু বা দুটি জলীয় পরমাণুর মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। এরকম ক্ষেত্রে প্রতিটি পার্থিব পরমাণুর মধ্যে এবং প্রতিটি জলীয় পরমাণুর মধ্যে আমাদের পৃথক পৃথক বিশেষ স্বীকার করতে হবে।

সমবায় ঃ

সমবায় বৈশেষিকসম্মত ষষ্ঠ পদার্থ। এই পদার্থ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃকও অনুমোদিত। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলেছেন ''অযুতসিদ্ধনামাধার্যাধার ভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহ প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ।'' অর্থাৎ অযুতসিদ্ধ পদার্থের 'আধার-আধেয়' ভাববোধক জ্ঞানের কারণীভূত সম্বন্ধই সমবায়।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে সমবায়ের দৃষ্টান্ত হ'ল পঞ্চবিধ। 'দৃষ্টান্ত' বলতে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ জোড়া সম্বন্ধীর কথা বোঝানো হয়েছে। এইগুলি সমবায়ের ক্ষেত্র বলেও পরিচিত। এই পাঁচজোড়া দৃষ্টান্ত হ'ল ঃ (১) দ্রব্য ও গুণ (যেমন, ঘট ও ঘটরূপ), (২) দ্রব্য ও কর্ম (যেমন, ঘট ও ঘটক্রিয়া), (৩) জাতি ও ব্যক্তি (যেমন, ঘট ও ঘটত্ব), (৪) অবয়ব ও অবয়বী (যেমন, ঘট ও কপালদ্বয়), (৫) নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ (যেমন, পরমাণু ও বিশেষ)। নৈয়ায়িকগণ সংযুক্ত-বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা যোগ্য পদার্থে সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেছেন। বৈশেষিক **সম্প্রদায়** সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন নি। বৈশেষিক মতে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের জন্য সম্বন্ধের যাবতীয় আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ সকল আশ্রয়ের প্রত্যক্ষ কখনই সম্ভব নয়। তাই সমবায়ের প্রত্যক্ষও সম্ভব নয়। বিশ্বনাথ সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করলেও মুক্তাবলীতে সমবায় সিদ্ধির জন্য একটি অনুমান প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন 'দণ্ডীপুরুষ' রূপ সকল বিশিষ্টবুদ্ধির ক্ষেত্রেই বিশেষণ-বিশেষ্যের সম্বন্ধ বিষয় হয়। 'রূপবান্ ঘট', 'গোত্ববান্ গৌঃ' প্রভৃতি বিশিষ্টবুদ্ধির ক্ষেত্রে যে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ বিষয় হয়, তা সংযোগ বা তাদাত্ম্য হ'তে পারে না। এইভাবে অন্যান্য সম্বন্ধের বাধজ্ঞানের দ্বারা অতিরিক্ত সমবায় পদার্থ সিদ্ধ হয়।

৩.০৭.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

অনুবৃত্তিপ্রত্যয় - 'অনুবৃত্তিপ্রত্যয়' বলতে বোঝায় একই ধরনের জ্ঞান। দুটি মানুষকে দেখে আমাদের ঐ দুটি প্রাণী একই ধরনের বলে বোধ হয়। এই ধরনের বোধকেই অনুবৃত্তি প্রত্যয় বলা হয়। অনুবৃত্তিপ্রত্যয়ের দ্বারাই সামান্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

সামান্যবিশেষ - সামান্যবিশেষ বৈশেষিকমতে পরাপর সামান্য। যে সামান্য একই সঙ্গে অনুবৃত্তিপ্রত্যয় ও ব্যাবৃত্তিপ্রত্যয়ের হেতু তাকেই বলে সামান্যবিশেষ। সামান্যবিশেষ একাধারে কেবল বিশেষ ও কেবলসামান্য থেকে পৃথক।

সংকর - সংকর বলতে বোঝায় পরস্পরের অভাবের সঙ্গে সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতি। মনে মূর্তত্ব ভূতত্বাভাবের সঙ্গে এবং আকাশে ভূতত্ব মূর্তত্বাভাবের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারটি দ্রব্যে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব সমানাধিকরণ হওয়ায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব সংকর দোষে দুষ্ট হয়।

অযুতসিদ্ধ - 'অযুতসিদ্ধ' শব্দের অর্থ যা যুতসিদ্ধ নয়। যে সব পদার্থ অতীতে অসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল বা ভবিষ্যতে অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারে তাদের বলে যুতসিদ্ধ যেমন, হাত ও কলম। এর বিপরীত অর্থাৎ যে সব পদার্থ অতীতে অসংবদ্ধ অবস্থায় ছিল না বা ভবিষ্যতেও অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকবে না তারা অযুতসিদ্ধ যেমন, তন্তু ও তন্তুর দ্বারা নির্মিত বস্ত্র।

৩.০৮.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

ছোট প্রশ্ন

(a) What are the different types of *œaṁskāra* ?
(b) What are the two types of *sabda* ?
(c) What are the different types of *parimāṇa* ?
(d) What are the *viœeṣaguṇa* of *atman* ?
(e) Which *dravyas* do not have *viœeṣaguṇa* ?
(f) What are the different types of *buddhi* ?
(g) What are the different types of *mūrta dravya* ?
(h) What are the two types of *sāmūnya* ?
(i) What is *jātibādhāka* ?
(j) What are the *jātibādhākas* ?
(k) What is *anuṛvti pratyaya.*
(l) What is *vyavṛtti pratyaya.*
(m) What is meant by *svatovyavartaka* ?
(n) Is *viœeṣatva* a *jāti.*
(o) Distinguish between *jāti* and *upādhi.*
(p) What is meant by *'antya'* ?
(q) What is meant by *'ayutasiddha'.*
(r) What is *ādhāra - ādheya bhāva* ?
(s) What is meant by *'nitya'* ?
(t) What is meant by *samaveta* ?
(u) Can a *karma* be *nitya* ?
(v) Can there be a *karma* of *karma* ?
(w) What is *gunavāna* and *karmavāna* ?
(x) What is meant by *'vyakti'* ?
(y) What are the different types *samyoga* ?
(z) Give an example of *uvayakarmaja saṁyoga* ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

(a) Define gu ṇ a.Explain *parimāṇa* and *śabda* as *guṇas* in Vaiśeṣika metaphysics.
(b) Define *karma*. Explain different types of *karma*.
(c) Define *Sāmānya*, Distinguish between *para and* apara *samanya*.
(d) On what grounds do the *Vaiśeṣikas* admit a universal over and above the particular objects? Explain.
(e) On what grounds *Sāmānya* is admitted as an independent category?
(f) Define *viśeṣa* after *Prasaśtapāda*. Why *viseṣa* is admitted as an independent category?
(g) What is *antyavyāvartaka*? What is *svatovyāvartaka*? Why *viśeṣa* is called *svatovyāvartaka?*
(h) Defive *sāmavaya*. Explain the necessity of esch term occurred in the definition. Distinguish between *saṁyoga* and *sāmavāya.*
(i) Why *Samāyaya* is called *ayutasiddha*? What are different fields of *Sāmāyaya*? Why *Sāmāyaya* is called one?

৩.০৯.০০ সহায়ক পুস্তক

১. বৈশেষিক দর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮২৮ শকাব্দ।
২. বৈশেষিক দর্শনম্, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
৩. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (সুক্তি, সেতু ও ব্যোম্বতী টীকা সহ), গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪।
৪. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা।
৫. প্রশস্তপাদভাষ্য, পণ্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।
৬. প্রশস্তপাদভাষ্য, কালিপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত।
৭. বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
৮. কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৯. ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ), পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।
১০. ভাষা পরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
১১. Vaisesika Philosophy, Ui.
১২. Tarkasaṁgraha Dipikā on Tarkasaṁgraha - Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers.

একক ঃ ৪

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-১

বিষয়সূচী

৪.০০.০০ - ভূমিকা

৪.০১.০০ - সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য

৪.০২.০০ - ষট্‌ পদার্থের সাধর্ম্য

৪.০২.০১ - অস্তিত্ব

৪.০২.০২ - অভিধেয়ত্ব

৪.০২.০৩ - জ্ঞেয়ত্ব

৪.০৩.০০ - নিত্যদ্রব্যভিন্ন যাবৎ পদার্থের সাধর্ম্য

৪.০৩.০১ - আশ্রিতত্ব

৪.০৪.০০ - দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য

৪.০৪.০১ - সমবায়িত্ব

৪.০৪.০২ - অনেকত্ব

৪.০৫.০০ - গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য

৪.০৫.০১ - নির্গুণত্ব

৪.০৫.০২ - নিষ্ক্রিয়ত্ব

৪.০৬.০০ - সারসংক্ষেপ

৪.০৭.০০ - কতিপয় শব্দ-পরিচিতি

৪.০৮.০০ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.০৯.০০ - সহায়ক পুস্তক

৪.০০.০০ ভূমিকা

আচার্য প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের উদ্দেশের পর ঐ পদার্থগুলির, সামর্ধ্য ও বৈধর্ম্যের আলোচনার সূত্রপাত করতে বলেছেন ''এবং ধর্মৈর্বিনা ধর্মিণামুদ্দেশঃ কৃতঃ''। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আলোচনায় কেবলমাত্র ধর্মীগুলিরই উদ্দেশ করা হয়েছে। তাদের ধর্মসকলের উদ্দেশ করা হয়নি। 'উদ্দেশ' শব্দের অর্থ নামমাত্র কথন। অর্থাৎ কোন কিছুর নামোল্লেখ করে তার স্বল্পমাত্র পরিচয় দানকে বলা হয় উদ্দেশ। ইতিপূর্বে গ্রন্থকার দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থের নামোল্লেখ পূর্বক পরিচয় দিয়েছেন। তাদের লক্ষণ ও পরীক্ষা পরে করা হবে। এখন

এই ছয়টি পদার্থের ধর্মসকলের আলোচনার সূত্রপাত করতে বললেন এতক্ষণ কেবল ধর্মী সকলেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে কিন্তু ধর্মসকলের পরিচয় দেওয়া হয়নি। এখন সেই ধর্মসকলের পরিচয় দেওয়া হবে। পদার্থের ধর্ম-ধর্মী ভেদ একপ্রকার তাত্ত্বিক ভেদ। সাধারণ বাস্তব জীবনে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই জ্ঞানের (নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ভিন্ন) বিষয় হয়। যাতে বা যে আশ্রয়ে কোন ধর্ম আশ্রিত হয় তাকে বলে ধর্মী। অপরদিকে যা কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হয় তা হল ঐ আশ্রয়ের ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রক্তপুষ্পের ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হল ধর্ম এবং পুষ্প হল ঐ ধর্মের ধর্মী। বলাই বাহুল্য, পদার্থের ধর্ম-ধর্মী ভেদ আপেক্ষিক। যে পদার্থ কোন পদার্থের ধর্ম তা আবার অন্য পদার্থের ধর্মীও হতে পারে। রক্তপুষ্পের ক্ষেত্রে পুষ্প যেমন রক্তবর্ণের ধর্মী এবং রক্তবর্ণ তার ধর্ম তেমনি রক্তপুষ্পবান পুরুষের ক্ষেত্রে রক্তপুষ্প হল পুরুষের ধর্ম এবং পুরুষ হল তার ধর্মী। তাই বর্তমানে আলোচিত ধর্ম সমূহ পূর্বে আলোচিত ছয়টি ধর্মী সমূহের অতিরিক্ত কিছু নয়। ঐ ষট্‌পদার্থই পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষায় কখনো বা ধর্ম হয় আবার কখনো বা ধর্মী হয়। তাই বলা যায় যে, পূর্বোক্ত ছয়টি ধর্মী পদার্থের উদ্দেশের সঙ্গেই তাদের ধর্মেরও উদ্দেশ কথন পরোক্ষভাবে হয়ে গেছে। তবে কোন্ পদার্থের অপেক্ষায় কোন্ পদার্থ ধর্মী বা কোন্ পদার্থ তার ধর্ম তা বলা হয়নি। তাই ধর্মীর পর ধর্ম সমূহের পৃথক ভাবে উদ্দেশ করা হয়েছে। ধর্ম ধর্মীতেই আশ্রিত। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের জ্ঞান হতে পারে না। এই কারণে ধর্মের আলোচনার সূচনা করার পূর্বে গ্রন্থকার ধর্মীর উদ্দেশ করেছেন। ধর্মীর উদ্দেশের পর গ্রন্থকার কোন্ কোন্ ধর্মীতে কোন্ কোন্ ধর্ম থাকে এবং কোন্ কোন্ ধর্ম থাকে না, সেই আলোচনার সূচনা করেছেন।

৪.০১.০০ সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য

আচার্য প্রশস্তপাদ নিঃশ্রেয়সের আলোচনায় দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়সের হেতু বলেছেন। পদার্থধর্মসংগ্রহ গ্রন্থে উক্ত ষট্‌পদার্থ ও তাদের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের নিরূপণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠ করলে তাই পদার্থ সমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। এই গ্রন্থ এইভাবে গ্রন্থকারের মতে নিঃশ্রেয়সের প্রযোজক হয়।

সাধর্ম্য বলতে বোঝায় সমানধর্ম। 'সমানো ধর্মো যেষাং তে সধর্মাণঃ তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ধর্ম একাধিক পদার্থে সমভাবে বর্তমান (সমান) তাই সাধর্ম্য। এর বিপরীত ভাবই বৈধর্ম্য। ''বিরুদ্ধঃ ধর্মো যেষাং তে বির্ধমাণঃ তেষাং ভাবো বৈধর্ম্যম্' -এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ধর্ম কোন এক পদার্থে থাকে কিন্তু অন্য পদার্থে থাকে না (বিষম) তাকে বলে বৈধর্ম্য। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের মাধ্যমে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সুস্পষ্ট জ্ঞান হয়। এইভাবে পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের যে তত্ত্বজ্ঞান হয় তাই বৈশেষিকমতে নিঃশ্রেয়সের হেতু।

৪.০২.০০ ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য

''ষন্নামপি পদার্থানামস্তিত্বাভিধেয়ত্বজ্ঞেয়ত্বানি''।

প্রশস্তপাদাচার্য পদার্থসমূহের সাধর্ম্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন ঃ ''ষন্নামপি পদার্থানামস্তিত্বাভিধেয়ত্বজ্ঞেয়ত্বানি''। অর্থাৎ অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব হল ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য। গ্রন্থকার প্রথমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় বৈশেষিক সম্মত এই ছয়টি ভাব পদার্থের সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব এই ধর্মত্রয় দ্রব্যাদি ষট্

পদার্থে সমান ভাবে বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষা পরিচ্ছেদ গ্রন্থে এই ধর্মত্রয়কে সপ্তপদার্থের সাধর্ম্যরূপে বর্ণনা করেছেন। (সপ্তানামপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে)। ষট্পদার্থের কোন সাধর্ম্যের কথা তিনি বলেননি। সপ্তপদার্থের সার্ধর্ম্য উল্লেখ করার পরই তিনি দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্যের কথা বলেছেন। বস্তুতঃ এই ধর্মত্রয় ষট্ পদার্থের যেমন সাধর্ম্য হতে পারে তেমনি আবার সপ্তপদার্থেরও সাধর্ম্য হতে পারে। তবে ভাষ্যকার সুস্পষ্ট ভাষায় এই ধর্মত্রয়কে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য বলেই উল্লেখ করেছেন। এর কারণ হয়ত এই যে, প্রশস্তপাদ কেবল ষট্পদার্থেরই উদ্দেশ করেছেন, সপ্তপদার্থের উদ্দেশ করেননি। এর দ্বারা তিনি যে ষট্পদার্থের অতিরিক্ত সপ্তম পদার্থ অভাব স্বীকার করেননা-একথা যেমন বোঝায়না, তেমনি এই ষট্পদার্থের সাধর্ম্য যে সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারেনা একথাও বোঝায়না। বিশ্বনাথ যেহেতু সপ্ত পদার্থের উদ্দেশ করেছেন সেইহেতু তিনি জ্ঞেয়ত্বাদিকে সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলেই উল্লেখ করেছেন।

৪.০২.০১ অস্তিত্ব

সাধারণ ভাবে 'অস্তিত্ব' বলতে বোঝায় কোন কিছুর বিদ্যমানতা। দ্রব্যাদি ষট্পদার্থ ভাবরূপে বিদ্যমান। বৈশেষিক মতে কোন পদার্থই মনের কল্পনা বা অলীক নয়। তাই অস্তিত্বকে সহজেই ষট্পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল অস্তিত্বকে কেন কেবল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হল। বৈশেষিক মতে ষট্ভাব পদার্থ ছাড়াও অভাব একটি পৃথক পদার্থ। তাই শুধু ষট্পদার্থ নয়, অভাব সহ সপ্ত পদার্থেরই সাধর্ম্য হল অস্তিত্ব। এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, গ্রন্থকার কর্তৃক উল্লিখিত ষট্ভাবপদার্থই এখানে পদার্থ রূপে গৃহীত হয়েছে। অভাব পদার্থ-তালিকায় উল্লিখিত হয়নি। তাই অস্তিত্বকে দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হয়েছে। কিরণাবলীকার অস্তিত্বের ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করতে বলেছেন ''অস্তিত্বংবিধিমুখ প্রত্যয় বিষয়ত্বম''। অর্থাৎ বিধিমুখ (সদর্থক) প্রত্যয়ের বিষয়ত্বকে বলা হয় অস্তিত্ব। দ্রব্যাদি ষট্পদার্থকে আমরা ভাবরূপে জানতে পারি। সুতরাং ভাবত্ব প্রকারে জ্ঞান-বিষয়ত্বই হল অস্তিত্ব। এইরূপ ব্যাখ্যায় অস্তিত্ব যেমন দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থেরই সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হয় তেমনি আবার তা অভাব পদার্থের সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হয় না। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থই ভাবত্ব প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয় কিন্তু অভাব কখনো ভাবত্ব প্রকারে জ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং 'বিধিমুখ প্রত্যয় বিষয়ত্বম্' রূপে অস্তিত্বকে কেবল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা যায়।

ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট উক্ত ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন ''অস্তিত্বং স্বরূপবত্ত্বং ষন্নামপি সাধর্ম্যম্ ষস্য বস্তুনো যৎ স্বরূপং তদেব তস্যাস্তিত্বম্।'' অর্থাৎ পদার্থের স্বরূপবত্বই হল তার অস্তিত্ব এবং এই অস্তিত্ব দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের সাধর্ম্য। স্বরূপবত্ব হল স্বরূপ। যে বস্তুর যা স্বরূপ তাই তার অস্তিত্ব। জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর সুক্তিটীকায় অনুরূপ ভাবে স্বরূপসত্তাকে অস্তিত্ব বলেছেন। যে ধর্মটি একটি অধিকরণ ছাড়া দ্বিতীয় কোন অধিকরণে থাকেনা সেই ধর্মই হল তার স্বরূপসত্ব। দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের স্বরূপসত্ব হল ভাবত্ব। ভাবত্ব দ্রব্যাদি ষট্পদার্থে থাকে কিন্তু অভাবে থাকেনা। অতএব ভাবত্ব-স্বরূপসত্ব-অস্তিত্ব হল ছয়টি ভাব পদার্থের সাধর্ম্য। বর্ধমান উপাধ্যায় স্পষ্টতঃই অস্তিত্বের লক্ষণ করেছেন ভাবত্ব।

৪.০২.০২ অভিধেয়ত্ব

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের দ্বিতীয় সাধর্ম্য বলেছেন অভিধেয়ত্ব। 'অভিধেয়ত্ব' শব্দের অর্থ হল শব্দ উচ্চারণের দ্বারা পদার্থের নিরূপণযোগ্যতা। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধকে বলে অভিধা বা সংকেত। শব্দ ও অর্থের

মধ্যে এই অভিধা বা সংকেত থাকায় শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা অর্থকে নির্দেশ করি। শব্দ-উচ্চারণের মাধ্যমে অর্থ নির্দেশের যোগ্যতাকেই বলা হয় অভিধানযোগ্যতা বা অভিধেয়ত্ব। 'এই শব্দ থেকে এই অর্থের বোধ হোক্' এইরূপ ইচ্ছাই অভিধা বা সংকেত। এই ইচ্ছা কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের ইচ্ছা হলেও নিত্য ঈশ্বরেচ্ছা সর্বদাই বিদ্যমান। ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ অদ্যাবধি অজ্ঞাত বিষয়কেও অভিধেয় বলা যায়। অস্তিত্বের ন্যায় অভিধেয়ত্ব অভাবে থাকায় পুনরায় অভিধেয়ত্ব সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রেও আমাদের বক্তব্য হল ভাষ্যকার প্রদত্ত পদার্থ তালিকায় অভাবের উল্লেখ না থাকায় অভাবকে এখানে সপ্তম পদার্থরূপে বিবেচনা করা হয়নি। এই কারণে গ্রন্থকার অভিধেয়ত্বকে কেবল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের দ্বিতীয় সাধর্ম্য রূপেই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা, ভাষ্যকারের মতে দ্রব্যাদি ষট্পদার্থই শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে বোধব্য বা নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে দ্রব্যাদি ষট্পদার্থই অভিহিত হতে পারে বা অভিধান যোগ্য। সুতরাং অভিধেয়ত্ব হল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের সাধর্ম্য।

৪.০২.০৩ জ্ঞেয়ত্ব

ভাষ্যকার দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের তৃতীয় সাধর্ম্যরূপে জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের মতে জ্ঞেয়ত্ব হল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের তৃতীয় সাধর্ম্য। কিরণাবলীকার জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাবরূপ যে সম্বন্ধ তাকেই জ্ঞান যোগ্যতা বা জ্ঞেয়ত্ব বলেছেন। যা জ্ঞানের বিষয় তাই জ্ঞেয়। সুতরাং জ্ঞেয়ত্বের অপর অর্থ হল জ্ঞান-বিষয়ত্ব, ঈশ্বর যেহেতু সর্বজ্ঞ সেহেতু যা কিছু অস্তিত্বশীল তাই ঈশ্বরের জ্ঞেয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে যা জ্ঞেয় তাই অভিধেয়। জ্ঞেয়ত্ব যে সব পদার্থের সাধর্ম্য অভিধেয়ত্বও সে সব পদার্থের সাধর্ম্য হবে।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে প্রমেয়ত্ব ও বাচ্যাত্বকেও সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলে বর্ণনা করেছেন। প্রশস্তপাদ অবশ্য উপরিউক্ত তিনটি সাধর্ম্যকেই ষট্পদার্থের সাধর্ম্য বলেছেন।

ভাষ্যকার প্রমেয়ত্বকে এবং বাচ্যত্বকে যে পৃথক সাধর্ম্য বলে উল্লেখ করেননি তাতে কোন ক্ষতি নেই। যা প্রমেয় তা অবশ্যই জ্ঞানের বিষয়। আবার বাচ্যত্ব অভিধেয়ত্বে অন্তর্ভুক্ত। 'বাচ্যত্ব' বলতে বোঝায় বাচক শব্দের দ্বারা অভিধান যোগ্যতা। অভিধেয়ত্ব বলতেও শব্দের দ্বারা অভিধান যোগ্যতাকে বোঝান হয়। সুতরাং বাচ্যত্বকেও পৃথক সাধর্ম্য রূপে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৪.০৩.০০ নিত্যদ্রব্যভিন্ন যাবৎ পদার্থের সাধর্ম্য

''আশ্রিতত্বঞ্চ অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ।''

নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবৎ পদার্থের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলা হল **''আশ্রিতত্বঞ্চ অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ।''**

প্রশস্তপাদ ষট্পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণের পর নিত্যদ্রব্যভিন্ন অন্যান্য পদার্থের সাধর্ম্য রূপে আশ্রিতত্বের উল্লেখ করেছেন।

৪.০৩.০১ আশ্রিতত্ব

আশ্রিতত্ব হল নিত্যদ্রব্য ব্যতীত অপর সকল পদার্থেরই সাধর্ম্য। পার্থিব, জলীয়, জৈজস ও বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ মন ও আত্মা হল নিত্যদ্রব্য। এই নিত্যদ্রব্যগুলির কোথাও কোন আশ্রয় নেই। তাই এই নিত্যদ্রব্যগুলি কোথাও কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হয় না। এই নিত্যদ্রব্যগুলি ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ও গুণাদি পদার্থে অন্যান্য দ্রব্যাদি পদার্থে আশ্রিত হয়। যেমন পট্রব্য তন্তুতে আশ্রিত, এইরূপ ঘটে আশ্রিত ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে যে, এখানে 'আশ্রিত' বলতে স্বাভাবিক আধেয়তা বুঝতে হবে। বৈশেষিক মতে অন্যত্র অনাশ্রিত নিত্যদ্রব্যও কালে আশ্রিত হয়। কাল সর্বপদার্থের আশ্রয়। সুতরাং অনাশ্রিত নিত্যদ্রব্য বলে আদৌ কোন দ্রব্য থাকতে পারেনা। কিন্তু কালিক সম্বন্ধের আধেয়তা স্বাভাবিক আধেয়তা নয়। সংযোগ সম্বন্ধ ক্রিয়া-সাপেক্ষ এবং কালিক সম্বন্ধ কাল-সাপেক্ষ হওয়ায় সংযোগ বা কালিক সম্বন্ধের আধেয়তাকে স্বাভাবিক আধেয়তা বলা যায় না। বস্তুতঃ সমবায় সম্বন্ধে আধেয়তাই হল স্বাভাবিক আধেয়তা। কারণাধীন উৎপন্ন পদার্থ কারণে সমবেত হয়েই উৎপন্ন হয়। তাদের কারণাশ্রিতত্ব হল স্বাভাবিক। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থ নিজ নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত। আশ্রয় বিছিন্ন হয়ে কাল ছাড়া তারা অন্য কোন আশ্রয়ে থাকতে পারে না। এই পদার্থগুলির আধেয়তা তাই স্বাভাবিক। নিত্যদ্রব্যের এই স্বাভাবিক আধেয়তা নেই। কিরণাবলীকার একথা প্রকাশ করতে বলেছেন ''আশ্রিতত্বমাশ্রয়ত্ব স্বাভাবিকী''। ব্যোমশিবাচার্য বলেছেন, ''স্বাভাবিকী সমবায়সম্বন্ধবচ্ছিন্না''। সুতরাং দেখা যায় যে, আশ্রিতত্ব হল সমবায় সম্বন্ধে সমবেতত্ব। নিত্যদ্রব্যভিন্ন অন্যান্য পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে আধেয়ত্ব থাকায় আশ্রিতত্ব হল নিত্যদ্রব্যভিন্ন যাবতীয় পদার্থের সাধর্ম্য।

সমবায় পদার্থ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে সংবদ্ধ হয় না। সুতরাং আপত্তি উঠতে পারে যে, আশ্রিত বলতে যদি সমবায় সম্বন্ধে আধেয়ত্ব বোঝান হয় তাহলে তা সমবায় পদার্থে প্রযোজ্য হয় কিভাবে ? এর উত্তরে বৈশেষিকাচার্যগণের বক্তব্য হল যদিও সমবায় অপর কোন সমবায় সম্বন্ধে কোথাও সংবদ্ধ হয় না তথাপি তা স্বাত্মকসমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। এরূপ সম্বন্ধকেই স্বরূপ বলা হয়। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে আধেয়ত্ব সমবায় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে আশ্রিতত্বকে নিত্যদ্রব্যভিন্ন পদার্থ সমূহের সাধর্ম্য বলা যেতে পারে।

বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন উক্ত অসুবিধার ভিন্নতর সমাধান উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে সমবায়াদি সম্বন্ধে বৃত্তিত্বই হল আশ্রিতত্ব (আশ্রিতত্বং তু সমবায়াদি সম্বন্ধেন বৃত্তিমত্বম্)। সমবায়ে যাতে অব্যাপ্তি না হয়, তার জন্যই তিনি 'আদি' শব্দ 'সমবায়' এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন ('সমবায়াদি')। অভিপ্রায় এই যে, সমবায় দ্রব্যাদিতে আশ্রিত হয় বলেই দ্রব্যাশ্রিত গুণাদির যে সমবায় সম্বন্ধ তা দ্রব্যে আশ্রিত হয়। গুণ বা দ্রব্যের মধ্যে গুণ-গুণিভাব প্রতীত হয়। সম্বন্ধ অনুযোগীতে আশ্রিত হয়েই আশ্রয়-আশ্রয়িভাব উপপন্ন করে। তাই আশ্রয়-আশ্রয়িভাবের সম্বন্ধ প্রধানতঃ সমবায় হলেও সর্বদা সমবায় হয় না। সমবায়ের ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ হল স্বরূপ সম্বন্ধ। দিনকর ভট্ট মুক্তাবলীর ব্যাখ্যায় 'সমবায়াদি' শব্দের অর্থ করেছেন সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ও স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা। এই স্বরূপ সর্বপদার্থের আধাররূপ কালিক সম্বন্ধের অতিরিক্ত হওয়ায় তা নিত্যদ্রব্যে প্রযোজ্য হতে পারেনা। অতএব সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আশ্রিতত্বই হল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবৎ পদার্থের সাধর্ম্য।

৪.০৪.০০ দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য

''দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানাং সমবায়িত্বমনেকত্বঞ্চ''

দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থকার বলেছেন ''দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানাংসমবায়িত্বং অনেকত্বংচ''।

প্রশস্তপাদ ষ্ট পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণের পর নিত্যদ্রব্যভিন্ন ষ্ট পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণ করেছেন। এক্ষণে তিনি দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণ করতে বলেছেন **''দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানাং সমবায়িত্বমনেকত্বঞ্চ''**। অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য হল সমবায়িত্ব ও অনেকত্ব। স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, সমবায়িত্ব ও অনেকত্ব সমবায় পদার্থের ধর্ম নয়। বরং এদুটি সমবায় পদার্থের বৈধর্ম্য।

৪.০৪.০১ সমবায়িত্ব

প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের যে দুটি সাধর্ম্যের উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটি হল সমবায়িত্ব। সাধারণভাবে 'সমবায়িত্ব' বলতে বোঝায় সমবায়ের আশ্রয়ত্ব। কখনো কখনো সমবেতত্বকেও সমবায়িত্ব বলা হয়। বিষয়টিকে আরো একটু সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন। সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধ। সম্বন্ধ মাত্রেরই অনুযোগী-প্রতিযোগী ভাব বর্তমান। সম্বন্ধ যে সম্বন্ধীকে আশ্রয় করে থাকে তাকে সম্বন্ধের অনুযোগী বলে। সম্বন্ধের যে সম্বন্ধী অপরসম্বন্ধীতে আশ্রিত থাকে তাকে সম্বন্ধের প্রতিযোগী বলে। কোন ভূতলে যখন একটি ঘট থাকে তখন তা সংযোগ সম্বন্ধে থাকে। ভূতল এখানে ঘট-সংযোগের অনুযোগী এবং ঘট তার প্রতিযোগী। অনুরূপভাবে, সমবায় যে আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ সমবায়ের যে সম্বন্ধী তার আশ্রয় তা তার অনুযোগী এবং যে সম্বন্ধী ঐ আশ্রয়ে সমবায়ের সঙ্গে আশ্রিত তা তার প্রতিযোগী। দ্রব্যে যখন গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তখন দ্রব্য সমবায়ের অনুযোগী এবং গুণ তার প্রতিযোগী হয়। অনুযোগীতে থাকে সমবায়ের আশ্রয়ত্ব ধর্ম আর প্রতিযোগীতে থাকে সমবেতত্ব ধর্ম।

এখন প্রশ্ন হল 'সমবায়িত্ব' বলতে সমবায়ের আশ্রয়ত্ব বা সমবেতত্বের মধ্যে কোন একটি ধর্মকে একান্তভাবে বোঝানো যায় কি ? 'সমবায়িত্ব' বলতে যদি সমবায়ের আশ্রয়ত্বকে বোঝানো হয়, তাহলে তা সামান্য ও বিশেষ পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারেনা কারণ সামান্য ও বিশেষ কখনই সমবায়ের অনুযোগী হয়না। সামান্য ও বিশেষ যদি কখনই সমবায়ের অনুযোগী না হয় তাহলে তারা কখনো সমবায়ের আশ্রয় হয়না এবং সমবায়ের আশ্রয়ত্ব তাদের থাকতে পারেনা। আবার 'সমবায়িত্ব' বলতে যদি সমবেতত্বকে বোঝানো হয় তাহলে তা নিত্যদ্রব্য (পরমাণু প্রভৃতি) প্রভৃতির সাধর্ম্য হতে পারে না। নিত্যদ্রব্য, আকাশ প্রভৃতি কখনো সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। তাই তাদের কোথাও সমবেতত্ব বা সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ার প্রশ্নই নেই। অনিত্য দ্রব্যপদার্থের ক্ষেত্রে অবয়বিদ্রব্য অবয়ব দ্রব্যে সমবেত হওয়ায় অবয়বদ্রব্য সমবায়ের অনুযোগী এবং অবয়বিদ্রব্য সমবায়ের প্রতিযোগী হয়। কিন্তু আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য কখনো সমবায়ের প্রতিযোগী হয়না। শব্দগুণ আকাশে সমবায় সম্বন্ধে থাকায় আকাশ সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী হলেও কখনো প্রতিযোগী হয়না কারণ আকাশ কখনো সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকে না।

উপরিউক্ত অসুবিধা পরিহারের জন্য বৈশেষিকাচার্যগণ কেবল সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকেই সমবায়িত্ব বলেছেন। সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বলতে বোঝায় সমবায়ের 'অনুযোগিত্ব প্রতিযোগিত্বান্যতরত্ব'। অর্থাৎ সমবায়িত্ব বলতে সমবায়ের অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্বের যে কোন একটিকে বুঝতে হবে। এই অর্থে সমবায়ের কেবল অনুযোগিত্বকে যেমন

সমবায়িত্ব বলা যায় তেমনি আবার কেবল প্রতিযোগিত্বকেও সমবায়িত্ব বলা যায়। নিত্যদ্রব্য, আকাশ প্রভৃতি যেসব পদার্থ কখনো সমবায়ের প্রতিযোগী হয়না কিন্তু অনুযোগী হতে পারে, সমবায়িত্ব তাদের সাধর্ম্য হতে পারে। আবার সামান্য ও বিশেষ প্রভৃতি যেসব পদার্থ কেবল সমবায়ের প্রতিযোগী হতে পারে, কিন্তু অনুযোগী হতে পারে না, সমবায়িত্ব তাদেরও সাধর্ম্য হতে পারে। কিন্তু সমবায় যেহেতু নিজের অনুযোগী বা প্রতিযোগী হতে পারেনা সেহেতু সমবায়িত্ব সাধর্ম্য হতে পারেনা। উদয়নাচার্য, শ্রীধরভট্ট, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি মনীষী অনুরূপভাবে সমবায়িত্বকে দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্যরূপে বর্ণনা করেছেন।

৪.০৪.০২ অনেকত্ব ঃ

ভাষ্যকার দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের দ্বিতীয় সাধর্ম্যরূপে অনেকত্বের উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ বহুসংখ্যক বিষয়কেই অনেক বলা হয়। কিন্তু এখানে অনেক শব্দটি সংখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। 'অনেক' বলতে এখানে স্বরূপভেদ বা স্বরূপতার ভেদকে বুঝতে হবে। ন্যায়কন্দলীকার বলেছেন, 'অনেকত্বং পরস্পরবিভিন্নত্বমিতরেতর ব্যাবৃত্তং স্বরূপমেব।'' অর্থাৎ 'অনেকত্ব' শব্দের অর্থ পরস্পর বিভিন্নত্ব। পারস্পরিক ভিন্ন বস্তুস্বরূপই অনেকত্ব। বৈশেষিক সম্মত ষ্টপদার্থই পরস্পর পরস্পর থেকে ভিন্ন। সুতরাং 'অনেক' শব্দের দ্বারা পদার্থের পারস্পরিক ভেদকে বোঝানো হলে সমবায়কেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। সমবায় দ্রব্যাদি থেকে ভিন্ন পদার্থ হওয়ায় পারস্পরিক ভেদত্ব সমবায়েরও আছে। কিন্তু অনেকত্বকে এখানে দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্যরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেকোন পঞ্চপদার্থের নয়।

'দ্রব্যাদি পঞ্চ' পদার্থ বলতে সমবায়কে বহির্ভুত করে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ পদার্থকেই বুঝতে হবে। সুতরাং 'অনেকত্ব' বলতে এখানে কিন্তু পারস্পরিক ভেদ নয়, সজাতীয় পদার্থসমূহের পারস্পরিক ভেদকে বুঝতে হবে। যে সকল পদার্থের বিভাগ আছে সেই সকল পদার্থেরই সজাতীয় পারস্পরিক ভেদ থাকতে পারে। এইরূপ ভেদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষে থাকতে পারে কিন্তু সমবায়ে থাকতে পারেনা। দ্রব্য পৃথিব্যাদি ভেদে নয় প্রকার, গুণ রূপাদি ভেদে চব্বিশ প্রকার, কর্ম উৎক্ষেপণাদি ভেদে পঞ্চপ্রকার, সামান্য পর-অপর ভেদে দুই প্রকার এবং বিশেষ অসংখ্য হওয়ায় দ্রব্যাদি এই পঞ্চপদার্থের সজাতীয় ভেদ বর্তমান। কিন্তু সমবায় এক হওয়ায় সমবায়ের সজাতীয় ভেদ সম্ভব নয়। এইভাবে অনেকত্বকে দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

৪.০৫.০০ গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য

''গুণাদীনাং পঞ্চানামপি নির্গুণত্বনিষ্ক্রিয়ত্বে''

এই ভাষ্যাংশে গ্রন্থকার প্রশস্তপাদ গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণ করেছেন। গুণাদি পঞ্চপদার্থ হল ঃ গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। এই পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য হল নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

৪.০৫.০১ নির্গুণত্ব ঃ

গুণাদি পঞ্চ পদার্থের প্রথম সাধর্ম্য হল নির্গুণত্ব। 'নির্গুণত্ব' পদের অর্থ হল গুণাভাববিশিষ্টত্ব। রূপ-রসাদি গুণ

একমাত্র দ্রব্যেই আশ্রিত হয়, গুণাদিতে আশ্রিত হয় না। পুষ্পে আশ্রিত গন্ধকে আমরা অনুভব করি কিন্তু ঐ গন্ধের কোন গন্ধকে আমরা অনুভব করিনা। আবার গন্ধের রূপাদি গুণকেও আমরা কেউ কখনো অনুভব করিনা। গুণের ন্যায় কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ও নির্গুণ পদার্থ। এই কারণে নির্গুণত্বকে গুণাদি অর্থাৎ গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয়েছে। 'নির্গুণত্ব' শব্দের অর্থ গুণের অত্যন্তাভাবত্ব। গুণের যেকোন প্রকার অভাবকে গুণাদি পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়না। অন্যোন্যাভাব অর্থে গুণাভাব দ্রব্যেও আছে। এই কারণে 'নির্গুণত্ব' বলতে গুণের অত্যন্তাভাবত্বকেই বুঝতে হবে। বৈশেষিক মতে দ্রব্য পদার্থ গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ। কারণ সর্বদা কার্যের অন্ততঃ ক্ষণকাল পূর্ববর্তী হয়। ঐ ক্ষণকালে দ্রব্য গুণবান বা ক্রিয়াবান হয়না। উৎপত্তিকালীন দ্রব্য হল নির্গুণও নিষ্ক্রিয়। এইজন্য নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব উৎপত্তিকালীন দ্রব্যেরও সাধর্ম্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বকে গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায় না।

উক্ত অসুবিধা দূর করার জন্য বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন ও জগদীশ তর্কালঙ্কার 'নির্গুণত্ব' শব্দের তাৎপর্যার্থ গ্রহণ করে 'গুণবদ্ অবৃত্তি ধর্মবত্ত্ব' কে নির্গুণত্ব বলেছেন। 'গুণবদ-অবৃত্তি ধর্মবত্ত্ব' বলতে বোঝায় গুণবৎ (দ্রব্যে) যে ধর্মের অবৃত্তি সেহটধর্মবত্ত্ব। ঘটত্বাদি বা দ্রব্যত্বাদি ধর্মের গুণবদ দ্রব্যে অবৃত্তি নেই, বৃত্তি আছে। গুণত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি ধর্ম দ্রব্যে না থাকায় গুণত্ব ও কর্মত্ব ধর্ম হল গুণবদ-অবৃত্তি ধর্ম। গুণত্ব ও কর্মত্ব ধর্ম থাকে যথাক্রমে গুণে ও কর্মে। গুণ ও কর্ম গুণবৎ বা কর্মবৎ না হওয়ায় গুণত্বাদি ধর্ম গুণবৎ বা কর্মবৎ পদার্থের (দ্রব্যের) ধর্ম হতে পারেনা। এই গুণত্বাদি ধর্ম গুণাদিতে থাকে বলে এবং দ্রব্যে থাকেনা বলে গুণত্বাদি ধর্ম গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু দ্রব্যের সাধর্ম্যরূপে গৃহীত হয় না।

৪.০৫.০২ নিষ্ক্রিয়ত্ব ঃ

'নির্গুণত্ব' বলতে যদিও গুণবদ-অবৃত্তি-ধর্মবত্ত্বকে বোঝানো যেতে পারে, 'নিষ্ক্রিয়ত্ব' বলতে কিন্তু কর্মবদ্-অবৃত্তি ধর্মবত্ত্ব কে বোঝানো যাবেনা। আকাশত্ব, কালত্ব প্রভৃতি ধর্মও কর্মবদ্-অবৃত্তি ধর্ম। আকাশত্ব, কালত্ব প্রভৃতি ধর্ম কোন কর্মবৎ দ্রব্যে থাকেনা। আকাশত্ব আকাশে থাকে কালত্ব কালে থাকে। আকাশ ও কাল ক্রিয়াশূন্য হওয়ায় আকাশত্ব ও কালত্ব কর্মবদ-অবৃত্তি-ধর্ম হয়ে পড়ে। কিন্তু আকাশত্ব বা কালত্ব কখনো গুণাদি পঞ্চ পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারেনা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার ও বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন নিষ্ক্রিয়ত্বের অর্থ করেছেন কর্মবদ্-অবৃত্তি ভাববিভাজকো জাতিমত্ব। ভাববিভাজক উপাধি হল দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব। এর মধ্যে দ্রব্যত্ব হল কর্মবদ্-বৃত্তি উপাধি, কর্মবদ্-অবৃত্তি উপাধি নয় কিন্তু গুণাদি অপর উপাধিগুলি কর্মবদ্-অবৃত্তি উপাধি। এই গুণত্বাদি জাতি বা উপাধি যথাক্রমে গুণাদিতে থাকায়, কর্মবদ্-অবৃত্তি-ভাব-বিভাজক-জাতিমত্বকে গুণাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়। অতএব গুণাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য হল নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

৪.০৬.০০ সারসংক্ষেপ

ইতিপূর্বে গ্রন্থকার দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় - এই ছয়টি ভাবপদার্থের নামোল্লেখ পূর্বক পরিচয় দিয়েছেন। এইরূপ পরিচয় দানকে বলে উদ্দেশ। এখন এই ছয়টি পদার্থের ধর্মসকলের আলোচনার সূত্রপাত করতে বললেন এতক্ষণ কেবল ধর্মী সকলেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে কিন্তু ধর্মসকলের পরিচয় দেওয়া হয়নি। এখন সেই ধর্মসকলের পরিচয় দেওয়া হবে। পদার্থের ধর্ম-ধর্মী ভেদ একপ্রকার তাত্ত্বিক ভেদ। বাস্তব জীবনে সাধারণতঃ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই জ্ঞানের বিষয় হয়। যাতে বা যে আশ্রয়ে কোন ধর্ম আশ্রিত হয় তাকে বলে ধর্মী। অপরদিকে যা কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হয় তা হল ঐ আশ্রয়ের ধর্ম। ধর্ম ধর্মীতেই আশ্রিত। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের জ্ঞান হতে পারে না। এই কারণে ধর্মের আলোচনার সূচনা করার পূর্বে গ্রন্থকার ধর্মীর উদ্দেশ করেছেন। এখন তিনি ধর্মের উদ্দেশ করতে ধর্মকে সাধর্ম্য ও বৈধম্য এইট দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সাধর্ম্য বলতে বোঝায় সমানধর্ম। যে ধর্ম একাধিক পদার্থে সমভাবে বর্তমান (সমান) তাই সাধর্ম্য। যে ধর্ম কোন এক পদার্থে থাকে কিন্তু অন্য পদার্থে থাকে না (বিষম) তাকে বলে বৈধর্ম্য। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের মাধ্যমে পদার্থসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।

গ্রন্থকার প্রথমে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় বৈশেষিক সম্মত এই ছয়টি ভাব পদার্থের সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব এই ধর্মত্রয় দ্রব্যাদি ষ্ট্পদার্থে সমান ভাবে বিদ্যমান। তাই অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব হল দ্রব্যাদি ষ্টপদার্থের সাধর্ম্য।

সাধারণ ভাবে 'অস্তিত্ব' বলতে বোঝায় কোন কিছুর বিদ্যমানতা। দ্রব্যাদি ষ্ট্পদার্থ ভাবরূপে বিদ্যমান।

কিরণাবলীকার অস্তিত্বের ভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ করতে বলেছেন বিধিমুখ (সদর্থক) প্রত্যয়ের বিষয়ত্বকে বলা হয় অস্তিত্ব। দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থকে আমরা ভাবরূপে জানতে পারি। সুতরাং ভাবত্ব প্রকারে জ্ঞান-বিষয়ত্বই হল অস্তিত্ব। এইরূপ ব্যাখ্যায় অস্তিত্ব যেমন দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থেরই সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হয় তেমনি আবার তা অভাব পদার্থের সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট উক্ত ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন পদার্থের স্বরূপবত্বই হল তার অস্তিত্ব এবং এই অস্তিত্ব দ্রব্যাদি ষ্ট্পদার্থের সাধর্ম্য। স্বরূপবত্ব হল স্বরূপ। যে বস্তুর যা স্বরূপ তাই তার অস্তিত্ব। জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁর সুক্তিটীকায় অনুরূপ ভাবে স্বরূপসত্তাকে অস্তিত্ব বলেছেন।

ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি ষ্ট্পদার্থের দ্বিতীয় সাধর্ম্য বলেছেন অভিধেয়ত্ব। 'অভিধেয়ত্ব' শব্দের অর্থ হল শব্দ উচ্চারণের দ্বারা পদার্থের নিরূপণযোগ্যতা। শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধকে বলে অভিধা বা সংকেত। শব্দ ও অর্থের মধ্যে এই অভিধা বা সংকেত থাকায় শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে আমরা অর্থকে নির্দেশ করি। শব্দ-উচ্চারণের মাধ্যমে অর্থ নির্দেশের যোগ্যতাকেই বলা হয় অভিধানযোগ্যতা বা অভিধেয়ত্ব।

ভাষ্যকার দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের তৃতীয় সাধর্ম্যরূপে জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকারের মতে জ্ঞেয়ত্ব হল দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের তৃতীয় সাধর্ম্য। কিরণাবলীকার জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপক ভাবরূপ যে সম্বন্ধ তাকেই জ্ঞান-যোগ্যতা বা জ্ঞেয়ত্ব বলেছেন। যা জ্ঞানের বিষয় তাহট জ্ঞেয়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে যা জ্ঞেয় তাই অভিধেয়। এথেকে বোঝা যায় যে, জ্ঞেয়ত্ব যে সব পদার্থের সাধর্ম্য অভিধেয়ত্বও সে সব পদার্থের সাধর্ম্য হবে।

প্রশস্তপাদ ষট্পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণের পর নিত্যদ্রব্যভিন্ন অন্যান্য পদার্থের সাধর্ম্য রূপে আশ্রিতত্বের উল্লেখ করেছেন। আশ্রিতত্ব হল নিত্যদ্রব্য ব্যতীত অপর সকল পদার্থের সাধর্ম্য। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ মন ও আত্মা হল নিত্যদ্রব্য। এই নিত্যদ্রব্যগুলির কোথাও কোন আশ্রয় নেই। তাই এই নিত্যদ্রব্যগুলি কোথাও কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হয় না। এ নিত্যদ্রব্যগুলি ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্য ও গুণাদি পদার্থ অন্যান্য দ্রব্যাদি পদার্থে আশ্রিত হয়। যেমন পট্টদ্রব্য তন্তুতে আশ্রিত, ঘটরূপ ঘটে আশ্রিত ইত্যাদি। এখানে 'আশ্রিত' বলতে স্বাভাবিক আধেয়তা বুঝতে হবে। বৈশেষিক মতে অন্যত্র অনাশ্রিত নিত্যদ্রব্যও কালে আশ্রিত হয়। কাল সর্বপদার্থের আশ্রয়। সুতরাং অনাশ্রিত নিত্যদ্রব্য বলে আদৌ কোন দ্রব্য থাকতে পারেনা। এই কারণে আশ্রিতত্ব বলতে স্বাভাবিক আধেয়তাকে বুঝতে হবে।

সমবায় সম্বন্ধে আধেয়তাই হল স্বাভাবিক আধেয়তা। কারণাধীন উৎপন্ন পদার্থ কারণে সমবেত হয়েই উৎপন্ন হয়। তাদের কারণাশ্রিতত্ব হল স্বাভাবিক। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থ নিজ নিজ আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত। আশ্রয় বিছিন্ন হয়ে কাল ছাড়া তারা অন্য কোন আশ্রয়ে থাকতে পারে না। এই পদার্থগুলির আধেয়তা তাই স্বাভাবিক। নিত্যদ্রব্যের এই স্বাভাবিক আধেয়তা নেই। যদিও সমবায় অপর কোন সমবায় সম্বন্ধে কোথাও সংবদ্ধ হয় না তথাপি তা স্বাত্মকসমবায় সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। এরূপ সম্বন্ধকে স্বরূপ বলা হয়।

প্রশস্তপাদ ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণের পর নিত্যদ্রব্যভিন্ন ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য নিরূপণ করেছেন। এক্ষণে তিনি দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য আলোচনা করছেন। দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য হল সমবায়িত্ব ও অনেকত্ব।

প্রশস্তপাদ দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের যে দুটি সাধর্ম্যের উল্লেখ করেছেন তার প্রথমটি হল সমবায়িত্ব। সাধারণভাবে 'সমবায়িত্ব' বলতে বোঝায় সমবায়ের আশ্রয়ত্ব। কখনো কখনো সমবেতত্বকেও সমবায়িত্ব বলা হয়। সমবায় যে আশ্রয়ে থাকে অর্থাৎ সমবায়ের যে সম্বন্ধী তার আশ্রয় তা তার অনুযোগী এবং যে সম্বন্ধী ঐ আশ্রয়ে সমবায়ের সঙ্গে আশ্রিত তা তার প্রতিযোগী। দ্রব্যে যখন গুণ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তখন দ্রব্য সমবায়ের অনুযোগী এবং গুণ তার প্রতিযোগী হয়। অনুযোগীতে থাকে সমবায়ের আশ্রয়ত্ব ধর্ম আর প্রতিযোগীতে থাকে সমবেতত্ব ধর্ম। সমবায়ের আশ্রয়ত্ব ও সমবেতত্ব উভয়ই সমবায়িত্ব।

এজন্য বৈশেষিকাচার্যগণ কেবল সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকেই সমবায়িত্ব বলেছেন। সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বলতে বোঝায় সমবায়ের 'অনুযোগিত্ব প্রতিযোগিত্বান্যতরত্ব'। অর্থাৎ সমবায়িত্ব বলতে সমবায়ের অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্বের যে কোন একটিকে বুঝতে হবে। এই অর্থে সমবায়ের কেবল অনুযোগিত্বকে যেমন সমবায়িত্ব বলা যায় তেমনি কেবল প্রতিযোগিত্বকেও সমবায়িত্ব বলা যায়।

আকাশ প্রভৃতি যেসব পদার্থ কখনো সমবায়ের প্রতিযোগী হয়না কিন্তু অনুযোগী হতে পারে, সমবায়িত্ব তাদের সাধর্ম্য হতে পারে। আবার সামান্য ও বিশেষ প্রভৃতি যেসব পদার্থ কেবল সমবায়ের প্রতিযোগী হতে পারে, কিন্তু অনুযোগী হতে পারে না সমবায়িত্ব তাদেরও সাধর্ম্য হতে পারে। কিন্তু সমবায় যেহেতু নিজের অনুযোগি বা প্রতিযোগী হতে পারেনা সেহেতু সমবায়িত্ব সমবায়ের সাধর্ম্য হতে পারেনা।

ভাষ্যকার দ্রব্যাদি পঞ্চপদার্থের দ্বিতীয় সাধর্ম্যরূপে অনেকত্বের উল্লেখ করেছেন। 'অনেকত্ব' শব্দের অর্থ পরস্পর বিভিন্নত্ব। পারস্পরিক ভিন্ন বস্তুস্বরূপত্বই অনেকত্ব।

'দ্রব্যাদি পঞ্চ' পদার্থ বলতে সমবায়কে বহির্ভুত করে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ পদার্থকেই বুঝতে

হবে। সুতরাং 'অনেকত্ব' বলতে এখানে কিন্তু পারস্পরিক ভেদ নয়, সজাতীয় পদার্থসমূহের পারস্পরিক ভেদকে বুঝতে হবে। যে সকল পদার্থের বিভাগ আছে সেই সকল পদার্থেরই সজাতীয় পারস্পরিক ভেদ থাকতে পারে। এইরূপ ভেদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষে থাকতে পারে কিন্তু সমবায়ে থাকতে পারেনা।

এরপর গ্রন্থাকার গুণাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য প্রকাশ করেছেন। গুণাদি পঞ্চ পদার্থের প্রথম সাধর্ম্য হল নির্গুণত্ব। 'নির্গুণত্ব' পদের অর্থ গুণাভাববিশিষ্টত্ব। রূপ-রসাদি গুণ একমাত্র দ্রব্যেই আশ্রিত হয়, গুণাদিতে আশ্রিত হয় না।

গুণের ন্যায় কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ও নির্গুণ পদার্থ। এইকারণে নির্গুণত্বকে গুণাদি অর্থাৎ গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয়েছে। 'নির্গুণত্ব' শব্দের অর্থ গুণের অত্যন্তাভাবত্ব। গুণের যেকোন প্রকার অভাবকে গুণাদি পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়না। অন্যোন্যাভাব, অর্থে গুণাভাব দ্রব্যেও আছে। এই কারণে 'নির্গুণত্ব' বলতে গুণের অত্যন্তাভাবত্বকেই বুঝতে হবে।

জগদীশ তর্কালঙ্কার ও বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন নিষ্ক্রিয়ত্বের অর্থ করেছেন কর্মবদ্-অবৃত্তি ভাববিভাজকো জাতিমত্ব। ভাববিভাজক জাতি ও উপাধি হল দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব। এই গুণত্বাদি জাতি বা উপাধি যথাক্রমে গুণাদিতে থাকায়, কর্মবদ্-অবৃত্তি ভাব বিভাজক জাতিমত্বকে গুণাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়। অতএব গুণাদি পঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য হল নির্গুণত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্ব।

৪.০৭.০০ কতিপয় শব্দ-পরিচিতি ঃ

(ক) **উদ্দেশ** - ভারতীয় দর্শনে বিষয়বস্তুর আলোচনায় তিন প্রকার উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। এহটতিন প্রকার উপদেশ হল ঃ উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা। পদার্থের নামমাত্র কথনকে বলে উদ্দেশ। নাম কথনকালে পদার্থের বিভাগও নির্দেশ করা হয়। তাহট পদার্থের বিভাগকে উদ্দেশের অন্তর্গত করা হয়।

(খ) **ধর্ম-ধর্মী** - পদার্থের ধর্ম-ধর্মী ভেদ একপ্রকার তাত্ত্বিক ভেদ। বাস্তব জীবনে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীহট সাধারণতঃ জ্ঞানের বিষয় হয়। যাতে বা যে আশ্রয়ে কোন ধর্ম আশ্রিত হয় তাকে বলা হয় ধর্মী। অপরদিকে যা কোন আশ্রয়ে আশ্রিত হয় তা হল ঐ আশ্রয়ের ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, রক্তঘটের ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হল ধর্ম এবং ঘট হল ঐ ধর্মের ধর্মী। বলাইবাহুল্য, পদার্থের ধর্ম-ধর্মী ভেদ আপেক্ষিক। যে পদার্থ কোন একটি পদার্থের ধর্ম তা আবার অন্য পদার্থের ধর্মীও হতে পারে। রক্ত ঘটের ক্ষেত্রে ঘট যেমন রক্তবর্ণের ধর্মী এবং রক্তবর্ণ তার ধর্ম তেমনি রক্তঘটবান পুরুষের ক্ষেত্রে রক্তঘট হল পুরুষের ধর্ম এবং পুরুষ হল তার ধর্মী। তাই বর্তমানে আলোচিত ধর্ম সমূহ পূর্বে আলোচিত ছয়টি ধর্মী সমূহের অতিরিক্ত কিছু নয়। ঐ ষট্পদার্থই পরস্পর পরস্পরের অপেক্ষায় কখনো বা ধর্ম হয় আবার কখনো বা ধর্মী হয়। তাই বলা যায় যে, পূর্বোক্ত ছয়টি ধর্মী পদার্থের উদ্দেশের সঙ্গেই তাদের ধর্মেরও উদ্দেশকথন পরোক্ষভাবে হয়ে গেছে। তবে কোন্ পদার্থের অপেক্ষায় কোন্ পদার্থ ধর্মী বা কোন্ পদার্থ তার ধর্ম তা বলা হয়নি। তাই ধর্মীর পর ধর্ম সমূহের পৃথক ভাবে উদ্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত।

(গ) **সাধর্ম্য** - সাধর্ম্য বলতে বোঝায় সমানধর্ম। 'সমানো ধর্মোমেষাং তে সধর্মানঃ তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যম্' এইরূপ

ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ধর্ম একাধিক পদার্থে সমভাবে বর্তমান তাই সাধর্ম্য। অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব হল ষট্পদার্থের সাধর্ম্য।

(ঘ) **বৈধর্ম্য** - বৈধর্ম্য হল সাধর্ম্যের বিপরীত। 'বিরুদ্ধঃ ধর্মো যেষাং তে বির্ধমানঃ তেষাং ভাবম্ বৈধর্ম্যম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে ধর্ম কোন এক পদার্থে থাকে কিন্তু অন্য পদার্থে থাকে না তাকে বলে বৈধর্ম্য। যেমন, গোত্ব মানুষের বৈধর্ম্য।

(ঙ) **বিধিমুখ** - 'বিধিমুখ' বলতে বোঝায় ভাবমুখ বা ভাবত্বপ্রকার। বিপরীতভাবে অভাবমুখকে বলা হয় নিষেধমুখ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এহট ছয়টি পদার্থ বৈশেষিকমতে ভাবপদার্থ। এই ছয়টি পদার্থেরই ভাবত্ব প্রকারে জ্ঞান হয়। এই কারণে এই ছয়টিপদার্থকে ভাবত্ব প্রকারক জ্ঞানের বিষয় বা বিধিমুখ প্রত্যয়ের বিষয় বলা হয়। অভাব পদার্থের জ্ঞান কিন্তু বিধিমুখে হয় না, নিষেধমুখে হয়।

(চ) **প্রত্যয়** - প্রশস্তপাদ বলেছেন ''বুদ্ধিরুপলবদ্ধির্জ্ঞানংপ্রত্যয়ইতি পর্যায়া'' অর্থাৎ বুদ্ধি, উপলব্ধি, জ্ঞান, প্রত্যয় এগুলি পর্যায় শব্দ। বৈশেষিকমতে যাকে জ্ঞান বলা হয় তাকেই বুদ্ধি, উপলব্ধি বা প্রত্যয় বলা হয়। এই জ্ঞান বা প্রত্যয় গুণ পদার্থ এবং তা আত্মদ্রব্যের বিশেষগুণ।

(ছ) **সংকেত** - বৈশেষিক দর্শনে অভিধাকে সংকেত, সময় প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। একটিপদ তার শক্তিবৃত্তির সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট পদার্থকে বোঝায়। পদনিষ্ট পদার্থকে বোঝানোর এই শক্তিকেই অভিধাশক্তি বা সংকেত বলা হয়।

(জ) **বাচ্যত্ব** - পদের দ্বারা বাচ্য পদার্থের ধর্মই হল বাচ্যত্ব। পদার্থ মাত্রই যেহেতু পদের দ্বারা বাচ্য বা পদের দ্বারা অভিধেয় সেহেতু বাচ্যত্বকে পদার্থ সমূহের সাধর্ম্য বলা হয়। একটিপদ যখন একটিপদার্থকে বোঝায় তখন পদটিকে বলা হয় বাচক এবং পদার্থটিকে বলা হয় বাচ্য। বাচ্য পদার্থের ধর্মই হল বাচ্যত্ব। বাচ্যত্ব ও অভিধেয়ত্ব সমার্থক।

(ঝ) **প্রমেয়ত্ব** - প্রমাণের দ্বারা যে বিষয়কে জানা যায় তাই হল প্রমেয়। অন্যভাবে বলা যায় প্রমার বিষয়ই প্রমেয়। প্রমেয় পদার্থের ধর্মকেই বলা হয় প্রমেয়ত্ব।

(ঞ) **অনুযোগী** - প্রতিযোগী - সম্বন্ধমাত্রেরই অনুযোগী-প্রতিযোগী ভাব বর্তমান। সম্বন্ধ যে সম্বন্ধীকে আশ্রয় করে থাকে তাকে বল অনুযোগী। এ সম্বন্ধের অপর সম্বন্ধীকে বলে প্রতিযোগী। অভাবের স্থলে যে অধিকরণ অভাববান তা হল অনুযোগী। অপরদিকে যার অভাব তাকে বলে প্রতিযোগী। যেমন ভূতলে ঘটাভাবের স্থলে ভূতল অনুযোগী এবং ঘটপ্রতিযোগী।

(ট) **সত্তা** - সৎ এর ধর্মকে বলে সত্তা। যা অস্তিত্বশীল তাই সৎ। তাই অস্তিত্বশীল পদার্থের ধর্মই হল সত্তা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনে সত্তা শব্দটি পরসামান্য বা জাতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পরসামান্য বা জাতি অর্থে সত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য। এই অর্থে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ সত্তা জাতিমান নয়।

(ঠ) **নিমিত্তকারণ** - যে কারণ কোন কার্যের সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ থেকে ভিন্ন তাহটনিমিত্তকারণ। পটকার্যের প্রতি তন্তু সমবায়িকারণ ও তন্তু সংযোগ অসমবায়িকারণ। কিন্তু এই দুই প্রকার কারণ ছাড়াও

পটকার্যের বহুবিধ করাণ আছে যথা, তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি। এই করাণগুলিকে পটকার্যের নিমিত্তকারণ বলা হয়। তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতিতে পট সমবায় বা স্বসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে থাকে না। ফলে এগুলি পটের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হয়না। অথচ তুরী, বেমা, তন্তুবায় প্রভৃতি যে পটের প্রতি কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ধরনের কারণকেই ন্যায় বৈশেষিক মতে নিমিত্তকারণ বলা হয়।

৪.০৮.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(a) What is *sādharmya* ? What is *vaidharmya* ? Explain the *sādharmya* of all *padārthas* other than eternal substances.

(b) Explain the *sādharmya-s* of the six catagories after *Praœastapāda* .

(c) State and explain the *sādharmya-s* of firs five categories (*davyādinām pañcānām*)

(d) Explain the following statement.
"*gunādinām pañcānāmapi nirguṇatva niskriyatve*"

(e) State and explain the *sādharmya-s* of first three categories (*dravyādinām trayānām*)

(f) Explain (i) *kāryatvānityatve kāraṇatāmeva*"
(ii) *kāraṇatvancayatra pārimaṇḍalyadibhyaḥ*"

(g) State and explain the sadharmya-s of three categories starting from *sāmānya* (*sāmānyādinām trayānām*)

(h) State and expain the *sādharmya-s* of nine substances starting from *pritivi* (*Prthivyādinām navānām*)

(i) Explain the *sādharmya-s* of substances other than *avayavidravya.*

৪.০৯.০০ সহায়ক পুস্তক

১. বৈশেষিক দর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮২৮ শকাব্দ।

২. বৈশেষিক দর্শনম্, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

৩. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (সুক্তি, সেতু ও ব্যোম্বতী টীকা সহ), গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪।

৪. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা।

৫. প্রশস্তপাদভাষ্য, পণ্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।

৬. প্রশস্তপাদভাষ্য, কালিপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত।

৭. বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৮. কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৯. ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ), পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।

১০. ভাষা পরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১. Vaiṣeśika Philosophy, Ui.

১২. Tarkasaṁgraha Dipikā on Tarkasaṁgraha - Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers.

একক ঃ ৫

সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-২

বিষয়সূচী

৫.০০.০০ - দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য

৫.০০.০১ - সত্তাসম্বন্ধ

৫.০০.০২ - সামান্যবিশেষবত্ব

৫.০০.০৩ - স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব

৫.০০.০৪ - ধর্মাধর্মকর্ত্তৃত্ব

৫.০১.০০ - কারণবন পদার্থের সাধর্ম্য

৫.০১.০১ - কার্যত্ব

৫.০১.০২ - অনিত্যত্ব

৫.০২.০০ - পারিমণ্ডল্যাদি ভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য

৫.০৩.০০ - নিত্যদ্রব্যভিন্ন অপর পদার্থের অন্যতম সাধর্ম্য

৫.০৪.০০ - সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য

৫.০৪.০১ - স্বাত্মসত্ত্ব

৫.০৪.০২ - বুদ্ধিলক্ষণত্ব

৫.০৪.০৩ - অকার্যত্ব

৫.০৪.০৪ - অকারণত্ব

৫.০৪.০৫ - অসামান্য বিশেষবত্ব

৫.০৪.০৬ - নিত্যত্ব

৫.০৪.০৭ - অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব

৫.০৫.০০ - পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য

৫.০৫.০১ - দ্রব্যত্বযোগ

৫.০৫.০২ - স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব

৫.০৫.০৩ - গুণবত্ত্ব

৫.০৫.০৪ - কার্যকারণবিরোধিত্ব

৫.০৫.০৫ অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্

৫.০৬.০০ - অবয়বিদ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সাধর্ম্য

৫.০৬.০১ - অনাশ্রিতত্ব

৫.০৬.০২ - নিত্যত্ব

৫.০৭.০০ - পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ষ্টপদার্থের সাধর্ম্য

৫.০৭.০১ - অনেকত্ব

৫.০৭.০২ - অপরজাতিমত্ত্ব

৫.০৮.০০ - পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য

৫.০৮.০১ - ক্রিয়াবত্ত্ব

৫.০৮.০২ - মূর্তত্ব

৫.০৮.০৩ - পরত্ব ও অপরত্ব

৫.০৮.০৪ - বেগবত্ত্ব

৫.০৯.০০ - আকাশাদি অমূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য

৫.০৯.০১ - সর্বগতত্ব

৫.০৯.০২ - পরমমহত্ত্ব

৫.০৯.০৩ - সর্বসংযোগিসমান দেশত্ব

৫.১০.০০ - পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য

৫.১০.০১ - ভূতত্ব

৫.১০.০২ - ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্ব

৫.১০.০৩ - বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি

৫.১১.০০ - সারসংক্ষেপ

৫.১২.০০ - কতিপয় শব্দ-পরিচিতি

৫.১৩.০০ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.১৪.০০ - সহায়ক পুস্তক

৫.০০.০০ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য

দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে প্রশস্তপাদ বলেছেন ''দ্রব্যাদীনাং ত্রয়ানামপি সত্তাসম্বন্ধঃ সামান্যবিশেষবত্ত্বং স্বসময়ার্থ শব্দাভিয়েত্বং ধর্মাধর্মকর্ত্তৃত্বঞ্চ।''

প্রশস্তপাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থের চারটি সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। এই চারটি সাধর্ম্য হল (১) সত্তাসম্বন্ধ, (২) সামান্য বিশেষবত্ব, (৩) স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব ও (৪) ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব।

৫.০০.০১ সত্তাসম্বন্ধ

শ্রীধর ভট্ট 'সত্তাসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ করেছেন সত্তার সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী হল সত্তা এবং অনুযোগী হল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম। দ্রব্য গুণ ও কর্মের প্রথম সাধর্ম্য হল এই সত্তাসম্বন্ধ। সত্তাসম্বন্ধ বলতে বুঝতে হবে সত্তা প্রতিযোগিক দ্রব্য, গুণ ও কর্ম অনুযোগিক সমবায় সম্বন্ধ। এইরূপ সম্বন্ধ কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকায় সত্তাসম্বন্ধ ঐ তিন পদার্থের সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হয়। একথা ঠিক যে, সামান্য সৎ, বিশেষ সৎ ও সমবায় সৎ এরূপে সামান্যাদিতে সত্তার জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বৈশেষিকমতে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থে জাতি স্বীকৃত নয়। তাই সামান্যাদিতে সত্তা জাতি স্বীকৃত হতে পারেনা। তাছাড়া সামান্য, বিশেষ ও সমবায়কে সৎ বলে আমাদের জ্ঞান হলেও সত্তা সমবায় সম্বন্ধে কখনো সামান্যে থাকেনা। বরং সামান্য সমবায় সম্বন্ধে ব্যক্তিতে থাকে। অনুরূপভাবে বিশেষও সমবায় সম্বন্ধে নিত্যদ্রব্যে থাকে। তাই সামান্য ও বিশেষ সমবায়ের প্রতিযোগী হলেও সমবায়ের অনুযোগি হয়না। আর সমবায় কখনো সমবায় সম্বন্ধে কোথাও থাকেনা। তাই সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সৎরূপে যে জ্ঞান বা ব্যবহার তা গৌণ। কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্মই যথার্থ অর্থে সত্তাবান বা সমবায় সম্বন্ধে সত্তার আশ্রয়। এই কারণে সত্তা সম্বন্ধকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০০.০২ সামান্যবিশেষবত্ব

দ্রব্য, গুণ ও কর্মের দ্বিতীয় সাধর্ম্য হল সামান্যবিশেষবত্ব। এখানে 'সামান্য' শব্দের অর্থ হল অনুবৃত্তির হেতুভূত ধর্ম এবং 'বিশেষ' শব্দের অর্থ হল ব্যাবৃত্তির হেতুভূত ধর্ম। 'সামান্যবিশেষ' এই যৌগিক শব্দেরঅর্থ হল সামান্যরূপ বিশেষ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব সামান্য, সকল দ্রব্যের সকল গুণের এবং সকল কর্মের অনুবৃত্তির হেতুভূত ধর্ম। আবার দ্রব্যত্ব, গুণ ও কর্ম থেকে দ্রব্যকে ব্যাবৃত্ত করে বলে দ্রব্যত্বধর্ম বিশেষও বটে। অনুরূপ ভাবে গুণত্ব ও কর্মত্ব ধর্মদ্বয়ও সামান্যবিশেষ ধর্ম। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে এই সামান্যবিশেষ ধর্ম বর্তমান থাকায় সামান্যবিশেষবত্ত্বকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০০.০৩ স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব

প্রশস্তপাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের তৃতীয় সাধর্ম্যরূপে স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বকে উল্লেখ করেছেন। 'সময়' শব্দের

অর্থ সংকেত। যার দ্বারা একটি শব্দ তার অর্থকে নির্দেশ করে তাকে সময় বা সংকেত বলা হয়। এই বৃত্তির অপর নাম 'অভিধা'। সংকেতের সাহায্যে শব্দ তার অর্থকে নির্দেশ করে বলে অর্থ হল অভিধেয়। সংকেতের সাহায্যে অর্থ অভিহিত হওয়ার সামর্থ্যকেই বলা হয় অভিধেয়ত্ব। এই অভিধেয়ত্বধর্ম অভিধেয় পদার্থের ধর্ম। আবার বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই হল অভিধেয় (জাতি ও আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি)। তাই শব্দাভিধেয়ত্ব হল দ্রব্য, গুণ ও কর্মের তৃতীয় সাধর্ম্য। এথেকে বোঝা যায় যে, বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্মই হল মুখ্য শব্দার্থ বা বাচ্যার্থ।

৫.০০.০৪ ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম-এই পদার্থত্রয়ের চতুর্থ সাধর্ম্য হল ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব। কেবল চেতন পদার্থই কর্তা হতে পারে, অচেতন পদার্থ কর্তা হয়না। বৈশেষিক মতে চেতনা আত্মার আগন্তুক গুণ। অতএব একমাত্র আত্মাই কোন কিছুর কর্তা হতে পারে। আত্মা বৈশেষিক সম্মত নবম দ্রব্য। সুতরাং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম পদার্থের মধ্যে মাত্র একবিধ দ্রব্যেরই, কর্তৃত্বধর্ম আছে, অন্য দ্রব্য বা অন্যান্য পদার্থের কর্তৃত্ব ধর্ম নেই। এমতাবস্থায় প্রশস্তপাদ কিভাবে ধর্মাধর্মকর্তৃত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলেছেন তা বোঝা যায় না। শ্রীধর ভট্ট, বর্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি টীকাকারগণ ব্যাখ্যান্তরের মাধ্যমে, এই সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের মতে এখানে 'কর্তৃত্ব' পদের অর্থ হল নিমিত্তকারণত্ব। আত্মা ভিন্ন দ্রব্য, গুণ ও কর্মের মধ্যে কোন কিছু কর্তা হতে না পারলেও তারা কর্মের নিমিত্ত কারণ হতে পারে। বস্তুতঃ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থই ধর্মাধর্মের নিমিত্তকারণ হয়। এই কারণেই ধর্মাধর্মকর্তৃত্বকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন উঠে ধর্ম ও অধর্ম কিভাবে একই সঙ্গে সম পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারে। বৈশেষিক মতে ধর্ম ও অধর্ম দুটি বিপরীত গুণ। ধর্ম থেকে হয় পুণ্য এবং অধর্ম থেকে হয় পাপ। ধর্ম কর্তৃত্ব ও অধর্মকর্তৃত্ব কখনো এক সঙ্গে থাকতে পারেনা। তাই ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব কোন পদার্থেরই ধর্ম হতে পারে না। এরূপ আপত্তির উত্তরে বৈশেষিকাচার্য্যগণের বক্তব্য এই যে, কোন পদার্থ একই কালে ধর্ম ও অধর্মের নিমিত্ত হতে না পারলেও কালভেদে ধর্মের ও অধর্মের নিমিত্ত হতে পারে। অর্থাৎ একটি পদার্থ কোন কালে ধর্মের নিমিত্ত হলেও ভিন্নকালে তা অধর্মের নিমিত্ত হতে পারে। এইভাবে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম কখনো ধর্মের আবার কখনো অধর্মের নিমিত্ত হওয়ায় ধর্মাধর্ম নিমিত্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যরূপে গৃহীত হতে পারে।

৫.০১.০০ কারণবান পদার্থের সাধর্ম্য

''কার্যত্বানিত্যত্বে কারণতামেব''

দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বর্ণনার পর গ্রন্থকার কারণবান পদার্থের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলেছেন ''কার্যত্বানিত্যত্বে কারণতামেব''।

গ্রন্থাকার কারণবান পদার্থের দুইটি সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। এই দুইটি সাধর্ম্য হল কার্যত্ব ও অনিত্যত্ব। উৎপন্ন

পদার্থমাত্রই কারণবান। কারণ ছাড়া কোন পদার্থ উৎপন্নই হতে পারে না। সুতরাং কারণবান পদার্থ বলতে উৎপন্ন পদার্থকেই বোঝানো হয়েছে। উৎপন্ন পদার্থকে বলা হয় কার্য। যা কারণ থেকে উৎপন্ন তাই কার্য। ন্যায়-বৈশেষিকমতে যা প্রাগভাব প্রতিযোগী তাই কার্য। কোন কিছু উৎপন্ন হবার পূর্বে তার প্রাগভাব বর্তমান থাকে। কার্য ঐ প্রাগভাবকে ধ্বংস করে উৎপন্ন হয়। যার অভাব কথিত হয় তাকে বলা হয় ঐ অভাবের প্রতিযোগী। ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল ঐ অভাবের প্রতিযোগী। উৎপত্তির পূর্ব পর্যন্ত ঘটের যে অভাব তাই ঘটের প্রাগভাব। ঘট যখন উৎপন্ন হয় তখন ঐ প্রাগভাবকে ধ্বংস করেই তা উৎপন্ন হয়। প্রাগভাব তাই কার্যের অন্যতম কারণ রূপে পরিগণিত হয়। এখন প্রশ্ন হল কার্য সমূহের সাধর্ম্য কি ? গ্রন্থকার এর উত্তরে বলেন কার্য বা কারণবান পদার্থের সাধর্ম্য দ্বিবিধ ঃ (১) কার্যত্ব ও (২) অনিত্যত্ব।

৫.০১.০১ কার্যত্ব

কার্যত্ব সকল কার্যের সাধারণ ধর্ম। কার্যের জাতিরূপে কার্যত্ব সকল কার্যে সমবেত বা সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। তাই কার্যত্ব হল সকল কার্যের সাধর্ম্য।

৫.০১.০২ অনিত্যত্ব

যা অনাদি এবং অনন্ত অর্থাৎ যার আদি নেই এবং অন্তও নেই তা হল নিত্য। যা নিত্য নয় তাই অনিত্য। বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বে দ্রব্যান্তর্গত, পরমাণুসমূহ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন, নিত্যগুণসমূহ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবান্তর্গত অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব নিত্যপদার্থ। অপরদিকে স্থূল পৃথিব্যাদি, অনিত্যগুণ ও কর্মসমূহ অনিত্য। কারণবান পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন কার্য। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই সাদি এবং অনিত্য। সুতরাং কারণবান পদার্থ সমূহের অন্যতম সাধর্ম্য হল অনিত্যত্ব।

ধ্বংসের প্রতিযোগী পদার্থকেও অনিত্য বলা হয়। যার ধ্বংস হয় তাই ঐ ধ্বংসের প্রতিযোগী। এই জন্য অনিত্যত্বকে ধ্বংস প্রতিযোগিত্বও বলা হয়। ধ্বংস নিজেও কারণবান হওয়ায় তা অনিত্য। কিন্তু ধ্বংসের ধ্বংসে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব নেই। এই কারণে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকে অনিত্য না বলে সত্তাবিশিষ্ট কারণবান পদার্থের ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকে অনিত্যত্ব বলাই শ্রেয়। ধ্বংস সত্তাবিশিষ্ট কারণবান না হওয়ায় তাতে অনিত্যত্বের অব্যাপ্তির আশংকা আর থাকে না। ধ্বংস কারণবান হলেও ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকৃত নয়। তাই সত্তাবান অনিত্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনপ্রকার কার্যপদার্থেরই সাধর্ম্য হল কার্যত্ব ও অনিত্যত্ব।

৫.০২.০০ পারিমণ্ডল্যাদি ভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য

''কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমণ্ডল্যাদিভ্যঃ''

পারিমণ্ডল্যাদি ভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থকার বলেছেন ''কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমণ্ডল্যাদিভ্যঃ''।

অণুপরিমাণাদি ভিন্ন যাবৎ পদার্থেরর সাধর্ম্য হল কারণত্ব। 'পারিমণ্ডল্য' শব্দের অর্থ পরমাণুর পরিমাণ। পরমাণুর পরিমাণ হল অণুপরিমাণ। পরমাণুর পরিমাণ যেমন অণুপরিমাণ তেমনি দ্ব্যণুকের পরিমাণও অণুপরিমাণ। বৈশেষিক মতে মনও অনুপরিমাণ। তাই 'পারিমণ্ডল্য' বলতে বোঝায় মন, পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ। কিরণাবলীকার বলেছেন 'আদি' শব্দের দ্বারা পরমাণু ও দ্ব্যণুক ছাড়াও বিভূপরিমাণ, অন্ত্য অবয়বীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ এবং দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিপৃথকত্ব, পরত্ব, অপরত্ব এবং বিনশ্যদবস্থ দ্রব্যে আশ্রিত সংযোগ, বিভাগ, বেগ, কর্ম ও অন্ত্যশব্দ এবং চরম সংস্কার ও জ্ঞান গৃহীত হয়। পরিমাণের প্রকৃতি হল সজাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণজনকত্ব। অর্থাৎ পরিমাণ সবসময় সেই জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের জনক। অণুপরিমাণ সব থেকে কম হওয়ায় তার থেকে উৎকৃষ্ট পরিমাণ (অণুতম) সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে বিভূ পরিমাণ সর্বব্যাপক হওয়া তার থেকে উৎকৃষ্ট পরিমাণ (ব্যাপকতম) পরিমাণ সম্ভব নয়। মন অণুপরিমাণ হওয়ায় মনও কোন পরিমাণের জনক হতে পারে না। আকাশ কাল, দিক্ ও আত্মার বিভূ পরিমাণও কোন পরিমাণের জনক হতে পারে না। এই কারণে কারণত্ব এই সব পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারে না। কারণত্বকে তাই পারিমণ্ডল্যাদি ভিন্ন পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয়েছে। পারিমণ্ডল্যাদি পদের এরূপ অর্থ গ্রহণ করা হলে পরোক্ষভাবে কারণত্বই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের (দ্রব্য, গুণ ও কর্ম) সাধর্ম্য বলে পরিগণিত হয়।

'কারণত্ব' বলতে কিরণাবলীকার জ্ঞাতৃধর্ম ভিন্ন নিমিত্ত কারণতাকেই বুঝিয়েছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ-দুঃখাদি হল জ্ঞাতৃধর্ম। ন্যায় বৈশেষিক মতে পদার্থমাত্রই জ্ঞেয় বা জ্ঞানের বিষয়। আবার জ্ঞানের বিষয়মাত্রই জ্ঞানের অন্যতম কারণ (নিমিত্তকারণ)। সুতরাং জ্ঞানকারণতা ভিন্ন অন্যকার্যের প্রতি কারণতাই এখানে বিবক্ষিত। সামান্যের জ্ঞান ন্যায়-বৈশেষিকমতে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের প্রতি নিমিত্ত কারণ রূপে স্বীকৃত। তাই সাধর্ম্যরূপে কথিত কারণত্বকে, কারণত্বমাত্র নয়, নিমিত্তকারণতাভিন্ন কারণত্ব বলেই বুঝতে হবে।

৫.০৩.০০ নিত্যদ্রব্যভিন্ন পদার্থের অন্যতম সাধর্ম্য -

''দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ''

নিত্যদ্রব্যভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে প্রশস্তপাদ বলেছেন ''দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ'' ইতিপূর্বে গ্রন্থকার আশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদিপদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলে বর্ণনা করেছেন। আশ্রিতত্বের মধ্যে দ্রব্যাশ্রিতত্ব অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং দ্রব্যাশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলায় পুনরুক্তির প্রসঙ্গ আসে। এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য কিরণাবলীকার দ্রব্যাশ্রিতত্বের অর্থ করেছেন দ্রব্যসমবায়ি কারণত্ব বা সমবায়িকারণবত্ব। সমবায়িকারণবত্ব দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থেই থাকে। সামান্যাদি নিত্যদ্রব্যের কারণ না থাকায় সমবায়িকারণবত্ব সাম্যানাদি নিত্য পদার্থের সাধর্ম্য হতে পারে না। এই জন্য সমবায়িকারণবত্বকে নিত্যদ্রব্যভিন্ন (অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ) পদার্থ সমূহের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০৪.০০ সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য

''সামান্যদীনাং ত্রয়ানাং স্বাত্মসত্ত্বং বুদ্ধিলক্ষণত্বমকার্যত্বমকারণত্বমসামান্যবিশেষবত্ত্বং নিত্যত্বমর্থশব্দানভিধেয়ত্বঞ্চ''

উক্ত ভাষ্যাংশে প্রশস্তপাদ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থের সাতটি সার্ধম্যের কথা বলেছেন। এই সাতটি সার্ধম্য হল ঃ

১। স্বাত্মসত্ব অর্থাৎ নিজ সত্তার অতিরিক্ত সত্তাসামান্যের অভাব,

২। বুদ্ধিলক্ষণত্ব অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থে কেবল বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ত্ব,

৩। অকার্যত্ব অর্থাৎ অনাদিত্ব,

৪। অকারণত্ব অর্থাৎ (সমবায়ি ও অসমবায়িকারণত্বের অভাব (সামান্য, বিশেষ ও সমবায় কোন কিছুর সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হয় না)।

৫। অসামান্যবিশেষবত্ব অর্থাৎ সামান্যবিশেষরূপ সামান্যের অভাব,

৬। নিত্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিতত্ব এবং

৭। অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব অর্থাৎ 'অর্থ' শব্দের দ্বারা অনভিধেয়ত্ব।

এখন এই সপ্ত সাধর্ম্যকে ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

৫.০৪.০১ স্বাত্মসত্ত্ব

'স্বাত্মসত্ত্ব' পদের অর্থ হল নিজ আত্মায় সত্ত্ব, অর্থাৎ সামান্যাদিসত্তারহিতত্ব। কিরণাবলীকার 'স্বাত্মসত্ত্বে'র অর্থ করেছেন সত্তা বিরহত্ব। 'সত্তা বিরহ' বলতে সত্তার অত্যন্তাভাব কে বুঝতে হবে, সুতরাং কিরণাবলীকারের মতে সত্তারূপ পর সামান্যের অত্যান্তাভাব হল সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম। এখন প্রশ্ন হল, অপর সামান্য উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হতে পারে কিনা ? এর উত্তরে বলা যায় যে, পর সামান্য বা অপর সামান্য যে কোন প্রকার সামান্যের অত্যন্তাভাবই উক্ত পদার্থত্রয়ের সমান ধর্ম। বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে আরো সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে ''সামান্য পরিহীনাস্ত সর্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ'' অর্থাৎ সর্বপ্রকার জাতির সামান্যতঃ অভাবই হল সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য।

আচার্য প্রশস্তপাদ সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য রূপে যে স্বাত্মসত্ত্বের উল্লেখ করেছেন তার সরল অর্থ হল সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থ জাতি সামান্যের অনধিকরণ। অর্থাৎ সামান্য বিশেষ ও সমবায় পদার্থে জাতি সামান্য থাকতে পারে না। কিরণাবলীকার যে, জাতির বাধকগুলি উল্লেখ করেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, অনবস্থাবশতঃ সামান্য পদার্থের সামান্য হয় না, রূপহানিবশতঃ বিশেষ পদার্থের সামান্য হয় না, আবার অসম্বন্ধবশতঃ সমবায় পদার্থের সামান্য হয় না। সুতরাং এই তিনটি পদার্থই সামান্যহীন, তাদের নিজসত্তাই একামাত্র সত্তা।

৫.০৪.০২ বুদ্ধিলক্ষণত্ব

'বুদ্ধিলক্ষণত্ব' পদের অর্থ হল বুদ্ধি মাত্রই যাদের লক্ষণ অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের বুদ্ধিই হল লক্ষণ বা প্রমাণ। এর ব্যাখ্যায় কিরণবলীকার বলেছেন দ্রব্যাদি পদার্থগুলির ক্ষেত্রে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ হতে পারে। কিন্তু সামান্যাদি পদার্থত্রয় কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই প্রমাণিত হতে পারে। অনুবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা সামান্য, ব্যাবৃত্তি বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ এবং ইহ প্রত্যয়ের দ্বারা সমবায় প্রমাণিত হয়। প্রকাশকার বর্ধমান উপাধ্যায় আরো স্পষ্টতঃ বলেছেন যে

বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলতে অনুগত বুদ্ধি, ব্যবৃত্তিবুদ্ধি ও অযুতসিদ্ধসম্বন্ধবুদ্ধি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির অন্যতমত্বকে (যে কোন একটিকে) বুঝতে হবে।

৫.০৪.০৩ অকার্যত্ব

'অকার্যত্ব' পদের অর্থ অনাদিত্ব। অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় কোন কারণের দ্বারা উৎপন্ন কার্য নয়। যদি সামান্যকে কার্য বলা হয় তাহলে তার সমবায়ীকরণ কি হতে পারে ? প্রথমত ব্যক্তি তার সমবায়ী কারণ হতে পারে না। ব্যক্তি যদি তার সমবায়ী কারণ হয় তাহলে ব্যক্তির উৎপত্তিতে সামান্যের উৎপত্তি এবং ব্যক্তির বিনাশে সামান্যের বিনাশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। এই কারণে সামান্যকে অনাদি বলতে হয়। অনুরূপ ভাবে বিশেষকেও অনাদি বলতে হয়। বিশেষকে অনাদি না বললে বিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে বিশেষের উৎপত্তির পূর্বে পরমাণু সমূহের ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ, বিশেষই পরমাণু সমূহের ভেদবুদ্ধির জনক। সমবায় পদার্থও অনাদি। সমবায় পদার্থ কোন আশ্রয়েই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব সমবায় সম্বন্ধের কোন সমবায়ী কারণ থাকতে পারে না। সমবায়ী কারণ ব্যতিরেকে সমবায়ের উৎপত্তি স্বীকার করলে কার্যকারণ সম্বন্ধকেই অস্বীকার করতে হয়। আবার সমবায়ের কখনো বিনাশ দেখা যায় না। অবিনাশী ভাব পদার্থ অনাদিই হয়। অতএব স্বীকার করতে হয় যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় অকার্য।

৫.০৪.০৪ অকারণত্ব

অকারণত্ব বলতে সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্বের অভাবকে বোঝান হয়েছে। সামান্য বিশেষ, বা সমবায় কোন কার্যের সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হয় না। কিন্তু সামান্যাদি পদার্থ নিমিত্তকারণ হতে পারে। সামান্য অনুগতপ্রতীতির জনক হয়, বিশেষ ব্যাবৃত্তি প্রতীতির জনক হয় এবং সমবায় হই-প্রতীতির জনক হয়। কিন্তু সামান্য, বিশেষ বা সমবায় কোন পদার্থের সমবায়ী কারণ বা অসমবায়ী কারণ হয় না। ব্যোমবতীকার বলেছেন সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এতদুভয়ের অন্যতরাভাবত্বই উক্ত পদার্থত্রয়ের সার্ধর্ম্য। বস্তুতঃ অন্যতরাভাবত্ব বলতে এখানে সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এই উভয় প্রকার কারণত্বের অভাবকেই বোঝান হয়। দ্রব্যে অসমবায়িকারণত্বের ও গুণে সমবায়িকারণত্বের অভাব থাকলেও দ্রব্যে বা গুণে উভয়াভাব থাকে না। কিন্তু সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে উভায়াভাব থাকায় অকারণত্ব এই তিন পদার্থের সাধর্ম্য হয়।

৫.০৪.০৫ অসামান্যবিশেষবত্ব

অসামান্যবিশেষবত্ব বলতে বোঝায় সামান্য রহিতত্ব। এখন প্রশ্ন হল ইতিপূর্বেই প্রশস্তপাদ 'স্বাত্ম' শব্দের দ্বারা উক্ত পদার্থত্রয়ের সামান্যের অভাব প্রতিপাদন করেছেন। পুনরায় কেন তিনি এই সাধর্ম্যের উল্লেখ করলেন তা বোঝা যায় না। তবে সামান্যাদিতে যে অনুগতজ্ঞান হয় সেই অনুগত জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার জন্যই হয়ত ভাষ্যকার এই সাধর্ম্যের উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সামান্যের একই রূপ জ্ঞান হয়। বিভিন্ন বিশেষ গুলিতেও একই রূপ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান কিভাবে হয় তা জানা দরকার। গ্রন্থকারের মতে দ্রব্যাদিতে যেমন সামান্যের দ্বারা অনুগত জ্ঞান হয় সামান্যাদিতে সেরূপ

সামান্যের জন্য অনুগত জ্ঞান হয় না। সামান্যবিশেষ বলতে সাধারণত অপর সমান্যকে বোঝান হয়। সামান্যদিতে যদি অপর একটি সামান্য স্বীকার করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ হবে। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব উপাধির দ্বারাই সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের অনুগত জ্ঞান হয়। কিন্তু এই পদার্থত্রয় পর বা অপর সকল প্রকার সামান্য বর্জিত।

৫.০৪.০৬ নিত্যত্ব

'নিত্যত্ব' বলতে অনন্তত্বকে বোঝান হয়েছে। সাধারণত নিত্যত্ব বলতে অনাদিত্ব ও অনন্তত্বকে বোঝান হয়। অকার্যত্ব সাধর্ম্যের দ্বারা গ্রন্থকার ইতিপূর্বেই সামান্যাদিপদার্থত্রয়ের অনাদিত্ব সাধর্ম্যের কথা বলেছেন, তাই এখানে নিত্যত্ব বলতে কেবল অনন্তত্বকেই বোঝান হয়েছে। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থের কোনটির বিনাশ হয় না। এই তিন পদার্থ যে অনাদি তা পূর্বে প্রতিপাদিত হওয়ায় অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব এই পদার্থত্রয়ের সার্ধম্য বলে প্রতিপাদিত হয়।

৫.০৪.০৭ অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব

'অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব' বলতে বোঝায় 'অর্থ' শব্দের দ্বারা অনভিধেয়ত্ব। যা 'অর্থ' শব্দের দ্বারা বোঝান যায় না, তাকেই 'অর্থ' শব্দের অনভিধেয় বলা হয়। বৈশেষিক দর্শনে দ্রব্য, গুণ ও কর্মকেই 'অর্থ' শব্দের দ্বারা বোঝান হয় অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মেই 'অর্থ' শব্দের অভিধা বা সঙ্কেত স্বীকৃত। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থ 'অর্থ' শব্দের অনভিধেয়। এই কারণে অর্থশব্দানভিধেয়ত্বকে এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

উপরিউক্ত সাতটি সাধর্ম্যের সমুচ্চয়কে বোঝানোর জন্য ভাষ্যে 'চ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব সামান্য, বিশেষ ও সমবায় পদার্থের উপরিউক্ত সপ্ত সাধর্ম্যই বৈশেষিক সম্মত।

৫.০৫.০০ পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য

''পৃথিব্যাদীনাং নবানামপি দ্রব্যত্বযোগঃ স্বাত্মন্যারম্ভকত্বং গুণবত্ত্বং কার্যকারণাবিরোধিত্বমন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্''

পদার্থসমূহের সাধর্ম্য আলোচনার পর প্রশস্তপাদ পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য আলোচনা করেছেন। পৃথিব্যাদি নবদ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থকার বলেছেন ঃ

''পৃথিব্যাদীনাং নবানামপি দ্রব্যত্বযোগঃ স্বাত্মন্যারম্ভকত্বং গুণবত্ত্বং কার্যকারণাবিরোধিত্বমন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্''। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্বযোগ স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব, গুণবত্ত্ব, কার্যকারণাবিরোধিত্ব অন্ত্যবিশেষবত্ত্ব এই পাঁচটি সাধর্ম্য।

৫.০৫.০১ দ্রব্যত্বযোগ

দ্রব্যত্বযোগ হল দ্রব্যত্বসমবায়। দ্রব্যত্বপ্রতিযোগিক সমবায় সকল দ্রব্যেই থাকে। দ্রব্য অনুযোগিক, দ্রব্যত্ব প্রতিযোগিক

সমবায় বলতে বোঝায় দ্রব্যে সমবেত দ্রব্যত্ব। অন্যভাবে বলা যায় দ্রব্যত্ব সকলদ্রব্যের প্রথম সাধর্ম্য। দ্রব্যত্ব দ্রব্যপদার্থের জাতি বা সাধারণধর্ম। জাতি ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এই কারণে দ্রব্যত্বযোগ বা দ্রব্যত্ব সমবায় নবদ্রব্যেরই সাধারণ ধর্মরূপে গৃহীত হয়।

৫.০৫.০২ স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব

নয়টিদ্রব্যের দ্বিতীয় সাধর্ম্য হল স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব। স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব বলতে বোঝায় নিজস্বরূপে আরম্ভকত্ব। দ্রব্য কার্যমাত্রেরই আরম্ভক বা উৎপাদক। দ্রব্যে তাই কার্যারম্ভকত্ব বর্তমান। দ্রব্য, গুণাদির সমবায়িকারণ। কার্যারম্ভকত্ব বলতে তাই গুণাদির সমবায়িকারণত্বকেই বোঝান হয়। এই সমবায়িকারণত্বই বস্তুতঃ পক্ষে নবদ্রব্যের দ্বিতীয় সাধর্ম্য। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় আরম্ভবাদী। ন্যায়-বৈশেষিকমতে পরমাণু থেকে ভিন্ন দ্ব্যণুকাদি অবয়বী কার্য অবয়ব পরমাণুতে উৎপন্ন হয়। অবয়ব দ্রব্য, অবয়বিদ্রব্য, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন সর্বত্র গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ হওয়ায় সকল দ্রব্যেই স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব বা সমবায়িকারণত্ব বর্তমান। সুতরাং স্বাত্মন্যারম্ভকত্বকে সকল দ্রব্যেরই সাধর্ম্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫.০৫.০৩ গুণবত্ত্ব

গুণবত্ত্ব হল সকল দ্রব্যের তৃতীয় সাধর্ম্য। গুণবত্ত্ব বলতে বোঝায় গুণপ্রতিযোগিক সমবায়ত্ব। গুণ-প্রতিযোগিক সমবায় সকল দ্রব্যেই থাকে বলে গুণবত্ত্বকে দ্রব্যসমূহের সাধর্ম্য বলা হয়েছে। যদিও উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে কোন গুণ উৎপন্ন হয়না বলে গুণপ্রতিযোগিক সমবায় উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে থাকে না তথাপি সেখানে গুণপ্রতিযোগিক সমবায়াধিকরণত্বের যোগ্যতা থাকে বলে গুণবত্ত্বকে সকল দ্রব্যেরই সাধর্ম্যরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.০৫.০৪ কার্যকারণবিরোধিত্ব

কার্যকারণাবিরোধিত্ব বলতে বোঝায় কার্য বা কারণের সঙ্গে অবিরোধ। দ্রব্য নিজ কার্যের দ্বারা বা নিজ করণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। গুণ ও কর্ম কখনো কার্যের দ্বারা আবার কখনো কারণের দ্বারা বিনষ্ট হয়। যেমন প্রথম উৎপন্ন শব্দ দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা বা অন্তিম শব্দ উপান্ত্য শব্দের দ্বারা বিনষ্ট হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যই তার কারণ বা কার্যের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। এই কারণে কার্যকারণাবিরোধিত্বকে দ্রব্যের চতুর্থ সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০৫.০৫ অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্

অন্তবিশেষ বলতে বোঝায় চরম ব্যাবর্তক। ন্যায়বৈশেষিকমতে বিশেষপদার্থ হল চরম ব্যাবর্তক। চরমব্যাবর্তক

তার ভেদজ্ঞানের জন্য অন্য ব্যাবর্তকের অপেক্ষা করে না। এই কারণে তাকে স্বতোব্যাবর্তকও বলা হয়। এইরূপ ব্যাবর্তক বা বিশেষ পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য। কেবলমাত্র বিশেষ বা ব্যাবর্তককে নব দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ রূপরসাদিগুণেও ব্যাবর্তকধর্ম বর্তমান। কিন্তু রূপরসাদি গুণে অন্ত্যব্যাবর্তক বা বিশেষ পদার্থ থাকে না। চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, মুক্ত আত্মা ও মুক্তমনে বিশেষ পদার্থ থাকে। এজন্য যেকোন ব্যাবর্তক ধর্মকে নবদ্রব্যের সাধর্ম্য না বলে অন্ত্যব্যাবর্তককে নবদ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০৬.০০ অবয়বিদ্রব্য ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের সাধর্ম্য

''অনাশ্রিতত্বনিত্যত্বে চান্যত্রাবয়বিদ্রব্যেভ্যঃ''

অবয়বিদ্রব্যভিন্ন সকল দ্রব্যেরই সাধর্ম্য হল অনাশ্রিততত্ব ও নিত্যত্ব। অবয়বিভিন্ন দ্রব্য হল নিরবয়ব দ্রব্য। পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা ও মন হল নিরবয়ব দ্রব্য। অনাশ্রিতত্ব ও নিত্যত্ব হল এই দ্রব্যগুলির সাধর্ম্য।

৫.০৬.০১ অনাশ্রিতত্ব

অনাশ্রিতত্ব বলতে বোঝায় কোথাও আশ্রিত না থাকা। একটিপদার্থ অন্য একটিপদার্থে কোন না কোন সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। এখন প্রশ্ন হল নিরবয়বদ্রব্যের অনাশ্রিতত্ব কোন্ সম্বন্ধে অনাশ্রিতত্ব ? ন্যায়-বৈশেষিক মতে সকল পদার্থই দেশে ও কালে আশ্রিত হয়। নিরবয়ব দ্রব্যও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং নিরবয়ব দ্রব্যের অনাশ্রিতত্ব যেকোন সম্বন্ধে অনাশ্রিতত্ব নয়, বিশেষ কোন সম্বন্ধেই অনাশ্রিতত্ব। যে সম্বন্ধে নিরবয়ব দ্রব্য অনাশ্রিত তা হল সমবায় সম্বন্ধ। পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইসব নিরবয়ব দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধে কোথাও আশ্রিত হয়না। তাই সমবায় সম্বন্ধে অনাশ্রিতত্ব হল এই সকল দ্রব্যের সাধর্ম্য।

৫.০৬.০২ নিত্যত্ব

নিরবয়ব দ্রব্যের অপর সাধর্ম্য হল নিত্যত্ব। 'নিত্যত্ব' শব্দের অর্থ হল উৎপত্তি ও বিনাশ রহিতত্ব। যার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই তাকেই নিত্য বলা হয়। পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই নিরবয়ব দ্রব্যগুলির অন্যতম সাধর্ম্য হল নিত্যত্ব। নিরবয়ব দ্রব্য ছাড়াও নিত্য গুণ, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নিত্য পদার্থ। তাই নিত্যত্ব কেবলমাত্র নিরবয়ব দ্রব্যেরই সাধর্ম্য একথা বলা যায়না। কিন্তু তাই বলে নিত্যত্ব নিরবয়ব দ্রব্যের সাধর্ম্য হতে পারেনা তা নয়। সকল নিরবয়ব দ্রব্যের সাধারণ ধর্মরূপে নিত্যত্ব নিরবয়ব দ্রব্যের যে সাধর্ম্য রূপে বিবেচিত হতে পারে তাতে কোন সংশয় থাকতে পারেনা। যা দ্রব্য ও দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য তা স্বভাবতঃই দ্রব্যপদার্থের সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

৫.০৭.০০ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ষ্টদ্রব্যের সাধর্ম্য

''পৃথিব্যুদকজ্বলন পবনাত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্ত্বে''

অতঃপর প্রশস্তপাদ পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলেছেন ''পৃথিব্যুদকজ্বলন পবনাত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্ত্বে'' অর্থাৎ উক্ত ছয়টি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল অনেকত্ব ও অপর জাতিমত্ত্ব।

৫.০৭.০১ অনেকত্ব

আকাশ এক, কাল এক এবং দিক্ সংখ্যায় এক। এই কারণে অনেকত্ব এই তিনটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হতে পারে না। ঐ তিন দ্রব্য ছাড়া বাকি দ্রব্যগুলি নানা হওয়ায় অনেকত্ব তাদের সাধর্ম্য। অনেকত্ব বলতে ঐ সকল দ্রব্যের বহুত্বকে বোঝান হয়।

৫.০৭.০২ অপরজাতিমত্ত্ব

উক্ত ছয়টি দ্রব্যের অপর সাধর্ম্য হল অপরজাতিমত্ত্ব। একমাত্র সত্তাই পরজাতি। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থে সত্তা জাতি থাকে। অপরদিকে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে থাকে অপরজাতি। পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজত্ব প্রভৃতি অপর জাতি। এই কারণে পৃথিবীত্বাদি জাতিমান পদার্থ হল অপর জাতিমান এবং তাদের সাধর্ম্য হল অপরজাতিমত্ত্ব।

৫.০৮.০০ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য

''ক্ষিতি জলজ্যোতিরনিলমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্তত্বপরত্বাপরত্ববেগবত্ত্বানি''

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন- এই পঞ্চ দ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন–

''ক্ষিতি জলজ্যোতিরনিলমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্তত্বপরত্বাপরত্ববেগবত্ত্বানি'' ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য হল ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগবত্ত্ব।

৫.০৮.০১ ক্রিয়াবত্ত্ব

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন- এই পঞ্চ দ্রব্যের প্রথম সাধর্ম্য হল ক্রিয়াবত্ত্ব। এখানে 'ক্রিয়া' শব্দের দ্বারা স্পন্দনকে বোঝান হয়েছে, ধাতু অর্থে যে কোন ক্রিয়াকে বোঝান হয়নি। বৈশেষিক সম্মত উৎক্ষেপণাদি কর্মই হল ক্রিয়া। সুতরাং উক্ত পঞ্চপ্রকার দ্রব্যের সাধর্ম্য হল কর্মবত্ত্ব।

৫.০৮.০২ মূর্তত্ব

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চপ্রকার দ্রব্যের অপর সাধর্ম্য হল মূর্তত্ব। মূর্তত্ব বলতে বোঝায় পরিছিন্ন, ইয়ত্তা বা সসীম পরিমাণযুক্ত। নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্মা, আকাশ, কাল ও দিক্ এই চারটি দ্রব্য মহৎ বা বিভু পরিমাণবিশিষ্ট। বাকি পাঁচটি দ্রব্য হল মূর্ত পরিমাণবিশিষ্ট। এই জন্য মূর্তত্বকে এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০৮.০৩ পরত্ব ও অপরত্ব

যদিও পরত্ব ও অপরত্ব দুটি পৃথক ধর্ম এবং সাধর্ম্য রূপে দুটি পৃথক সাধর্ম্য তথাপি এদুটি ধর্ম পরস্পর

সাপেক্ষ। একটির প্রতীতি, অপরটির প্রতীতি নির্ভর। এই জন্য পরত্ব ও অপরত্বকে পরত্বাপরত্ব ধর্ম বলা হয়। পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল পরত্বাপরত্ব। পরত্ব ও অপরত্ব জাতি না হওয়ায় একই অধিকরণে এই দুটি ধর্মই থাকতে পারে। পরত্বাপরত্ব কোন বিভূদ্রব্যে থাকতে পারে না। এই জন্য এই ধর্মদ্বয় মূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য। দূরত্ব, নিকটত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব, কণিষ্ঠত্ব প্রভৃতি ব্যবহারের কারণ হল এই পরত্ব ও অপরত্ব ধর্ম। আমরা যখন বলি বর্ধমান বোলপুরের নিকটে কিন্তু কলকাতা থেকে দূরে তখন একই বর্ধমানে দূরত্ব ও নিকটত্ব ধর্ম অবস্থান করে।

৫.০৮.০৪ বেগবত্ব

পৃথিব্যাদি উক্ত পঞ্চদ্রব্যের পঞ্চম সাধর্ম্য হল বেগবত্ব। বেগ বলতে সংস্কারের একটি বিভাগকে বোঝান হয়। সংস্কার তিন প্রকার। বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনাখ্য। বেগ নোদনাদির দ্বারা মূর্ত দ্রব্যে উৎপন্ন হয়। কর্মব্যতীত বেগ উৎপন্ন হয় না। এইজন্য আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে বেগ উৎপন্ন হয়না (কারণ তাদের ক্রিয়া নেই)। কেবলমাত্র মূর্তদ্রব্যেই বেগ উৎপন্ন হয় বলে বেগ পঞ্চমূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য।

৫.০৯.০০ আকাশাদি অমূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য

''আকাশকালদিগাত্মনাং পরমমহত্ত্বং সর্বসংযোগিসমানদেশত্বং চ''

পৃথিব্যাদি উক্ত পঞ্চমূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য আলোচনার পর প্রশস্তপাদ অমূর্তদ্রব্য আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলেছেন- ''আকাশকালদিগাত্মনাং পরমমহত্ত্বং সর্বসংযোগিসমানদেশত্বং চ''। অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সাধর্ম্য হল সর্বগতত্ব, পরমমহত্ব ও সর্বসংযোগিসমানদেশত্ব।

৫.০৯.০১ সর্বগতত্ব

'সর্বগতত্ব' বলতে বোঝায় পূর্বোক্ত সর্বদ্রব্যের সঙ্গে সম্বন্ধত্ব। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ বায়ু ও মনের সঙ্গে এই চারটি অমূর্ত দ্রব্যের সম্বন্ধ বর্তমান। তাই উক্ত পঞ্চদ্রব্যের সঙ্গে সম্বন্ধত্বকেই আকাশাদি চারটিদ্রব্যের প্রথম সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.০৯.০২ পরমমহত্ব

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার দ্বিতীয় সাধর্ম্য হল পরমমহত্ব। পরমমহত্ব বলতে বোঝায় পরিমাণের চরম উৎকর্ষ। যে পরিমাণএর ইয়ত্তা নেই বা যে পরিমাণ অন্য কোন পরিমাণ থেকে নিকৃষ্ট নয় তাকেই পরমমহৎ পরিমাণ বলা হয়। এই পরমমহত্বই হল আকাশাদি চতুর্দ্রব্যের দ্বিতীয় সাধর্ম্য।

৫.০৯.০৩ সর্বসংযোগিসমান দেশত্ব

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চারটি অমূর্ত দ্রব্যের সঙ্গে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ বর্তমান। সুতরাং পৃথিব্যাদি মূর্ত দ্রব্যের সঙ্গে আকাশাদি অমূর্ত দ্রব্যের সংযোগিত্বকে আকাশাদি অমূর্ত দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.১০.০০ পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য

''পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চানামপি ভূতত্বেন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বং বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি''

পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থাকার বলেছেন ''পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চানামপি ভূতত্বেন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বং বাহ্যৈকৈকোন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি''। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের সাধর্ম্য হল ইন্দ্রিয় - প্রকৃতিত্ব এবং বাহৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্ব।

৫.১০.০১ ভূতত্ব

ভূতত্ব বলতে বোঝায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্ব। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি বিশেষগুণ পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত দ্রব্যে থাকে এবং তারা চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ গুণ। এজন্য পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতপদার্থের সাধর্ম্য হল ভূতত্ব।

৫.১০.০২ ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্ব

উক্ত পঞ্চভূতের দ্বিতীয় সাধর্ম্য ইন্দ্রিয়-প্রকৃতিত্ব। ইন্দ্রিয়-প্রকৃতিত্ব মানে ইন্দ্রিয়োপাদানত্ব। পৃথিবীতে আছে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের উপাদান, রসে আছে রসনেন্দ্রিয়ের উপাদান, তেজে আছে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপাদান, বায়ুতে আছে ত্বগিন্দ্রিয়ের উপাদান, এবং আকাশে আছে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের উপাদান। সুতরাং ইন্দ্রিয়োপাদানত্ব বা ইন্দ্রিয়োপ্রকৃতিত্ব পৃথিব্যাদিপঞ্চপদার্থের সাধর্ম্য।

৫.১০.০৩ বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি হল বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণ। এই বিশেষগুণগুলির হটন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব নির্দিষ্ট। অর্থাৎ এই বিশেষগুণগুলি কোন একটি নির্দিষ্ট হটন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। রূপ কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য, রস কেবল রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। গন্ধ কেবল ঘ্রানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শ কেবল ত্বগেন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং শব্দ কেবল কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য। পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্য এক একটি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বিশেষগুণগুলির আশ্রয়। এই কারণে বাহ্য এক একটি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বকে পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হয়েছে।

৫.১১.০০ সারসংক্ষেপ

প্রশস্তপাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থের চারটি সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। এই চারটি সাধর্ম্য হল (১) সত্তাসম্বন্ধ, (২) সামান্য বিশেষবত্ত্ব, (৩) স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব ও (৪) ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব।

শ্রীধর ভট্ট 'সত্ত্বাসম্বন্ধ' শব্দের অর্থ করেছেন সত্তার সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে সমবায় সম্বন্ধের প্রতিযোগী হল

সত্তা তার অনুযোগী হল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম। সুতরাং সত্তাসম্বন্ধ বলতে বুঝতে হবে সত্তা প্রতিযোগিক সমবায় সম্বন্ধ অনুযোগিকত্ব। এইরূপ অনুযোগিকত্ব কেবলমাত্র দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকায় সত্তাসম্বন্ধ ঐ তিন পদার্থের সাধর্ম্য বলে বিবেচিত হয়।

দ্রব্য, গুণ ও কর্মের দ্বিতীয় সাধর্ম্য হল সামান্যবিশেষবত্ত্ব। এখানে 'সামান্য' শব্দের অর্থ হল অনুবৃত্তির হেতুভুত ধর্ম এবং 'বিশেষ' শব্দের অর্থ হল ব্যাবৃত্তির হেতুভুত ধর্ম।

প্রশস্তপাদ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের তৃতীয় সাধর্ম্যরূপে স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বকে উল্লেখ করেছেন।

সংকেতের সাহায্যে শব্দ তার অর্থকে নির্দেশ করে বলে অর্থ হল অভিধেয়। সংকেতের সাহায্যে অর্থ অভিহিত হবার সামর্থ্যকেই বলা হয় অভিধেয়ত্ব।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম-এই পদার্থত্রয়ের চতুর্থ সাধর্ম্য হল ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব। কেবল চেতন পদার্থই কর্তা হতে পারে, অচেতন পদার্থ কর্তা হয়না। বৈশেষিক মতে চেতনা আত্মার আগন্তুক গুণ। অতএব একমাত্র আত্মাই কোন কিছুর কর্তা হতে পারে।

গ্রন্থাকার কারণবান পদার্থের দুইটি সাধর্ম্য উল্লেখ করেছেন। এই দুইটি সাধর্ম্য হল কার্যত্ব ও অনিত্যত্ব। উৎপন্ন পদার্থমাত্রই কারণবান। কারণ ছাড়া কোন পদার্থ উৎপন্নই হতে পারে না। সুতরাং কারণবান পদার্থ বলতে উৎপন্ন পদার্থকেই বোঝানো হয়েছে। উৎপন্ন পদার্থকে বলা হয় কার্য। যা কারণ থেকে উৎপন্ন তাই কার্য।

পারিমণ্ডল্যাদি ভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থকার বলেছেন ''কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমণ্ডল্যাদিভ্যঃ''। নিত্যদ্রব্যভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে প্রশস্তপাদ বলেছেন ''দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ'' প্রশস্তপাদ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থের সাতটি সার্ধম্যের কথা বলেছেন। এই সাতটি সাধর্ম্য হল ঃ

১। স্বাত্মসত্ব অর্থাৎ নিজ সত্তার অতিরিক্ত সত্তাসামান্যের অভাব,

২। বুদ্ধিলক্ষণত্ব অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিন পদার্থে কেবল বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ত্ব,

৩। অকার্যত্ব অর্থাৎ অনাদিত্ব,

৪। অকারণত্ব অর্থাৎ (সামবায়ি ও অসমবায়িকারণত্বের অভাব (সামান্য, বিশেষ ও সমবায় কোন কিছুর ৭ সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ হয় না)।

৫। অসামান্যবিশেষবত্ত্ব অর্থাৎ সামান্যবিশেষরূপ সামান্যের অভাব,

৬। নিত্যত্ব অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ রহিতত্ব এবং

৭। অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব অর্থাৎ 'অর্থ' শব্দের দ্বারা অনভিধেয়ত্ব।

পদার্থসমূহের সাধর্ম্য আলোচনার পর প্রশস্তপাদ পৃথিব্যাদি নব দ্রব্যের সাধর্ম্য আলোচনা করেছেন। পৃথিব্যাদি নবদ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থকার বলেছেন ঃ

''পৃথিব্যাদীনাং নবানামপি দ্রব্যত্বযোগঃ স্বাত্মন্যারম্ভকত্বং গুণবত্ত্বং কার্যকারণাবিরোধিত্বমন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্''। অর্থাৎ

পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্বযোগ স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব, গুণবত্ব, কার্যকারণাবিরোধিত্ব অন্ত্যবিশেষবত্ব এই পাঁচটি সাধর্ম্য।

অবয়বিদ্রব্যভিন্ন সকল দ্রব্যেরই সাধর্ম্য হল অনাশ্রিততত্ব ও নিত্যত্ব। অবয়বিভিন্ন দ্রব্য হল নিরবয়ব দ্রব্য। পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ আত্মা ও মন হল নিরবয়ব দ্রব্য। অনাশ্রিতত্ব ও নিত্যত্ব হল এই দ্রব্যগুলির সাধর্ম্য।

অতঃপর প্রশস্তপাদ পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলেছেন ''পৃথিব্যুদকজ্বলন পবনাত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্ত্বে'' অর্থাৎ উক্ত ছয়টি দ্রব্যের সাধর্ম্য হল অনেকত্ব ও অপর জাতিমত্ত্ব।

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন- এই পঞ্চ দ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন–

''ক্ষিতি জলজ্যোতিরনিলমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্তত্বপরত্বাপরত্ববেগবত্বানি'' ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য হল ক্রিয়াবত্ব, মূর্তত্ব, পরত্ব, অপরত্ব এবং বেগবত্ব।

পৃথিব্যাদি উক্ত পঞ্চমূর্তদ্রব্যের সাধর্ম্য আলোচনার পর প্রশস্তপাদ অমূর্তদ্রব্য আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সাধর্ম্য প্রকাশ করতে বলেছেন- ''আকাশকালদিগাত্মনাং পরমমহত্ত্বং সর্বসংযোগিসমানদেশত্বং চ''। অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সাধর্ম্য হল সর্বগতত্ব, পরমমহত্ব ও সর্বসংযোগিসমানদেশত্ব।

পৃথিব্যাদি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্য প্রকাশ করতে গ্রন্থাকার বলেছেন ''পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চানামপি ভূতত্বেন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বং বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি''। অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও

আকাশের সাধর্ম্য হল ইন্দ্রিয় - প্রকৃতিত্ব এবং বাহৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্ব।

৫.১২.০০ কতিপয় শব্দ- পরিচিতি

সামান্য-বিশেষ - 'সামান্য-বিশেষ' বলতে বোঝায় সেই সামান্য যা একই সঙ্গে অনুবৃত্তিও ব্যাবৃত্তি প্রতীতির জনক হয়। দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব প্রভৃতি সামান্য হল সামান্য-বিশেষ। দ্রব্যত্ব সামান্য দ্রব্যকে গুণাদি থেকে ব্যাবৃত্ত করে এবং সকল দ্রব্যের অনুগত ব্যবহার সহাদন করে। কর্মত্ব ও গুণত্ব অনুরূপ ভাবে কর্ম ও গুণের একাধারে অনুগত ও ব্যবৃত্ত ব্যাবহার সহাদন করে। এই কারণে দ্রব্যত্বাদিকে সামান্য-বিশেষ বলা হয়।

অন্ত্যব্যাবর্তক - 'অন্ত্য' শব্দের অর্থ চরম বা অন্তিম। 'ব্যাবর্তক' শব্দের অর্থ ভেদক। সুতরাং অন্ত্যব্যাবর্তক হল চরম ব্যাবর্তক। ন্যায়-বৈশেষিক মতে বিশেষ পদার্থকে বলা হয় অন্ত্যব্যাবর্তক।

পারিমণ্ডল্য - 'পারিমণ্ডল্য' শব্দের অর্থ হল পরমাণুর পরিমাণ। পরমাণুর পরিমাণ হল অণুপরিমাণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে দ্ব্যাণুকের পরিমাণও অণুপরিমাণ। সুতরাং পরমাণু ও দ্ব্যণুকের পরিমাণ হল পারিমণ্ডল্য।

সময় - বৈশেষিক দর্শনে একটি পদের সঙ্গে তার অর্থের সম্বন্ধকে অভিধা, সংকেত বা সময় বলা হয়। শক্তির দ্বারা একটি পদ যে অর্থকে নির্দেশ করে সেই অর্থকে বলা হয় বাচ্যার্থ, অভিধেয়ার্থ বা সময়ার্থ।

ভূতত্ব - ভূতত্ব হল ভূত দ্রব্যের সাধর্ম্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ এই পাঁচটি হল ভূতদ্রব্য। এই পাঁচটিকে ভূতদ্রব্য বলা হয় তার কারণ এই পাঁচটি দ্রব্য বাহ্যেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষগুণবান। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটি হল বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণ। এই পাঁচটি গুণ যথাক্রমে তেজ, অপ্, ক্ষিতি, মরুৎ ও ব্যোমের বিশেষ গুণ। সুতরাং বলা যায় বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষ গুণবত্বই হল ভূতত্ব।

মূর্তত্ব - 'মূর্তত্ব' বলতে বোঝায় পরিচ্ছন্ন বা সসীম পরিমাণবত্ব। ন্যায়-বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও মন এই পাঁচটি দ্রব্য হল মূর্ত দ্রব্য। এই পাঁচটি দ্রব্য বিভুপরিমাণ বিশিষ্ট নয়, সসীম পরিমাণ বিশিষ্ট। এই জন্য এই পাঁচটি দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম হল মূর্তত্ব।

৫.১৩.০০ সম্ভাব্য প্রশ্ন ঃ

1. Explain the *sādharmya-s* of the first three *padārtha-s* (*dravya* etc.)
2. Explain the *sādharmya-s* of *padārtha-s* other than *parimandalya* etc.
3. Explain the following statements :
   a) *dravyāśritatvañ cānyatra nityadravyebhyaḥ*."
   b) *kāryatvanityatve kāraṇatāmeva*".
4. Explain the *sādharmya-s* of nine substances (*dravya*)
5. Explain the following statements :
   a) "*anāśritatvanityatve cānyatrāvayavidravyebhyaḥ*".
   b) *pṛthivyudakajvalanapavanātmamanasāmanekatvā parajāimatve*".
6. Clearly explain the *sādharmya-s* of the five *mūrtadravya-s*.
7. Explain the *sādharmya-s* of *amūrtadravya-s*.
8. Explain the *sādharmya-s* of the five *bhūtadravya-s*.

৪.০৯.০০ সহায়ক পুস্তক

১. বৈশেষিক দর্শনম্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৮২৮ শকাব্দ।

২. বৈশেষিক দর্শনম্, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

৩. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, (সুক্তি, সেতু ও ব্যোম্বতী টীকা সহ), গোপীনাথ কবিরাজ ও ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯২৪।

৪. প্রশস্তপাদভাষ্যম্, ঢুন্ডীরাজ শাস্ত্রী সম্পাদিত, চৌখাম্বা।

৫. প্রশস্তপাদভাষ্য, পণ্ডিত শ্যামাপদ মিশ্র সম্পাদিত, দামোদর আশ্রম।

৬. প্রশস্তপাদভাষ্য, কালিপদ তর্কাচার্য সম্পাদিত।

৭. বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মন্ডল, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৮. কিরণাবলী, শ্রী গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৯. ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ), পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত।

১০. ভাষা পরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী সহ) গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

১১. Vaiṣesika Philosophy, Ui.

১২. Tarkaśaṁgraha Dipikā on Tarkasaṁgraha - Gopinath Bhattacharya, Progressive Publishers.

দ্বিতীয় অর্ধ

ইমানুয়েল কান্ট : ক্রিটিক্ অফ পিত্তর রিজন

অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র খান

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম পাঠ (Unit-I)

Immanuel Kant – জীবনী ও রচনা

পাঠ সংকেত

১.১ Kant -এর জীবনী

১.২ Kant -এর যুগ

১.৩ Kant -এর যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের সাফল্য

১.৩.১ মানবতাবাদের নবজাগরণ; Kant ও ফরাসী বিপ্লব; Kant ও Hume

১.৩.২ Kant ও Rousseau

১.৪ Kant -এর পরম বিস্ময়

১.৫ প্রধান প্রধান রচনা

১.৬ Critique of Pure Reason গ্রন্থটির শিরোনামের তাৎপর্য

১.৬.১ Critique -এর অর্থ

১.৬.২ 'Pure' বা 'বিশুদ্ধ' কথার অর্থ

১.৬.৩ 'of Pure Reason' -এর অর্থ

১.৭ Immanuel Kant - এর দর্শন-সমগ্রে Critique of Pure Reason -এর স্থান

১.৭.১ দর্শন-তন্ত্র বা philosophical system কি?

১.৭.২ Kant -এর দর্শন-তন্ত্রের মূল মূল গ্রন্থ ও তাঁর দর্শনের মূল মূল প্রশ্ন

১.৮ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

১.৯ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী

১.১ Kant -এর জীবনী

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে দু'জন প্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের একজন হলেন আধুনিক যুগের জার্মান দার্শনিক Immanuel Kant (1724 - 1804), এবং অন্যজন হলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Plato (427 B. C. - 347 B.C.)। Critique of Pure Reason গ্রন্থটি হল Kant-এর প্রথম ও প্রধান দর্শন গ্রন্থ।

দর্শন, সাহিত্য, শিল্প-কলা প্রভৃতি অধ্যয়ন করতে হলে দার্শনিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রভৃতিকে জানতে হয়। জানতে হয় তাঁদের যুগের পরিচয়, তাঁদের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল, ইত্যাদি। বিজ্ঞান পাঠের ক্ষেত্রে এমনটি জরুরী নয়। তার কারণ, Bacon যেরূপ বলেন, বিজ্ঞানের মধ্যে বৈজ্ঞানিককে অনুপস্থিত থাকতেই হয়। অপরদিকে, দার্শনিকের অনুভূতি ও বিচার তার দর্শনকে পুষ্ট করে। তাই আমরা Critique of Pure Reason পড়বার পূর্ব-প্রস্তুতিকল্পে দার্শনিক Immanuel Kant -এর জীবনী, তাঁর যুগের হাওয়া, তাঁর বিভিন্ন রচনা, ইত্যাদির সাথে কিছুটা পরিচিত হবার চেষ্টা করব।

১৭২৪ খৃষ্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল জার্মানির একটি ছোট শহর কয়নিগসবার্গ-এ Immanuel Kant জন্মগ্রহণ করেন। শহরটির বর্তমান নাম কালিনিনগ্রাদ। বাড়িতে অনেক ভাই-বোন, এবং বাবা সামান্য ঘোড়ার জিন-প্রস্তুতকারক। ফলে Kant -এর ছোটবেলা দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে। জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে তিনি কিছুটা স্বচ্ছলতার মুখ দেখেন।

দরিদ্র পরিবারে Kant -এর জন্ম ঠিকই, কিন্তু পরিবারের আবহাওয়া ছিল স্নিগ্ধ, কোথাও কোন তিক্ততা বা অস্থিরতা ছিল না। মা-বাবা ছিলেন পাইটিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টাবলম্বী। মা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ও একান্ত ধর্মপরায়ণা মহিলা। সুখ কিংবা দুঃখ, সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা, প্রশংসা কিংবা নিষ্ঠুর সমালোচনা, সব কিছুকে সহজভাবে মেনে নেবার শিক্ষা Kant তাঁর মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তিনি একবার বলেন, ''আমি আমার মাকে কোনদিন ভুলতে পারব না''।

Kant -এর সময় ইউরোপের কোথাও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ছিল না। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-লাভের সুযোগ থেকে Kant -কে বঞ্চিত হতে হত যদি না গৃহ শিক্ষক Schulz এবং পরে কয়নিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Knutzen -এর পৃষ্টপোষকতা ও প্রেরণা লাভ করতেন। অন্তর্মুখি, দুর্বলস্বাস্থ্য ও লাজুক প্রকৃতির Kant -এর মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা তাঁরা গোড়া থেকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং Kant -এর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কয়নিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে Kant তর্কশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, নৃতত্ত্ব, ভূগোল, শিশু শিক্ষা, খনিজ বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় পড়াশুনা করেন। অধ্যাপক Knutzen -এর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে তাঁর প্রবেশাধিকার থাকায় উন্নতমানের বহু বিচিত্র গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং যথা সময়ের পূর্বেই পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ১৭৫৫ খৃ: অব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। তথাপি বহু আকাঙ্ক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ লাভের জন্য তাঁকে ১৭৭০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। মাঝখানের বছরগুলো তিনি গৃহ-শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ব্যক্তিগত শিক্ষক (Privatdozent) হয়ে কাটান। বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময়, বেশ কিছুটা পরিণত বয়সে, তিনি তাঁর কালজয়ী দর্শন গ্রন্থসমূহ রচনা করেন।

১.২ Kant -এর যুগ

Kant-এর ছাত্রাবস্থাকালে কয়নিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান বুদ্ধিবাদী দার্শনিক Leibnitz এবং Wolff -এর খুবই প্রভাব ছিল। এঁদের ভাবধারা Kant -কে মুগ্ধ করে। কিন্তু পরে তিনি এঁদের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন। তিনি বুদ্ধিবাদকে কোনদিনই পরিত্যাগ করেননি, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিবাদ Wolff -এর নির্বিচারবাদকে বর্জন করে বিচারবাদের দ্বারা পুষ্ট হয়। Kant বলেন যে তাঁর যুগ হল বিচারের যুগ, এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তাঁর দর্শনও হবে বিচারবাদী দর্শন। দর্শনের ক্ষেত্রে বিচারবাদের অর্থ হল— কোন বিষয়ে দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে তোলার আগে বিচার করে দেখা যে মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা কিরূপ, বুদ্ধি সে বিষয়ে আদৌ জ্ঞান দিতে সক্ষম কি না, বা অপর কোন কোন শর্ত পূরিত হলে বুদ্ধি সে বিষয়ে জ্ঞান দিতে সক্ষম, ইত্যাদি। Kant -এর বিচারবাদ কল্পনাশ্রয়ী (speculative) এবং আবেগ-নির্ভর দর্শনকে সম্পূর্ণ বর্জন করে। Kant -এর দর্শনের কয়েকটি অতি বিখ্যাত প্রশ্ন হল :

কি-রূপে অঙ্কশাস্ত্র সম্ভব?

কি-রূপে পদার্থ বিজ্ঞান সম্ভব?

কি-রূপে অধিবিদ্যা সম্ভব?

ঐ প্রশ্নগুলির স্বরূপ অনুধাবন করলে Kant -এর বিচারবাদের স্বরূপ কিছুটা বুঝা যায়। যে-কোন প্রতিষ্ঠিত বা আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানের শর্ত নিরূপণ করাই বিচারবাদী দর্শনের প্রথম কাজ। পুরানো সব কিছুকে বিসর্জন দিয়ে দর্শনের সব কিছুই নূতন করে গড়ে তুলতে হবে, এমন নয়, কিন্তু যা কিছুই গৃহীত হোক না কেন তাকে যাচাই করেই গ্রহণ করতে হবে— এই হল Kant -এর বিচারবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।

১.৩ Kant -এর যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের সাফল্য

Kant-এর যুগের অপর একটি দিক হল আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধারণ সাফল্য এবং সর্বত্রই তার প্রভাব। আধুনিক বিজ্ঞানের মানসিকতা অনুযায়ী— এ্যারিষ্টটল কি বলেন তা বড় কথা নয়, প্রকৃতি কি বলে তাই হল প্রথম ও প্রধান কথা। প্রকৃতির দ্বিবিধ রূপ— জড়প্রকৃতি (physical nature) ও অধ্যাত্ম প্রকৃতি (moral or mental nature)। Kant তাঁর দর্শনে অধ্যাত্ম প্রকৃতিকেই দর্শনের ক্ষেত্রে বিচারালয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

১.৩.১ মানবতাবাদের নবজাগরণ; Kant ও ফরাসী বিপ্লব; Kant ও Hume

Kant -এর যুগকে যে কেবলমাত্র বিচারের যুগ বলা যায় তাই নয়, একে মানবতাবাদের নবজাগরণের যুগও বলা যায়। Kant -এর সময়ে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব (১৭৭৯-১৭৮৪) মানুষের অধিকার — স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব— অর্জনের লড়াই-রূপেই ইউরোপের প্রতিটি মানুষের চিত্তকে উদ্বেলিত করে। এ যুগের হাওয়ায় Kant -এর বিচারবাদী দর্শন মানবতাবাদী দর্শনের রূপ নেয়। Kant -এর মানবতাবাদের

উপর যে দু'জন দার্শনিকের গভীর প্রভাব রয়েছে, এবং যাঁদের ঋণ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁদের একজন হলেন স্কটিশ দার্শনিক David Hume (1711-1776) এবং অপরজন হলেন ফরাসী লেখক ও দার্শনিক Jean Jacques Rousseau (1712-1778)। বিজ্ঞানের সাথে মানব অনুসন্ধানের সম্পর্ক কি রূপ হবে, এ বিষয় নিয়ে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক Galileo-এর সময় থেকে উঠে আসে। David Hume, যিনি বিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলি, যেমন, কার্য-কারণ এর ধারণা, পরীক্ষণ পদ্ধতির ধারণা, দ্রব্যের ধারণা, ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর দার্শনিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন, তাঁর দর্শনের পরিচয় দিয়েছেন Science of Human Nature বা মানব প্রকৃতির বিজ্ঞান-রূপে। তাঁর দু'টি অতি বিখ্যাত উক্তি হল "Indulge your passions for science, but let your science be human" এবং "Be a philosopher, but amidst all your philosophy be still a man"। বিজ্ঞানের অনুসন্ধান হল কারণের অনুসন্ধান এবং প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নিয়ম হল কার্য-কারণের নিয়ম। প্রকৃতির দিক থেকে কার্য-কারণ হল প্রাকৃতিক ঘটনা-সমূহের সতত সংযোগ। প্রকৃতিতে ঘটনাগুলি ঘটে তার নিজের নিয়মে। কিন্তু প্রকৃতি ঐ নিয়মগুলিকে ব্যবহার করে না। মানুষই প্রকৃতির নিয়মগুলিকে ব্যবহার করে প্রকৃতিকে বুঝবার জন্য এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ গড়ে তোলার জন্য। মানুষের দিক থেকে কার্য-কারণের ভিত্তি হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, অভ্যাস ও প্রত্যাশা। David Hume কার্য-কারণের এই যে বিশ্লেষণ দেন তার নেতিমূলক দিকটি Kant -এর কাছে বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়া যে আমরা কোনভাবেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ আবিস্কার করতে পারি না, Hume -এর এই বিশ্লেষণ Kant মেনে নেন। কিন্তু কার্য-কারণের অনিবার্যতা যে অভ্যাসের অনিবার্যতা মাত্র Kant তা মেনে নেননি। Kant বলেন, যে প্রকৃতি সম্পর্কে বিজ্ঞানের নিয়মগুলি প্রযুক্ত সে প্রকৃতি স্বয়ংস্থিত প্রকৃতি নয়, মানুষের বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রকৃতি। Kant -এর কথা হল— Understanding makes nature, এবং প্রকৃতির নিয়মগুলি হল বুদ্ধি থেকে উৎসারিত নিয়ম। অবশ্য এই বুদ্ধি হল পরাবুদ্ধি, এবং প্রকৃতির সাথে মানুষের যোগ হল পরাজাগতিক যোগ। এই গভীর সংযোগের কারণে বিজ্ঞান, দর্শন, কলা, ইত্যাদি কোন কিছু থেকেই মানুষকে বাদ দেওয়া চলে না।

১.৩.২ Kant ও Rousseau

Rousseau ছিলেন তাঁদেরই একজন যাদের চিন্তাধারা ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। তাঁর চিন্তাধারা Kant -কেও গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। চিন্তানায়ক ও খ্যাতিমান অধ্যাপক Kant ছিলেন কিছুটা অভিজাত শ্রেণীর মানসিকতাসম্পন্ন। তিনি প্রতিদিন বিকাল বেলায় একটি পার্কে (লোকে আদর করে পার্কটির নাম দিয়েছিল Philosopher's Walk) বেড়াতে যেতেন। সেখানে অনেক সাধারণ মানুষের সাথে Kant -এর দেখা-সাক্ষাৎ হত এবং তিনি তাদের সাথে গল্প-গুজব করতেন। কিন্তু কখনই তিনি তাঁর দর্শনের কোন কথা এদেরকে বলতেন না, বা দর্শনের কোন প্রসঙ্গ উঠলে নীরব থাকতেন। তাঁর দর্শনের গভীরতায় সাধারণ মানুষ ডুব দিতে পারবে বলে তিনি মনে করতেন না। Rousseau -এর চিন্তাধারা Kant -কে এইখানে ঘা দিয়েছিল। তিনি অতঃপর বুঝতে শিখেন যে, যে দর্শন সাধারণ ও আপামর জনগণের কাছে পৌঁছয় না তার মূল্য তেমন কিছু নয়। Kant বলেন, ''আমার নিজস্ব প্রবৃত্তি অনুযায়ী আমি একজন অনুসন্ধিত্সু। আমার মধ্যে জানার আগ্রহ সব সময় কাজ করে, এবং জানার জগৎকে কোনভাবে সমৃদ্ধ

করতে পারলে নূতন আবিষ্কারের আনন্দ পাই। এক সময় আমি মনে করতাম এই জ্ঞান-তপস্যাই মানুষকে প্রকৃত মর্যাদাবান করে। ফলে সাধারণ মানুষ যাদের জানার তেমন কিছু আগ্রহ নাই তাদেরকে ঘৃণাই করতাম। Rousseau এই জায়গায় আমাকে শুধরে দিয়েছে। আমার মধ্যে কল্পিত শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি উবে গেছে। আমি মানুষকে সম্মান দিতে শিখেছি। আমি এক্ষণে আন্তরিকভাবেই বুঝেছি যে, আমার মূল্য একজন সাধারণ শ্রমিকের চাইতেও কম, যদি আমার দর্শন সকল মানুষের সাধারণ অধিকার ফিরিয়ে দিতে সাহায্য না করে।"

Kant -এর নীতি-দর্শনে Rousseau -এর প্রভাব বিশেষরূপে অনূভূত হয়। Rousseau বলেন, মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন, কিন্তু সর্বত্র সে সমাজের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। Kant বলেন, প্রতিটি মানুষই পরাজাগতিক স্বাধীনতার অধিকারী, এবং ইহ জগতের কোন কিছুই সে স্বাধীনতাকে শৃঙ্খলিত করতে পারে না। স্বাধীনতার কারণে প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের কাছে দেবতার সমান। এ হল Kant-এর অতিবিখ্যাত Kingdom of Ends-এ ধারণা।

১.৪ Kant -এর পরম বিস্ময়

Kant দুর্বল স্বাস্থ্যের মানুষ ছিলেন, কিন্তু সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন করতেন। ফলে তিনি দীর্ঘ ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। আবার, যদিও তিনি অকৃতদার ছিলেন তথাপি সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোনও প্রকার আড়ষ্টতা বা বিচ্ছিন্নতা ছিল না। যে কোন আমন্ত্রণ মর্যাদার সাথে রক্ষা করতেন, এবং পরিচিতদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসবের মেজাজে আপ্যায়ণ করতেন। তিনি নিজের শহর কয়নিগসবার্গ ছেড়ে বাইরে খুব বেশি যান নি, কিন্তু পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে, কোন দেশটি কেমন, ইত্যাদি জানতে আগ্রহী ছিলেন, এবং সে-সব জানার জন্য পড়াশুনা করতেন।

কয়নিগসবার্গ শহরের প্রতিটি মানুষ Kant -এর সাথে গভীর আত্মীয়তা অনুভব করত। তাঁর শব-যাত্রায় শহরের প্রায় প্রতিটি মানুষ অংশগ্রহণ করে। তাঁর সমাধির উপর স্মৃতিফলকে তাঁরই রচিত Critique of Practical Reason গ্রন্থ থেকে যে কথাগুলি উৎকীর্ণ করা আছে তার মর্মার্থ এইপ্রকার ঃ দু'টি বিষয় আমাকে বিস্মিত ও শিহরিত করে— আমার মাথার উপর বিরাজমান নক্ষত্রখচিত আকাশ ও আমার অন্তরে জেগে থাকা নৈতিকতার অনুভূতি।

১.৫ প্রধান প্রধান রচনা

Kant যে সমস্ত প্রধান প্রধান গ্রন্থাদি ও প্রবন্ধ রচনা করেন তার তালিকা এই প্রকার ঃ

1755 General History of Nature and Theory of the Heavens

1755 A New Exposition of the First Principles of Metaphysical Knowledge

1763 The Only Possible Agrument for the Existence of God

1764	Observation on the Sense of the Beautiful and the Sublime
1766	Dreams of a Spirit-seer
1781	Critique of Pure Reason, 1787 Second Edition
1783	Prolegomena to any Future Metaphysics
1784	Idea for a Universal History with Cosmopolitan Intent
1784	What is Enlightenment?
1785	Groundwork of the Metaphysic of Morals
1788	Critique of Practical Reason
1790	Critique of Judgement
1793	Religion Within the Limits of Reason Alone
1795	Perpetual Peace
1797	Metaphysic of Morals
1803	The Theory of Eduction

১.৬ ঃ Critique of Pure Reason গ্রন্থটির শিরোনামের তাৎপর্য

Immanuel Kant -এর অধিকাংশ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় রচিত। তাঁর অতি বিখ্যাত গ্রন্থ Kritik der reinen Vernuft (1781) এর ইংরাজী তর্জমা হল Critique of Pure Reason। এ দেশের পণ্ডিত সমাজ গ্রন্থটির শিরোনামের বাঙলা তর্জমা করেছেন 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার'। গ্রন্থটির শিরোনাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমতঃ 'Critique' কথাটির অর্থ বুঝতে হয়, দ্বিতীয়তঃ 'pure reason' এর অর্থ বুঝতে হয়, এবং তৃতীয়তঃ 'of pure reason' এর কি নির্দেশ তা বুঝতে হয়।

১.৬.১ Critique -এর অর্থ

সপ্তদশ শতাব্দীতে 'critique' বা 'criticism' কথাটি ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, Pope -এর কবিতায় এই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। জার্মান ভাষায় Kant প্রথম এর প্রয়োগ করেন। তিনি সাহিত্যের আসর থেকে শব্দটি তুলে এনে দর্শনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষণে 'critique' বা 'criticism' বলতে বুঝি সমালোচনা, অর্থাৎ, যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে কোন কিছুর দোষ-ত্রুটী তুলে ধরা। কিন্তু দর্শনে 'critique' বলতে নিছক দোষ-ত্রুটী খুঁজে বার করা বুঝায় না। Critique -এর ইতি এবং

নেতি এই উভয় দিকই থাকে। Kant 'critique' বলতে বোঝেন এক নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বা বিচার যার ফলশ্রুতি ইতি এবং নেতি দুই-ই হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্র Kant 'critique' -এর অর্থ করেছেন শৃঙ্খলা। Critique of Pure Reason বা শুদ্ধ প্রজ্ঞার বা বুদ্ধির বিচার হল শুদ্ধ বুদ্ধির নিজস্ব ক্ষেত্র বা গণ্ডি সুনির্দিষ্ট করা, এবং সেই গণ্ডির মধ্যে তাকে আবদ্ধ করে রাখা।

১.৬.২ 'Pure' বা 'বিশুদ্ধ' কথার অর্থ

'Pure' বা 'বিশুদ্ধ' কথাটির একটি নেতিমূলক ও একটি ইতিমূলক অর্থ আছে। নেতিমূলকভাবে বলা যায় যে, তাই হল বিশুদ্ধ যা সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় সংবেদন নিরপেক্ষ। আবার ইতিমূলকভাবে বলা যায় যে, তাই হল বিশুদ্ধ যা বুদ্ধির আপন অন্তর থেকে উৎসারিত এবং সার্বিকতা ও অনিবার্যতা হল যার দু'টি বৈশিষ্ট্য। এখানে অবশ্য 'বুদ্ধি' বা 'প্রজ্ঞার' বা 'reason' কথাটির অর্থ কি তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। Kant 'reason' বা 'বুদ্ধি' কথাটিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমতঃ 'বুদ্ধি' বা 'প্রজ্ঞার' কথাটির একটি অতি বৃহৎ অর্থ দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধি বলতে বোঝান হয়েছে মনের যে-কোন ক্ষমতা বা বৃত্তিকে, যা কোন না কোন প্রকার প্রাক্‌সিদ্ধের উৎস। Kant -এর মতে মানুষের মনের ক্ষমতা বা বৃত্তি প্রথমতঃ দু'প্রকার— ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিন্তাবৃত্তি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত হয় দেশ ও কালের আকার যা প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*) অনুভব (intuition)। চিন্তাবৃত্তি আবার দু'প্রকারের সংশ্লেষণ বা গঠন-ক্ষমতা, যার একপ্রকার হল বোধবুদ্ধি (power of understanding) এবং আর এক প্রকার হল যুক্তি-বুদ্ধি (power of reason)। বোধবুদ্ধি থেকে বিষয়ের সামান্য ধারণা-সমূহ (categories of the understanding) উৎসারিত হয়। এগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ ধারণা। যুক্তিবুদ্ধি থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের ধারণা উৎসারিত হয়। তা-হলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বোধবুদ্ধি এবং যুক্তিবুদ্ধি, প্রভৃতি সবই হল বুদ্ধি, কারণ, এদের প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রাক্‌সিদ্ধের উৎস। দ্বিতীয়তঃ 'বুদ্ধি' বলতে কেবল যুক্তি-বুদ্ধি (reason)-কে বোঝান হয়েছে। অর্থাৎ, বুদ্ধি হল মনের সেই ক্ষমতা যা থেকে ইন্দ্রিয়াতীতের ধারণা উৎসারিত হয়। তৃতীয়তঃ 'বুদ্ধি' বলতে বোধ-বুদ্ধি বা understanding -কে বোঝান হয়েছে। এ হল 'বুদ্ধি' কথার মধ্যম অর্থ। Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থে মানুষের মনের প্রতিটি ক্ষমতাই বিচার করেছেন এবং তার সীমা নির্ধারণ করেছেন। ফলে, 'শুদ্ধ-প্রজ্ঞার বিচার' বলতে মানুষের মনের প্রতিটি বৃত্তি বা ক্ষমতার বিচারই বুঝতে হবে।

১.৬.৩ 'of Pure Reason' -এর অর্থ

পরিশেষে, 'of pure reason' বলতে যা বোঝান হয়েছে তা হল বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধির বিচার। অর্থাৎ, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা একদিকে বিচারের কর্তা ও অন্যদিকে বিচারের বিষয়। সহজ কথায়, Critique of Pure Reason বা 'শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার' হল মানুষের জ্ঞান-ক্ষমতার বিচার ও বিশ্লেষণ এবং তার সীমা

নির্ধারণ। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, Kant -এর মতে অধ্যাত্ম প্রকৃতির দিক থেকে মানুষের পরিচয় তিন রকম— সে হয় জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা। মানুষের এই প্রতিটি পরিচয়ই হল তার শুদ্ধ-বুদ্ধির পরিচয়। Critique of Pure Reason হল মানুষের জ্ঞাতৃত্বের অনুসন্ধান ও বিচার। যে মানুষ জ্ঞাতা সে তার জানার সব কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করে তা নয়, এতে তার নিজের সংযোজনও অনেক কিছু আছে। মানুষের মন বা বুদ্ধি জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করার জন্য যা নিজে থেকে যোগান দেয়, এবং যে-ভাবে বুদ্ধির ঐ সমস্ত ঐশ্বর্য জ্ঞানের বিষয়ে সংযুক্ত হয় তারই অনুসন্ধান হল Critique of Pure Reason। বাইরের উপাদানের সাথে বুদ্ধির উপাদান ও ক্রিয়া ঠিক মত যুক্ত হলে সৃষ্টি হয় বিষয়ের জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়, আর তা না হলে সৃষ্টি হয় জ্ঞানের মরীচিকা। শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারের ফলে ঐ মরীচিকা দূর হতে পারে ও জ্ঞানার্জনের পথ সুগম হতে পারে, Kant এরূপ প্রত্যাশা করেন।

১.৭ ঃ Immanuel Kant -এর দর্শন-সমগ্রে Critique of Pure Reason -এর স্থান

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে দর্শনের মহাকাব্যসদৃশ দর্শন-তন্ত্র যারা শেষবারের মতন রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন Immanuel Kant। Kant -এর পর আর একজন মাত্র দর্শন-তন্ত্র রচনা করেছেন, যিনি হলেন হেগেল।

১.৭.১ দর্শন-তন্ত্র বা philosophical system কি?

দর্শন-তন্ত্র কি? আমরা স্নায়ুতন্ত্রের উদাহরণ সামনে রেখে প্রথমে তন্ত্র কি তা বুঝবার চেষ্টা করতে পারি। স্নায়ুতন্ত্রের মূলাধার হল মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে এসেছে শ্রোতের আকারে বিভিন্ন শিরা ও উপশিরা। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই শিরা ও উপশিরাগুলি প্রসারিত হয়েছে। ফলে, বিভিন্ন অংশে বিভক্ত শরীর হয়ে উঠেছে এক দেহ। স্নায়ুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশ একে অপরের সাথে যুক্ত। দর্শন হল একপ্রকার বিচার যার বিষয় মাত্র একটি নয়, একাধিক। উদাহরণস্বরূপ, তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, সত্তাবিদ্যা, জ্ঞানবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, সৌন্দর্যবিদ্যা, ইত্যাদি হল দর্শনের বিভিন্ন শাখা যাদের আলোচ্য বিষয়ও পৃথক পৃথক। একজন দার্শনিক দর্শনের যে-কোন একটি শাখায় মাত্র একটি বিষয় নিয়ে দার্শনিকতায় লিপ্ত হতে পারেন অথবা বিষয়গুলির প্রত্যেকটি সম্পর্কেই তার দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা প্রসারিত হতে পারে। যাঁরা দর্শন-তন্ত্র রচনা করেন তারা হলেন সমগ্র-দার্শনিক, অর্থাৎ তাঁরা দর্শনের সব কটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করেন এবং সেগুলিকে এক-সূত্রে গাঁথবার চেষ্টা করেন। দর্শন-তন্ত্রের অন্তর্গত দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক কি-রূপ, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দার্শনিক Descartes বলেন, ''দর্শনতন্ত্র হল একটি মহীরুহের ন্যায় যার মূল হল অধিবিদ্যা, পদার্থশাস্ত্র হল যার কাণ্ড, এবং অন্যান্য বিজ্ঞান হল এই কাণ্ড-র উপর গজিয়ে ওঠা ডালপালা।''

১.৭.২ Kant -এর দর্শন-তন্ত্রের মূল মূল গ্রন্থ ও তাঁর দর্শনের মূল মূল প্রশ্ন

Immanuel Kant তাঁর দর্শনতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য তিনটি অথবা চারটি Critique গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থগুলি হল ১) Critique of Pure Reason ২) Critique of Practical Reason এবং ৩) Critique of Judgement। অনেকে বলেন Religion Within the Limits of Reason Alone গ্রন্থটি হল চতুর্থ Critique। কিন্তু সকলে তা স্বীকার করেন না। তারা বলেন যে Religion গ্রন্থটি হল দ্বিতীয় Critique, অর্থাৎ Critique of Practical Reason গ্রন্থের পরিশিষ্ট। Critique of Pure Reason গ্রন্থে Kant বলেন যে দর্শনের মূল প্রশ্ন হল তিনটি, যথা—

১) আমি কি জানতে পারি? (What may I know?)

২) আমার কর্তব্য কর্ম কি? (What ought I to do?)

৩) আমি কি প্রত্যাশা করতে পারি? (What may I hope for?)

তিনি Logic প্রবন্ধে দর্শনের মূল প্রশ্ন হিসাবে আর একটি প্রশ্নের কথা বলেন ৪) আমি কে? বা মানুষ কি? (Who am I? অথবা What is man?)। তিনি Critique of Pure Reason -এ প্রথম প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। মানুষের জীবন পশু-পক্ষীর জীবন থেকে আলাদা। অন্ধ প্রবৃত্তি অনুযায়ী মানুষের জীবন প্রবাহিত নয়। জ্ঞানের ভিত্তিতে তার কর্ম, এবং কর্মের কারণে তার প্রত্যাশা। এ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, Critique of Pure Reason গ্রন্থটি Kant-এর দর্শন-তন্ত্রের মূল ও প্রথম গ্রন্থ। জ্ঞান সম্পর্কে এখানে যা সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে তারই ভিত্তিতে Kant নৈতিক তত্ত্ব ইত্যাদি গড়ে তুলেছেন।

১.৮ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

1) Explain the meaning of the title '*Critique of Pure Reason*'. (১.৬, ১.৬.১, ১.৬.২, ১.৬.৩)

2) What is philosophical system? Explain the position of the *Critique of Pure Reason* in Kant's philosophical system. (১.৭, ১.৭.১, ১.৭.২)

3) Explain the salient feature of Kant's age as the '*age of criticism*'. (১.২, ১.৩)

১.৯ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kant's Critique of Pure Reason*
2. F. Colpeston, *The History of Philosophy*, Vol. VI
3. J. P. Mahaffy, *Kant's Critical Philosophy for English Readers*.
4. স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, ''ইমানুয়েল কান্ট — জীবন ও দর্শন'', *তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কান্টের দর্শন*

দ্বিতীয় পাঠ (Unit-II)

কোপার্নিকীয় দৃষ্টিভঙ্গি

পাঠ সংকেত

২.১ Critique of Pure Reason গ্রন্থের রচনা

২.২ প্রথম মুখবন্ধ

২.২.১ অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের কিছু উদাহরণ, অধিবিদ্যার অতীত গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থা

২.২.২ অধিবিদ্যার বর্তমান দূরবস্থার কারণ কি?

২.২.৩ অধিবিদ্যা-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

২.৩ দ্বিতীয় মুখবন্ধ

২.৩.১ চারটি মৌলিক বিজ্ঞান

২.৩.২ যুক্তিশাস্ত্র বা Logic

২.৩.৩ অঙ্কশাস্ত্র বা Mathematics

২.৩.৪ পদার্থবিজ্ঞান বা Physics

২.৩.৫ দুটি শিক্ষা

২.৩.৬ অধিবিদ্যার উন্নয়নকল্পে বৈপ্লবিক পদক্ষেপগ্রহণের সঙ্কল্প

২.৩.৭ Ptolemy -এর 'পৃথিবী-মণ্ডল' ও 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদ'; Copernicus -এর 'সৌরমণ্ডল' ও সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদ

২.৩.৭.১ Ptolemy -এর প্রকল্পের সুবিধা

২.৩.৮ Copernicus -এর প্রকল্পের সুবিধা

২.৩.৯ Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প

২.৩.১০ কিভাবে Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প Copernicus -এর প্রকল্পের সাথে তুলনীয়?

২.৪ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

২.৫ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী

Suggested further readings

২.১ Critique of Pure Reason গ্রন্থের রচনা

Immanuel Kant ১৭৭০ খৃঃ অব্দে কয়নিগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়ই তিনি Critique of Pure Reason রচনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। বিশাল পরিধি বিশিষ্ট এই গ্রন্থটিতে বহু বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে এই বিষয়গুলি নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন এবং টুকরো টুকরো নোটের আকারে লিখে রাখেন। মধ্য বয়সে এসে Kant -এর মনে হয়েছিল যে তিনি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তাই তাড়াহুড়ো করে মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ঐ টুকরো লেখাগুলি একত্রিত ও সংকলিত করে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে Critique of Pure Reason নামে প্রকাশ করেন। অতি অল্প দিনেই গ্রন্থটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, এবং Kant-ও রাতারাতি অতি বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিণত হন। এরপর তিনি একের পর এক গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। তবুও প্রথম Critique গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর অসন্তুষ্টি থেকেই যায়। তাঁর মনে হয়েছিল যে তাড়াহুড়ো করে সংকলন করার কারণে গ্রন্থটি কোন কোন জায়গায় অসংলগ্ন, এবং কোন কোন আলোচনায় অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। সেই জন্য তিনি গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশের পর ছয় বৎসর বাদে, অর্থাৎ ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে, এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। আলোচনার গতি-প্রকৃতির দিক থেকে গ্রন্থ দু'টি সর্বত্র এক নয়। তাই এক্ষণে পণ্ডিত-সমাজ গ্রন্থের দু'টি সংস্করণই পাশাপাশি রেখে পাঠ করেন।

Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে দু'টি পৃথক পৃথক মুখবন্ধ সংযোজিত আছে। এই মুখবন্ধ দু'টি যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় মুখবন্ধ নামে পরিচিত। গ্রন্থে প্রবেশ করার জন্য মুখবন্ধ দু'টি অবশ্য পাঠ্য।

সাধারণতঃ আমরা বলে থাকি যে একটি মানুষের মুখের ছবি হল তার সমগ্র সত্তার ছবি। গ্রন্থের মুখবন্ধ সম্পর্কে একই কথা বলা যায়। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কি, তার দৃষ্টিভঙ্গি কি, তার সিদ্ধান্ত কি, ইত্যাদি সম্পর্কে আগাম কিছু কথা মুখবন্ধে বলা থাকে। যে-হেতু Kant -এর দর্শন তন্ত্রের আকারে বিস্তারিত, এবং Critique of Pure Reason গ্রন্থটি তাঁর দর্শন-তন্ত্রের প্রথম গ্রন্থ ও প্রবেশদ্বার-স্বরূপ, সে-হেতু মুখবন্ধ দু'টি তাঁর সমগ্র দর্শনেরও মুখবন্ধ। প্রথম মুখবন্ধে Kant তাঁর সমগ্র দর্শনের মূল লক্ষ্য, এবং Critique of Pure Reason কি-ভাবে সেই লক্ষ্য পূরণে কার্যকরী হবে, তার কথা বলেছেন। দ্বিতীয় মুখবন্ধে তিনি প্রচলিত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি কোপার্নিকীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলে পরিচিত।

২.২ প্রথম মুখবন্ধ

Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রথম মুখবন্ধ শুরু করেন অধিবিদ্যার প্রসঙ্গ দিয়ে। অধিবিদ্যা কি? Kant বলেন অধিবিদ্যার পরিচয় তার বিষয়বস্তু নয়, অধিবিদ্যার পরিচয় হল তার প্রশ্নাবলী। অধিবিদ্যাগত প্রশ্নাবলীর কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক প্রশ্ন, অর্থাৎ মনুষ্য-বুদ্ধির স্বাভাবিক প্রবণতার সাথে প্রশ্নগুলি সংশ্লিষ্ট। এ প্রশ্নগুলি উত্থাপনের জন্য বিশেষ কোন শিক্ষা-দীক্ষা বা

বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক হলেও এদের কোন স্বাভাবিক উত্তর নাই। বস্তুতঃ প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়। তার কারণ, প্রশ্নগুলি এমন যে সেগুলির উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়াতীত জগতে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই কল্পনা করতে পারি, সুস্পষ্টরূপে কিছুই জানতে পারি না। ফলে অধিবিদ্যাগত প্রশ্নগুলির এক এক জন এক এক রকম উত্তর দেয়, এবং দেখা যাবে যে কোন এক-জনের উত্তর অপর এক-জনের উত্তরের সাথে মিলছে না। একই প্রশ্নের বিভিন্ন বিরুদ্ধ উত্তরের মধ্যে কোন উত্তরটি ঠিক বা কোনটি ঠিক নয় তা নির্ণয় করারও কোন উপায় নাই। ফলতঃ অধিবিদ্যা হয়ে উঠেছে যেন এক নকল যুদ্ধক্ষেত্র। নকল যুদ্ধে না আছে রক্তপাত, না আছে জয়, না আছে পরাজয়, আছে শুধু আস্ফালন।

২.২.১ অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের কিছু উদাহরণ, অধিবিদ্যার অতীত গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থা

Kant অধিবিদ্যাগত প্রশ্নের দু'-একটি উদাহরণ দিয়েছেন। একটি হল, আদি কারণ-বিষয়ক প্রশ্ন। আমাদের চারপাশের জগতে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই জিজ্ঞাসা করি— কি এর কারণ? একটি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে হয়ত আর একটি পরিবর্তনকে খুঁজে পাই। তাহলে, এই দ্বিতীয় পরিবর্তনের কারণ কি? এইভাবে কারণের কারণ, এবং তার কারণ, জিজ্ঞাসা করতে করতে এগিয়ে গিয়ে সমস্ত জগতের কারণ কি তা জানতে চাই। অর্থাৎ, সমস্ত জগৎ-সংসারের আদি কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর আর জগতের অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে পাওয়া যাবে না, কারণ, কারণ হল কার্যের অতিরিক্ত ও কার্যের পূর্ববর্তী। সুতরাং আদি কারণ কি তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কেবল কল্পনার উপর ভর করেই এগুতে হয়, কিন্তু কল্পনার কোন লাগাম নেই। ফলে সবার কল্পিত উত্তরগুলি এক হয় না। দেখা দেয় বিসংবাদ। আদি কারণ-বিষয়ক প্রশ্নের অনুরূপ অধিবিদ্যাগত প্রশ্ন হল : জন্মের পূর্বে আমি কোথায় ছিলাম? মৃত্যুর পর আমি কোথায় যাব? ইত্যাদি। এমন-কি একটি ছোট শিশুর মনেও প্রশ্ন জাগে— মা আমি এলেম কোথা থেকে? কোথায় ছিলেম, কোথায় যাব, কে আমি — এসব হল চিরন্তন অধিবিদ্যাগত প্রশ্ন যার কোন সঠিক উত্তর জানা নাই।

প্রশ্নগুলি যেমনই হোক না কেন অধিবিদ্যাগত প্রশ্নানুসন্ধানের মধ্য দিয়েই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূত্রপাত। প্রশ্ন না থাকলে অনুসন্ধান হয় না। তাই যে প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক প্রশ্ন সেগুলিই আগে এসেছে, এবং সেগুলিকে সামনে রেখেই অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। অতঃপর ধীরে ধীরে অধিবিদ্যাগত অনুসন্ধানের সূত্র ধরে মানুষের মনে আরো নানা প্রশ্ন জেগেছে এবং অন্যান্য শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে। যথার্থই, এক সময় অধিবিদ্যা সকল শাস্ত্রের জননীর মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু এক্ষণে অধিবিদ্যা তার অতীত গৌরব হারিয়েছে। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানগুলি দ্রুত এগিয়েছে। গবেষক, চিন্তাবিদ, প্রভৃতিরা দলে দলে সে-সব জায়গায় ভিড় করেছে। কিন্তু অধিবিদ্যার চর্চায় তাদের কোন উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অধিবিদ্যা এক্ষণে অন্ত্যজ।

২.২.২ অধিবিদ্যার বর্তমান দূরবস্থার কারণ কি?

অধিবিদ্যার এই বর্তমান দুরবস্থার কারণ কি? Kant-এর মতে এতদিন পর্যন্ত যারা অধিবিদ্যার চর্চায় রত ছিলেন তাদের মধ্যে দু'ধরণের টানা-পোড়নের ফলে এক্ষণে এই তৃতীয় অবস্থা। অধিবিদ্যার স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যারা অধিবিদ্যার চর্চা করতেন তাদের মধ্যে নির্বিচারবাদের মানসিকতা প্রাধান্য লাভ করে। এই মানসিকতায় ধরেই নেওয়া হয় যে পরাজগত সম্পর্কে জ্ঞান-লাভের সক্ষমতা মানুষের বুদ্ধির আছে, এবং দার্শনিকেরা পরাজগত সম্পর্কে যা কিছু বলেন সবই সত্য। এ যেন শাসনতন্ত্রের দিক থেকে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। কিন্তু কোন স্বেচ্ছাচারই চিরকাল চলতে পারে না। নির্বিচারবাদ তথা স্বেচ্ছাচারবাদের প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দেয় সন্দেহবাদের মানসিকতা। সন্দেহবাদ যেন এক নৈরাজ্যবাদ। কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, কিছুই ঠিক নাই, তাই কাউকেই মানতে পারি না— এই রকমের মনোভাব হল সন্দেহবাদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের অভাব প্রগতির পরিপন্থি, অর্থাৎ নেতি। অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে নির্বাচারবাদ ও সন্দেহবাদ এই দুই নেতির টানা-পোড়নের ফলে দেখা দিয়েছে তৃতীয় অবস্থা — ঔদাসীন্যবাদের অবস্থা। Kant বলেন, তাঁর সময়ের লোকেরা অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী, কিন্তু অধিবিদ্যর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন।

২.২.৩ অধিবিদ্যা-চর্চার প্রয়োজনীয়তা

তা-হলে আর অধিবিদ্যার প্রসঙ্গ কেন? Kant বলেন, বর্তমান অবস্থা যাই হোক না কেন, অধিবিদ্যাকে বর্জন করা যায় না, যাবে না এবং বর্জন করা উচিতও হবে না। মানব সভ্যতার স্থায়ী উন্নতি-কল্পে একে সযত্নে রক্ষা করতে এবং এর উন্নতি-সাধন করতে হবে। অধিবিদ্যাগত প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক প্রশ্ন। ফলে এদের সম্পর্কে যতই উদাসীন থাকতে চাই না কেন, প্রশ্নগুলি বারে বারে মনের কোণে উঁকি দেবে, আঘাত করবে এবং অতৃপ্তি জাগাবে। দ্বিতীয়তঃ অধিবিদ্যা হল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে মানব-যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ। অন্ত((ঃ প্রাচীনতার নিদর্শনরূপে একে রক্ষা করতে হয়। তৃতীয়তঃ অধিবিদ্যা হল সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি জননী। আবেগের সম্পর্ক থাকায় একে রক্ষা করা দরকার। চতুর্থতঃ মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থায়ী উন্নতিকল্পে অধিবিদ্যার চর্চা হওয়া দরকার। অধিবিদ্যাগত তত্ত্ব ব্যতীত মানব-সাধন বিজ্ঞান-সমূহ, যথা কাব্য-শাস্ত্র, নীতি-শাস্ত্র, সৌন্দর্য-শাস্ত্র, আইন-শাস্ত্র, ইত্যাদি, অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর এগুলি বাদ দিলে মানব-সংস্কৃতির উজ্জ্বলতা বা চমৎকারিত্ব একেবারে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুতঃ অধিবিদ্যাগত চিন্তাই মনুষ্যত্বের শেষ আশ্রয়-স্থল। যে মানুষ জেনে গেছে যে আর দশ মিনিটের মধ্যে তার ফাঁসী হবে, তখনও যদি তার মধ্যে কিছু পড়ে থাকে, এবং যার কারণে বলা যাবে যে একজন মানুষের ফাঁসী হল, তা হবে তার মধ্যে জেগে থাকা পরাচিন্তা, পরা-ভবিষ্য, পরা-প্রত্যাশা, ইত্যাদি।

Kant তাঁর প্রথম মুখবন্ধে বলেন যে, তাঁর দর্শন-চর্চার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল অধিবিদ্যার আলোচনা ও অনুসন্ধানে বিচারের মানসিকতা গড়ে তোলা ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রাচীন এই শাস্ত্রটিকে পুনরুজ্জীবিত

করা। তার জন্য তিনি প্রথম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন Critique of Pure Reason গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি হবে শুদ্ধ প্রজ্ঞার আত্মসমীক্ষা। এখানে বিচার করে দেখা হবে মনুষ্য বুদ্ধির ক্ষমতা কি-রূপ, বুদ্ধি কোন কোন বিষয়ে এবং কতদূর জ্ঞান দিতে সক্ষম, কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধি জ্ঞান দিতে অক্ষম, ইত্যাদি। অর্থাৎ Critique of Pure Reason হবে একপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠার আদালত বা tribunal। Kant -এর কথায় — "I do not mean by this a critique of books and systems, but of the faculty of reason in general, in respect of all knowledge after which it may strive *independently of all experience*".

অর্থাৎ, তিনি যা বলেন, Critique of Pure Reason নামক বুদ্ধি-শক্তির সমীক্ষার ফলে যা সুনিশ্চিত হবে তা হল— অধিবিদ্যা আদৌ সম্ভব কি না, যদি সম্ভব হয় তাহলে কি ধরনের অধিবিদ্যা গড়ে তোলা সম্ভব, অধিবিদ্যাগত জ্ঞানের যাথার্থ্য ও সীমাবদ্ধতা কি, ইত্যাদি।

২.৩ দ্বিতীয় মুখবন্ধ

Immanuel Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের দ্বিতীয় মুখবন্ধ শুরু করেন বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ দিয়ে। প্রথমে তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কয়েকটি নেতিমূলক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠলে একটি অনুসন্ধানকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বলা যাবে না, তাদের উল্লেখ করেন। যদি বারংবার ও বিস্তারিত প্রস্তুতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও একটি অনুসন্ধান-কর্মসূচী তার শেষ লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারে, বা লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই সেটি থেমে যায় ও পায়ে পায়ে পিছিয়ে এসে শুরুর জায়গায় হাজির হয়, যদি বারংবার অনুসন্ধান-কর্মসূচীর পরিবর্তন হয় অথচ কোন কর্মসূচীই ফলবতী না হয়, যদি যারা অনুসন্ধানে রত তাদের মধ্যে অনুসন্ধানের পদ্ধতি-বিষয়ে কোন মতৈক্য না থাকে তাহলে বুঝতে হবে অনুসন্ধানটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান নয়। এই লক্ষণগুলির সাথে মিলিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, এযাবৎ অধিবিদ্যার অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হিসাবে গড়ে ওঠেনি। অধিবিদ্যার কোন একটি তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন দু'জনের মত এক হয় না। কে কোন পথে গিয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছে তারও কোন নির্দিষ্টতা নাই। এ অবস্থায় অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখতে হলে প্রথমেই পথের দিশা দিতে হবে। Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থে সে কাজটিই করতে চান। তিনি অধিবিদ্যার অনুসন্ধানকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের স্তরে তুলতে আনতে চান।

২.৩.১ চারটি মৌলিক বিজ্ঞান

যে-হেতু Kant -এর লক্ষ্য হল অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে তুলে আনা, সেই জন্য প্রথমে তিনি সফল বিজ্ঞানগুলির সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে অধিবিদ্যার সংস্কারের কাজে লাগে এমন কিছু

শিক্ষাগ্রহণ করতে চান। Kant -এর মতে সমস্ত বিজ্ঞানগুলিকে চারটি মৌলিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত করে দেখা যায়। সেগুলি হল— ১) Logic বা যুক্তিশাস্ত্র ২) Mathematics বা অঙ্কশাস্ত্র ৩) Physics বা পদার্থবিজ্ঞান এবং ৪) Metaphysics বা অধিবিদ্যা। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি বিজ্ঞান হল সফল বিজ্ঞান, এবং চতুর্থ, অর্থাৎ, অধিবিদ্যা, সে তুলনায় অসফল। Kant অধিবিদ্যাকে সফল অনুসন্ধান করে গড়ে তুলতে চান।

২.৩.২ যুক্তিশাস্ত্র বা Logic

Kant যুক্তিশাস্ত্র বলতে Aristotle -কৃত যুক্তিশাস্ত্রকেই বোঝেন। তাঁর মতে Aristotle যে এই শাস্ত্রটির জন্ম দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি একে সম্পূর্ণও করেছেন। এটি একটি পূর্ণ বিকশিত বিজ্ঞান। যদিও এই বিজ্ঞানটির পরিসর স্বল্প, তথাপি গুরুত্বের দিক থেকে স্বল্প নয়। যুক্তিশাস্ত্রের নিয়মগুলি মেনে না চললে কোন বিজ্ঞানেই সত্যতা লাভ করা যাবে না। সে-কারণে বলা যায় যে, যুক্তিশাস্ত্র হল সকল বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার (vestibule of the sciences)। Kant -এর মতে যুক্তিশাস্ত্রের কাজ হল চিন্তা থেকে চিন্তার সমস্ত বিষয় বাদ দিয়ে চিন্তার সব আকারগত নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করা, সেগুলিকে সুসংবদ্ধ করা, এবং সেগুলি যে চিন্তার নিয়ম তার প্রমাণ দেওয়া। Aristotle একাই এ-কাজ সম্পন্ন করেছেন। এ-কাজ সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিভা-গুণ বাদ দিয়ে Aristotle এর যে দু'টি বাড়তি সুবিধা ছিল তা হল বিষয়বস্তুর স্বল্পতা এবং সুবিধাজনক অবস্থান। চিন্তার নিয়ম-সমূহের অনুসন্ধান করতে গিয়ে Aristotle-কে বাইরের জগতে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়নি, তিনি তাঁর চিন্তার মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ রেখেই চিন্তার নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন।

২.৩.৩ অঙ্কশাস্ত্র বা Mathematics

অঙ্কশাস্ত্র তর্কশাস্ত্রের ন্যায় সম্পূর্ণ বিকশিত বিজ্ঞান নয়, এ হল বিকাশমান বিজ্ঞান। প্রতিদিনই বিজ্ঞানটির নূতন নূতন বিকাশ ঘটে চলেছে, এবং এর বিকাশের ধারা কোথায় গিয়ে পৌঁছবে বা কবে শেষ হবে কিছুই বলা যায় না। হয়ত এই বিজ্ঞানটির বিকাশ কোনদিনই সম্পূর্ণ হবে না, বিকাশ চলতেই থাকবে। Kant -এর মত যদিও অঙ্কের চর্চা বহুদিন থেকে এবং বহুদেশে প্রচলিত, তথাপি প্রাচীন গ্রীকেরাই বিজ্ঞান হিসাবে অঙ্কশাস্ত্র গড়ে তোলে। ইউক্লিড প্রভৃতি গ্রীক অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা একে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নিত করেন। অঙ্ক-চিন্তার জগতে এক-প্রকার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে অঙ্ক অবিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানের রাস্তায় উঠে আসে। অঙ্কের প্রমাণ পদ্ধতি নিরূপণ হল সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন। অঙ্কের প্রমাণ-পদ্ধতির প্রথম পদক্ষেপ হল প্রাক্‌সিদ্ধ ধারণা গঠন, অবশ্য ধারণাটি প্রাক্‌সিদ্ধ হলেও তা এমন ধারণা হবে যা অভিজ্ঞতার জগতে সংশ্লিষ্ট হতে পারে। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল, ঐ ধারণা থেকে যে যে সিদ্ধান্ত তর্কের নিয়মে অনুসৃত হয়, অর্থাৎ, যেগুলি অনিবার্য সিদ্ধান্ত সেগুলিকে অঙ্কের সত্য বলে নির্দিষ্ট করা। উদাহরণ স্বরূপ, ''ত্রিভূজের অন্তঃস্থিত তিনটি কোণের সমষ্টি সমান দুই সমকোণ'' হল একটি জ্যামিতিক সত্য। এ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে

ত্রিভূজের ধারণা গঠন করা হয়েছে। ধারণাটি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ধারণা। অতঃপর দেখান হচ্ছে যে "তিনটি সরলরেখা দ্বারা বেষ্টিত একটি সমতল ক্ষেত্র হল ত্রিভূজ" এরূপ একটি ধারণা থেকে যে সত্য অনিবার্য বলে প্রমাণিত হয় তা হল "ত্রিভূজের অন্তঃস্থিত তিনটি কোণের সমষ্টি সমান দুই সমকোন"। অঙ্কের কোন ধারণাই অভিজ্ঞতার ধারণা নয়, এবং অঙ্কের কোন সত্যই অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রমাণিত সত্য নয়। অথচ অঙ্কের সত্য বাক্য অভিজ্ঞতার জগৎ সম্পর্কেও সত্য।

২.৩.৪ পদার্থবিজ্ঞান বা Physics

বিজ্ঞানগুলির মধ্যে নবতম হল পদার্থবিজ্ঞান। এ হল সমস্ত প্রকার সজীব ও অজীব প্রকৃতি-পদার্থের বিজ্ঞান। দীর্ঘদিন প্রকৃতি-পদার্থের অনুসন্ধান এলোপাথাড়ি খোঁজাখুজি, যথা, অ্যালকেমি, ইত্যাদিতে সীমিত ছিল। আধুনিক যুগে Galileo, Torecelli, Stahl, Kepler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এর নবজন্ম দেন। এখানেও এক বৈপ্লবিক চিন্তা ও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি-অনুসন্ধান অবিজ্ঞান থেকে বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবনা হল সেই বিপ্লব। পরীক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী প্রকৃতি-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বুদ্ধিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। বুদ্ধি প্রকৃতিকে প্রশ্ন করে এবং প্রকৃতিকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য করে। এরই মধ্য দিয়ে প্রকৃতির নিয়ম বুদ্ধির কাছে প্রকাশিত হয়, নতুবা প্রকৃতি আপনা থেকে নিজের নিয়মের কথা কাউকেই কিছুই বলে না। পরীক্ষণ পদ্ধতি আরোহ পদ্ধতি নয়, এ হল প্রকল্প-অবরোহ পদ্ধতি (hypothetico-deductive method)। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথমে প্রকৃতির আচরণ-বিষয়ে প্রকল্প গঠন করা হয়। প্রকল্প হল বুদ্ধির প্রকৃষ্ট কল্পনা। বুদ্ধির কল্পনা এবং প্রকৃতির বাস্তবতা এক হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। সেই জন্য কিছু প্রকৃতির বাস্তব তথ্য যা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করি প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা হয়। এক্ষণে, প্রকল্পটি ন্যায়ানুমানের প্রধান আশ্রয়-বাক্য এবং প্রকৃতির তথ্য অপ্রধান আশ্রয়বাক্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তা থেকে যে অনিবার্য সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় সে সম্পর্কে প্রকৃতি কি বলে তা দেখা হয়। যদি প্রকৃতি 'হ্যাঁ' বলে তাহলে প্রকল্পটিও 'হ্যাঁ' আর যদি 'না' বলে তাহলে প্রকল্পটিও 'না'। এইভাবে অগ্রণী বুদ্ধির সাথে পশ্চাৎ অভিজ্ঞতার শুভ পরিণয় ঘটে।

২.৩.৫ দুটি শিক্ষা

Kant সফল বিজ্ঞানগুলির সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দু'টি শিক্ষা লাভ করেন। এক, কোন একটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অচল অবস্থা কাটিয়ে তুলতে হলে মৌলিক পরিবর্তনের দরকার হতে পারে। দুই, বিজ্ঞান গড়ে তোলার জন্য চাই বুদ্ধির অগ্রণী ভূমিকা। অগ্রণী বুদ্ধির সাথে অভিজ্ঞতার শুভ পরিণয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারে বিজ্ঞান।

২.৩.৬ অধিবিদ্যার উন্নয়নকল্পে বৈপ্লবিক পদক্ষেপগ্রহণের সঙ্কল্প

অতঃপর Kant ঘোষণা করেন যে, অধিবিদ্যার অনুসন্ধানকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য তিনি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চান। জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে জ্ঞানের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা কল্পে তিনি একটি নুতন প্রকল্প গ্রহণ করবেন, যে প্রকল্পটি কোন দিক থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোপার্নিকাসের মূল প্রকল্প (Primary Hypothesis)-এর সাথে তুলনীয়।

২.৩.৭ Ptolemy -এর 'পৃথিবী-মণ্ডল' ও 'পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদ'; Copernicus -এর 'সৌরমণ্ডল' ও সৌর-কেন্দ্রিক মতবাদ

আমরা 'সৌরমণ্ডল' কথাটির সাথে সুপরিচিত। সূর্য প্রভৃতি কয়েকটি তারা নিয়ে গঠিত এই সৌরমণ্ডল। এদেরকে সম্মিলিতভাবে সৌরমণ্ডল বলা হয় তার কারণ এদের মধ্যে প্রধান তারা বা নক্ষত্র হল সূর্য। এই সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে কয়েকটি তারা যারা হল গ্রহ, এবং গ্রহগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে আরো কয়েকটি ছোট তারা যেগুলি হল উপগ্রহ। পোল্যান্ডের বৈজ্ঞানিক Copernicus এই তারামণ্ডলকে সৌরমণ্ডল বলে চিনতে শিখিয়েছেন। Copernicus -এর পূর্বে এই তারা-মণ্ডলটি 'পৃথিবী মণ্ডল' নামে পরিচিত ছিল। তার কারণ, তখন মনে করা হত যে, এই তারামণ্ডলটির কেন্দ্রে অবস্থিত পৃথিবী এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে অন্য তারাগুলি। বৈজ্ঞানিক দিক থেকে 'পৃথিবী মণ্ডল' ধারণাটিকে যিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি প্রাচীন মিশরের বৈজ্ঞানিক Ptolemy। একই তারামণ্ডলের দুই ভিন্ন ব্যাখ্যা বা দুই মতবাদের একটি হল Ptolemy -এর পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদ (Geo-centric Theory) এবং Copernicus -এর সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ (Helio-centric Theory)। এক্ষণে বৈজ্ঞানিক মহল Copernicus -এর সৌরকেন্দ্রিক মতবাদকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যেহেতু দু'টিই মতবাদ, কোনটিই প্রত্যক্ষিত সত্য নয়, অতএব মত দু'টির সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলিই বিচার্য।

২.৩.৭.১ Ptolemy -এর প্রকল্পের সুবিধা

Ptolemy -এর পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদের সুবিধা হল এই যে, মতবাদটি সহজ অভিজ্ঞতার অনুপন্থি। আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করি যে সূর্য সকাল বেলায় পূর্ব গগনে উদিত হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিম গগনে অস্ত যায়। এ-থেকে যেন সহজে অনুমান করা যায় সে সূর্য গতিমান। বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ Ptolemy -এর মতকেই সমর্থন করে। Ptolemy -এর মতের সব চাইতে বড় সমর্থন হল Ptolemy -কৃত বর্ষপঞ্জী (Yearly Calender)। Ptolemy তাঁর পৃথিবী-কেন্দ্রিক প্রকল্পকে আশ্রয় করে যে বর্ষপঞ্জী রচনা করেন তার গণনা বা সিদ্ধান্ত সবই বাস্তবে মিলে যায়। Ptolemy -এর প্রকল্পের এই সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও Copernicus তাকে মেনে নিতে পারেনি। Copernicus -এর প্রকল্প দিয়েও সফল বর্ষপঞ্জী রচনা করা

যায়, এবং বর্ষপঞ্জীর গণনাও অনেক সহজবোধ্য। সবচাইতে বড় কথা Copernicus -এর সময়ে আকাশে অন্যান্য তারকার অবস্থান ও গতিবিধি বিষয়ে বহু তথ্য হাজির হয়, তার সব কিছু Ptolemy -এর প্রকল্প ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ছিল না। Copernicus -এর প্রকল্প এ সবের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থাৎ কিনা, ব্যাখ্যার ক্ষমতার দিক থেকে Copernicus -এর প্রকল্প Ptolemy -এর প্রকল্পের চাইতে অনেক বেশী কার্যকরী।

২.৩.৮ Copernicus -এর প্রকল্পের সুবিধা

Copernicus -এর প্রকল্পে বলা হয়েছে যে পৃথিবী গতিমান এবং সূর্য স্থির। কিন্তু আমরা পৃথিবীকে স্থির এবং সূর্যের স্থানান্তর প্রত্যক্ষ করি; কেন? Copernicus এর ব্যাখ্যা দেন। প্রথমতঃ তিনি আপাত গতি ও প্রকৃত গতির মধ্যে পার্থক্য করেন। সূর্যে যে গতি প্রত্যক্ষ করি বলে মনে হয় তা আপাত গতি এবং পৃথিবীর গতি হল প্রকৃত গতি যা আমরা প্রত্যক্ষ করি না। এখানে আপাতকে প্রকৃত বলে মনে হচ্ছে এবং প্রকৃত দৃষ্টির অন্তরালে চলে যাচ্ছে। এমনটি হওয়ার কারণ হলে মনের এক অদ্ভুত ক্ষমতা। মন তার নিজের কোন কোন ধর্মকে বাইরের বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত করে সেই বস্তুর ধর্ম-রূপে প্রত্যক্ষ করে। দ্রুতগামী শকটে চড়ে আমরা যখন বাইরের দিকে তাকাই তখন বাইরের গাছ-পালা যেন বিপরীত দিকে দৌড়চ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। পৃথিবী গতিময়। পৃথিবীর গতি তারই বুকে চড়ে আছে যে মানুষ, তারও গতি। মানুষের মন (বা মস্তিষ্ক) সেই গতিকে সূর্যে প্রক্ষিপ্ত করে সূর্যকে গতিময় দেখছে, এবং নিজেকে গতিহীন দেখছে।

২.৩.৯ Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প

অতঃপর Kant - এর প্রকল্পে আসা যাক। Kant -এর প্রকল্পটি জ্ঞানের সম্ভাবনা সংক্রান্ত প্রকল্প। কোন কিছু জানার অর্থ হল কেউ জানে এবং কাউকে বা কিছুকে জানে। যে জানে সে হল বিষয়ী এবং যা জানা যায় তা হল বিষয়। Kant -এর পূর্ববর্তী দার্শনিকেরা বলতেন যে জ্ঞান হল বিষয়-কেন্দ্রিক। মানুষের চিত্ত বিষয়ের দিকে প্রসারিত হলে বিষয় চিত্তে তার ছাপ ফেলে। তার কবলে বিষয়টিকে জানা যায়। অর্থাৎ, জ্ঞান হল বিষয়ের চিত্ত-রূপ। এক্ষণে, কোপার্নিকীয় প্রকল্পে যেমন, Kant -এর প্রকল্পেও বলা হয়েছে যে বিষয় জ্ঞান-কেন্দ্রিক বা বিষয়ী-কেন্দ্রিক। Kant ব্যাখ্যা করে বলেন, বিষয়ের থাকা এবং বিষয়কে জানা এক নয়। বিষয় থাকে এক রূপে আর তাকে জানা যায় আর এক রূপে। বিষয়ী বিষয়কে জানে নিজের মত করে, তার নিজের রূপে। সেই হেতু বিষয়ের জ্ঞান হল বিষয়ী-কেন্দ্রিক, বিষয়-কেন্দ্রিক নয়। বিষয়ী বিষয়কে জানে দেশ-কালের রূপে, কারণ, কার্য, দ্রব্য, গুণ, ইত্যাদি অর্থে (ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় 'নাম')। বিষয় হল নাম-রূপ বিষয়। অথচ নাম-রূপ বিষয়ের নিজস্ব ধর্ম নয়, এগুলি বিষয়ী-বুদ্ধি থেকে আসে। নাম-রূপ বাদ দিলে বিষয়ের যা স্বস্থিতি তা মানুষের জ্ঞানগম্য নয়।

এক্ষণে, Kant বলেন জ্ঞানের সাথে জ্ঞানের বিষয়ের সম্পর্ক বিষয়ে পূর্বতন দার্শনিকদের যে প্রকল্প সেই প্রকল্প অনুযায়ী কি-রূপে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (অর্থাৎ, প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণে আবদ্ধ হতে পারে এমন জ্ঞান) সম্ভব তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু Kant -এর প্রকল্প সে ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। একটি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ, যথা, "ত্রিভূজের অন্তস্থিত তিনটি কোণের সমষ্টি সমান দুই সমকোণ", সকল দেশে, সকল কালে এবং সকলের কাছে সত্য। কিন্তু জ্ঞান যদি বিষয়-কেন্দ্রিক হয় তাহলে যে ত্রিভূজ এখনও আঁকাই হয় নি, অর্থাৎ যা অনাগত, তার সম্পর্কে কি-ভাবে বলা যায় যে সেটিও দুই সমকোণ বিশিষ্ট হবে। অনুরূপ, যে ঘটনা এখনও ঘটেনি তার সম্পর্কে কিভাবে বলা যায় যে, তারও কারণ আছে। অপরদিকে, বিষয় যদি জ্ঞান-কেন্দ্রিক হয় তাহলে বাস্তবিক ও সম্ভাব্য জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ঠিক করে বলা যায় যে বিষয়ের মধ্যে বিষয়ী-চিত্তের কিছু কিছু আকার অবশ্যই থাকবে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হল বিষয় সম্পর্কে সার্বজনীন ও অনিবার্য জ্ঞান। বিষয়ের সার্বজনীনতা ও অনিবার্যতা তার আকারের সাথে যুক্ত এবং সেই আকার আবার বিষয়ী বুদ্ধির আকার। ফলে বাস্তবিক ও সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে সার্বিক বৈজ্ঞানিক বাক্য গঠন করা সম্ভব।

২.৩.১০ কিভাবে Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প Copernicus -এর প্রকল্পের সাথে তুলনীয়?

পরিশেষে, যে প্রশ্নটি বারে বারে উঠে এসেছে তা হল, Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রকল্প কি-ভাবে Copernicus -এর প্রকল্পের সাথে তুলনীয়। উক্ত প্রকল্পের তুলনা পদ্ধতিগত বলা যায় আবার তত্ত্বগতও বলা যায়। উভয় প্রকল্পে কেন্দ্রের ধারণা পাল্টান হয়েছে, এবং উভয় প্রকল্পে আপাত-প্রকৃত নিরূপণে মনের ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে।

কোপার্নিকীয় প্রকল্প গৃহীত হওয়ার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অনুসন্ধানের নুতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। Kant -এর দাবী তাঁর প্রকল্প গৃহীত হলে অধিবিদ্যার উপর তারও প্রভাব হবে সুদুরপ্রসারী। প্রথমতঃ কোন কোন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হতে পারে তা সুনির্দিষ্ট হবে। তার ফলে, যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান হয় না সে বিষয় নিয়ে বৃথা আলোচনা ও অনুসন্ধানে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হবে না। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানের জগৎ সীমিত হয়ে দেখা দিলেও বিশ্বাসের জগৎ উন্মোচিত হবে। যা বিশ্বাসের বিষয় তাকে জ্ঞানের বিষয় বলে ভুল করলে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তাকে মুক্ত রাখা যাবে। কোপার্নিকীয় প্রকল্প গৃহীত হওয়ার ফলে একটি বিষয় যা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হবে তা হল — পরাজগৎ বা ইন্দ্রিয়াতীত জগত সম্পর্কে অধিবিদ্যা কোন জ্ঞান দেয় না। তাহলে, অধিবিদ্যা পরাবিদ্যা নয়। অধিবিদ্যা হবে প্রকৃতির অধিবিদ্যা (metaphysics of nature), নৈতিকতার অধিবিদ্যা (metaphysics of morals), সৌন্দর্যানুভূতির অধিবিদ্যা (metaphysics of taste), ইত্যাদি। অধিবিদ্যার কাজ হবে জ্ঞান, কর্ম, সৌন্দর্যানুভূতি ইত্যাদির অনিবার্য বৌদ্ধিক পূর্বশর্তগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা। সহজ কথায়, অধিবিদ্যা হবে সেই বুদ্ধির অনুসন্ধান যে বুদ্ধিকে কেন্দ্র করে জ্ঞানের জগৎ, কর্মের জগৎ এবং সৌন্দর্য-অনুভবের জগৎ আবর্তিত।

২.৪ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

1. What is the central objective of Kant's critical philosophy? (২.২, ২.২.১, ২.২.২, ২.২.৩, ২.৩)
2. Explain Kant's Copernican standpoint in philosophy. (২.৩, ২.৩.৯, ২.৩.১০)
3. How does Copernicus' 'Primary Hypothesis' compare with Kants' hypothesis concerming the possibility of knowledge? (২.৩.৭, ২.৩.৭.১, ২.৩.৮.২, ৩.৯, ২.৩.১০)

২.৫ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী Suggested further readings

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kant's Critique of Pure Reason*
2. H. J. Paton, *Kants' Metaphysic of Experience*, Vol. I
3. A. C. Ewing, *A short Commentary on Kants' Critique of Pure Reason*
4. Rasvihary Das, *A Handbook to Kants' Critique of Pure Reason*
5. C. D. Broad, *Kant, An Introduction.*

তৃতীয় পাঠ (Unit-III)

'Critique of Pure Reason' গ্রন্থের কেন্দ্রীয় সমস্যা
(Central Problem of the 'Critique of Pure Reason')

পাঠসংকেত

৩. Critique of Pure Reason গ্রন্থটির বিভাগ

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

৩.১.১ 'প্রাক্‌সিদ্ধ' (*a priori*) -এর সংজ্ঞা

৩.১.২ 'প্রাক্‌সিদ্ধ'-এর দু'টি লক্ষণ

৩.২ অবধারণ (judgement) — প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*) ও পরতসাধ্য (*a posteriori*), বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লেষক (synthetic)

৩.২.১ ঃ প্রাকসিদ্ধ অবধারণ (*a priori judgement*) ও পরতসাধ্য অবধারণ (*a posteriori judgement*)

৩.২.২ বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লেষক (synthetic) অবধারণ

৩.২.৩ অবধারণের ত্রি-বিভাজন

৩.২.৪ অঙ্কে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

৩.২.৫ পদার্থবিজ্ঞানে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

৩.২.৬ অধিবিদ্যায় প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

৩.২.৭ Critique of Pure Reason গ্রন্থের কেন্দ্রীয় সমস্যা — কিভাবে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব?

৩.৩ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

৩.৪ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী : Selected texts for further readings

৩. Critique of Pure Reason গ্রন্থটির বিভাগ

Critique of Pure Reason গ্রন্থটির দু'টি মূল বিভাগ— Transcendental Doctrine of Elements এবং Transcendental Doctrine of Method। প্রথম বিভাগটি মূল বিভাগ। বস্তুতঃ

গ্রন্থটির পাঁচ ভাগের চার ভাগ এই প্রথম বিভাগটি। এই অংশে জ্ঞানের বিভিন্ন দিক, যথা, স্বরূপ, শর্ত, সীমাবদ্ধতা, ইত্যাদি, আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা ও অনুসন্ধানের ফলে যে সমস্ত পরাতত্ত্ব গড়ে উঠেছে সেগুলিকে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগে একটি তন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। Kant -এর ভাষ্যকারেরা অনেক সময় গ্রন্থেব এই দ্বিতীয় বিভাগটিকে উপেক্ষাই করেছেন। প্রথম বিভাগটির দুটি উপ-বিভাগ আছে, তার একটি হল Transcendental Aesthetic এবং অপরটি হল Tanscendental Logic। Transcendental Aesthetic -এ Kant জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত মনের দু'টি শক্তির একটি শক্তি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুসন্ধান করেছেন। Transcendental Logic-এ Kant মনের অপর একটি শক্তি, অর্থাৎ চিন্তাশক্তির অনসুন্ধান করেছেন। Transcendental Logic-এর আবার দুটি উপ-বিভাগ আছে— Transcendental Analytic এবং Transcendental Dialectic। Transcendental Analytic অংশে মানুষের মনের যে চিন্তাশক্তি জ্ঞানার্জনে নিয়োজিত তার আলোচনা করা হয়েছে, এবং Transcendental Dialectic অংশে মানুষের মনের যে চিন্তাশক্তি পরাজাগতিক ও চরম বা পরম সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে নিয়োজিত তার আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থটির বিভাজন সংক্ষেপে দেখান হল :

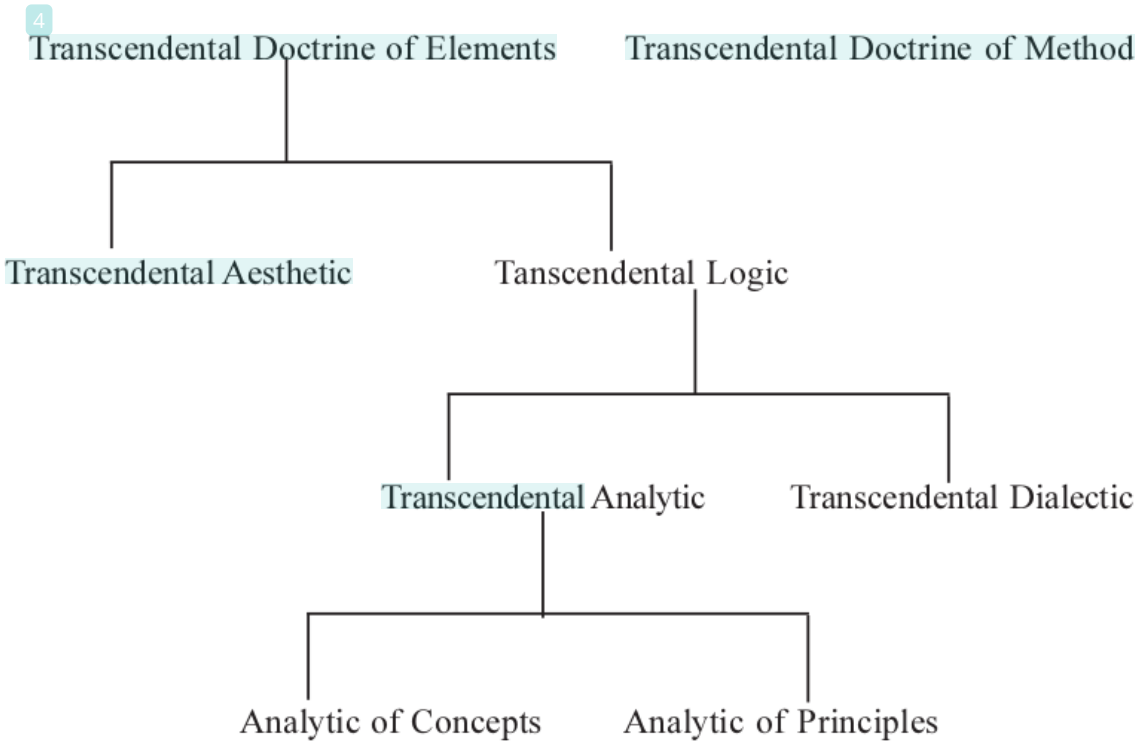

মূল গ্রন্থটির বিভাগ যে-রূপ দেখান হল, তা-ছাড়াও গ্রন্থটির দু'টি সংস্করণে দু'টি পৃথক পৃথক মুখবন্ধ আছে, এবং একটি ভূমিকা বা উপক্রমনিকা (Introduction) আছে। এই ভূমিকা অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

৩.১ ঃ ভূমিকা (Introduction)

প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*) — প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি (*a priori intuition*), প্রাক্‌সিদ্ধ ধারণা (*a priori concept*), প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ (*a priori judgement*)

চূড়ান্ত বুদ্ধিবাদীরা বলেন যে, মানুষের বুদ্ধিই হল মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অপরপক্ষে, চূড়ান্ত অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে, মানুষের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই মানুষের জ্ঞানের একমাত্র উৎস। Kant -এর মতে এই উভয় মতবাদই একদেশদর্শি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার স্পর্শ ছাড়া জ্ঞানের সূত্রপাত ঘটে না— এ হল প্রথম সত্য। কিন্তু, যদিও ইন্দ্রিয় সচকিত হওয়ার পূর্বে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে না, তথাপি একথা বলা চলে না যে, একমাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদনই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। ইন্দ্রিয় সংবেদন হল জ্ঞানের আগম, কিন্তু জ্ঞানের সব-কিছু নয়। মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার যা-কিছু দ্বারা সমৃদ্ধ তার অনেক-কিছুই বুদ্ধির দান। সেগুলি ইন্দ্রিয় সংবেদন নিরপেক্ষ, বুদ্ধিজাত, এবং সেই কারণে প্রাক্‌সিদ্ধ।

৩.১.১ 'প্রাক্‌সিদ্ধ' (*a priori*)-এর সংজ্ঞা

'প্রাক্‌সিদ্ধ' কথাটিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে Kant বলেন, "We shall understand by a priori knowledge not knowledge independent of this or that experience, but knowledge absolutley independent of all experience."। অর্থাৎ, সরাসরি ও অসরাসরি, সকল প্রকার ইন্দ্রিয় সংবেদন নিরপেক্ষ জ্ঞান হল প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান। উদাহরণ-স্বরূপ, কোন একটি বাড়ি সম্পর্কে আমি আগেই জানি যে সেটির ভিত্তি-ভূমি খুঁড়ে ফেলা হলে সেটি ভেঙে পড়বে। বাড়িটি যে প্রকৃতই ভেঙে পড়েছে, এবং তা দেখে যে আমার বাড়িটি সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান হয়েছে, তা-নয়। তা-হলে কি একে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান বলা যাবে? না, বলা যাবে না। এ হল অনুমান-লব্ধ জ্ঞান, এবং এই অনুমান গঠনে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। কিন্তু যে জানে যে দু'টি সরলরেখা কেবলমাত্র একটি বিন্দুতে পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করতে পারে, সে কোন অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই এ সত্য জানে।

Kant 'প্রাকসিদ্ধ জ্ঞান' বলতে জ্ঞানের উপাদান ও অবধারণকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি 'জ্ঞান' কথাটিকে বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান তিন প্রকার। কোন কোন প্রতীতি, যেমন, দেশ ও কালের প্রতীতি, কোন কোন ধারণা, যেমন, দ্রব্যের ধারণা, কার্য-কারণের ধারণা, ইত্যাদি, এবং কোন কোন অবধারণ, যেমন, 'সকল ঘটনার কারণ আছে', '২+২=৪', ইত্যাদি, হল প্রাক্‌সিদ্ধ। প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণগুলি আবার বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ হতে পারে। বিশুদ্ধ প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের প্রতিটি ধারণাই প্রাক্‌সিদ্ধ। যেমন, 'AB হয় B' এই অবধারণটি বিশুদ্ধ প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ। অন্যদিকে, 'প্রতিটি ঘটনার কোন না কোন কারণ আছে' হল অবিশুদ্ধ প্রাকসিদ্ধ অবধারণ। এখানে কোন প্রকার ইন্দ্রিয় সংবেদনের সাহায্য ছাড়াই বিধেয়, অর্থাৎ, 'কারণ'-এর ধারণাকে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ 'ঘটনা'-এর ধারণার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য 'ঘটনা'র ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ধারণা নয়।

৩.১.২ 'প্রাক্‌সিদ্ধ'-এর দু'টি লক্ষণ

Kant 'প্রাক্‌সিদ্ধ'-এর দু'টি লক্ষণের কথা বলেন। লক্ষণ (mark) দু'টি হল অনপেক্ষ সার্বিকতা (strict universality) এবং অনিবার্যতা (necessity)। এই দু'টি লক্ষণের কোন একটি পাওয়া গেলে প্রাক্‌সিদ্ধ বুঝতে হবে। 'সকল কাক হয় কালো' একটি সার্বিক বচন, কিন্তু অনপেক্ষ সার্বিক বচন নয়। এটি অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ, অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু ভবিষ্যত সম্পর্কে সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং বচনটি প্রাক্‌সিদ্ধ নয়। প্রাক্‌সিদ্ধের অপর লক্ষণ হল অনিবার্যতা। কোন কিছু অনিবার্য, তার অর্থ হল তার বিপরীত কিছু সম্ভব এরূপ চিন্তাই করা যায় না।

৩.২ ঃ অবধারণ (judgement) — প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*) ও পরতসাধ্য (*a posteriori*), বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লেষক (synthetic)

Critique of Pure Reason গ্রন্থের ভূমিকা অংশে Kant বিশেষরূপে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণকেই আলোচনার জন্য হাজির করেছেন। তার জন্য প্রথমে তিনি অবধারণের দু'প্রকার বিভাজনের আলোচনা করেছেন।

অবধারণ (judgement) : অবধারণ হল একপ্রকার ধারণা-সংযোগ। একটি অবধারণে দু'টি ধারণা থাকে, যার একটি উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়। অবধারণের মধ্য দিয়ে বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে যুক্ত হয়। যুক্ত হওয়ার অর্থ হল, বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছু স্বীকার করে বা অস্বীকার করে। 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' এই অবধারণটিতে মরণশীলতার ধারণা সকল মানুষ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে। অবধারণ ভাষায় ব্যক্ত হলে তাকে বলা হয় বচন। আলোচনার সুবিধার্থে অনেক সময় 'বচন' ও 'অবধারণ' সমার্থক হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছে।

৩.২.১ ঃ প্রাকসিদ্ধ অবধারণ (*a priori judgement*) ও পরতসাধ্য অবধারণ (*a posteriori judgement*)

সংবেদন-জাত অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই যেখানে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে যুক্ত হয় সেখানে আমরা প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ পাই। উদাহরণস্বরূপ, '২+২=৪' এই অবধারণটি প্রাক্‌সিদ্ধ। '২+২' এবং '৪'র সমতা কোন সংবেদনের মাধ্যমে পাই না। অপরপক্ষে, 'গাছের পাতাগুলি হয় সবুজ' একটি পরতসাধ্য অবধারণ। গাছের পাতাগুলির সাথে যে সবুজের যোগ তা একমাত্র ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানতে পারি, এবং সেই কারণে পরতঃ।

৩.২.২ ঃ বিশ্লেষক (analytic) ও সংশ্লেষক (synthetic) অবধারণ

Immanuel Kant বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্য এই-ভাবে তুলে ধরেন:

"In all judgements in which the relation of a subject to the predicate is thought (I take into consideration affirmative judgements only, the subsequent application to negative judgements being easily made), this relation is possible in two different ways. Either the predicate B belongs to the subject A, as something which is (covertly) contained in this concept A; or B lies outside the concept A, although it does indeed stand in connection with it. In the one case I entitle judgement analytic, in the other synthetic".

তা-হলে, একটি অবধারণে দুটি স্বতন্ত্র ধারণা থাকে, যার একটি উদ্দেশ্য এবং অপরটি বিধেয়। এক্ষণে, যে অবধারণে বিধেয়-ধারণাটি উদ্দেশ্য-ধারণার মধ্যে স্পষ্টত অথবা গুপ্তভাবে নিহীত থাকে, উদ্দেশ্য-ধারণাটি বিশ্লেষণ করে বিধেয় ধারণাটি পাওয়া যায়, এবং তাদাত্ম্য সম্বন্ধে বিধেয়কে উদ্দেশ্যের সাথে যুক্ত করা হয়, সেইটি হল বিশ্লেষক অবধারণ। Kant বিশ্লেষক অবধারণের যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হল— 'জড়বস্তু হয় বিস্তৃতি-সম্পন্ন।' অবধারণটি বিশ্লেষক তার কারণ 'জড়' এই ধারণার মধ্যে 'বিস্তৃতি' ধারণাটি নিহীত। বিশ্লেষক অবধারণের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

ক) বিশ্লেষক অবধারণ হয় পরিস্ফুটন মূলক, সম্প্রসার-মূলক নয়। এখানে যে ধারণা ইতিমধ্যে উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয়েছে তাকেই বিশ্লেষণ করা হয়, ফুটিয়ে তোলা হয়, এবং নূতন করে দেখা হয় মাত্র।

খ) বিশ্লেষক অবধারণ হল অ-তথ্যমূলক। তথ্যের সংযোজন নয়, অর্থ বিশ্লেষণই হল এর প্রাণ।

গ) বিশ্লেষক অবধারণ হল অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ, কোন প্রকার অভিজ্ঞতার সাহায্যে এর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা যায় না।

ঘ) বিশ্লেষক অবধারণ হল সদা সত্য অবধারণ। তর্কের অ-বিরোধ নীতি (law of non-contradiction) কাজ করায় অবধারণটি সত্য হয়। একটি বিশ্লেষক অবধারণকে মিথ্যা বলতে হলে স্ব-বিরোধিতাকে মেনে নিতে হয়, কিন্তু স্ব-বিরোধিতা তর্ক-অসম্মত।

ঙ) বিশ্লেষক অবধারণ অ-তথ্যমূলক, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় নয়। অস্পষ্টকে সুস্পষ্ট করতে, পুনরুক্তি এড়াতে, স্ববিরোধিতা মুক্ত করতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে এরূপ অবধারণ একান্তই জরুরী, যদিও অবশ্য বিজ্ঞানের কোন নীতি বা সূত্র এরূপ অবধারণের সাহায্যে গঠিত হয় না।

বিশ্লেষক অবধারণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হল সংশ্লেষক অবধারণ। সংশ্লেষক অবধারণে বিধেয়-ধারণাটি কোনভাবেই উদ্দেশ্য-ধারণার মধ্যে নিহীত থাকে না। এখানে উদ্দেশ্য বহিরাগত ধারণাকে বিধেয়রূপে ব্যবহার করে উদ্দেশ্যের সাথে সংযুক্ত করা হয়। Kant সংশ্লেষক অবধারণের উদাহরণ দিয়েছেন— 'জড়বস্তু

হয় ওজনসম্পন্ন।' জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে ওজনের ধারণা নিহীত নয়, কিন্তু ওজন থাকা জড়বস্তুর বিভিন্ন গুণের মধ্যে একটি গুণ যা আমরা অভিজ্ঞতায় পাই।

সংশ্লেষক অবধারণের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

ক) সংশ্লেষক অবধারণ হল সম্প্রসারণমূলক। এই অবধারণে পূর্বে গৃহীত উদ্দেশ্য-ধারণাটি নূতন ধারণার সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে বিস্তৃত হয়।

খ) সংশ্লেষক অবধারণ হল তথ্যমূলক। এই অবধারণে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নূতন তথ্য পাওয়া যায়।

গ) সংশ্লেষক অবধারণ হল অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ অবধারণ। এই অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয় সংবেদন-জাত অভিজ্ঞতা হতে পারে অথবা ইন্দ্রিয় সংবেদন-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা হতে পারে।

ঘ) সংশ্লেষক অবধারণ সত্য হতে পারে, অনিবার্য সত্য হতে পারে, অথবা মিথ্যা হতে পারে।

ঙ) প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নীতি ও সূত্র-গুলি এই-রূপ অবধারণের সাহায্যে গঠিত হয়। সেগুলি একাধারে প্রাক্‌সিদ্ধ ও সংশ্লেষক।

৩.২.৩ অবধারণের ত্রি-বিভাজন

Kant -এর পূর্ববর্তী Hume প্রভৃতি দার্শনিকেরা অবধারণের প্রাক্‌সিদ্ধ-পরতসিদ্ধ ও বিশ্লেষক-সংশ্লেষক বিভাজনকে পরস্পর সমান্তরাল বিভাজন বলে গণ্য করতেন। অর্থাৎ, তাঁরা বলতেন যে, সকল প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ হয় বিশ্লেষক, এবং সকল পরতসাধ্য অবধারণ হয় সংশ্লেষক। কিন্তু Kant বলেন, অবধারণের ঐ বিভাজনদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল নয়, বরং পরস্পরচ্ছেদি। তাঁর মতে বিভাজনদ্বয় থেকে তত্ত্বগতভাবে চার প্রকার অবধারণ পেতে পারি, কিন্তু তিন-প্রকার অবধারণ প্রকৃত সম্ভব। এই তিন প্রকার অবধারণ হল :

১) প্রাক্‌সিদ্ধ বিশ্লেষক

২) প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক

৩) পরতসাধ্য সংশ্লেষক

উক্ত তিন-প্রকার অবধারণের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ, প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের সম্ভাবনা বিষয়ে দার্শনিক মহলে বিসংবাদ দেখা যায়। কোন কোন দার্শনিক প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। কিন্তু Kant বলেন, প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ গঠন করা সম্ভব, এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এরূপ অবধারণের অস্তিত্ব আছে।

৩.২.৪ অঙ্কে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

প্রথমতঃ, Kant বলেন, অঙ্কের প্রতিটি অবধারণই হল প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক। এগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ, কারণ এগুলি আবশ্যিক বা অনিবার্য সত্য, এবং অনিবার্যতা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। কিন্তু অনেকে বলবেন, একটি পাটিগাণিতিক বচন, যেমন, '৭+৫=১২' সংশ্লেষক নয়, বিশ্লেষক। তারা বলবেন, বচনে ব্যবহৃত '=' চিহ্নটি

তাদাত্ম্য ব্যক্ত করে, এবং তাদাত্ম্য বিশ্লেষকের দ্যোতক। কিন্তু Kant বলেন, '=' বা 'সমান' পুরোপুরি তাদাত্ম্য নয়। যেমন, 'একটি পোষাকের দাম সমান এক জোড়া জুতোর দাম' বচনটিতে 'সমান' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এখানে তাদাত্ম্য নাই। '৭+৫=১২' এই পাটিগণিতিক বচনটির উদ্দেশ্য অংশে দু'টি সংখ্যার সংযোগ-এর কথা বলা হয়েছে (১১ সংখ্যাটির পরবর্তী সংখ্যা হল ১২)। Kant -এর মতে '+', 'x', '–', '..', ইত্যাদি, বিশ্লেষণ ক্রিয়া নয়, এগুলি সংশ্লেষণ ক্রিয়া। ৭ এবং ৫ এই দু'টি সংখ্যা সংযোগে সংশ্লিষ্ট হলে নূতন একটি সংখ্যা ১২ পাওয়া যায়। একটি জ্যামিতিক বচনের উদাহরণ নিলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়। 'একটি সরলরেখা হল যে-কোন দু'টি বিন্দুর মধ্যে নিকটতম দূরত্ব' — এই বচনটির উদ্দেশ্য 'সরলরেখা' গুণের কথা বলে, এবং বিধেয় 'নিকটতম দূরত্ব' পরিমাণের কথা বলে। কিন্তু পরিমাণ ও গুণ তাদাত্মক নয়। প্রসঙ্গতঃ Kant -এর মতে অঙ্কের সংজ্ঞাগুলিও সংশ্লেষক অবধারণ। বস্তুতঃ, Kant বলেন, একমাত্র অঙ্কে সংজ্ঞা পাওয়া যায়, অন্য কোথাও নয়। সহজকথায়, অঙ্কের যে বিশাল প্রগতি তা শুধুমাত্র কতিপয় ধারণা বা অর্থ-বিশ্লেষণে সাধিত হয়েছে এমন নয়। অঙ্কের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে দেশ ও কালের বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ছোঁয়া। এই যে আমরা আঙ্গুলের সাহায্যে বা বিন্দু ইত্যাদি মূর্ত প্রতিরূপের সাহায্যে গণনা করি, তার মধ্যে বিশুদ্ধ কালের অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়। এবং এই কারণেই অঙ্কের অবধারণগুলি অভিজ্ঞতার জগতে প্রযুক্ত হয়।

Kant বলেন, অঙ্কের প্রতিটি অবধারণ (সংজ্ঞাগুলি সমেত) প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্লেষক অবধারণের কোন জায়গা নাই। অঙ্কের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত জ্যামিতিতে, কিছু মূলনীতি পাওয়া যায় যেগুলি প্রকৃতই বিশ্লেষক এবং যেগুলি অ-বিরোধের (law of non-contradiction) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সেগুলি তর্কের বচন, অঙ্কের নয়। সেগুলি অঙ্কের সিদ্ধান্ত গঠনে সাহায্য করে। কিন্তু নিজেরা অঙ্ক নয়। এরূপ অবধারণ হল 'A=A', '(A+B)>A' ইত্যাদি।

৩.২.৫ পদার্থবিজ্ঞানে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

পদার্থ বিজ্ঞান (physics) অঙ্ক থেকে কিঞ্চিত ভিন্ন। অঙ্কের প্রতিটি অবধারণই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের সব অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক নয়। কেবলমাত্র, যা বলা হয় বিশুদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞান, অর্থাৎ পদার্থের যেগুলি মূল নীতি, যেমন, সার্বিক কার্য-কারণ নীতি, পদার্থের অবিনশ্বরতার নীতি, ইত্যাদি, হল প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক। এগুলি আবশ্যিক ও এদের মধ্যে বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতার ছোঁয়া আছে।

৩.২.৬ অধিবিদ্যায় প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

অধিবিদ্যায় আমরা এমন অনেক অবধারণ পাই যেগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক রূপে প্রতীয়মান হয়। একটি অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ হলে তা হবে অনিবার্য সত্য। কিন্তু অধিবিদ্যার ঐ অবধারণগুলি সত্য কি-না তা সুনিশ্চিত নয়। সে কারণে Kant বলেন, অধিবিদ্যাগত অবধারণগুলির অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাক্‌সিদ্ধ

সংশ্লেষক (Thus metaphysics consists, at least *in intention*, entirely of *a priori* synthetic propositions.)। উদাহরণ-স্বরূপ, 'জগতের প্রথম জন্মলগ্ন অবশ্যই আছে' হল একটি অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ। কিন্তু এটি প্রকৃত কি-না তা আলাদাভাবে বিচার করতে হবে।

৩.২.৭ Critique of Pure Reason গ্রন্থের কেন্দ্রীয় সমস্যা — কিভাবে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব?

তাহলে, Kant -এর মতে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ গঠন করা সম্ভব এবং তাদের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কি-ভাবে তারা সম্ভব হয়? অর্থাৎ, কোন শর্ত পূরণের মধ্য দিয়ে এরূপ অবধারণ গঠন করা সম্ভব হয়? Kant বলেন তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের এ হল মূল বা কেন্দ্রিয় সমস্যা, এবং এই সমস্যা সমাধানের উপর নির্ভর করছে অধিবিদ্যার ভবিষ্যত। দেখা যাচ্ছে, Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের কেন্দ্রিয় সমস্যাকে একটি প্রশ্নের আকারে হাজির করেছেন — কোন উপায়ে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব? আসলে এই একটি প্রশ্নের মধ্যে তিনটি অথবা চারটি প্রশ্ন আছে। সেই প্রশ্নগুলি হল :

১) কোন উপায়ে অঙ্কে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব হয়?

২) কোন উপায়ে পদার্থ বিজ্ঞানে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব হয়?

৩) অধিবিদ্যায় কি প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ সম্ভব?

৪) যদি অধিবিদ্যায় প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব নয়, তাহলে কোন উপায়ে তা-সম্ভব?

এক্ষণে দেখা যাক সমস্যাটির অন্তর্নিহিত স্বরূপটি কি। Kant বলেন, কোন একটি অবধারণ যদি বিশ্লেষক হয় তা-হলে উদ্দেশ্যের ধারণা বিশ্লেষণ করে তর্কের নিয়মে ঐ বিশ্লিষ্ট ধারণাটিকে উদ্দেশ্যের ধারণা সাথে জুড়ে দিয়ে অবধারণটি গঠন করা সম্ভব। বলা বাহুল্য, প্রতিটি বিশ্লেষক অবধারণই প্রাক্‌সিদ্ধ। অবধারণটি যদি পরতসাধ্য সংশ্লেষক হয় তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিধেয়ের ধারণাটিকে উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অবধারণটি যদি প্রাক্‌সিদ্ধ হয় তাহলে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার অবধারণটি যদি সংশ্লেষক হয় তা-হলে বিশ্লেষণের উপায়েও তর্কের নিয়মে তাকে দাঁড় করানো যায় না। তা-হলে কোন একটি তৃতীয় ভূমি নিশ্চয় আছে যে ভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ গঠিত হয়। ঐ তৃতীয় ভূমিটিকে খুঁজে বার করাই হল সমস্যা। Critique of Pure Reason গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

৩.৩ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

1. Explain the main divisions of Kants' *Critique of Pure Reason*. (৩)
2. What is a priori knowledge, according to Kant? What are the marks of *a priori* knowledge? What are the different types of *a priori* knowledge that Kant admits? (৩.১, ৩.১.২)

3. Distinguish, after Kant, between analytic and synthetic judgements. (৩.২.২)
4. Are there judgements which are both synthetic and *a priori*? If such judgements exist how are they possible? (৩.২.৪, ৩.২.৫, ৩.২.৬)
5. Discuss what Kant regards as the central problem of the Critique of Pure Reason. (৩.২, ৩.২.৬)
6. Critically discuss Kants' view that all mathematical judgements are synthtic *a priori*. (৩.২.৪)
7. What exactly is the problem of synthetic *a priori* judgement? (৩.২.৭)

৩.৪ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী : **Selected texts for further readings**

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kant's Critique of Pure Reason*
2. H. J. Paton, *Kant's Metaphysic of Experience*, Vol. I
3. P. F. Strawson, *The Bounds of Sense*
4. Jonathan Bennet, *Kants' Analytic*
5. W. H. Walsh, *Reason and Experience*
6. মণিদীপা সান্যাল, ''বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণ — কান্টের শ্রেণীবিভাগ'', **তত্ত্ব** ও ***প্রয়োগ*** — *কান্টের দর্শন*
7. মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, ''সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক বচন — কান্টের দুই উত্তরসূরির অভিমত'', **তত্ত্ব** ও ***প্রয়োগ*** — *কান্টের দর্শন*
8. তুষার সরকার, ''কান্টের পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন ঃ একটি বিশ্লেষণ'', **তত্ত্ব** ও ***প্রয়োগ*** — *কান্টের দর্শন*

চতুর্থ পাঠ (Unit-IV)

ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরাতত্ত্ব
(TRANSCENDENTAL AESTHETIC)

পাঠসংকেত

৪ স্বজ্ঞা (intuition), ইন্দ্রিয়বৃত্তি (sensibility), প্রতিভাস (appearance), প্রতিভাসের আকারসমূহ (formsof appearances)

৪.১.১ দেশ ও কাল বিষয়ে Newton -এর তত্ত্ব

৪.১.২ দেশ ও কাল বিষয়ে Leibnitz -এর তত্ত্ব

৪.১.৩ দেশ ও কাল বিষয়ে Kant -এর তত্ত্ব

৪.১.৪ দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি — Kant -এর এই তত্ত্বের সমর্থনে দু'প্রকার যুক্তি

৪.২ দেশের স্বরূপ সম্পর্কে আধিবিদ্যক যুক্তি

৪.২.১ প্রথম যুক্তি

৪.২.২ দ্বিতীয় যুক্তি

৪.২.৩ তৃতীয় যুক্তি

৪.২.৪ চতুর্থ যুক্তি

৪.৩ দেশ সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concept of Space)

৪.৪ অনুসিদ্ধান্ত

৪.৫ কাল (Time)-এর স্বরূপ নির্ণয়ে আধিবিদ্যক যুক্তি

৪.৫.১ প্রথম যুক্তি

৪.৫.২ দ্বিতীয় যুক্তি

৪.৫.৩ তৃতীয় যুক্তি

৪.৫.৪ চতুর্থ যুক্তি

৪.৬ কাল সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Expositions of the Concept of Time)

৪.৭ অনুসিদ্ধান্ত

৪.৮ প্রশ্নাবলী (Suggested Questions) ঃ

৪.৯ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী

৪. স্বজ্ঞা (intuition), ইন্দ্রিয়বৃত্তি (sensibility), প্রতিভাস (appearance), প্রতিভাসের আকারসমূহ (forms of appearances)

মানুষের জ্ঞান উদ্ভুত হয় তার মনে এবং তার এই জ্ঞান বিষয়কে অপেক্ষা করে। মন বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়, এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় একপ্রকার মনের অবস্থা যার নাম হল জ্ঞান। এক্ষণে, যে উপায়ে মন সরাসরি জ্ঞানের বিষয়ের সাথে যুক্ত হয় তাকে বলা হয় স্বজ্ঞা বা intuition। অর্থাৎ, স্বজ্ঞা হল সাক্ষাৎ প্রতীতি। স্বজ্ঞা-প্রতীতিকে আশ্রয় করে মানুষের চিন্তা বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়। Kant বলেন, যে-কোন স্বজ্ঞা-প্রতীতিই হল ইন্দ্রিয়ানুভব, এবং একমাত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তির কার্যকারিতার ফলে এই অনুভবের সৃষ্টি হতে পারে। Transcendental Aesthetic হল ইন্দ্রিয়ানুভবের পরাতত্ত্ব, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুসন্ধান ও তত্ত্ব। Kant -এর মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত হয় দেশ ও কালের আকার। দেশ ও কাল হল যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভবের আকার এবং প্রাক্‌সিদ্ধ অনুভব। ফলতঃ ব্যাপক অর্থে ইন্দ্রিয়বৃত্তি হল বিশুদ্ধি বুদ্ধি, এবং Transcendental Aesthetic হল ইন্দ্রিয়বৃত্তি-স্বরূপ বিশুদ্ধ-বুদ্ধির অনুসন্ধান।

Kant -এর মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি হল মনের নিষ্ক্রিয় গ্রহণ-ক্ষমতা। কোন বস্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সচকিত করলে মনের ভিতর সংবেদনের অনুভব জন্মে এবং অপর দিকে মনের বাইরে বস্তু প্রতিভাত হয়। সংবেদন সম্পূর্ণ ব্যক্তিসাপেক্ষ অনুভব, কিন্তু প্রতিভাস হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ অনুভবের অনুসারী প্রদত্ত বস্তু। প্রতিভাসের মধ্যে থাকে আকার ও উপাদান। আকারগুলি হল পাশাপাশি, উপর-নীচ, ভিতর-বাহির, আগে-পরে, ইত্যাদি, প্রতীয়মান দেশ-কালের সম্বন্ধ। এবং, যাদের মধ্যে ঐ সম্বন্ধগুলি ফুটে ওঠে তারা হল প্রতিভাসের উপাদান। দেশ ও কালের আকারগুলির প্রতীতি হয়, কিন্তু তাদের কোন সংবেদন হয় না। অর্থাৎ, দেশ-কালের আকার হল সংবেদন-বিহীন প্রতীতি। অপরদিকে, সংবেদনের অনুভব বস্তু-প্রতিভাসের প্রকার বা উপাদানকে নির্দেশ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বস্তুর রূপ, রস, গন্ধ, ইত্যাদি পাই। আর যে দেশ-কালের আকারে ঐ রূপ, রস, গন্ধ, ইত্যাদি প্রতিভাত হয় তাদেরকে সংবেদন-বিহীন বিশুদ্ধ অনুভবে পাই। প্রতিভাস নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ-স্বরূপ। Kant -এর মতে তাকে জ্ঞানের বিষয় বলা চলে না। প্রতিভাস বুদ্ধির ধারণায় ব্যাখ্যাত হলে তা জ্ঞানের বিষয় হয়।

Transcendental Aesthetic অংশের মূল আলোচ্য বিষয় হল দেশ ও কাল। অঙ্কের বচনগুলি ঐ দেশ ও কাল সম্পর্কে সত্য বচন। Kant -এর মতে আমাদের বাস্তবিক ও সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগৎ হল প্রতিভাসের জগৎ, এবং দেশ ও কাল প্রতিভাসের আকার। দেশ ও কাল সম্পর্কে যা কিছু সত্য তার সবই অভিজ্ঞতার জগৎ সম্পর্কেও সত্য। ফলতঃ অঙ্কের বচনগুলি অভিজ্ঞতার জগতে প্রযুক্ত।

৪.১ দেশ ও কাল (Space and Time)

দেশ ও কালের স্বরূপ বিষয়ে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা বহু তত্ত্ব দিয়েছেন। Kant -এর সময় যে দু'টি বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক তত্ত্ব বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল তার একটি হল Newton -এর তত্ত্ব এবং অপরটি হল অঙ্কশাস্ত্রবিদ ও দার্শনিক Leibnitz-এর তত্ত্ব। Kant উভয়ই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোনটিই গ্রহণ করেন-নি। দেশ ও কাল বিষয়ে তিনি নিজের তত্ত্ব দিয়েছেন।

৪.১.১ দেশ ও কাল বিষয়ে Newton-এর তত্ত্ব

Newton -এর মতে দেশ ও কাল উভয়ই হল দ্রব্য-সত্তা। এগুলি অনন্তপ্রসারী, আধারস্বরূপ, ফাঁকা দ্রব্য। দেশ জড়বস্তুর আধার এবং কাল হল ঘটনার আধার। দেশ অনন্তপ্রসারী হওয়ায় যে-কোন জড়দ্রব্যই তাতে স্থান পেতে পারে। অনুরূপ, কালে যে-কোন সংখ্যক ঘটনাই ঘটতে পারে। দেশ ও কাল উভয়ই ফাঁকা আধার হওয়ায়, এবং কারুরই কোন উপাদান না থাকায়, একে অপরের প্রতিবন্ধক হয় না। অর্থাৎ, যে বস্তু দেশে থাকে সেই একই বস্তুর পরিবর্তন কালে সংঘটিত হতে পারে। প্রসঙ্গত, ঘটনা হল বস্তুর পরিবর্তন।

Newton চূড়ান্ত দেশ (absolute space) এবং চূড়ান্ত কাল (absolute time) এবং আপেক্ষিক দেশ (relative space) ও আপেক্ষিক কাল (relative time) -এর মধ্যে পার্থক্য করেন। চূড়ান্ত দেশ হল অনন্ত মহাশূন্য যার কোন পরিমাপ হয় না। চূড়ান্ত কালও ঠিক তাই। অপরদিকে, দেশে অবস্থিত একটি জড়বস্তু থেকে অপর একটি জড়বস্তুর দূরত্ব পরিমাপযোগ্য। এই পরিমাপ হল আপেক্ষিক দেশের পরিমাপ। অনুরূপ, একটি ঘটনা থেকে আর একটি ঘটনার কালিক দূরত্ব হল আপেক্ষিক কালের পরিমাপ। Newton বলেন তাঁর তিনটি গতির সূত্র (laws of motion) চূড়ান্ত দেশ ও চূড়ান্ত কালে জড়বস্তুর প্রকৃত চলাচল বা প্রকৃত গতি ব্যক্ত করে। গতি হল কালে জড়বস্তুর স্থান পরিবর্তন। অপরদিকে আপেক্ষিক দেশ ও আপেক্ষিক কাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গতির পরিমাপ দেয়। Newton -এর চূড়ান্ত দেশ-কাল ও আপেক্ষিক দেশ-কাল যেন Plato -এর প্রকৃত (reality) এবং আভাস (appearance)-এর ছায়া, এবং অনেক কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদই মনে করেন যে, Newton -এর বুদ্ধিগ্রাহ্য দেশ-কাল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ-কালের পার্থক্য তাঁর গতিসূত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আসলে Newton ছিলেন একজন একনিষ্ঠ খৃষ্টান, এবং খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব (theology) -কে সামনে রেখেই তিনি চূড়ান্ত-বুদ্ধিগ্রাহ্য ও আপেক্ষিক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেশ-কালের পার্থক্য করেছেন। প্রাক্তন সন্ধি (Old Testament)-তে বলা হয়েছে যে, আদিতে ঈশ্বর ছিলেন কিন্তু জগৎ ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল, এবং তিনি শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করলেন। যাই হোক্, জগতের আবির্ভাব হল একটি ঘটনা, এবং কোন কিছু ঘটার প্রাক্‌শর্ত হল কালের অস্তিত্ব। পুনরায়, জগৎ জড়বস্তু দ্বারা গঠিত, এবং জড়বস্তুর আবির্ভাবের প্রাক্‌শর্ত হল দেশের অস্তিত্ব। Newton বলেন, ঈশ্বর নিজের অন্তর থেকে দেশ ও কালে উৎসারিত করে তথায় জগতের আবির্ভাব ঘটিয়ে জগতকে প্রতিস্থাপিত করেছেন। সহজেই বুঝা যায় যে, Newton -এর দেশ-কাল তত্ত্ব তাঁর বিজ্ঞানের গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে গভীর পরাতত্ত্ব (theories of speculative metaphysics) ও ধর্মতত্ত্বের দিকে এগিয়েছে, এবং Kant -এর বিচারে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

৪.১.২ দেশ ও কাল বিষয়ে Leibnitz-এর তত্ত্ব

Leibnitz ছিলেন Newton -এর সম-সাময়িক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি দেশ ও কালের যে তত্ত্ব দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে দেশ ও কাল হল গুণ-সত্তা। গুণ দ্রব্যাশ্রয়ী, কিন্তু দ্রব্য নয়। দেশ ও কাল দু'ধরনের সম্বন্ধ-গুণ। দেশ হল জড়বস্তুর সাথে জড়বস্তুর সম্বন্ধ, এবং জড়বস্তুতে যে পরিবর্তন হয় সেই

পরিবর্তনের সম্বন্ধ হল কাল। উপর-নীচ, পাশাপাশি, ভিতর-বাহির, ইত্যাদি হল দৈশিক সম্বন্ধ, এবং আগে-পরে, ইত্যাদি হল কালিক সম্বন্ধ। Leibnitz -এর দেশ-কালের তত্ত্ব তাঁর মনাদ বা চিদানু তত্ত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু অনেকে মনে করেন গতি-তত্ত্বের সাথে এরূপ দেশ-কালের ধারণাকে মেলানো যায় না।

৪.১.৩ দেশ ও কাল বিষয়ে Kant -এর তত্ত্ব

Kant-এর মতে দেশ ও কাল কোন প্রকার দ্রব্য নয়, বা গুণ নয়, প্রতিভাসের আকার-মাত্র, ব্যবহারিক দিক থেকে বাস্তব কিন্তু পারমার্থিক কিছু নয় (empirically real but transcendentally ideal)। তিনি তাঁর দেশ-কাল বিষয়ক এই তত্ত্ব হাজির করেছেন একই বিষয়ের উপর জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত অনুসিদ্ধান্তরূপে। দেশ ও কাল বিষয়ে Kant -এর জ্ঞানতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত হল— দেশ ও কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ অনুভব বা প্রতীতি (space and time are a priori inuitions)। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সপক্ষে তিনি দু'প্রকার যুক্তি দিয়েছেন। ঐ যুক্তিগুলিই হল Transcendental Aesthetic -এর মূল যুক্তি।

৪.১.৪ দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি — Kant -এর এই তত্ত্বের সমর্থনে দু'প্রকার যুক্তি

যে দু'প্রকার যুক্তি দিয়ে Kant প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে দেশ ও কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি, তার প্রথম প্রকার হল অধিবিদ্যক যুক্তি (Metaphysical Exposition of the Concepts of Space and Time) এবং দ্বিতীয় প্রকার হল প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত- বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concepts of Space and Time)। উভয় প্রকার যুক্তিই হল পরাতাত্ত্বিক যুক্তি।

দেশ ও কাল সম্পর্কে Kant বলেন যে সেগুলি হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি (*a priori* intuitions)(; সেগুলি পরতঃসিদ্ধ নয়, সেগুলি ধারণা নয়। কিন্তু যুক্তিগুলির শিরোনাম দিয়েছেন Metaphysical Exposition of the Concept of Space, Metaphysical Exposition of the Concept of Time ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। Kant -এর একজন অতি-বিখ্যাত ভাষ্যকার N. K. Smith বলেন, Kant এখানে 'concept' কথাটি কিছুটা এলোমেলোভাবে ও প্রসারিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ, 'concept' বলতে তিনি যে-কোন প্রকার প্রতিবেদন (representation) -কেই বুঝিয়েছেন। চিত্তে যা সরাসরি বা সাক্ষাতে প্রতিবেদিত হয় তা হল স্বজ্ঞা, আর যা অসরাসরি প্রতিবেদিত হয় তা হল ধারণা। দেশ ও কাল সাক্ষাতে প্রতিবেদিত হয়, এবং সেগুলি হল স্বজ্ঞা।

বিষয়টির জটিলতা কাটাতে Kant-এর অপর ভাষ্যকার H. J. Paton অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Paton -এর মতে যা প্রথমে অনুভবে বা প্রতীতে পাওয়া যায় পরে তারই ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমনও অনেক ধারণা আছে যার মূলে কোন অনুভব নাই, যেমন দ্রব্যের ধারণা, ঈশ্বরের ধারণা, ইত্যাদি। এগুলি হল বিশুদ্ধ ধারণা, অর্থাৎ, এদেরকে আমরা শুধু চিন্তায় পাই, অভিজ্ঞতায় পাই না। কিন্তু দেশ ও কাল সম্পর্কে প্রথমে আমাদের অভিজ্ঞতা হয় এবং পরে সেই অভিজ্ঞতা থেকে দেশ ও কালের ধারণা গড়ে ওঠে।

৪.২ দেশের স্বরূপ সম্পর্কে অধিবিদ্যক যুক্তি (Metaphysical Exposition of the Concept of Space)

আধিবিদ্যক যুক্তিতে কোন কিছুর ধারণা বিশ্লেষণ করে দেখান হয় যে ধারণাটি এমনই যে ইন্দ্রিয় সংবেদনজাত কোন কিছুর ধারণা হতে পারে না, যদিও ধারণাটি অনুভবের ধারণা। অর্থাৎ, ধারণাটির মূল হল প্রাক্‌সিদ্ধ অনুভব। দেশের ধারণা এরূপ ধারণা। Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দেশ সম্পর্কে পাঁচটি আধিবিদ্যক যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের তৃতীয় যুক্তিটিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concept of Space) -এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

৪.২.১ প্রথম যুক্তি

যুক্তিটি নেতিমূলক। যুক্তিটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল— ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় আমরা যা পাই তা থেকে দেশের ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। যে-সকল ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে দেশের ধারণা গড়ে ওঠে বলে আপাততঃ মনে হয়, প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভবই দেশের ধারণাকে অপেক্ষা করে। ইন্দ্রিয়-প্রতীতি দু'ধরণের— আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। সুখ, দুঃখ, রাগ, অভিমান ইত্যাদির অনুভব হল আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় প্রতীতি। গাছ-পালা, পাহাড়, নদী, ইত্যাদির প্রতীতি হল বাহ্যিক ইন্দ্রিয় প্রতীতি। এক্ষণে, দেশের ধারণা যদি ইন্দ্রিয় প্রতীতি থেকে গড়ে ওঠে বলা হয় তাহলে বলতে হয় যে, বাহ্যপ্রতীতির উপর-নীচ, ভিতর-বাহির প্রভৃতি সম্বন্ধগুলিকে পৃথক-করণ ও সামান্য-করণ করে দেশের ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তা হতে পারে না। কারণ, আগে থেকে আমাদের মনে দেশের ধারণা না থাকলে কোন প্রতীতিকে বাহ্য প্রতীতি বলে চিনতেই পারব না। যেখানে আমাদের মনের সংবেদন দেশে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ করে সেখানে আমরা যে প্রতীতি লাভ করি তা হল বাহ্য প্রতীতি। সুতরাং বাহ্য প্রতীতি লাভের পূর্বশর্ত হল একদিকে সংবেদন ও অপর-দিকে দেশের ধারণা। যা পূর্বশর্ত তা পরতঃ হতে পারে না, অর্থাৎ, দেশের ধারণা-বাহ্যপ্রতীতি থেকে কোনভাবেই আসে না।

যুক্তিটিকে Kant যে-ভাবে হাজির করেছেন, অনেক ভাষ্যকারই তার মধ্যে অসুবিধা দেখতে পান। তাদের অনেকের মতে যুক্তিটির প্রকৃত বক্তব্য এই-রকম। ইন্দ্রিয়-প্রতীতির মূলাধার হল ইন্দ্রিয় সংবেদন। কিন্তু সংবেদনগুলির না আছে দেশের ধর্ম, না আছে কালের ধর্ম। অথচ সংবেদন দেশে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ না করলে বাহ্য প্রতীতি হয় না। সুতরাং বাহ্য-প্রতীতির পূর্বশর্ত যদি হয় দেশের ধারণা তাহলে দেশের ধারণা পরতসাধ্য হতে পারে না।

৪.২.২ দ্বিতীয় যুক্তি

দ্বিতীয় যুক্তিটি ইতিমূলক। যুক্তিটির প্রতিপাদ্য হল — দেশের ধারণা প্রাক্‌সিদ্ধ। প্রথম যুক্তিটিতে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, দেশের ধারণা বাহ্য-প্রতীতির পূর্বশর্ত, অতএব, পরতঃ নয়। দ্বিতীয় যুক্তিটিতে

বলা হয়েছে যে, দেশের ধারণা প্রাক্‌সিদ্ধ। যা ব্যতিক্রম-বিহীন সর্বজনীন ও কঠোররূপে অনিবার্য তাই প্রাক্‌সিদ্ধ। দেশের প্রাক্‌সিদ্ধতা প্রমাণের জন্য Kant একটি কল্পনার পরীক্ষা (thought experiment) করেছেন। আমরা দেশের অনস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারি না, ফলে এমন কোন জড়বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি-না যা দেশে অবস্থিত নয়, পরন্তু জড়বস্তু-বিহীন দেশের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি। তাহলে, এমন নয় যে, জড়বস্তুর প্রতীতি ও দেশের প্রতীতি এক ও অভিন্ন। জড়বস্তুর প্রতীতির জন্য দেশের প্রতীতি অনিবার্য, কিন্তু বিপরীত দিকে দেশের প্রতীর জন্য জড়বস্তুর প্রতীতি অনিবার্য নয়। অর্থাৎ, দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি এবং দেশের ধারণা প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি স্বরূপ দেশের ধারণা।

৪.২.৩ তৃতীয় যুক্তি

যুক্তিটি একাধারে নেতি ও ইতি। যুক্তিটির দু'টি অংশ যার প্রথমটি ইতি এবং দ্বিতীয়টি নেতি। প্রতিপাদ্য বিষয় হল — দেশের ধারণা প্রতীতি-লব্ধ দেশের ধারণা, কিন্তু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে লব্ধ বিভিন্ন উপাদানের দ্বারা গঠিত কোন ধারণা নয়। দেশ হল নিরবিচ্ছিন্ন ও অনন্ত-প্রসারী। বিভিন্ন দেশ হল একই দেশের খণ্ড খণ্ড অংশ। কিন্তু দেশের দু'টি খণ্ডের মাঝের যে অংশ তাও দেশ। ফলে যদিও দেশকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেখা যায়, তথাপি দেশ বিভিন্ন অংশ-দেশের সমষ্টি নয়। দেশের অংশগুলির অদল-বদল সম্ভব নয়, বা কোন অংশকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। যা এক, যার দুই নাই, যা অনন্তপ্রসারী, যাকে কোনভাবে পরিবর্তিত করা যায় না, তা মূলতঃ ধারণা হতে পারে না, তা মূলতঃ প্রতীতি।

৪.২.৪ চতুর্থ যুক্তি

তৃতীয় যুক্তির ন্যায় চতুর্থ যুক্তিটিও একাধারে নেতি ও ইতি এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক — দেশ মূলতঃ কোন ধারণা নায়, দেশ মূলতঃ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ। যুক্তিটিতে সাধারণ ধারণা ও তার সাথে তার দৃষ্টান্তের সম্বন্ধ যে-রূপ হতে পারে তার কথা বলা হয়েছে, এবং দেখান হয়েছে যে দেশের ক্ষেত্রে এরূপ সম্বন্ধ খাটে না। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন গো হল একই গো-জাতির দৃষ্টান্ত। গো'র সমগ্র ধারণার মূর্তরূপ হল যে কোন একটি গো। প্রতিটি গো স্বতন্ত্র, এবং এদের জন্ম-মৃত্যু আছে। কিন্তু তার ফলে গো'র সাধারণ ধারণার কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয়-না। দেশের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন দেশের কথা বলি, কিন্তু ঐ দেশগুলি একই দেশের অংশ, দৃষ্টান্ত নয়। বিভিন্ন দেশের সাথে সাধারণ দেশের সম্বন্ধ হল অংশ ও সমগ্রের সম্বন্ধ। একটি দৃষ্টান্তের হানি হলে অনিবার্যভাবে তার সাধারণ ধারণার হানি হয় না, কিন্তু কোন একটি অংশের হানি হলে সমগ্রের হানি হয়। দেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ হল একই দেশের অংশ, দৃষ্টান্ত নয়। সুতরাং যা এক, যার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তা মূলতঃ ধারণা নয়, তা মূলতঃ প্রত্যক্ষ।

এক্ষণে আমরা চারটি যুক্তি একত্রিত করে দেখতে পারি। প্রথম দু'টি যুক্তিতে দেখান হয়েছে যে দেশ পরতঃ নয়, অর্থাৎ দেশের ধারণা ইন্দ্রিয়সংবেদন-জাত অভিজ্ঞতার ধারণা নয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ যুক্তিতে বলা হয়েছে যে, যদিও দেশের ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে আসে না, তথাপি দেশ মূলতঃ ধারণা নয়,

দেশকে আমরা অভিজ্ঞতায় পাই। সহজ কথায়, দেশ হল সংবেদনবিহীন বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা, যা আবার সকল প্রকার বাহ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা-লাভের অনিবার্য পূর্বশর্ত।

৪.৩ দেশ সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concept of Space)

দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি (বা অনুভব বা প্রত্যক্ষ) — এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে Kant দ্বিতীয় প্রকার অপর একটি যুক্তির অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় প্রকার যুক্তিটিও পরাতাত্ত্বিক যুক্তি, এবং প্রথম প্রকার যুক্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদিও অবশ্য তার সাথে সম্পর্ক-বিহীন নয়। দ্বিতীয় যুক্তিটি প্রথম প্রকার যুক্তির সিদ্ধান্তকে জোরালো করে। আধিবিদ্যক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি। এক্ষণে দেখান হয়েছে যে, যদি দেশ সম্পর্কে ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিই তাহলে, এবং একমাত্র তাহলে, এক অতি পরিচিত ও নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞানের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

Euclid -এর জ্যামিতি হল অতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানটি হল ত্রি-মাপ-বিশিষ্ট দেশ সম্পর্কে সত্য বচন-সমূহের তন্ত্র (system)। জ্যামিতির বচন-সমূহ সার্বজনীন সত্য ও অনিবার্য সত্য, অতএব প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*)। বচনগুলি আবার সংশ্লেষক, এবং সেই কারণে অভিজ্ঞতার জগতে সুপ্রযুক্ত। তাহলে, দেশ সম্পর্কে এরূপ জ্ঞান সম্ভব হওয়ার অনিবার্য পূর্বশর্ত কি হতে পারে? Kant -এর নিজের কথায় "What, then, must be our representation of space, in order that such knowledge of it may be possible?" (Critique of Pure Reason, N. K. Smith trans. p. 70) এরূপ জ্ঞান সম্ভব হওয়ার একমাত্র শর্ত হল দেশ একাধারে প্রতীতি (intuition) ও প্রাক্‌সিদ্ধ (*a priori*)। দেশ যদি মূলতঃ প্রতীতি না হয় তাহলে দেশ সম্পর্কে এমন কোন সত্য বচন পাওয়া যেতে পারে না যা সংশ্লেষক। আবার দেশ যদি প্রাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ না হয়, তাহলে দেশ সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ সার্বজনীন ও অনিবার্য সত্য বচন পাওয়া যেত না। Kant বলেন "Our explanation is thus the only explanation that makes intelligible the possibility of geometry, as a body of a priori synthetic knowledge". (Critique of Pure Reason, N. K. Smith-trans. p. 71)

৪.৪ অনুসিদ্ধান্ত :

দু'প্রকার যুক্তি দিয়ে Kant এই পর্যন্ত যা প্রমাণ করেছেন তা হল — দেশের জ্ঞান সমস্ত প্রকার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ, প্রাকসিদ্ধ, এবং দেশ প্রত্যক্ষগম্য, অর্থাৎ, অনুভব। Kant -এর মতে প্রত্যক্ষ দু'প্রকার। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের মধ্য দিয়ে যা প্রত্যক্ষিত হয় তা হল পরতঃ, এবং ইন্দ্রিয়-সংবেদন না থাকা সত্ত্বেও যা প্রত্যক্ষিত হয় তা হল প্রাক্‌সিদ্ধ। দেশ হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রত্যক্ষ যা প্রাক্‌সিদ্ধ অনুভব। এ-থেকে দেশের স্বরূপ বিষয়ে যে-সমস্ত অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা হল :

ক) দেশ স্বস্থিত সত্তা নয়, স্বস্থিত সত্তার গুণ নয় বা স্বস্থিত সত্তা-সমূহের কোন সম্বন্ধ নয়। বস্তুতঃ, দেশ স্বস্থিত সত্তার সাথে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়। দেশের প্রত্যক্ষ হল প্রাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ ত্রৈকালিক প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা অতীতে অস্তিত্বশীল ছিল বা ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হবে কিন্তু বর্তমানে নাই, তাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। অতীত এবং ভবিষ্যত হল মনঃস্থ। সুতরাং দেশ বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, প্রত্যক্ষের সাথে সংশ্লিষ্ট ও প্রত্যক্ষের শর্তরূপে মনঃস্থ (subjective, ideal)।

খ) দেশ হল সমস্ত-প্রকার বাহ্য প্রতীতির আকার। যা কিছু প্রতীয়মান হয় তাই প্রতিভাস। অর্থাৎ, দেশ হল বাহ্য প্রতিভাসের আকার (form of external appearance)। ইন্দ্রিয়বৃত্তি যেন দেখার চোখ, এবং দেশ হল যেন চোখের সামনে এঁটে থাকা রঙিন চশমা, যে চশমার রঙে রঙিন হয়ে বাইরের বস্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ, উৎসমূলে দেশ হল বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার (form of external sensibility), এবং প্রত্যক্ষমূলে এ হল বাহ্য প্রতিভাসের আকার। সুতরাং প্রত্যক্ষকারী মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশের অস্তিত্ব আছে বলা যায়। মনুষ্যেতর প্রাণীরা জগৎকে কিসের আকারে প্রত্যক্ষ করে, বা জগৎ তাদের কাছে কি আকারে প্রতিভাত হয়, তা আমাদের জানা নাই, কিন্তু দেশ যে প্রতিটি মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে একইভাবে অন্তঃস্থ তা আমরা সুনিশ্চিত করে বলতে পারি, কারণ সকলের কাছেই জগৎ একই দেশে প্রতীয়মান হয়।

গ) দেশ হল ব্যবহারিক বা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার দিক থেকে বাস্তব, কিন্তু পারমার্থিক কিছু নয়। Kant -এর ভাষায়, "Space is empirically real but transcendentally ideal"। দেশ বাহ্য প্রতিভাসের আকার, কিন্তু প্রতিভাসের যা অধিষ্ঠান অর্থাৎ, স্বস্থিত বস্তু, তার সাথে এর কোন যোগ নাই। প্রতিভাস সাপেক্ষিক। যে ব্যক্তির দৃষ্টিতে জগৎ প্রতিভাত হয় সেই ব্যক্তির দৃষ্টি নিভে গেলে তার কাছে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। তথাপি দেশকে দেখার ভ্রম বলা যায় না। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তির গঠন এক, এবং সবাই জগৎকে একইভাবে এবং অনিবার্যরূপ দেশে অবস্থিত দেখে। ফলে, ব্যবহারিক দিক থেকে জগৎ তথা দেশ বাস্তব। দেশের বাস্তবতার একটি গভীর দিক হল এই যে, জ্যামিতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের বচনগুলি দেশ সম্পর্কে সত্য, এবং সেগুলি সার্বজনীন ও অনিবার্য সত্য।

৪.৫ কাল (Time)-এর স্বরূপ নির্ণয়ে আধিবিদ্যক যুক্তি

Kant -এর কাল-সম্পর্কিত যুক্তিগুলি দেশ সম্পর্কিত যুক্তিগুলির সমান্তরাল, এবং সেই কারণে অনেক ভাষ্যকার দেশ ও কালের যুক্তিগুলিকে একসাথে আলোচনা করে থাকেন। অবশ্য Kant নিজে যুক্তিগুলিকে পৃথক পৃথক করে হাজির করেছেন।

প্রাথমিকভাবে Kant প্রমাণ করেন যে, কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ (a priori) প্রতীতি (intuition)। তিনি কাল সম্পর্কে তাঁর এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সপক্ষে দু'প্রকার যুক্তি দেন, যার প্রথম প্রকার হল আধিবিদ্যক যুক্তি (Metaphysical Exposition of the Concept of Time), এবং দ্বিতীয় প্রকার হল প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concept of Time)।

কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি — এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে আধিবিদ্যক যুক্তি (Metaphysical Exposition of the Concept of Space) :

৪.৫.১ প্রথম যুক্তি

১) যুক্তিটি নেতিমূলক। যুক্তিটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল— ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে কালের ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। অথাৎ, কাল পরতঃ নয়। যে-সকল ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে কালের ধারণা গড়ে ওঠে বলে আপাততঃ মনে হয়, প্রকৃত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ঐ-সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভবই কালের ধারণাকে অপেক্ষা করে। ইন্দ্রিয়-প্রতীতি দু'ধরণের— আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। সুখ, দুঃখ, রাগ, অভিমান, ইত্যাদির অনুভব হল আভ্যন্তরীণ প্রতীতি। অপরপক্ষে, গাছ-পালা, পাহাড়, নদী, ইত্যাদির অনুভব হল বাহ্যিক। এক্ষণে, কালের ধারণা যদি ইন্দ্রিয় প্রতীতি থেকে গড়ে ওঠে বলা হয়, তাহলে বলতে হয় যে, আভ্যন্তরীণ প্রতীতির সমসাময়িক, আগে-পরে প্রভৃতি সম্বন্ধগুলিকে পৃথক-করণ ও সামান্য-করণ করে কালের ধারণা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু তা হতে পারে না। কারণ, আগে থেকে আমাদের মনে কালের ধারণা না থাকলে কোন বিশেষ প্রতীতিকে আভ্যন্তরীণ প্রতীতি বলে চিনতেই পারব না। মনের সংবেদন যেখানে কালে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ করে সেখানে প্রতীতি হয় আভ্যন্তরীণ। সুতরাং আভ্যন্তরীণ প্রতীতি-লাভের পূর্বশর্ত হল একদিকে সংবেদন ও অপরদিকে কালের ধারণা। যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পূর্বশর্ত তা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ-জাত হতে পারে না। অর্থাৎ, কালের ধারণা পরতঃ নয়।

যুক্তিটিকে Kant যে-ভাবে হাজির করেছেন, অনেক ভাষ্যকার তার মধ্যে অসুবিধা দেখতে পান। তাদের অনেকের মতে যুক্তিটির প্রকৃত বক্তব্য এইরকম। ইন্দ্রিয়-প্রতীতির মূলাধার হল ইন্দ্রিয়-সংবেদন। কিন্তু সংবেদনগুলির না আছে দেশের ধর্ম, না আছে কালের ধর্ম। অথচ সংবেদন কালে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ না করলে তা আভ্যন্তরীণ হয়না। সুতরাং, আভ্যন্তরীণ প্রতীতির পূর্বশর্ত যদি হয় কালের ধারণা, তাহলে কালের ধারণা পরতঃ বা বহিরাগত নয়।

৪.৫.২ দ্বিতীয় যুক্তি

যুক্তিটি ইতিমূলক। যুক্তিটির প্রতিপাদ্য হল — কালের ধারণা প্রাক্‌সিদ্ধ। যা ব্যতিক্রমবিহীন সার্বজনীন ও কঠোররূপে অনিবার্য তাই প্রাক্‌সিদ্ধ। কালের প্রাক্‌সিদ্ধতা প্রমাণের জন্য Kant একটি কল্পনার পরীক্ষা (thought experiement) করেছেন। আমরা কালের অনস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারি না, ফলে এমন কোন ঘটনার অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারি-না যা কালে ঘটেনি। এক্ষেত্রে আমাদের কল্পনা-শক্তি যে-পর্যন্ত কার্যকরী তা হল — পরের ঘটনাকে আগে ও আগের ঘটনাকে পরে, ইত্যাদি রূপে ভাবতে পারি। কিন্তু একটি ঘটনা ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু তা কোন কালে ঘটেনি বা ঘটবে না, এরকম কোন কিছু কল্পনাতে স্থান পেতে পারে না। অথচ, ঘটনা-বিহীন কালের অস্তিত্ব আমরা সহজেই কল্পনায় আনতে পারি। তাহলে, এমন নয় যে, ঘটনার প্রতীতি এবং কালের প্রতীতি এক ও অভিন্ন। ঘটনার প্রতীতির জন্য কালের প্রতীতি

অনিবার্য, কিন্তু বিপরীত দিকে কালের প্রতীতির জন্য ঘটনার প্রতীতি অনিবার্য নয়। অর্থাৎ, কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি, এবং কালের ধারণা হল প্রাক্‌সিদ্ধ কালের ধারণা।

৪.৫.৩ তৃতীয় যুক্তি

যুক্তিটি একাধারে নেতি ও ইতি। যুক্তিটির দু'টি অংশ যার প্রথমটি ইতি এবং দ্বিতীয়টি নেতি। প্রতিপাদ্য বিষয় হল — কালের ধারণা প্রতীতি-লব্ধ কালের ধারণা, যদিও অবশ্য কালের প্রতীতি ইন্দ্রিয় প্রতীতি নয়। কাল হল নিরবিচ্ছিন্ন ও অনন্তপ্রসারী। বিভিন্ন কাল হল একই কালের খণ্ড খণ্ড অংশ। কিন্তু কালের দু'টি খণ্ডের মাঝের যে অংশ তাও কাল। ফলে যদিও কালকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে দেখা যায়, তথাপি কাল বিভিন্ন অংশের সমষ্টি নয়। কালের অংশগুলির অদল-বদল সম্ভব নয়, বা কোন একটি অংশকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। যা এক, যার দুই নাই, যা অনন্ত-প্রসারী, যাকে কোনওভাবে পরিবর্তিত করা যায় না, তা মূলতঃ ধারণা হতে পারে না, তা মূলতঃ প্রতীতি। অবশ্য এই প্রতীতি ইন্দ্রিয় প্রতীতি নয়, কারণ কালের কোন সংবেদন হয় না। বস্তুতঃ, কোন অনন্তই সংবেদিত হয় না।

৪.৫.৪ চতুর্থ যুক্তি

তৃতীয় যুক্তির ন্যায় চতুর্থ যুক্তিটিও একাধারে নেতি ও ইতি, এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক — কাল মূলতঃ কোন ধারণা নয়, কাল মূলতঃ প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ। যুক্তিটিতে সাধারণ ধারণা ও তার সাথে তার দৃষ্টান্তের সম্বন্ধে যে-রূপ হতে পারে তার কথা বলা হয়েছে, এবং দেখান হয়েছে যে কালের ক্ষেত্রে এরূপ সম্বন্ধ খাটে না। আমরা বিভিন্ন কালের কথা বলি, কিন্তু ঐ বিভিন্ন কাল হল একই কালের অংশ, দৃষ্টান্ত নয়। বিভিন্ন কালের সাথে সাধারণ কালের সম্বন্ধ হল অংশ ও সমগ্রের সম্বন্ধ। একটি দৃষ্টান্তের হানি ঘটলে অনিবার্যভাবে তার সাধারণ ধারণার হানি হয় না। কিন্তু একটি অংশের হানি হলে সমগ্রের হানি হয়। কালের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাল হল একই কালের অংশ, এবং কাল হল নিরবিচ্ছিন্ন সমগ্র। যা এক, যার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তা মূলতঃ ধারণা নয়, মূলতঃ প্রত্যক্ষ বা প্রতীতি।

এক্ষণে আমরা চারটি যুক্তিকে একত্রিত করে দেখতে পারি। প্রথম দু'টি যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, কাল পরতঃ নয়, অর্থাৎ, কালের ধারণা ইন্দ্রিয়সংবেদন-জাত অভিজ্ঞতার ধারণা নয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ যুক্তি দু'টিতে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, যদিও কালের ধারণা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে আসে না তথাপি কাল মূলতঃ ধারণা নয়, কাল হল প্রতীতি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। সহজ কথায়, কাল হল সংবেদন-বিহীন বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ।

৪.৬ ঃ কাল সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত বিষয়ক যুক্তি (Transcendental Exposition of the Concept of Time)

কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রত্যক্ষ (*a priori* intuition) — এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে Kant দ্বিতীয় প্রকার অপর একটি যুক্তি দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রকার যুক্তিটিও পরাতাত্ত্বিক যুক্তি, যদিও অবশ্য প্রথম প্রকার যুক্তি

থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দ্বিতীয় প্রকার যুক্তিটির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই যে, এই যুক্তি প্রথম প্রকার যুক্তির সিদ্ধান্তকে জোরালো করে। আধিবিদ্যক যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রতীতি। এক্ষণে দেখান হয়েছে যে, কাল সম্পর্কে আমরা যদি ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিই তাহলে, এবং একমাত্র তাহলে, কাল সম্পর্কে অতি পরিচিত ও আবশ্যিক নীতিগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

কালিক সম্বন্ধের একটি অমোঘ নীতি হল — কাল একমাপ-বিশিষ্ট। কোন দুই বিভিন্ন সময় সমসাময়িক হয় না, তারা আগে-পরে এই সম্বন্ধে সম্বন্ধিত। কালের এই নীতি ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় পাওয়া যেতে পারে না, কারণ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা কখনই ব্যতিক্রম-বিহীন সার্বজনীনতা ও অমোঘতার উৎস নয়। কালের এই অমোঘ নীতি অভিজ্ঞতা অর্জনের পূর্বশর্ত, অতএব পরতঃ বা অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নয়।

পরিবর্তনের ধারণাও কালের প্রত্যক্ষতা ও প্রাকসিদ্ধতার সপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে এমন এক স্ব-বিরোধিতা পাওয়া যায় যাকে আর কোন ধারণা দিয়ে মিটিয়ে ফেলা যায় না। দুধ জমে দই হয়। কিন্তু দুধের গুণ এক-রকম এবং দই-এর গুণ আর এক-রকম। ফলে একই বস্তু দুধ এবং দই নয়। অথচ তারা পৃথক দ্রব্য নয়। তাহলে, কি-ভাবে তারা এক ও পৃথক? পরিবর্তনের কারণে একই বস্তু পৃথক-পৃথক রূপে উপস্থাপিত হতে পারে। যা কোন এক সময়ে দুধ তাই পরবর্তী কোন এক সময়ে দই। সময়ের অন্তর থাকার কারণে এখানে কোন স্ব-বিরোধিতা নাই। যে-কোন পরিবর্তনই প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য বিষয়, এবং যে কালের মধ্যে আমরা বস্তুতে পরিবর্তন লক্ষ্য করি তাও অতি অবশ্যই প্রত্যক্ষের বিষয় বা প্রতীতি।

পরিবর্তনের ন্যায় গতিও প্রত্যক্ষের বিষয়। গতির কারণে বস্তু স্থানান্তরিত হয়। 'A' নামক বস্তুটি যা 'B' স্থানে ছিল তা গতির কারণে 'C' স্থানে এসেছে। একই বস্তু 'A' , 'B' -স্থানে আছে এবং 'C' স্থানে আছে বললে স্ববিরোধী হয়ে যায়। কিন্তু এই স্ববিরোধিতা থাকে না কারণ আমরা এক সময় 'A' কে 'B' স্থানে দেখি এবং আর এক সময় সেই একই 'A' কে 'C' স্থানে দেখি। গতি প্রত্যক্ষের বিষয় এবং গতি-প্রত্যক্ষের যা অনিবার্য পূর্ব-শর্ত, অর্থাৎ, কাল, অতি অবশ্য প্রত্যক্ষের বিষয়।

৪.৭ অনুসিদ্ধান্ত

দু'প্রকার যুক্তি দিয়ে Kant এ পর্যন্ত যা প্রমাণ করেছেন তা হল — কালের জ্ঞান সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, অর্থাৎ, প্রাক্‌সিদ্ধ, এবং কাল প্রত্যক্ষগম্য বিষয়। Kant -এর মতে প্রত্যক্ষ দু'প্রকার। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের সাহায্যে যা প্রত্যক্ষিত হয় তা হল পরতঃ, এবং ইন্দ্রিয়-সংবেদন না থাকা সত্ত্বেও যা প্রত্যক্ষিত হয় তা হল প্রাক্‌সিদ্ধ। কাল হল প্রাক্‌সিদ্ধ প্রত্যক্ষ বা প্রাক্‌সিদ্ধ অনুভব। এ-থেকে কালের স্বরূপ বিষয়ে যে সকল অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা হল —

ক) কাল স্বস্থিত সত্তা নয়, স্বস্থিত সত্তার গুণ নয়, বা স্বস্থিত সত্তা-সমূহের সম্বন্ধ নয়। বস্তুতঃ কাল স্বস্থিত সত্তার সাথে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়। কালের প্রত্যক্ষ হল প্রাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ, কালের প্রত্যক্ষ হল ত্রৈকালিক প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা অতীতে অস্তিত্বশীল ছিল বা ভবিষ্যতে অস্তিত্বশীল হবে অথচ বর্তমানে নাই, তাকে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সহজ-কথায়, অতীত ও ভবিষ্যত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয় নয়।

অতীত এবং ভবিষ্যত হল মনঃস্থ। কাল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, কিন্তু সকল প্রত্যক্ষের শর্তরূপে মনঃস্থ (subjective or ideal)।

খ) কাল হল সকল প্রকার ইন্দ্রিয়-প্রতীতির আকার। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি আমাদেরকে যা কিছু দেখায়, অর্থাৎ, যা কিছু প্রতীয়মান হয়, সবই প্রতিভাস। কাল হল ঐ সকল প্রতিভাসের আকার। এর আগে বলা হয়েছে যে দেশ হল সকল বাহ্য প্রতিভাসের আকার। কিন্তু কাল সম্পর্কে বলা যায়, কাল হল সকল প্রতিভাস (অর্থাৎ, বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়ই)-এর আকার। প্রত্যক্ষ-মূলে কাল সকল প্রতিভাসের আকার, কিন্তু উৎসমূলে কাল হল আন্তর-ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার। যে বাহ্য বস্তু সরাসরি বাহ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে যুক্ত হয়, সেই বাহ্য বস্তু আবার অসরাসরি আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকারে প্রতিভাত হয়। ফলে, কাল হল সকল প্রতিভাসের আকার। কিন্তু দেশ কেবলমাত্র বাহ্য প্রতিভাসের আকার। যে সকল প্রতিভাসের আকার দেশ ও কাল উভয়ই সেগুলি হল বাহ্য প্রতিভাস, আর যে সকল প্রতিভাস কেবলমাত্র কালের আকারে সজ্জিত হয় সেগুলি হল আভ্যন্তরীণ প্রতিভাস।

গ) কাল হল ব্যবহারিক বা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দিক থেকে বাস্তব কিন্তু পারমার্থিক কিছু নয় (Time is empirically real but transcendentally ideal)। কাল হল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার প্রতিভাসের আকার, কিন্তু প্রতিভাসের যা অধিষ্ঠান, অর্থাৎ, স্বস্তিত সত্তা, তার সাথে এর কোন যোগ নাই। প্রতিভাস সাপেক্ষিক। যে ব্যক্তির দৃষ্টিতে জগৎ প্রতিভাত হয় সেই ব্যক্তির দৃষ্টি নিভে গেলে তার কাছে জগতের কোন অস্তিত্বই থাকে না। তথাপি কালকে ভ্রমাত্মক অভিজ্ঞতা বলা চলে না। সকল মানুষের ইন্দ্রিয়বৃত্তির গঠন এক, এবং সকলেই জগৎকে একইভাবে ও অনিবার্যরূপে কালে প্রত্যক্ষ করে। ফলে, ব্যবহারিক দিক থেকে কাল বাস্তব। কালের বাস্তবতার একটি গভীর দিক হল এই যে, অঙ্কের নিয়মগুলি মূলতঃ কালের নিয়ম, এবং অঙ্কের নিয়মগুলি জগতে সকলের কাছে একইভাবে প্রযুক্ত।

৪.৮ প্রশ্নাবলী (Suggested Questions) ঃ

1. What is Transcendental Aesthetic, and what is its subject-matter? (দ্রঃ ৪)
2. State and explain Kant's theory of Space and Time as distinguished from that of Newton and that of Leibnitz. (দ্রঃ ৪.১, ৪.১.১, ৪.১.২, ৪.১.৩, ৪.১.৪)
3. What is metaphysical exposition? Explain and examine Kants' metaphysical exposition of the concept of space. (দ্রঃ. ৪.২, ৪.২.১, ৪.২.২, ৪.২.৩, ৪.২.৪)
4. What does Kant understand by transcendental exposition? Explain Kants' transcendental exposition of the concept of space. (দ্রঃ. ৪.৩)
5. Elucidate the conclusions that Kant draws from his two-fold expositions of the concept of space. (দ্রঃ ৪.৪)

6. What is metaphysical exposition? Elucidate Kants metaphysical exposition of the concept of time. (দ্রঃ ৪.২, ৪.৫, ৪.৫.২, ৪.৫.৩, ৪.৫.৪)
7. What is transcendental exposition? Explain Kant's transcendental exposition of the concept of time. (দ্রঃ ৪.৬)
8. What conclusions does Kant draw about the nature of time from his two-fold expositions of the concept of time? (দ্রঃ ৪.৭)

৪.৯ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জী

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kants' Critique of Pure Reason*
2. H. H. Paton, *Kants' Metaphysic of Experience,* vol. 1
3. C. D. Broad, *Kant, An Introduction*
4. রাসবিহারী দাস, ***কান্টের দর্শন***
5. অমিয় কুমার মাইতি, ''দেশ ও কাল সম্পর্কে কান্টের মত'' ***তত্ত্ব ও প্রয়োগ***, *কান্টের দর্শন।*

পঞ্চম পাঠ (Unit-V)

পরা-যুক্তিশাস্ত্র বা অধিবিদ্যাগত যুক্তিশাস্ত্র (Transcendental Logic)

পাঠ সংকেত

৫. চিন্তাবৃত্তি (power of thinking)

৫.১ আকারগত যুক্তিশাস্ত্র ও পরা-যুক্তিশাস্ত্র (Formal Logic and Transcendental Logic)

৫.২ Categories বা পদার্থ সমুদয়

৫.২.১ বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিভিন্ন পরিচয়

৫.২.২ 'বিশুদ্ধ'-এর অর্থ

৫.২.৩ অভিজ্ঞতার উপাদান ও গঠন বিশ্লেষণ

৫.৩ Category বা পদার্থের বিভিন্ন বিবরণ

৫.৩.১ দেশ ও কালের ধারণা থেকে পদার্থের ধারণার পার্থক্য

৫.৩.২ পদার্থ-সম্পর্কে দু'টি সমস্যা

৫.৩.৩ পদার্থ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

৫.৩.৪ Kant -এর পদার্থ-নির্ণয় সূত্র

৫.৩.৫ পদার্থের তালিকা

৫.৩.৬ Kant -এর পদার্থ-তালিকা ও Aristotle -এর পদার্থ-তালিকা — একটি তুলনা

৫.৪ পদার্থ-প্রমাণ (Transcendental Deduction of the Categories)

৫.৪.১ পদার্থ-প্রমাণের দু'টি দিক

৫.৪.২ পদার্থ-প্রমাণের বিষয়ীগত দিকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৫.৪.৩ পদার্থ-প্রমাণের বিষয়গত দিকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৫.৫ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

৫.৬ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৫. চিন্তাবৃত্তি (power of thinking)

'জ্ঞান' একটি সাপেক্ষ পদ, যার দু'টি পক্ষ হল জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। জ্ঞাতা হল মানুষের মন এবং জ্ঞেয় হল মন-বর্হিভুত কোন কিছু যাকে বলা হয় বিষয়। মনের বৃত্তি বা সাধারণ জ্ঞান-ক্ষমতা দ্বিবিধ — ইন্দ্রিয়বৃত্তি (power of sensing) ও চিন্তাবৃত্তি (power of thinking)। স্বস্থিত (thing-in-itself) কোন বস্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করলে স্বজ্ঞার প্রতিবেদন (intuitive representations) তৈরি হয়। ঐ স্বজ্ঞার প্রতিবেদনের উপর চিন্তার ক্রিয়া প্রসারিত হয়। চিন্তার ক্রিয়া থেকে উৎসারিত হয় একপ্রকার ধারণা যার দ্বারা স্বজ্ঞার প্রতিবেদন সমূহ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং বিষয়ের অর্থ প্রাপ্ত হয়। ফলে একদিকে জ্ঞানের বিষয় এবং অপরদিকে বিষয়ের জ্ঞান গড়ে ওঠে। জ্ঞানের বিষয় হল গঠিত বিষয়, এবং বিষয়ের জ্ঞান হল গঠিত চেতনা। দু'প্রকার সামগ্রী (elements) নিয়ে জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয়, যার এক-প্রকার হল স্বজ্ঞার প্রতিবেদন ও অপর প্রকার হল ধারণার প্রতিবেদন। ধারণা ব্যতীত স্বজ্ঞার প্রতিবেদন অন্ধ এবং স্বজ্ঞা ব্যতীত ধারণা শূন্যগর্ভ। স্বজ্ঞার উৎস হল ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং ধারণার উৎস হল চিন্তাবৃত্তি। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিন্তাবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ইতিপূর্বে Transcendental Aesthetic অংশে Kant ইন্দ্রিয়বৃত্তির আলোচনা করেছেন। এক্ষণে, Transcendental Logic-এর অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয় হল চিন্তাবৃত্তি।

সাধারণভাবে Logic বা যুক্তিশাস্ত্র হল চিন্তার নিয়ম-কানুনের অনুসন্ধান। Transcendental Logic হল চিন্তাবৃত্তি বা মনের যে ক্ষমতা-বলে চিন্তা সম্ভব হয়, তার অনুসন্ধান। এই কারণে, চিন্তাবৃত্তির অনুসন্ধানকে Transcendental Logic বা পরা-যুক্তিশাস্ত্র বলা হয়েছে।

৫.১ আকারগত যুক্তিশাস্ত্র ও পরা-যুক্তিশাস্ত্র (Formal Logic and Transcendental Logic)

পরা-যুক্তিশাস্ত্র এক সম্পূর্ণ নূতন অনুসন্ধান যা Kant প্রথম শুরু করেন। একে Aristotle-এর আকারগত যুক্তিশাস্ত্র থেকে আলাদা করে দেখতে হবে।

প্রথমতঃ, আকারগত যুক্তিশাস্ত্র শুধুমাত্র চিন্তার আকার নিয়ে আলোচনা করে। চিন্তার এই আকারগুলিকে চিন্তার যা কিছু বিষয় থেকে আলাদা করে দেখা হয়। কিন্তু পরা-যুক্তিশাস্ত্রে চিন্তাকে চিন্তার বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখা হয় না। একেও আকারের অনুসন্ধানই বলা চলে, তবে যে আকারের অনুসন্ধান এই শাস্ত্রে করা হয় তা হল বিষয়-চিন্তার আকার। তাহলে, আকারগত যুক্তিশাস্ত্র যেখানে সাধারণভাবে চিন্তার আকার নিয়ে আলোচনা করে, পরা-যুক্তিশাস্ত্র সেখানে বিশেষ চিন্তার আকার (অর্থাৎ, বিষয়-চিন্তার আকার) নিয়ে আলোচনা করে। Critique of Pure Reason গ্রন্থের ভূমিকা অংশে Kant বলেন যে, তাঁর এই গ্রন্থের কেন্দ্রিয় সমস্যা হল প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব হওয়ার শর্ত কি তা নিরূপণ করা। এক্ষণে তিনি দেখাতে চাইবেন যে, বিষয়-চিন্তার যেগুলি সাধারণ আকার সে-গুলিই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব করে তোলার শর্ত।

দ্বিতীয়তঃ, আকারগত যুক্তিশাস্ত্র সাধারণভাবে চিন্তার মূল নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু পরা-যুক্তিশাস্ত্র চিন্তার শর্ত নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ, পরা-যুক্তিশাস্ত্র হল চিন্তার ভিত্তিমূলে অনুসন্ধান।

তৃতীয়তঃ, Kant -এর মতে আকারগত যুক্তিশাস্ত্র হল একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিজ্ঞান। চারটি মৌলিক বিজ্ঞানের মধ্যে এটি হল প্রথম। পরা-যুক্তিশাস্ত্র অপরপক্ষে চতুর্থ মৌলিক বিজ্ঞান, অর্থাৎ, অধিবিদ্যার অন্তর্গত। Kant একে বলবেন Immanent Metaphysics বা অন্তঃপাতী অধিবিদ্যা।

চতুর্থতঃ, আকারগত যুক্তিশাস্ত্র চিন্তার মূল নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু তাদের উৎস বা যাথার্থতা ইত্যাদি নিয়ে কোন কথা বলে না। অপরদিকে, পরা-যুক্তিশাস্ত্র বিষয়-চিন্তার আকারগত নীতিগুলির উৎস ও যাথার্থতা নিয়ে আলোচনা করে।

Kant -এর Transcendental Logic বা পরা-যুক্তিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় হল — যে কোন কিছুকে জ্ঞানের বিষয় হতে হলে তাতে কতিপয় বিষয়ের অতি-সাধারণ ধারণা অতি অবশ্যই প্রযুক্ত হতে হবে। ঐ ধারণাগুলি হল প্রাক্‌সিদ্ধ ও বিশুদ্ধ, এবং চিন্তাশক্তি থেকে উৎসারিত। পুনরায়, ঐ ধারণাগুলি কেবলমাত্র বাস্তবিক ও সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতেই প্রযুক্ত, অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে প্রসারিত করলে বা প্রয়োগ করলে ঐগুলিই শূন্যগর্ভ ধারণা হয়ে ওঠে। Kant -এর দর্শনে অভিজ্ঞতার জগতে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত বিষয়ের সামান্য ধারণাগুলিকে categories বা পদার্থ বলা হয়। Transcendental Logic-এর মূল আলোচ্য বিষয় হল categories বা পদার্থ, এবং তা থেকে অনুসৃত নীতিসমূহ, যেমন কার্য-কারণ নীতি, দ্রব্যের নীতি ইত্যাদি।

৫.২ Categories বা পদার্থ

পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষায় যাদের 'category' বলা হয়, ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় তা হল পদার্থ। সেই কারণে আমরা এখানে 'category' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'পদার্থ' শব্দটি ব্যবহার করব।

পদার্থ-তত্ত্ব প্রচলিত অধিবিদ্যাগত তত্ত্ব। প্রচলিত অধিবিদ্যায় পদার্থ তত্ত্বকে বিষয়-তত্ত্ব অথবা বস্তু-তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জগৎ কতকগুলি আদি বস্তু-সমন্বয়ে গঠিত। এই বস্তু-সমন্বয়গুলি বিষয় হিসাবে জ্ঞাত ও জ্ঞেয় হলেও, তারা কোনভাবেই জ্ঞান-নির্ধারিত নয়, বরং বস্তুই জ্ঞানের রূপ নির্ধারণ করে। কিন্তু Kant-এর দর্শনে পদার্থ বলতে বিষয়ের দ্বারা নির্দেশিত বস্তুকে বোঝায় না, বোঝায় বিষয়ের অর্থ। পদার্থ বলতে যাতে বস্তুমূল না বোঝায় সেই জন্য Kantএকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন pure concepts of the understanding বা বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা। Kant-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলিই আবার বিষয়ের সাধারণ অর্থ (the meaning of an object in general)। বিষয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বা বিষয়ের গুণাবলী লক্ষ্য করে এই সমস্ত ধারণা সংগ্রহ করা হয় না, বিষয়কে বিষয় হিসাবে জানার জন্যই বোধ-বুদ্ধি এই সমস্ত ধারণা সৃষ্টি করে ও প্রয়োগ করে।

৫.২.১ বিশুদ্ধ বুদ্ধির বিভিন্ন পরিচয়

এই প্রসঙ্গে Kant-এর দর্শনে বিশুদ্ধ বুদ্ধির যে বিভিন্ন পরিচয় দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। Kant প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকে প্রদত্ত বিষয় করে দার্শনিক অনুসন্ধান শুরু করেন। জ্ঞানের মধ্যেই উল্লেখিত

থাকে জ্ঞানের বিষয়। Kant-এর বিচার অনুযায়ী জ্ঞানের বিষয় ও বিষয়ের জ্ঞান একে অপর থেকে অবিচ্ছেদ্য। তারা যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। বিষয়ের জ্ঞান তথা জ্ঞানের বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুই প্রকার সামগ্রী (element)-এর সন্ধান পাই। এক প্রকার জ্ঞান-সামগ্রী হল পরিবর্তনশীল, উপাদান-স্বরূপ (material element), টুকরো-টুকরো, এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র, সংবেদন। আর একপ্রকার জ্ঞান-সামগ্রী হল অপরিবর্তনশীল, সামান্য, অসংবেদন, এবং স্বরূপতঃ আকার (formal element)। এরা কোথা থেকে আসে বা এদের উৎস কি সে সম্পর্কে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাই জ্ঞান-সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে Kant দু'টি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অনিবার্য প্রকল্প হিসাবে মেনেছেন, যার একটি হল স্বস্থিত বস্তু (thing-in-itself) এবং অপরটি হল স্বস্থিত বিষয়ী অথবা বিশুদ্ধ বুদ্ধি। জ্ঞান-সামগ্রীর মধ্যে যা কিছু অপরিবর্তনশীল, আকার-স্বরূপ, তারই উৎস হল বিশুদ্ধ বুদ্ধি। আকার-সামগ্রীগুলি আবার দুই ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। কতকগুলি আকার হল প্রতীতির আকার (forms of intuition) যেমন দেশ ও কাল, এবং কতকগুলি হল চিন্তার আকার, যেমন দ্রব্য (substance), কার্য-কারণ ইত্যাদি। প্রথমোক্তগুলি স্বরূপতঃ প্রতীতি এবং দ্বিতীয়োক্তগুলি স্বরূপতঃ ধারণা। এই দুই প্রকার আকারের উৎস হিসাবে স্বস্থিত বিষয়ী বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দু'টি স্বতন্ত্র বৃত্তি (faculty)-রূপে প্রকল্পায়িত করেছেন, যার একটি হল ইন্দ্রিয়বৃত্তি (sensibility) এবং অপরটি হল চিন্তাবৃত্তি (power of thinking)। ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিস্ক্রিয়, কিন্তু গ্রহণ-ক্ষমতার অধিকারী (power of receptivity)। অপরপক্ষে চিন্তাবৃত্তি হল ক্রিয়ার প্রবণতা (spontaneity)। ইন্দ্রিয়বৃত্তি থেকে উৎসারিত হয় কতকগুলি বিশুদ্ধ প্রতীতি, দেশ ও কাল, যেগুলি অন্য সমস্ত প্রতীতির আকাররূপে প্রতিবেদিত হয়। অনুরূপ, চিন্তাবৃত্তি থেকে উৎসারিত হয় কতকগুলি বিশুদ্ধ ধারণা, যেগুলি মানব-বোধের আকার হিসাবে প্রতিবেদিত হয়। Kant যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে, দেশ ও কাল এবং মানব-বোধের ধারণাগুলি শুধুমাত্র বিশুদ্ধই নয়, সেগুলি প্রাক্‌সিদ্ধও বটে। প্রাক্‌সিদ্ধের উৎস হিসাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তি হল এক-প্রকার বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং চিন্তাবৃত্তি হল আর এক-প্রকার বিশুদ্ধ বুদ্ধি। ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিজস্ব প্রকৃতির কারণে এবং স্বস্থিত বস্তুর সাথে কোনভাবে এর যোগাযোগ হওয়ার কারণে, স্বস্থিত বস্তু দেশ ও কালের আকারে সজ্জিত সংবেদনরূপে প্রতিফলিত হয়। চিন্তাবৃত্তির ক্রিয়ার কারণে ঐ একই প্রতিভাস জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জগৎ হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়। জ্ঞানের জগতের উপর গড়ে ওঠে কর্মের জগৎ এবং মূল্যের জগৎ। এসব ক্ষেত্রেও চিন্তাবৃত্তি-স্বরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা স্বস্থিত বিষয়ী ক্রিয়াশীল। অবশ্য জ্ঞানের জগৎ, কর্মের জগৎ ও মূল্যের জগতের সাপেক্ষে চিন্তাবৃত্তি-স্বরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধির পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রচনায় নিয়োজিত চিন্তাবৃত্তির পরিচয় হল বোধ-বুদ্ধি (understanding অথবা pure reason in knowledge or experience), কর্মের মধ্যে নিয়োজিত চিন্তাবৃত্তি হল ইচ্ছা (pure reason in action as will), সৌন্দর্য অনুভব ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিয়োজিত চিন্তাবৃত্তি হল বিচার-বুদ্ধি (pure reason in judgment)। এদের মধ্যে বোধ-বুদ্ধি হিসাবে চিন্তাবৃত্তির পরিচয়ই হল প্রাথমিক এবং জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জগৎই হল প্রাথমিক জগৎ। যে জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পাই তাকে আশ্রয় করেই আমরা কর্ম সম্পাদন করি, তারই ভিতর বিশুদ্ধ সৌন্দর্য অনুভব করি এবং তারই প্রকৃতিতে কোন মহাজ্ঞানীর কারুকৃতি (divine design) লক্ষ্য করি। আবার ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিসরের মধ্যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা রচনায় নিয়োজিত যে চিন্তাবৃত্তির পরিচয় হল বোধ-বুদ্ধি (understanding) সেই একই চিন্তাবৃত্তি যদি ইন্দ্রিয়ের জগৎ অতিক্রম করে যায় এবং কোন অতীন্দ্রিয় জগতের ধারণা তৈরিতে নিযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার পরিচয় হবে চিন্তাবুদ্ধি (reason)।

৫.২.২ 'বিশুদ্ধ'-এর অর্থ

Kant -এর দর্শনে বারংবার উচ্চারিত 'বিশুদ্ধ' (pure) কথাটির তাৎপর্যও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিশুদ্ধ' ও 'প্রাক্‌সিদ্ধ' (a priori) সমার্থক। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা নয়। সব জায়গাতেই 'বিশুদ্ধ' কথাটির নেতিমূলক অর্থ হল — যা সংবেদন নয়, সংবেদনের উৎস নয়, অথবা সংবেদন সহযোগে গঠিত কোন বিষয়ের ধারণা নয়। এরূপ বিশুদ্ধতা কোন কোন প্রতীতির মধ্যে পাওয়া যায়, আবার কোন কোন ধারণার মধ্যেও পাওয়া যায়। দেশ ও কাল হল সংবেদন-বিহীন প্রতীতি, অতএব বিশুদ্ধ। এবং Hume যেরূপ লক্ষ্য করেছিলেন, দ্রব্যের ধারণার পশ্চাতে কোন সংবেদন নেই। Hume -এর মতে সেই কারণে দ্রব্যের ধারণা প্রকৃত নয়, তথাকথিত ধারণা। কিন্তু Kant -এর মতে দ্রব্যের ধারণা যথার্থ ধারণা, এবং বিশুদ্ধ ধারণা। তাঁর বিচার অনুযায়ী জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য তিন প্রকার সামগ্রীর একান্ত প্রয়োজন — কিছু বিশুদ্ধ প্রতীতি (কাল অথবা কাল এবং দেশ উভয়ই), কিছু অবিশুদ্ধ প্রতীতি (কোন না কোন সংবেদনরাশি) এবং কিছু বিশুদ্ধ ধারণা (যেমন, দ্রব্য ইত্যাদির ধারণা)। যে-সমস্ত বিশুদ্ধ ধারণা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এবং যে-গুলি বোধ-বুদ্ধির অন্তর থেকে উৎসারিত, Kant-এর দর্শন অনুযায়ী সে-গুলি হল বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা (pure concepts of the understanding) বা পদার্থ (category)।

Kant-এর দর্শন অনুযায়ী জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টির ব্যাপারটি সংক্ষেপে এই প্রকার।

৫.২.৩ অভিজ্ঞতার উপাদান ও গঠন বিশ্লেষণ

অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান সৃষ্টির জন্য প্রতীতি এবং ধারণা, উভয়রই প্রয়োজন। ধারণা ব্যতীত প্রতীতি অন্ধ এবং প্রতীতি ব্যতীত ধারণা নিছকই ফাঁকা। স্বস্থিত বস্তু যদি কোন কারণে বা কোনভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তির উপর ক্রিয়া করে, তাহলে অবিশুদ্ধ প্রতীতিসমূহ, অর্থাৎ সংবেদন-রাশি, দেশ ও কালের আকারে সজ্জিত হয়ে প্রতিবেদিত হয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির এই প্রতিবেদনসমূহ প্রতিভাস (appearance) রচনা করে মাত্র, কারণ এদের ভিতর থেকে দেশ-কালের উৎস, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি, অথবা সংবেদন উৎস, অর্থাৎ স্বস্থিত বস্তু, কেউই স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। H. J. Paton -এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী দেশ ও কাল যেন ইন্দ্রিয়বৃত্তির চোখের সামনে এঁটে থাকা রঙিন চশমা যার ভিতর দিয়ে চোখের বাইরের বস্তুকে দেখা যেতে পারে, অন্য কোনভাবে নয়। ফলে যে বস্তুটিকে চোখ দেখায় তা চশমার রঙে রঙিন হয়ে প্রতিভাত হয়, স্বরূপে নয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রতিবেদনেও আমরা এইরূপ প্রতিভাস পাই। প্রতিভাস জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টির কারণে এগুলি চিন্তাবৃত্তিতে অর্পিত হয়, অর্থাৎ অতঃপর এগুলি চিন্তিত হয় (thought through)। এ অবস্থায় চিন্তাবৃত্তির পরিচয় হল বোধ-বুদ্ধি (understanding)। বোধ-বুদ্ধির চিন্তায় প্রতিভাসের প্রতিবেদনসমূহের উপর একপ্রকার ভাবের ঐক্য সৃষ্টি হয়। ঐ ঐক্যের কারণে চলমান ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদনসমূহ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়। ফলে জন্ম নেয় বিষয়ের জ্ঞান বা চেতনা। অর্থাৎ চেতনার বিষয় এবং বিষয়ের চেতনা একই সাথে উৎপন্ন হয়।

যে সমস্ত ভাবনার সাহায্যে মানববোধের নিকট প্রদত্ত চলমান প্রতীতিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয় ও অভিজ্ঞতার বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যাত হয় Kant তাদের বলেছেন বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা। বলা বাহুল্য, বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি অব্যক্ত চিন্তার ধারণা, সচেতন চিন্তার ধারণা নয়। প্রত্যক্ষ (perception) সৃষ্টির অনিবার্য পূর্বশর্ত হিসাবে চিন্তার ক্রিয়া তথা বোধ-বুদ্ধির ধারণা প্রত্যক্ষের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। প্রত্যক্ষ তথা অভিজ্ঞতার উপর ব্যক্ত চিন্তা প্রসারিত হলেই (through reflective awareness) অভিজ্ঞতার অন্তরে নিয়োজিত সুপ্ত চিন্তার ক্রিয়াসমূহকে ব্যক্ত ধারণায় পাই।

৫.৩ Category বা পদার্থের বিভিন্ন বিবরণ

Kant পদার্থ বা category -এর কোন সংজ্ঞা দেননি; কিন্তু তিনি এর বিভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন। একটি বিবরণে বলেছেন — এগুলি হল আদি ও সংশ্লেষণের বিশুদ্ধ ধারণা যেগুলি অভিজ্ঞতার অনিবার্য পূর্বশর্ত হিসাবে বোধ-বুদ্ধির অন্তরে নিহীত ('Original pure concepts of synthesis that the understanding contains within itself a priori')। আবার তিনি বলেছেন, এগুলি হল সাধারণভাবে বিষয়ের বিশুদ্ধ ধারণা ('pure concept of an object in general')। H. J. Paton মনে করেন, 'the more exact description of a category is that it is a pure concept of the necessary synthetic unity which is present in every object of experience.'। এই সমস্ত বিরণ থেকে পদার্থের যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য পাই তা হল :

প্রথমতঃ, এগুলি ধারণা — সামান্য ও বিশুদ্ধ ধারণা। বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে এগুলি কোন সংবেদনের ধারণা নয়। এবং সামান্য হওয়ার কারণে এরা কোন প্রতীতির ধারণা নয়। বলা বাহুল্য, Kant-এর মতে এমনও প্রতীতি হতে পারে যার কোন সংবেদন নাই, উদাহরণ স্বরূপ, দেশ ও কালের প্রতীতি। দেশ ও কালের প্রতীতি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে দেশ ও কালের ধারণাও বিশুদ্ধ ধারণা। কিন্তু প্রতীতির ধারণা হওয়ার কারণে দেশ ও কালের ধারণা হল বিশেষ ধারণা, সামান্য ধারণা নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এগুলি হল বোধ-বুদ্ধির ধারণা (concepts of the understanding)। কথাগুলি শুনতে অদ্ভুত লাগে, কারণ Kant -এর মতে সমস্ত ধারণাই বোধ-বুদ্ধির ধারণা। তাহলে নিশ্চয় কোন বিশেষ অর্থে এগুলিকে বোধ-বুদ্ধির ধারণা বলা হয়েছে। H. J. Paton বিষয়টিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। বোধ-বুদ্ধির ধারণা কোন অবিশ্লেষণযোগ্য একক নয়, এটিও একটি গঠিত ধারণা। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই ধারণার মধ্যে রয়েছে আকার ও উপাদান। যে কোন ধারণার আকারই চিন্তার সংযোজন। এক্ষণে, ধারণাটি বিশুদ্ধ হলে তার উপাদান সংবেদন থেকে গৃহীত কিছু নয়। বোধ-বুদ্ধির ক্রিয়াই এক্ষেত্রে উপাদান হিসাবে গৃহীত হয়। প্রতীতির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে চিন্তা প্রথম জাগ্রত হয় বা ক্রিয়া করতে শুরু করে। তারপর ঐ চিন্তার ক্রিয়াকে আলাদা করে দেখলে এবং তাকে চিন্তার আকারের সাথে যুক্ত করলে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ধারণা। এই ধারণার আকার এবং উপাদান বোধবুদ্ধি-স্বরূপ চিন্তাবৃত্তি থেকে পাওয়া যায়। সেজন্য একে প্রকৃত অর্থে বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি হল সংশ্লেষণের ধারণা (concept of synthesis)। Kant বলেন, অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত, যদিও অভিজ্ঞতাই সমস্ত জ্ঞানের উৎস নয়। তার

অর্থ হল, যদিও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও চিন্তাবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তথাপি চিন্তাবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার অনিবার্য পূর্বশর্ত হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির জাগরণ। ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রতীতির প্রতিবেদন গৃহীত হলে পর চিন্তাবৃত্তি ক্রিয়া করতে শুরু করে। প্রতীতির প্রতিবেদনগুলি কালে গৃহীত হওয়ার কারণে বহুধা বিভক্ত। এই বহুধা প্রতীতির উপর চিন্তাকে দাঁড়াতে হলে এগুলিকে একত্রিত করতে হয়। যে ক্রিয়ায় প্রতীতি-রাশি একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয় সেটি একটি সংশ্লেষণ ক্রিয়া। বোধের বিশুদ্ধ ধারণায় এই সংশ্লেষণ ক্রিয়া উপাদান হয় বলে ধারণাটি সংশ্লেষণের ধারণা। Kant -এর মতে চিন্তাবুদ্ধি-স্বরূপ বিশুদ্ধ বুদ্ধি সর্বত্রই একই ক্রিয়া সম্পাদন করে। এর ক্রিয়ায় প্রদত্ত বহুধা একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়। প্রদত্তগুলি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে এই ক্রিয়ার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রত্যক্ষ-চিন্তার সামনে প্রদত্তগুলি হল প্রতীতির প্রতিবেদন। সেই কারণে এই চিন্তার ক্রিয়ায় সংশ্লেষক ঐক্যের সৃষ্টি হয়। অবধারণের আকার গঠনেও একই চিন্তা কাজ করে। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে প্রদত্তসমূহ হল ধারণা, ফলে সেখানে বিশ্লেষক ঐক্য (analytic unity)-এর সৃষ্টি হয়।

চতুর্থতঃ, বোধ-বুদ্ধির ধারণাগুলি হল বিষয়ের সামান্য ধারণা। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতায় যে কোন বিষয়ের মধ্যেই পাওয়া যাবে, বিষয়ের বিষয়ত্ব ও বিষয়ের বিশেষত্ব। Kant-এর মতে বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি বিষয়ের বিষয়ত্ব সৃষ্টি করে এবং সংবেদন-প্রতীতির বিশিষ্টতা বিষয়ের বিশেষত্ব সৃষ্টি করে। যে-হেতু Kant-এর মতে বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি হল বিষয়ের বিষয়ত্ব বা বিষয়ের সামান্য ধারণা সেই-হেতু আমরা এদেরকে আক্ষরিক অর্থেই পদার্থ (পদের অর্থ = পদার্থ) বলতে পারি।

৫.৩.১ দেশ ও কালের ধারণা থেকে পদার্থের ধারণার পার্থক্য

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করবেন, দেশ-কালের ধারণা বিষয়ের বিশেষত্ব নয় কেন? এর উত্তর হতে পারে এই যে, দেশ-কালের ধারণাও বিষয়ের বিশেষত্ব সৃষ্টি করে। জ্ঞানের বিষয়গুলি দু'প্রকার হয়। যে সকল সংবেদন কেবলমাত্র কালের আকারে প্রতিবেদিত সেগুলি বোধ-বুদ্ধির ধারণায় ব্যাখ্যাত হলে আন্তঃপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। আর যে সকলে সংবেদনরাশি দেশ ও কাল এই উভয় আকারে প্রতিবেদিত হয় সেগুলি বোধ-বুদ্ধির ধারণায় ব্যাখ্যাত হলে বহিঃপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। সুতরাং দেশ ও কালের ধারণা সাধারণভাবে বিষয়ের বিষয়ত্ব সৃষ্টি করে না, বিশেষত্ব সৃষ্টি করে।

পঞ্চমতঃ, বোধ-বুদ্ধির সামান্য ধারণাগুলি হল পূর্বতঃসিদ্ধ বা প্রাক্‌সিদ্ধ (a priori)। যা কিছু প্রাক্‌সিদ্ধ তাই বিশুদ্ধ। কিন্তু সমস্ত বিশুদ্ধই প্রাক্‌সিদ্ধ নয়। ঈশ্বরের ধারণা একটি বিশুদ্ধ ধারণা, কিন্তু প্রাক্‌সিদ্ধ নয়। প্রাক্‌সিদ্ধ হলে ব্যতিক্রমবিহীন সামান্য ও একান্ত অনিবার্য হবে। Kant -এর মতে বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি বাস্তবিক এবং সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি বিষয়ে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত।

৫.৩.২ পদার্থ-সম্পর্কে দু'টি সমস্যা

Kant পদার্থের যেরূপ বিবরণ দিয়েছেন তাতে করে দু'টি বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় — একটি নির্ণয়ের সমস্যা ও অপরটি অনিবার্যতা প্রমাণের সমস্যা। প্রথম সমস্যাকে তিনি যে শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করেছেন তা হল Transcendental clue to the Discovery of all pure concepts of the

understanding বা বোধ-বুদ্ধির ধারণা-সমূহের আবিষ্কারের অধিবিদ্যাগত সূত্র। আর দ্বিতীয় সমস্যাটিকে তিনি যে শিরোনাম দিয়ে আলোচনা করেছেন তা হল Transcendental Deduction of the Categories বা জ্ঞানের অনিবার্য পূর্বশর্ত হিসাবে পদার্থের প্রতিষ্ঠা। একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, এই উভয় সমস্যাই আসলে পদার্থ প্রমাণের সমস্যা। Kant -এর দর্শনে এদের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্বপূর্ণও বটে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে Kant-ই প্রথম যিনি পদার্থ প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

৫.৩.৩ পদার্থ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা

বোধ-বুদ্ধির ধারণাসমূহ নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা অন্যতম যে কারণে দেখা যায় তা হল, অসংখ্য ধারণার মধ্যে এই ধারণাগুলি মিশে আছে। এদের মধ্যে কোনটি কোনটি পদার্থ তা সহজে বুঝা যায় না। কোন একটি ধারণাকে পদার্থ হিসাবে যদিও বা চেনা যায়, তাহলেও কোন সহজ বর্ণনা প্রক্রিয়ার সাহায্যে নির্ণয় করে বলা যাবে না যে কতকগুলি ধারণা হল বোধের বিশুদ্ধ ধারণা এবং তার বাইরে ঐরূপ আর কোন ধারণা নাই। Kant পদার্থ নির্ণয়ের সমস্যাটিকে এইভাবে সাজিয়েছেন। প্রথমতঃ, দেখাতে হবে যে কতকগুলি ধারণা বিশুদ্ধ, অবিশুদ্ধ নয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে সংবেদনের ছাপ নেই এবং তারা অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত নয়। দ্বিতীয়তঃ, দেখাতে হবে যে ঐগুলি প্রতীতের ধারণা নয় বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির অন্তর্গত নয়। তৃতীয়তঃ, দেখাতে হবে যে ঐগুলি মৌলিক, অন্য ধারণার সংমিশ্রণে তৈরি নয় বা অন্য কোন ধারণা থেকে অনুসৃত নয়। চতুর্থতঃ, প্রতিটি ধারণাই দার্শনিক অনুসন্ধানে ধরা পড়েছে, কোনটিও বাদ পড়েনি। এ থেকে অবশ্য প্রমাণিত হবে না যে এগুলি পদার্থ বা বিষয়ের অনিবার্য সামান্য ধারণা। পদার্থ হিসাবে প্রমাণ করতে হলে দেখাতে হবে যে ঐ ধারণাগুলি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বিষয়ে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত। অর্থাৎ, ঐ ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই জ্ঞানের বিষয় হিসাবে হাজির হতে পারে না বা পরিজ্ঞাত হতে পারে না। শেষোক্ত এই প্রমাণটি Transcendental Deduction of the Categories এবং Analytic of Principles -এর অন্তর্গত।

৫.৩.৪ Kant-এর পদার্থ-নির্ণয় সূত্র

Kant বলেন, ইতিপূর্বে একমাত্র Aristotle-ই এক-প্রকার পদার্থ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে Aristotle কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেননি, এলোপাথাড়ি অনুসন্ধান করেছেন। ফলে যে চারটি শর্তের কথা Kant বলেছেন Aristotle-এ তা পূরিত হয়নি। অবশ্য অনেকে হয়ত বলবেন, আবিষ্কারের কোন সাধারণ সূত্র নাই। জ্ঞানের সাথে প্রতিভা যুক্ত হলে তবেই বড় কিছু আবিষ্কার করা যায়। পদার্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Kant কিন্তু একথা মানতে রাজী নন। পদার্থ নির্ণয় এক অর্থে বাছাই-এর কাজও, যার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতি অতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তাঁর মতে এই নীতি হবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সৃষ্টির অনিবার্য পূর্বশর্তের সাথে সম্পর্কিত। পুনরায়, নীতিটি এমন হবে যে তার সাহায্যে বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা-সমূহকে একটি সম্পূর্ণ তন্ত্র হিসাবে দেখান হবে। Kant শেষ পর্যন্ত বোধ-বুদ্ধির প্রকৃতি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই নীতিকে খুঁজে পেয়েছেন। বোধ-বুদ্ধি Kant-এর মতে পরম ঐক্য এবং

স্বয়ংসম্পূর্ণও বটে। সুতরাং বোধ-বুদ্ধির কোন একটি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে তারই সূত্র ধরে সম্পূর্ণ বোধ-বুদ্ধি পরিক্রমা করা যায়।

Kant বোধ-বুদ্ধির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে পদার্থ-নির্ণয়ের সূত্রটি যেভাবে খুঁজে পেয়েছেন তা হল এই-রকম। মানুষ যে ধরনের চিন্তাবৃত্তির অধিকারী তা সকল ক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে একইভাবে কাজ করে। প্রত্যক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে বোধ-বুদ্ধির আকারে চিন্তাবৃত্তির প্রথম প্রকাশ। চিন্তাবৃত্তি কোন প্রতীতি সৃষ্টি করে না বা প্রকৃত কিছু সৃজন করে না। এর ক্রিয়ার সাহায্যে বিশিষ্ট প্রতিবেদনগুলিকে এক করে দেখা হয়। চিন্তাবৃত্তির এই ক্রিয়া প্রত্যক্ষের মধ্যে কাজ করে। একই ক্রিয়া প্রত্যক্ষ পরবর্তী অবধারণ গঠনের মধ্যেও কাজ করে। অবধারণে একটি ধারণাকে আর একটি ধারণার সাথে তুলনা করে, একটিকে আর একটির অন্তর্গত করে, ঐক্যবদ্ধ করা হয়। প্রত্যক্ষের মধ্যে বোধ-বুদ্ধি তথা চিন্তা যেভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে আমাদের কোন চেতনা নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ-পরবর্তী স্তরে যখন অবধারণ গঠিত হয় তখন সেই অবধারণ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট চেতনা থাকে। এই অব্যক্ত অবধারণের বিভিন্ন মৌলিক আকার বা প্রকরণগুলি লক্ষ্য করে আমরা বোধ-বুদ্ধির বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি হল ঐ সমস্ত ক্রিয়ার ধারণা। সুতরাং অবধারণের মৌলিক আকারগুলি বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহের নির্দেশক।

H. J. Paton লক্ষ্য করেছেন যে, বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে Kant যে যুক্তি দিয়েছেন তা পাঁচটি ধাপে বিভক্ত। সেই ধাপগুলি হল :

১) 'Understanding is a power of knowing by means of concept', অর্থাৎ, বোধ-বুদ্ধি হল ধারণার সাহায্যে কোন কিছু জানার ক্ষমতা।

২) 'To know by means of concepts is to judge', অর্থাৎ, ধারণার সাহায্যে কোন কিছুকে জানার অর্থ হল অবধারণ গঠন করা বা বিচার করা।

৩) 'To judge is essentially to unite our ideas', অর্থাৎ, অবধারণ গঠন করা বা বিচার করার অর্থ হল আমাদের ধারণাগুলিকে একত্রিত করা।

৪) 'The different ways by which judgements unite our ideas are the forms of judgment', অর্থাৎ, যে বিভিন্ন উপায়ে আমাদের ধারণাগুলি অবধারণে ঐক্যবদ্ধ হয় সেগুলি হল অবধারণের এক একটি মৌলিক আকার।

৫) 'Consequently the complete list of the forms of judgment is a complete list of the functions of the understanding', অর্থাৎ, অবাধারণের মৌলিক আকারগুলির সম্পূর্ণ তালিকাই হল বোধ-বুদ্ধির বিভিন্ন ক্রিয়ার সম্পূর্ণ তালিকা।

৫.৩.৫ পদার্থের তালিকা

বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা নির্ণয়ের সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার পর Kant দেখিয়েছেন যে, অবধারণের সমস্ত মৌলিক আকারগুলিকে মোট চারটি শীর্ষে এবং প্রতিটি শীর্ষের অন্তর্গত তিনটি মুহূর্তে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ অবধারণের মৌলিক আকারসমূহ মোট বার প্রকারের। এই আকারগুলি হল — সামান্য, বিশেষ ও একক (অবধারণের পরিমাণের হিসাবে); সদর্থক, নঞর্থক ও অসীম (অবধারণের গুণের হিসাবে); নিরপেক্ষ

প্রাকল্পিক ও বৈকল্পিক (অবধারণের সম্বন্ধের হিসাবে); সমস্যামূলক, ঘোষণামূলক এবং নিশ্চয়তামূলক (অবধারণের ভঙ্গিমার হিসাবে)। অবধারণের এক-একটি মৌলিক আকার অনুযায়ী এক একটি বোধ-বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা পাওয়া যায়। ধারণাগুলি হল — ঐক্য, বহুত্ব, সমগ্র, বাস্তব, অবাস্তব, সীমাবদ্ধ, দ্রব্য, কার্য-কারণ, সমষ্টি, সম্ভব-অসম্ভব, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব এবং অনিবার্য সম্ভাব্য।

৫.৩.৬ Kant -এর পদার্থ-তালিকা ও Aristotle -এর পদার্থ-তালিকা — একটি তুলনা

Kant মনে করেন, তিনি পদার্থ বা category-এর যে তালিকাটি তৈরি করেছেন তা সম্পূর্ণ নিখুঁত। তুলনায় প্রাচীন দার্শনিক Aristotle পদার্থের যে তালিকাটি তৈরি করেছেন তার মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। তিনি কোন নীতি অনুসরণ না করেই কতকগুলি ধারণাকে পদার্থের ধারণা বলে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমে তিনি দশটি ধারণা বেছেছিলেন, এবং সেগুলিকে তিনি বলেছিলেন categories বা predicaments। পরে তিনি আরও পাঁচটি ধারণা খুঁজে পান যাদেরকে বলেছিলেন post-predicaments। Aristotle -এর নির্বাচিত দশটি predicaments হল — দ্রব্য (substantia বা substance), গুণ (ubi বা place), কাল (quando বা time), অবস্থা (situs বা situation), প্রবণতা (habitus বা state), ক্রিয়া (actio বা action), এবং আলোড়ন (passio বা passion)। আর যে পাঁচটিকে তিনি post-predicaments বলেছিলেন সেগুলি হল — বৈপরিত্য (oppositum বা opposite), পূর্ব বা প্রাক্ (prius বা prior), সমসাময়িক (simul বা simultaneous), গতি (motus বা motion) এবং প্রস্তুতি (habere বা fit)। Aristotle -এর এই তালিকাটিতে যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে বলে Kant মনে করেন তা হল — প্রথমতঃ, কিছু বিশুদ্ধ প্রতীতির ধারণা, যেমন, স্থান, কাল ইত্যাদি, এবং কিছু অবিশুদ্ধ প্রতীতির ধারণা, যেমন, গতি ইত্যাদিকে পদার্থ বা category বা predicament বলে গণ্য করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, কিছু অনুসৃত ধারণা, যেমন, ক্রিয়া, আলোড়ন, ইত্যাদিকেও predicament হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ, কিছু কিছু ধারণা যা প্রকৃতপক্ষে পদার্থ, যেমন, কার্য-কারণ, সম্ভব-অসম্ভব ইত্যাদির ধারণা Aristotle -এর তালিকায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থেকেছে।

যদিও Kant Aristotle -এর পদার্থতত্ত্বকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন তথাপি অনেক বিশিষ্ট ভাষ্যকারই মনে করেন Kant যেভাবে পদার্থের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে করে Aristotle-এর প্রসঙ্গ আসে না। Aristotle পদার্থ বলতে যা বুঝেছিলেন তার সাথে Kant-এর পদার্থ-তত্ত্বের কোন অনিবার্য সংযোগ নেই। পদার্থ বলতে Kant বোধের বা বুদ্ধি-ক্রিয়ার বিশুদ্ধ ধারণা বুঝেছেন। এগুলি জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বৌদ্ধিক উপাদান। কিন্তু Aristotle পদার্থের উৎস বিচার করেননি। Aristotle জানতে চেয়েছেন জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সত্তার কোন্ কোন্ বিশিষ্ট ভঙ্গিমা (modes of being) আমরা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। কিন্তু Kant জানতে চেয়েছেন বোধ-বুদ্ধির কোন্ ক্রিয়ার ফলে মানব-বোধের নিকট প্রদত্ত প্রতিভাস-সমূহ বিষয় হিসাবে ব্যাখ্যাত ও জ্ঞাত হয়। সহজ কথায়, Aristotle বস্তু বিচার করেছেন, অন্যদিকে Kant বুদ্ধি বিচার করেছেন। বিচারের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত পার্থক্য থাকায় তারা পরস্পর তুলনীয় নয়।

৫.৪ পদার্থ-প্রমাণ (Transcendental Deduction of the Categories)

Kant-এর ভাষ্যকারেরা অনেক সময় মনে করেন যে পদার্থ-প্রমাণই হল Critique of Pure Reason গ্রন্থের অন্যতম মূল বিষয়, এবং Kant নিজেই বলেছেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে তাঁর সব চাইতে বেশি সময় লেগেছে এবং সব চাইতে বেশি শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। Kant-এর মতে categories বা বিষয়ের বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ বাইরের জগতের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত নয়, এগুলি বিশুদ্ধ ও বুদ্ধিজাত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধারণা-বস্তু। অথচ এগুলি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ উপাদান-রূপে পরিজ্ঞাত। বিষয় মনের বাইরে অবস্থিত। অর্থাৎ, যা মূলতঃ মনের ধারণা তাই আবার মনের বাইরে বিষয়-রূপে বাস্তব। কিন্তু কি-ভাবে তা সম্ভব হয়?

যে-হেতু পদার্থ-সমূহ বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা সে-হেতু Kant অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত কোন তথ্যাদি দিয়ে এদের প্রমাণ দেবার চেষ্টা করেননি। ইতিপূর্বে Transcendental Aesthetic অংশে Kant দেখিয়েছেন যে দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হওয়ার অনিবার্য পূর্বশর্ত। সেই কারণে, দেশ ও কাল ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপ মনের ধর্ম হলেও ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় বাস্তব। অনুরূপ, এখানেও Kant প্রমাণ করে দেখাবার চেষ্টা করবেন যে, বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণাগুলি হল বিষয়কে জানবার অনিবার্য পূর্বশর্ত। কোন কিছুকে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বিষয় হতে হলে তাকে প্রথমতঃ, প্রদত্ত হতে হবে, এবং একমাত্র দেশ ও কালের আকারে কোন কিছু প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, তাকে আবার জ্ঞানের বিষয়-রূপে ব্যাখ্যাত হতে হবে। পদার্থগুলি হল ঐ ব্যাখ্যার অনিবার্য ধারণা। অতএব পদার্থসমূহ বিষয়ে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত।

৫.৪.১ পদার্থ-প্রমাণের দু'টি দিক

Kant-এর পদার্থ-প্রমাণের দু'টি দিক আছে, যার একটি হল বিষয়ীগত দিক (subjective side) এবং অপরটি হল বিষয়গত দিক (objective side)। Kant-এর মতে বিশুদ্ধ চেতনা বলে কিছু নেই। চেতনা হল কোন না কোন বিষয়ের চেতনা। অর্থাৎ বিষয় গঠনের মধ্য দিয়ে চেতনা গঠিত হয়। অপরদিকে আবার স্বস্থিত ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিষয় বলেও কিছু নেই। যে কোন বিষয়ই হল চেতনার বিষয়। অর্থাৎ, বিষয়ের চেতনা ও চেতনার বিষয় পরস্পর-সাপেক্ষ। তারা যেন একই মুদ্রার দুই পিঠ। সুতরাং পদার্থ-প্রমাণের একটি প্রশ্ন হল — কিরূপে বিষয়-চেতনা সম্ভব? অর্থাৎ, কোন্ অনিবার্য প্রাক্‌শর্ত পূরণের ফলে বিষয়-চেতনা গঠিত হয়? এই প্রশ্নগুলির Kant যে-রূপ উত্তর দিয়েছেন তা Subjective Deduction of The Categories বা পদার্থের বিষয়ীগত প্রমাণরূপে পরিচিত। পদার্থ-প্রমাণের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হল — কিরূপে চেতনার বিষয় সম্ভব? অর্থাৎ, কোন্ অনিবার্য প্রাক্‌শর্ত পূরণের ফলে প্রকৃতি গঠিত হয়? দ্বিতীয় প্রশ্নটির Kant যে উত্তর দিয়েছেন তা Objective Deduction of the Categories বা পদার্থের বিষয়গত প্রমাণরূপে পরিচিত। একটু গভীরে প্রবেশ করলে বুঝা যায় যে পদার্থের দ্বিবিধ প্রমাণই আসলে একই প্রমাণ। খুব সম্ভবতঃ, এই কারণে Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে Subjective Deduction of the Categories বা পদার্থের বিষয়ীগত প্রমাণটিকে উপেক্ষা করেছেন।

৫.৪.২ পদার্থ-প্রমাণের বিষয়ীগত দিকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পদার্থের যে দু'টি প্রমাণের উল্লেখ করা হল তার প্রথম প্রমাণ, অর্থাৎ, Subjective Deduction বা বিষয়ীগত প্রমাণে Kant দেখিয়েছেন যে, মনের তিনটি ক্ষমতা, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা, বোধ-বুদ্ধির ক্ষমতা এবং মাঝামাঝি আর একটি ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি, একত্রে পরস্পর সহযোগিতায় বিষয় চৈতন্য গড়ে তোলে। ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে স্বস্থিত সত্তা কোনভাবে যুক্ত হলে এক অস্পষ্ট অনুভব জন্মে। অতঃপর বোধ-বুদ্ধির ক্রিয়ায় এবং কল্পনাশক্তির সহযোগিতায় এই অস্পষ্ট অনুভব সুস্পষ্ট বিষয় চেতনায় রূপান্তরিত হয়। বিষয়-চেতনার জন্য আমি-ঐক্য (transcendental unity of apperception) একান্ত জরুরী। বোধ-বুদ্ধি থেকে উৎসারিত পদার্থের ধারণাগুলি অনুভবের উপর প্রযুক্ত হলে পর ঐ আমি-ঐক্যের আবির্ভাব ঘটে। ফলে বোধ-বুদ্ধির ধারণাগুলি বিষয়ে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত হয়।

৫.৪.৩ পদার্থ-প্রমাণের বিষয়গত দিকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পদার্থের দ্বিতীয় প্রমাণ, অর্থাৎ Objective Deduction of the Categories বা পদার্থের বিষয়গত প্রমাণে Kant দেখান যে, যে-কোন জ্ঞানের বিষয় হল প্রকৃতির বিষয়। প্রকৃতি কিন্তু স্বস্থিত সত্তা নয়, প্রকৃতি হল বোধ-বুদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট বা বোধ-বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত প্রতিভাস। Understanding maketh nature বা বোধ-বুদ্ধি প্রকৃতিকে গড়ে তোলে — এ হল Kant -এর অতি বিখ্যাত তত্ত্ব। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, বোধ-বুদ্ধি প্রকৃতিকে সৃজন করে। বোধ-বুদ্ধি প্রকৃতিকে নিয়ম দান করে। ঐ নিয়মগুলি বোধ-বুদ্ধির ধারণা থেকে আসে। অর্থাৎ, বোধ-বুদ্ধির ধারণা হল প্রকৃতির ধারণা এবং প্রকৃতি সম্পর্কে অনিবার্যভাবে প্রযুক্ত।

পদার্থ-প্রমাণের মধ্য দিয়ে Kant যা সুনির্দিষ্ট করে দেখিয়েছেন তা হল — কিরূপে প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান সম্ভব হয় (how our a priori knowledge of nature is possible), অর্থাৎ কিরূপে প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ গঠন করা সম্ভব হয়, ইত্যাদি।

৫.৫ Suggested Questions : প্রশ্নাবলী

1. What is Transcendental Logic? How does Kant distinguish between Formed Logic and Transcendental Logic? (দ্রঃ, ৫, ৫.১)
2. What, according to Kant, are Categories? (দ্রঃ. ৫.২, ৫.৩, ৫.৩.১)
3. What special problems does Kant seek to solve in his Metaphysical Deduction of the Categories?

   or

   Critically discuss Kants' Metaphysical Deduction of the Categories.(দ্রঃ ৫.৩.২, ৫.৩.৩, ৫.৩.৪, ৫.৩.৫, ৫.৩৬)

4. Give a brief outline of Kants' Transcendental Deduction of the Categories.(দ্রঃ ৫.৪, ৫.৪.১, ৫.৪.২, ৫.৪.৩)

৫.৬ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kants' Critique of Pure Reason*
2. H. J. Paton, *Kants Metaphysic of Experiences,* Vol. 1
3. A. C. Ewing, *A Short Commentary on Kants' Critique of Pure Reason*
4. C. D. Broad, *Kant, An Introduction*
5. Ras Vihary Das, *A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason.*
6. গোপাল চন্দ্র খান, কান্টের দর্শন, পদার্থ-তত্ত্ব ঃ কিছু প্রসঙ্গ, তত্ত্ব ও প্রয়োগ, কান্টের দর্শন

ষষ্ঠ পাঠ (Unit-VI)

প্রকৃতির কয়েকটি মূল নীতি ও প্রকৃত-বহির্ভূত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় জগৎ (Principles of Nature and the Unknown and Unknowable)

পাঠ সংকেত

৬. কারণের তত্ত্ব (Theory of Causation)

৬.১ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কারণ ও কার্য

৬.২ David Hume ও কার্য-কারণ তত্ত্ব

৬.৩ David Hume -এর সাথে Kant -এর মতৈক্য ও মতপার্থক্য

৬.৪ সার্বিক কার্য-কারণ নীতির দু'টি বিবরণ

৬.৫ কার্য-কারণের অনিবার্যতা

৬.৫.১ প্রথম প্রমাণ

৬.৫.২ দ্বিতীয় প্রমাণ

৬.৬ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (The concept of the noumenon)

৬.৬.১ জ্ঞানের বিষয় ও চিন্তার বিষয়

৬.৬.২ স্বস্থিত সত্তা ও প্রতিভাস

৬.৬.৩ প্রকৃতি (phenomena) ও প্রকৃতি-বহির্ভূত (noumena)

৬.৬.৪ প্রকৃতি-বহির্ভূত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-এর দু'টি সংজ্ঞা

৬.৬.৫ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব মানার প্রয়োজনীয়তা

৬.৭ Suggested Questions

৬.৮ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থ

৬. কারণের তত্ত্ব (Theory of Causation)

Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের Transcendental Analytic-এ যে মূল প্রশ্নটির উত্তর চেয়েছেন তা হল — কিরূপে পদার্থবিজ্ঞানে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব (How are judgments synthetic a priori possible in Physics?) ? Kant-এর মতে এমন নয় যে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিটি অবধারণই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক। কিন্তু বিশুদ্ধ পদার্থ-বিজ্ঞান (Pure Physics), অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞানের যেগুলি মূল নীতি বা প্রাক্-গৃহীত নীতি, সেগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ-রূপে

গঠিত। সার্বিক কার্য-কারণ নীতি (theory of universal causation), পদার্থের অবিনশ্বরতার নীতি (law of the conservation of matter and energy), ইত্যাদি হল পদার্থ-বিজ্ঞানের এরূপ মূল নীতি। ইতিপূর্বে Kant প্রমাণ করেছেন যে, বুদ্ধির কতকগুলি বিশুদ্ধ ধারণা হল বিষয়ের সামান্য ধারণা, এবং সেগুলি বাস্তবিক ও সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার জগতে প্রযোজ্য। কার্য-কারণের ধারণা হল এরূপ বুদ্ধির বিশুদ্ধ ধারণা। ফলে, জগতের প্রতিটি ঘটনাই হয় কারণ না-হয় কার্য। কিন্তু যে-কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য হয় না। কারণ-কার্যের সম্বন্ধের নির্দিষ্টতা আছে। বিভিন্ন দার্শনিক এই নির্দিষ্টতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

৬.১ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কারণ ও কার্য

প্রাচীন দার্শনিক Aristotle বলেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান হল কারণের অনুসন্ধান। তাঁর মতে অবশ্য কারণ চার প্রকার — উপাদান-কারণ (material cause), আকার-কারণ (formal cause), নিমিত্ত-কারণ (efficient cause) এবং পরিণতি-কারণ (final cause)। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে কারণের বিভিন্নতা স্বীকার করা হয় না। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কারণ এবং কার্য উভয়ই হল ঘটনা, এবং ঘটনা হল জড়বস্তুর পরিবর্তন। কার্য-কারণ সম্বন্ধ হল একটি পরিবর্তনের সাথে আর একটি পরিবর্তনের সম্বন্ধ। Kant -এর মতে এই সম্বন্ধ হয় অনিবার্য সম্বন্ধ। কিন্তু সকল দার্শনিক তা স্বীকার করেন না। সেই জন্য Kant -এর কাছে কার্য-কারণের অনিবার্যতা প্রমাণ জরুরী হয়ে দেখা দেয়। তিনি Transcendental Analytic-এর দ্বিতীয় উপমান বা Second Analogy-তে এই প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে Kant -এর প্রধান প্রতিপক্ষ হলেন David Hume। বস্তুতঃ এ-স্থানে Kant মোট যে তিনটি Analogy of Experience আলোচনা করেছেন তার প্রতিটির প্রতিপক্ষই হলেন David Hume। Hume-এর অভিজ্ঞতাবাদ অনুযায়ী জগতে (আন্তর্জগতে অথবা বহির্জগতে) কোথাও স্থায়ী দ্রব্য-সত্তা (substance) নাই। জগতের প্রতিটি ঘটনাই একক, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন, এবং জগতের অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের পারস্পারিকতা নাই। কিন্তু Kant দেখিয়েছেন যে, স্থায়ী দ্রব্যের ধারণা, ঘটনার অনিবার্যতা, এবং অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের পারস্পরিকতা প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য একান্ত জরুরী।

৬.২ David Hume ও কার্য-কারণ তত্ত্ব

David Hume সার্বিক কার্য-কারণ বা Causal maxim-কে এইভাবে ব্যক্ত করেন — every beginning of existence has a cause, অর্থাৎ প্রতিটি অস্তিত্বশীল বস্তু যার শুরু আছে তার কারণ আছে। Hume-এর মতে এই বাক্যের সত্যতা না ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে না কোন তর্কের যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায়। অপরপক্ষে বিশেষ কার্য-কারণ হল সতত সংযোগ, যার ভিত্তি হল অতীত এবং বর্তমান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, এবং অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে ওঠা অভ্যাসের প্রবণতা। যদি A-সদৃশ ঘটনাসমূহকে B-সদৃশ ঘটনাসমূহ খুব কাছাকাছি সময়ে অনুসরণ করে এবং এ যাবৎ অভিজ্ঞতায় যদি তাদেরর কোন ব্যতিক্রম না দেখা যায় তাহলে প্রত্যাশা করা যায় যে ভবিষ্যতেও B-সদৃশ ঘটনাসমূহ A-সদৃশ ঘটনাসমূহকে অনুসরণ করবে। অর্থাৎ A হল B-র কারণ। প্রত্যাশার অনিবার্যতা ছাড়া পূর্বাপর ঘটনা-সমূহের মধ্যে আর কোন অনিবার্যতা নাই। Hume-এর এই বিশেষ কার্য-কারণ সম্বন্ধ সতত সংযোগবাদ-রূপে পরিচিত (theory

of constant conjunction)। Kant এর বিরোধিতা করেন।

৬.৩ David Hume-এর সাথে Kant-এর মতৈক্য ও মতপার্থক্য

David Hume কার্য-কারণ সম্বন্ধের যে বিশ্লেষণ দেন Kant তার সব কিছুই বিরোধিতা করেন তা নয়। Hume-এর মতে কার্য-কারণ সম্বন্ধে হল সংশ্লেষক সম্বন্ধ, অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধ কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার জগতে প্রযুক্ত, এবং একমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যে বলা যেতে পারে কোন কার্যের কি কারণ বা কোন কারণ থেকে কি কার্য হয়। Hume-এর কার্যকারণের এই বিশ্লেষণের সাথে Kant পুরোপুরি একমত হন। কিন্তু কার্য-কারণ হল ঘটনার সতত সংযোগ, তদতিরিক্ত কিছু নয়, এবং কার্য-কারণের অনিবার্যতা মানসিক প্রত্যয় মাত্র, Hume-এর এই মতের পুরোপুরি বিরোধী মত Kant অনুসরণ করেন। যেহেতু কার্য-কারণ সম্বন্ধ সংশ্লেষক সম্বন্ধ সেই হেতু একমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যেই বিশেষ কার্য-কারণ আবিষ্কৃত হতে পারে। কিন্তু কারণের আবিষ্কারের উপায় এবং কারণের স্বরূপ নির্ণয় এক নয়। বিশেষ কার্য-কারণ হল সার্বিক কার্য-কারণের দৃষ্টান্ত এবং সার্বিক কার্য-কারণের যে অনিবার্যতা তা বিশেষ কার্য-কারণের মধ্যে সঞ্চারিত। Kant দ্বিতীয় উপমান বা Second Analogy-তে সার্বিক কার্য-কারণের অনিবার্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

৬.৪ সার্বিক কার্য-কারণ নীতির দু'টি বিবরণ

Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সার্বিক কার্য-কারণ নীতিটিকে এইভাবে ব্যক্ত করেন — Everything that happens, i.e., begins to be, presupposes somethng on which it follows according to a rule, অর্থাৎ, প্রকৃতিতে যখন কিছু ঘটে বা প্রথম আবির্ভূত হয়, তখন তা তার পূর্বে অবস্থিত অপর কিছুকে নিয়ম অনুসারে অনুসরণ করেই হাজির হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ একই সার্বিক কার্য-কারণ নীতিটিকে তিনি একটু অন্যভাবে ব্যক্ত করেন — All changes take place in conformity with the law of the connection of cause and effect, অর্থাৎ, প্রকৃতির প্রতিটি পরিবর্তনই কার্য-কারণের নিয়ম অনুসারে সাধিত হয়। সহজ কথায়, প্রকৃতির কোন পরিবর্তনই আকস্মিক নয়। তার মধ্যে রয়েছে অনিবার্যতা।

৬.৫ কার্য-কারণের অনিবার্যতা

Kant কার্য-কারণের অনিবার্যতার মোট ছ'টি প্রমাণ দিয়েছেন। এর সব কটি স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। একই প্রমাণ দু'বার দু'ভাবে হাজির করেছেন — এই রকম। আমরা এখানে দু'টি প্রমাণ উল্লেখ করব।

৬.৫.১ প্রথম প্রমাণ —

এখানে Kant অভিজ্ঞতার দু'প্রকার ক্রমের পার্থক্য দেখিয়েছেন। এক প্রকার অভিজ্ঞতার ক্রম হল ব্যক্তি সাপেক্ষ এবং আর এক-প্রকার অভিজ্ঞতার ক্রম হল ব্যক্তি নিরপেক্ষ ও বস্তু-সাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ,

যখন আমরা বন্দরে স্থির একটি জাহাজকে প্রত্যক্ষ করি তখন আমরা জাহাজটিকে বিভিন্ন ক্রমে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম । আমরা প্রথমে জাহাজের তলদেশ, পরে মধ্যদেশ ও তারপর মাস্তুলটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি, আবার ইচ্ছা করলে বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ প্রথমে জাহাজের মাস্তুল তার পর মধ্যদেশ ও শেষে তলদেশ প্রত্যক্ষ করতে পারি। এক্ষেত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও নানা ভাবে আমরা জাহাজটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের কোন অনিবার্য সুনির্দিষ্ট ক্রম নাই। কিন্তু ঐ একই জাহাজটিকে যখন দূর থেকে বন্দরের দিকে আসতে দেখি তখন অতি অবশ্য আমরা প্রথমে মাস্তুলটিকে দেখব, পরে মধ্যদেশ ও তারপর তলদেশ প্রত্যক্ষ করব, অন্য কোন ক্রমে নয়। আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে প্রথম প্রকার অভিজ্ঞতার ক্রম-পরিবর্তনের সাথে বস্তুর অবস্থা অনিবার্যভাবে সংযুক্ত নয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অভিজ্ঞতার ক্রম-পরিবর্তনের জন্য বস্তুর অবস্থা অনিবার্য। এই অনিবার্যতা হল কারণের অনিবার্যতা। এখানে বস্তু হল কারণ যা অনিবার্যভাবে অভিজ্ঞতার ক্রম নির্দিষ্ট করে। ক্রম-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা যদি কোন নিয়ম স্বীকার না করি তাহলে আমরা কোনভাবেই ব্যক্তিসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা-ক্রম থেকে বস্তুসাপেক্ষ অভিজ্ঞতা-ক্রমের পার্থক্য করতে পারব না।

৬.৫.২ দ্বিতীয় প্রমাণ

এই প্রমাণে Kant বিশুদ্ধ কালের ধর্ম উল্লেখ করেন। কাল সকল অনুভবের আকার। ফলে কালের ধর্ম সকল অনুভবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এবং বলাবাহুল্য, অনুভবেরর উপাদান ছাড়া কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা হয় না। কাল হল অনন্ত মুহূর্ত-রাশি। এই মুহূর্তগুলি পূর্বাপর-বিশিষ্ট এবং কালের পূর্বাপর ক্রম অনিবার্য। পূর্বের কাল-মুহূর্ত অতিক্রম না করে পরের কাল-মুহূর্তে হাজির হওয়া যায় না, বা মুহূর্তগুলিকে অদল-বদল করা যায় না। অর্থাৎ, কোনভাবেই পূর্বের কালকে পরে এবং পরের কালকে পূর্বে আনা যায় না। এ-হল কালের অমোঘতা। কালের এই অমোঘতা কালে সংঘটিত বস্তু-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কারণের অনিবার্যতারূপে দেখা দেয়। বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কারণ-কার্য পূর্বাপর সম্বন্ধযুক্ত।

৬.৬ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (The concept of the noumenon)

৬.৬.১ জ্ঞানের বিষয় ও চিন্তার বিষয়

Kant তাঁর দর্শনে বিষয়-সমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিষয় এবং চিন্তার বিষয়। যা কিছু জ্ঞানের বিষয় তাই আবার চিন্তার বিষয়, কিন্তু চিন্তার সকল বিষয় জ্ঞানের বিষয় হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক কিছুই ভাবতে পারি, অর্থাৎ ঈশ্বর চিন্তার বিষয়, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। চিন্তায় আমরা যে সমস্ত বিষয় পাই, অথচ অভিজ্ঞতায় পাই না, তার কিছু কিছু অভিজ্ঞতার জগৎকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনিবার্য বলে গৃহীত নয়। যেমন, নৈতিকতা অনুভবের বিষয়। কিন্তু কেবলমাত্র অনুভব দিয়ে নৈতিকতার ব্যাখ্যা হয় না। নৈতিকতা ব্যাখ্যার কারণে, 'ঈশ্বর', 'ইচ্ছার স্বাধীনতা' এবং 'আত্মার অমরত্ব'-এর ধারণা, Kant-এর মতে একান্তই জরুরী। তথাপি এগুলি বিশুদ্ধ ধারণা-মাত্র, এদেরকে আমরা কখনই অভিজ্ঞতায় পাই না। Kant এদেরকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয় (noumenal objects) বলেছেন।

৬.৬.২ স্বস্থিত সত্তা ও প্রতিভাস

Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থে প্রথম যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়ের কথা বলেন তা হল 'স্বস্থিত সত্তা' (thing-in-itself বা things-in-themselves)। সেখানে তিনি তাঁর কোপার্নিকীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখে দেখান যে, আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সকল বিষয়ই হল প্রতিভাস (appearance)। অভিজ্ঞতার জগৎকে প্রতিভাস বললে তর্কসম্মত-ভাবে মানতেই হয় যে, প্রতিভাসের আড়ালে বা প্রতিভাসের অধিষ্ঠান-রূপে স্বস্থিত কিছু আছে। কিন্তু সেই স্বস্থিত সত্তা মানুষের জ্ঞান-চেতনার নিকট প্রকাশিত নয়। তার কারণ, Kant বলেন, ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে গৃহীত স্বজ্ঞার প্রতিবেদন (intuitive representation) হল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার একমাত্র উপাদান। স্বস্থিত সত্তা কোনভাবে ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সচকিত করলে ঐ স্বস্থিত সত্তার প্রতিবেদন দেশ ও কালের আকারে ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে গৃহীত হয়। কিন্তু যে-হেতু দেশ ও কাল স্বস্থিত সত্তার কোন ধর্ম নয় বা তার সাথে কোনভাবে যুক্ত নয়, পরন্তু ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার, সে-হেতু স্বজ্ঞার প্রতিবেদন-সমূহ প্রতিভাস, স্বস্থিত নয়। বিষয়টিকে H.J. Paton একটি উপমার সাহায্যে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন। আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি বা অনুভববৃত্তি যেন দেখার চোখ, এবং দেশ ও কাল যেন চোখের সামনে এঁটে থাকা রঙিন চশমার দু'টো কাঁচ। যদি কিছু দেখতে হয় তাহলে ঐ রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়েই দেখতে হবে, অন্য কোনভাবে নয়। ফলে চোখে যা কিছু দেখা যাবে তা হলে চশমার রঙে রঙিন, নিজের রঙে নয়। এক্ষেত্রে যা দেখব তা হবে যাকে দেখব তার প্রতিভাস। অনুরূপ, ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রতিভাসিত অনুভবের আড়ালে স্বস্থিত সত্তার উপস্থিতি সুনিশ্চিত , তবুও তাকে জ্ঞাত বা জ্ঞেয় বলা যায় না। তা নিজের রূপে মানুষের কাছে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

৬.৬.৩ প্রকৃতি (phenomena) ও প্রকৃতি-বহির্ভূত (noumena)

Kant তাঁর Critique গ্রন্থের Transcendental Aesthetic অংশে স্বস্থিত (Thing-in-itself) এবং প্রতিভাস (appearance)-এর যে পার্থক্য করেন Transcendental Analytic-এ তা আরও বিস্তৃত হয়ে phenomena এবং noumena-এর পার্থক্য-রূপে হাজির হয়। এখানে noumena বলতে বোঝান হয়েছে প্রকৃতি তথা ইন্দ্রিয়গম্য জগতের বাইরে অবস্থিত যেন কোন শূন্য স্থান ('empty space') যেখানে যা কিছু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়কে রাখা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, কল্পনা-বৃত্তি, বিচার-বৃত্তি, স্বস্থিত বিষয়, স্বস্থিত বিষয়ী, ইত্যাদি সবকিছুর আধার হল noumena।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠতে পারে, Kant অনেক কিছুকেই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বলছেন, এবং তাদের সম্পর্কে অনেক কথাই বলছেন — কিন্তু তা কি-ভাবে সম্ভব হয়? Kant বলেন ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি হল মনের দু'টি স্বতন্ত্র বৃত্তি বা জ্ঞান-ক্ষমতা। ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে গৃহীত স্বজ্ঞার প্রতিবেদনের সাথে বুদ্ধিবৃত্তি-জাত বিষয়ের ধারণাগুলি যুক্ত হলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়বৃত্তির সাথে বুদ্ধিবৃত্তির সহযোগিতা হল জ্ঞান-সৃষ্টির কারণ, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি যে সব সময় ইন্দ্রিয়বৃত্তির সহযোগী তা নয়। ইন্দ্রিয়গম্যতা এবং বুদ্ধিগম্যতা একই বিস্তৃতিসম্পন্ন নয়। বুদ্ধির প্রসার ইন্দ্রিয়ের প্রসারের চাইতে বেশি। ফলে, চিন্তা স্ব-বিরোধিতা মুক্ত হলে ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কেও চিন্তার ধারণা প্রযুক্ত হতে পারে। এরূপ ধারণা প্রয়োগের ফলে শুধু চিন্তার বিষয়ই পাওয়া যাবে, কিন্তু তা জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠবে না। যা জ্ঞানের বিষয় নয় অথচ চিন্তার বিষয় তা অজ্ঞাত

ও অজ্ঞেয়। দর্শনের কিছু কিছু দিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Kant অনেক অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বিষয়কে মেনেছেন এবং সাধারণভাবে তাদেরকে noumena বলেছেন।

৬.৬.৪ প্রকৃতি-বহির্ভূত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-এর দু'টি সংজ্ঞা

Kant 'noumena'-এর দুটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার একটি সদর্থক এবং অপরটি নঞর্থক। সদর্থকভাবে বলা যায় যে noumena হল তাই যা বুদ্ধি প্রত্যক্ষের বিষয়। বুদ্ধি-প্রত্যক্ষ হল দৃষ্টি-সৃষ্টি। Old Testament-এ যে-রূপ বলা হয়েছে, ''ঈশ্বর বললেন— আলো হোক্, আলো হল ("Let there be light, and lo it was light")। মানুষের এরূপ বুদ্ধি প্রত্যক্ষ-ক্ষমতা নাই। ফলে সদর্থক দিক থেকে 'noumena'-এর ধারণাটি মানুষের জ্ঞানের জগতে নিরর্থক। নঞর্থকভাবে বলা যায় 'noumena' হল এমন সব কিছু যা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের একান্তই অবিষয়। এক্ষেত্রে 'noumena' ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে। এর দ্বারা বোঝান হয় যে মানুষের বুদ্ধি এমন সব বস্তুর কথা ভাবতে বাধ্য যা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।

৬.৬.৫ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় তত্ত্ব মানার প্রয়োজনীয়তা

Kant তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধে এক জায়গায় বলেছেন, "I have therefore found it necessary to deny knowledge, in order to make room for faith" অর্থাৎ আমি বিশ্বাসের জগৎকে স্থান দেওয়ার কারণে জ্ঞানের জগৎকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়েছি। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে জ্ঞানের জগৎ অবস্থিত। এবং এই জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব। কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র জ্ঞাতা নয়, সে কর্তাও বটে এবং ভোক্তাও বটে। শুধুমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতে মানুষ কর্ম সম্পাদন করে এমন নয়। নৈতিক বিশ্বাস হল মানুষেরর নৈতিক কর্মের ভিত্তি। এই বিশ্বাসের বস্তু যা কিছু তা সবই হল 'noumena'। উদাহরণস্বরূপ '', 'Summum Bonum' ইত্যাদি হল 'noumena'।

৬.৭ Suggested Questions :

1. Show how Kant differs from Hume in his conception of cause.
2. State and explain Kant's formulation of the causal maxim. How does Kant prove that causal connection is a necessary connection?
3. Elucidate Kants' conception of the noumenon.

৬.৮ অতিরিক্ত পাঠের জন্য নির্বাচিত গ্রন্থ

1. N. K. Smith, *A Commentary to Kants' Critique of Pure Reason.*

Philosophy 1st Paper Part 1

ORIGINALITY REPORT

1%	0%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	P A Zyla, R M Barnett, J Beringer, O Dahl et al. "Review of Particle Physics", Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2020 Publication	<1%
2	Lautemann, Sven-Eric. "Schemaevolution in objektorientierten Datenbanksystemen auf der Basis von Versionierungskonzepten", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	<1%
3	Olive, K.A.. "Review of Particle Physics", Chinese Physics C, 2014. Publication	<1%
4	en.wikipedia.org Internet Source	<1%
5	ir.cwi.nl Internet Source	<1%
6	Béatrice Longuenesse. "Kant and the Capacity to Judge", Walter de Gruyter GmbH, 1998 Publication	<1%

7	strangebeautiful.com Internet Source	<1%
8	M. Tanabashi, K. Hagiwara, K. Hikasa, K. Nakamura et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2018 Publication	<1%
9	archive.org Internet Source	<1%
10	murshidabad.nic.in Internet Source	<1%
11	Mir Faizal, Douglas J. Smith. "Supersymmetric Chern-Simons theory in the presence of a boundary", Physical Review D, 2012 Publication	<1%
12	Weth, Christian von der. "Individuelle datenbankgestützte Reputationsberechnung in virtuellen Gemeinschaften", Universität Karlsruhe, 2009. Publication	<1%
13	Caliendo, Marco and Hujer, Reinhard. "Evaluation of active labour market policy : methodological concepts and empirical estimates", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2005. Publication	<1%

14	Hürst, Wolfgang. "Multimediale Informationssuche in Vortrags- und Vorlesungsaufzeichnungen", Universität Freiburg, 2005. Publication	<1 %
15	Kuz'mina. "The Origin of the Indo-Iranians", Brill, 2007 Publication	<1 %
16	Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden, 2015. Publication	<1 %
17	Submitted to Boston College High School Student Paper	<1 %
18	Submitted to Montour High School Student Paper	<1 %
19	ses.library.usyd.edu.au Internet Source	<1 %
20	Walther, Dieter. "Elektronische Eigenschaften eindimensionaler aperiodischer Strukturen. Einführung der Ortsraum Pfad-Renormierung tridiagonaler Jacobi-Operatoren und orthogonaler Polynome.", Universität Karlsruhe, 2007. Publication	<1 %
21	Bognár, Sebastian. "Elektrolumineszenzuntersuchungen an	<1 %

	In(Ga)As/GaAs Quantenpunkten - Gewinn und Polarisation von Kantenemittern", Technische Universität Berlin, 2005. Publication	
22	epdf.pub Internet Source	<1 %
23	Neubauer, Dagmar. "Fuzzy-Regression bei Fehlern in den Daten : Modellierung und Analysepotentiale", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2010. Publication	<1 %
24	Submitted to Trinity College Dublin Student Paper	<1 %
25	Submitted to MDCC - North Campus Student Paper	<1 %
26	theses.gla.ac.uk Internet Source	<1 %
27	Ragg, Thomas. "Problemlösung durch Komitees neuronaler Netze [online].", Universität Karlsruhe, 2007. Publication	<1 %
28	Lecture Notes in Computer Science, 2003. Publication	<1 %
29	Thöne, Andrea. "Einfluss von Dotierungen auf die Einkristallzüchtung und auf ausgewählte	<1 %

Eigenschaften von KNbO3", Kölner UniversitätsPublikationsServer, 2011.
Publication

30	Zehou Li. "Chapter 2 Epistemology: I. Raising the Question", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1 %
31	"Theoretische Physik 2", Springer Science and Business Media LLC, 2005 Publication	<1 %
32	Synthese Historical Library, 1972. Publication	<1 %
33	Zehou Li. "A New Approach to Kant", Springer Science and Business Media LLC, 2018 Publication	<1 %
34	www.newworldencyclopedia.org Internet Source	<1 %
35	"Encyclopedia of Optimization", Springer Science and Business Media LLC, 2009 Publication	<1 %
36	J. Beringer, J. -F. Arguin, R. M. Barnett, K. Copic et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2012 Publication	<1 %
37	Luca Romano. "Non-relativistic four dimensional p-brane supersymmetric theories	<1 %

	and Lie algebra expansion", Classical and Quantum Gravity, 2020 Publication	
38	koneill41.typepad.com Internet Source	<1 %
39	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
40	philpapers.org Internet Source	<1 %
41	www.etymologie.info Internet Source	<1 %
42	Ostrick, Beatrix(Weinheimer, Christian). "Eine kondensierte 83mKr-Kalibrationsquelle für das KATRIN-Experiment", Münster University, Germany, Document Server, 2009. Publication	<1 %
43	osms.wbsed.gov.in Internet Source	<1 %
44	Haukur Hafsteinsson, Markus Burak, Lars-Erik Eriksson, Mattias Billson. "Experimental and Numerical Investigation of a Novel Acoustic Liner Concept", 16th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 2010 Publication	<1 %
45	hdl.handle.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 16
Submission title:	Philosophy 2nd paper Part 1
File name:	Philosophy_2nd_Part_Total_Book_2012.pdf
File size:	1.67M
Page count:	198
Word count:	105,520
Character count:	376,299
Submission date:	29-Jul-2022 07:07AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876567514

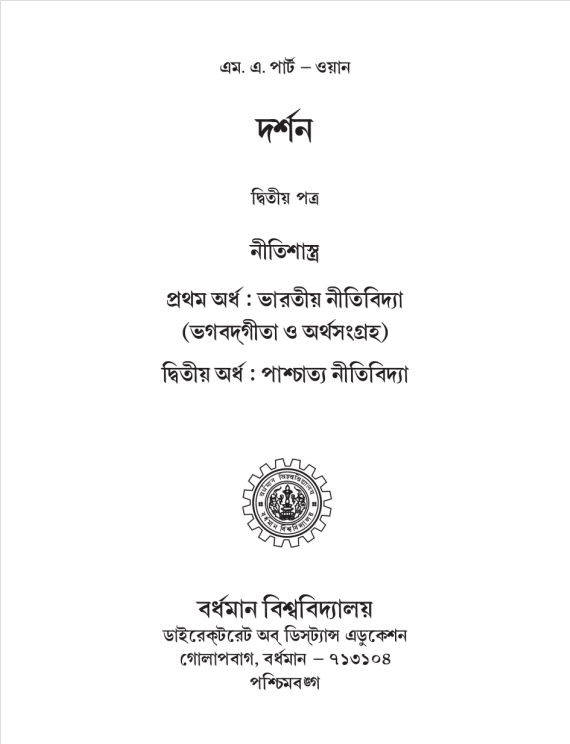

এম. এ. পার্ট – ওয়ান

দর্শন

দ্বিতীয় পত্র

নীতিশাস্ত্র

প্রথম অর্ধ : ভারতীয় নীতিবিদ্যা
(ভগবদ্‌গীতা ও অর্থসংগ্রহ)

দ্বিতীয় অর্ধ : পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 2nd paper Part 1

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:07AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876567514
File name: Philosophy_2nd_Part_Total_Book_2012.pdf (1.67M)
Word count: 105520
Character count: 376299

এম. এ. পার্ট – ওয়ান

দর্শন

দ্বিতীয় পত্র

নীতিশাস্ত্র

প্রথম অর্ধ : ভারতীয় নীতিবিদ্যা
(ভগবদ্‌গীতা ও অর্থসংগ্রহ)

দ্বিতীয় অর্ধ : পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ মৃদুলা ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক কোয়েলী চক্রবর্তী, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিদ্যালয়।

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান-পুনর্মুদ্রন-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ার ডিসেম্বর, ২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যেগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণপ্রমাদগুলি। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণপ্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বতমার্ন উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলির সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বর্তমান সংকলনে রয়েছে দ্বিতীয় পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে ''—এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম অর্ধ : পর্যায় গ্রন্থ – ১ (ভগবদ্‌গীতা)

সমাজের অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে আমাদের জীবন হয়েছে আরামদায়ক, সুখদায়ক ও ত্বরান্বিত — দূরের জিনিস আজ আমাদের নাগালে — অনেক অজানা জিনিস আজ আমাদের মনের মণিকোঠায়। তবুও আজ দেখা যাচ্ছে, সমাজের নানা স্তরে অবক্ষয়। এর কারণ হল নীতিবোধ ও মূল্যবোধের অভাব।

আগামী প্রজন্মকে নৈতিক কর্মে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ **ভগবদ্‌গীতা**-র সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ এই দুটি অধ্যায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই পাঠ্যাংশের ওপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য তিনটি ইউনিটে দূরশিক্ষার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী পাঠ-উপকরণগুলি রচনা করেছে। প্রতিটি ইউনিট কতকগুলি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে প্রধানত আত্মা ও দেহের ভেদ, স্বধর্ম ও স্থিতপ্রজ্ঞ এবং কর্মযোগ **ভগবদ্‌গীতা**-র আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। স্থলবিশেষে অনুবাদসহ মূল বিধৃত হয়েছে।

আমি অতি তৃপ্তির সাথে এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করেছি। এগুলি প্রাঞ্জল ও সুসম্বদ্ধ। পাঠ-উপকরণগুলি দূরশিক্ষার্থীদের একান্ত উপযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ পাঠ-উপকরণগুলি আমায় সম্পাদনা করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তার জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠ-প্রণেতা ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য্য-এর ভাব প্রকাশের ভঙ্গী ও যুক্তির পারিপাট্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাকে স্নেহসিক্ত শুভেচ্ছা জানাই।

অমরনাথ ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

'যন্নাস্তি ভারতে সৌম্য তন্নাস্তি খলু ভারতে' অর্থাৎ যা নেই মহাভারতে তা নেই ভারতবর্ষে — এরূপ প্রবাদবাক্যের সত্যতা অবিসম্বাদিত। **ভগবদ্‌গীতা মহাভারত**-এর একটি অংশবিশেষ। তাই **ভগবদ্‌গীতা**-কেও বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে। ভক্তের কাছে এটি ধর্মগ্রন্থ ও তত্ত্বুভুৎসুর কাছে এটি অধ্যাত্মশাস্ত্র। আর সমাজচিন্তকের কাছে এটি নীতিগ্রন্থ। গ্রন্থটি সব কালের সব মানুষের নীতিপথের দিশারী।

বর্তমান প্রজন্মকে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে **ভগবদ্‌গীতা**-র কিছু নির্ধারিত অংশ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন এর পক্ষ থেকে **ভগবদ্‌গীতা**-র ওপর পাঠ উপকরণ তৈরি করার জন্য আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ভগবদ্‌গীতা-র সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ এই দুটি অধ্যায় স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে আমি সমগ্র পাঠ্যাংশ তিনটি ইউনিটে ভাগ করে দূরশিক্ষার্থীর উপযোগী করে পাঠ-উপকরণগুলি লিখেছি। স্থলবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের বোধসৌকর্যের জন্য গীতার মূল ও তার বঙ্গানুবাদ সংযোজন করেছি। পাঠ-উপকরণগুলি বিদ্যার্থীর উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন এর কর্তৃপক্ষ, যাঁরা আমাকে এই উপকরণগুলি লেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমার শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যে এই পাঠ-উপকরণগুলি অতি যত্নসহকারে সম্পাদনা করেছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শের দ্বারা পাঠ-উপকরণগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁকে আমি প্রণতি জানাই।

মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম অর্ধ : পর্যায় গ্রন্থ-২ (অর্থসংগ্রহ)

ভাষাদর্শন বুঝতে হলে মীমাংশাদর্শন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। খুবই পরিতাপের বিষয় যে, পশ্চিমবঙ্গে মীমাংসার পঠন-পাঠন অবলুপ্তির পথে। তবে আশার আলো এই যে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ মীমাংসা পাঠের উপযোগিতা অনুধাবন করে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রণীত **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থের কিছু নির্ধারিত অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন অর্থসংগ্রহ-এর ওপর প্রস্তুত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পদনা করার কাজ আমায় দিয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রণীত অর্থসংগ্রহ গ্রন্থের ওপর লেখা পাঠ-উপকরণগুলি আমি সযত্নে সম্পাদনা করেছি। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় তিনটি ইউনিটে ধর্ম ও অধর্ম, বিধি ও ভাবনা এবং বিধির বিভাগ, নিষেধ ও অর্থবাদকে উপজীব্য করে মীমাংসার অতি দূরূহ তত্ত্ব অর্থগাম্ভীর্য বজায় রেখে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এর সাথে বঙ্গানুবাদ সহ মূল গ্রন্থের সংযোজন উপকরণ গুলিকে আরও পরিপুষ্ট করেছে। এই পাঠ- উপকরণগুলি দূরশিক্ষার্থীর একান্ত উপযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন এর কর্তৃপক্ষ আমাকে সম্পাদনা করার দায়িত্ব দেওয়ায় আমি সম্মানিত বোধ করছি। আমি তাঁদের সকলকে হার্দিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার শিক্ষক মিমাংসাদর্শনে পারদর্শী অধ্যাপক ড. অমরনাথ ভট্টাচার্যের লেখা পাঠ উপকরণগুলি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমি ব্যক্তিগত ভাবে উপকৃত হয়েছি। তাঁর কাছে জ্ঞানঘন শুভাশিস্ প্রর্থনা করি।

মৃদুলা ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

মীমাংসাদর্শনকে বাক্যশাস্ত্র বলে। কর্মকান্ডবিষয়ক বেদবাক্যের অর্থ বিচার করা মীমাংসাদর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হলেও অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বও এখানে পর্যালোচিত হয়েছে। মীমাংসকেরা বিহিত কর্ম করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কোন্ কর্ম ব্যক্তি ও সমাজের হিতকর ও কোন্‌টি অহিতকর তা বিশ্লেষণ করে পাঠককে মঙ্গলজনক কর্মানুষ্ঠানে প্রেরণা দেওয়া ও প্রবৃত্তি জন্মানো মীমাংসাদর্শনের লক্ষ্য।

মীমাংসাদর্শনের অতিজাগতিক নীতিতত্ত্বের সাথে জাগতিক নীতিতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোন্‌টি নৈতিক কর্ম, কোন্‌টি অনৈতিক কর্ম, কীরূপ কর্ম সমাজে কল্যাণ বহন করে ও কীরূপ কর্ম সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি নিয়ে আসতে পারে এ বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অর্থসংগ্রহ গ্রন্থের কিছু নির্ধারিত অংশ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেকরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন এর কর্তৃপক্ষ অর্থসংগ্রহ গ্রন্থ ভিত্তি করে পাঠ-উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য আমার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করে।

লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রণীত **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থের ধর্ম, বিধি, ভাবনা, অর্থবাদ ও নিষেধ এই পাচঁটি বিষয় দর্শনের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত। আমি সমগ্র পাঠ্যাংশ তিনটি ইউনিটে ও প্রতিটি ইউনিটে আবার কতকগুলি অনুচ্ছেদে ভাগ করে দূরশিক্ষার নির্ধারিত নীতির অনুসরণে পাঠ- উপকরণগুলি প্রণয়ন করেছি। দূর-শিক্ষার্থীরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমার প্রয়াস দ্বফল হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্‌রেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন এর কর্তৃপক্ষ পাঠ-উপকরণগুলি লেখার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছে। আমার স্নেহভাজন গবেষিকা ছাত্রী বর্তমান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের রীডার ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য অতি শ্রম দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সম্পদনা করেছে। আমি তার সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করি।

অমরনাথ ভট্টাচার্য

সম্পাদকের নিবেদন

দ্বিতীয় অর্ধ (পাশ্চাত্যনীতিবিদ্যা)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের নতুন স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে ২০০৩ - ২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হয়। নতুন পাঠ্যক্রমে যেহেতু নানা নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেহেতু নতুন পাঠ্যবিষয়গুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পাঠ্য বিষয়গুলিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এমনভাবে পরিবেশন করার কথা ভাবা হয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য কারোর সাহায্য ছাড়াই তা পড়ে বুঝতে পারেন। অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়গুলিকে বিভিন্ন ইউনিটের ক্রমপর্যায়ে ভাগ করে, কথোপকথনের ভঙ্গীতে সাজিয়ে, নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে কিভাবে তুলে ধরা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। এই প্রকল্পটি যাতে সফল হয় সেজন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিসট্যান্স এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেন।

এই পুস্তিকাটিতে দর্শনের দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অর্ধের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অর্ধের বিষয় হলো **পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা**। অধ্যাপক সন্তোষকুমার পাল আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা এবং অধি-নীতিবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও সমস্যা যুক্তিসহকারে ভাগ করে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন। এই তত্ত্বগুলির মধ্যে উপযোগবাদ, কর্তব্যবাদ, প্রকৃতিবাদ, স্বজ্ঞাবাদ, আবেগবাদ, পরামর্শবাদ, বর্ণনাবাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ফলিত নীতিবিদ্যার সমস্যাগুলি আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুনীল রায়। নানা উদাহরণের সাহায্যে এবং তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বস্তিমৃত্যু এবং পরিবেশ-নীতিবিদ্যার নানা জটিলতত্ত্বকেও তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেছেন। উভয় অধ্যাপক-ই তাঁদের লেখায় নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। এই পাঠগুলি যত্নসহকারে অধ্যয়ন করলে ছাত্র-ছাত্রীরা যে সবিশেষ উপকৃত হবেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগের সহকর্মীদের, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর অধিকর্তা ড. মোহন পাল ও সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষকে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব ড. ষোড়শীমোহন দাঁ মহাশয়কে — যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই কাজে সাফল্য লাভ করা যেতো না। ধন্যবাদ জানাই দর্শনের কোর্ ফ্যাকাল্টি শ্রী মলয় রায়কে যাঁর অক্লান্ত সহযোগিতার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

কোয়েলী চক্রবর্তী
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান : ২৬ জুন, ২০০৮

প্রথম অর্ধ

ভারতীয় নীতিবিদ্যা
ভগবদ্‌গীতা ও অর্থসংগ্রহ

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

অধ্যাপক সুনীল রায়
ড. সন্তোষ কুমার পাল
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

প্রথম অর্ধ– ভারতীয় নীতিবিদ্যা

ভগবদ্‌গীতা

বিষয়		পৃষ্ঠা
১	আত্মা ও দেহের ভেদ	৩-১৪
২	স্বধর্ম ও স্থিতপ্রজ্ঞ	১৫-২৬
৩	গীতায় কর্মযোগ	২৭-৩৬

অর্থসংগ্রহ

১	ধর্ম ও অধর্ম	৩৯-৫১
২	বিধি ও ভাবনা	৫২-৬৫
৩	বিধির বিভাগ, নিষেধ ও অর্থবাদ	৬৬-৮৩

দ্বিতীয় অর্ধ--২

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

ড. সন্তোষ কুমার পাল

একক ১.	□	আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা	৮৭-১০১
একক ২.	□	অবগতিমূলক নীতিতত্ত্ব : প্রকৃতিবাদ স্বজ্ঞাবাদ ও বর্ণনাবাদ	১০৩-১২০
একক ৩.	□	অনবগতিমূলক নীতিতত্ত্ব : আবেগবাদ ও পরামর্শবাদ	১২১-১৪৩

অধ্যাপক সুনীল রায়

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা (ফলিত)

একক ৪.	□	স্বস্তিমৃত্যু	১৪৭-১৬৭
একক ৫.	□	পরিবেশ-নীতিবিদ্যা	১৬৯-১৮৬

ভগবদ্‌গীতা

(নির্ধারিত অংশ)

প্রথম অর্ধ

পর্যায় গ্রন্থ – ১

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য্য
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

ইউনিট-১ ঃ আত্মা ও দেহের ভেদ

পাঠপরিকল্পনা

১.১ প্রাক্‌কথন

১.১.১ গীতা একটি উপনিষৎ

১.১.২ গীতার উদ্দেশ্য

১.১.৩ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের সঙ্গে গীতার সঙ্গতি

১.১.৪ গীতায় নীতিতত্ত্ব

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

১.৩ শোকের কারণ

১.৪ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক অনুচিত

১.৫ জীবন ও মৃত্যু

১.৬ আত্মার বিনাশ নেই

১.৭ আত্মা এক, বহু নয়

১.৮ আত্মা দ্রষ্টা, দৃশ্য নয়

১.৯ আত্মা নির্বিকার

১.১০ বিকারী আত্মা অশোচ্য

১.১১ সাধারণ মোহ ও তার উচ্ছেদের উপায়

১.১২ সারসংক্ষেপ

১.১৩ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.১৪ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রাক্‌কথন

১.১.১ গীতা একটি উপনিষৎ

ভগবদ্‌গীতা একটি উপাদেয় ধর্মগ্রন্থ। ইহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ইহা ৭০২ শ্লোকে লেখা। গ্রন্থটি বারবার পড়লে সহজেই তা কণ্ঠস্থ হয়। **শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতোপনিষৎ** হল এই গ্রন্থের শিরোনাম। **ভগবদ্‌গীতা** নামে এবং অতিসংক্ষেপে **গীতা** নামে ইহা প্রসিদ্ধ। মহাভারতে ভীষ্মপর্বের ২৩ নং অধ্যায় হতে

৪০ নং অধ্যায়ে **ভগবদ্‌গীতা** বিধৃত আছে। ইহা বহুকাল মহাভারতের অংশরূপেই পরিচিত ছিল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে ক্ষাত্রধর্মোচিত কর্তব্যে প্রবৃত্ত করবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন তাই 'ভগবদ্‌গীতা' নামে পরিচিত। গীতার ওপর অনেক প্রামাণিক ভাষ্য প্রণীত হয়েছে। আদি শঙ্করের **গীতাভাষ্য** প্রণয়নের পর ভারতীয় দার্শনিকগণ ও ক্রমে সকল মনীষীই গীতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। তখন থেকে **ভগবদ্‌গীতা** স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বিবেচিত ও অধীত হয়ে থাকে।

ভগবদ্‌গীতা কোনো রাজনীতির গ্রন্থ নয়, ইহা ধর্মীয় গ্রন্থ। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিলেও ইহা নিছক ধর্মোপদেশ নয়। গ্রন্থের শিরোনাম হতেই জানা যায় যে, ইহা একটি উপনিষৎ। 'শ্রীমতা ভগবতা গীতা উপনিষৎ' অর্থাৎ শ্রীমান্ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক গীতা অর্থাৎ উপদিষ্ট উপনিষৎ। উপ-নি-সদ্ ধাতুর সঙ্গে কিপ্ প্রত্যয় যোগ করে 'উপনিষৎ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'উপনিষৎ' শব্দের মুখ্য অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। শব্দটি গৌণভাবে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদক গ্রন্থকেও বোঝায়। সুতরাং যে বিদ্যার দ্বারা বা যে গ্রন্থ পাঠের ফলে পরমতত্ত্বের সান্নিধ্যে মুমুক্ষুগণের নিঃশেষে অজ্ঞাননিবৃত্তি বা নিশ্চিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে তাকে 'উপনিষৎ' বলে। এই অর্থে **ভগবদ্‌গীতা**-ও উপনিষৎ। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে বর্তমানে যে ১০৮ টি উপনিষৎ আমরা পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে **ভগবদ্‌গীতা**-র উল্লেখ নেই। বস্তুতঃ ইহা শ্রৌত উপনিষৎ নয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিলব্ধ উপনিষৎ। একে কেবলমাত্র উপনিষৎ বলাও সমীচীন হবে না। **ভগবদ্‌গীতা** হল সকল উপনিষদের সার। শংকরাচার্য গীতার উপক্রমণিকা ভাষ্যে বলেছেন -গীতাশাস্ত্র সকল বেদার্থের সারসংক্ষেপস্বরূপ (পৃ. ৯ দেব সাহিত্য কুটির, সং ১৩৫৮ সাল) ও ইহার অর্থ বিশেষ ভাবে জানলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় (পৃ ১৪ ঐ) । সকল উপনিষৎ হল গাভী, ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা, অর্জুন বৎস (অর্থাৎ বাছুর) এবং অমৃতকল্পগীতা দুগ্ধ (সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধী র্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। গীতা ধ্যান ৪)।

১.১.২ গীতার উদ্দেশ্য

ভগবদ্‌গীতা-র বৈশিষ্ট্য হল কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ । **ভগবদ্‌গীতা** ১৮ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই অধ্যায়গুলিকে তিনটি ষট্‌কে বিভক্ত করা চলে। প্রথম অধ্যায় হতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত প্রথম ষট্‌ক, সপ্তম অধ্যায় হতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত দ্বিতীয় ষট্‌ক, ত্রয়োদশ অধ্যায় হতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত তৃতীয় ষট্‌ক। প্রথম ষট্‌কে কর্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ ও তৃতীয় ষট্‌কে জ্ঞানযোগের কথা বলা হয়েছে। ইহা অদ্বৈতবেদান্তিগণের অভিমত। তবে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব আচার্যগণ এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন । অদ্বৈত মতে গীতাতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা হয় নি। এখানে কর্মের মাধ্যমে ভক্তিতে এবং ভক্তির মাধ্যমে জ্ঞানে উত্তরণের পথ প্রদর্শিত হয়েছে। মধুসূদন সরস্বতী গীতার ওপর যে **গূঢ়ার্থদীপিকা** টীকা লিখেছেন তা সযত্নে পড়লে দর্শন শাস্ত্রের এবং সাধন পথের অনেক বিষয় জানা যায়। তিনি নিষ্কাম কর্মকে মোক্ষের মূল বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে,

ভক্তি ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। মোক্ষের পর্বগুলি গীতাতে যে ধাপে ধাপে সাজানো আছে তা মধুসূদনের **গূঢ়ার্থদীপিকা** পড়লে জানা যায়।

১.১.৩ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের সঙ্গে গীতার সঙ্গতি

কোন কোন অদ্বৈতবেদান্তী বলেন, গীতার তিনটি ষট্‌কেই জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক মহাবাক্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জীব ও ব্রহ্মের একত্ববোধক বেদবাক্যকে মহাবাক্য বলে। যে সকল শ্রুতিবাক্যে জীব -জগতের স্বরূপ বা ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপিত হয়েছে তা মহাবাক্য নয়, অবান্তর বাক্য। সাধারণতঃ প্রতিটি বেদের অন্তগর্ত উপনিষৎ সমূহে এক একটি মহাবাক্য দেখানো হয়েছে। 'তত্ত্বমসি','অহং ব্রহ্মাস্মি', প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' এবং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' এই চারটি যথাক্রমে সামবেদ,যজুর্বেদ, ঋগ্‌বেদ ও অথর্ববেদের মহাবাক্য। এছাড়া 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' প্রভৃতি আরও কয়েকটি মহাবাক্য আছে। 'তত্ত্বমসি ' এই মহাবাক্যে 'তৎ' পদের অর্থ মায়াবচ্ছিন্নচৈতন্য, 'ত্বম্' পদের অর্থ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য এবং 'অসি' পদের অর্থ উহাদের সম্বন্ধ। এখানে 'তৎ' 'ত্বম্' ও 'অসি' পদের মুখ্যার্থ পরিহার করে ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। সকল মহাবাক্যই অখন্ডার্থের বোধক। এই অখন্ড অর্থের জ্ঞান হলেই মূল অজ্ঞান দূরীভূত হয়। কাজেই 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য মানুষকে পূর্ণ করে ইহাই গীতার বক্তব্য। 'ত্বম্' যখন 'তৎ' এর সঙ্গে একত্বপ্রাপ্ত হয় তখনই পূর্ণতা। **গীতা**য় দেখানো হয়েছে, জীব-বিন্দু কালগঙ্গা বক্ষে কতবার ভাসে, কতবার ভাঙ্গে। কিন্তু বিন্দু যতদিন সিন্ধুতে মিশে সিন্ধু না হয় ততদিন তার ভাঙ্গাগড়ার বিরাম থাকে না । তুমি কখনই নিস্তার পাবে না,যতদিন না 'তুমি' 'সেই' এর সাথে পূর্ণ হয়ে না যাও। গীতাগ্রন্থ 'ত্বম্' কে 'তৎ' এ মেশানোর কৌশল ধরিয়ে দিচ্ছে। **গীতা**র প্রথম ষট্‌কে 'ত্বম্' পদের শোধনের কথা এবং দ্বিতীয় ষট্‌কে 'তৎ' পদের শোধন পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। তৃতীয় ষট্‌কে উভয়ের একত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

১.১.৪ গীতায় নীতিতত্ত্ব ঃ

গীতাতে নীতিবিদ্যাকে অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের প্রথম ধাপ বলা হয়েছে। এখানে সামাজিক নীতিতত্ত্ব এবং বৈয়ক্তিক নীতিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। সমাজ ও ব্যক্তির শৃঙ্খলা বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই হতে পারে। এছাড়া গীতায় সাধারণধর্মের উপদেশও দেওয়া হয়েছে। অহিংসা , সত্য অক্রোধ, প্রিয়বাক্য ,দয়া, প্রেম স্বার্থত্যাগ, পরনিন্দাত্যাগ প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম আচরণের নির্দেশ এখানে আছে। সমাজের কল্যাণের জন্য লোকস্থিতি অর্থাৎ সামাজিক নিয়ম, লোকসিদ্ধি অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি রক্ষা, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ সামাজিক সমতা, লোককল্যাণ অর্থাৎ সমাজকল্যাণ এবং লোকযাত্রা অর্থাৎ সামাজিক উন্নতির ওপর **গীতা** বিশেষ জোর দিয়েছে। এককথায় **গীতা**র নীতিতত্ত্ব বলতে নিষ্কাম কর্ম ও স্বধর্মের অনুষ্ঠানকে বোঝায়। নিষ্কাম কর্মের আদর্শই গীতার নীতিতত্ত্বের মূলকথা।

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গনে অর্জুন শোকাহত। তার শোক দূর করার জন্য ও ক্ষত্রোচিত কর্তব্য হতে নিবৃত্ত না হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ **গীতা**র দ্বিতীয় অধ্যায় হতে অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১১নং শ্লোক হতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুরু হয়েছে। এই অধ্যায়কে অবলম্বন করেই পাঠটি রচিত।

১.৩ শোকের কারণ

শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে অর্জুন মোহগ্রস্ত বলে শোকাহত। মোহ দুপ্রকার — সাধারণ ও অসাধারণ। সাধারণ মোহ সকল জীবের মধ্যেই আছে। স্বপ্রকাশ চৈতন্যই আত্মা। স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর এই তিনটি তার উপাধি। যা অপরিচ্ছন্ন বস্তুকে পরিচ্ছন্ন করে তাকে উপাধি বলে। যেমন আকাশ এক হলেও ঘট, পট, শ্রোত্র, গৃহ প্রভৃতি ভেদে ঘটাকাশ পটাকাশ, শ্রোত্রাকাশ, গৃহাকাশ ইত্যাদি ভেদ ব্যবহার হয়। এজন্য ঘট, পট ইত্যাদিকে মহাকাশের উপাধি বলা হয়। সেরূপ একই শুদ্ধচৈতন্যকে আমরা প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন রূপে কল্পনা করে থাকি। স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর কারণশরীর চৈতন্যস্বরূপ আত্মায় ভেদ সৃষ্টি করে। ইহা এক প্রকার মোহ বা ভ্রম। এই মোহের ফলে মিথ্যা কল্পিত এই সংসার সত্য বলে মনে হয়। ইহা সাধারণ মোহ। এই সাধারণ মোহ ছাড়াও অর্জুনের মধ্যে আর এক প্রকার মোহ লক্ষ্য করা যায়। যুদ্ধ করা হল ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। অর্জুন একজন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ করা তার স্বধর্ম। আর কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ তা ধর্মযুদ্ধ। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কাছে যুদ্ধের পরিবর্তে পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে তা দিতে অসম্মত হন। তাই এই যুদ্ধ হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ। এজন্য একে ধর্মযুদ্ধ বলে। যুদ্ধে হিংসা করতে হয় ভেবে ধর্মযুদ্ধকেও অর্জুন অধর্ম বলে ভেবেছেন। যুদ্ধরূপ ধর্মকে অধর্ম বলে বোঝা সাধারণ মোহ। শুদ্ধ আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান হলে প্রথমপ্রকার মোহ দূর হয়। আর যুদ্ধে হিংসা থাকলেও তা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম বলে তাতে অধর্ম হয় না। যোদ্ধার এরূপ জ্ঞান দ্বিতীয় মোহের নির্বতক।

১.৪ জীবিত ও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক অনুচিত

(মূল) অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।

গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পন্ডিতাঃ।। গীতা ২।১১

(অনু) যাঁদের জন্য শোক করা অনুচিৎ তাঁদের জন্য তুমি শোক করছ; আবার প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ। পন্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কারও জন্য শোক করেন না।

(মূল) ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।

ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্।। গীতা ২।১২

(অনু) আমি কখনও ছিলাম না -এমন নয়, একথা একথাও সত্যি নয় যে, তুমি কখনও ছিলে না, আর এই সব নৃপতিগণ ও ছিলেন না তাও নয়, দেহত্যাগের পর আমরা কেউ থাকব না -তাও নয়।

(মূল) নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।। গীতা ২।১৬

(অনু) অসৎ বস্তুর সত্তা নেই ও সৎবস্তুর অসত্তা নেই। তত্ত্বদর্শিগণ এভাবে সৎ ও অসৎ উভয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি জীবিত, কি মৃত কারও জন্যই শোক করেন না। কারণ সকলের প্রাণ বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। যারা মারা গেছে এবং যারা বেঁচে আছে- এরা শরীর ও শরীরী উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। স্থূল শরীর অতীতে ছিল না, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে থাকবে না। সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর অতীতে ছিল না, বর্তমানে থাকে, মৃত্যুর পর থাকলেও সুদূর ভবিষ্যতে থাকবে না। কিন্তু শরীরী অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। শরীরের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব দুইই আছে। কিন্তু শরীরী আত্মার কোনটিই নেই। এজন্য শরীরী ও শরীর এক নয়। যা সৎ বস্তু তার কখনও অভাব হতে পারে না এবং যা অসৎ বস্তু তা আছে বলা যাবে না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, সৎ বস্তু তিন রকম - পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক। যা প্রতীতির সময় বাধিত হয় না, অথচ সংসার দশাতেই বাধিত হয় তা প্রাতিভাসিক, যেমন ভ্রমীয় বস্তু। আবার যা ব্যবহার দশায় অবাধিত থাকলেও পারমার্থিক দশায় বাধিত হয়, তাকে ব্যবহারিক সৎবস্তু বলে এবং যা কখনও বাধিত হয় না, তা পারমার্থিক সৎ বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সৎ বস্তু বলতে পারমার্থিক সৎ বস্তু ও অসৎ বস্তু বলতে ব্যাবহারিক সৎ বস্তু ও প্রাতিভাসিক সৎ বস্তুকে বুঝিয়েছেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জাগতিক বস্তু আছে এরূপ বোঝা ভুল। তাই সেগুলির জন্য শোক করাও অনুচিত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সৎ ও অসৎ এই উভয়ের স্বরূপ জানেন, তাই তিনি কি জীবিত, কি মৃত কোন মানুষের জন্যই শোক করেন না।

১.৫ জীবন ও মৃত্যু

(মূল) দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।

তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।। গীতা ২।১৩

(অনু) যেমন দেহীর (জীবের) এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা উপস্থিত হয় , তেমন (জীবের) দেহান্তর লাভ ও জয় হয়। এতে জ্ঞানিগণ মোহগ্রস্ত হন না।

জীবন ও মৃত্যু দুটিই শরীরের ধর্ম। শরীর বিকারশীল। জন্ম, সত্তা, বৃদ্ধি বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ছটি শরীরের বিকার, শরীরীর নয়। শরীরী (আত্মা) সমস্ত অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে, পরিবর্তন হয় শরীরের। বাল্যকালে যে দেহ থাকে বার্ধক্যে সে দেহ থাকে না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেহে একই আত্মা অবস্থান করেন। দেহকে আত্মা বললে যে আমি বাল্যকালে পিতামাতাকে অনুভব করেছিলাম, সেই আমি এখন বার্ধ্যক্যে নাতি প্রনাতিকে দেখছি — এরূপ আমিত্বের প্রত্যভিজ্ঞা ব্যাহত হবে। স্বপ্নে বা যোগৈশ্বর্যে ভিন্ন ভিন্ন দেহেও একই আমিত্বের জ্ঞান হয়। কাজেই জীবন মানে আত্মার কোন দেহ পরিগ্রহ করা আর মৃত্যু হল ঐ দেহ পরিহার করা।

১.৬ আত্মার বিনাশ নেই

(মূল) অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।

বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমহর্তি।। গীতা ২।১৭

(অনু) যিনি এই সমগ্র জগৎ (সাক্ষীরূপে) পরিব্যাপ্ত করে আছেন,তাঁকেই অবিনাশী আত্মা বলে জানবে। কেউই এই অধ্যায় আত্মার বিনাশ করতে পারে না।

(মূল) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা না ভূয়ঃ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।। গীতা ২।২০

(অনু) এই আত্মা কখনও জাত বা মৃত হন না। এই আত্মা (পূর্বে) উৎপন্ন না হয়ে আবার উৎপন্ন হন না। ইনি জন্মরহিত, নিত্য (সর্বদা একরূপ), শ্বাশতক্ষয়রহিত। পুরাণ (পুরাতন থেকেও নতুন, দেহ বিনষ্ট হলেও হত হন না।

(মূল) বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।

কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্।। গীতা ২।২১

(অনু) হে পার্থ, যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে জানেন, সেই ব্যক্তি কিরূপে কাকেই বা হত্যা করান এবং কাকেই বা হত্যা করেন?

আত্মা বা ব্রহ্ম সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। দেহাদি অনিত্য বস্তু এই আত্মাকেই আশ্রয় করে

রয়েছে। এগুলি বিনাশশীল, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অব্যয়। যার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না, তাকেই অব্যয় বলে। 'আত্মা অবিনাশী, যেহেতু তার নাশক নেই, যারা যারা বিনাশী তাদের সকলের নাশক আছে, যেমন ঘট,পট ইত্যাদি' — এরূপ ব্যতিরেকী অনুমানের দ্বারা আত্মার অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হয়। দেহের নাশে দেহী বা আত্মার নাশ হয় না। দেহের নাশের আর একটি কারণ দেহের জন্ম আছে; যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে, আত্মার উৎপত্তি নেই বলে বিনাশের প্রসঙ্গ হয় না। পূর্বে না থেকে পরে থাকাকে জন্ম ও পূর্বে থেকে পরে না থাকাকে মৃত্যু বলে। আত্মাতে এই দুই অবস্থার কোনটিই নেই। এজন্য **গীতায়** শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে অবিনাশী বলেছেন। যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী বলেছেন। যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ ও অব্যয় বলে জানেন, তিনি কাউকে হত্যা করতে পারেন না বা হত্যা করাতেও পারেন না।

১.৭ আত্মা এক, বহু নয়

(মূল) মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।। গীতা ২।১৪

(অনু) হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রদান করে। এরা উৎপত্তি বিনাশশীল, অতএব অনিত্য। হে ভারত (অর্জুন) এগুলোকে সহ্য কর।

আত্মা 'এক' কারণ উহা বিভু। আত্মা মধ্যমপরিমাণ বা অনুপরিমাণ নহেন। মধ্যমপরিমাণ হলে তাকে সাবয়ব হতে হয়। আর সাবয়ব বস্তু মাত্রই বিনাশশীল। কাজেই আত্মাকে বিভু বলতে হয়। বিভু বলে তিনি এক। কারণ, এক বিভু আত্মা দ্বারা যখন সকল শরীরের চেষ্টা উপপন্ন হয় তখন বহু আত্মা স্বীকার করা নিরর্থক। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন সুখ, দুঃখ অনুভব করে। আত্মা এক হলে সকলেই একই সুখ ,দুঃখ অনুভব করত। এরূপ শঙ্কা অমূলক। কারণ সুখ-দুঃখ আত্মার গুণ নয়। আত্মা 'নির্গুণ'। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়। সুখ-দুঃখের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। এরূপ অনিত্য গুণ নিত্য আত্মায় থাকতে পারে না। সুখ ও দুঃখ দৃশ্য বলে দ্রষ্টা আত্মার ধর্ম কখনও হতে পারে না। কারণ দৃশ্যত্ব আর দ্রষ্টৃত্ব দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম একই অধিকরণে থাকতে পারে না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুখ, দুঃখ ভিন্ন হলেও তার দ্বারা আত্মার একত্ব হানি হয় না। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হল — দুঃখ অনিত্য। ভীষ্ম, দ্রোণাদির সাথে সংলাপ ও বিয়োগের ফলে যে সুখ, দুঃখের কথা অর্জুন ভাবছেন ঐ অনিত্য পদার্থের জন্য শোক করা উচিত নয়।

১.৮ আত্মা দ্রষ্টা, দৃশ্য নয়

(মূল) অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।

অনাশিনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ।। গীতা ২।১৮

(অনু) অবিকারী অবিনাশী, প্রমাণের অবিষয় আত্মার এই সব দেহ নাশশীল (ইহা তত্ত্বদর্শী কর্তৃক) কথিত।

দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান এই তিনটি ভেদ লোকে অনুভব করে। একটি থাকলে অপর দুটি থাকবে। দৃশ্য ছাড়া যেমন দ্রষ্টা ও দর্শন হয় না, তেমনি দ্রষ্টা ছাড়াও দৃশ্য বস্তুর জ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু দ্রষ্টা ও দৃশ্য সব সময় ভিন্ন হবে। দ্রষ্টা চেতন আত্মা, অন্তঃকরণ প্রভৃতি অনিত্য বস্তুই দৃশ্য। অন্তঃকরণ জড়, আত্মা জড় হতে ভিন্ন — চিৎস্বরূপ। অন্তঃকরণের বৃত্তি জড় হওয়ায় অপ্রকাশ। জড় বুদ্ধিবৃত্তি কখনও বিষয়কে প্রকাশ করতে পারে না। সুতরাং বিষয় প্রকাশের জন্য বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব স্বীকার করতে হয়। এই প্রতিবিম্বকেই 'চিদাভাস' বলে। জল কাঁপলে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য কম্পিত হয়। প্রতিবিম্ব সূর্যের কম্পনের ফলে বিম্ব সূর্য কম্পিত হচ্ছে বলে মনে হয়। বস্তুতঃ ইহা বিম্ব সূর্য ও প্রতিবিম্ব সূর্যের মধ্যে তাদাত্ম্যবোধের জন্য হয়ে থাকে। সেইরূপ চিৎ ও চিদাভাসের মধ্যে তাদাত্ম্য স্বীকার করতে হয়। নচেৎ জড় চিদাভাসের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ অসম্ভব হবে। স্বপ্রকাশ আত্মা বুদ্ধিরূপ উপাধির সাথে যুক্ত হয়ে বদ্ধ বলে প্রতীত হন। উপাধির নাশে তিনি স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করেন। বস্তুতঃ আত্মার বন্ধন ও মুক্তি কিছুই নেই। আত্মা সর্বদাই দ্রষ্টা। জ্ঞানের যে উৎপত্তি-বিনাশ দেখা যায় তা বস্তুতঃ ঐ জ্ঞানের বিষয়গুলিরই উৎপত্তি ও বিনাশ। বিষয়ের উৎপত্তি ও বিনাশ মানলেই যখন বিষয়জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় তখন শুদ্ধ চৈতন্য বা আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করা নিরর্থক গৌরব কল্পনা। কাজেই অন্তঃকরণ প্রভৃতি জড়বস্তু মাত্রই দৃশ্য, আর চিৎস্বরূপ আত্মাই একমাত্র দ্রষ্টা ইহা স্বীকার করতে হবে।

১.৯ আত্মা নির্বিকার

(মূল) অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি।। গীতা ২।২৫

(অনু) ইনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অনুমেয় নন, ইনি অবিকারী ইহা (বেদে) কথিত হয়। অতএব একে এভাবে জেনে তোমার শোক করা উচিত নয়।

(মূল) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়

নবানি গৃহ্ণাতি নরোহপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-

ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। গীতা ২।২২

(অনু) মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্রগুলি ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীরগুলি পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়।

(মূল) নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। গীতা ২।২৩

(অনু) একে (আত্মাকে) শাস্ত্র ছেদন করে না, অগ্নি একে ভস্ম করে না, জল একে আর্দ্র করে না ও বায়ু একে শুষ্ক করে না।

(মূল) অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। গীতা ২। ২৪

(অনু) এই আত্মা ছেদনের যোগ্য নয়, ইহা দগ্ধ করার যোগ্য নয়, ইহা আর্দ্র হবার যোগ্য নয় এবং ইহা শুষ্ক হবার যোগ্য নয়। ইহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থিতিশীল, ক্রিয়ারহিত ও আদিকাল থেকে বিদ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, দেহের বিকারকেই লোকে আত্মার বিকার বলে বোঝে। উৎপত্তি, হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপরিণাম ও বিনাশ দেহেরই হয়, আত্মার নয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। জাগতিক কোন কারণ তাকে স্পর্শ করতে পারেনা। অস্ত্রশস্ত্র দেহকে ছিন্ন করতে পারে। আগুন দেহকেই দগ্ধ করে। জল দেহকেই দ্রবীভূত করে। বায়ুও দেহকেই শোষণ করে, কিন্তু ইহারা আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না। আত্মা অবিকারী। ইহার অবয়ব নেই, ইহা অনাদি, ইহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, ইহা মনেরও অগোচর। অবিকারী আত্মার বিনাশ হতে পারে না। এজন্য তাকে বদ্ধ বলা যায় না। অপরিণামী আত্মার কোন ঘাতকও থাকতে পারে না। কাজেই আত্মা হত হয়েছে বা বধ করেছে এরূপ বলা অসঙ্গত। একথা স্মরণ করিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, যে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির মৃত্যু পরিতাপের বিষয় নয়, যেহেতু তাদের দেহেরই অবসান ঘটবে, অবিকারী আত্মার নয়। কারণ মানুষ যেমন জীর্ণ পরিধেয় পরিহার করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনি দেহ যখন জরা, বার্ধক্য প্রভৃতির ফলে জীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন আত্মা ঐ দেহ পরিহার করে একটি নতুন দেহ ধারণ করে মাত্র। সুতরাং জরা-বার্ধক্যের ফলে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতির দেহও জীর্ণ হয়ে পড়েছে , তাই তাদের বিনাশ কখনও পরিতাপের বিষয় নয়।

১.১০ বিকারী আত্মা অশোচ্য

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আত্মা অবিকারী অর্থাৎ এর কোন বিকার নেই। অর্জুন যদি আত্মাকে বিকারী বলেও বোঝেন তবু যা অদৃষ্ট অনুসারে ঘটবেই ঘটবে কিংবা যাকে পরিহার করার কোন উপায় নেই অর্থাৎ যা হবেই হবে কিংবা যে বিষয়টি মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ঐ সব বিষয়ে শোক করা অনুচিত। এখন যদি আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ থাকে এবং প্রত্যেক শরীরের উৎপত্তির সাথে সাথে আত্মা উৎপন্ন হয়, তাহলে ঐ সব শরীরের বিনাশের সাথে সাথে উহাও বিনাশপ্রাপ্ত হবে এরূপ মানলেও অর্জুনের আত্মীয় বিয়োগে শোক করা উচিত নয়। কারণ যার উৎপত্তি হয়েছে তার বিনাশও হবে— এটি অপরিহার্য নিয়ম। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি যদি স্বীকার করা হয় তবে তার বিনাশও স্বীকার করতে হবে। এর ফলে আত্মাকে অবিনাশী না বলে বিনাশী বলতে হয়। নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী ফলভোগের জন্য আত্মার পুনর্জন্মও আবার মানতে হয়। কাজেই যারা আত্মাকে বিকারী বলেন, তাদের মতে আত্মার ঐ বিকারশীল ধর্ম ইহার

জন্ম-মৃত্যু বা উৎপত্তি বিনাশের মধ্যেই ধরা পড়বে। আত্মার বিনাশ বা অবসান যদি জন্ম -মৃত্যু আবর্তের মধ্যেই ঘোরে তাহলেও আত্মার বিনাশ বিচারশীল ব্যক্তির কাছে কোনমতেই শোকের বিষয় হবে না।

১.১১ সাধারণ মোহ ও তার উচ্ছেদের উপায়

আত্মাই একমাত্র নিত্যবস্তু। ঐ নিত্য আত্মায় মিথ্যা অজ্ঞানের ফলে দেহের একত্বাধ্যাস হয়। এজন্য সকলেই দেহকে আত্মা বলে ভুল করে। একে সাধারণ মোহ বলে। অর্জুন যেহেতু একজন মানুষ সেজন্য তিনিও ঐ সাধারণ মোহের কবলে। সাধারণ মোহের জন্যই আত্মীয় বিয়োগের আশঙ্কায় তিনি শোকান্বিত। যেহেতু আত্মার প্রকৃত স্বরূপ না জানার জন্য এই সাধারণ মোহ ও তার ফলে শোক দেখা দেয়, সেহেতু আত্মাকে যতদিন জানতে না পারা যায় ততদিন শোক যায় না। কিন্তু আত্মতত্ত্ব সহজে আয়ত্ত করা যায় না। আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করলেও তা বোধগম্য হয় না। এই তত্ত্ব বরং অনেক সময় আশ্চর্যজনক বলেও মনে হয়। এই তত্ত্ব এত দুরূহ যে যিনি একে জানেন তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারেনা। আবার এই তত্ত্ব এমনই অভিনব যে যিনি আত্মাকে দর্শন করেন তিনি অভিভূত হন।

১.১২ সারসংক্ষেপ

কুরুক্ষেত্রে রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন অর্জুনের মোহ নিবারণের জন্য। **গীতা**র দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোক থেকে ৩০ নং শ্লোক পর্যন্ত এই আত্মতত্ত্ব বিবৃত হয়েছে। অর্জুনের মোহের মূল কারণ হল আত্মতত্ত্ব না জানা। তাই আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হলে শোক নিবৃত্ত হবে। বর্তমান এককে আলোচিত হয়েছে আত্মা নিত্য, শরীর অনিত্য; আত্মা সৎ, শরীর অসৎ; আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনশী। আত্মা অপরিবর্তনীয়, শরীর পরিবর্তনশীল। বাল্যকাল, যৌবন ও বার্ধক্যে শরীরের পরিবর্তন ঘটলেও শরীরী অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মা অপরিবর্তিত থাকে। তাই বার্ধক্যে আত্মা বাল্যের কথা স্মরণ করে। আত্মা নিত্য -তার উৎপত্তি বা বিনাশ নেই। মৃত্যু বলতে বোঝায় আত্মার দেহান্তরপ্রাপ্তি। কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য আত্মা নতুন নতুন দেহ ধারণ করে।

১.১৩ প্রধান শব্দগুচ্ছ

দেহ - দিহ্ ধাতুর সাথে ঘঞ্ প্রত্যয় যোগ করে 'দেহ' শব্দটি নিষ্পন্ন। এটি উপচিত ও অপচিত হয় অর্থাৎ বাড়ে ও কমে। এজন্য এর অপর নাম 'শরীর'। প্রতিক্ষণে নাশপ্রাপ্ত হয় বলে একে শরীর বলা হয়। সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে শরীর দুপ্রকার। প্রত্যেকটি আবার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ ভেদে তিনপ্রকার।

দেহী - আত্মাকে 'দেহী' বলে। আত্মা স্বরূপত নিঃসঙ্গ, নির্বিকার অপরিচ্ছন্ন, অসীম। ভ্রমবশতঃ দেহের সাথে তার সম্বন্ধ হয় বলে তাকে শরীরবান বলা হয়। এজন্য দেহীকে শরীরী বলে। দেহী প্রাণময়, মনোময়,

বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কল্পিত কোষের অধিষ্ঠান।

উপনিষৎ - উপ-নি-সদ্ ধাতুর সাথে ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগ করে 'উপনিষদ্' শব্দটি নিষ্পন্ন। এর মুখ্য অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা, আর গৌণ অর্থ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা বা এই গ্রন্থ পাঠের ফলে পরম তত্ত্বের সান্নিধ্যে মুমুক্ষুর নিঃসংশয়ে অজ্ঞান দূরীভূত হয় বলে একে উপনিষৎ বলে।

সাধারণ মোহ -চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু। তাতে অজ্ঞানের ফলে এই বিশ্বসংসার কল্পিত। দেহ, মন, নাম, রূপ প্রভৃতি মিথ্যা হলেও সত্য বলে বদ্ধজীবের কাছে মনে হয়। একেই 'সাধারণ মোহ' বলে। এটি সব জীবের মধ্যেই আছে। শুদ্ধ আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান হলে এই সাধারণ মোহ দূর হয়।

অসাধারণ মোহ - যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। যুদ্ধে হিংসা থাকে বলে ধর্মযুদ্ধ অর্জুনের কাছে অধর্ম বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধরূপ ক্ষাত্রধর্মে অধর্মবোধই অসাধারণ মোহ। যুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্ম একথা বুঝলে অর্জুনের অসাধারণ মোহ দূর হবে এটি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।

১.১৪ নমুনা - প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Explain, after the *Bhagavadgîtâ*, the nature of *âtman*.
2. Why does Lord Kṛṣṇa advise Arjuna not to lament?

Short Type

1. How does the *Bhagavadgîtâ* distinguish between *âtman* and *deha*?
2. Why is the *Bhagavadgîtopaniṣat* so named?

১.১৫ গ্রন্থপঞ্জী

The Bhagavadgîtâ, trans. S Radhakrishnan, Blackie & Son (India)Ltd, calcutta, 1974.

Universal Message of the Bhagavad Gita, ed Swami Ranganathananda, Vol-I, Advaita Ashram, Calcutta, 2001.

শ্রীগীতা, রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত, প্রথম ষট্‌ক, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯১

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৯৯২।

ইউনিট - ২ ঃ স্বধর্ম ও স্থিতপ্রজ্ঞ

পাঠপরিকল্পনা

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

২.২ স্বধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম ও ধর্ম্যযুদ্ধ

২.২.১ ধর্মের প্রকারভেদ

২.২.২ স্বধর্মের স্বরূপ ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রের স্বধর্ম

২.২.৩ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম

২.২.৪ গীতোক্ত ধর্ম্যযুদ্ধ

২.২.৫ ধর্ম্যযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কাম্যকর্ম নয়

২.৩ স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ ও ব্যবহার

২.৩.১ স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয়

২.৩.২ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

২.৩.৩ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্য

২.৩.৪ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের আচার-ব্যবহার

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৬ নমুনা-প্রশ্নাবলী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

যুদ্ধ হতে পরাঙ্মুখ অর্জুন অসাধারণ মোহগ্রস্ত। ধর্মযুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্ম-একথা অর্জুনকে বোঝানোর জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যযোগে স্বধর্ম ও বিশেষ করে ক্ষাত্রধর্মের বিবরণ দিয়েছেন। এই পাঠে তা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। বুদ্ধিযোগই স্বধর্ম অনুষ্ঠানে প্রেরণা দেয়। সমত্বকেই বুদ্ধিযুক্ত অবস্থা বলে। এরূপ নিষ্কাম যোগীকে **গীতায়** স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির স্বরূপ,তার প্রকার ভেদ, আচার-ব্যবহার ও অবস্থান বিশ্লেষণ করা এই পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২.২ স্বধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম ও ধর্ম্যযুদ্ধ

২.২.১ ধর্মের প্রকারভেদ

শ্রৌত ও স্মার্তভেদে সাধারণতঃ ধর্ম দুপ্রকার। বেদে উপদিষ্ট বা বিহিত দর্শপূর্ণমাস, সোমযাগ প্রভৃতিকে শ্রৌত ধর্ম বলে। বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে আচার, যম, নিয়ম প্রভৃতিকে স্মার্তধর্ম বলে। **মহাভারত**-এর শান্তিপর্বে শিষ্টাচারকে তৃতীয় ধর্মরূপে স্বীকার করা হয়েছে। তবে ব্যাপক অর্থে বর্ণধর্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম, গুণধর্ম, নৈমিত্তিক ধর্ম ও সাধারণ ধর্ম ভেদে ধর্ম পাঁচ প্রকার। একমাত্র বর্ণত্বকে অবলম্বন করে যে ধর্ম প্রবৃত্ত হয় তাকে 'বর্ণধর্ম' বলে। যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের উপনয়ন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি আশ্রম অবস্থায় অনুষ্ঠেয় কর্মকে 'আশ্রমধর্ম' বলা হয়। যে ধর্ম বর্ণত্ব ও আশ্রমত্ব উভয়কে নিয়ে প্রবৃত্ত হয় তাকে 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম বলে। যেমন উপনীত ব্রাহ্মন প্রভৃতি বালকের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের দ্বারা নির্মিত মেখলা ধারণ। উপনীত ত্রৈবর্ণিকের মেখলা ধারণ অবশ্য করণীয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য —এই ত্রিবিধ জাতির উপনয়নে অধিকার। এই তিনটি বর্ণের প্রত্যেকের জন্য বিশেষ দ্রব্য দিয়ে মেখলা করার উপদেশ আছে। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে মুঞ্জ নির্মিত মেখলা ধারণ কর্তব্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মেখলা ঐ মুঞ্জ নির্মিত হবে না। এই মুঞ্জ মেখলা ধারণ বিশেষ বর্ণের বিশেষ আশ্রমের অনুষ্ঠেয় কর্ম। গুণ অনুযায়ী যে ধর্ম অনুষ্টেয় তাকে 'গুণধর্ম' বলে। যেমন ক্ষত্রিয়ের প্রজাপালন। একমাত্র নিমিত্ত অবলম্বন করে যে ধর্ম প্রবৃত্ত হয় তাকে 'নৈমিত্তিক ধর্ম' বলে। যেমন প্রায়শ্চিত্তের বিধান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যপুরাণে বর্ণধর্ম এবং গুণধর্মের এরূপ ভেদ স্বীকার করা হলেও **গীতায়** উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ দেখান হয় নি। এখানে 'স্বধর্ম' বলতে 'বর্ণধর্ম' ও 'গুণধর্ম'ই বিবক্ষিত। অহিংসা, দয়া, করুণা প্রভৃতি মানবিকগুলিকে সাধারণ ধর্ম বলা হয়। **গীতা**-তে স্থলবিশেষে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ থাকলেও বর্ণধর্মের পালনই গীতার উপদেশ।

২.২.২ স্বধর্মের স্বরূপ ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্রের স্বধর্ম

(মূল) শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিকং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্। গীতা ১৮।৪২

(অনু) মনের সংযম, বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই নয়টি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ ধর্ম।

(মূল) কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।

পরিচর্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্।। গীতা ১৮।৪৪

(অনু) কৃষিকর্ম গবাদি পশুপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবিক কর্ম। সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম।

প্রত্যেকটি বর্ণের যে বিশেষ বিশেষ কর্ম তাকে 'স্বধর্ম' বলে। প্রত্যেকটি মানুষ সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। সত্ত্বগুণের ধর্ম লঘুতা ও প্রকাশ, রজোগুণের ধর্ম কার্যকারিতা ও প্রবৃত্তি এবং তমোগুণের ধর্ম গুরুতা ও আবরণ। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ থাকলেও কারও কারও মধ্যে স্বত্ত্বগুণ বেশী, কারও মধ্যে রজোগুণ বেশী, আবার কারও কারও মধ্যে তমোগুণ বেশী। যে মানব প্রকৃতিতে

সত্ত্বগুণ বেশী থাকে তা ব্রাহ্মণ প্রকৃতি। আবার কোন মানব প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণ অপ্রধানভাবে থাকলে এবং রজোগুণ প্রধানভাবে থাকলে সেই মানব প্রকৃতির নাম ক্ষত্রিয়। রজঃ প্রধান ভাবে ও তমঃ অপ্রধানভাবে থাকলে সেই মানব প্রকৃতির নাম বৈশ্য প্রকৃতি। রজঃ অপ্রধানভাবে এবং তমঃ প্রধানভাবে থাকলে সেই মানব প্রকৃতির নাম শূদ্র প্রকৃতি। কোন বিশেষ প্রকৃতি বিশিষ্টি লোককে এক একটি বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ব্রাহ্মণ প্রকৃতির সকল ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং ক্ষত্রিয় প্রকৃতির সকল ব্যক্তিকে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্য প্রকৃতির সকল ব্যক্তিকে বৈশ্যবর্ণ ও শূদ্র প্রকৃতির সকল ব্যক্তিকে শূদ্রবর্ণ বলা হয়। মানুষের কর্ম তার প্রকৃতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। কর্ম যদি প্রকৃতির অনুকূল হয় তবে তা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে হিতকর। মানুষের প্রকৃতি ও তদনুযায়ী যে কর্ম তাকে 'স্বধর্ম' বলে। তবে মানুষ যে সব কর্ম করে থাকে তার অন্তরালে যে সব মানসিক ভাব, ধর্ম বা অবস্থা কাজ করে সেগুলিকেও কর্ম বলা হয়। এগুলি কর্মের মূল। এই সব ভাব, ধর্ম, অবস্থা কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাহ্যিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রাহ্মণের স্বধর্ম হল পঠন, পাঠন,যজন, যাজন দান ও প্রতিগ্রহ। একজন ব্রাহ্মণের এই সকল স্বধর্ম পালনের পশ্চাতে যে সমস্ত মানসিকভাব কাজ করে সেগুলি হল শম, দম, তপস্যা, ক্ষমা, সরলতা শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞান, শাস্ত্রার্থের অনুভব, সাত্ত্বিকা শ্রদ্ধা প্রভৃতি। সত্ত্বগুণ হতেই ব্রাহ্মণের স্বভাবজ গুণ উৎপন্ন হয়। কৃষি, গো-পালন এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান হতেই বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম উৎপন্ন হয়। পরিচর্চা বা সেবা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম। রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধান হতেই শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম উৎপন্ন হয়।

২.২.৩ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম

(মূল) শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্।। গীতা ১৮। ৪৩

(অনু) পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা , যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান , প্রভুত্ব প্রকাশ করার শক্তি এগুলি ক্ষত্রিয়বর্ণের স্বাভাবিক ধর্ম।

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হল অধ্যয়ন, যজন, দান ও প্রতিরক্ষা। একজন ক্ষত্রিয়ের প্রতিরক্ষা ইত্যাদি স্বধর্ম পালনের পিছনে যে সমস্ত মানসিক ভাব কাজ করে সেগুলি হল শৌর্য, তেজ, ধৃতি ,দাক্ষ্য , যুদ্ধে অপলায়ন প্রবৃত্তি, দান করা, প্রভৃত্বশালী ইত্যাদি। সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণপ্রধান হতে ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কর্ম উৎপন্ন হয়। 'শৌয' কথার অর্থ প্রবল পরাক্রম। বলশালী ব্যক্তিকেও পরাস্ত করার প্রকৃতির নাম শৌর্য। তেজ শব্দের অর্থ অপ্রগল্ভতা অর্থাৎ অন্যে যাতে পরাস্ত করতে না পারে বা প্রতিপক্ষের কাছে সহজে বশ্যতা স্বীকার না করা। ক্ষত্রিয়ের অন্য স্বাভাবিক কর্ম হল ধৃতি অর্থাৎ মহাবিপদেও অবসন্ন না হওয়া। দাক্ষ্য হল দক্ষতা; হঠাৎ উপস্থিত কোন বিষয়ে কিংকর্তব্য বিমূঢ় না হয়ে প্রবৃত্তি। এই সকল স্বাভাবিক কর্ম ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অবশ্য-করণীয়, যা না থাকলে ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় বলা যাবে না। অন্য লোক হতে ক্ষত্রিয়ের যে বিশেষত্ব তাই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। যে ক্ষত্রিয় স্বধর্মে থাকে সেই স্বভাবজ কর্ম করে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছেন। স্বভাবপ্রেরিত কর্ম করার সময় মনে রাখতে হবে যে ঐ কর্মের দ্বারা অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই পূজা হচ্ছে। নিজ অধিকার অনুযায়ী কর্ম করলে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। নিজের অধিকার না মেনে অন্যের অধিকারে কর্ম করতে গেলে তা পরিণামে অনর্থের কারণ হয়। নিজের স্বভাবজ কর্ম দোষযুক্ত হলেও তা কখনও পরিতাজ্য নয়। দোষশূন্য কর্ম পাওয়া যায় না। আমার অধিকারের উপযোগী এই কর্ম কিনা এটিই বিবেচনা করতে হয়। এ স্বভাবজ কর্মে কোন দোষ আছে কিনা তা বিবেচ্য নয়। অর্জুন ক্ষত্রিয় হওয়ায় কোন্‌টি ক্ষত্রোচিত স্বাভাবিক কর্ম সেইটি তাকে বিবেচনা করতে হবে। নিজের অধিকার কর্মে দোষ আছে কিনা এটা অর্জুনের বিচারের বিষয় হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এখানে বলতে চেয়েছেন যে, স্বভাবপ্রেরিত কর্ম করলে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধির লক্ষণ হল ইন্দ্রিয়জয় ও স্পৃহা না থাকা। এরাই তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা এনে দেয়। কর্মের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জ্ঞানযোগ্যতা লাভই কর্মস্তরের সাধনার শেষ ফল।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরও বলেন, যতদিন সে শোকের হাত হতে এড়াতে না পারবে ততদিন সে সাগ্রহে কর্ম করতে পারবে না। শোকের ফলেই মোহ উপস্থিত হয়। মোহ এলেই মানুষ স্বাভাবিক কর্ম অতিক্রম করতে চায়। আর তখন সে স্বাভাবিক কর্ম ছেড়ে পরধর্ম গ্রহণ করে। স্বধর্ম পরিহার করে অন্যের ধর্ম গ্রহণ করলে তা ভয়াবহ হয়। কাজেই ক্ষাত্রধর্মরূপ স্বভাব পরিত্যাগ করে ভিক্ষাগ্রহণাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম গ্রহণে অর্জুনের অভিলাষ প্রকৃতির বিরুদ্ধ আচরণ। প্রকৃতির ছন্দ বা স্পন্দন হতেই জীবের জন্ম। প্রকৃতির স্পন্দন বা ছন্দ সব সময় ভিন্নরূপ হয়। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও কর্ম কখনও ব্রাহ্মণের ধর্ম ও কর্মের সাথে এক হতে পারে না। তাই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, যুদ্ধ ত্যাগ করলে অর্জুনের ক্ষত্রোচিত স্বভাব অতিক্রম করা হবে। এর ফলে ক্ষত্রিয় হিসাবে অর্জুন স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে না। ছন্দ ত্যাগই মানুষের অধর্ম।

২.২.৪ গীতোক্ত ধর্ম্যযুদ্ধ

(মূল) স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।

ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।। গীতা ২।৩১

(অনু) ক্ষত্রিয়ের ধর্ম আলোচনা করেও (তোমার) বিচলিত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্মানুগত যুদ্ধ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের অন্য কোন মঙ্গলজনক কাজ নেই।

(মূল) যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।

সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।। গীতা ২।৩২

(অনু) নিজের প্রযত্ন ছাড়া আগত এই (উপস্থিত) যুদ্ধ সাক্ষাৎ স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। হে পার্থ, ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরা এরূপ যুদ্ধ লাভ করে।

(মূল) অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।

ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্সসি।। গীতা ২।৩৩

(অনু) আর যদি তুমি এই ধর্মানুগত যুদ্ধ না কর তাহলে স্বধর্ম ও পূর্বে অর্জিত কীর্তি ত্যাগ করে পাপের ভাগী হবে।

'ধর্ম্যযুদ্ধ' ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের ধর্মোচিত বলে একে 'ধর্ম্যযুদ্ধ' বলে। 'ধর্ম্যযুদ্ধ' বলতে ধর্ম্যযুদ্ধই বিবক্ষিত। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যে যুদ্ধ তাকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে। বৈদেশিক আক্রমণ হতে নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধ করতে হয় তাকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে। ইহা দেশের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্যই করা হয়। গৃহযুদ্ধ 'ধর্মযুদ্ধ' নয়। আগ্রাসনের জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলা চলে না। আফগানিস্তানে তালিবানদের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে না। আমেরিকার ইরাককে আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা যাবে না। কারণ আগ্রাসনই আমেরিকার লক্ষ্য বলে মনে হয়। নিজের দেশের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলে। ধর্মবুদ্ধি ও কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে যুদ্ধ করা হয় তাকে 'ধর্মযুদ্ধ' বলে। অধর্মের সাথে ধর্মের সংগ্রামকে 'ধমযুদ্ধ' বলে। পাপবৃত্তির সাথে পূণ্য বৃত্তির যে সংগ্রাম উহাও 'ধর্মযুদ্ধ'। মানুষের চিত্তনদীর কল্যাণবহ স্রোতের সাথে পাপবহ স্রোতের যে সংগ্রাম উহাও 'ধর্মযুদ্ধ'। যতদিন মানুষের মধ্যে অসুরভাব থাকে, যতদিন পাপভাব বলবান্ থাকে, ততদিন আমাদের মনে এরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হয় না। যখন রজোগুণ সত্ত্বগুণের অভিমুখী হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ভাব যখন দেখা দেয় তখনই ধর্মসংগ্রাম উপস্থিত হয়। এজন্য ধর্ম্যযুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের একমাত্র শ্রেয়ঃ ; এছাড়া আর কোনও শ্রেয়ঃ নেই। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, তার কোনও অন্যায় কার্য্যের জন্যও এই যুদ্ধ উপস্থিত হয় নি, এমনকি, এই যুদ্ধ যে সে প্রার্থনা করেছে তাও নয়, বরং ইহা নিবারণেরই চেষ্টা করেছে। এই যুদ্ধের ফলে ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় হবে-কাজেই ইহা ধর্ম্যযুদ্ধ। এই যুদ্ধে যারা ধর্মের পক্ষে থাকবেন তাদের জয় নিশ্চিত। সুতরাং এই যুদ্ধের দ্বারা তার কাছে স্বর্গের দ্বার যেন নিজের থেকেই খুলে গেছে। নিতান্ত সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়রাই এরূপ অপার্থিত ধর্মযুদ্ধ করার সুযোগ পায়। ক্ষত্রিয় হলেও যে সকলের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ করবার সুযোগ ঘটে তা নয়। কত ক্ষত্রিয় বিশেষ প্রার্থনা করেও 'ধর্মযুদ্ধ' করবার এবং তার ফলস্বরূপ স্বর্গলাভের সুযোগ পায় না। আর অর্জুন কিনা নিজের থেকেই উপস্থিত সাক্ষাৎ স্বর্গলাভের সুযোগ পরিত্যাগ করছে - তা কিছুতেই সঙ্গত নয়। এই যুদ্ধ থেকে বিরত হলে স্বধর্ম ত্যাগের দরুণ পাপ হবে এবং পাপের ফলও ভোগ করতে হবে। **গীতায়** শ্রীকৃষ্ণ পাপ-পুণ্যের একটি মূল সূত্র দিয়েছেন। যাতে আত্মার অকল্যাণ হয় ও সমাজের অহিত হয় তাই পাপ, আত্মার নিঃশ্রেয়স্ এবং জগতের অভ্যুদয়েসাধন মানব জীবনের লক্ষ্য। স্বধর্মোচিত কর্তব্য ত্যাগ করে পরধর্ম গ্রহণ করলে তার দ্বারা আত্মার অকল্যাণ হবে এবং সমাজের অহিত হবে; কাজেই তা পাপ। ন্যায় ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষা, অত্যাচারী ও দুর্বৃত্তের দমন করে সমাজের শান্তি স্থাপন, এমনকি প্রয়োজন হলে এই ধর্মপালনের জন্য যুদ্ধ করা এবং নিশ্চিত মরণ জেনেও যুদ্ধ থেকে পলায়ন না করা এটি হল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। যখন দুর্বৃত্তের দমন ও দুর্বলের রক্ষার জন্য আহ্বান আসবে তখন সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে ক্ষত্রিয় যদি আত্মীয়স্বজনের মমতায়, নরহত্যার আশঙ্কায়, রক্তপাতের ভয়ে ধর্মযুদ্ধ হতে বিরত হয় তবে কর্তব্য লঙ্ঘনের দরুণ তার পাপ হবে। কীর্তি ত্যাগ করলেও পাপ হবে। মানুষ সৎ কাজ করে এবং স্বধর্ম পালন করে কীর্ত্তি অর্জন করে থাকে। যাতে ধর্মের বৃদ্ধি হয় তাতে কীর্তিও অর্জিত হয়। অর্জুন বহু ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে

বিপুল কীর্ত্তি অর্জুন করেছে। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভ করলে সেই কীর্ত্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। এই কীর্ত্তিকে ত্যাগ করলে ধর্মকেই ত্যাগ করা হবে। সুতরাং তাতে পাপই জন্মাবে।

স্বধর্মত্যাগ করলে অর্জুন যে শুধু স্বর্গাদি থেকে বঞ্চিত হবেন তাই নয়, সমস্ত ব্যক্তি তার অযশ ঘোষণা করবে। এতকাল সকলে যাকে সম্মান দেখিয়েছেন তার পক্ষে অপমান সহ্য করা মৃত্যুর চেয়েও দুঃখজনক। এর ফলে তার মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হবে এবং তাতে তার মনে হবে এ জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল ছিল। এছাড়াও কর্ণ,দুর্যোধন প্রভৃতি মহারথীগণ মনে করবে যে অর্জুন তাদের ভয়ে ভীত হয়ে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত হয়েছে। এর ফলে তাদের কাছে অর্জুনের গুরুত্ব কমে যাবে। তারা তাকে ভীরু বলবে এবং তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করবে। এমনকি অর্জুনের শক্তি সামর্থ্যের নিন্দা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না। বীর ক্ষত্রিয়ের কাছে এটি অতি অসহনীয়।

২.২.৫ ধর্ম্যযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কাম্যকর্ম নয়

ফলের আকাঙ্খায় কোন কাজ করলে তাকে কাম্য কর্ম বলে। কাম্য কর্মের বোধক অনুজ্ঞাবাক্যে ফলের উল্লেখ থাকে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করার যে অনুজ্ঞা বা নির্দেশ আছে তাতে ফলের উল্লেখ নেই। এজন্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ করা কাম্য কর্ম নয়। রাজ্যভোগ বা স্বর্গলাভ যুদ্ধের ফল নয়। তাই অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ 'ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম যুদ্ধ' এই ভাব নিয়ে অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, যুদ্ধের ফল কি হবে এ কথা ভেবে যুদ্ধ কোরো না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ফলভোগের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে করাতে চান নি। অর্জুন যাতে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত না হন তার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। গীতার কর্মযোগের আদর্শ হল নিষ্কাম কর্ম।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হল, অর্জুন যদি নিষ্কামভাবে যুদ্ধ করা রূপ স্বধর্মপালন করে, তাহলে সে নিষ্কামযোগী হিসাবে বুদ্ধিযোগের ভূমি হতে জ্ঞানভূমিতে উত্তীর্ণ হবে ও পরিশেষে তার পরম পুরুষার্থ লাভ সুনিশ্চিত। রাজ্যপ্রাপ্তি, স্বর্গপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তি কোনটিই ধর্মযুদ্ধের ফল নয়, এগুলি আনুষঙ্গিক। সেজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অর্জুন যদি সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় এগুলোকে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করে তবে তার পাপ হবে না। কোন কাজ পাপের ও কোন কাজটি পুণ্যের তা কেবল কর্মের ফল দেখে নির্ণয় করা যায় না। কর্ত্তার মনের ভাব বা অবস্থার দিকেও লক্ষ্য করতে হবে। একই কাজ শুদ্ধ-বুদ্ধিতে করলে তা হবে পুণ্যের, আর অশুদ্ধ বুদ্ধিতে করলে তা হবে পাপের। স্বজনবধ কোনওস্থলে পাপ, কোনও স্থলে পাপ নয়। অর্জুন যদি জিগীষা প্রণোদিত হয়ে লাভের আশায় অথবা নিজের বা অপরের সুখলাভের আশায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে স্বজন বধ করে তবে তাতে হবে পাপ। আর যদি কোনও ফলাকাঙক্ষা না করে তবে তার পাপের হবে না। এই ফলাঙ্খাকা শূন্য সমত্ববুদ্ধিযুক্ত স্বধর্ম পালনই কর্মযোগ । কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করলে মনে যে আনন্দ হয়, ঐ চিত্ত প্রসাদই পরম ফল। কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্ম করলে পাপকর্মের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এসব কথা অনুধাবন করে মোহগ্রস্ত অর্জুন ধর্মযুদ্ধ হতে বিরত না কোন - এটি হল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারকথা।

২.৩ স্থিতপ্রজ্ঞের স্বরূপ ও ব্যবহার

২.৩.১ স্থিতপ্রজ্ঞের পরিচয়

নিষ্কাম যোগী যখন বুদ্ধির ভূমিতে আরূঢ় হন তখন তাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির সকল দ্বন্দ্ব বিষয়ে সমানজ্ঞান হয়। সুখ-দুঃখ, শীত-গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে একই রকম অনুভূতি হয়। এককথায় ফলাকাঙক্ষা বর্জন করে কর্ম করলেই ঐ নিষ্কামকর্মীর এরূপ সমদর্শন হয়ে থাকে।

২.৩.২ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ

(মূল) প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। গীতা ২.৫৫

(অনু) হে পার্থ, যে ব্যক্তি মনের ধর্ম সমস্ত কামনাকে পরিত্যাগ করতে পারেন এবং (স্বপ্রকাশ) চিদ্রূপে ভাসমান পরমাত্মাতে সন্তুষ্ট থাকেন তাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে।

আচার্য শঙ্কর **গীতার ভাষ্যে** ও মধুসূদন সরস্বতী **গূঢ়ার্থদীপিকা** টীকায় অবস্থাভেদে স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির স্বরূপ দুভাবে বর্ণনা করেছেন। এই অবস্থাভেদেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে 'সমাধিস্থ' ও 'ব্যুত্থিত' বলা হয়। যে নিষ্কাম যোগী অজ্ঞানের সাথে কামাদি সকল প্রকার বৃত্তিকে পরিত্যাগ করেন। তাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ সব রকম কামনাবাসনাকে মনের ধর্মরূপে বোঝেন। এগুলি আত্মার স্বরূপ নয়। কেউ কারও স্বরূপ পরিহার করে থাকতে পারে না। দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ। এজন্য অগ্নি তাকে পরিহার করে অবস্থান করে না। কিন্তু সকল প্রকার কাম আসে ও যায়। এজন্য মনের সব ধর্মগুলি অনিত্য। তাই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ এগুলি আত্মার স্বরূপ নয় বুঝে পরিহার করেন। তিনি সর্বদা আনন্দস্বরূপ আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি নিত্য সুখী। কারণ তাঁর কাছে সন্তোষই সুখ। তাঁর তামস ও রাজস মনোবৃত্তি হয় না। কেবলমাত্র সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি হয়। তিনি আনন্দস্বরূপ অর্থাৎ রসস্বরূপ এই অনুভব করেন বলে তিনি সর্বদা আনন্দে অবস্থান করেন।

২.৩.৩ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের বৈশিষ্ট্য

(মূল) দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।গীতা২।৫৬

(অনু) দুঃখে যার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখেতে যার স্পৃহা চলে গেছে, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়েছেন এমন মননশীল ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত।

স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি যখন সমাধি অবস্থা থেকে ফিরে আসেন তখন তাকে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের মতো ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ চিত্তের ভূমিতে অবস্থান করেন। যে সব কামনার ভূমির সাথে সাধারণ মানুষ পরিচিত সেই কামনার ভূমিতে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থান করেন না। জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থায় সাধারণ মানুষ কামনার ভূমিতে থাকে। কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞ জীব কামনার ভূমিতে থাকে না, সাময়িক সে

চিত্তের ভূমিতে অবস্থান করে। পরে আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে কামনার ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু সমাধিস্থ ও ব্যুত্থিত এই উভয় অবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ সর্বদা চিত্তভূমিতেই অবস্থান করে। চিত্তে স্থিত হলেই সমতা লাভ হয়। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ চিত্তে র ভূমিতে থাকেন বলেই ব্যুত্থানের পর কাম্য বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হলেও তিনি নির্লিপ্ত থাকেন। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কোন অনুতাপ থাকে না। সকল প্রকার দুঃখে তার মন উদ্বিগ্ন হয় না। উদ্বেগ এক প্রকার ভ্রমজনিত মনের তামস অবস্থা। প্রারব্ধ কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ হয় একথা তিনি বুঝে থাকেন। সেজন্য তা পরিহার করা সম্ভব নয় ইহা জেনে তিনি অভিভূত হন না। এখানে প্রশ্ন হয়, ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের যদি ভ্রম না হয় তাহলে তার শরীর ধারণের জন্য অন্য প্রারব্ধ কর্ম স্বীকার করতে হয়। এর উত্তরে বলতে হবে, ঘটকার্য নিষ্পন্ন হবার পরেও কুমারের চাকা যেমন নিরর্থক ঘোরে তেমনি ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞেরও প্রারব্ধ কর্মের ফলে দেহধারণ সম্ভব হয়। তিনি যে ভিক্ষাদি গ্রহণ করেন তা অন্যের দ্বারা প্রেরিত হয়েই করছেন বুঝতে হবে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ভোগের সময়ই বুঝতে পারেন যে, এগুলি অনাত্মার ধর্ম। তিনি যেমন দুঃখে উদ্বিগ্ন হন না তেমনি সুখে তাঁর স্পৃহা থাকে না। স্পৃহা হল আকাঙক্ষারূপ একপ্রকার তামস চিত্তবৃত্তি। তা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়, আর তা অবিবেকী পুরুষেরই হয়ে থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য হয়ে থাকেন। 'রাগ' শব্দের অর্থ হল অনুরাগ নামক মনের বৃত্তি, যা সৌন্দর্যাধ্যাসের ফলে হয়। বাস্তবিক সৌন্দর্য তাতে না থাকায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাতে আসক্তি জন্মায় না। নিজের রোধ করার সামর্থ্য নেই জেনে যে দীনতারূপ মনের বৃত্তি হয় তাকে 'ভয়' বলে। অভিজ্বলন রূপ মনোবৃত্তিকে 'ক্রোধ' বলে। এগুলি সব ভ্রমাত্মক বলে তত্ত্বজ্ঞানী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইহা পরিহার করেন। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি শুভ বস্তু পেয়েও তুষ্ট হন না, অশুভ বা অনিষ্ট বস্তু পেয়েও দ্বেষ করেন না, ইহাই হল নিষেধমুখে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। এ থেকে পরিপুষ্ট হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মনের ভূমির ওপরে অবস্থান করেন। কামনার ভূমিতেই সুখ, দুঃখ প্রভৃতির সাথে পরিচিতি ঘটে। শুদ্ধসত্ত্বের ভূমিতে এই দ্বন্দ্ব নেই।

২.৩.৪ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের আচার-ব্যবহার

(মূল) যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।

ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।। গীতা ২।৫৮

(অনু) যখন ইনি (ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ) কচ্ছপের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সকল হতে নিজের ইন্দ্রিয় সকলকে সঙ্কুচিত করে থাকেন, তখন বুঝতে হবে তাঁর প্রজ্ঞা পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(মূল) বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নির্বত্ততে।।গীতা ২।৫৯

(অনু) আহার রহিত ব্যক্তির অর্থাৎ বা ভন্ড তপস্বীর কাছ হতে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) বিষয় সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়ের অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করার পর স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হয়ে যায়।

ভগ্‌বান শ্রীকৃষ্ণ বিধিমুখে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ব্যবহার বিশ্লেষণ করেছেন। সমাধিস্থ যোগী যখন প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগের জন্য ঐ অবস্থা থেকে ব্যুত্থিত হন তখন তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে সমাধিস্থ হওয়ার জন্যই উপবেশন করেন। কচ্ছপ যেমন ভয় পেলে সব দিক হতে নিজের অঙ্গসমূহ উপসংহার করে, তেমনি জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যুত্থিত যোগী ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল প্রকার বিষয় হতে উপসংহার করেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ব্যুত্থান অবস্থায় ব্যক্তিতে কোন প্রকার তামস মনোবৃত্তি থাকে না। কিন্তু রাজস ও সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি থাকে। সমাধি অবস্থায় মনের কোনও বৃত্তিই থাকে না। তবে উভয় অবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিতে ইন্দ্রিয়ের সংযম ও প্রত্যাহার স্বভাবসিদ্ধ। কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে। স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়সমূহ অন্তর্মুখী থাকে। প্রয়োজন হলেই যোগী তাদের উপসংহার করেন। এই স্বাভাবিক প্রত্যাহারই স্থিতপ্রজ্ঞের প্রকৃত লক্ষণ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অজ্ঞ ব্যক্তি বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি রোগাদির ফলে বিষয় ভোগ করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য বিষয় থেকে নিবৃত্ত হয়ে থাকে। কাজেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় একথা যে বলা হয়েছে তা কিভাবে সঙ্গত হবে, কারণ বিষয়ভোগ না থাকলেই বা ইন্দ্রিয়সংযম থাকলেই যদি পরমাত্মাতেই সে স্থির হতে পারে তাহলে রোগী বা ভন্ড তপস্যীকেও স্থিতপ্রজ্ঞ বলতে হয়। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অজ্ঞব্যক্তি বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয়ভোগ হতে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ে তার অনুরাগ নিবৃত্ত হয় না। রোগাদির ফলে সে অসমর্থ হওয়ায় বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় না। কিন্তু তাই বলে যে তার ভোগতৃষ্ণা থাকে না, তা নয়। তা পূর্ণ মাত্রাতেই থাকে। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তুচ্ছ বিষয়ানুরাগও লোপ পায়। কাজেই বিষয়ানুরাগের সাথে বিষয়েরও যে নিবৃত্তি তা ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। সুতরাং মোহগ্রস্ত ব্যক্তি এবং স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি উভয়ের লক্ষণ ভিন্ন । স্থিতপ্রজ্ঞের এই লক্ষণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে **গীতায়** বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়সংযম ও প্রত্যাহার স্থিতপ্রজ্ঞের ব্যহ্যলক্ষণ। কারণ স্থিতপ্রজ্ঞ না হয়েও অনেকে বিষয়ভোগ থেকে বিরত থাকে। তাই এটি সাধনপথের উচ্চভূমির পরিচয় নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থার পরিচায়ক হল পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে স্বাভাবিক তৃষ্ণা ত্যাগ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রজ্ঞার এই স্থিরতা আনার জন্য বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম ও মনের নিগ্রহ অসাধারণ কারণ। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য করতে ইচ্ছা করে তার পক্ষে প্রথমে ইন্দ্রিয় সকলকে নিজের বশে আনা উচিত। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করতে না পারলে উহারা বিষয়াসক্ত মেধাবী ব্যক্তিরও মনকে হরণ করে। বলশালী দস্যুরা যেমন ধনী ও প্রহরী উভয়কে পরাভূত করে তাদের সামনেই ধন হরণ করে, তেমনি ইন্দ্রিয়গুলিও বিষয়স্পর্শে মনকে হরণ করে। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও মনকে সংযত করাই হল স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মন বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে মাধ্যম করেই অনর্থের কারণ হয়। এখন যে ব্যক্তি বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছে, তার মন যদি বশীভূত না হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির মন তার কোন অনিষ্ট

করতে পারবে না। বিষধর সাপের বিষদাঁত যদি ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে সে যেমন অনিষ্ট করতে পারে না, তেমনি ব্যাহ্যেন্দ্রিয়গুলি বিষয় হতে নিবৃত্ত হলে উহারা মনের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এর উত্তরে গীতায় বলা হয়েছে, বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত হলেও ঐ ব্যক্তির মনে বারবার বিষয় চিন্তা আসবে। বিষয়ের ধ্যান হতে সঙ্গ জন্মায়, আর সঙ্গ হতেই কাম, ক্রোধ, স্মৃতিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হয়ে থাকে। বিষয়াসক্তির মূলে রয়েছে বিষয়ের ধ্যান। সর্বদা ভগবানের ধ্যান করলে বিষয় চিন্তা না হয়ে ভগবচ্চিন্তা হবে এবং বিষয়াসক্তি চলে গিয়ে ভগবদাসক্তি জন্মাবে।

ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়াসক্তি থাকে না। তার চিত্তে ভগবদাসক্তি থাকে। তবে **গীতায়** শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছেন, নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত ভাবে বিষয়ের জ্ঞান স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিরও হয়, বিষয়ভোগ হয় না। ইন্দ্রিয় সংযমই হল স্থিতপ্রজ্ঞতার লক্ষণ। ইন্দ্রিয়গুলি যদি সংযত হয়, সেগুলো যদি সম্পূর্ণ ভাবে নিজের বশে থাকে, তবে ঐ জিতেন্দ্রিয় স্থিতধী ব্যক্তি বিষয়ে বিচরণ করেও আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। চিত্তপ্রসন্ন হলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল প্রকার দুঃখের উপশম ঘটে ও তার বুদ্ধিও স্থির হয়। অন্যদিকে অসংযত বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় না, যেহেতু সে আত্মতৃপ্তি লাভ করে না। যে ব্যক্তির ঈশ্বরচিন্তা নেই, তার শান্তি থাকে না, অশান্তচিত্ত ব্যক্তির সুখ হয় না। একটি ইন্দ্রিয় বিষয়ানুগামী হলে ঐ ব্যক্তির প্রজ্ঞা নষ্ট হয়। তাই নিষ্কামযোগীকে সমস্ত ইন্দ্রিয় সর্বতোভাবে সংযত করতে হবে। এর ফলে তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হবে। এরূপ স্থিতধী ব্যক্তির বিষয়ভোগ হয় না। কারণ তাঁর বিষয়ভোগে চেতনা থাকে না, চেতনা থাকে ভগবানের প্রতি। তাঁর চিত্ত আত্মানন্দে পরিপূর্ণ থাকে বলে, কাম্য বিষয় চিত্তে প্রবেশ করলেও তাকে বিচলিত করতে পারে না। ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ নিষ্কামভাবে বিষয়ে বিচরণ করেন। বিষয়ের প্রতি তার কোন মমতা থাকে না। তার কর্তৃত্বের অভিমানও থাকে না। তিনি পরম স্থিতিলাভ করেন। এই অবস্থার নাম ব্রাহ্মীস্থিতি।

২.৪ সারসংক্ষেপ

অর্জুনের অসাধারণ মোহ দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাকে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম সম্পর্কে অবহিত করেছেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম শ্রেয়ঃ, যেমনটি অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে নিজ নিজ স্বধর্ম পালন শ্রেয়োজনক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল 'ধর্ম্যযুদ্ধ' । এটি হল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। অর্জুন ক্ষত্রিয় হওয়ায় তার পক্ষে ধর্ম্যযুদ্ধ করার চেয়ে কল্যাণকর আর কিছু হতে পারে না। এই যুদ্ধে যারা ধর্মের পক্ষ নেবেন, তাদের জয় নিশ্চিত। আনুষঙ্গিক ভাবে রাজ্যপ্রাপ্তি এবং স্বর্গলাভও হবে। স্বধর্ম পরিহার করলে অর্জুন যেমন স্বর্গাদি লাভ থেকে বঞ্চিত হবেন, তেমনি তার অপযশও হবে। তিনি শত্রুপক্ষের কাছে নিন্দার ভাজন হবেন। তাকে শত্রুরা ভীরু বলে গণ্য করবে। মানী, বীর ক্ষত্রিয়ের কাছে শক্তিসামর্থ্যের নিন্দা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ ক্ষত্রিয় হিসাবে নিষ্কামভাবে ধর্ম্যযুদ্ধ করা। নিষ্কামভাবে স্বধর্ম পালন করলে অর্জুন সব সময় চিত্তভূমিতে বিচরণ করতে পারবেন।

এই পাঠে আরও দেখানো হয়েছে, কামনার ভূমি পরিহার করে যিনি সব সময় চিত্তের ভূমিতে বিচরণ করেন তিনি 'স্থিতপ্রজ্ঞ'। সকল দ্বন্দ্ব বিষয়ে তার সমান জ্ঞান হয়। নিষ্কামভাবে কর্ম করলে নিষ্কাম কর্মী স্থিতপ্রজ্ঞের স্তরে উন্নীত হয়। সমাধি অবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞ সকল কামনা-বাসনাকে মনের ধর্ম বুঝে পরিহার করেন ও সর্বদা আনন্দ স্বরূপ আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকেন। তার কেবল সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি হয়। ব্যুত্থানের পর ইন্দ্রিয়ের সাথে কাম্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ায় স্থিতপ্রজ্ঞের বিষয়ের জ্ঞান হয়, কিন্তু যেহেতু তার ইন্দ্রিয় সংযত ও যেহেতু তাঁর বিষয়ের ধ্যান হয় না, ধ্যান হয় ভগবানের, সেজন্য সুখ-দুঃখ প্রভৃতি কোন ভোগই তার হয় না। নিষ্কাম যোগী এরূপ 'ব্রাহ্মীস্থিতি' লাভ করেন— অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ইহাই উপদেশ।

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

বর্ণধর্ম

সকল বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্মকে বর্ণধর্ম বলে । একেই স্বধর্ম বলা হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের তারতম্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের নিজ নিজ কর্ম বর্ণধর্ম। বর্ণধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে জীবন হয় শৃঙ্খলিত, মনে জাগে নীতিবোধ ও মূল্যবোধ।

ক্ষাত্রধর্ম

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম ক্ষাত্রধর্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হল অধ্যয়ন, যজন, দান ও প্রতিরক্ষা। আর্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করা ও প্রত্যেকে যাতে নিজ নিজ স্বধর্ম করতে পারে তা দেখাও ক্ষত্রিয়ের কাজ। ক্ষত্রিয়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য — শৌর্য, তেজ, ধৃতি ও যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত না হওয়া।

ধর্ম্যযুদ্ধ

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠার জন্য যে যুদ্ধ তাকে ধর্ম্যযুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধ হল পাপবৃত্তির সাথে পুণ্যবৃত্তির সংগ্রাম। এটি ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ কর্ম। কারণ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হল দুষ্টের দমন করা ও শিষ্টের পালন করা।

নিষ্কামকর্মী

কর্মের কৌশল জেনে যিনি কর্ম করেন তাকে নিষ্কামকর্মী বলে। ফলের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তার সমর্পণ হল যোগ। এখানে যোগ শব্দের অর্থ সমত্ব। সমত্ববোধ থাকলেই ফলের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা জন্মায়। নিষ্কাম যোগীর দ্বন্দ্বেই সমদর্শন হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ

যিনি সর্বদা ভগবানের চিন্তায় নিজেকে নিযুক্ত রাখেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ । তাঁর কোন কামনা- বাসনা থাকে না। তিনি সর্বদা আনন্দে থাকেন। তিনি সর্বদা চিত্তের ভূমিতে বিরাজ করেন।

২.৬ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Give an account of *samâdhistha sthitaprajña* and *vyutthita sthitaprajña,* after the Gîtâ.

Short Type

1. What is *dharmyayuddha*?
2. What is the duty (*svadharma*) of a Brâhmaṇa?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

The Bhagavadgîtâ, trans. S Radhakrishnan, Blackie & Son (India)Ltd. Calcutta, 1974.

Universal Message of the Bhagavad Gita, ed. Swami Ranganathananda. Vol. I, Advaita Ashrama, Calcutta, 2001.

শ্রীগীতা, রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত, প্রথম ষট্‌ক, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯১

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৯৯২।

ইউনিট-৩ ঃ গীতায় কর্মযোগ

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য

৩.২ 'কর্মযোগ' শব্দের অর্থ

৩.৩ অজ্ঞানীর পক্ষে কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক

৩.৪ পরার্থপর কর্ম হিতকর

৩.৫ লোকসংগ্রহের জন্য জ্ঞানীর কর্মানুষ্ঠান

৩.৬ কর্মানুষ্ঠানের ভেদ ও পথনির্দেশ

৩.৭ কাম পাপপ্রবৃত্তির মূল

৩.৮ ইন্দ্রিয়সংযম কাম জয়ের হেতু

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.১১ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য

জ্ঞানী ও কর্মী সকলেই কর্ম-করলেও জ্ঞানীর কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, আর কর্মীর কর্ম মোক্ষের অন্তরায় হয়। কিন্তু নিষ্কামভাবে ও ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে প্রতিটি কর্মী নিজ নিজ স্বভাবজ কর্ম অনুষ্ঠান করলে তা পরম্পরাক্রমে মোক্ষের উপকারক হয়ে থাকে। সকল বর্ণের মানুষের যে নিজ নিজ স্বধর্ম অনুযায়ী নিষ্কামভাবে কর্ম করা উচিত ইহা বিশ্লেষণ করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.২ 'কর্মযোগ' শব্দের অর্থ

(মূল) যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।। গীতা ২।৪৮

(অনু) হে ধনঞ্জয়, ফলের অভিলাষ ও কর্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ করে এবং ফলের সিদ্ধি ও ফলের অসিদ্ধি দু এতেই সমভাবাপন্ন হয়ে কাজ করতে থাকো। এই যে সমভাব ইহাই যোগ বলে কথিত।

(মূল) যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।। গীতা ২।৫০ খ

(অনু) কর্মের মধ্যে যোগই কুশল।

ভগবদ্গীতা-র প্রতিটি অধ্যায়কে এক এক প্রকার যোগ বলা হয়েছে। যেমন প্রথম অধ্যায় বিষাদযোগ, দ্বিতীয় অধ্যায় স্যাংখ্যযোগ, তৃতীয় অধ্যায় কর্মযোগ ইত্যাদি। 'যোগ' শব্দটি পাতঞ্জল দর্শনে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে বোঝায়। কিন্তু **গীতায়** 'যোগ' শব্দটি বিভিন্ন স্থলে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ''বুদ্ধিযোগ'' পদে ''যোগ'' শব্দটি বুদ্ধিকে আত্মার স্বরূপে কিভাবে যুক্ত করতে হবে তা বলা হয়েছে। এখানে আক্ষরিকভাবে আত্মার স্বরূপের সাথে বুদ্ধির নিয়োগের কথা বলা হলেও অন্য থেকে নিবৃত্ত হবার কথাও সূচিত হচ্ছে। কাজেই পাতঞ্জলের যোগের সাথে বুদ্ধিযোগের বিরোধ নেই। ''কর্মযোগ'' পদে 'যোগ' শব্দটি কিভাবে কর্ম করতে হবে তা বলা হয়েছে। এখানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' বলতে কর্মের কৌশলকে বুঝিয়েছেন। 'কৌশল' শব্দের অর্থ নৈপুণ্য । বস্তুতঃ সমত্বই যোগ শব্দের অর্থ। লাভ-অলাভ, জয় -পরাজয়, সুকৃত-দুষ্কৃত প্রভৃতিকে সমান জ্ঞান করে কর্মের অনুষ্ঠানের নাম কর্মযোগ। কর্মযোগে যোগ বলতে সমত্ববুদ্ধিকে বোঝালেও অন্য থেকে নিবৃত্তির কথাও সূচিত হয়েছে। কর্তব্য বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান করতে হবে ইহাই হল কর্মযোগের কথা। প্রবৃত্তির কথা বলা হলেও এর মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের কথা প্রকারান্তরে বলা হয়েছে। তাই পাতঞ্জলোক্ত যোগের গীতোক্ত কর্মযোগের কোন বিরোধ নেই।

৩.৩ অজ্ঞানীর পক্ষে কর্মানুষ্ঠান আবশ্যক

(মূল) ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।

ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।। গীতা ৩।৪

(অনু) (বিহিত) কর্মের অনুষ্ঠান না করলে (বহির্মুখ সাধারণ) মানুষ নৈষ্কর্ম্য (অর্থাৎ জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা) লাভ করতে পারে না। আবার (চিত্তশুদ্ধি ছাড়া) কেবল কর্মসন্ন্যাস হতেই সিদ্ধিলাভ করতে পারে না।

(মূল) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।

কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। গীতা ৩।৫

(অনু) কোন লোক কখনও একক্ষণের জন্যও নিষ্কর্ম থাকে না। কারণ সকলেই নিজের স্বভাবজ গুণের দ্বারা অবশভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। প্রত্যেকে যাতে নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করে অর্থাৎ স্বধর্ম হতে বিচ্যুত না হয় এটি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারকথা। জীবন মানে কর্ম। জীবনের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই কর্মের মধ্য দিয়ে কাটায়। **গীতা-য়** 'কর্মযোগ' নামে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, অধ্যাত্মপথে অগ্রসরের জন্য মন্দাধিকারী অজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অবশ্য করণীয়।

কর্মের অনুষ্ঠান না করলে কর্মশূন্যতার অবস্থা লাভ করা যায় একথা ঠিক নয়। কর্মানুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি কর্ম পরিহার করেছে তার কখনও নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় না। 'নৈষ্কর্ম্য' বলতে লোকে কর্মশূন্যতাকে বোঝে। কিন্তু **গীতা-র** মতে, 'নৈষ্কর্ম্য' শব্দের দ্বারা মোক্ষাবস্থাকে বোঝালেও ঐ অবস্থা কখনও কর্মকে পরিহার করে পাওয়া যায় না। কর্ম মানুষকে নৈষ্কর্ম্যের জন্য উপযোগী করে তোলে। গীতোপদিষ্ট রীতিতে কর্ম অনুষ্ঠান করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত যখন শুদ্ধ হয় তখন আপনা হতেই নৈষ্কর্ম্য আসে।

গীতা-য় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, জীবের পক্ষে নিঃশেষে কর্মত্যাগ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ দেহধারণের জন্য কিছু কর্ম করতেই হয় শ্বাসপ্রশ্বাস প্রভৃতি কতকগুলি কর্ম আছে যেগুলো মানুষ অজ্ঞাতসারে আপনা হতেই করে। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ অবশভাবে কাজ করে। শারীরিক কর্ম যদি বন্ধও থাকে তবুও মানসিক চিন্তা চলে। এগুলিও একপ্রকার কর্ম। কাজেই সকল মানুষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানা কর্ম করে থাকে। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে কর্মত্যাগ করার কথা বলেছেন তা হল ফলাকাঙক্ষার ত্যাগ। কর্মত্যাগ বা কর্মসন্ন্যাস ত্যাগীর পক্ষেই বিহিত, কর্মযোগীর পক্ষে নয়। কাজেই অজ্ঞানীর কর্ম করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

অজ্ঞানী মানুষ যদি কৌতূহল বশতঃ কিংবা অন্যের দ্বারা প্রভারিত হয়ে অথবা পরকে প্রতারিত করার জন্য কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তা হল মিথ্যাচার। মনে প্রবৃত্তি রেখে বাইরে ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে. কর্মত্যাগ করলে মিথ্যাচার হয়। যতক্ষণ মনসংযত ও শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানী কর্মত্যাগের যোগ্য হয়না। যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন কর্মত্যাগ করা অনুচিত । বাহ্যত কর্ম পরিহার করলে যদি মনে কামনা-বাসনা থাকে তাহলেও কর্ম হচ্ছে বলতে হবে। কেবল কর্ম মানুষের বন্ধনের কারণ হয় না। কর্মের মূলে যে সব কামনা-বাসনা কাজ করে সেগুলি এবং মানুষের অহংবোধ বন্ধনের কারণ। যারা কামনা-বাসনা এবং কর্তৃত্বের অভিমান নিয়ে কাজ করে তারা অজ্ঞানী। এরূপ অজ্ঞানী বাহ্যত কর্মত্যাগ করলেও নৈষ্কর্ম্যলাভ করতে পারেনা। বরং কর্মযোগের পথ ধরে কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর নৈষ্কর্ম্য আসা সম্ভব। কাজেই যারা মনে করেন, কর্মত্যাগ করলে মোক্ষের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তারা ভ্রান্ত। **গীতা** কর্মহীনতার শিক্ষা দেয় না, বরং কর্ম কিভাবে অনুষ্ঠিত হলে কর্মত্যাগের অবস্থা লাভ করা যায় তার উপদেশ দেয়।

৩.৪ পরার্থপর কর্ম হিতকর

(মূল) যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।। গীতা ৩।৯

(অনু) যজ্ঞার্থ কর্ম ছাড়া (অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাছাড়া) অন্য কর্মে প্রবৃত্ত হলে ঐ কর্মাধিকারী ব্যক্তি কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। (সুতরাং) হে কুন্তীপুত্র, তুমি সেই উদ্দেশ্যেই নিঃসঙ্গ হয়ে কর্ম করতে থাকো।

(মূল) এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।

অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।। গীতা ৩।১৬

(অনু) হে পার্থ, যে ইন্দ্রিয়ারাম মানুষ এই প্রকারে প্রবর্তিত চক্র অনুবর্তন করে না সেই পাপী ব্যক্তি বৃথাই জীবন ধারণ করে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন কর্ম করলেই তা বন্ধন হয় না। যজ্ঞার্থ কর্ম বন্ধনের হেতু নয়। পরমেশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাকে যজ্ঞার্থ কর্ম বলে। বিষ্ণু সকল কর্মের অধিষ্ঠাতা। এজন্য শ্রুতিমধ্যে যজ্ঞকেই বিষ্ণু বলা হয়েছে। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কর্ম। সকল কর্মকে বিষ্ণু ভাবনা করে অনুষ্ঠান করতে হয়। কাজেই 'যজ্ঞার্থ কর্ম' হল আসক্তিরহিত ও স্বার্থরহিত কর্ম। যে কোন ক্রিয়াকেই যজ্ঞার্থ কর্ম বলা হয় না। যে ক্রিয়ার স্থলে আমি কর্তা বলে বোধ হয় তাকে আসক্তিযুক্ত কর্ম বলে। যে ক্রিয়ায় আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এরূপ বোধ থাকে না, তা হল 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বা পরার্থপর কর্ম। স্বার্থবোধে যে কর্ম করা হয় তা মানুষকে সঙ্কুচিত করে তোলে। 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলতে স্বার্থরহিত পরের কল্যাণের হেতু কর্মকে বোঝানো হয়েছে। মানুষ স্বার্থপর বটে, তবুও পরার্থপর বুদ্ধি তাতে স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন। স্বার্থপর কর্ম চিত্তকে সঙ্কুচিত করে। এই সঙ্কোচই হল পাপ। পরার্থপর কর্ম চিত্তকে উদার করে তোলে। এই প্রসারণই হল পূণ্য।

গীতা-য় আরও বলা হয়েছে যে, জগৎচক্র বিশ্লেষণ করলেও তা হতে কর্ম করবার উপযোগিতা বোঝা যায়। সকলে অন্নের দ্বারা পরিতৃপ্তি লাভ করে থাকে। এই অন্ন মেঘ হতে সৃষ্ট হয়। আবার যজ্ঞ হতে মেঘের সৃষ্টি। কর্ম থেকে যজ্ঞের সৃষ্টি। কর্মের মূলে বেদ। আবার এই বেদ ব্রহ্ম হতে উদ্ভূত। ইহাই হল জগৎচক্র।

প্রকৃতিস্থ দেবতারা সর্বদা এই যজ্ঞ করছেন। নিজের যা আছে তাকে অকাতরে দান করার নাম আত্মদান। সকলেই আত্মদান করে কৃতার্থ হতে চান। সূর্যদেব সকালে উদিত হয়ে সমস্ত সৌরজগৎ নিজের কিরণে প্রকাশ করে কৃতার্থ হন, পবনদেব সবসময় আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ু দিয়ে কৃতার্থ হন, অগ্নিদেব উতাপ দিয়ে ও ইন্দ্রদেব মেঘরূপ বৃষ্টি দান করে কৃতার্থ হন। এর ফলে সৃষ্টি রক্ষা পাচ্ছে, জীবগণ বেঁচে আছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে ও ইষ্ট বস্তু লাভ করছে। মানুষকেও এই যজ্ঞে যোগদান করতে হবে। মানুষ এই প্রকৃতিকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে এবং তার মধ্য দিয়ে দেবতাদের তুষ্ট করা হবে। মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করলে প্রকৃতি পক্ষান্তরে মানুষের ধ্বংসের কারণ হবে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক মানুষ যদি অপরের শুভকামনা না করে কেবল নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে কর্ম করে, নিজের মঙ্গল তো হবেই না, কারও মঙ্গল হবে না। এমনকি কেবল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য কর্ম করলে জগৎচক্রের বিপরীত দিকে যাওয়া হয়। এরূপ জীবন ব্যর্থ। তাই জগৎচক্রকে অনুসরণ করে পরার্থপর কর্ম করাই কর্তব্য। যারা কামনার ঊর্ধ্বভূমিতে বিচরণ করেন তাদের পক্ষে এরূপ পরার্থপর কর্ম করণীয় নয়। কারণ, কামনার হয়ে সেরূপ করবেন।

৩.৫ লোকসংগ্রহের জন্য জ্ঞানীর কর্মানুষ্ঠান

(মূল) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমহসি।। গীতা ৩।২০

(অনু) যেহেতু জনক প্রভৃতি মহাপুরুষেরা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া লোকসংগ্রহের দিকে তাকিয়েও তোমার কর্ম করা উচিৎ।

(মূল) উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।

সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।। গীতা ৩।২৪

(অনু) যদি আমি কর্ম না করি তাহলে সকল লোকই বিনষ্ট হবে। এর ফলে আমি বর্ণসঙ্করের কর্তা হব ও আমি প্রজাদের বিনাশের কর্তা হব।

গীতা-য় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন, কর্ম সব সময় জ্ঞানলাভের পরিপন্থী হয় না। নিরাসক্তভাবে কর্ম অনুষ্ঠান করলে পরম্পরাক্রমে তা তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয়। মোক্ষলাভের হেতু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেও তত্ত্বজ্ঞানী লোকহিতার্থে কর্মানুষ্ঠান করে থাকেন। জনক প্রভৃতি জ্ঞানীরা নিষ্কামকর্মের মাধ্যমে শুদ্ধচিত্ত হয়ে জ্ঞানলাভ করার পরও নানাবিধ কর্ম করেছেন।

গীতা-য় আরও বলা হয়েছে যে, সমাজব্যবস্থার জন্যও কর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন। যারা সমাজে শীর্ষস্থানীয়, তাদেরকে অন্যেরা অনুসরণ করে। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা কর্ম না করলে অন্যেরা কর্ম করবে না। সকলেই যদি কর্ম ত্যাগ করে তবে সমাজের কি দশা হবে? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আরও বলেছেন, ত্রিভুবনের মধ্যে তার অপ্রাপ্ত কিছু না থাকলেও অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য কর্ম করছেন। ভগবান্ কর্মের অতীত। তার পক্ষে কর্ম করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম না করলে তাকে অনুসরণ করে সাধারণ মানুষও কর্ম করবে না। কর্ম না করলে ভগবানের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কর্ম না করলে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হবে। তাই লোকশিক্ষার জন্য ভগবান্কেও কর্ম করতে হচ্ছে। বিহিত কর্ম না করলে ধর্মসংকর, আশ্রমসংকর ও বর্ণসংকর দেখা দেবে। ফলে সংসারে অনিষ্ট ঘটবে। এই সব কথা ভেবে স্বয়ং ভগবান্ কর্মানুষ্ঠান করছেন।

৩.৬ কর্মানুষ্ঠানের ভেদ ও পথনির্দেশ

(মূল) সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।

কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু র্লোকসংগ্রহম্।। গীতা ৩।২৫

(অনু) হে ভারত, কর্মাসক্ত অজ্ঞেরা যেমন কর্ম করে থাকে,অনাসক্ত জ্ঞানীও লোকশিক্ষার অভিলাষী হয়ে সেরূপ করবেন।

(মূল) প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।

অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।। গীতা ৩।২৭

(অনু) প্রকৃতির গুণের দ্বারা (অর্থাৎ গুণসম্ভূত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা) সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। (কিন্তু) অহঙ্কারে বিমূঢ়ব্যক্তি 'আমি কর্তা' এরূপ মনে করে।

ভগবদ্‌গীতা-র কর্মযোগ অধ্যায়ে ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই কর্ম করেন, কিন্তু উভয়ের কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দুস্তর ভেদ আছে। তিনি জ্ঞানীকে তত্ত্ববিৎ ও অজ্ঞানীকে অতত্ত্ববিৎ বলেছেন। তিনি তত্ত্ববিৎকে 'বিদ্বান্' এবং অতত্ত্ববিৎকে 'অবিদ্বান্' শব্দের দ্বারা বুঝিয়েছেন। তত্ত্ববিৎ বা জ্ঞানীর কর্মানুষ্ঠান করবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি অজ্ঞানীকে শিক্ষা দেবার জন্যেই নিজে কর্মানুষ্ঠান করেন। জ্ঞানী কর্মানুষ্ঠান না করলে অজ্ঞানীও কর্মত্যাগ করবে। এর ফলে অজ্ঞানী ব্যক্তির ক্ষতি হবে। অজ্ঞানী ব্যক্তির মনে যে অপবিত্রতা আছে তা কর্মের দ্বারাই দূর করতে হবে। তাই অজ্ঞানীকে অবশ্যই কর্মানুষ্ঠান করতে হবে। অজ্ঞানীকে কর্মে প্রেরণা দেবার জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তিরা কর্ম করে থাকেন।

জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করলেও ঐ কর্মের দ্বারা তার বন্ধন ঘটে না। কারণ তিনি অনাসক্তভাবে কর্ম করেন। তাই জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম পরিহার করা উচিত নয়। তাঁর কর্মানুষ্ঠান লোকসংগ্রহের জন্য। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, এই কর্ম তাত্ত্বিক নয়। তিনি নিজেকে কর্ত্তা মনে করে কর্ম করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি জানেন, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ,ও তমঃ গুণের দ্বারা চালিত হয়েই কাজ করছেন। জ্ঞানী গুণের ওপারে থেকেও আত্মা যে নিঃসঙ্গ তা তাঁর আচরণে শিক্ষা দেন না। এমন কি, কর্ম যে পারমার্থিক নয় একথাও তাঁর আচরণে প্রকাশ পায় না। তিনি নিরাসক্ত হয়েও শ্রেষ্ঠ আচরণ দেখানোর জন্যই কর্ম করেন।

গীতা-য় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞানী ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠানেরও বিবরণ দিয়েছেন। জ্ঞানীর কর্মাচরণ হতে অজ্ঞানীর কর্মাচরণের মধ্যে দুস্তর ভেদ আছে। জ্ঞানী ব্যক্তি পরহিতার্থে ও পরশিক্ষার্থে কর্ম করলেও অজ্ঞানী ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই কর্ম করে থাকেন। অজ্ঞানীর কর্মাচরণ বন্ধনের কারণ হয়। কারণ সে কামনাবশতঃ কর্ম করে। জ্ঞানী ব্যক্তির মত নিষ্কামভাবে সে কর্ম করে না। তাছাড়া, সে নিজেকেই কর্তা মনে করে। এই কর্তৃত্ববুদ্ধিতেই সে কর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। এই কর্তৃত্ববুদ্ধি তার বন্ধনের কারণ।

অজ্ঞানী ব্যক্তি জানে না যে, সে কর্তা নয়। এজন্য কর্মফলের দ্বারা সে লিপ্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে আত্মা নিঃসঙ্গ। কোন কিছুর দ্বারা সে লিপ্ত হয় না— একথা জ্ঞানী ব্যক্তি জানলেও অজ্ঞানী ব্যক্তি একথা না জেনে কর্ম করে। অজ্ঞানী প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ তিনটি গুণের দ্বারা চালিত হয়েই কর্ম করে। কিন্তু সে জানে না প্রকৃতির দ্বারা সে পরিচালিত হচ্ছে। অজ্ঞানী কখনও সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কর্ম করতে পারে না। জ্ঞানীর কর্মের সঙ্গে অজ্ঞানীর কর্মের এখানেই প্রভেদ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির আচরণে এরূপ ভেদ হয় কেন? কেনই বা জ্ঞানী নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারেন, আর অজ্ঞানী সকামভাবেই কর্ম করেন? **গীতায়** শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, মানুষের স্বভাবজ গুণই এর কারণ। জ্ঞানী ব্যক্তি সত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিতে রজঃ ও তমঃ গুণ থাকলেও তারা অপ্রধানভাবে থাকে। তার চিত্তে সত্ত্বগুণই প্রধান।

কিন্তু অজ্ঞানীর চিত্তে রজঃ গুণই প্রধান। সত্ত্বগুণ প্রধান থাকলে অহং বুদ্ধি থাকে না; আর রজোগুণের প্রাবল্য থাকলে অহংবুদ্ধি দেখা যায়। এই অহংবুদ্ধি নিয়ে কর্ম করে বলেই অজ্ঞানী জীব কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হয়।

অদম্য কামই অজ্ঞানী ব্যক্তির কর্মানুষ্ঠানের মূল কারণ। কাম কোনভাবে প্রতিহত হলেই অজ্ঞানীর ক্রোধ জন্মায়। এর ফলে নানা অনর্থ হয়। অজ্ঞানীর এই আচরণের মূল কারণ হল রজোঃ গুণ। জ্ঞানী ব্যক্তি রজঃ গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না বলে তিনি কামনার দ্বারা তাড়িত হন না। কাজেই তাঁর নিষ্কাম কর্মের মূলে রয়েছে তাঁর স্বভাবজ সত্ত্বগুণ। প্রত্যেকেই নিজের স্বভাবজ গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়েই কর্ম করবে এটি স্বাভাবিক নিয়ম। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তি সত্ত্বগুণের প্রভাবে নিষ্কামভাবে কর্ম করেন, আর অজ্ঞানী ব্যক্তি রজোগুণের প্রভাবে কামনাপরবশ হয়ে কর্ম করেন।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্মভেদের মূলকারণ বিশ্লেষণ করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন — প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ধর্ম পালন করা অবশ্য কর্তব্য। নিজের ধর্ম পরিহার করে অন্যের ধর্ম আচরণ করা অনর্থের কারণ হয়। স্বধর্ম আচরণ একপ্রকার সামাজিক কর্তব্য। এরূপ কর্তব্য আচরিত হলে জীবন নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্জুন ক্ষত্রিয় হওয়ায় তার ক্ষাত্রধর্ম অবশ্য কর্তব্য। তবে কামনার দ্বারা তাড়িত না হয়ে ভগবানের ওপর ফলসমর্পণ করে অর্জুনকে কর্মানুষ্ঠান হবে।

৩.৭ কাম পাপপ্রবৃত্তির মূল

(মূল) কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপ্না বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্।। গীতা ৩।৩৭

(অনু) রজোগুণ হতে উদ্ভুত এই কাম ও এই ক্রোধ দুষ্পূরণীয় ও অতি উগ্র। এখানে (মোক্ষমার্গে) কামই শত্রু জানবে।

পাপের মূল কারণ কাম এবং ক্রোধ। এই দুটিই রজঃগুন থেকে সমদ্ভুত। কামনার এতই ক্ষুধা যে কোন আহারেই এর পরিতৃপ্তি নেই। কামনা মোক্ষ পথের প্রবল শত্রু। ক্রোধ কামনারই রূপান্তর, কামনা প্রতিহত হলেই ক্রোধের উদয় হয়। বাহ্য বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হলেই তার প্রতি ইন্দ্রিয়ের একটি অনুরাগ জন্মে। তারপর ঐ বিষয় অনুপস্থিত থাকলেও মনে তার চিন্তা চলতে থাকে। এই চিন্তা থেকে সেই বস্তুর প্রতি সঙ্গ বা আসক্তি জন্মে, আসক্তি থেকে কামনার উৎপত্তি হয়, কামনা ব্যাহত হলেই ক্রোধ জন্মে। এই কামনা প্রবল শত্রু, কারণ এই কামনা সর্বপ্রকারে বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। অগ্নি যেমন সহজাত ধূমের দ্বারা আবৃত হয়, জ্ঞানও তেমনি কামনার দ্বারা আবৃত হয়। আবার দর্শন যেমন ধূলা ইত্যাদির দ্বারা আবৃত হয়, জ্ঞানও তেমনি কামের দ্বারা আবৃত হয়। ধূমের দ্বারা আবৃত হলেও বহ্নি দগ্ধ করতে পারে। দর্পণে ময়লা পড়লে প্রতিবিম্ব গ্রহণ হয় না বটে, তথাপি দর্পণে দৃষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানকে কাম এমনভাবে আবৃত রাখে যে কিছুতেই তার স্বরূপ বোঝা যায় না, ঠিক যেরূপ গর্ভ দ্বারা গর্ভস্থ শিশু আবৃত থাকে, উহার প্রসারশক্তি থাকে না। তাই কাম জ্ঞানীর চিরশত্রু। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে শত্রুর ন্যায় আচরণ করে তাকে

চিরশত্রু বলা হয়। কাম বহ্নির মতোই দুষ্পূরণীয়।অগ্নিতে যত ঘৃত দেওয়া হয় ততই উহা বাড়তে থাকে। কামও সেইরূপ উপভোগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। কামের আশ্রয় হল ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি। এগুলির দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করে রাখে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করে মন ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করে কামকে নিরাশ্রয় করা যায়। কাম নিরাশ্রয় হলে সহজে নিবৃত্ত হয়।

৩.৮ ইন্দ্রিয়সংযম কাম জয়ের হেতু

(মূল) ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্।। গীতা ৩।৪০

(অনু) ইন্দ্রিয়গুলি মন ও বুদ্ধি এর (কামের) অধিষ্ঠান কথিত হয়। এগুলির দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত করে জীবকে মোহিত করে।

(মূল) তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।

পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।। গীতা ৩।৪১

(অনু) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ এই কামকে পরিত্যাগ কর।

ইন্দ্রিয় জয়ই কাম জয়ের হেতু। ইন্দ্রিয় জয় বলতে ইন্দ্রিয় সংযমকে বোঝায়। ইন্দ্রিয় বশীভূত হলে কাম পরিহৃত হয়। পরতত্ত্বের জ্ঞান হলে ইন্দ্রিয় বশীভূত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যবিষয় হতে শ্রেষ্ঠ। কারণ এই ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা বাহ্য বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। আবার ইন্দ্রিয়গুলো হতে সূক্ষ্মতার দিক থেকে মন শ্রেষ্ঠ। আবার মনের চাইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কাজেই বুদ্ধির সাহায্যে চঞ্চল মনকে বশীভূত করা দরকার। কিন্তু বুদ্ধিও অনেকসময় ইন্দ্রিয়-মনের আকর্ষণে বিচলিত হয়ে নিম্নাভিমুখী হয়। সুতরাং বুদ্ধিরও সংযম আবশ্যক। তাই বুদ্ধিকে সংযত করতে হলে এর চেয়েও উচ্চতর শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হল আত্মা। বুদ্ধিকে চঞ্চল মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত করে আত্মাতে স্থিত করতে হবে; তবেই বুদ্ধি সংযত ও স্থির হবে। এই সংযত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়কে জয় করতে হবে। কামকে চিরতরে পরিত্যাগ করতে হলে পরমপুরুষকে জেনে তার আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

৩.৯ সারসংক্ষেপ

কর্মযোগে **গীতা-র** বক্তব্য, নিম্নাধিকারীর পক্ষে কর্ম অবশ্য করণীয়। কর্মহীনতার শিক্ষা **গীতা**-য় দেওয়া হয় নি। কর্ম কিভাবে অনুষ্ঠিত হলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয় ইহা কর্মযোগে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ পরহিতার্থে

নিষ্কামযোগীকে কর্ম করার উপদেশ দিয়েছেন। আসক্তিরহিত ও স্বার্থরহিত কর্মকে তিনি 'যজ্ঞার্থ কর্ম' বলেছেন। মানুষ স্বার্থপর হলেও পরার্থপর বুদ্ধি তাতে স্বাভাবিক ভাবেই থাকে। এই সহজাত প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ। সমাজব্যবস্থার জন্য কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন এখানে বিবৃত হয়েছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম করে থাকেন। লোকশিক্ষার জন্য স্বয়ং ভগবানকেও কর্ম করতে হয়। সংসারে ধর্মসংকর, আশ্রমসংকর ও বর্ণসংকরও যাতে না হয় তারজন্যই অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবানের এই কর্মানুষ্ঠান। এখানে আরও দেখানো হয়েছে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তির কর্মাচরণের মধ্যে দুস্তর ভেদ আছে। জ্ঞানী পরহিতার্থে ও পরশিক্ষার্থে কর্ম করলেও অজ্ঞানী স্বার্থবোধে কর্ম করেন। কাম অজ্ঞানীর সর্ববিধ পাপপ্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ - অন্তর্যামী ঈশ্বরের অধীন হয়ে 'তাঁর নিমিত্তেই কাজ করছি' এই বুদ্ধিতে সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে কর্মানুষ্ঠান করতে হবে। নিষ্কাম কর্মযোগকে লক্ষ্য রেখে যাঁরা 'আমার বাক্যে' শ্রদ্ধান্বিত হয়ে কর্ম করেন, তাঁরাও ঐ কর্ম করতে করতে কালক্রমে জ্ঞানলাভ করে মুক্ত হন। আর যাঁরা অসূয়াবশতঃ 'আমার বাক্যের' ওপর আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে জ্ঞানী না হয়েও কর্মত্যাগ করেন, তাঁরা পুরুষার্থ হতে ভ্রষ্ট হন এবং উদ্ধারের সব উপায় থেকে বঞ্চিত হন। কামে বশীভূত হয়ে কর্ম করলে বন্ধন হয়। কারণ কামনাই মোক্ষলাভের প্রধান অন্তরায়। রজোগুণ হ্রাসের ফলে কামকে জয় করা যায়। কাম পরিহার করে সদ্‌বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম করলে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম করা হয়। এভাবে কর্ম করলেই সকল প্রকার শোকবিহীন হওয়া যায়। আর বশীভূত হয়ে কর্ম করলে জয় ও পরাজয়ের জন্য হর্ষ ও শোক হবে।

৩.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

যজ্ঞার্থকর্ম

যজ্ঞার্থ কর্ম হল আসক্তিরহিত ও স্বার্থরহিত কর্ম। যে কোন ক্রিয়াকেই যজ্ঞার্থ কর্ম বলা হয় না। যে ক্রিয়ায় 'আমি কর্তা', আমি ভোক্তা' এরূপ বোধ থাকে না তা যজ্ঞার্থ কর্ম। ঈশ্বরের প্রীতিলাভের জন্য বা মানুষের সেবার জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় তাকে যজ্ঞার্থ কর্ম বলে।

নৈষ্কর্ম্য

নৈষ্কর্ম্য বলতে কর্মহীনতাকে বোঝায় না। নৈষ্কর্ম্য বলতে মোক্ষলাভের অবস্থাকে বোঝায়। **গীতা-য়** বলা হয়েছে, কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত নৈষ্কর্ম্যলাভ সম্ভব নয়। নিষ্কামভাবে কর্ম করলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং তার থেকে ক্রমে নৈষ্কর্ম্য আসে।

লোকসংগ্রহ

বিশ্বজনের কল্যাণ ও সুখকে লোকসংগ্রহ বলে। প্রগতি লোকসংগ্রহকে অপেক্ষা করে। নাগরিকত্বের ধারণা লোকসংগ্রহের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু দেশে বাস করলেই নাগরিক হওয়া যায় না। আমি দেশের ও দেশের জন্য এই ভাবনা থাকলেই প্রকৃত নাগরিক হওয়া যায়। নিষ্কামযোগীরও উদ্দেশ্য লোকসংগ্রহ।

বিদ্বান্

গীতা-য় শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ববিৎকে বিদ্বান্ বলেছেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্তভাবে অপরের কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। তিনি নিজেকে অকর্তা জেনে কর্ম করেন। তাই তার কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না।

অবিদ্বান্

গীতা-য় শ্রীকৃষ্ণ অতত্ত্ববিৎকে অবিদ্বান্ বলেছেন। অবিদ্বান্ ব্যক্তি কর্মফলের আসক্তি পরিহার করতে পারেন না। তিনি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কর্ম করেন। তিনি কর্তৃত্বাভিমান নিয়ে কর্ম করেন বলে তার কর্ম বন্ধনের কারণ হয়।

৩.১১ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Give a full account of the doctrine of *niṣkâmakarman,* after the *Bhagavadgîtâ.*

Short type

2. Distinguish between enlightened *(vidvân)* and unenlightened *(avidvân)* person.
3. What is *lokasaṁgraha*?

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

Vedavyâsa Kṛṣṇa Dvaipâyana, Bhagavadgîtâ, trans. S Radhakrishnan, Blackie & Son (India) Ltd., Calcutta, 1974.

Universal Message of the Bhagavad Gita, ed. Swami Ranganathananda, Vol-I, Advaita Ashrama, Calcutta, 2001.

শ্রীগীতা, রামদয়াল মজুমদার সম্পাদিত, প্রথম ষট্‌ক, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ১৯৯১

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, জগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯২।

অর্থসংগ্রহ

(নির্ধারিত অংশ)

প্রথম অর্ধ

পর্যায় গ্রন্থ – ২

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান

ইউনিট -১ ঃ ধর্ম ও অধর্ম

পাঠপরিকল্পনা

১.১ উপক্রমণিকা

১.১.১ মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১.১.২ মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়

১.১.৩ মীমাংসা পাঠের প্রয়োজনীয়তা

১.১.৪ 'অর্থসংগ্রহ' ও তার টীকা

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

১.৩ ধর্ম ও তার প্রকারভেদ

১.৩.১ 'ধর্ম' শব্দের নানাবিধ অর্থ

১.৩.২ ধর্ম বিচারের বিষয়

১.৩.৩ মীমাংসাদর্শনে ধর্মের ভেদ

১.৪ ধর্মের লক্ষণ

১.৪.১ লৌগাক্ষি প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ

১.৪.২ লক্ষণোক্ত 'প্রয়োজনবৎ' পদের সার্থকতা

১.৪.৩ লক্ষণোক্ত 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদের ব্যাবৃত্তি

১.৪.৪ লক্ষণোক্ত 'অর্থ' পদের তাৎপর্য

১.৪.৫ লৌগাক্ষির ধর্মলক্ষণের সাথে জৈমিনির ধর্মলক্ষণের অবিরোধ

১.৪.৬ মীমাংসা মতে ধর্মের প্রমাণ

১.৫ অধর্মের স্বরূপ

১.৬ সারসংক্ষেপ

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ উপক্রমণিকা

১.১.১ মীমাংসাদর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'মীমাংসা' শব্দের অর্থ বিচার। **পূর্বমীমাংসাদর্শনে** কর্মকাণ্ড বিষয়ক বেদবাক্যের অর্থ বিচার করা হয়েছে। জৈমিনি প্রচলিত **পূর্বমীমাংসা**দর্শনের প্রবর্তক। জৈমিনির প্রবর্তিত মীমাংসাদর্শন 'পূর্বমীমাংসা' নামে এবং বাদরায়ণ প্রবর্তিত **বেদান্তদর্শন** 'উত্তরমীমাংসা' দর্শন নামে অভিহিত হলেও বর্তমানে মীমাংসাদর্শন বলতে জৈমিনীয় দর্শনকে বোঝায়। জৈমিনির **মীমাংসাসূত্র** ১২ টি অধ্যায়ে এবং অধ্যায়গুলো ৫৯ পাদে বিভক্ত। প্রচলিত **মীমাংসাদর্শন** দ্বাদশাধ্যায়ী হলেও সংকর্ষকান্ড ধরে একে 'ষোড়শাধ্যায়ী' বলে। মীমাংসা দর্শনকে ষোড়শ লক্ষণী বলা হয়। পদার্থ যার দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় তাকে 'লক্ষণ' বলে। এই অর্থে 'লক্ষণ' শব্দটি এখানে অধ্যায়কে বোঝায়। মীমাংসাদর্শনকে 'বাক্যশাস্ত্র' বলা হয়। যেহেতু এখানে বেদবাক্যের অর্থ বিচার করা হয়েছে।

শাবরস্বামী **মীমাংসা-সূত্রে**-র ওপর শাবরভাষ্য রচনা করেছেন। **শাবরভাষ্যের** ওপর কুমারিল ভট্ট **শ্লোকবার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক** ও **টুপ্‌টীকা** লেখেন। তাঁর শিষ্য প্রভাকর মিশ্র **শাবরভাষ্যের** ওপর **বৃহতী** ও **লঘ্‌বী** টীকা লিখেছেন। কুমারিল 'বার্ত্তিককার' নামে এবং প্রভাকর 'গুরু' নামে পরিচিত। কুমারিল ভট্ট হতে প্রভাকর বহু স্থলে স্বতন্ত্র মত পোষণ করেছেন। এর ফলে উভয় মীমাংসকের অনুগামী দার্শনিকদের গ্রন্থে 'ভাট্টপ্রস্থান' ও 'প্রাভাকর প্রস্থান' নামে দুটি প্রস্থান গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে মুরারি মিশ্র নামে একজন মীমাংসক অনেক স্থলে এই দুই প্রস্থান হতে নতুন মতবাদ প্রবর্তন করেছেন। এজন্য মুরারি মিশ্রের মতকে মীমাংসার 'তৃতীয় প্রস্থান' বলে।

১.১.২ মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়

বেদার্থ বিচার করা মীমাংসা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। ধর্মের স্বরূপ, ধর্ম বা কর্মের প্রকারভেদ, মন্ত্র, বিধি, অর্থবাদ, নিষেধ, নামধেয় দ্রব্য, দেবতা, বাক্যার্থনিরূপণের পদ্ধতি প্রভৃতি **মীমাংসাদর্শনে**-র প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়।

মীমাংসাদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র, স্মৃতি ও নামধেয়ের প্রামাণ্য বিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মভেদ ও তার প্রামাণিকতা এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের ভেদ নিরূপণ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রুতি প্রমাণ, লিঙ্গপ্রমাণ, বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যা এই চারটি প্রমাণ, প্রতিপত্তি কর্ম, প্রযাজাদি অঙ্গকর্ম ও যজমানের কর্ম বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধান কর্ম ও অপ্রধান কর্মের প্রযোজকতা আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ক্রম, ক্রমের বিশেষ বিভাগ ও শ্রুতি প্রভৃতি ছটি প্রমাণ বিচার করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে যজ্ঞকর্মের অধিকারী, অধিকারীর ধর্ম, হব্যদ্রব্য, প্রায়শ্চিত্ত কর্ম, সত্র কর্ম, দেয় বস্তু ও

বিভিন্ন প্রকার অগ্নিতে হোম বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রথম ছটি অধ্যায়ে প্রকৃতি যাগ আলোচিত হয়েছে।

মীমাংসাদর্শনে-র বাকি ছটি অধ্যায়ে প্রধানত বিকৃতি যাগ আলোচিত হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে এক যজ্ঞের কর্মীর অন্য যজ্ঞে স্থানান্তরণ, অবশিষ্ট বিচার, নামের ও লিঙ্গের জন্য স্থানান্তরণ বর্ণিত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে অতিদেশ ও তার স্থানান্তরনের অপবাদ আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ঊহ সম্পর্কে প্রশ্ন ও সমাধান প্রদর্শিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে বেদী নিষ্পাদন কর্ম, বিকৃতি যাগের দক্ষিণা, নিষেধের কারণ ও নঞর্থ বিচার করা হয়েছে। এই অধ্যায়টি সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকায়। একাদশ অধ্যায়ে তন্ত্র ও আবাপ, তন্ত্রের বিস্তার ও আবাপের বিস্তার বিচার করা হয়েছে। **মীমাংসাদর্শনে**-র অন্তিম অধ্যায়ে সাধারণ ধর্মের সাথে যুক্ত নির্ণয়, সমুচ্চয় ও বিকল্প বিচারিত হয়েছে।

১.১.৩ মীমাসা পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বৈদিক ধর্ম জানার জন্য মীমাংসা শাস্ত্রের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। বৈদিক অনুষ্ঠানের তাত্ত্বিক দিক মীমাংসা শাস্ত্র হতে জানা যায়। বিরোধী শ্রুতিবাক্যের মধ্যে একবাক্যতা দেখানোর পদ্ধতি মীমাংসা দর্শন থেকেই জানা যায়। ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের অর্থ বোঝার জন্যও মীমাংসা দর্শনের অনুশীলন আবশ্যক। **মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা** প্রভৃতি কুড়িটি স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্মশাস্ত্র আছে। এই সকল স্মৃতিশাস্ত্রে নানা বিরোধী বাক্য আছে। এর ফলে ধর্মীয় কার্যের অনুষ্ঠানে অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু মীমাংসার ব্যাখ্যাশৈলীকে অবলম্বন করে এই সব বিরোধের পরিহার করা হয়। মীমাংসা শাস্ত্র নিযোজ্য পুরুষকে জাগতিক ও অতিজাগতিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেয়। প্রযোজকের অভিপ্রায় বোঝার পদ্ধতি মীমাংসা দর্শন হতে জানা যায়। বাক্যার্থ নিরূপণের পদ্ধতি সম্বন্ধে মীমাংসা দর্শনই সর্বপ্রথম আলোকপাত করে।

১.১.৪ 'অর্থসংগ্রহ' ও তার টীকা

অর্থসংগ্রহ মীমাংসাদর্শনের ভাট্টপ্রস্থানের একটি প্রকরণগ্রন্থ। শাস্ত্রের একদেশকে অবলম্বন করে কিংবা শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য মূল বিষয়কে সংক্ষেপে যে গ্রন্থে লেখা হয় তাকে প্রকরণ গ্রন্থ বলে। প্রকরণ গ্রন্থকে 'স্বতন্ত্র গ্রন্থ'ও বলা হয়। এই সব গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকারের বিশেষ অভিপ্রায় থাকে। লৌগাক্ষি ভাস্কর (১৬শ। ১৭শ শতাব্দী) এই গ্রন্থের প্রণেতা। ভাস্কর তাঁর নাম এবং লৌগাক্ষি বংশগত পদবী। এই পদবী থেকে জানা যায়, তিনি দক্ষিণ দেশীয় ছিলেন। তবে অনেকে মনে করেন, লৌগাক্ষি ভাস্কর একটি নাম। কেউ কেউ বলেন, ইনি মুদ্‌গল ভট্টের পুত্র লৌগাক্ষি ভাস্কর ভট্ট। **অর্থসংগ্রহ** ছাড়াও লৌগাক্ষি বৈশেষিক মতের অনুসরণে প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী **তর্ককৌমুদী** নামে একটি প্রকরণ গ্রন্থও রচনা করেন।

অর্থসংগ্রহ গ্রন্থের প্রকৃত শিরোনাম **পূর্বমীমাংসার্থসংগ্রহ**। একথা গ্রন্থের অন্তিম শ্লোক হতে জানা যায়। **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত নামকরণ। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে ভাট্টমত অনুসরণ করে মীমাংসার প্রতিপাদ্য বিষয় অতি সংক্ষেপে সরলভাবে পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে, গ্রন্থকার মীমাংসার প্রথম শিক্ষার্থীর জন্যই গ্রন্থটি লিখেছেন। এই গ্রন্থটি পড়লে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ও তার ইতিকর্তব্যতা সহজে জানা

যায়। তবে এখানে কখনও কখনও 'ভাবনা' প্রভৃতি মীমাংসার জটিল তত্ত্ব নিয়েও আলোচনা আছে। ভাবনার ধারণা ভাট্ট মীমাংসা সিদ্ধান্তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্য এই গ্রন্থে তা বিবেচিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। আয়তনে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থটি বিদ্বৎসমাজে সমাদৃত।

আপোদেব (১৬শ।১৭শ শতাব্দী) **মীমাংসান্যায়প্রকাশ** নামে একটি প্রকরণ গ্রন্থ লিখেছেন। এখানে গ্রন্থকার ভাট্টমত অনুসরণ করে মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের সাথে লৌগাক্ষির **অর্থসংগ্রহের** বহুলাংশে মিল আছে। লৌগাক্ষি ও আপোদেব সমসাময়িক ছিলেন। গ্রন্থটি দুটি পড়লে বোঝা যায়, একজন অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ দার্শনিক মনে করেন — আপোদেবের **মীমাংসান্যায়প্রকাশ** পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু এতে এত জটিল আলোচনা আছে যা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী নয়। এ কথা ভেবে লৌগাক্ষি আপোদেবের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু রামস্বামী প্রমুখ টীকাকারগণ মনে করেন, লৌগাক্ষি প্রথমে **অর্থসংগ্রহ** রচনা করেন এবং তা অতি সংক্ষিপ্ত বুঝে আপোদেব লৌগাক্ষির আলোচ্য বিষয় জটিল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

অর্থসংগ্রহের ওপর রামেশ্বর শিবযোগীর রচিত **মীমাংসার্থসংগ্রহকৌমুদী** একটি প্রামাণিক সংস্কৃত টীকা। এছাড়া, এই গ্রন্থের ওপর সংস্কৃতে লেখা অনেক টীকা আছে। এর মধ্যে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের **অর্থপ্রতিপাদিকা**, তাতাচার্যের **তন্ত্রপ্রকাশিকা** এবং জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের **টীকা** উল্লেখযোগ্য। ইংরাজী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। জি.থিবট্ ও এ বি গজেন্দ্রগদ্‌করের ইংরাজী অনুবাদ নির্ভরযোগ্য ও পাঠকের উপযোগী।

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

মীমাংসাদর্শন বেদার্থবিচার করে। বেদার্থ হল ধর্ম। ধর্ম স্বর্গাদি ফলের সাধন। মীমাংসা মতে বেদবিহিত সপ্রয়োজন হিতকর কর্ম হল ধর্ম। যা ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় ঐ রূপ কর্ম হল অধর্ম। স্বর্গাদি ফলের সাধন যাগাদি ধর্ম। আর অন্যের ক্ষতিসাধক অর্থাৎ শত্রুবধ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে শ্যেনাদি আভিচারিক কর্ম অধর্ম। অবৈধ হিংসা অধর্ম। ধর্মের লক্ষণ, কর্মের ভেদ, অধর্মের লক্ষণ ও ধর্মের প্রমাণ বিশ্লেষণ করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১.৩ ধর্ম ও তার প্রকারভেদ

১.৩.১ 'ধর্ম' শব্দের নানাবিধ অর্থ

ধারণার্থক 'ধৃঞ্' ধাতুর সাথে মন্ প্রত্যয়ের যোগে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন। যা ধারণ করে তাই ধর্ম। মহাভারতে বলা হয়েছে, 'ধারণাদ্ ধর্ম ইত্যাহুঃ।' ধর্ম শব্দের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সকলে অনুসরণ

করেন না। বিভিন্ন দার্শনিক ধর্ম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে থাকেন। তাই তারা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পরিহার করে পদটিকে পারিভাষিক অর্থে বুঝেছেন। কেউ আচারকে ধর্ম বলেন। কারও মতে ধর্ম আচারমূলক অর্থাৎ আচার হতে উৎপন্ন হয়। কারও মতে যা হতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয় তা-ই ধর্ম। কারও মতে চিত্তের বৃত্তি হল ধর্ম। কেউ কেউ বিশেষণ ও প্রকারকে ধর্ম বলেন। কেউ আবার শ্মশানে বৃক্ষপূজাকে ধর্ম বলেন। কেউ পুদ্‌গলকে ধর্ম বলেন। কেউ জটাধারণকে ধর্ম বলেন। কেউ মস্তক মুন্ডনকে ধর্ম বলেন। কেউ শিখাধারণকে ধর্ম বলেন। কেউ আবার বেদে উপদিষ্ট প্রয়োজন বিশিষ্ট মঙ্গলজনক কর্মকে ধর্ম বলেন।

১.৩.২ ধর্ম বিচারের বিষয়

জিজ্ঞাসা না জন্মালে কোন বিষয়ের বিচারে বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি হয় না। যে বিষয়ে সন্দেহ ও প্রয়োজন থাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয়। সন্দেহ ও প্রয়োজন জিজ্ঞাস্যত্বের ব্যাপ্ত। যে বিষয়ে সন্দেহ ও প্রয়োজন দুই-ই থাকে ঐ বিষয়ে দার্শনিক জিজ্ঞাসা হয়। কোন বিষয়ে কেবল সন্দেহ থাকলে বা কেবল প্রয়োজন থাকলে সাধারণ মানুষের প্রবৃত্তি হলেও দার্শনিকের প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই ধর্ম বিচারের বিষয় তখনই হবে যদি তার স্বরূপ সন্দিগ্ধ ও সপ্রয়োজন হয়। ধর্মকে সর্বথা অপ্রসিদ্ধ বলা চলে না। ধর্ম প্রসিদ্ধ। তবে ধর্ম প্রসিদ্ধ হলেও ধর্মের স্বরূপ নিয়ে বাদিগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এজন্য ধর্মের স্বরূপ সন্দিগ্ধ। মীমাংসা মতে ধর্ম হল স্বর্গাদি ফলের সাধন। কাজেই ধর্ম সপ্রয়োজন। ধর্ম সন্দিগ্ধ ও সপ্রয়োজন হওয়ায় মীমাংসার প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে ধর্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা জাগে। তার জন্যই ধর্মের বিচার একান্তই প্রাসঙ্গিক।

১.৩.৩ মীমাংসাদর্শনে ধর্মের ভেদ

মীমাংসা দর্শনে 'ধর্ম' শব্দটি কর্মকে বোঝায়। যাগ, হোম এবং দান এই তিনভাগে কর্ম বিভক্ত। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ত্যাগকে যাগ বলে। এটি একপ্রকার মানসিক ব্যাপার। নিজের স্বত্ব নিবৃত্তিপূর্বক দেবতার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের বোধক শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে এই মানসিক ব্যাপার ঘটে থাকে। এই যাগ 'ইন্দ্রদেবতার জন্য আমার জন্য নয়' এই মানসিক ব্যাপারকে বোঝায়। হোম ও একপ্রকার ব্যাপার এবং তা 'স্বাহা' শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়। নিজের স্বত্ব নিবৃত্তির মাধ্যমে দেবতার সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের বোধক শব্দের উচ্চারণপূর্বক এই ব্যাপার ঘটে দানকর্ম একপ্রকার ব্যাপার। এটি নিজের স্বত্ব নিবৃত্তিপূর্বক অন্যের স্বত্ব উৎপাদনের অনুকূল অন্যের হস্তে অর্পণরূপ ব্যাপারকে বোঝায়। যাগকর্ম, হোমকর্ম এবং দানকর্মের ভেদ ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উচ্চারণ থেকে ঘটে থাকে। যাগকর্মের স্থলে 'যজতি', হোমকর্মের স্থলে জুহোতি ও দান কর্মের স্থলে 'দদাতি' এরূপ ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়।

যাগের স্বরূপ ভেদ অনুসারেও মীমাংসকেরা কর্মের ভেদ দেখিয়ে থাকেন। যাগের দুটি স্বরূপ- দ্রব্য ও দেবতা। দ্রব্য এবং দেবতা প্রধান কর্মের অঙ্গ। এজন্য তাদের সম্বন্ধে যে বেদবাক্য বিধান দেয় তাকে গুণবাক্য বলে। দুটি কর্মের দ্রব্য এক হলেও দেবতা ভিন্ন হলে কর্মভেদ স্বীকার করা হয়। সেরূপ দুটি কর্মের দেবতা এক হলেও দ্রব্য ভিন্ন হলে কর্মের ভেদ হয়। দুটি কর্মের দ্রব্য এবং দেবতা দুই-ই ভিন্ন হলে কর্ম অবশ্যই ভিন্ন হয়। আর যে দুটি কর্মের দ্রব্য ও দেবতা এক সে স্থলে একটি কর্মই স্বীকৃত হয়।

মীমাংসকেরা প্রধান কর্ম ও গুণ কর্ম ভেদে কর্মের দুপ্রকার ভেদ স্বীকার করেন। প্রধান কর্মকে মুখ্য কর্ম ও অঙ্গকর্মকে গৌণকর্ম বলা হয়। অঙ্গকর্ম প্রধান কর্মের উপকার সাধন করে। অঙ্গকর্ম প্রধানত দু প্রকার — আরাদুপকারক ও সন্নিপত্যোপকারক। যাগের দ্রব্যকে উদ্দেশ্য না করে যে সব অঙ্গকর্ম বিহিত হয় তাকে আরাদুপাকারক বলে। যেমন প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি কর্ম আরাদুপকারক। আরাদুপকারক কর্ম অনুষ্ঠিত হলে একপ্রকার অপূর্ব অর্জিত হয়, পরে তা প্রধান কর্মজন্য অপূর্বের সাথে মিলিত হয়ে ফলাপূর্ব উৎপাদন করে। এই ভাবে এই অঙ্গকর্ম বহু দূরবর্তী সময়ে উপকার করে বলে একে আরাদুপকারক বলে। আর যে সব অঙ্গকর্ম যাগের দ্রব্যকে উদ্দেশ্য করে বিহিত হয় তাকে সন্নিপত্যোপকারক বলে। যেমন ব্রীহির প্রোক্ষণ (জল ছিটানো) ব্রীহির অবহনন, আহুতি প্রভৃতি। এই সন্নিপত্যোপকারক কর্ম আবার তিনপ্রকার দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ।

১.৪ ধর্মের লক্ষণ

১.৪.১ লৌগাক্ষি প্রদত্ত ধর্মের লক্ষণ

(মূল) যাগাদিরেব ধর্মঃ। তল্লক্ষণং বেদপ্রতিপাদ্যঃ প্রয়োজনবদর্থো ধর্ম ইতি।

(অনু) যাগ প্রভৃতিই ধর্ম। তার (ধর্মের) লক্ষণ -বেদবিহিত প্রয়োজন বিশিষ্ট শ্রেয়োজনক কর্ম ধর্ম।

লৌগাক্ষি ভাস্করের মতে যে কর্ম বেদে বিহিত হয়েছে এবং যে কর্মের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে এবং যে কর্ম শ্রেয়স্কর তা-ই ধর্ম। যেমন 'স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেত' অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করবে। এই বিধিবাক্যে জ্যোতিষ্ঠোম যাগই হল ধর্ম। স্বর্গাদি হল ঐ যাগের ফল। ইহা যাগের দ্বারা সাধ্য আর যাগ তার সাধন। জ্যোতিষ্টোম যাগকে ধর্ম বলা হয় কারণ এটি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বিহিত হয়েছে। এই যাগ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলাভ হয়, সুতরাং এই যাগের প্রয়োজন আছে। এই যাগ স্বর্গকামী ব্যক্তির পক্ষে হিতকর। কাজেই জ্যোতিষ্টোম যাগে ধর্মলক্ষণের সঙ্গতি আছে।

লৌগাক্ষি 'যাগাদিকে' ধর্ম বলেছেন। এখানে 'আদি' শব্দের দ্বারা দাম ও হোম এই দু শ্রেণীর কর্মকে বোঝানো হয়েছে। কাজেই যাগ কর্ম, হোমকর্ম ও দানকর্ম ধর্ম। অর্থসংগ্রহকার এখানে একটি 'এব' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। 'এব' শব্দ অযোগনিষেধ বা অন্যযোগনিষেধকে বোঝায়। এখানে অন্যনিষেধ 'এব' কারের অর্থ। যাগকর্ম, হোমকর্ম ও দানকর্মই ধর্ম, অন্য নয় — ইহাই লৌগাক্ষির অভিপ্রায়। চৈত্য বন্দনা প্রভৃতি যে ধর্ম নয় ইহা বোঝানোর জন্য এখানে 'এব' কার দেওয়া হয়েছে। কি অবৈদিক সম্প্রদায়, কি বৈদিক সম্প্রদায় যারাই যাগাদি ভিন্নকে ধর্ম বলেন মীমাংসক মতে সেটি ধর্ম নয়।

১.৪.২ লক্ষণোক্ত 'প্রয়োজনবৎ' পদের সার্থকতা

(মূল) প্রয়োজনেহতিব্যাপ্তিবা রণায় প্রয়োজনবদিতি।

(অনু) (যাগজন্য স্বর্গাদি ফলরূপ) প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি কারণের জন্য (ধর্মের লক্ষণে) 'প্রয়োজনবৎ' এই পদটি (সন্নিবিষ্ট হয়েছে)।

ধর্মের লক্ষণে 'বেদপ্রতিপাদ্য' 'প্রয়োজনবৎ' ও 'অর্থ' এই তিনটি পদ গ্রন্থকার ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে 'প্রয়োজনবৎ' পদটি ধর্মের লক্ষণে যোজনা করার উপযোগিতা এখানে আলোচনার বিষয়। লক্ষণে যদি 'প্রয়োজনবৎ' পদটি প্রযুক্ত না হত তাহলে ধর্মের লক্ষণ দাঁড়াবে — যা বেদে উপদিষ্ট ও যার দ্বারা কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় তা-ই ধর্ম। ধর্মের এরূপ লক্ষণ মানলে ধর্ম লক্ষণের স্বর্গাদি ফলে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ স্বর্গাদি বেদে উপদিষ্ট হয়েছে এবং তা পুরুষের অভিপ্রেত। কিন্তু স্বর্গাদি ফল ধর্ম নয়। এজন্যই ধর্মের লক্ষণে 'প্রয়োজনবৎ' অর্থাৎ সপ্রয়োজন পদটি দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগের ফল স্বর্গলাভ। সুতরাং জ্যোতিষ্টোম যাগ প্রয়োজনবিশিষ্ট, কিন্তু স্বর্গাদিপ্রাপ্তি জ্যোতিষ্টোম যাগের প্রয়োজন হলেও তা নিজে প্রয়োজন বিশিষ্ট নয়। স্বর্গ সুখস্বরূপ। যা দুঃখের সাথে সংভিন্ন নয়, যেখানে ইচ্ছা মাত্রেই বস্তুটি উপনীত হয় এমন নিরবচ্ছিন্ন সুখকে স্বর্গ বলে। স্বর্গের আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। 'প্রয়োজনবৎ' পদটি যোজনার ফলে স্বর্গাদি ফলে ধর্ম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গ হয় না। বস্তুতঃ প্রয়োজনে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্যই 'প্রয়োজনবৎ' পদটি দেওয়া হয়েছে।

১.৪.৩ লক্ষণোক্ত 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদের ব্যাবৃত্তি

(মূল) ভোজনাদাবতিব্যাপ্তিবারণায় বেদপ্রতিপাদ্য ইতি।

(অনু) ভোজন প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'বেদপ্রতিপাদ্য' এই পদটি (ধর্মের লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে)।

ধর্মলক্ষণে 'বেদপ্রতিপাদ্য' শব্দটি যোজনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই পদটি না দিলে সপ্রয়োজন পুরুষের ইষ্টমাত্রই ধর্ম হত। এর ফলে ভোজন প্রভৃতিতে ধর্ম লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হত, যেহেতু ভোজনাদি সপ্রয়োজন। ভোজনের ফলে ক্ষুধার নিবৃত্তি ও তৃপ্তি হয়; উহাই ভোজনের ফল। কিন্তু মানুষের অনুরাগবশতই ভোজনে প্রবৃত্তি হয়, তার জন্য বেদের বিধান নিষ্প্রয়োজন। একথা বোঝানোর জন্যই 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদটি ধর্মের লক্ষণে প্রযুক্ত হয়েছে। ভোজন প্রভৃতি ইষ্টসাধন হলেও তা বেদের দ্বারা বিহিত না হওয়ায় লক্ষণে অতিপ্রসঙ্গ হয় না।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদটি যোজনার পরও ধর্মলক্ষণের ভোজনে অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গ থেকেই যায়। কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে ভোজন সম্পর্কে কিছু বিধান দেখা যায়। স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে— নিত্য মুনির আটটি গ্রাস, অরণ্যবাসীর ষোলোটি গ্রাস, গৃহীর বত্রিশটি গ্রাস ও ব্রহ্মচারীর যেমন ইষ্ট তেমন গ্রাস ভক্ষণীয়। কাজেই এরূপ বিধান থাকায় ধর্মলক্ষণের ভোজনে অতিব্যাপ্তি রয়েই যাবে।

আমাদের, মনে হয়, মীমাংসক মতে লক্ষণে 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদটি দিলে ভোজনে অতিব্যাপ্তি কোনমতেই হবে না। কারণ ধর্ম হবে বেদবিহিত, আর ভোজনটি এখানে হয়েছে স্মৃতিবিহিত। তাছাড়া, স্মৃতিবাক্যে

ভোজনের বিধান নেই, ভোজনের গ্রাসের নিয়ম আছে।

লৌগাক্ষি 'ভোজনাদি' পদে আদি শব্দের দ্বারা ক্রীড়া প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদটি লক্ষণে প্রযুক্ত না হলে ক্রীড়া প্রভৃতিতেও ধর্মের লক্ষণের অতিপ্রসঙ্গ হয়। যেহেতু ইহা প্রয়োজন বিশিষ্ট অর্থ। প্রত্যেকেই ক্রীড়া পছন্দ করে, আর এটি লোকের মনের ক্লান্তি দূর করে, এটি তার প্রয়োজন। সুতরাং ক্রীড়া দিতে অতিব্যপ্তি কারণের জন্যও 'বেদপ্রতিপাদ্য' শব্দটি যোজনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

১.৪.৪ লক্ষণোক্ত 'অর্থ' পদের তাৎপর্য

(মূল) অনর্থফলকত্বাদনর্থভূতে শ্যেনাদাবতিব্যাপ্তিবারণায়ার্থ ইতি।

(অনু) অনর্থফলদায়ক হয় বলে অনর্থস্বরূপ শ্যেনাদি যাগে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অর্থ' পদটি (ধর্মের লক্ষণে) প্রযুক্ত হয়েছে।

ধর্মের লক্ষণে 'অর্থ' পদটি যোজনার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। লক্ষণে 'অর্থ' পদটি না দিলে 'বেদে উপদিষ্ট সপ্রয়োজন সবকিছুই' ধর্ম বলে গণ্য হবে। এর ফলে শ্যেনযাগ প্রভৃতিতে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। শ্যেনযাগ বা ঐরূপ অন্য আভিচারিক কর্ম বেদে উপদিষ্ট হয়েছে এবং অনুষ্ঠাতার কাছে এগুলির প্রয়োজনও আছে। শত্রুবধই শ্যেনযোগের ফল। কিন্তু মীমাংসকদের মতে শত্রুবধ অধর্ম, ধর্ম নয়। একথা বোঝানোর জন্যই 'অর্থ' পদটি লক্ষণে দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অনর্থের ধর্মত্ব নিবারিত হয়েছে। যা অনর্থ কিংবা অনিষ্টের সাধন অর্থাৎ যার ফল নিজে অনর্থ হয় কিংবা অনিষ্টের কারণ হয় তা বেদোক্ত হলেও ধর্ম নয়। শত্রুবধ হিংসাত্মক বলে বেদে উহা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। কাজেই শ্যেনযাগ বেদে উল্লিখিত হলেও তা যখন শত্রুবধরূপ ফলের মাধ্যমে অনর্থের কারণ হয় তখন তাকে ধর্ম বলা যায় না। বস্তুতঃ যা ধর্ম তার ফলের ফলও অনর্থ হবে না। ধর্ম কেবল প্রীতিরই কারণ হয়। সুতরাং শ্যেনযাগ বেদোক্ত হলেও ধর্ম নয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, বেদোক্ত হলেই যে তা বেদবিহিত হবে তা বলা যায় না। 'বেদপ্রতিপাদ্য' বলতে অর্থসংগ্রহকার বেদবিহিত অর্থ করেছেন। কিন্তু শ্যেনযাগ বেদে উল্লিখিত হলেও উহা বিহিত নয়। 'যজেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদি বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিত যাগ পুরুষকে স্বর্গফলের সাথে সম্বদ্ধ করে। কাজেই স্বর্গাদি ইষ্টফলের উদ্দেশ্যেই স্বর্গকামী ব্যক্তির জন্য যাগাদি বেদে উপদিষ্ট হয়েছে। যাগাদি হিতকর ক্রিয়া, ধর্ম । শ্যেন প্রভৃতি আভিচারিক কর্ম, ধর্ম নয়। ঐ সব কর্মের **অথর্ববেদে** উল্লেখ আছে, ত্রয়ীবিদ্যায় নয়। **অথর্ববেদ** চতুর্থ বেদরূপে স্বীকৃতি লাভ করলে শবরস্বামী প্রমুখ ব্যাখ্যাকারেরা ঐ সব কর্মকে বেদবিহিত না বলে বেদোক্ত বলেন। যাঁরা হিংসার মাধ্যমে পার্থিব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চান তাঁদের জন্য এই সব আভিচারিক কর্ম বেদে উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র।

১.৪.৫ লৌগাক্ষির ধর্মলক্ষণের সাথে জৈমিনির ধর্মলক্ষণের অবিরোধ

(মূল) ন চ 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম' ইতি সৌত্রতল্লক্ষণবিরোধঃ চোদনাপদস্য বিধিরূপবেদৈকদেশ পরত্বাদিতিবাচ্যম্। তত্রাপিচোদনাশব্দস্যবেদমাত্রপরত্বাৎ। বেদস্য সর্বস্য ধর্মতাৎপর্যবত্ত্বেন ধর্মপ্রতিপাদকত্বাৎ।

(অনু) 'চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ' (অর্থাৎ চোদনা বোধিত শ্রেয়স্কর যাগাদি ক্রিয়া) এই মীমাংসাসূত্রের সাথে (লৌগাক্ষির) ধর্ম লক্ষণের বিরোধ দেখা যায়, যেহেতু 'চোদনা' পদটি বেদের একাদশ প্রবর্তক বাক্যকে বোঝায়। এরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়। যেহেতু (লৌগাক্ষির মতে জৈমিনির ধর্ম লক্ষণে) 'চোদনা' শব্দটি সমস্ত বেদের বাচক। কারণ (চোদনা প্রকরণে পঠিত) সমস্ত বেদবাক্যের ধর্মে তাৎপর্য থাকায় সমস্ত বেদ ধর্মের প্রতিপাদক হয়।

সূত্রকার জৈমিনির প্রদত্ত ''চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ'' এই ধর্ম লক্ষণের সাথে লৌগাক্ষির ধর্মলক্ষণের আপাত বিরোধ দেখা যায়। এই মীমাংসাসূত্রে 'চোদনা' পদটি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু অর্থসংগ্রহকার 'চোদনা' পদের পরিবর্তে 'বেদ' পদটি দিয়েছেন। চোদনা শব্দ বেদবাক্যসমূহের একদেশকে বোঝায়, সকল বেদবাক্যকে নয়। বেদবাক্য পাঁচপ্রকার — বিধি, মন্ত্র, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ। বেদভাষ্যকার সায়ণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণকে বেদ বললেও উভয় মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। যেহেতু সায়ণের মতে বিধি, নামধেয়, নিষেধ ও অর্থবাদ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। শবরস্বামী 'চোদনা' শব্দের অর্থ করেছেন যাগের প্রবর্তক বাক্য। সুতরাং তার দ্বারা কেবল বিধিবাক্যই বিবক্ষিত হবে। এর উত্তরে লৌগাক্ষি বলেন, 'চোদনা' সমগ্র বেদকেই বোঝায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাথেও এর কোন বিরোধ নেই। কারণ এই 'চোদনা' শব্দটি যে প্রকরণে পঠিত হয়েছে. উপনিষদ্‌বাক্যসমূহ তা থেকে ভিন্ন প্রকরণে পঠিত হয়েছে। স্তুতিপর সকল বেদবাক্যেরই ধর্মে তাৎপর্য থাকায় ঐ সকল বাক্যকেও ধর্মের প্রতিপাদক বলা হয়। কাজেই ধর্মের বিধায়ক 'চোদনা' পদটির পরিবর্তে লৌগাক্ষি যে 'বেদ' পদটি ব্যবহার করেছেন তাতে কোন অসামঞ্জস্য নেই।

মূলকথা হল, বিধিবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ধর্মের প্রতিপাদক হয়। কারণ লিঙ্ প্রত্যয়ের অর্থ শাব্দী ভাবনা হল ধর্ম। কাজেই মন্ত্র, অর্থবাদ, নিষেধ ও নামধেয়ের সাক্ষাদ্‌ভাবে ধর্মে তাৎপর্য নেই। সেজন্য এই সব বাক্যের ধর্মে মহাতাৎপর্য নেই। সেজন্য এই সব বাক্যের ধর্মে মহাতাৎপর্য স্বীকার করা যাবে না। বস্তুতঃ মীমাংসকেরা মন্ত্র, নামধেয় এবং নিষেধ বাক্যের ধর্মে অবান্তর তাৎপর্য দেখান। এজন্য অর্থবাদ বিধেয় বস্তুর স্তাবক রূপে, নিষেধবাক্য নিষেধ্য বস্তুর নিবর্তকরূপে , মন্ত্রবাক্য যাগসমবেত দ্রব্য ও দেবতার প্রকাশকরূপে এবং নামধেয় বাক্য বিধেয় বিষয়ের পরিচ্ছেদকরূপে পরম্পরাক্রমে ধর্মের প্রতিপাদক হয়। এই ভাবে জৈমিনির ধর্মলক্ষণসূত্রে উক্ত 'চোদনা' পদটি সমস্ত বেদকে বোঝায়। সুতরাং জৈমিনির ধর্ম লক্ষণের সাথে লৌগাক্ষির ধর্ম লক্ষণের কোন বিরোধ নেই।

১.৪.৬ মীমাংসা মতে ধর্মের প্রমাণ

লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা কোন প্রমেয়বস্তু সিদ্ধ হয়। কেবল লক্ষণ বা কেবল প্রমাণের দ্বারা কোন বস্তু প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু লৌগাক্ষি ভাস্কর **অর্থসংগ্রহে** কেবল ধর্মের লক্ষণই বিচার করেছেন, ধর্মের সাধক কোন প্রমাণ দেখান নি। এ থেকে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মীমাংসকগণের মতে ধর্মের সাধক কোন প্রমাণ নেই।

প্রতিপক্ষীরা বলেন, ধর্মের সাধক কোন প্রমাণ নেই। প্রত্যক্ষ প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ যেমন ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ হতে পারে না, তেমনি বেদবাক্যও ধর্মের প্রমাণ হতে পারে না। শক্তিজ্ঞান ছাড়া আপ্ত পুরুষের উচ্চারিত লৌকিকবাক্যের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। লোকপ্রসিদ্ধ ঘট প্রভৃতি পদার্থেরই শক্তিজ্ঞান হয়। ধর্ম অলৌকিক বলে এ বিষয়ে শক্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। আর শক্তিজ্ঞান ব্যতিরেকে 'হুং' 'ফট্' ইত্যাদির ন্যায় বেদবাক্যও ধর্মের বোধক না হওয়ায় উহা ধর্মের প্রমাণ হতে পারে না।

এরূপ আপত্তির প্রত্যুত্তরে বলতে হবে যে, মীমাংসকেরা বেদবাক্যকে ধর্ম বিষয়ে প্রমাণ বলে থাকেন। বেদবাক্য ধর্মের স্বতঃপ্রমাণ। ধর্ম অলৌকিক বলে অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না এবং বেদ স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় তা ধর্ম বিষয়ে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করে না। ভাট্টেরা বলেন, ''চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ'' এই সূত্র হতে ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ দুই-ই পাওয়া যায়। এই সূত্রে 'চোদনালক্ষণঃ' শব্দটির দুপ্রকার অর্থ শবরস্বামী দেখিয়েছেন। ''চোদনালক্ষণং স্বরূপং যস্য'' এরূপ বিগ্রহবাক্যে বহুব্রীহি সমাস করে 'চোদনা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে ধরলে তার দ্বারা ধর্মের লক্ষণ বোধিত হবে। আর 'চোদনালক্ষণঃ' শব্দের অর্থ 'চোদনা এব লক্ষণং প্রমাণং যস্য সঃ' এরূপ অর্থ বুঝলে তা থেকে একমাত্র চোদনাই ধর্মে প্রমাণ তা প্রতিপন্ন হয়। সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনিও 'সৎসম্প্রয়োগে' ইত্যাদি মীমাংসাসূত্রে দেখিয়েছেন যে, চোদনা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণই ধর্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করতে পারে না। আবার সূত্রকার 'ঔৎপত্তিকস্তু' ইত্যাদি মীমাংসাসূত্রে উপপাদন করেছেন যে, চোদনা অবশ্যই প্রমাণ, তা অপ্রমাণ নয়। ভাষ্যকার শবরস্বামী চোদনা- সূত্রের ভাষ্যে চোদনাই যে ধর্মে প্রমাণ ও চোদনা যে ধর্মে প্রমাণ ছাড়া, অপ্রমাণ নয় তা অনাগতাবেক্ষণন্যায়ে প্রতিপাদন করেছেন। ভট্টপাদ কুমারিল প্রমুখ সকল ভাট্টগণই বেদবাক্যকে ধর্মে একমাত্র প্রমাণ বলেছেন। লৌগাক্ষি ভাস্কর একজন ভাট্টপ্রস্থানের মীমাংসক। তিনিও ধর্মের লক্ষণ নিরূপণের দ্বারা ধর্মে প্রমাণও দেখিয়েছেন। ধর্মের লক্ষণে যে 'বেদপ্রতিপাদ্য' পদটি দেওয়া আছে তা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্মের স্বরূপ কেবল বেদবাক্যের দ্বারাই নির্ণীত হয়। সুতরাং বেদবাক্যই ধর্মে একমাত্র প্রমাণ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, জৈমিনির চোদনা-সূত্রের দ্বারা বা লৌগাক্ষির ধর্ম লক্ষণের দ্বারা যদি ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ দুই-ই নিরূপিত হয় তাহলে বাক্যভেদ প্রসঙ্গ হয়। এর উত্তরে ভট্টপাদ কুমারিল **শ্লোকবার্ত্তিকে** বলেছেন, একটি সূত্রের দ্বারা ধর্মের লক্ষণ ও প্রমাণ প্রদর্শন করলেও বাক্যভেদ হয় না। ধর্মের লক্ষণ চোদনা-সূত্রটির আক্ষরিক অর্থ এবং ধর্মের প্রমাণ সূত্রটির আর্থিক অর্থ।

১.৫ অধর্মের স্বরূপ

লৌগাক্ষি **অর্থসংগ্রহে** ধর্মের স্বরূপ বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্যেনাদি আভিচারিক কর্মকে অধর্ম বলেছেন। কিন্তু তিনি অধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন নি। ধর্মের ন্যায় অধর্ম মীমাংসাশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় কিনা সেটি বিবেচ্য। অথাতো 'ধর্মজিজ্ঞাসা' এই প্রথম সূত্রে ধর্মের জিজ্ঞাসা প্রতিজ্ঞাত হয়েছে। কাজেই ধর্মের স্বরূপ, প্রকারভেদ ইত্যাদি আলোচনা মীমাংসা দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় এটি বোঝা যায়। অনেকে মনে করেন, 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' এই সূত্রে 'অথাতোঽধর্মজিজ্ঞাসা' এরূপ পাঠ বুঝে অধর্মও যে মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় তা বলা যেতে পারে।

ধর্ম যেমন বেদবিহিত, অধর্মও বেদে উল্লিখিত। ধর্ম হল শ্রেয়স্কর কর্ম। অধর্ম অঙ্গলজনক কর্ম। ধর্ম পুণ্যোৎপাদন করে, কিন্তু অধর্ম পাপ উৎপাদন করে। ধর্মজন্য অপূর্ব ও অধর্মজন্য অপূর্ব সমানভাবে শ্রেয়োজনক ফল উৎপাদন করে না। ধর্মে হিংসা থাকে না, কিন্তু অধর্মে হিংসা থাকে। অঙ্গকর্মে হিংসা থাকলেও তা অধর্ম নয়। প্রধান কর্মে হিংসা থাকলেই তাকে অধর্ম বলা হয়। কাজেই কর্মজন্য ফল বা ফলের ফলে হিংসা থাকলে তাকে অধর্ম বুঝতে হবে। প্রধান কর্মে হিংসা অবৈধ হিংসা এবং অঙ্গকর্মে হিংসা বৈধ হিংসা। অবৈধ হিংসা অধর্ম।

১.৬ সারসংক্ষেপ

'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যা ধারণ করে'। কিন্তু এটি বিভিন্ন সম্প্রদায় পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহার করেন। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে মীমাংসা পাঠেচ্ছু ব্যক্তির মনে জিজ্ঞাসা জাগে। এই জন্য মীমাংসকেরা ধর্মের স্বরূপ বিচার করেন। মীমাংসক মতে ধর্ম মানে কর্ম। যাগ, হোম ও দান এই তিনপ্রকার কর্ম মীমাংসকেরা স্বীকার করেন। দ্রব্য ও দেবতার ভেদ অনুসারে কর্মের ভেদ মীমাংসাদর্শনে মানা হয়। মীমাংসকেরা প্রধান কর্ম ও গুণকর্ম ভেদে দুপ্রকার কর্ম স্বীকার করেন। গুণকর্মকে অঙ্গকর্ম বলে। এই অঙ্গ কর্ম আবার দুপ্রকার আরাদুপকারক ও সন্নিপত্যোপকারক। লৌগাক্ষি **অর্থসংগ্রহে** বেদবিহিত প্রয়োজন বিশিষ্ট শ্রেয়োজনক কর্মকে ধর্ম বলেছেন। ভোজন, ক্রীড়া প্রভৃতি সপ্রয়োজন ও হিতকর হলেও এরা বেদবিহিত না হওয়ায় ধর্মপদবাচ্য নয়। ধর্ম স্বর্গাদি ফলের সাধন ও স্বর্গাদি যাগসাধ্য। স্বর্গাদি ফল বেদবিহিত এবং শ্রেয়োজনক হলেও তা ধর্ম নয়। কারণ স্বর্গাদির কোন প্রয়োজন নেই। যে কর্ম অনর্থ ঘটায় কিংবা যে কর্মের ফলের ফল মঙ্গলজনক নয়, তাকে মীমাংসকেরা ধর্ম বলেন না। অধর্মে হিংসা থাকে; শ্যেনাদিযাগ স্বরূপত হিংসা নয়, তার ফলে হিংসা থাকে। এ জন্য শ্যেনাদি যাগ ধর্ম নয়, অধর্ম। লৌগাক্ষির মতে ধর্ম কেবল বিধিবাক্যের দ্বারাই বিহিত হয় না। মন্ত্র, অর্থবাদ প্রভৃতি যে কোন বেদবাক্যের দ্বারাই ধর্মের বিধান দেওয়া হয়। বিধিবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ধর্মের প্রতিপাদক হয় এবং অন্য বেদবাক্য পরম্পরাক্রমে ধর্মের প্রতিপাদক হয়। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্যই ধর্মের একমাত্র প্রমাণ।

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ধর্ম মীমাংসকেরা বেদে বিহিত প্রয়োজন বিশিষ্ট যাগ, দান ও হোম এই তিনপ্রকার কর্মকে ধর্ম বলেন। ধর্ম মাত্রই শ্রেয়োজনক। ধর্ম স্বর্গাদি ফলের সাধন। যাগাদি কর্ম আশু বিনাশশীল। ইহা অপূর্বের মাধ্যমে ফলের জনক হয়।

চোদনা

ভাষ্যকার শবরস্বামীর মতে চোদনা বলতে কেবল বিধিবাক্যকে বোঝায়। কারণ প্রবর্তক বিধিবাক্যেরই সাক্ষাদ্‌ভাবে ধর্মে তাৎপর্য থাকে। লৌগাক্ষির মতে মন্ত্র, বিধি, অর্থবাদ, নিষেধ ও নামধেয় এই পাঁচপ্রকার বেদবাক্যই চোদনা শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত হয়। এদের মধ্যে বিধিবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে এবং অন্য বেদবাক্যগুলো পরম্পরাক্রমে ধর্মের প্রতিপাদক হয়।

স্বর্গ

স্বর্গ সুখস্বরূপ। পার্থিব সুখের থেকে এই সুখের ভেদ আছে। পার্থিব সুখ দুঃখমিশ্রিত ও দুঃখে তার পর্য্যবসান হয়। কিন্তু স্বর্গসুখ কোনমতেই দুঃখসংভিন্ন নয়। এই সুখের মধ্যে কোন বিরাম থাকে না। স্বর্গে সকল সুখের বস্তু ইচ্ছামাত্রই পাওয়া যায়।

সন্নিপত্যোপকারক

এটি একপ্রকার অঙ্গকর্ম। অঙ্গকর্ম প্রধান কর্মের উপকার সাধন করে। এজন্য তাকে প্রধান কর্মের উপকারক বলা হয়। যে সব অঙ্গকর্ম যাগের দ্রব্যকে উদ্দেশ্য করে বিহিত হয় তাদেরকে সন্নিপত্যোপকারক বলে। যেমন ব্রীহির প্রোক্ষণ, ব্রীহির অবহনন ইত্যাদি। সন্নিপত্যোপকারক কর্ম তিনপ্রকার দৃষ্টার্থ, অদৃষ্টার্থ ও দৃষ্টাদৃষ্টার্থ।

আরাদুপকারক

এটি একপ্রকার অঙ্গকর্ম। অঙ্গকর্ম প্রধানকর্মের উপকার সাধন করে। এই জন্য তাকে প্রধানকর্মের উপকারক বলা হয়। যে অঙ্গকর্ম যাগের দ্রব্যকে উদ্দেশ্য না করে বিহিত হয় তাকে আরাদুপকারক বলে। যেমন, প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি। আরাদুপ্রকারক কর্ম অনুষ্ঠিত হলে একপ্রকার অপূর্ব অর্জিত হয়। পরে তা প্রধানকর্মজন্য অপূর্বের সাথে মিলিত হয়ে ফলাপূর্ব উৎপাদন করে। এই অঙ্গকর্ম বহু দূরবর্তী সময়ে উপকার করে বলে একে আরাদুপকারক বলে।

১.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Explain the *lakṣaṇa* of *dharma* given in the *Arthasaṁgraha*.

Short Type

1. What is meant by *codanâ* ?
2. Distinguish between *ârâdupakâraka karman* and *sannipatyopakâraka karman.*

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

ভাস্কর লৌগাক্ষি, **অর্থসংগ্রহ**, রামচন্দ্র ঝা সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৯৯

''**অর্থসংগ্রহ**, পট্টাভিরাম শাস্ত্রী ও বাচস্পতি উপাধ্যায় কৃত টীকাসহ, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, বারাণসী ১৯৭৭.

''The Arthasamgraha of Laugaksi Bhaskara, ed. A.B Gajendragadkar & R.D Karmakar, Motilal Banarsidass,

Delhi 1998.

ইউনিট -২ ঃ বিধি ও ভাবনা

পাঠপরিকল্পনা

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

২.২ বিধিবাক্য ও তার বোধক

২.২.১ বিধিবাক্য সপ্রয়োজন

২.২.২ বিধ্যর্থের বোধক

২.৩ লৌগাক্ষি প্রদত্ত বিধির লক্ষণ

২.৪ 'দধ্না জুহোতি' ও 'সোমেন যজেত' এই বেদবাক্য দুটির বিধিবিচার

২.৫ অগ্নিহোত্র ও সোমযাগের স্বরূপ

২.৬ ভাবনা ও তার প্রকারভেদ

২.৬.১ ভাবনার বাচক

২.৬.২ লৌগাক্ষি প্রদত্ত ভাবনার লক্ষণ

২.৬.৩ শাব্দীভাবনার লক্ষণ

২.৬.৪ শাব্দীভাবনার অংশত্রয়

২.৬.৫ আর্থীভাবনার লক্ষণ

২.৬.৬ আর্থীভাবনার অংশত্রয়

২.৭ সারসংক্ষেপ

২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৯ নমুনা- প্রশ্নাবলী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম ও অধর্মের স্বরূপ জেনে অধর্ম বর্জন করে ধর্মের অনুষ্ঠান করলে পুরুষার্থ লাভ হয়। এজন্য মীমাংসকেরা বেদবাক্যকে ক্রিয়াপর বলেন। বেদবাক্য পাঁচপ্রকার হলেও তাদের মধ্যে বিধিবাক্যই

সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্রিয়াপর। ক্রিয়াপর বেদবাক্যই প্রমাণ, অন্য বেদবাক্যগুলি বিধির সাথে যুক্ত হয়ে পরম্পরাক্রমে ধর্মের প্রতিপাদক হয়। বিধির অর্থকে ভাবনা বলে। ঐ ভাবনা আবার শাব্দী ও আর্থী ভেদে দুপ্রকার। ভাট্ট মীমাংসকেরা শাব্দীভাবনাকে বাক্যার্থ বলেন। বিধিবাক্য না বুঝলে অন্য বাক্যগুলিরও ধর্মে তাৎপর্য বোঝা যাবে না। বিধিবাক্যের লক্ষণ, বিধ্যর্থের বোধক, বিধ্যর্থ ভাবনা ও তার প্রকারভেদ বিশ্লেষণ করা এই পাঠের উদ্দেশ্য।

২.২ বিধিবাক্য ও তার বোধক

২.২.১ বিধিবাক্য সপ্রয়োজন

বেদবাক্য পাঁচপ্রকার — মন্ত্র, বিধি, অর্থবাদ, নিষেধ ও নামধেয়। ধর্ম বিশ্লেষণ করা মীমাংসাশাস্ত্রের প্রয়োজন। যাগাদি ধর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হল স্বর্গাদিলাভ। বিধিবাক্যগুলির সাক্ষাৎ প্রয়োজন না থাকলেও পরম্পরাক্রমে তাদের প্রয়োজন আছে। স্বর্গাদিরূপ ফল প্রয়োজন, আর যাগাদি প্রয়োজনবান্। বিধিবাক্য সেই যাগাদি বিধানের দ্বারা প্রয়োজনবান্ হয়। অপৌরুষের বেদ হতে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের উপায় জানা যায়। প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থের জ্ঞানের উদ্দেশ্যে বেদাধ্যয়ন কর্তব্য। প্রবর্তনাবিধায়ক বিধিবাক্যগুলি অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত স্বর্গাদি ফলের উদ্দেশ্যে স্বর্গকামী ব্যক্তিকে জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ করার জন্য প্রেরণা দেয়।

২.২.২ বিধ্যর্থের বোধক

বাক্যের অর্থ সকলেই নিরূপণ করে থাকেন। তবে বাক্যার্থ নিরূপণে মীমাংসকরাই সকলের চেয়ে অধিক যত্নবান্। একটা বাক্যের অন্তর্গত পদগুলির মধ্যে কোনটির অর্থ প্রধান হবে এ নিয়ে বাদীগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মীমাংসকরা বলেন, বাক্যে ক্রিয়াপদের অর্থই প্রধান। ধাতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা একটি ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। এদের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থই প্রধান। কোনটি বিধিবাক্য ও কোন্‌টি বিধিবাক্য নয় তা প্রত্যয়ের দ্বারাই নিরূপিত হয়। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লট্, লঙ্, লুঙ্, লিঙ্, লুট, লৃট্, লোট্, লিট্, লৃঙ্ ও লেট্ — এই দশটিল-কার স্বীকার করা হয়। এদেরকে আখ্যাত বলে। প্রথম ছয়টি প্রত্যয় কালের বোধক , আর পরের চারটি বিধির বোধক। কাজেই যে বাক্যে ক্রিয়াপদ লোট্, লিঙ্,লৃঙ্ বা লেট্ এদের যে কোন একটি প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে তাকে বিধিবাক্য বলে। এই প্রত্যয়গুলি বিধ্যর্থের বোধক হয়। এছাড়াও তব্য, অনীয়র্ প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় বিধিকে বোঝায়। 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রেণ জুহুয়াৎ' এই বাক্যে 'জুহুয়াৎ' এই ক্রিয়াপদটি হু ধাতুর সাথে 'যাৎ' প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে। 'যাৎ' এই লিঙ্ প্রত্যয়টি এখানে বিধির বোধক। এই রূপ লোট্ ও লৃঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারাও বিধিকে জানা যায়। কর্তব্য, করণীয় প্রভৃতি পদগুলিও বিধিকে বোঝায়। লেট্ প্রত্যয়টি কেবল বৈদিক বিধিবাক্যেই প্রযুক্ত হতো। অনুজ্ঞাবোধক ও কর্তব্যবোধক প্রত্যয়ের দ্বারা লৌকিক বিধি জানা যায়।

২.৩ লৌগাক্ষি প্রদত্ত বিধির লক্ষণ

(মূল) তত্রাজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকো বেদভাগো বিধিঃ। স চ তাদৃশপ্রয়োজনবদর্থবিধানেনার্থবান্। তাদৃশং চার্থং প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তং বিধত্তে। যথা 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম' ইতি বিধির্মানান্তরেণাপ্রাপ্তং স্বর্গপ্রয়োজনবদ্ হোমং বিধত্তে। অগ্নিহোত্রহোমেন স্বর্গং ভাবয়েদিতি বাক্যার্থবোধঃ।

(অনু) (বেদবাক্যের) এই পাঁচপ্রকার বিভাগের মধ্যে যে বেদবাক্য (প্রমাণান্তরের দ্বারা) অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে বিধান দেয় তাকে বিধি বলে। এই বিধি অন্য প্রমাণের দ্বারা অপ্রাপ্ত প্রয়োজনবিশিষ্ট বিষয়কে বিধান দেয় (বলে) এর দ্বারা তা (নিজেও) অর্থবান হয়। যেমন 'স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করবে' এই বিধিবাক্যটি অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত স্বর্গরূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হোমের বিধান দেয়। অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা স্বর্গরূপ ফলকে ভাবনা করবে (অর্থাৎ ঐরূপ ফলের উদ্দেশ্যে যত্নশীল হবে) উক্ত বিধিবাক্যটির এরূপ অর্থ বুঝতে হবে।

বিধি, চোদনা, প্রেরণা ও উপদেশ শব্দগুলি সমার্থক। লৌগাক্ষি প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত যাগাদি ইষ্ট বস্তুর জ্ঞাপককে বিধি বলেছেন। যা লৌকিক কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না, যা কেবল ঐ বিধিবাক্য দ্বারাই জানা যায়, অথচ যা প্রয়োজনবিশিষ্ট তার বিধায়ক বাক্যকে বিধি বলে। অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপককেও বিধি বলা হয়। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ' অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করবে এই বিধিবাক্যটি যে অগ্নিহোত্র হোম করার জন্য বিধান দিচ্ছে তা অন্য প্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত এবং তার ফল স্বর্গ। এই বিধিবাক্যে অগ্নিহোত্রকে হোমের কর্ম বলা হলেও একে হোমের করণ অর্থে বুঝতে হবে। সুতরাং 'অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা স্বর্গলাভের জন্য যত্নশীল হও' এটি বিধিবাক্যের অর্থ। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিধিবাক্যে 'অগ্নিহোত্রম্' এইরূপ দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ থাকলেও তাকে 'অগ্নিহোত্রহোমেন' এই রূপ তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ বুঝলে অসঙ্গতি দেখা যাবে। কারণ, দ্বিতীয়া বিভক্তি স্বীকার করলে অগ্নিহোত্র যাগটি হবে সাধ্য আর তৃতীয়া বিভক্তি মানলে অগ্নিহোত্র হবে সাধন। এর উত্তরে টীকাকার রামস্বামী বলেন, অনুষ্ঠানের পূর্বে অগ্নিহোত্র হোমকে সাধ্য বলে বুঝতে হবে। অনুষ্ঠানের পর তাকে স্বর্গরূপ ফল লাভের সাধন বুঝলে কোন অসঙ্গতি দেখা দেবে না।

২.৪ 'দধ্না জুহোতি' ও 'সোমেন যজেত' এই বেদবাক্য দুটির বিধি বিচার

বিধির লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে লৌগাক্ষি গুণবিধির সাথে বিশিষ্ট বিধির পার্থক্য আলোচনা করেছেন। যদিও এই আলোচনা এস্থলে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী নয়, ইহা বিধির বিভাগ প্রসঙ্গে আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়; তথাপি গ্রন্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য ইহা এখানে আলোচিত হচ্ছে। যাগাদি কর্ম অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত থাকলেও যে বিধিবাক্যে ঐ প্রাপ্ত ইষ্টবস্তুর সাথে গুণাদির বিধান করা হয় তাকে গুণবিধি বলে। যেমন , 'দধ্না জুহোতি' অর্থাৎ দধির দ্বারা হোম

করবে এই বিধিবাক্যে যে হোমের উল্লেখ আছে তা 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ' এই বিধিবাক্যের দ্বারাই জানা যায়। বস্তুতঃ এই বিধিবাক্যে কেবলমাত্র দধির বিধান করা হচ্ছে। এজন্য একে 'গুণবিধি' বলে। লৌগাক্ষি বিধির আলোচনা প্রসঙ্গে উৎপত্তিবিধি ও গুণবিধির ন্যায় বিশিষ্টবিধিরও উল্লেখ করেছেন। যে বিধিবাক্যে উল্লিখিত যাগ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা যদি অপ্রাপ্ত থাকে তবে ঐ অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক বিধিকেই বিশিষ্টবিধি বলে। যেমন, 'সোমেন যজেত' এই বিধিবাক্যে যাগ ও সোম অন্যপ্রমাণের দ্বারা অজ্ঞাত থাকে। কাজেই বিধিবাক্যে সোমবিশিষ্ট যাগই বিহিত হয়েছে। বিধিবাক্যে 'সোম' শব্দটি থাকলেও তা সোমবিশিষ্ট অর্থে লক্ষণার দ্বারা বুঝতে হবে। একে গ্রন্থকার 'মত্বর্থলক্ষণা' বলেছেন। ইহা অজহল্লক্ষণার নামান্তর। একে উপাদানলক্ষণাও বলা হয়। যার দ্বারা মুখ্যার্থের সাথে অন্য লাক্ষণিক অর্থও গৃহীত হয় তাকে অজহল্লক্ষণা বলে। অর্থসংগ্রহকার আলোচ্য বিশিষ্টবিধিবাক্যটির অর্থ নিরূপণের সময় 'সোম' পদটির এরূপ লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, 'সোমেন যজেত' অর্থাৎ সোমের দ্বারা যাগ করবে এই বিধিবাক্যে যাগ এবং তার হব্য দ্রব্য সোমের উল্লেখ আছে। কাজেই এখানে একটি বাক্য থাকলেও 'সোমের দ্বারা যাগ করবে' ও 'যাগের দ্বারা ইষ্টবস্তুকে পাবার জন্য যত্নশীল হবে' এই দুটি বাক্য অভিপ্রেত। কাজেই বিধিবাক্যকে এখানে দুটি বাক্যে বুঝতে হচ্ছে। এর ফলে বাক্যভেদ দোষের প্রসঙ্গ হয়। একটি শ্রূয়মাণ বাক্যকে আবৃত্তি করে অনেক অর্থে গ্রহণ করার নাম বাক্যভেদ'। পুরুষের উচ্চারিত লৌকিক বাক্যে বাক্যভেদ তত দোষের হয় না। কারণ বক্তার অভিপ্রায় অনুসারে একটি বাক্যের একাধিক অর্থ কল্পনা করা হয়। এভাবেই শ্লেষ অলংকারের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। কিন্তু বেদের বক্তা নেই। তাই বেদের বক্তার অভিপ্রায়ও থাকতে পারে না। কাজেই বেদবাক্যের একাধিক অর্থ করতে হলে একটি অর্থ অবশ্যই পৌরুষের হবে। আর যে বাক্যটি পৌরুষেয় হবে তা বেদবাক্য না হওয়ায় অপ্রমাণ হবে। বিশিষ্টবিধিস্থলে একাধিক বাক্য মানলে এরূপ বাক্যভেদ দোষ অনিবার্য। এর উত্তরে অর্থসংগ্রহকার বলেছেন, বিশিষ্ট বিধির স্থলে একাধিক বাক্য স্বীকৃত হয় নি। বিশিষ্ট একটি বাক্য দ্বারাই এখানে বিধান দেওয়া হয়েছে। কাজেই 'সোমবিশিষ্ট যাগের দ্বারা ইষ্টবস্তুর ভাবনা করবে' এটি এখানে বিধির অর্থ।

এখানে অর্থসংগ্রহকার পুনরায় আরেকটি আপত্তি তুলেছেন, 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' অর্থাৎ 'স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগ করবে' এই বিধিবাক্যের দ্বারা যাগের বিধান করা হয় নি। বরং যাগের উপকারক সোমের বিধান করা হয়েছে এ কথা বলা যেতে পারে। কাজেই 'সোমের দ্বারা যাগ করবে' এটিই এখানে বিধিবাক্যের অর্থ হবে। 'সোমেন যজেত' এখানে অহজল্লক্ষণার মাধ্যমে বিশিষ্টবিধি স্বীকার না করে গুণবিধি স্বীকার করা সমীচীন হবে। এই আপত্তির উত্তরে অর্থসংগ্রহকার বলেছেন, ইহা অধিকারবিধি, উৎপত্তিবিধি নয়। যে বিধির দ্বারা অধিকার বিহিত হয় তাকে অধিকারবিধি বলে। ফলের সাথে ব্যক্তির সম্বন্ধ বিধান এই বিধির উদ্দেশ্য। এস্থলে স্বর্গকামী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যাগের অধিকারী। স্বর্গকামত্ব হল অধিকার। বিধির দ্বারা এই অধিকার-ই বিহিত হয়েছে।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে, 'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' এই বিধিকে অধিকারবিধি বলা

হলেও কেনই বা একে উৎপত্তিবিধি বলা যাবে না? যে বিধি যাগাদির কেবল স্বরূপকে বোঝায় তাকে উৎপত্তিবিধি বলে। এখন উৎপত্তিবিধির দ্বারা অনুষ্ঠেয় সে যাগাদি কর্ম ফলের সাথে উহার সম্বন্ধের বিধান অধিকারবিধি দিয়ে থাকে। কাজেই 'উদ্ভিদা যজেত পশুকামঃ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি পশুকামনা করে সে ওষধির দ্বারা যাগ করবে — এস্থলে যেমন উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি উভয়ই আছে সেরূপ 'জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করবে' — এস্থলেও উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি থাকুক। এই সম্ভাব্য আপত্তির উত্তরে অর্থসংগ্রহকার বলেন, অধিকারবিধি সব সময় উৎপত্তিবিধিকে অপেক্ষা করে। 'উদ্ভিদা যজেত' এস্থলে উৎপত্তিবিধি না মানলে অধিকারবিধিও অনুপপন্ন হয়। এই অনুপপত্তি হয় বলেই দৃষ্টান্তে উভয়বিধি স্বীকার করা হয়। কিন্তু জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের ক্ষেত্রে এরূপ অনুপপত্তি না থাকায় উভয়বিধি স্বীকার করা অসঙ্গ ত হবে। তাছাড়া ,'জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত' — এই বাক্যে উৎপত্তিবিধি ও অধিকারবিধি উভয়ই মানলে এই বিধির দ্বারা যাগ ও ফলের সাথে অনুষ্ঠাতা পুরুষের সম্বন্ধ বিহিত হয়েছে ইহা বুঝতে হবে। এর জন্য বাক্যান্তরের আবশ্যক হবে। এরফলে পূর্বোক্ত বাক্যভেদ দোষের আপত্তি হবে। সুতরাং 'সোমেন যজেত' এই বিধিবাক্যে অজহল্লক্ষণা স্বীকার করে উহাকে বিশিষ্টবিধি বলাই সঙ্গত হবে।

২.৫ অগ্নিহোত্র ও সোমযাগের স্বরূপ

অগ্নি, প্রজাপতি এবং সূর্যের উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্র হোম করা হত। অগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে এই হোম করা হয় বলে একে অগ্নিহোত্র বলে। বৈদিক যুগে এক বিশেষ পদ্ধতিতে যাগকর্মের জন্য অগ্নি নিষ্পাদন করা হত। অশ্বত্থ ও শমী কাষ্ঠের ঘর্ষণের ফলে অগ্নি নিষ্পাদন করা হত। একে অগ্ন্যাধান বলে। বৈদিক যাজ্ঞিকরা যজ্ঞকর্মের জন্য তিনপ্রকার অগ্নি উৎপাদন করতেন। এই তিনপ্রকার অগ্নি হল — গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণ। এছাড়াও কেউ কেউ সভ্য অগ্নি ও বিবাহের জন্য আবস্থ্য অগ্নি স্থাপন করতেন। একে বৈবাহিক অগ্নিও বলা হত। অগ্নিহোত্র হোম গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিতে করা হয়। অগ্নিহোত্রী পুরুষ যাবজ্জীবন প্রত্যহ সকালে ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্র হোম করেন। অসমর্থ হলে ত্রিশ বছর ধরে অগ্নিহোত্র হোমের বিধান আছে। যজমান নিজে পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় প্রাতঃকাল এবং সায়াহ্নে অগ্নিহোত্র হোম করেন। অন্য দিনগুলিতে অধ্বর্য্যু অথবা অগ্নিহোত্রী পুরুষের শিষ্য অগ্নিহোত্র হোম করেন। কিন্তু অগ্নিহোত্রী পুরুষ অথবা তার পত্নী ঐ সময় উপস্থিত থাকেন। দুধ, যব, দই প্রভৃতি হব্য দ্রব্য অগ্নিহোত্র হোমে আহুতি দেওয়া হয়। অগ্নিহোত্রী পুরুষ অথবা অধ্বর্য্যু অথবা শিষ্য অগ্নি রক্ষার জন্য অগ্নিতে কাষ্ঠাদি প্রদান করে থাকেন। হোম সমাপ্তির পর অবশিষ্ট দুগ্ধ প্রভৃতি অধ্বর্য্যু পান করেন।

সোম লতাকে নিষ্কাসন করে তার দ্বারা যে যাগ করা হয় তাকে সোমযাগ বলে। প্রাতঃকাল,মধ্যাহ্নকাল এবং সায়ংকালে নিষ্কাসিত সোমরসের সংস্কার করা হয়। একে সবন বলে। জ্যোতিষ্টোম একপ্রকার সোমযোগ। একাহ, অহীন ও সত্র ভেদে সোমযাগ তিনশ্রেণীর হয়। সে সোমযাগ একদিনে নিষ্পন্ন হয় তাকে একাহ, যা এগারো দিনে সম্পন্ন হয় তাকে অহীন এবং যা বারো দিনে হতে এক সহস্র বছর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় তাকে সত্র বলে। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী , অতিরাত্র , আপ্তুর্যাম এবং বাজপেয় —

এই সাত প্রকার জ্যোতিষ্টোম যাগ আছে। অগ্নিষ্টোম একশ্রেণীর একাহ জ্যোতিষ্টোম যাগ। অগ্নিষ্টোম সকল সোমযাগের প্রকৃতি। সোমযাগ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলাভ হয়।

২.৬ ভাবনা ও তার প্রকারভেদ

২.৬.১ ভাবনার বাচক

(মূল) 'যজেত' ইত্যত্রাস্ত্যংশদ্বয়ং যজিধাতুঃ প্রত্যয়শ্চ। প্রত্যয়েহপ্যস্ত্যংশদ্বয়ং আখ্যাতত্বং লিঙ্ত্বং চ। তত্রাখ্যাতত্বং দশলকারসাধারণং লিঙ্ত্বং পুনর্লিঙ্মাত্রে। উভাভ্যামপ্যংশাভ্যাং ভাবনৈবোচ্যতে।

(অনু) 'যাগ করা উচিৎ' এই ক্রিয়াপদের দুটি অংশ আছে যজ্ ধাতু ও লিঙ্ প্রত্যয়। প্রত্যয়েরও দুটি অংশ আছে আখ্যাতত্ব ও লিঙ্ত্ব। এদের মধ্যে আখ্যাতত্ব দশটি লকারেই থাকে। লিঙ্ত্ব কেবল লিঙ্ প্রত্যয়ে থাকে।

ভাট্ট মীমাংসাদর্শনে ভাবনা একটি পারিভাষিকতা। ইহা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সহজবোধ্য নয়। কিন্তু ভাবনা না বুঝলে ভাট্ট মীমাংসার অনেক কিছুই পরিস্ফুষ্ট হবে না। ভাট্ট মতে ভাবনা বিধির অর্থ, নিয়োগ নয়। ভাট্টগণ বলেন, বাক্যে ক্রিয়াপদই প্রধান। ক্রিয়াপদের দুটি অংশ থাকে — ধাতু ও প্রত্যয়। এদের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থ প্রধান। প্রত্যয়েরও আবার দুটি অংশ আছে — আখ্যাতত্ব ও লিঙ্ত্ব। উভয়ের মধ্যে লিঙের অর্থই প্রধান। যাস্ক প্রমুখ প্রাচীন বৈয়াকরণরা আখ্যাত বলতে দশটি লকারকে বুঝিয়েছেন। এই দশটি লকার হল — লট্, লিট্, লুট্,লৃট্, লঙ্, লুঙ্, লেট্, লোট্, লিঙ্ ও লৃঙ্। প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের প্রথমে 'ল' থাকার জন্য এদেরকে লকার বলে। প্রথম ছটি ক্রিয়ার কালকে ও পরের চারটি অনুজ্ঞাদিকে বোঝায়। বৈদিক বাক্যে লোট্ প্রভৃতি প্রত্যয় লিঙ্ অর্থেই ব্যবহৃত হত। রূপের দিক হতে লেট্ লট্ লকারের মতে মনে হলেও তা বস্তুত লিঙের অর্থকে বোঝায়। **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থে লৌগাক্ষি ভাস্কর 'ভাবনা' বলতে আখ্যাত ও লিঙ্ উভয়কে বুঝিয়েছেন। 'ভাবনা' শব্দের অর্থ নিয়োগ, প্রেরণা বা প্রযোজনা। 'ভূ' ধাতুর পরে ণিজন্তে যুজ্ প্রত্যয় ও তার সাথে টাপ্ প্রত্যয় যোগ করে 'ভাবনা' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। লৌগাক্ষির মতে প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব এবং লিঙ্ত্ব এই দুটি অংশই ভাবনার বোধক। আখ্যাত লকারের সামান্যতজ্ঞানকে ও লিঙ্প্রত্যয় বিধিকে বোঝায়।

২.৬.২ লৌগাক্ষি প্রদত্ত ভাবনার লক্ষণ

(মূল) ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনানুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ।

(অনু) জায়মান বস্তুর ভবনের (জননের) অনুকূল ভাবয়িতার (প্রযোজ্যের বা প্রযোজকের) ব্যাপার বিশেষকে ভাবনা বলে।

ভাট্ট মীমাংসকগণের মতে ভাবনা হল বিধির অর্থ। এই ভাবনা প্রযোজ্য ও প্রয়োজক উভয়ের মানসিক ব্যাপারকে বোঝায়। জায়মান বস্তুর উৎপত্তির অনুকূল ভাবয়িতার ব্যাপারকে ভাবনা বলে। 'ভবিতা' শব্দের

অর্থ জায়মান বস্তু, 'ভবনানুকূল' শব্দের অর্থ উৎপত্তির অনুকূল ও 'ভাবয়িতা' শব্দের অর্থ উৎপাদনকর্তা। ঐ উৎপাদন কর্তার অর্থাৎ ভাবয়িতার ব্যাপার বিশেষই ভাট্ট মতে ভাবনা।

এখানে জায়মান বস্তু বলতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতিকে বোঝায়। লৌকিক বিধিবাক্যের স্থলে প্রযোজক ব্যক্তি ভাবয়িতা হয়। ঐ পুরুষের ইচ্ছাই প্রেরণা বা প্রবর্তনা। যেমন 'বেদদত্তঃ ওদনং পচতি' অর্থাৎ 'দেবদত্ত অন্ন পাক করছে' এ স্থলে অন্নের জন্য পাকরূপ অনুকূল ক্রিয়া আবশ্যক। পাকের জন্য চেতন ব্যক্তির ব্যাপার দরকার। চেতন পুরুষের ব্যাপার ছাড়া পাক সিদ্ধ হয় না।আর পাক ছাড়া অন্ন সিদ্ধ হয় না। কাজেই দেবদত্ত অন্নের জন্য তদনুকূল পাকক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়। ইহা ঐ বাক্য থেকে বোঝা যায়। 'পচতি' এই ক্রিয়াপদের অর্থ বিক্লিত্তির অনুকূল ব্যাপার। আর 'তি' প্রত্যয়ের অর্থ দেবদত্তের প্রবৃত্তি। দেবদত্তের প্রবৃত্তির ফলেই পাক সিদ্ধ হয় এবং পাকের জন্য অন্ন উৎপন্ন হয়। কাজেই 'তি' প্রত্যয় আখ্যাতত্ব ধর্ম যুক্ত হয়ে দেবদত্তের প্রবৃত্তির বাচক হয়ে থাকে। ঐ প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভাবয়িতা পুরুষের ব্যাপারই হল ভাবনা। 'গরুটি আনয়ন কর' এইরূপ বাক্য শুনে প্রযোজ্য ব্যক্তি মনে করে 'প্রযোজক ব্যক্তির ইচ্ছা যে আমি এই গরুটি নিয়ে আসি'। এরপর ঐ প্রযোজ্য ব্যক্তিতে গরুটিকে আনার অনুকূল কৃতি বা যত্ন উৎপন্ন হয়।

লৌকিক বিধিবাক্যস্থলে 'ভাবয়িতা' বলতে প্রযোজক পুরুষকে বোঝালেও বৈদিক বাক্যস্থলে ভাবনা পুরুষনিষ্ঠ নয়। কারণ বেদবাক্যের কোন কর্তা নেই— ইহা অপৌরুষেয়। ভাট্ট মীমাংসকরা বলেন, বেদবাক্যস্থলে ভাবনা লিঙাদি প্রত্যয়নিষ্ঠ। তাই একে পুরুষনিষ্ঠ না বলে শব্দনিষ্ঠ বলা হয়। মীমাংসক মতে, বৈদিক বাক্যের স্থলে কোন প্রযোজক ব্যক্তি না থাকলেও লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের এমন শক্তি আছে যে লিঙাদি শব্দ শুনে বিধির অধীন প্রযোজ্য পুরুষের যাগাদি কর্মে মানসিক প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়।

২.৬.৩ শাব্দীভাবনার লক্ষণ

(মূল) সা দ্বিধা — 'শাব্দীভাবনা', 'আর্থীভাবনা' চেতি। তত্র পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলো ভাবয়িতুর্ব্যাপারবিশেষঃ শাব্দীভ্রবনা। সা চ লিঙ্ত্বাংশেনোচ্যতে। লিঙ্শ্রবণে 'অয়ং মাং প্রবর্তয়তি', 'মৎপ্রবৃত্ত্যনুকূলব্যাপারবানয়ম্' ইতি নিয়মেন প্রতীতেঃ। যদ্যস্মাচ্ছব্দান্নিয়মতঃ প্রতীয়তে তত্তস্য বাচ্যম্। যথা 'গামানয়' ইত্যস্মিন্ বাক্যে গোশব্দস্য 'গোত্বম্'। স চ ব্যাপারবিশেষো লৌকিকবাক্যে পুরুষনিষ্ঠোঽভিপ্রায়বিশেষঃ। বৈদিকবাক্যে তু পুরুষাভাবাল্লিঙাদিশব্দনিষ্ঠ এব। অতএব 'শাব্দীভাবনা' ইতি ব্যবহ্রিয়তে।

(অনু) সেই ভাবনা দুপ্রকার — শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনা। এদের মধ্যে পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল ভাবয়িতা অর্থাৎ প্রযোজকের ব্যাপার বিশেষকে শাব্দীভাবনা বলে এবং সেটি (শাব্দী ভাবনা) লিঙ্ত্ব অংশের দ্বারা অভিহিত হয়। লিঙ্ প্রত্যয় শ্রবণের পর 'এই ভাবয়িতা আমাকে প্রবর্তন করছে', 'ইনি আমার প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশিষ্ট' এটি নিয়মিত ভাবেই প্রতীত হয়। যেটি যে শব্দ হতে নিয়মিতভাবে প্রতীত হয় সেটি তার বাচ্য। যেমন, 'গামানয়' (গরুটিকে নিয়ে এসো)এই বাক্যে গোত্ব হল 'গো' শব্দের বাচ্য। সেই (শাব্দীভাবনারূপ) মানসিক ব্যাপার পুরুষনিষ্ঠ অভিপ্রায় বিশেষ। কিন্তু

বৈদিকবাক্যে পুরুষ না থাকায় (শাব্দীভাবনা) লিঙ্ প্রভৃতি শব্দেই থাকে। এইজন্য এটি শাব্দীভাবনা এই নামে ব্যবহৃত হয়।

লৌগাক্ষি ভাস্কর **অর্থসংগ্রহ-এ** শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনা ভেদে দু প্রকার ভাবনা স্বীকার করেছেন। প্রযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশেষকে শাব্দীভাবনা বলে। একে শব্দভাবনাও বলা হয়। এরই অপর নাম প্রর্বতনা বা বিধি। ইহা লিঙাদি প্রত্যয়ের বাচ্যার্থ। প্রেরণারূপ শব্দভাবনা থাকলে তবেই পুরুষ বৈদিক যাগাদি কর্মে কিংবা লৌকিক কর্মে যত্নশীল হয়, নচেৎ হয় না। এভাবে অন্বয়ব্যতিরেকের দ্বারা জানা যায় যে, শব্দভাবনা পুরুষের প্রযত্নের কারণ। 'যজেত' এই ক্রিয়ায় যে 'ঈত' প্রত্যয় আছে উহা লিঙ্ত্বাবচ্ছেদে শব্দভাবনার বাচক হয়। লৌকিক বাক্যের স্থলে প্রবৃত্তির অনুকূল প্রযোজনারূপ ব্যাপার প্রযোজক কর্তায় থাকে। যেমন 'গরুটি আনয়ন কর' এরূপ অনুজ্ঞাবোধক বাক্যে আনয়ন বিষয়ে প্রবৃত্তির অনুকূল ব্যাপার প্রযোজক ব্যক্তির অভিপ্রায় বিশেষ। কিন্তু বৈদিকবাক্যে কোন প্রযোজক ব্যক্তি নেই। যেহেতু উহা অপৌরুষেয়। সেজন্য যাগাদি সম্পাদনের অনুকূল প্রেরণা লিঙাদি প্রত্যয়ে থাকে ইহা বুঝতে হবে। লৌকিকস্থলে প্রেরণা পুরুষে থাকে বলে তা শব্দভাবনা নয়। বৈদিকবাক্যে ঐ প্রেরণা লিঙাদিতে থাকে বলে তাকে শব্দভাবনা বলে। তবে লৌকিক ও বৈদিক উভয়স্থলে ভাবনাকে শব্দনিষ্ঠ বললে লাঘব হয়। লৌকিক বাক্যের স্থলেও লিঙাদি প্রত্যয়ের সাথে প্রবৃত্তির অন্বয়ব্যতিরেক থাকে। লিঙাদি শব্দ ছাড়া পুরুষের অভিপ্রায়কে জানা যায় না। এজন্য লৌকিক বাক্যস্থলে ভাবনাকে শব্দনিষ্ঠ বলা অসঙ্গত হবে না। লৌকিক বিধিবাক্যে শাব্দীভাবনা নেই একথা যারা বলেন, তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ লৌকিকবাক্যে শাব্দীভাবনা না থাকলে ঐ বিধিবাক্যের প্রবর্তকত্ব ব্যাহত হবে।

২.৬.৪ শাব্দীভাবনার অংশত্রয়

(মূল) সা চ ভাবনাংশত্রয়মপেক্ষতে সাধ্যং সাধনমিতিকর্তব্যতাং চ, কিং ভাবয়েৎ, কেন ভাবয়েৎ, কথং ভাবয়েদিতি। তত্র সাধ্যাকাঙ্খায়াং বক্ষ্যমাণাংশত্রয়োপেতা আর্থীভাবনা সাধ্যত্বেনান্বেতি, একপ্রত্যয়গম্যত্বেন সমানাভিধানশ্রুতেঃ। সংখ্যাদীনামেকপ্রত্যয়গম্যত্বেপ্যযোগ্যত্বান্ন সাধ্যত্বেনান্বয়ঃ। সাধনাকাঙ্খায়াং লিঙাদিজ্ঞানং করণত্বেনান্বেতি। তস্য চ করণত্বং ন ভাবনোৎপাদকত্বেন, তৎপূর্বমপি তস্যাঃ শব্দে সত্ত্বাৎ। কিন্তু ভাবনাজ্ঞাপকত্বেন শব্দভাবনাভাব্যনির্বর্তকত্বেন বা। ইতিকর্তব্যতাকাঙক্ষায়ামর্থবাদজ্ঞা প্যপ্রাশস্ত্যমিতিকর্তব্যতাত্বেনান্বেতি।

(অনু) সেই (শাব্দীভাবনা) সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা এই তিনটি অংশকে (অর্থাৎ ধর্মকে) অপেক্ষা করে। কি ভাবনা করবে, কার দ্বারা ভাবনা করবে এবং কিভাবে ভাবনা করবে। এই তিনটি অংশের মধ্যে (শাব্দীভ্রবনার) সাধ্যের আকাঙ্খা জন্মালে বক্ষ্যমাণ অংশত্রয় বিশিষ্ট আর্থীভাবনা সাধ্যরূপে অন্বিত হয়। যেহেতু (ধর্মদ্বয়বিশিষ্ট) একই (লিঙাদি) প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় একই শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ। সংখ্যা প্রভৃতিও একই প্রত্যয়গম্য হলেও যোগ্যতা না থাকায় শাব্দীভাবনার সাথে সাধ্যরূপে তাদের অন্বয় হয় না। (শাব্দীভাবনার) সাধনের আকাঙক্ষা জন্মালে লিঙাদি প্রত্যয়ের জ্ঞান করণরূপে অন্বিত হয়। সেই লিঙাদিজ্ঞান ভাবনার উৎপাদকরূপে করণ হয় না, যেহেতু ভাবনার উৎপত্তির পূর্বেও তা শব্দে থাকে। কিন্তু

(লিঙাদির জ্ঞান) শব্দভাবনার সাধ্যের নিবর্ত্তকরূপে করণ হয়। (শাব্দীভাবনার) ইতিকর্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা হলে অর্থবাদবাক্যের দ্বারা জ্ঞাপ্য প্রাশস্ত্যই ইতিকর্তব্যতারূপে অন্বিত হয়।

'ভাব্যতে অনয়া ইতি ভাবনা' অর্থাৎ যার মধ্যে কিছু উৎপাদন করার প্রেরণা থাকে তাকে ভাবনা বলে। আর যে উৎপন্ন হবার জন্য প্রেরিত করে তাকে ভাবয়িতা বলে। ভাবয়িতার মানসব্যাপার রূপ ভাবনার তিনটি অংশ থাকে - সাধ্য, সাধন, ও ইতিকর্তব্যতা। এখানে অংশ বলতে ধর্মকে বোঝায়। যা ভাবনার কর্ম তাকে ভাব্য বলে। এই ভাব্যই হল সাধ্য। 'কিম্ ভাবয়েৎ' অর্থাৎ কি ভাবনা করবে এটি সাধ্যের পরিচায়ক। ভাব্যবস্তু উৎপাদ্য বলে তা সাধনকে অপেক্ষা করে। এর পরেই ইতিকর্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা থাকে। ইতিকর্তব্যতা শব্দের অর্থ হল কর্তব্য বিশেষ। ইহা প্রধান কর্মের উপকারক। পুরুষের প্রযত্নরূপ অর্থভাবনা হল শব্দভাবনার সাধ্য। লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের জ্ঞান শব্দভাবনার করণ। অর্থবাদবাক্যের প্রাশস্ত্যরূপ লাক্ষণিক অর্থের জ্ঞানই এখানে ইতিকর্তব্যতা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অর্থভাবনাতেও তিনটি অংশ অপেক্ষিত থাকে — সাধ্য , সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। এই তিনটি অংশযুক্ত অর্থভাবনাই শব্দভাবনার সাধ্য। লিঙ্ প্রত্যয়ের দ্বারা শব্দভাবনা এবং অর্থভাবনা এই দুটিই অভিহিত হয়। এর মধ্যে 'লিঙ্' অংশের দ্বারা শব্দভাবনা এবং 'আখ্যাত' অংশের দ্বারা অর্থভাবনা অভিহিত হয়। অর্থভাবনা যে শব্দভাবনার সাধ্য এ বিষয়ে লৌগাক্ষি 'সমানাভিধান' শ্রুতিকে প্রমাণরূপে উল্লেখ করেছেন। বিনিয়োগ বিধি প্রসঙ্গে শ্রুতি প্রমাণরূপে উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই শ্রুতিপ্রমাণে 'সমানাভিধানশ্রুতি', 'একপদশ্রুতি ও 'বিভক্তিশ্রুতি' এই তিনপ্রকার বিভাগ দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে 'সমানাভিধান-শ্রুতি' একপ্রকার প্রমাণ। অর্থভাবনা যে শব্দভাবনার সাধ্য তা এই প্রমাণ হতে সিদ্ধ হয়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, 'যজেত' এই ক্রিয়াপদে 'ঈত' প্রত্যয়ের দ্বারা লিঙ্ এবং আখ্যাত যেমন অভিহিত হয়, তেমনি সংখ্যা ও পুরুষ অভিহিত হয়। এজন্য সংখ্যা প্রভৃতিও একই প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হওয়ায় তাদেরকে শব্দভাবনার সাধ্য বলা যেতে পারে। এর উত্তরে লৌগাক্ষি বলেন, সংখ্যা প্রভৃতি শব্দভাবনার সাধ্য বলে গৃহীত হবে না। কারণ সংখ্যাদির সাধন নেই। এজন্য সাধ্য হওয়ায় মত তাদের যোগ্যতা নেই। কোন সাধনের দ্বারা যেটি নিষ্পন্ন হয় তাকে সাধ্য বলে। কৃতি একপ্রকার সাধন, যার সাথে চেতন ব্যক্তির সম্বন্ধ থাকে। যেমন কুমোরের কৃতি থেকে তন্তুসমবায় ও ঘটের কৃতি জন্মায়। এর ফলে ঘট উৎপন্ন হয়। কিন্তু সংখ্যা কখনও কৃতিসাধ্য হয় না। সংখ্যার মধ্যে একত্ব সংখ্যা কেবলান্বয়ী হয়ে থাকে, আর দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা অপেক্ষাবুদ্ধি থেকে জন্মায়। 'ঈত' প্রত্যয় থেকে সংখ্যা জানা গেলেও তা কৃতিসাধ্য না হওয়ায় সাধ্য নয়। এজন্য সংখ্যা প্রভৃতি শব্দভাবনার সাধ্য নয়।

শাব্দীভাবনার সাধ্যকে জানার পর তার সাধনকে জানার আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। 'কেন ভাবয়েৎ' অর্থাৎ কার দ্বারা যত্নশীল হবে ইহাই শাব্দীভাবনার দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা। লৌগাক্ষি লিঙাদির জ্ঞানকে শাব্দীভাবনার করণ বলেছেন। কিন্তু মীমাংসক মতে শব্দ নিত্য বলে শব্দনিষ্ঠ ভাবনাও নিত্য। এর ফলে লিঙাদি শ্রবণের পূর্বে ভাবনা থাকায় লিঙাদি তার করণ হতে পারেনা। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পূর্বে রূপাদির জ্ঞান থাকে না। কাজেই ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ রূপাদিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন করণ হয়, লিঙাদির জ্ঞান সেরূপ শব্দভাবনার করণ

হতে পারে না। লৌগাক্ষি বলেছেন, লিঙাদির জ্ঞান শব্দভাবনার সাধ্যের উৎপাদকরূপে করণ নয়, তার নিবর্তকরূপে করণ। সুতরাং লিঙাদির জ্ঞান শাব্দীভাবনার জনক নয়, তার জ্ঞাপক।

শব্দভাবনার সাধনকে জানার পর তার ইতিকর্তব্যতাকে জানার আকাঙক্ষা জন্মায়। 'ইতিকর্তব্য' এই পদটিতে 'ইতি' শব্দের অর্থ প্রকার 'কর্তব্যস্য ইতি' এই বিগ্রহবাক্যটির অর্থ হল— কি উপায়ে সাধ্য উৎপাদন করতে হবে। সাধন ও ইতিকর্তব্যতা উভয়েই সাধ্যকে উৎপাদন করেলও সাধন সাধ্যের বিশেষ করণ। যেমন — 'অন্নপ্রার্থী ব্যক্তি তন্ডুল পাক করবে' এই লৌকিক বিধিবাক্যে সাধ্য হল 'অন্নকে ভাবনা করবে' এবং সাধন হল 'পাকের দ্বারা' অন্ন উৎপাদনে যত্নশীল হবে। এর পর আরো জানার ইচ্ছা থেকে যায়, কিভাবে পাক করতে হবে। দাহ্যদ্রব্য, ফুৎকার প্রভৃতির মাধ্যমে উপকৃত পাকের দ্বারাই অন্নকে ভাবনা করবে। দাহ্যদ্রব্য প্রভৃতির দ্বারা উপকার বলতে পাকের উপায়কেই বোঝায়। বৈদিক উদাহরণস্থলে লিঙ্ প্রভৃতির জ্ঞানের দ্বারা অনেক ব্যক্তির মনে অর্থভাবনা উৎপাদন সম্ভব নাও হতে পারে। তাই সাধ্যের প্রশস্তি কিংবা ফলের মহত্ত্ব খ্যাপন করা প্রয়োজন হয়। ইতিকর্তব্যতা হল কর্তব্যবিশেষ । অর্থবাদ বাক্য শব্দভাবনার ইতিকর্তব্যতা।

২.৬.৫ আর্থীভাবনার লক্ষণ

(মূল) প্রয়োজনেচ্ছাজনিতক্রিয়াবিষয়ব্যাপার আর্থীভাবনা। সা চাখ্যাতত্বাংশেনোচ্যতে, আখ্যাতসামান্যস্য ব্যাপারবাচিত্বাৎ।

(অনু) (স্বর্গ, পুত্র প্রভৃতি) প্রয়োজনের ইচ্ছা হতে উৎপন্ন (প্রযোজ্য পুরুষের) ব্যাপার, যাতে ক্রিয়া বিষয় রূপে থাকে, তাকে আর্থীভাবনা বলে। সেই আর্থীভাবনা (প্রত্যয়ের) আখ্যাতত্ব অংশের দ্বারা অভিহিত হয়, যেহেতু সামান্যত সকল আখ্যাতই ব্যাপারবাচী।

আর্থীভাবনা হল ফলের প্রতি অনুরাগবশত যাগাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে একপ্রকার ব্যাপার। স্বর্গ, পশু, পুত্র প্রভৃতি লাভের ইচ্ছায় অনুরাগবশত নিযোজ্য পুরুষের ব্যাপারকে আর্থীভাবনা বলে। ঐ ব্যাপারে বিধেয় ক্রিয়া বিষয়রূপে ভাসমান হয়। নিযোজ্য পুরুষের এই আর্থীভাবনাকে কেউ প্রযত্ন বলেন, কেউ আবার অন্য বস্তু উৎপাদনের অনুকূলে ব্যাপার বলেন। প্রযত্ন পক্ষে, প্রযত্ন চেতনের ধর্ম হওয়ায় বাহক, অশ্ব প্রভৃতির প্রযত্নকে ধরে রথের প্রযত্ন বুঝতে হবে। ব্যাপার পক্ষে, 'রথো গচ্ছতি' এই সব প্রয়োগ অনুপপন্ন বলে মনে হবে, কারণ রথে গমন ছাড়া অন্যের উৎপাদনের অনুকূল কোন ব্যাপার নেই। গমন হল ধাতুর অর্থ, প্রত্যয়ের অর্থ নয়। এখানে রথের ব্যাপারকে অন্যভাবে বুঝতে হবে। গতির বা গমনের ফলে রথ পূর্ব এবং উত্তর দেশ বিভাজনের দ্বারা ব্যাপৃত হয়। ঐ ব্যাপার থাকলে গমনের দ্বারা রথের গ্রামপ্রাপ্তি ঘটে। এইভাবে বিশ্লেষণ করে রথের ব্যাপার বুঝতে হবে। লৌকিক ও বৈদিক উভয় বিধিবাক্যের স্থলে আর্থীভাবনা পুরুষনিষ্ঠ। প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব অংশের দ্বারা আর্থীভাবনা অভিহিত হয়। সকল আখ্যাত ক্রিয়াবাচী হওয়ায় আখ্যাতই আর্থীভাবনার বাচক হয়।

২.৬.৬ আর্থীভাবনার অংশত্রয়

(মূল) সাপ্যংশত্রয়মপেক্ষতে সাধ্যং সাধনমিতিকর্তব্যতাং চ, কিং ভাবয়েত্ কেন ভাবয়েত্, কথং ভাবয়েদিতি। তত্র সাধ্যাকাঙক্ষায়াং স্বর্গাদিফলং সাধ্যত্বেনান্বেতি। সাধনাকাঙক্ষায়াং যাগাদিঃ করণত্বেনান্বেতি। ইতিকর্তব্যতাকাঙ্খায়াং প্রযাজাদ্যঙ্গজাতমিতি কর্তব্যতাত্বেনান্বেতি।

(অনু) সেই আর্থীভাবনাও তিনটি ধর্মকে অপেক্ষা করে। যেমন সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। কি ভাবনা করবে, কার দ্বারা ভাবনা করবে এবং কিভাবে ভাবনা করবে। এই তিনটি অংশের মধ্যে সাধ্যের আকাঙক্ষায় স্বর্গাদি ফল সাধ্যরূপে অন্বিত হয়। সাধনের আকাঙক্ষায় যাগ প্রভৃতি করণরূপে অন্বিত হয়। ইতিকর্তব্যতার আকাঙক্ষায় প্রযাজ প্রভৃতি অঙ্গকর্ম ইতিকর্তব্যতারূপে অন্বিত হয়।

আর্থীভাবনার তিনটি ধর্ম আছে — সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। 'কি ভাবনা করবে' 'কার দ্বারা ভাবনা করবে' এবং 'কি উপায়ে ভাবনা করবে' এই তিনটি হল যথাক্রমে সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। আর্থীভাবনার সাধ্য কি এরূপ আকাঙক্ষা প্রথমে জন্মায়। স্বর্গ প্রভৃতি ফলকে এখানে সাধ্য বলে বুঝতে হবে। কোন ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোই হল অর্থভাবনার সাধ্য।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সাধ্য ক্রিয়াকে বোঝায়। কাজেই স্বর্গাদি ফল ও যাগ এ দুটিই এখানে সাধ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। যাগ ও স্বর্গের মধ্যে যাগই প্রত্যয়ের অর্থভাবনার নিকটতম। যেহেতু 'ঈত' প্রত্যয়ের আখ্যাত অংশের দ্বারা শব্দভাবনার সাধ্য অভিহিত হয় এবং প্রকৃতির অর্থ যাগ ও প্রত্যয়ের অর্থ ভাবনা এ দুটিই 'যজেত' ক্রিয়ার দ্বারা গৃহীত হতে পারে।

এর উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকেরা বলেন, যে একথা ঠিক যে 'যজেত' এই ক্রিয়াপদের দ্বারা যাগ ও ভাবনা উভয়কেই জানা যায়। কিন্তু যাগকে ভাবনার কর্ম বলা যাবে না। কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যাকে পাবার জন্য সবচেয়ে অধিক ইচ্ছা করে, তাকে কর্ম বলে। কাজেই স্বর্গ এখানে ইষ্টতম, যাগ নয়। কারণ ফল সুখের হলেও ফলপ্রাপ্তির সাধন দুঃখের হতে পারে। ফল পাবার ইচ্ছায় প্রেরিত হয়ে সাধন বিষয়ে ইচ্ছা জন্মায়। সাধনকে পাবার ইচ্ছা গৌণ ইচ্ছা, ফলের ইচ্ছা মুখ্য ইচ্ছা। সুতরাং ফলের ইচ্ছা ইষ্টতম বলে তাকেই সাধ্য বলতে হবে। যাগাদির ফলে স্বর্গ উৎপন্ন হয় না। স্বর্গ অনাদি। যাগাদির ফলে অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি স্বর্গ পেতে পারে এটিই এখানে বলার উদ্দেশ্য।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মীমাংসক মতে আশু বিনাশশীল যাগ অপূর্বের মাধ্যমে দূরবর্তী বা জন্মান্তরীণ স্বর্গলাভের কারণ হয়। অপূর্ব না মানলে স্বর্গলাভের প্রতি যাগ কারণই হতে পারে না। যাগাদি জন্য স্বর্গাদি লাভের কারণ এমন গুণবিশেষকে মীমাংসকগণ 'অপূর্ব' বলেন। একে বেদান্তীগণ প্রারব্ধকর্ম, নৈয়ায়িকগণ ধর্ম ও অধর্ম, বৈশেষিকরা অদৃষ্ট এবং পৌরাণিকগণ পুণ্য ও পাপ বলে থাকেন। লিঙ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের জ্ঞান শাব্দীভাবনার জ্ঞাপক করণ ও আর্থীভাবনার উপকারক করণ। আর্থীভাবনার সাধন যাগাদিও আদিষ্ট পুরুষে অর্থভাবনার জ্ঞাপকরূপে এবং অপূর্বের মাধ্যমে স্বর্গাদি ফলের উপকারকরূপে সাধন হয়ে থাকে।

অর্থভাবনার সাধন জানার পর তার ইতিকর্তব্যতা জানার আকাঙক্ষা জন্মায়। এখানে ইতিকর্তব্যতা

বলতে অঙ্গকর্মকে বোঝানো হয়েছে। অঙ্গকর্ম প্রধান কর্মের উপকারক হয়। যেমন 'স্বর্গকামী ব্যক্তি দর্শপূর্ণমাসযাগ করবে' এই বিধিবাক্যে দর্শপূর্ণমাসযাগের বিধান দেওয়া হয়েছে। 'দর্শ' অর্থাৎ অমাবস্যা ও 'পূর্ণমাস' অর্থাৎ পূর্ণিমাতে যে যাগ করা হয়, তাকে দর্শপূর্ণমাস যাগ বলে। দর্শপূর্ণমাস প্রধান যাগ। এই যাগে অগ্নিবিষ্ণু, অগ্নীষোমা, ইন্দ্রবৈমৃধ এই চারজন দেবতার উদ্দেশ্যে ঘি দিয়ে আহুতি করা হয়। এটি পুরোডাশেরই একপ্রকার অঙ্গ। প্রযাজ ও অনুযাজ যথাক্রমে দর্শপূণমাসযাগের পূর্বে ও পরে অনুষ্ঠিত হয়। 'সমিধো যজতি', 'তনূনপাতং যজতি', 'ইড়ো যজতি', 'বর্হির্যজতি, 'স্বাহাকারং যজতি' এই পাঁচটি যাগকে 'প্রযাজ' বলা হয়। দর্শপূর্ণমাসযাগ ফলবান্। যা ফলবান তাকে প্রধান বলা হয়। কিন্তু প্রধান যাগ স্বয়ং ফল সম্পাদন করতে পারে না। অঙ্গসহিত প্রধান যাগের দ্বারা ফল সম্পাদিত হয়। কাজেই প্রধান কর্ম এই সব অঙ্গকর্মকে আকাঙক্ষা করে। অন্যদিকে প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি যাগ ফলবিহীন। সুতরাং এই সব যাগও ফলকে অপেক্ষা করে। এইভাবে প্রধান অঙ্গকে এবং অঙ্গ প্রধানকে আকাঙক্ষা করে বলে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। দর্শপূর্ণমাসযাগ আর্থীভাবনার সাধন। ঐ সাধনের উপকারক প্রযাজ, অনুযাজ প্রভৃতি আর্থীভাবনার ইতিকর্তব্যতা।

২.৭ সারসংক্ষেপ

মীমাংসকরা ক্রিয়াপর বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য স্বীকার করেন। যে সব বেদবাক্য সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্রিয়াপর নয়, ক্রিয়াপর বিধিবাক্যের সাথে একবাক্যতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়। কাজেই মীমাংসা শাস্ত্রে বিধিবাক্যেরই প্রামাণ্য। প্রবর্তনা বিধায়ক বেদবাক্যকে বিধিবাক্য বলে। বিধি প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত বিষয়কে জ্ঞাপন করে। ইহা অপ্রাপ্ত বিষয়েরও প্রাপক হয়। বিধির অর্থ হল ভাবনা। মীমাংসকরা বাক্যে ক্রিয়াপদকে প্রধান বলেন। একটি ক্রিয়াপদ ধাতু ও প্রত্যয়ের দ্বারা গঠিত। উভয় অংশের মধ্যে প্রত্যয়ের অর্থই প্রধান। প্রত্যয়ের আবার আখ্যাতত্ব ও লিঙ্‌ত্ব এই দুটি অংশ আছে। এদের মধ্যে লিঙ্‌ত্ব অংশটির অর্থ প্রধান। লিঙ্ অংশের বাচ্যকে শাব্দীভাবনা ও আখ্যাত অংশের বাচ্যকে আর্থীভাবনা বলে। প্রযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল ভাবয়িতার ব্যাপারবিশেষ হল শাব্দীভাবনা। বৈদিকবাক্যে শাব্দীভাবনা শব্দনিষ্ঠ ও লৌকিক বাক্যে পুরুষনিষ্ঠ। শাব্দীভাবনার তিনটি অংশ -সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। শাব্দীভাবনার সাধ্য আর্থীভাবনা, সাধন লিঙাদির জ্ঞান ও ইতিকর্তব্যতা হল বিধেয়বস্তুর প্রশস্তি। ফলের প্রতি অনুরাগ বশতঃ যাগাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযোজ্য পুরুষের ব্যাপারকে আর্থীভাবনা বলে। একে কেউ আবার নিযোজ্য পুরুষের প্রযত্ন বলেন। ইহা লিঙ্ প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব অংশের বাচ্যার্থ। ইহা সর্বদা পুরুষনিষ্ঠ। আর্থীভাবনার তিনটি অংশ - সাধ্য, সাধন ও ইতিকর্তব্যতা। স্বর্গাদি ফল ইহার সাধ্য, যাগাদি প্রধান কর্ম তার সাধন ও অঙ্গকর্ম ইহার ইতিকর্তব্যতা।

২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

বিধি

যে বেদবাক্য প্রামাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাতবিষয় সম্বন্ধে বিধান দেয় তাকে বিধি বলে। বিধি অপ্রাপ্ত বিষয়েরও প্রাপক হয়। বিধিকে কখনও চোদনা, প্রেরণা বা উপদেশ শব্দের দ্বারাও বোঝানো হয়। লোট্, লিঙ্,লৃঙ্, লেট্, তব্য ও অনীয়র্ প্রত্যয় বিধির বোধক।

ভাবনা

ভাবনা বিধির অর্থ। এটি ভাবয়িতার ব্যাপার বিশেষ। এটি কখনও জায়মান বস্তুর উৎপত্তির অনুকূল প্রযোজকের ব্যাপার, কখনও বা প্রযোজ্যের ব্যাপারকে বোঝায়। লিঙাদি প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব অংশ এবং লিঙ্ত্বাদি অংশ উভয়ের দ্বারা ভাবনা অভিহিত হয়।

শাব্দীভাবনা

প্রযোজ্য পুরুষের প্রবৃত্তির অনুকূল প্রযোজকের ব্যাপারবিশেষকে শাব্দীভাবনা বলে। একে শব্দভাবনাও বলা হয়। ইহা প্রত্যয়ের লিঙ্ত্ব অংশের দ্বারা অভিহিত হয়। শব্দভাবনা থাকলে তবেই পুরুষ যাগাদি বৈদিক কর্মে কিংবা লৌকিক কর্মে যত্নশীল হয়, নচেৎ হয় না। বৈদিক বাক্যস্থলে শাব্দীভাবনা শব্দনিষ্ঠ, লৌকিকবাক্যের স্থলে তা পুরুষনিষ্ঠ।

আর্থীভাবনা

ফলের প্রতি অনুরাগবশতঃ যাগাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযোজ্য পুরুষের ব্যাপারকে আর্থীভাবনা বলে। একে কেউ নিযোজ্য পুরুষের প্রযত্ন বলেন। আবার কেউ একে তার ব্যাপার বলেন। লিঙ্ প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব অংশের দ্বারা আর্থীভাবনা অভিহিত হয়। আর্থীভাবনা সবসময় পুরুষনিষ্ঠ হয়।

ইতিকর্তব্যতা

ইতিকর্তব্যতা হল কর্তব্যতা বিশেষ। ইহা সাধনের উপকারক হয়। সাধন প্রধান কর্তব্য, ইতিকর্তব্যতা অপ্রধান কর্তব্য। শাব্দীভাবনার স্থলে বিধেয় বস্তুর প্রাশস্ত্য লিঙাদি জ্ঞানের সহায়ক হয়। আর্থীভাবনার স্থলে অঙ্গকর্মগুলো প্রধান কর্মের ইতিকর্তব্যতা।

২.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Explain *œâbdîbhâvanâ* and its three constitutents.

Short Type

1. Explain the *lakṣaṇa* of *vidhi* given in the *Arthasaṁgraha*

2. What is *agnihotra* sacrifice?

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

ভাস্কর লৌগাক্ষি, **অর্থসংগ্রহ**, রামচন্দ্র ঝা সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৯৯

''**অর্থসংগ্রহ**, পট্টাভিরাম শাস্ত্রী ও বাচস্পতি উপাধ্যায়কৃত টীকা সহ, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, বারাণসী, ১৯৭৭

"The Arthasamgraha of Laugaksi Bhaskara, ed. A. B. Gajendragadkar & R. D. Karmakar, Motilal Banarsidass, Delhi 1998.

ইউনিট - ৩ ঃ বিধির বিভাগ, নিষেধ ও অর্থবাদ

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য

৩.২ লৌগাক্ষিসম্মত বিধির বিভাগ

- ৩.২.১ উৎপত্তিবিধির স্বরূপ ও তার বিচার
- ৩.২.২ বিনিয়োগবিধির লক্ষণ সমীক্ষা
- ৩.২.৩ প্রয়োগবিধির স্বরূপ ও তার বিশ্লেষণ
- ৩.২.৪ অধিকারবিধি ও কর্মভেদে অধিকারভেদ

৩.৩ বিধির বৈকল্পিক বিভাগ

- ৩.৩.১ নিয়মবিধির স্বরূপ ও বিচার
- ৩.৩.২ পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাতে দোষ

৩.৪ নিষেধের স্বরূপ ও বিচার

- ৩.৪.১ নিষেধের লক্ষণ বিশ্লেষণ
- ৩.৪.২ শাব্দীভাবনাতে নঞর্থের অন্বয়

৩.৫ অর্থবাদের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

- ৩.৫.১ অর্থবাদের লক্ষণ
- ৩.৫.২ অর্থবাদের প্রকারভেদ

৩.৬ সারসংক্ষেপ

৩.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য :

মন্ত্রবাক্য, অর্থবাদবাক্য, নিষেধবাক্য ও নামধেয়বাক্য স্বরূপতঃ ক্রিয়াহীন ও নিষ্প্রয়োজন মনে হলেও বিধির সাথে একবাক্যতা প্রাপ্ত হয়ে এরা ক্রিয়াপর ও সপ্রয়োজন হয়। এজন্য মীমাংসকরা বিধিবাক্য বিশ্লেষণে সবচেয়ে বেশি যত্নশীল হয়েছেন। কতগুলো বিধিবাক্য অজ্ঞাত বিষয়কে জ্ঞাপনা করে, কতগুলো বিধেয় বস্তুর গুণকে, কোন কোন বিধিবাক্য অঙ্গকর্মগুলির ক্রমকে, কোনটি অঙ্গকর্মের সাথে প্রধানকর্মের সম্বন্ধকে, কোনটি আবার ফলের ভোক্তৃত্বকে বিধান দেয়। তাই বিধিবাক্যগুলোর মধ্যে প্রকারগত নানা ভেদ আছে। যে বেদবাক্য অনর্থজনক কর্ম হতে পুরুষকে নিবৃত্ত করে তাকে নিষেধবাক্য বলে। লিঙর্থ শাব্দীভাবনার সাথে নঙর্থের অন্বয় হয়। আর যে বেদবাক্যে বিধেয় পদার্থের প্রশংসা ও নিন্দা করা হয় তাকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদবাক্য স্বয়ং প্রমাণ না হলেও বিধিশেষ ও নিষেধশেষরূপে প্রমাণ হয়ে থাকে। বিধির বিভাগ, নিষেধের স্বরূপ এবং অর্থবাদের স্বরূপ ও বিভাগ বিশ্লেষণ করা এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.২ লৌগাক্ষিসম্মত বিধির বিভাগ

৩.২.১ উৎপত্তিবিধির স্বরূপ ও তার বিচার

(মূল) বিধিশ্চতুর্বিধঃ — উৎপত্তিবিধিঃ, বিনিয়োগবিধিঃ, অধিকারবিধিঃ, প্রয়োগবিধিশ্চেতি। তত্র কর্মস্বরূপমাত্রবোধকো বিধিরুৎপত্তিবিধিঃ। যথা 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি। অত্র চ বিধৌ কর্মণঃ করণত্বেনান্বয়ঃ। 'অগ্নিহোত্রহোমেনেষ্টং ভাবয়েৎ' ইতি।

(অনু) বিধি চারপ্রকার — উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি ও প্রয়োগবিধি। এদের মধ্যে (চারপ্রকার বিধির মধ্যে) যে বিধি কেবল (যাগাদি) কর্মের স্বরূপকে বোঝায় তাকে উৎপত্তিবিধি বলে। যেমন 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' (অর্থাৎ অগ্নিহোত্রযাগ করবে)। এই বিধিতে (ধাত্বর্থ) কর্মের করণরূপে অন্বয় হবে। অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা ইষ্টকে ভাবনা করবে (এটি বাক্যার্থ)।

অর্থসংগ্রহকার বিধির লক্ষণ আলোচনা প্রসঙ্গে উৎপত্তিবিধি, গুণবিধি ও বিশিষ্টবিধি এ তিনপ্রকার বিধি উল্লেখ করেচেন। এরপর তিনি বিধির চারপ্রকার বিভাগ আলোচনা করেন, উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি ও প্রয়োগবিধি। গ্রন্থের শেষভাগে নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি এই দু প্রকার বৈকল্পিক বিভাগ স্বীকার করেছেন। অপূর্ববিধির উল্লেখ না থাকলেও তিনি তা স্বীকার করতেন। সম্ভবত তিনি অপূর্ববিধিকে প্রয়োগবিধির অর্ন্তগত মনে করেন। অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন, উৎপত্তিবিধি প্রভৃতি চারপ্রকার বিধির প্রত্যেকটি আবার অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা ভেদে তিন প্রকার।

উৎপত্তিবিধিতে উৎপত্তি কথার অর্থ সাধন। সাধনের স্বরূপের বোধক বিধিকে উৎপত্তিবিধি বলে। স্বর্গের সাধন যাগ। যে উদ্দেশ্যে যার বিধান দেওয়া হয় তা হল সেই উদ্দিষ্টের সাধন। উদ্দিষ্ট হল প্রয়োজন এবং সাধন হল বিধেয়। উৎপত্তিবিধি বিধেয় যাগের স্বরূপের বোধক। লক্ষণোক্ত কর্ম শব্দের অর্থ যাগাদি। যাগাদির কেবল স্বরূপ উৎপত্তি বিধিতে বিশ্লেষণ করা হয়। উৎপত্তিবিধির দৃষ্টান্ত হল — ''অগ্নিহোত্রং জুহোতি'' অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোম করবে। লক্ষণোক্ত 'মাত্র' পদটির বিশেষ তাৎপর্য আছে। অধিকারবিধি হতে উৎপত্তিবিধির পার্থক্য 'মাত্র' পদের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। অধিকারবিধি কর্মস্বরূপ ও ফলসম্বন্ধের বোধক, আর উৎপত্তিবিধি কেবল কর্মস্বরূপের বোধক। যদিও ''অগ্নিহোত্রং জুহোতি'' এই বিধিবাক্যে অগ্নিহোত্র যাগকে কর্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি তার অর্থ করণরূপে বুঝতে হবে। অগ্নিহোত্র হোমের দ্বারা ইষ্টবস্তু ভাবনা কর এটি এই বিধিবাক্যের অর্থ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' — এই বিধিবাক্যে কেন 'হোমকে ভাবনা করবে' না বলে 'ইষ্টকে ভাবনা করবে' বলা হল? ভাবনার তিনটি অংশের মধ্যে সাধ্যের আকাঙ্ক্ষাই প্রথমে হয়। এই ভাবনায় ধাত্বর্থ সন্নিহিত। কাজেই ধাতুর অর্থ হোমকে ভাবনার সাধ্য বলা হোক্। এর উত্তরে ভাট্ট মীমাংসকরা বলেন, উক্ত বিধিবাক্যে হোম ভাবনার সাধ্য নয়, ইষ্ট ভাবনার সাধ্য। 'ইষ্ট' বলতে স্বর্গাদি ফলকে বোঝানো হয়েছে। একথা ঠিক যে, ধাত্বর্থ ভাবনার সন্নিহিত এবং স্বর্গাদি ফল ব্যবহিত। কিন্তু স্বর্গাদির মত ধাত্বর্থ পুরুষার্থ নয়। 'স্বর্গ আমার হোক্' এটা লোকে কামনা করে। কিন্তু 'যাগ আমার হোক্' এরূপ কামনা কেউ করে না।

এখানে পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে, 'ব্রীহিভি র্যজেত' ও 'দধ্না জুহোতি' এই সব বিধিবাক্যের স্থলে 'যাগকে ভাবনা করবে', 'হোমকে ভাবনা করবে' এরূপ ধাত্বর্থকেই সাধ্য বলা হয়েছে। এর ফলে ধাত্বর্থ পুরুষার্থ হবে। কিন্তু 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই স্থলে ধাত্বর্থকে অপুরুষার্থ বলা হয়। কাজেই ধাত্বর্থ কখনও পুরুষার্থ, কখনও অপুরুষার্থ হচ্ছে। এর সমাধানে বলা যেতে পারে যে, একটি উৎপত্তিবিধি, আর একটি গুণবিধি হওয়ায় সাধ্যের এরূপ ভেদ দেখা যায়। গুণবিধিতে ধাত্বর্থ অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত থাকে। আর উৎপত্তিবিধিতে ধাত্বর্থটি অপ্রাপ্ত থাকে। প্রাপ্তের অনুবাদ ও অপ্রাপ্তের বিধান এটি উভয়বিধির ভেদ। সুতরাং যে উৎপত্তিবিধিবাক্যে ফল উল্লিখিত থাকে সেখানে তাকে সাধ্য বলে বুঝতে হবে। আর যে উৎপত্তিবিধিবাক্যে ফলের উল্লেখ থাকে না, সেখানে 'ইষ্ট' পদটি অধ্যাহার করে সাধ্য বুঝতে হবে, ধাত্বর্থকে নয়।

(মূল) ননু যাগস্য দ্বে রূপে দ্রব্যং দেবতা চ। তথা চ রূপাশ্রবণে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি কথমুৎপত্তিবিধিঃ। অগ্নিহোত্রশব্দস্য তু তৎপ্রখ্যন্যায়েন নামধেয়ত্বাদিতি চেৎ। ন। রূপাশ্রবণেঽপ্যস্যোৎপত্তিবিধিত্বাৎ। অন্যথা রূপশ্রবণাৎ 'দধ্না জুহোতি' ইত্যয়মেবোৎপত্তিবিধিঃ স্যাৎ। তথা চ 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইতি বাক্যমনর্থকং স্যাৎ।

(অনু) আচ্ছা, যাগের দুটি স্বরূপ — দ্রব্য ও দেবতা। কাজেই স্বরূপের উল্লেখ না থাকায় 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' অর্থাৎ অগ্নিহোত্র হোম করবে এটি কিভাবে উৎপত্তিবিধি হবে? 'তৎপ্রখ্যন্যায়' অনুযায়ী অগ্নিহোত্র শব্দ কর্ম নামধেয় (বুঝতে হবে)। এরূপ শঙ্কা অমূলক। কারণ স্বরূপের উল্লেখ না থাকলেও ('অগ্নিহোত্রং জুহোতি') এই বাক্যটি উৎপত্তিবিধিই হবে। নতুবা, স্বরূপের উল্লেখ থাকায় 'দধ্না জুহোতি' এই বাক্যটি উৎপত্তিবিধি হবে। এর ফলে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি অনর্থক হয়ে পড়বে।

এখানে পূর্বপক্ষী আপত্তি করে থাকেন যে, দ্রব্য ও দেবতা এই দুটি যাগের স্বরূপ। প্রধান যাগের কেবল স্বরূপ যদি উৎপত্তিবিধি বিশ্লেষণ করে তাহলে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বিধিবাক্যটিকে উৎপত্তিবিধি বলা যাবে না। এখানে অগ্নিহোত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয় নি। কারণ এখানে দ্রব্য বা দেবতা কোনটির উল্লেখ নেই, বরং 'তৎপ্রখ্যন্যায়' অনুসারে অগ্নিহোত্র শব্দটিকে কর্মের নামধেয় বলা সঙ্গত হবে। যে গুণ বিধান করার ইচ্ছা হবে, তার প্রাপক যদি ভিন্ন শাস্ত্রবচন থাকে তাকে 'তৎপ্রখ্য' বলে। ঐ ভিন্ন শাস্ত্রবচনের দ্বারা যখন গুণের প্রাপ্তি হয় তখন তাকে নামধেয় বলে। অগ্নিহোত্র শব্দের দ্বারা অগ্নিদেবতাকে বুঝতে হবে। 'অগ্নির্জ্যোতি র্জ্যোতিরগ্নিঃস্বাহা' এই মন্ত্রের দ্বারা প্রাপ্ত থাকায় 'অগ্নিহোত্র' শব্দটি এখানে কর্মের নামধেয়। আপত্তিকারীর বক্তব্য, 'যাতে অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে হোম হয় তা অগ্নিহোত্র' এরূপ যৌগিক অর্থানুযায়ী অগ্নিহোত্র শব্দকে কর্মের নামধেয় বললে অপ্রসিদ্ধ কল্পনা হয় না। কাজেই 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি উৎপত্তিবিধি নয়।

এই আপত্তির উত্তরে লৌগাক্ষি বলেছেন, 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যে যাগের স্বরূপ উল্লিখিত না হলেও তা অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারা কল্পিত হবে। কাজেই দ্রব্য-দেবতার উল্লেখ না থাকলেও প্রধানত হোমকর্মের স্বরূপমাত্রের বোধক হওয়ায় এই বাক্যটিকে উৎপত্তিবিধি বলা সঙ্গত হবে। যদি এই বাক্যটিকে উৎপত্তিবিধি না বলা হয়, তাহলে 'দধ্না জুহোতি'-এই বাক্যটিকে উৎপত্তিবিধি বলতে হয়, যেহেতু এখানে যাগের স্বরূপের উল্লেখ আছে। আর 'দধ্না জুহোতি' এই বাক্যটিকে উৎপত্তিবিধি বললে 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এই বাক্যটি নিরর্থক হয়ে পড়বে।

এই উৎপত্তিবিধিকে অনেক মীমাংসক ফলবিধি বলে থাকেন। লৌগাক্ষি আবার অপূর্ববিধিকে উৎপত্তিবিধির অন্তর্গত বলেছেন।

৩.২.২ বিনিয়োগবিধির লক্ষণ সমীক্ষা

(মূল) অঙ্গপ্রধানসংবন্ধবোধকো বিধির্বিনিয়োগবিধিঃ। যথা 'দধ্না জুহোতি' ইতি। স হি তৃতীয়য়া প্রতিপন্নাঙ্গভাবস্য দধ্নো হোমসংবন্ধং বিধত্তে 'দধ্না হোমং ভাবয়েৎ' ইতি।

গুণবিধৌ চ ধাত্বর্থস্য সাধ্যত্বেনান্বয়ঃ। ক্বচিদাশ্রয়ত্বেনাপি। যথা 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' ইত্যত্র 'দধিকরণত্বেনেন্দ্রিয়ং ভাবয়েৎ'। তচ্চ কিংনিষ্ঠমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সংনিধিপ্রাপ্তহোম আশ্রয়ত্বেনান্বেতি।

(অনু) অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের সম্বন্ধের বোধক বিধিকে বিনিয়োগবিধি বলে। যেমন 'দধ্না জুহোতি' অর্থাৎ দধির দ্বারা হোম করবে। এখানে তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা দধির অঙ্গত্ব জানা যায় বলে বিধিটি হোমের সাথে দধির সম্বন্ধ বিধান দিচ্ছে। যেমন, দধির দ্বারা হোমকে ভাবনা করবে (এটি বাক্যটির অর্থ)। গুণবিধিতে ধাত্বর্থের সাধ্যরূপে অন্বয় হয়, কখনও আশ্রয়রূপেও (ধাত্বর্থের অন্বয় হয়)। যেমন 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কাম ব্যক্তি দধির দ্বারা হোম করবে। এই বিধিবাক্যে 'দধির করণরূপে ইন্দ্রিয়কে ভাবনা করবে' এরূপ অর্থ বুঝতে হবে। সেই দধি কোথায় আশ্রিত এরূপ আকাঙক্ষায় সন্নিহিত হোম আশ্রয়রূপে অন্বিত হয়।

যে বিধিবাক্য অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের মধ্যে উপকার্য-উপকারকভাব সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে তাকে বিনিয়োগবিধি বলে। শেষ ও শেষীকে যথাক্রমে অঙ্গ ও অঙ্গী বলে। গ্রন্থকার শেষশেষিভাব সম্বন্ধ নিরূপণের অভিপ্রায়েই বিনিয়োগবিধির অবতারণা করেছেন। বাদরির মতে শেষ বলতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটিকেই বোঝায়, — যাগ, ফল ও পুরুষকে নয়। কিন্তু জৈমিনির মতে উপকারিত্বই শেষত্বের লক্ষণ নয়, পরার্থত্বই শেষত্ব। তিনি যাগের ফল ও পুরুষকেও শেষ বলেছেন। তবে দ্রব্য, গুণ, যাগ, ফল ও পুরুষ কারও তুলনায় শেষ ও কারও তুলনায় শেষী। অঙ্গকর্মের সাথে প্রধান কর্মের এই সম্বন্ধকে লৌগাক্ষি উপকার্য-উপকারক সম্বন্ধ বলেছেন। শেষ প্রধানের উপকারক এবং প্রধান শেষের উপকার্য। বিনিয়োগবিধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল — 'দধ্না জুহোতি'। এই বিধিবাক্যটি অগ্নিহোত্র প্রকরণে শ্রুত হয়েছে। এই বাক্যের দ্বারা হোম বিহিত হয় নি। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' এরূপ অন্য বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিত হোমই প্রধান কর্ম। ঐ হোমের নিষ্পত্তির অঙ্গ বিশেষ হওয়ায় দধি হোমের উপকারক হয়। হোম দধির উপকার্য। 'দধ্না জুহোতি' এই বিধির দ্বারা ঐরূপ উপকার্য-উপকারভাবই বিহিত হয়েছে, হোম নয়। 'দধ্না' এই তৃতীয়া বিভক্তির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, দধি হোমের অঙ্গ এবং দধির দ্বারা হোম করবে অর্থাৎ হোমের শরীর নিষ্পন্ন করবে ইহাই বিধির অর্থ।

এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থসংগ্রহকার বিনিয়োগবিধি ও গুণবিধিকে পর্যায়বাচী বলেছেন। উৎপত্তিবিধিতে ধাত্বর্থ হয় সাধন অর্থাৎ যাগ, কিন্তু গুণবিধিতে ধাত্বর্থ সাধারণত সাধ্য হয়, এবং স্থলবিশিষে ধাত্বর্থ আশ্রয় হয়। 'দধ্না জুহোতি' এই গুণবিধিতে ধাত্বর্থ হোম সাধ্য, দধিরূপ অঙ্গ অঙ্গী হোমের শরীর নিষ্পন্ন করে। এজন্য এখানে ধাত্বর্থ হোম দধির সাথে সাধ্যরূপে অন্বিত হয়। কিন্তু অগ্নিহোত্র প্রকরণে 'দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ' এই গুণবিধিতে ধাত্বর্থ হোম দধির আশ্রয়রূপে বিবক্ষিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়কাম ব্যক্তি দধির দ্বারা হোম করবে ইহা এই বিধির অর্থ। ইন্দ্রিয়বল বৃদ্ধির জন্য দধি নামক দ্রব্যের দ্বারা হোম বিহিত হয়েছে। এখানে ইন্দ্রিয় হল ফল। কাজেই 'দধি করণের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে ভাবনা করবে' এটি বিধির স্পষ্টার্থ। এ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, এখানে সাধ্য ইন্দ্রিয়, ধাত্বর্থ হোম নয়। ধাত্বর্থ হোম দধির আশ্রয়।

৩.২.৩ প্রয়োগবিধির স্বরূপ ও তার বিশ্লেষণ

(মূল) প্রয়োগপ্রাশুভাববোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ। স চাঙ্গবাক্যৈকবাক্যতাপন্নঃ প্রধানবিধিরেব। স হি সাঙ্গং প্রধানমনুষ্ঠাপয়ন্ বিলম্বে প্রমাণাভাবাদবিলম্বাপরপর্যায়ং প্রয়োগপ্রাশুভাবং বিধত্তে। ন চ তদবিলম্বেঽপি প্রমাণাভাব ইতি বাচ্যম্। বিলম্বে হি অপ্রধানবিধ্যেকবাক্যতাবগততৎসাহিত্যানুপপত্তিঃ। বিলম্বেন ক্রিয়মাণয়োঃ পদার্থয়োঃ 'ইদমনেন সহকৃতম্' ইতি সাহিত্যব্যবহারাভাবাৎ। স চাবিলম্বো নিয়তে ক্রমে আশ্রীয়মাণে ভবতি। অন্যথা হি 'কিমেতদনন্তরমেতৎ কর্তব্যমেতদনন্তরংবা' ইতি প্রয়োগবিক্ষেপাপত্তেঃ। অতঃ প্রয়োগবিধিরেব স্ববিধেয়প্রয়োগপ্রাশুভাবসিদ্ধ্যর্থং নিয়তং ক্রমমপি পদার্থবিশেষণতয়া বিধত্তে। অত এবাঙ্গানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিরিত্যপি লক্ষণম্। তত্র ক্রমো নাম বিততিবিশেষঃ, পৌর্বাপর্যরূপো বা।

(অনু) অনুষ্ঠানের প্রাশুভাবের বোধক বিধিকে প্রয়োগবিধি বলে। অঙ্গবাক্যগুলির সাথে একবাক্যতাপ্রাপ্ত এই প্রয়োগবিধি (বস্তুত) প্রধানবিধি-ই। অঙ্গকর্মের সাথে প্রধানকর্মের অনুষ্ঠানের জন্য বিলম্বে প্রমাণ না থাকায় এই বিধি অবিলম্বের নামান্তর অনুষ্ঠানের প্রাশুভাবকে বিধান দেয়। (অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের মধ্যে) অবিলম্বে অনুষ্ঠানে কোন প্রমাণ নেই একথা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না। (অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের অনুষ্ঠানে) বিলম্ব ঘটলে প্রধানবিধির সাথে একবাক্যতাপ্রাপ্ত অঙ্গবিধির সাহিত্য অনুপপন্ন হবে। যেহেতু বিলম্বে অনুষ্ঠিত অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের 'সেই অঙ্গকর্ম এই প্রধানকর্মের সাথে অনুষ্ঠিত' এরূপ সাহিত্যের ব্যবহার হবে না। নিয়ত ক্রম অনুসরণ করলে সেই অবিলম্ব (সম্ভব) হয়। কারণ তা না হলে 'এইটি কি এর পর কর্তব্য অথবা এইটি এর পর কর্তব্য' এইরূপ অনুষ্ঠানের বৈকল্য প্রসঙ্গ হয়। সুতরাং প্রয়োগবিধিই নিজের বিধেয় অনুষ্ঠানের প্রাশুভাব সিদ্ধির জন্য নিশ্চিত ক্রমকেও পদার্থের বিশেষণরূপে বিধান করে। সুতরাং অঙ্গ গুলির ক্রমবোধক বিধি প্রয়োগবিধি এটিও (প্রয়োগবিধির) লক্ষণ। এখানে ক্রম মানে বিস্তার বিশেষ বা পৌর্বাপর্য।

যে বিধি অনুষ্ঠানের প্রাশুভাবের বোধক তাকে প্রয়োগবিধি বলে। 'প্রয়োগ' শব্দের অর্থ অনুষ্ঠান। কিন্তু এখানে একবাক্যতাপন্ন অঙ্গ ও প্রধানকর্মের সংঘাতই 'প্রয়োগ' শব্দের অর্থ। যা একটি সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করে কিন্তু বিভক্ত হলে অন্বয়ের জন্য অন্য পদকে অপেক্ষা করে তাই একটি বাক্য। সুতরাং অর্থৈকত্ব হল একবাক্যত্ব। এই একবাক্যত্ব দু-প্রকার — পদৈকবাক্যতা ও বাক্যৈকবাক্যতা। মিলিত পদসমূহের একার্থবোধকতা পদৈকবাক্যতা। যে স্থলে একাধিক বাক্যার্থ পরস্পর অন্বিত হয়ে একটি মহাবাক্য গঠন করে সে স্থলে বাক্যৈকবাক্যতা থাকে। এই বাক্যৈকবাক্যতা আবার দু-প্রকার — অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধক বাক্যসমূহের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতা এবং অর্থবাদ ও বিধিবাক্যের মধ্যে বাক্যৈকবাক্যতা। প্রয়োগবিধির স্থলে প্রথমশ্রেণীর বাক্যৈকবাক্যতা থাকে। সুতরাং অঙ্গবাক্যের সাথে একবাক্যতাপন্ন প্রধান বিধিবাক্যই হল প্রয়োগবিধি। বস্তুতঃ উৎপত্তিবিধি ও বিনিয়োগবিধি একটি বিধিবাক্যে উল্লিখিত হলে তাকে প্রয়োগবিধি বলে।

'আশু' শব্দের অর্থ অবিলম্ব। অঙ্গ ও প্রধান কর্ম অনুষ্ঠেয় হওয়ায় একবাক্যতাপন্ন ব্যাপারসমূহের অনুষ্ঠান যে অবিলম্বেই করতে হবে তা প্রয়োগবিধির দ্বারা জানা যায়। প্রধান কর্ম হতে অঙ্গকর্ম বিলম্বিত হলে উভয়ের সাহিত্য উপপন্ন হবে না। যেমন পূর্বদিনে ও পরদিনে দুটি ভোজনের মধ্যে এই ভোজন তার সহকৃত একথা বলা চলে না, তেমনি প্রধানকর্ম ও অঙ্গকর্ম বিলম্বে অনুষ্ঠিত হলে তাদের সাহিত্য সিদ্ধ হবে না। অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের এই সাহিত্য ক্রমের দ্বারাই উপপন্ন হয়। তা না হলে 'এরপর এটি কর্তব্য' এইরূপ প্রয়োগ ব্যাহত হবে। কাজেই অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের অবিলম্বে অনুষ্ঠান সিদ্ধির জন্যই ক্রম অপেক্ষিত। ক্রম হল বিততিবিশেষ। অনুষ্ঠানকালে অনেক পদার্থে থাকে এরূপ গুণকে বিততি বলে। একই কর্তার দ্বারা অনুষ্ঠেয় বহু পদার্থে বিততির ব্যবহার হয়। বিততি একপ্রকার বিস্তার বিশেষ। এই লক্ষণের প্রতি লৌগাক্ষির আস্থা না থাকায় তিনি পৌর্বাপর্যকেও ক্রমের দ্বিতীয় লক্ষণ বলেছেন। ক্রম না জানলে কর্তব্য বিভিন্ন অঙ্গকর্মের মধ্যে কোনটির অনুষ্ঠান হয়তো হবে না, কোনটির বা দুবার অনুষ্ঠান হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানের শীঘ্রতা ও ক্রম এই দুটি এস্থলে বিবক্ষিত হলেও বাক্যভেদ দোষ হয় না। কারণ দুটি যদি বিধিবাক্যের দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে বিহিত হত তাহলে বাক্যভেদ দোষ হত। কিন্তু এখানে ক্রম ক্রিয়ার বিশেষণরূপে বিবক্ষিত। ফলে বাক্যভেদ দোষ হয় না। এজন্য অর্থসংগ্রহকার বলেছেন, 'অঙ্গকর্মসমূহের ক্রমের বিশিষ্টবিধিকেও প্রয়োগবিধির লক্ষণ বলা চলে। ক্রম কর্মের স্বরূপ নয়। এজন্য তা স্বরূপত বিধির বিষয় হয় না। তবে পদার্থের বিশেষণরূপেই ক্রম বিধির বিষয় হয়। লৌগাক্ষি বলেছেন, প্রয়োগবিধিতে অনুষ্ঠানের পৌর্বাপর্য নিরূপণের জন্য শ্রুতি, অর্থ, পাঠ, স্থান, মুখ্য ও প্রবৃত্তি এই ছপ্রকার প্রমাণ সহায়ক। এই ছটি প্রমাণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব প্রমাণের তুলনায় পরের পরের প্রমাণ দুর্বল হয়।

৩.২.৪ অধিকারবিধি ও কর্মভেদে অধিকারভেদ

(মূল) কর্মজন্যফলস্বাম্যবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ। কর্মজন্যফলস্বাম্যং কর্মজন্যফলভোক্তৃত্বম্। স চ 'যজেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদিরূপঃ। স্বর্গমুদ্দিশ্য যাগং বিদধতানেন স্বর্গকামস্য যাগজন্যফলভোক্তৃত্বং প্রতিপাদ্যতে। 'যস্যাহিতাগ্নেরগ্নির্গৃহান্ দহেৎ সোঽগ্নয়ে ক্ষামবতেঽষ্টাকপালং নির্বপেৎ' ইত্যাদিনাঽগ্নিদাহাদৌ নিমিত্তে কর্ম বিদধতা নিমিত্তবতঃ কর্মজন্যপাপক্ষয়রূপফলস্বাম্যং প্রতিপাদ্যতে। এবম্ 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইত্যাদিনা শুচিবিহিতকালজীবিনঃ সংধ্যোপাসনজন্যপ্রত্যবায়পরিহাররূপফলস্বাম্যং বোধ্যতে।

(অনু) যে বিধি (যাগাদি) কর্ম থেকে উৎপন্ন (স্বর্গাদি) ফলের স্বামিত্বকে বোঝায় তাকে অধিকারবিধি বলে। কর্ম হতে উৎপাদ্য ফলস্বামিত্বের অর্থ হল কর্ম হতে উৎপাদ্য ফলের ভোক্তা হওয়া। এই বিধির রূপ হল 'যজেত স্বর্গকামঃ' (অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করবে)। স্বর্গকে উদ্দেশ্য করে যাগের বিধায়ক এই বাক্যের দ্বারা স্বর্গকামী ব্যক্তির যাগজন্য ফলের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয়। 'যে ব্যক্তি অগ্ন্যাধান করেছে তার গৃহ অগ্নির দ্বারা দগ্ধ হলে সেই ব্যক্তি ক্ষীণ অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল (পুরোডাশ) সমর্পণ করবেন' ইত্যাদি মন্ত্র অগ্নিদাহ প্রভৃতি নিমিত্ত উপস্থিত হলে কর্মের বিধানের মাধ্যমে নিমিত্তবান্ পুরুষের কর্মজন্য পাপক্ষয়রূপ ফলের স্বামিত্ব প্রতিপাদন করে। এভাবে 'প্রত্যহ সন্ধ্যা উপাসনা করবে' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে

জীবনযাপন করেন এরূপ পুরুষের সন্ধ্যোপাসনার জন্য পাপনিবারণরূপ ফলের স্বামিত্ব বোধিত হয়।

অধিকারবিধির লক্ষণে প্রদত্ত 'কর্ম' বলতে যাগাদি কর্মকে বুঝতে হবে। যাগাদি বৈদিক কর্মজন্য ফল বলতে পারলৌকিক স্বর্গাদি বা ঐহিক পশুপুত্রাদি ফল বিবক্ষিত। স্বাম্য শব্দের অর্থ স্বামিত্ব। কর্মজন্য ফলভাবিত্ব-ই 'কর্মজন্যফলস্বামিত্ব' শব্দের অর্থ। কর্মজন্য ফল যিনি ভোগ করেন তাঁকে অধিকারী বলে। স্বামিত্বই অধিকার শব্দের অর্থ। যেমন 'যজেত স্বর্গকামঃ' এই বিধিবাক্যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি যাগ করবেন। ঐ স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগজন্য স্বর্গরূপ ফলের ভোক্তা হবেন। এজন্য এই বাক্যটিকে অধিকারবিধি বলে।

যে ব্যক্তি যজ্ঞার্থে অগ্ন্যাধান করে থাকেন তাকে আহিতাগ্নি পুরুষ বলা হয়। নিজের প্রজ্বলিত অগ্নির দ্বারা যদি আহিতাগ্নি পুরুষের ঘর দগ্ধ হয় তাহলে তার পাপ হয়। এজন্য ঐ ব্যক্তিকে ক্ষীণ অগ্নির উদ্দেশ্যে অষ্টাকপাল পুরোডাশ দিয়ে যাগ করতে হয়। এস্থলে যে বিধিবাক্যটি আছে তা হল — 'যস্যাহিতাগ্নেরগ্নির্গৃহান্ দহেৎ সোহগ্নয়ে ক্ষামবতেহষ্টাকপালং নির্বপেৎ।' এই ইষ্টিযাগের নিমিত্ত হল গৃহদাহ। এই বিধিবাক্যে ফল উল্লিখিত না হলেও পুরুষের প্রবৃত্তির জন্য ফল কল্পনা করতে হবে। ঐ কল্পিত ফল হল পাপক্ষয়। সুতরাং এই বিধিটিও অধিকারবিধি। ত্রৈবর্ণিকের পক্ষে প্রত্যহ তিনবার সন্ধ্যাবন্ধনাদির বিধান আছে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সন্ধ্যাচরণের জন্য শুচিতা আবশ্যক। কাজেই যে ব্যক্তি শুচিভাবাপন্ন হয়ে বিহিত কালে সন্ধ্যা-উপাসনা করেন, তারই ফলে অধিকার থাকে। এজন্য 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' এই বাক্যটি অধিকারবিধি।

(মূল) তচ্চ ফলস্বাম্যং তস্যৈব যোঽধিকারবিশিষ্টঃ। অধিকারশ্চ স এব যৎ বিধিবাক্যেষু পুরুষবিশেষণত্বেন শ্রূয়তে। যথা কাম্যে কর্মণি ফলকামনা, নৈমিত্তিকে কর্মণি নিমিত্তনিশ্চয়ঃ, নিত্যে সন্ধ্যোপাসনাদৌ শুচিবিহিতকালজীবিত্বম্। অতএব 'রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত' ইত্যনেন বিধিবাক্যেন স্বারাজ্যমুদ্দিশ্য বিদধতাপি ন স্বারাজ্যমাত্রকামস্য তৎফলভোক্তৃত্বং প্রতিপাদ্যতে, কিংতু রাজ্ঞঃ সতঃ স্বারাজ্যকামস্যৈব, রাজত্বস্যাপ্যধিকারিবিশেষণত্বেন শ্রবণাৎ।

(অনু) (অধিকারবিধি বোধিত) সেই ফলের স্বামিত্ব সেই পুরুষেরই থাকবে যে অধিকারবিশিষ্ট এবং অধিকার বলতে তাকেই বোঝায় যা বিধিবাক্যগুলিতে পুরুষের বিশেষণরূপে উল্লিখিত থাকে। যেমন কাম্য কর্মে ফলের কামনা, নৈমিত্তিক কর্মে নিমিত্তের নিশ্চয় ও সন্ধ্যা, উপাসনা প্রভৃতি নিত্য কর্মে শাস্ত্রানুমোদিত জীবনযাপন করা। সুতরাং স্বারাজ্যের উদ্দেশ্যে বিহিত স্বারাজ্যকামী রাজা রাজসূয় যাগ করবেন' এই বিধিবাক্যের দ্বারা ঐ যাগের ফলভোক্তৃত্ব কেবল স্বারাজ্যকামী ব্যক্তিরই প্রতিপাদিত হয় না, কিন্তু স্বারাজ্যকামী রাজারই, যেহেতু রাজত্ব অধিকারীর বিশেষণরূপে উল্লিখিত আছে।

অর্থসংগ্রহকার দেখিয়েছেন যে, যিনি ফলভোক্তা হবেন যাগাদি কর্মে তার অধিকার থাকা আবশ্যক। যে ব্যক্তির কর্মে অধিকার নেই, সে ফলভাগী হতে পারে না। এজন্যই অধিকারবিধিবাক্যে কর্তার বিশেষণরূপে অধিকার প্রদত্ত হয়ে থাকে। কাম্যকর্মে ফলকামনাই কর্তার অধিকার। নৈমিত্তিক কর্মে নিমিত্তের নিশ্চয় অনুষ্ঠাতার অধিকার। শুচিতা ও বিহিতকালজীবিত্ব নিত্যকর্ম করার অধিকার। শ্রুতিমধ্যে

স্বারাজ্যকামনায় রাজসূয়যজ্ঞ করার বিধান আছে। কিন্তু স্বারাজ্যকামী যে কোন ব্যক্তি ঐ ফলের ভোক্তা হতে পারেন না। স্বারাজ্যকামী ক্ষত্রিয় রাজাই ফলভোক্তা হন। কারণ রাজা হওয়াই রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকার। এখানে রাজা বলতে ক্ষত্রিয় রাজাকেই বুঝতে হবে। ক্ষত্রিয়েরই রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকার, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণের নেই।

এখানে প্রসঙ্গত বলা চলে যে, অধিকারবিধিকে কর্মজন্যফলস্বাম্যবোধক বলা হয়েছে। এই ফলস্বামিত্ব কর্মকর্তারই থাকবে তা বলা চলে না। কারণ কর্মকর্তা যদি প্রতিনিধি হন তাহলে তিনি ফলভোক্তা হবেন না। যজমান ত্যাগস্বরূপ প্রধানকর্ম করে থাকেন এবং তিনিই ফলভোক্তা। ঋত্বিক্ কর্মকর্তা হলেও যজমান দক্ষিণার দ্বারা ঐ ঋত্বিক্ হতে যজ্ঞের ফল ক্রয় করেন। শ্রাদ্ধকার্যে পিতা- মাতা ফলভোক্তা হন, কিন্তু তাঁরা কর্মকর্তা নন। এজন্য তাঁরা অধিকারবিশিষ্ট নন। শ্রাদ্ধাদি কার্যে যজমানই কর্মকর্তা ও ফলভোক্তা। কারণ শ্রাদ্ধাদি কর্ম করলে যজমানের পাপক্ষয় হয় বা প্রত্যবায় পরিহার হয়। সুতরাং অধিকারবিধির স্থলে কর্তার বিশেষণরূপে অধিকারের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। কর্তার বিশেষণরূপে বেদবাক্যে কোন বিশেষণ শ্রুত না হলেও কোন না কোন বিশেষণ অবশ্যই কল্পনা করতে হয়। কারণ অসমর্থ ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন বিধিবাক্যই প্রযুক্ত হয় না।

৩.৩ বিধির বৈকল্পিক বিভাগ

৩.৩.১ নিয়মিবিধির স্বরূপ ও বিচার

(মূল) **নানাসাধনসাধ্যক্রিয়ায়ামেকসাধনপ্রাপ্তাবপ্রাপ্তস্যাপরসাধনস্য প্রাপকো বিধির্নিয়মবিধিঃ। যথাহুঃ —**

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে।। ইতি।

অস্যার্থঃ। প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধিরপূর্ববিধিঃ যথা 'যজেত স্বর্গকামঃ' ইত্যাদিঃ। স্বর্গার্থকযাগস্য প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তস্যানেন বিধানাৎ।

(অনু) নানাসাধনের দ্বারা সাধ্য ক্রিয়ায় একটি সাধনের প্রাপ্তদশায় অন্য সাধনের প্রাপক বিধিকে নিয়মবিধি বলে। যেমন (বার্ত্তিককার) বলেছেন — অত্যন্ত অপ্রাপ্ত (অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত নয় এমন) বিষয়ের বিধায়ক বাক্যকে অপূর্ববিধি, পাক্ষিক (অপ্রাপ্তি) স্থলে নিয়মবিধি এবং সেখানে ও অন্যত্র প্রাপ্তিতে পরিসংখ্যা (বিধি হয়ে থাকে)। এর (শ্লোকের) অর্থ — অন্য প্রমাণের দ্বারা অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক বিধি অপূর্ববিধি। যেমন, 'যজেত স্বর্গকামঃ' (অর্থাৎ স্বর্গকামী ব্যক্তি যাগ করবে) ইত্যাদি। যেহেতু এই বিধিবাক্যের দ্বারা প্রমাণান্তরের দ্বারা অজ্ঞাত স্বর্গফলের উদ্দেশ্যে যাগ বিহিত হয়েছে।

লৌগাক্ষি **অর্থসংগ্রহে** বিধিবিভাগ প্রসঙ্গে অপূর্ববিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি উল্লেখ করেন নি। মন্ত্রবাক্য আলোচনার পর প্রসঙ্গত তিনি নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধির ভেদ আলোচনা করেছেন। বিধির এই বৈকল্পিক বিভাগ অন্য দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর মতে কোন ক্রিয়া একাধিক সাধনের দ্বারা সাধ্য হলে অনুরাগবশতঃ একটি সাধনে প্রাপ্তি ঘটলে অন্য সাধনের প্রাপক বিধিকে নিয়মবিধি বলে। একটি ক্রিয়াতে দুই বা বহু সাধনের বৈকল্পিক ভাবে প্রাপ্তি থাকলে সেখানে একটি সাধনে প্রাপ্তির সময় যে সাধনান্তরের অপ্রাপ্তি ঘটে তার পূরকবিধি হল নিয়মবিধি। এই প্রসঙ্গে অর্থসংগ্রহকার বার্ত্তিককারের মত উদ্ধৃত করেছেন। বার্ত্তিককারের মতে বিধি তিনপ্রকার অপূর্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যা। অন্য প্রমাণের দ্বারা সর্বথা অজ্ঞাত বিষয়ের বিধান যে বিধিবাক্য দিয়ে থাকে তাকে অপূর্ববিধি বলে। যেমন 'যজেত স্বর্গকামঃ' এটি অপূর্ববিধি। কারণ এই বিধিবাক্যটি না থাকলে যাগের দ্বারা স্বর্গফল পাওয়া যায় তা লোকের কাছে অজ্ঞাত থাকত। এই অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হওয়ায় এটি অপূর্ববিধি। 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' এই বাক্যটিও অপূর্ববিধির আর একটি স্থল। 'প্রোক্ষতি' শব্দটি লট্ ল-কারের মতো হলেও তা লেট্ লকার। কাজেই ব্রীহিগুলিকে প্রোক্ষণ করবে ইহাই বিধির অর্থ। প্রোক্ষণ শব্দের অর্থ জল ছিটানো। দর্শপূর্ণমাস প্রকরণে পুরোডাশ আবশ্যক এবং তার জন্য ব্রীহি প্রয়োজন। ব্রীহি বলতে শরৎকালের পাকা ধানকে বোঝায়। ঐ ব্রীহি হতে তুষ বিমোচনের পূর্বে জল ছিটাতে হয়। ধানগুলিতে জল ছিটালে একটি সংস্কার জন্মায়। এই বিধিবাক্য না থাকলে প্রোক্ষণরূপ সংস্কারকর্ম করণীয় তা অন্য কোন উপায়ে জানা যেত না। প্রোক্ষণের কোন দৃষ্ট ফল নেই। সংস্কাররূপ অদৃষ্টই প্রোক্ষণের ফল। কাজেই এই বিধিটি না থাকলে পুরোভাশপ্রার্থী পুরুষ কখনও তুষবিমোচনের আগে প্রোক্ষণ করত না। যদি প্রোক্ষণ অন্য বিধি বা অন্য প্রমাণ বা অন্য কোনভাবে জানা যেত তাহলে তাকে অত্যন্ত অপ্রাপ্ত বলা যেত না। অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারাও ইহা জানা যায় না। সুতরাং পূর্বে অননুভূতত্বই হল অপূর্ববিধির অপূর্বত্ব।

(মূল) পক্ষেঽপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধির্নিয়মবিধিঃ। যথা 'ব্রীহীনবহন্তি' ইত্যাদিঃ। কথমস্য পক্ষেঽপ্রাপ্তপ্রাপকত্বমিতি চেৎ। ইত্থম্। অনেন হ্যবঘাতস্য বৈতুষ্যার্থত্বং ন প্রতিপাদ্যতেঽন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাৎ। কিংতু নিয়মঃ। স চাপ্রাপ্তাংশপূরণম্। বৈতুষ্যস্য হি নানোপায়সাধ্যত্বাদ্ যদা অবঘাতং পরিত্যজ্য উপায়ান্তরং গ্রহীতুমারভতে, তদা অবঘাতস্যাপ্রাপ্তত্বেন তদ্বিধানাত্মকমপ্রাপ্তাংশপূরণমেবানেন বিধিনা ক্রিয়তে। অতশ্চ নিয়মবিধাবপ্রাপ্তাংশপূরণাত্মকো নিয়ম এব বাক্যার্থঃ। পক্ষেঽপ্রাপ্তাবঘাতস্য বিধানমিতি যাবৎ।

(অনু) পক্ষে অপ্রাপ্তের প্রাপক বিধি হল নিয়মবিধি। যেমন, 'ব্রীহীনবহন্তি' (অর্থাৎ ব্রীহিকে অবহনন করবে) ইত্যাদি। এই বিধি কিভাবে অপ্রাপ্তের প্রাপক হয় এরূপ যদি শঙ্কা হয়, তার উত্তর হল — এই বিধিবাক্যের দ্বারা অবহননের তুষবিমোচনরূপ প্রয়োজন প্রতিপাদিত হয় নি, যেহেতু তা অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা সিদ্ধ; কিন্তু নিয়ম (প্রতিপাদিত হয়েছে)। অপ্রাপ্ত অংশের পূরণকে নিয়ম বলে। তুষবিমোচন নানা উপায়ের দ্বারা সম্ভব হওয়ায় যখন অবঘাত পরিত্যাগ করে অন্য উপায় অবলম্বন করতে প্রবৃত্ত হয়, তখন অবঘাত অপ্রাপ্ত হয় বলে তার বিধানরূপ অপ্রাপ্ত অংশের পূরণ এই বিধিবাক্যের দ্বারা করা

হয়। সুতরাং নিয়মবিধিতে অপ্রাপ্ত অংশের পূরণরূপ নিয়মই বাক্যের অর্থ। পক্ষে অপ্রাপ্ত অবঘাতের বিধানই পর্যবসিত অর্থ।

অর্থসংগ্রহকার বার্ত্তিককারকে অনুসরণ করে বলেছেন, কোন উপায়ে পাক্ষিক প্রাপ্তি ও পাক্ষিক অপ্রাপ্তি থাকলে নিয়মবিধি সেই অপ্রাপ্ত অংশের পূরণ করে। এই বিধি পাক্ষিকভাবে অপ্রাপ্ত অংশের বিধান দেয়। যেমন, 'ব্রীহীনবহন্তি' এই বাক্যটি নিয়মবিধি। দর্শপূর্ণমাস যাগে দেবতার উদ্দেশ্যে পুরোডাশ অর্থাৎ একপ্রকার পিঠে আহুতি দেওয়া হয়। পুরোডাশের জন্য তন্ডুল এবং তন্ডুলের জন্য ধানের তুষবিমোচন প্রয়োজন। ধানের তুষবিমোচন অর্থাপত্তি প্রমাণগম্য। কাজেই অবঘাতকে পাওয়ার জন্য এই বিধি নয়। বস্তুতঃ তুষবিমোচনের নানা উপায় আছে। যেমন নখের দ্বারা বিদলন, পাথর দিয়ে ডলা, উলূখলে মুষলের আঘাত দেওয়া ইত্যাদি। 'ব্রীহীনবহন্তি' এই বিধিবাক্যটি না থাকলেও কোন ব্যক্তি অবহননের দ্বারা তুষবিমোচন করতে পারে, কিন্তু পক্ষে অবহননের অপ্রাপ্তি থাকে। এই অপ্রাপ্তির পরিপূরণের জন্য অর্থাৎ অবঘাতের দ্বারা তুষবিমোচন করতে হবে একথা বোঝানোর জন্য বিধির প্রয়োজন। 'ব্রীহীনবহন্তি' এই বাক্যের দ্বারা অবঘাত বিহিত হলে ফলতঃ নখবিদলনাদি অন্য সাধন পরিত্যক্ত হয়।

৩.৩.২ পরিসংখ্যাবিধির স্বরূপ, প্রকারভেদ ও তাতে দোষ

(মূল) উভয়োশ্চ যুগপৎপ্রাপ্তাবিতরব্যাবৃত্তিপরো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ। যথা — 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' ইতি। ইদং হি বাক্যং ন পঞ্চনখভক্ষণপরং, তস্য রাগতঃ প্রাপ্তত্বাৎ। নাপি নিয়মপরং, পঞ্চপঞ্চনখাপঞ্চনখভক্ষণস্য যুগপৎপ্রাপ্তেঃ পক্ষেঽপ্রাপ্ত্যভাবাৎ। অত ইদমপঞ্চপঞ্চনখভক্ষণনিবৃত্তিপরমিতি ভবতি পরিসংখ্যাবিধিঃ।

(অনু) দুটি বিধানের যুগপৎ প্রাপ্তি হলে একটির নিবারক বিধিকে পরিসংখ্যাবিধি বলে। যেমন 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' (অর্থাৎ পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণীয়)। এই বাক্যটি পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণের বিধায়ক নয়, যেহেতু তার ভক্ষণের প্রাপ্তি (মানুষের স্বভাবতঃ) অনুরাগ হতে হয়ে থাকে। (এই বাক্যটি) নিয়মপর নয়, যেহেতু পঞ্চনখবিশিষ্ট ও অপঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণীর ভক্ষণে যুগপৎ প্রাপ্তি থাকায় পক্ষে অপ্রাপ্তির অভাব থাকে। অতএব এই বাক্যটি পঞ্চনখবিশিষ্ট পাঁচটি ভিন্ন প্রাণীর ভক্ষণের নিবৃত্তিপর। এজন্য এটি পরিসংখ্যাবিধি।

যে বিধিবাক্যের দ্বারা যা উপস্থিত হয় সেই পদার্থ এবং যা উপস্থিত হয় না সেই পদার্থ, এই উভয়েরই যদি যুগপৎ প্রাপ্তি সম্ভব হয় এবং সেই বিধিবাক্যের দ্বারা যদি নিজের অভিপ্রেত পদার্থ থেকে ভিন্ন পদার্থের নিবৃত্তি হয় তাহলে তাকে পরিসংখ্যাবিধি বলে। অন্যনিবৃত্তিই হল পরিসংখ্যাবিধির ফল। যেমন ''পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ'' এই শ্রুতিবাক্যটি পরিসংখ্যাবিধি। যে প্রাণীর চরণে পাঁচটি করে নখ আছে তাকে 'পঞ্চনখ' বলে। বানর, গোসাপ, খরগোস, কচ্ছপ ও শ্বাবিধ এরাই হল পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণী। তবে নানা স্মৃতিশাস্ত্রে পঞ্চনখ প্রাণীর সংখ্যা ও পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী নিয়ে মতভেদ আছে। এই পাঁচটি প্রাণী ভক্ষণীয় একথা এই বিধিবাক্যে বলা হয়েছে। এটি অপূর্ববিধির স্থল নয়, যেহেতু বিধি প্রবৃত্তির পূর্বেই কামত উহারা প্রাপ্ত। রাগত

প্রাপ্ত বিষয় বিধেয় হতে পারে না। একে নিয়মবিধিও বলা যায় না। কারণ এ স্থলে পক্ষে অপ্রাপ্তি নেই। বস্তুতঃ এই বিধির দ্বারা পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণী ভক্ষণ করতে হবে একথা বলা হয় নি। 'অন্য পঞ্চনখবিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষণীয় নয়' এরূপ অন্যনিষেধই এই পরিসংখ্যাবিধির অর্থ।

এখানে আপত্তি হতে পারে যে, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি উভয়স্থলেই অপরের ত্যাগরূপ ফলটি সমান। নিয়মবিধির দ্বারা অবঘাতের পাক্ষিক অপ্রাপ্তি পরিপূরণ হলে নখবিদলন প্রভৃতি অন্য সাধনগুলি পরিত্যক্ত হয়। আর পরিসংখ্যাবিধির স্থলেও পাঁচটি পঞ্চনখ প্রাণী ভিন্ন অপর সকলেরও পরিত্যাগ হয়। সুতরাং উভয়বিধির মধ্যে ফলগত কোন পার্থক্য নেই। বস্তুতঃ নিয়মবিধিতে অপ্রাপ্ত অংশ পরিপূরণ করা ফল বলে বুঝতে হবে, যেহেতু উহা বিধির নিকটবর্তী। অপরের পরিত্যাগ পরে বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়। অন্যের নিবৃত্তি সাক্ষাদ্‌ভাবে বিধির সাথে অন্বিত নয়। সুতরাং দূরবর্তী অপরের পরিত্যাগকে নিয়মবিধির ফল বলে স্বীকার করা সঙ্গত হবে না।

অর্থসংগ্রহকার শ্রৌতী ও লাক্ষণিকীভেদে দুইপ্রকার পরিসংখ্যা স্বীকার করেছেন। যে স্থলে বিধিবাক্য বাচক শব্দের দ্বারাই অন্যের নিষেধ করে থাকে তাকে শ্রৌতী পরিসংখ্যা বলে। সাধারণত 'নঞ্' বা 'এব'-কারের দ্বারা এরূপ অন্যনিষেধ বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন, 'অত্র হ্যেবাবপন্তি' এই বাক্যটি শ্রৌতী পরিসংখ্যার দৃষ্টান্ত। এখানে 'এব' কারের দ্বারা পবমান ভিন্ন স্তোত্রে সামেয় দ্বারা আবাপের নিষেধ করা হয়েছে। আর যে পরিসংখ্যা বিধির স্থলে লক্ষণা স্বীকার করতে হয় তাকে লাক্ষণিকী বা আর্থী পরিসংখ্যা বলে। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' এই বাক্যটি লাক্ষণিকী পরিসংখ্যা। যেহেতু এই স্থলে অন্যনিষেধের বাচক কোন পদ উল্লিখিত হয়নি।

অর্থসংগ্রহকার লাক্ষণিকী পরিসংখ্যাতে তিনপ্রকার দোষ দেখিয়েছেন — শ্রুতহানি, অশ্রুতকল্পনা ও প্রাপ্তবাধ। শক্তিলভ্য পদার্থের হানিকেই শ্রুতহানি বলে। 'পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ' এই বিধিবাক্যে পঞ্চনখ পদটির 'পঞ্চনখ ভিন্ন' অর্থে এবং 'ভক্ষ্যাঃ' পদটির 'অভক্ষ্যাঃ' অর্থে লক্ষণা করা হয়। ফলে উভয় পদের স্বার্থহানি হয়। ইহাই প্রথম দোষ। অন্য অর্থের কল্পনা হল অশ্রুতকল্পনা। ইহা দ্বিতীয় দোষ। লাক্ষণিকী পরিসংখ্যা স্থলে প্রমাণান্তরের দ্বারা বা রাগত যা প্রাপ্ত তার বাধ হয়ে থাকে। যেমন রাগত প্রাপ্ত অপঞ্চনখ ভক্ষণ — এই বিধির দ্বারা বাধিত হয়েছে। এই তিনটি দোষের মধ্যে শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা এই দুটি শব্দগত দোষ এবং প্রাপ্তবাধ হল অর্থনিষ্ঠ দোষ।

৩.৪ নিষেধের স্বরূপ ও বিচার :

৩.৪.১ নিষেধের লক্ষণ বিশ্লেষণ

(মূল) পুরুষস্য নিবর্তকং বাক্যং নিষেধঃ। নিষেধবাক্যানামনর্থহেতুক্রিয়ানিবৃত্তিজনকত্বেনৈবার্থবত্ত্বাৎ। তথা হি যথা বিধিঃ প্রবর্তনাং প্রতিপাদয়ন্ স্বপ্রবর্তকত্বনির্বাহার্থং বিধেয়স্য যাগাদেরিষ্টসাধনত্বমাক্ষিপন্ পুরুষং তত্র প্রবর্তয়তি, তথা 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদি নিষেধোঽপি নিবর্তনাং প্রতিপাদয়ন্ স্বনিবর্তকত্বনির্বাহার্থং নিষেধ্যস্য কলঞ্জভক্ষণস্য পরানিষ্টসাধনত্বমাক্ষিপন্ পুরুষং ততো নিবর্তয়তি।

(অনু) (অনর্থজনক কর্ম হতে) পুরুষের নিবর্তক বাক্য হল নিষেধ। অনর্থজনক ক্রিয়ার নিবৃত্তির হেতুরূপে নিষেধ বাক্যগুলি সপ্রয়োজন হয়। এর বক্তব্য — যেমন বিধি প্রবর্তনা প্রতিপাদন করতে করতে নিজের প্রবর্তকত্ব উপপাদনের জন্য যাগাদি বিধেয়ের ইষ্টসাধনত্ব নিশ্চয় করে তাতে পুরুষকে প্রবৃত্ত করায়, তেমনি 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' অর্থাৎ 'বিষাক্ত মাংস ভক্ষণ করবে না' ইত্যাদি নিষেধও নিবর্তনা প্রতিপাদন করে নিজের নিবর্তকত্ব নির্বাহের জন্য নিষেধ্য কলঞ্জভক্ষণের অনিষ্টসাধনত্ব নিশ্চয় করে পুরুষকে তা হতে নিবৃত্ত করায়।

যে বেদবাক্য অনর্থজনক বা পাপজনক কর্ম হতে পুরুষকে নিবৃত্ত করে তাকে নিষেধবাক্য বলে। যেমন, 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' অর্থাৎ 'বিষাক্ত মাংস ভক্ষণ করবে না' 'ন সুরাং পিবেৎ' অর্থাৎ 'মদ্যপান করবে না' ইত্যাদি বাক্যগুলি নিষেধ। এরা কিভাবে নিবর্ত্তক হয় এ বিষয়ে সংশয় হতে পারে। 'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' এই বাক্যে বিধির অর্থ প্রবর্তনা। তার সাথে নিষেধের অন্বয় হলে প্রবর্তনার অভাব এরূপ অর্থই বোঝা যাবে। কিন্তু প্রবর্তনার অভাব কিভাবে নিবর্ত্তক হবে? এরূপ আশঙ্কা লৌগাক্ষি বিধির দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সমাধান করেছেন। বিধিবাক্য প্রবৃত্তির জনক ব্যাপারের বিধান দিয়ে যাগাদি বিধেয়বস্তু যে ইষ্টবস্তুর সাধন তা স্থাপন করে ও এরপর ঐ যাগাদি কর্মে পুরুষকে প্রবৃত্ত করে। তুল্যভাবে নিষেধবাক্যগুলিও অনিষ্টকর কর্ম হতে নিবৃত্ত হবার জন্য নির্দেশ দিয়ে 'বিষাক্ত মাংস ভক্ষণ' প্রভৃতি নিষেধ্যবস্তু যে অহিতকর ও অনিষ্টফলের সাধন তা নিশ্চয় করে ও পুরুষকে ঐ সব কর্ম হতে নিবৃত্ত করে। প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতার জ্ঞান কারণ এবং অনিষ্টসাধনতার জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। কাজেই নিষেধ প্রতিবন্ধক অনিষ্টসাধনতা জ্ঞান থাকায় প্রবৃত্তির সামগ্রী ব্যাহত হয়। এর ফলে ঐ কর্মে পুরুষ প্রবৃত্ত হয় না।

৩.৪.২ শাব্দীভাবনাতে নঞর্থের অন্বয়

'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' ইত্যাদি নিষেধবোধক বাক্যে 'নঞ্' শব্দের দ্বারা নিষেধকে বোঝানো হয়। ভাট্ট মতে লিঙাদি প্রত্যয়ের প্রবর্তনে শক্তি আর নঞের অভাবে শক্তি। নঞের সাথে যেটি সম্বদ্ধ হয়, নঞের দ্বারা তারই অভাব বোধিত হয়। যদি ধাত্বর্থের সাথে নঞের সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় তাহলে তা ধাত্বর্থের অভাবকেই বোঝাবে। এখন, লিঙের সাথে ভক্ষণরূপ ধাত্বর্থের অন্বয় হলে নিষেধের দ্বারা ধাত্বর্থের পরিত্যাগই প্রতীত হবে। এর ফলে নিষেধবাক্যগুলোকে আর নিবর্তনাবোধক বলা যাবে না।

এরূপ আপত্তির উত্তরে অর্থসংগ্রহকার বলেছেন, নিষেধবাক্যস্থলে নঞর্থের সাথে ধাত্বর্থের অন্বয় হয় না। লিঙ্ প্রত্যয়ের আখ্যাতত্ব অংশের দ্বারা আর্থীভাবনা অভিহিত হয়। ধাত্বর্থ ঐ আর্থীভাবনার বিশেষণ হওয়ায় তার সাথে নিষেধের অন্বয় হবে না। কারণ প্রত্যেকে নিজের প্রধানের সাথে অন্বিত হতে চায়। আর্থীভাবনা এস্থলে প্রধান। কাজেই ধাত্বর্থ যেমন আর্থীভাবনায় অন্বিত হয়, তেমনি নিষেধ ও আর্থীভাবনার সাথে অন্বিত হয়। এজন্য ধাত্বর্থ এবং নঞর্থের মধ্যে পরস্পর অন্বয় হবে না। এ বিষয়ে নিয়ম হচ্ছে, অন্যের বিশেষণ কখনও অপরের সাথে অন্বিত হয় না।

অর্থসংগ্রহকার 'অন্যের বিশেষণ অন্যেতে অন্বিত হয় না' এরূপ নিয়মের অনুকূলে যুক্তিও দেখিয়েছেন। 'রাজপুরুষম্ আনয়' ইত্যাদি বাক্যে পুরুষ আনয়ন ক্রিয়ার কর্ম। ঐ পুরুষের বিশেষণ রাজা। পুরুষের বিশেষণীভূত রাজার আনয়ন ক্রিয়াতে অন্বয় হয় না। যদি উক্ত ন্যায়টি স্বীকার না করা হয় তাহলে রাজারও আনয়ন ক্রিয়াতে অন্বয়ের আপত্তি হবে। এইভাবে লৌগাক্ষি দেখিয়েছেন, নঞর্থের সাথে প্রত্যয়ার্থেরই অন্বয় হয়, ধাত্বর্থের নয়।

এখানে বিবেচ্য, প্রত্যয়ার্থ দু প্রকার — শাব্দীভাবনা ও আর্থীভাবনা। এই দুটির মধ্যে কোনটির সাথে নঞর্থের অন্বয় হবে? নঞর্থের আর্থীভাবনাতেই অন্বয় হয় এরূপ মনে হতে পারে। কারণ, আর্থীভাবনা প্রত্যয়ের অর্থ এবং তা ধাত্বর্থ অপেক্ষা প্রধান। এখানে লৌগাক্ষি দেখিয়েছেন, ধাত্বর্থের অপেক্ষায় আর্থীভাবনার প্রাধান্য থাকলেও ঐ আর্থীভাবনা শাব্দীভাবনাতে সাধ্যরূপে অন্বিত থাকে। এজন্য আর্থীভাবনা শাব্দীভাবনার বিশেষণ। অন্যের বিশেষণে অপরের অন্বয় হয় না বলে নঞর্থের শাব্দীভাবনাতে অন্বয় হবে। কারণ শাব্দীভাবনা প্রত্যয়ের লিঙ্-অংশের বাচ্য এবং তা ধাত্বর্থ ও আর্থীভাবনার অপেক্ষায় প্রধান। এই অভিপ্রায়ে ভাট্ট মীমাংসকরা শাব্দীভাবনাতেই নঞর্থের অন্বয় স্বীকার করেন, ধাত্বর্থে বা আর্থীভাবনায় নয়।

৩.৫ অর্থবাদের লক্ষণ ও প্রকারভেদ

৩.৫.১ অর্থবাদের লক্ষণ

(মূল) প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যমর্থবাদঃ। তস্য চ লক্ষণয়া প্রয়োজনবদর্থপর্যবসানম্। তথাহি অর্থবাদবাক্যং হি স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রয়োজনাভাবাদ্বিধেয়নিষেধ্যয়োঃ প্রাশস্ত্যনিন্দিতত্বে লক্ষণয়া প্রতিপাদয়তি। স্বার্থমাত্রপরত্বে আনর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ। আম্নায়স্য হি ক্রিয়ার্থত্বাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' ইত্যধ্যয়নবিধিনা সকলবেদাধ্যয়নং কর্তব্যমিতি বোধয়তা সর্ববেদস্য প্রয়োজনবদর্থপর্যবসায়িত্বং সূচয়তোপাত্তত্বেনানর্থক্যানুপপত্তেঃ।

(অনু) প্রশংসা ও নিন্দা যে কোন একটির প্রতিপাদক বাক্য অর্থবাদ। সেই অর্থবাদের লক্ষণার দ্বারা প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থে (অর্থাৎ ধর্মে) পর্যবসান হয়। বক্তব্য এই যে, নিজের মুখ্যার্থ প্রতিপাদনে প্রয়োজন না থাকায় অর্থবাদবাক্য বিধেয় ও নিষেধ্য পদার্থের প্রশংসা ও নিন্দা লক্ষণার দ্বারা প্রতিপাদন করে। যেহেতু নিজের মুখ্যার্থপর হলে অর্থবাদ বাক্য অনর্থক হয়ে পড়বে। কারণ সকল বেদবাক্যই ক্রিয়াপর। (অর্থবাদবাক্যের ব্যর্থতাকে) ইষ্টাপত্তি বলা যাবে না। 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' এই অধ্যয়ন বিধির দ্বারা 'সকল বেদের অধ্যয়ন কর্তব্য' এরূপ বোধিত হওয়ায় সকল বেদবাক্যের প্রয়োজনবিশিষ্ট অর্থে (অর্থাৎ ধর্মে) পর্যবসান সূচিত হয়। সুতরাং (অর্থবাদ বাক্যের) ব্যর্থতা হতে পারে না।

লৌগাক্ষি ভাস্কর **অর্থসংগ্রহ** গ্রন্থে প্রশংসামূলক ও নিন্দামূলক বেদবাক্যকে অর্থবাদ বলেছেন। অর্থবাদবাক্যগুলি আক্ষরিকভাবে অর্থবহ নয়। মীমাংসা দর্শনের প্রয়োজনের সাথে তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকলেও লক্ষণার মাধ্যমে তার প্রয়োজন বুঝতে হবে। অর্থবাদবাক্যগুলি নিজ নিজ অর্থ পরিহার করে

লক্ষণার দ্বারা বিধেয় বিষয়ের প্রশস্তি এবং নিষেধ্য বিষয়ের নিন্দারূপ ঔপচারিক অর্থ প্রতিপাদন করে। অর্থবাদবাক্যগুলির লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার না করলে তারা অনর্থক হয়ে পড়বে। কারণ মীমাংসক মতে যেসব বেদবাক্য ক্রিয়ার প্রতিপাদক নয় তারা পুরুষার্থের হেতু নয়। অর্থবাদবাক্য ক্রিয়ার প্রতিপাদক না হওয়ায় তাকে অনর্থকই বলতে হবে। অথচ অর্থবাদবাক্যকে অনর্থকবাক্য বলা যাবে না। যেহেতু 'স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ' অর্থাৎ 'বেদাধ্যয়ন করতে হবে' এই অধ্যয়নবিধির দ্বারা জানা যায় যে, বেদের সব অংশই প্রমাণ। সুতরাং বিধি, নামধেয় প্রভৃতির ন্যায় অর্থবাদও ধর্ম নিরূপণের হেতু। এভাবে লৌগাক্ষি দেখিয়েছেন, বিধিবাক্যের সাথে একবাক্যতা ধরে সকল অর্থবাদবাক্যের ধর্মে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

সকল বেদবাক্য ক্রিয়াপর বলে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে ধর্মের সাথে তার সম্বন্ধ। বিধিবাক্য হতে ধর্ম এবং নিষেধবাক্য হতে অধর্ম জানা যায়। নামধেয়বাক্য বিধিবাক্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। ধর্মের স্বরূপ জেনে তা অনুষ্ঠান করলে এবং অধর্মের স্বরূপ জেনে তা পরিহার করলে পুরুষার্থ লাভ হয়। বেদমধ্যে যে সব স্তুতিমূলক বা নিন্দামূলক বাক্য আছে তারা অর্থবাদ। অর্থবাদবাক্যে এরূপ অনেক কিছুর উল্লেখ আছে যা সম্ভবপর নয়। 'তরতি মৃত্যুং তরতি পাম্পানং তরতি ব্রহ্মহত্যাং যোহশ্বমেধেন য উ চৈনমেবং বেদ' অর্থাৎ যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করেন এবং যে ব্যক্তি অশ্বমেধ যোগের স্বরূপ জানেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন, পাপ হতে মুক্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যা হতে মুক্তি পান। এই অর্থবাদবাক্যের প্রামাণ্য মানলে 'অশ্বমেধেন যজেত' এই বিধিবাক্যটি অপ্রমাণ হয়ে পড়বে। বস্তুত অর্থবাদগুলি ক্রিয়াপ্রতিপাদক নয়। যা ক্রিয়ার প্রতিপাদক নয় তা নিষ্প্রয়োজন ও অপ্রমাণ। এই অপ্রামাণ্য আশঙ্কা নিরসনের জন্য সূত্রকার মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, বিধিবাক্যের সাথে অর্থবাদ বাক্যের একবাক্যতা হয় বলে বিধেয় কর্মের প্রশংসার মাধ্যমে অর্থবাদ বাক্যগুলি নিজেরা সার্থক হয়ে থাকে। যে পদগুলি একটা সমগ্র অর্থ প্রকাশ করে অর্থাৎ একটা প্রয়োজন নির্বাহ করে, অথচ তার মধ্যে বিভাগ করলে তারা অন্য পদের আকাঙ্ক্ষা করে, ঐ পদগুলিকে মীমাংসকেরা একটি বাক্য বলেন। সকল বিধিবাক্য যেমন প্রশংসাকে অপেক্ষা করে তেমনি অর্থবাদবাক্যও নিজের প্রয়োজন নির্বাহের জন্য বিধিবাক্যের সাথে মিলিত হয়ে বিধেয় কর্মফলের প্রশংসা করে নিজে সফল হয়ে থাকে। সহজসাধ্য লৌকিক কর্মে অনুরাগবশতঃ মানুষ প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু কষ্টসাধ্য যাগাদি কর্মে অনেকসময় পুরুষের প্রবৃত্তি নাত্ত হতে পারে। কারও ক্লান্তি বা আলস্য আসতে পারে। যজ্ঞাদির ফল অত্যন্ত লোভনীয় এ কথা শুনলে বেদবিহিত কর্মে অলস ব্যক্তির অবসন্ন চিত্তও প্রবৃত্তিতে উন্মুখ হয়। সুতরাং বৈধ কর্মে মানুষের প্রবৃত্তিকে তীব্রতর করার জন্য বিধিবাক্যে অর্থবাদের অপেক্ষা থাকে। আবার অর্থবাদবাক্য নিজে নিরর্থক বলে বিধিবিহিত প্রয়োজনের দ্বারা নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিবাক্যের অপেক্ষা রাখে। সুতরাং 'নষ্টাশ্বদগ্ধরথ' ন্যায়ে অর্থবাদ এবং বিধির পরস্পর মিলনে একটি প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

৩.৫.২ অর্থবাদের প্রকারভেদ

সূত্রকার জৈমিনি স্তুতি, নিন্দা, পরকৃতি এবং পুরাকল্প এই চার প্রকার অর্থবাদ স্বীকার করেছেন। কিন্তু আপোদেব **মীমাংসান্যায়প্রকাশ** গ্রন্থে কেবল স্তুতি ও নিন্দার বোধক অর্থবাদই মেনেছেন। তাঁর মতে পরকৃতি ও পুরাকল্প এই দুইপ্রকার অর্থবাদ বিধিশেষ ও নিষেধশেষ অর্থবাদের অন্তর্ভুক্ত। আপোদেবকে অনুসরণ করে

লৌগাক্ষি প্রথমে অর্থবাদের বিধিশেষ ও নিষেধশেষ এই দুপ্রকার ভেদ দেখিয়েছেন। বিধির স্তাবক অর্থবাদকে 'বিধিশেষ' ও নিষেধের নিন্দক অর্থবাদকে 'নিষেধশেষ' বলে। বিধি ও নিষেধের পরিশিষ্ট ধরে এই দ্বিবিধ অর্থবাদকে 'বিধিশেষ' ও 'নিষেধশেষ' বলে। এরা যথাক্রমে বিধি ও নিষেধের উপকার সাধন করে। 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ' অর্থাৎ 'উন্নতিকামী ব্যক্তি বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে শ্বেতবর্ণছাগ হত্যা করবে' এই বিধিবাক্যের শেষ পূরণ হয় 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা' অর্থাৎ 'বায়ু ক্ষিপ্রগামী দেবতা' এই অর্থবাদ বাক্যটি দিয়ে। এই অর্থবাদ বাক্যটির অভিপ্রেত অর্থ — অত্যন্ত ক্ষিপ্রগামী বলে বায়ু দেবতা যাগের ফল দ্রুত প্রদান করেন। এই অর্থবাদ বাক্য শুনে ঐ বৈধ কর্মে পুরুষের দ্রুত প্রবৃত্তি ঘটে। 'সোরোদীত্, যদ্ অরোদীত্ তদ্ রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্' অর্থাৎ তিনি রোদন করেছিলেন, তিনি রোদন করেছিলেন বলে তাঁর অশ্রু হতে রজত উৎপন্ন হয়েছিল' এই অর্থবাদ বাক্যটি 'বর্হিষি রজতং ন দেয়ম্' অর্থাৎ 'আস্তীর্ণ কুশের ওপর রজত দান করবে না'এই নিষেধবাক্যের শেষ অংশ। এই শ্রুতিবাক্যটি রজতদানের নিন্দা করছে। রজত দুঃখ হতে উৎপন্ন বলে তা দক্ষিণারূপে দেয় নয়। এভাবে এই অর্থবাদ বাক্যটি নিন্দার বোধক হওয়ায় একে 'নিষেধশেষ' বলে।

লৌগাক্ষি তাঁর **'অর্থসংগ্রহ'** গ্রন্থে প্রকারান্তরে বিধির বিভাগ দেখিয়েছেন। তাঁর মতে স্তুতি ও নিন্দা এই দুপ্রকার ভেদের জন্য অর্থবাদবাক্যের বিধিশেষ ও নিষেধশেষ এরূপ বিভাগ করা হয়। আবার প্রকারান্তরে অর্থবাদের তিনপ্রকার ভেদ মীমাংসকগণ স্বীকার করেন। এরা হল, গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ। অর্থবাদের বিষয় কখনো অন্য প্রমাণের বিরুদ্ধ হয়, কখনো অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়, কখনো বা অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধও হয় না এবং বিরুদ্ধও হয় না। বিষয় ত্রিবিধ বলেই অর্থবাদবাক্য ত্রিবিধ। যে অর্থবাদের বিষয়ের সাথে অন্য প্রমাণসিদ্ধ বিষয়ের বিরোধ ঘটে, তাকে 'গুণবাদ' বলে। এখানে 'গুণ' শব্দের অর্থ সাদৃশ্য। যেমন, 'আদিত্যো যূপঃ' অর্থাৎ 'হারকাঠটি (যূপকাষ্ঠটি) সূর্য' এই বিধিবাক্যটির সাথে প্রত্যক্ষসিদ্ধ সূর্যের বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। হারকাঠের সাথে সূর্যের অভেদ অনুভববিরুদ্ধ হওয়ায় 'আদিত্য' শব্দের মুখ্যার্থ পরিহার করে লক্ষণার দ্বারা সাদৃশ্যবশতঃ 'সূর্যের উজ্জ্বল রূপ গুণ' এরূপ গৌণ অর্থ বুঝতে হবে। যে অর্থবাদ প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়কে বোঝায় তাকে 'অনুবাদ' বলে। যেমন 'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্' অর্থাৎ 'অগ্নি শৈত্যের ওষুধ' এই বিধিবাক্যটি 'অনুবাদ'। অগ্নি যে শৈত্যের বাধক তা সর্বানুভবসিদ্ধ। কাজেই প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ বিষয় এই অর্থবাদে আলোচিত হওয়ায় একে 'অনুবাদ' বলা হয়। যে অর্থবাদের বিষয় অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধও নয় বা অন্য প্রমাণের দ্বারা বাধিতও হয় না তাকে 'ভূতার্থবাদ' বলে। এখানে 'ভূতার্থবাদ' বলতে অতীত ঘটনা বা বস্তুর যথাযথ বিবরণকে বোঝায়। যেমন; 'ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছত' অর্থাৎ 'ইন্দ্র বৃত্রকে আঘাত করবার জন্য বজ্র উত্তোলন করেছিলেন' এই ভূতার্থবাদের বিষয়টি প্রমাণ সিদ্ধও নয় এবং কোন প্রমাণের দ্বারা বাধিতও নয়। কাজেই যে বেদবাক্যে অতীত এমন ঘটনার উল্লেখ থাকে যা অন্য প্রমাণের দ্বারা জ্ঞাতও নয় এবং বাধিতও নয়, ঐ বেদবাক্যকে 'ভূতার্থবাদ' বলে।

৩.৬ সারসংক্ষেপ

লৌগাক্ষি **অর্থসংগ্রহ**-এ বিধিবিভাগ প্রকরণে উৎপত্তিবিধি, বিনিয়োগবিধি, অধিকারবিধি ও প্রয়োগবিধি এই চারপ্রকার বিধির বিভাগ দেখিয়েছেন। যাগাদি সাধনের স্বরূপবোধক বিধিকে উৎপত্তিবিধি বলে। প্রসঙ্গ

ত গুণবিধিও আলোচিত হয়েছে। গুণবিধিতে ধাত্বর্থ অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত থাকে। কিন্তু উৎপত্তিবিধিতে ধাত্বর্থটি অপ্রাপ্ত থাকে। প্রাপ্তের অনুবাদ ও অপ্রাপ্তের বিধান এই দুটি বিধির ভেদ। বিনিয়োগবিধি অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের মধ্যে শেষশেষিভাব সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে। শেষ ও শেষীকে যথাক্রমে অঙ্গ ও অঙ্গী বলা হয়। শেষ প্রধানের উপকারক, শেষী শেষের উপকার্য হয়। বিনিয়োগবিধিকে গুণবিধিও বলা হয়। এরূপ গুণবিধিতে ধাত্বর্থ সাধারণত সাধ্য ও স্থলবিশেষে আশ্রয় হয়। যে বিধি অনুষ্ঠানের প্রাশুভাবের বোধক হয় তাকে প্রয়োগ বিধি বলে। উৎপত্তি ও বিনিয়োগ বিধি একটি বিধিবাক্যে উল্লিখিত হলে তাকে প্রয়োগবিধি বলা হয়। অঙ্গকর্ম ও প্রধানকর্মের সাহিত্য ক্রমের দ্বারা উপপন্ন হয়। ক্রম পদার্থের বিশেষণরূপে বিধির বিষয় হয়। যে বিধি কর্মজন্য ফলের স্বামিত্বকে বোঝায় তাকে অধিকারবিধি বলে। যিনি ফলের ভোক্তা হবেন তারই কর্মে অধিকার থাকে। যে ব্যক্তির কর্মে অধিকার নেই সে ফলভাগী হতে পারে না। তাই অধিকারবিধিবাক্যে কর্তার বিশেষণরূপে অধিকার প্রদত্ত হয়। লৌগাক্ষি মন্ত্রবাক্য আলোচনা প্রসঙ্গে নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যাবিধি এই দু প্রকার বিধি আলোচনা করেছেন। অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরক বিধিকে নিয়মবিধি বলে। পরিসংখ্যাবিধির তাৎপর্য বিধেয় বস্তুর বিধানে নয়, অন্যবস্তুর নিষেধে। বিধিবাক্যগুলো যেমন ইষ্ট বস্তু লাভের জন্য যাগাদি সাধনে পুরুষকে প্রবৃত্ত হতে প্রেরণা দেয়, তেমনি নিষেধবাক্যগুলো অমঙ্গলজনক কর্ম হতে পুরুষকে নিবৃত্ত করে। নঙর্থের শাব্দীভাবনায় অন্বয় হয়, ধাত্বর্থ ও আর্থীভাবনায় নয়। বিধিশেষ ও নিষেধশেষ রূপে অর্থবাদ বাক্যের স্বরূপ এখানে আলোচিত হয়েছে। প্রশংসামূলক ও নিন্দামূলক বেদবাক্যকে অর্থবাদ বলে। বিধেয়ের প্রশস্তি ও নিষেধ্যের নিন্দা অর্থবাদবাক্যের লাক্ষণিক অর্থ। অর্থবাদের বিধিশেষ ও নিষেধশেষ এই দুপ্রকার বিভাগ এবং গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ এই তিনপ্রকার বিভাগ এখানে আলোচিত হয়েছে।

৩.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

উৎপত্তিবিধি

'উৎপত্তি' শব্দের অর্থ যাগাদি সাধন। যে বিধিবাক্য সাধনের স্বরূপ বোঝায় তাকে উৎপত্তিবিধি বলে। যাগের স্বরূপ, দ্রব্য ও দেবতা এই বিধিবাক্যের দ্বারা বোধিত হয়। যেখানে স্বরূপের উল্লেখ থাকে না সেখানে তা কল্পিত হয়। একে ফলবিধিও বলে। লৌগাক্ষির মতে এটি অপূর্ববিধির নামান্তর।

কর্মাধিকার

যে ব্যক্তির কর্মে অধিকার থাকে, সে ব্যক্তিই ফলের ভোক্তা হয়। কাম্য কর্মে ফলকামনা কর্তার অধিকার। নৈমিত্তিক কর্মে নিমিত্তের নিশ্চয় অনুষ্ঠানের অধিকার। শুচিতা ও বিহিত কালজীবিত্ব নিত্য কর্ম করার অধিকার। স্বারাজ্যকামী ক্ষত্রিয় রাজা হওয়া রাজসূয় যজ্ঞ করার অধিকার।

নিয়ম

অপ্রাপ্ত অংশের পূরণকে নিয়ম বলে। যে বিষয়ে পাক্ষিক প্রাপ্তি ও পাক্ষিক অপ্রাপ্তি থাকে ঐ অপ্রাপ্ত অংশের পূরণ যে বিধির দ্বারা করা হয় তাকে নিয়মবিধি বলে। নিয়মিবিধিতে প্রাপ্ত অংশের বিধানে তাৎপর্য থাকে না, অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরণেই তাৎপর্য থাকে। অপ্রাপ্ত অংশের পরিপূরণই নিয়মবিধির ফল। অন্যনিষেধ আনুষঙ্গিকভাবে আসে।

অর্থবাদ

স্তুতিমূলক ও নিন্দামূলক বেদবাক্যকে অর্থবাদ বলে। অর্থবাদ বাক্য মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করে না। ইহা লক্ষণার দ্বারা বিধেয়বস্তুর প্রশংসা ও নিষেধ্য বস্তুর নিষেধকে সূচিত করে। অর্থবাদবাক্য বিধিবাক্যের সঙ্গে একবাক্যতা প্রাপ্ত হয়ে ক্রিয়াপর ও ধর্মের প্রতিপাদক হয়।

৩.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী :

Essay Type

1. Explain and illustrate *utpattividhi* after the author of the *Arthasaṁgraha.*

Short type

1. Write notes on *anuvâda* and *bhûtârthavâda*.
2. Distinguish between *niyamavidhi* and *parisaṁkhyâvidhi.*

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী :

ভাস্কর লৌগাক্ষি, **অর্থসংগ্রহ**, রামচন্দ্র ঝা সম্পাদিত, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বারাণসী, ১৯৯৯

''**অর্থসংগ্রহ**, পট্টাভিরাম শাস্ত্রী ও বাচস্পতি উপাধ্যায় কৃত টীকাসহ, চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, বারাণসী, ১৯৯৭

"The Arthasamgraha of Laugaksi Bhaskara, ed. A. B. Gajendragadkar & R. D. Karmakar, Motilal Banarsidarss,Delhi 1998.

দ্বিতীয় অর্ধ

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

ড. সন্তোষ কুমার পাল
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ একক - ১

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

পাঠ-সংকেত

একক : ১.০ : উদ্দেশ্য

একক : ১.১ : প্রাক্‌কথন

একক : ১.২ : আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

১.২.১ : কর্তব্যবাদ

১.২.২ : কান্টের কর্তব্যবাদ

১.২.৩ : সারসংক্ষেপ

১.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.২.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

একক : ১.৩ : উপযোগবাদ : প্রাক্‌কথন

১.৩.১ : মিলের উপযোগবাদ

১.৩.২ : উপযোগবাদের প্রমাণ

১.৩.৩ : সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

১.৩.৪ : নমুনা প্রশ্ন

১.৩.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

একক : ১.০ ■ উদ্দেশ্য

পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সম্যক্ পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ্যসূচিতে নীতিবিদ্যা (Normative Ethics), অধিনীতিবিদ্যা (Metaethics) ও ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা (Applied Ethics) - এই তিন ধারার নীতিতত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পাঠ - এককে আমরা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার পর্যালোচনা করব।

একক : ১.১ ■ প্রাক্‌কথন

নীতিশাস্ত্র আমাদের আচরণের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় সুসংবদ্ধ ও বিচার-নিষ্ঠ দার্শনিক আলোচনা। সমাজবদ্ধ মানুষের কোন্ আচরণ উচিত, কোন্‌টি অনুচিত, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টিই বা মন্দ - এভাবে বিচার করে নীতিশাস্ত্র। প্রথাবাহী কর্মনীতিগুলির নির্বিচার, প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব মেনে না নিয়ে যখন আমরা তাদের যথার্থ্য বিচারে প্রবৃত্ত হই তখনই উদ্ভব ঘটে নীতিশাস্ত্র তথা নীতিদর্শনের। মঙ্গল, কর্তব্য, ঔচিত্য ইত্যাদি বিষয়ের দর্শনঋদ্ধ ধারণাগঠন, তাদের পক্ষে উপযুক্ত যুক্তিপ্রদান এবং এ ধরণের বিচারের মাধ্যমে আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করা নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য। (তবে কোন কোন নীতিদার্শনিক নীতিতাত্ত্বিকের সাধারণ মানুষকে পরামর্শদানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার হক্‌দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।) পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস ও বর্তমান আলোচনার গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা তিনটি স্তরে বা ধারায় প্রবাহিত হয়েছে : আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা, অধি-নীতিবিদ্যা ও ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যা। আদর্শনিষ্ঠ নীতিচর্চায় আমরা নৈতিক বিচারের জন্য মানদণ্ড বা আদর্শ নিরূপণ করার চেষ্টা করি, এবং সেই মানদণ্ড অনুসারে আমাদের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করি। যেমন, কিছু দার্শনিক মন্দের তুলনায় ভাল ফলাফল উৎপাদনকে নৈতিক আদর্শ হিসাবে স্থির করেছেন। যে কাজ এরূপ অপেক্ষাকৃত ভাল পরিণাম উৎপাদনের উপযোগী সেই কাজকে ভাল কাজ হিসাবে সিদ্ধান্ত করবেন। নীতি-চর্চার অপর ধারাটি অধি-নীতিবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ, যেখানে নৈতিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি, যেমন 'ভাল', 'মন্দ', 'কর্তব্য', 'শুভ' ইত্যাদির অর্থনিরূপণ করা হয়। একই সঙ্গে নৈতিক বিচার বা অবধারণের অথবা কার্যাবলীর ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা নিরূপণ করা হয়। নৈতিকবিচারের অর্থনিরূপণ ও যৌক্তিকতা বিষয়ে এই অধিনীতিবিদ্যায় আবেগবাদ (emotivism), পরামর্শবাদ (prescriptivism) প্রভৃতি তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। 'রামুর কাজটি খুব ভাল হয়েছে' — এই অবধারণটি অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে আবেগবাদী বলবেন যে 'রামুর কাজটি আমি অনুমোদন করছি, তার কাজে আমি খুশী হয়েছি।'

নীতিতত্ত্বের আলোচনার যে ধারাটি তুলনায় নতুন তা হল ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যা। নীতি-আলোচনার এই ধারায় নীতিতাত্ত্বিকেরা আমার জীবনের বাস্তব নৈতিক সমস্যাগুলি পরিস্থিতিমাফিক কিন্তু আদর্শ তত্ত্বের নিরিখে বিচার করেন। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্‌রা ধরে নেন যে আমাদের নীতিবোধ বা নৈতিকতা কমবেশি দেশ-কাল নিরপেক্ষ হবে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুসারে নীতিবিচারে কোন ব্যতায় ঘটতে পারে — এ রকম সম্ভাবনা তাঁরা খুব একটা স্বীকার করে না। তাঁরা নীতিবিচারকে কয়েকটি সাধারণ বিমূর্ত্ত নীতিসূত্রে বেঁধে ফেলার পক্ষপাতী। একই রকম ভাবে অধিনীতিবিদ্যার আলোচনাও খুববেশি বিশ্লেষণধর্মী, যা সাধারণ মানুষের সত্যিকারের নীতি-সংকট সমাধানে কোনো সাহায্য করে না। এ সবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বিংশ-শতাব্দীর শেষের দিকে এক ঝাঁক তরুণ নীতিতাত্ত্বিক অনুভব করেন যে নীতিশাস্ত্রকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নীতিবিচারে সাহায্য করতে হলে ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ভাবনাচিন্তা থেকেই ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার জন্ম। চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আদর্শের নিরিখে

পরিস্থিতিমাফিক নীতিবিচার করে এই নীতিবিদ্যা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যক্তি অনারোগ্য ব্যধিতে ভুগছেন, তীব্র যন্ত্রণায় তার প্রতিটি মূহূর্ত কাটে। জীবনের কোন মানেই সে খুঁজে পায় না। সে এই দুঃসহ বেঁচে থাকা থেকে মুক্তি চায়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্‌রা এ বিষয়ে দিক্‌দর্শন করে থাকেন। স্বেচ্ছায় যদি কেউ এরকম অবস্থায় স্বস্তিমৃত্যু (euthanasia) চান তাহলে তাঁরা শর্তসাপেক্ষে তা অনুমোদন করতেও পারে।

একক : ১.২ ■ আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা

আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় মোটামুটি তিন ধরনের তত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। কর্তব্যবাদ (Deontology), পরিমাণবাদ (Consequentialism) বা উদ্দেশ্যবাদ (Teleology) এবং সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব (Virtue ethics) বলা বাহুল্য এই সব নীতিতত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ বা উপবিভাগ প্রচলিত আছে। কর্তব্যবাদ বলতে আমরা সেই ধরনের কর্মনীতিকে বুঝি যেখানে কর্তব্যতার নিরিখে কোন কাজের নৈতিকমূল্য নিরূপণ করা হয়। নিছক ফলাফল বিচার নয়, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করাই আমাদের কর্মনীতি হওয়া উচিত। কর্তব্য বলতে অবশ্য কেউ ঐশ্বরিক আদেশকে বোঝাতে পারেন, আবার কেউ বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার নিঃশর্ত অনুজ্ঞাকে বোঝাতে পারেন। যেমন, পিতামাতা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা, তাদের মান্য করা কর্তব্য, তা করতে হবে, ফলাফল যাই হোক না কেন। অপরপক্ষে পরিণামবাদ (বা ফলাফলবাদ) অনুসারে কোন কর্ম ন-নৈতিক (non-moral) ফলাফল বা পরিমাণ উৎপন্ন করে বা করতে পারে তার নিরিখে সে কাজের মূল্যায়ন করতে হবে। কোন কাজ বা কর্মনীতির ফলাফল এখানে একমাত্র বিবেচ্য। যেমন, আমি বিরক্ত হয়েও যদি একজন ক্ষুধার্ত ভিখারীকে পাঁচ টাকার একটি কয়েন ছুঁড়ে দিই এবং ঐ ভিখারীটি যদি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে খাবার কিনে খায়, তাহলে আমার কাজের পরিণাম যেহেতু ভাল সেহেতু কাজটিকে ভাল কাজই বলা হবে।

অপর আদর্শতত্ত্বটি সদ্‌গুণ বা প্রলক্ষণের নীতিতত্ত্ব (Virtue ethics)। এই নীতিতত্ত্ব বিচ্ছিন্নভাবে কোন কাজ বা কর্মনীতির পরিমাণ বা কর্তব্যতা বিচারের পরিবর্তে ব্যক্তির চরিত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ব্যক্তির চরিত্রকে বিবেচনায় না রেখে কোন একটি কাজের বিচার যথার্থ বিচার সম্ভব নয়, কেননা কোনো শিথিল চরিত্রের ব্যক্তিও কোনো একটি 'ভাল' কাজ করে ফেলতে পারে। একই রকম ভাবে চবিত্রবান মানুষও কখনও সাময়িক ভুলে একটি 'খারাপ' কাজ করে ফেলতে পারে। আমাদের উচিত ব্যক্তির চরিত্রকে ঠিক মতো করে গড়ে তোলা যাতে সুগুণগুলি আমাদের মধ্যে শক্তপোক্তভাবে প্রোথিত হয়। প্লেটো - আরিস্টটলের সদ্‌গুণতত্ত্বের উপর ভিত্তিশীল এই নীতিবিদ্যায় প্রজ্ঞা (Wisdom), সাহসিকতা (Courage), সংযম্ (Temperence) ও ন্যায় (Justice) এই চারটি প্রলক্ষণ সহ বিভিন্ন সদ্‌গুণের পরিচর্যার কথা বলা হয়। অ্যারিস্টটলের আরেটি (arete = উৎকর্ষ) ফ্রোনেসিস্ (phronesis = ব্যবহারিক নৈতিক প্রজ্ঞা) এবং ইউডায়মোনিয়া (endaimonia = পূর্ণতার বিকাশ) এই সব গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উপর ভিত্তিশীল এই নীতিতত্ত্ব বিংশ শতাব্দীতে নতুন জীবন লাভ করেছে। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগ এই নীতিতত্ত্ব সর্বাধিক গুরুত্ব পেত। কিন্তু আধুনিক যুগে পবিণামবাদ ও কর্তব্যবাদের নীতিতত্ত্বের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিতত্ত্ব পিছিয়ে পড়েছিল। সমকালীন নীতিচর্চায়, বিশেষ করে অ্যালেস্‌ডেয়ার ম্যাকিনটায়ারের

প্রচেষ্টায়, সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব নবজীবন লাভ করেছে।

যাইহোক, আমরা পাঠ্যসূচীকে অনুসরণ করে ফলাফলবাদী তত্ত্ব হিসাবে মিলের উপযোগবাদ (Utilitarianism) এবং কর্তব্যবাদী তত্ত্ব হিসাবে কান্টের নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা করব। সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্বের আলোচনা পাঠ্যসূচী না থাকায় আমরা এ বিষয়ে আর অগ্রসর হব না।

১.২.১ ■ কর্তব্যবাদ (Deontology)

আক্ষরিক বা বুৎপত্তিগত অর্থে কর্তব্যবাদ হল কর্তব্য বা নৈতিক বাধ্যতাবোধের তত্ত্ব। গ্রীক 'deon' শব্দের অর্থ কর্তব্য। আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, কর্তব্যবাদীর বিচারে কোনো কাজের যথৌচিত্য (rightness) বা অনৌচিত্য (wrongness) কাজটির পরিণাম বা ফলাফলের ভালত্ব বা মন্দত্বের উপর নির্ভর করে না। পরিণামবাদের বিপরীতে কর্তব্যবাদী বলেন, যথোচিত বা সঠিক কাজ বা কর্মনীতির প্রকৃতির মধ্যেই এমন কিছু বিশেষত্ব থাকে যা কাজটি বা সংশ্লিষ্ট কর্মনীতিটিকে ন্যায্য, সঠিক বা বাধ্যতামূলক করে তোলে। এ বিচারে সর্বাধিক শুভাধিক্যরূপ ফলাফলের সূচক হয়েও কোনো একটি কাজ মন্দ হতে পারে, বিশেষ করে যদি কাজটির প্রকৃতির মধ্যে অন্যায্যতার উপাদান বর্তমান থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো একজন দুর্বৃত্তকে খুন করলে শতাধিক মানুষের স্বস্তি মেলে। এক্ষেত্রে পরিণামবাদী খুন করার কাজটি অনুমোদন করতে পারে। কিন্তু কর্তব্যবাদের বিচারে কাউকে খুন করার কাজটি প্রকৃতিগতভাবে অনুচিত কাজ। অতএব কাজটি অনুমোদনযোগ্য নয়।

কর্তব্যবাদ অবশ্য দু-ধরনের হতে পারে : কর্ম-কর্তব্য (act-deontology) ও নিয়ম-কর্তব্যবাদ (rule-deontology)। কর্মকর্তব্যবাদ অনুসারে নৈতিক বাধ্যতাবোধক মৌলিক অবধারণগুলি বিশেষ, 'এই বিশেষ পরিস্থিতিতে আমার এরকম করা উচিত' এই আকারের। এ মতে মনে করা হয় আমাদের কর্মানুষ্ঠানের প্রতিটি ক্ষেত্র স্বতন্ত্র এবং তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে ঔচিত্য বিচার আলাদা আলাদা হবে। মনে করা হয়, সর্বজনীন নৈতিক নিয়ম বা বিধি বলে কিছু নেই। প্রতিটি কর্ম স্বতন্ত্র চরিত্রের এবং তাই বিশেষ কর্ম, তার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিবিশেষ অনুযায়ী নৈতিক বিচার করতে হবে। স্বজ্ঞা (intuition) -এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কোনো কাজটি কর্তব্য, সঠিক। অন্যদিকে নিয়মকর্তব্যবাদ অনুসারে সাধারণ বিধি বা নিয়ম অনুসারে কোনো কাজের বিচার করা কর্তব্য। সাধারণ নিয়মের কর্তব্যতাই ঠিক করে ঐ বিধির অন্তর্গত কোন কাজ যথোচিত কিনা। অর্থাৎ এ মতে, নৈতিক মানদণ্ড এক বা একাধিক নিয়ম বা বিধি দিয়ে তৈরী। এই নিয়মগুলি স্থান-কাল-ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে প্রযোজ্য হবে। আসলে আমরা ব্যক্তিজীবনে যে সব নৈতিক নিয়মের ভিত্তিতে কাজ করলে কোনো কাজ যথোচিত হয়, সেই সব নিয়মই তাদের বিবেচ্য হয়। যেমন সত্যকথা বলার সাধারণ নিয়ম, কথা দিয়ে কথা রাখার নিয়ম। এসব নিয়মের প্রতিটিই প্রায় নির্দেশ করে 'এই ধরনের কাজ এইভাবে করা সর্বদা কর্তব্য'। যেমন, কথা রাখার যে লৌকিক

নিয়ম সমাজে প্রচলিত আছে তা বলে দেয় কথা দিয়ে থাকলে সেই কথা রাখা সর্বদা কর্তব্য, পরিস্থিতি বা ফলাফল যাই হোক না কেন। কর্ম-কর্তব্যবাদ ও নিয়ম-কর্তব্যবাদ এই উভয়ের ধরনের বিভিন্ন তত্ত্ব নীতিদর্শনে প্রচলিত আছে। এদের মধ্যে ইম্যানুয়েল কান্টের নীতি-কর্তব্যবাদ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে কান্টের নীতিতত্ত্বেরই পর্যালোচনা করব।

১.২.২ ■ কান্টের কর্তব্যবাদ (Kant's Deontology)

পাশ্চাত্য নীতিদর্শনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ইম্যানুয়েল কান্ট অনুভব করেছেন যে আমাদের ভিতর যে নৈতিক নিয়ম, যে বিবেক, তা নক্ষত্রখচিত আকাশের ন্যায় ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উদ্রেগ করে। এই নৈতিক নিয়মের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে কান্ট একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে 'গ্রাউণ্ডওয়ার্ক অফ দ্য মেটাফিজিক অফ্ মরালস্', 'ক্রিটিক অফ্ প্রাক্টিক্যাল রীজন' ও মেটাফিজিকস্ অফ মরালস্' সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। 'গ্রাউন্ডওয়ার্ক' -এ কান্ট শুরু করেছেন এই বলে যে সৎসংকল্প (Good Will) ব্যতিরেকে এই জগতে, এমনকি এই জগতের বাইরেও কোনো কিছু কল্পনা করা যায় না বিনা শর্তে ভাল। এই সৎসঙ্কল্প বা শুভেচ্ছা, কান্টের বিচারে, কোন সাধারণ কামনা-বাসনা নয়। যে ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (practical reason) নিঃসৃত সঙ্কল্প ব্যক্তির স্বাধীন কর্মোদ্যোগের সূচনা করে সেই বিশেষ ইচ্ছাই শুভ সঙ্কল্প। সাধারণ কামনা-বাসনা যেখানে আমাদের শর্তাধীন, পরতন্ত্রী করে তোলে সেখানে সদিচ্ছা স্বাধীন কর্মোদ্যোগের সূচনা করে। কান্ট বলেন, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি, প্রতিভা, ক্ষমতা যদি শুভেচ্ছার দ্বারা পরিচালিত না হয় তাহলে বড়ো ধরনের মন্দেরও সূচনা হতে পারে। এই শুভেচ্ছা বা সঙ্কল্প শুভ বা ভাল এই কারণে নয় যে এর দ্বারা যা সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ পরিণাম বা ফলাফলের সৃষ্টি হয় - তা ভাল। শুভেচ্ছা নিঃশর্তভাবে ভাল, পরিণাম-নিরপেক্ষভাবে ভাল। এই সদিচ্ছা বা সঙ্কল্প কোনভাবে পরতন্ত্রী নয়, স্বাধীন। আর এই সঙ্কল্পের স্বাধীনতাই সকল নিয়মের এবং এই নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল কর্তব্যের মূল নীতি।

বলার অপেক্ষা থাকে না যে এই সৎসংকল্প বা শুভেচ্ছার যেন আর এক নাম নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (The Categorical Imperative)। অন্যভাবে বললে, কান্ট আমাদের চরম নৈতিক বিধি (The Supreme Moral Law) কে নিঃশর্ত আদেশ হিসাবে বিচার করেন। অনুজ্ঞা বা আদেশ মাত্রের নির্দেশ হয় শর্তসাপেক্ষ, নয়তো শর্ত-নিরপেক্ষ হবে। শর্তাধীন আদেশ (hypothetical imperative) আমাদের অপর কোনো বস্তুলাভের পন্থারূপে কোন সম্ভাব্য আচরণের প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা কল্পনা করে। অপরপক্ষে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা (Categorical Imperative) অন্য কোন উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্করহিত হয়ে আচরণের স্বকীয় আবশ্যিকতা ব্যক্ত করে। কান্টের ভাষায় "[The hypothetical imperatives] represent the practical necessity of possible action as means to something else that is willed. The categorical imperatives would be that which represent an action as necessary of itself without reference to another end." আমরা প্রাকল্পিক অনুজ্ঞাকে বিচক্ষণতা (prudence) এবং নিঃশর্ত অনুজ্ঞাকে (morality) হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

কান্ট নৈতিকতার এই সর্বোচ্চ নীতি নিঃশর্ত আদেশকে নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি বয়ানে ব্যক্ত করেছেন :

প্রথম বয়ান : "এমন ব্যক্তিগত নীতি মেনে কাজ করো যে নীতিকে একই সঙ্গে সর্বজনীন বিধিরূপে তুমি সঙ্কল্প করতে পারো।"

("Act only on that maxim which you can at the same time will to become a universal law.")

দ্বিতীয় বয়ান : এমনভাবে কাজ করো যাতে মানবসত্তা - তা সে তোমার নিজ ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই হোক, বা অন্য কোনো ব্যক্তির মধ্যেই হোক — কখনই নিছক উপায় হিসাবে নয়, সর্বদা উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

("Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never simply as a means, but always as an end.")

তৃতীয় বয়ান : তুমি তোমার ব্যক্তিগত নীতির মাধ্যমে এমন ভাবে কাজ করো যাতে তুমি উদ্দেশ্যে রাজ্যের একজন বিধি-প্রণয়নকারী সদস্য হিসাবে প্রতিপন্ন হও।"

("Act as though you were through your maxims a law-making member of a kingdom of ends.")

কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার আর দু-একটি বয়ান পাওয়া যায় তাঁর লেখার মধ্যে। তবে এর মূল বক্তব্য উপরের তিনটি বয়ান বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসে। আর একটা কথা : বয়ানগুলি মোটেই পরস্পর স্বতন্ত্র নয়, বরং বলা যেতে পারে এক একটি বয়ান নৈতিক বিধির এক একটি দিক্‌কে প্রকাশ করে। কান্টের নীতিদর্শনকে বোঝার জন্য আমরা এখন নিঃশর্ত আদেশের এই বয়ানগুলি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করব।

প্রথম বয়ানে বলা হয়েছে সর্বজনীনতা বা সার্বিকীকরণযোগ্যতা (universalizability) নৈতিক বিধির আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। কোনো ব্যক্তিগত কর্মনীতি (maxim) যদি সার্বিকীকরণযোগ্য না হয় তাহলে সেই বিধি বা নিয়ম কখনই নৈতিক-বিধি (moral-law)-র মর্যাদা পাবে না। বস্তুতঃ যে কোনো নৈতিক মূল্যায়নের মধ্যে এই ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকে যে কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে আমি যেভাবে মূল্যায়ন করছি অনুরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি সেইভাবেই মূল্যায়ন করতে বাধ্য থাকব। আমার কোনো কর্মবিধি যদি সকলের জন্য ইচ্ছে করতে না পারি তাহলে তা কখনই নৈতিক বিধি হবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি যদি অভাবী মানুষকে সাহায্য করার নিয়ম মেনে কাজ করি, আমার এই কর্ম-নিয়ম নৈতিক নিয়ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন আমি কোনোরকম অসংগতির সূচনা না করে সঙ্কল্প করতে পারবো যে সকলেই অভাবী মানুষকে সাহায্য করুক। ঠিক একই রকম ভাবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলার কর্মনীতি তখনই নৈতিক বিধির মর্যাদা পাবে যখন কোনো গুরুতর আত্ম-অসংগতি ছাড়াই আমি সঙ্কল্প করতে পারব যে সকলেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুক।

এখানে যে আত্ম-অসঙ্গতির প্রসঙ্গ তা স্পষ্ট হবে যদি আমি নিম্নোক্ত ব্যক্তিগত কর্মনীতিটি বিচার করি :

"যখনই আমি অর্থের অভাব-বোধ করব তখনই পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধার নেব, অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন হয়েই যে, ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হবে না।"

দেখা যাক্ এই ব্যক্তিগত নীতিটি সকলের জন্য সঙ্কল্প বা অভিপ্রায় করা যায় কিনা। কান্টকে অনুসরণ করে এই বিধিকে সার্বত্রিক বিধিরূপে কল্পনা করলে দাঁড়ায় :

"প্রতি ক্ষেত্রে, যখনই সে অর্থের অভাব-বোধ করবে তখনই সে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধার নেবে, অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন হয়েই যে ঐ প্রতিশ্রুতি রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়।"

বলা বাহুল্য, এরূপ সার্বত্রিক বিধিগঠনের প্রয়াসের মধ্যে এক আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতি রয়েছে। একজন ব্যক্তির নিজের ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদান সম্ভব হলেও পৃথিবীর সব মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদানে অভ্যস্ত হোক - এরকম সার্বিক বিধিগঠনের উদ্যোগ শুধু আত্মঘাতীই নয়, সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদানের প্রক্রিয়াটিই অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, কান্ট এই নিঃশর্ত আদেশকে নৈতিকভাব সর্বোচ্চ একক মানদণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে নিঃশর্ত আদেশ অবশ্যমান্য, এবং সর্বজনীনযোগ্যতা এই আবশ্যিকতা প্রদান করে। কিন্তু নিঃশর্ত আদেশের যে ব্যাখ্যা কান্ট দিয়েছেন তাতে করে এই মানদণ্ড যে পর্যাপ্ত তা প্রমাণ হয় না। এমন অনেক ব্যক্তিগত বিধি সম্ভব যেগুলির সার্বিকীকরণের ইচ্ছা আমি করতে পারি। কিন্তু সেগুলি মোটেই নৈতিক বিধি নয়। যেমন, আমি কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সহাস্যবদনে প্রীতি বিনিময় করি। আমার এই ব্যক্তিগত বিধি সকলে অনুসরণ করুক এমন আমি ইচ্ছা করতে পারি। কিন্তু তাহলেই কি এই সামাজিকতার বিধি নৈতিক বিধিতে পরিণত হবে? অধ্যাপক সি.ডি. ব্রড তাই মন্তব্য করেছেন যে নিঃশর্ত আদেশের এই বয়ানটি নৈতিক নিয়মের মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু স্বরূপত এই আদেশ নিজে নিজেই নৈতিক গঠন করে না।

আমরা এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় বয়ানের দিকে মনোযোগ দেব। দুটির বক্তব্য পরস্পরভেদী, এবং তাই এ দুটিকে একসঙ্গে আলোচনা করা যায়। দ্বিতীয় বয়ানে প্রজ্ঞাবান (rational) প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাকে উপায় হিসাবে না দেখে সর্বদা উদ্দেশ্য হিসাবে বিচার করার আদেশ আছে। তৃতীয় বয়ানে নিজেকে উদ্দেশ্যরাজ্যের বাসিন্দা ও বিধিপ্রণয়নকারী সত্তা হিসাবে বিচার করার কথা আছে। আসলে কান্ট বলতে চান নিজেকে বা অপর কোনো বুদ্ধিমান সত্তাকে অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে বিচার করা কখনই নৈতিক অবস্থান হতে পারে না। প্রতিটি বুদ্ধিমান সত্তার স্বতন্ত্র তথা স্বগত মূল্য আছে এবং কোনোরূপ নৈতিক মূল্যায়নের সময় এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। কান্ট নৈতিক সমাজকে উদ্দেশ্য-রাজ্য (a kingdom of ends) হিসাবে কল্পনা করেছেন, যার প্রতিটি সদস্য এক এক বিধিপ্রনয়নকারী সত্তা।

কান্ট দৃষ্টান্ত সহযোগে বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। ধরা যাক্, সাংসারিক দুঃখকষ্টে ক্লান্ত কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যার কথা ভাবছে। নিজের প্রতি আবশ্যিক কর্তব্য প্রসঙ্গে যে নিজেকেই প্রশ্ন করবে তার এই আচরণ লক্ষ্যরূপে মনুষ্যত্বের কল্পনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে ক্লেশজনক অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্য যখন কেউ নিজেকে বিনাশ করতে উদ্যত হয় তখন যে তার ব্যক্তিসত্তাকে কেবলমাত্র

সারাজীবন গ্রহণযোগ্য সুখের অবস্থা বজায় রাখার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষ কোনো বস্তু বা জিনিস নয়। তাই তাকে শুধু কোনো উদ্দেশ্য সাধনের হিসাবে ব্যবহার করা চলে না। আমি আমার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে উপায় হিসাবে তার অপব্যবহার করতে পারি না, তাকে বিকৃত বা বিনষ্ট করতে পারি না।

দ্বিতীয়ত, অন্যের প্রতি অলঙঘ্য কর্তব্য দেখা যায় যে অপর ব্যক্তিকে সে শুধুমাত্র নিজের কোনো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত, যে উদ্দেশ্য ঐ অপর ব্যক্তিকে সে কেবল নিজের কোন এক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় রূপে ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত, যে উদ্দেশ্যে ঐ অপর ব্যক্তির কোনো অংশীদারিত্ব নেই। কিন্তু যুক্তিবান প্রাণীরূপে ঐ ব্যক্তি লক্ষ্যরূপে মর্যাদালাভের এবং তাই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সে স্বয়ং ঐ উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণেরও দাবী করতে পারে। তৃতীয়তঃ কান্ট মনে করিয়ে দিয়েছেন যে নিজের প্রতি অনবশ্যম্ভাবী বিচক্ষণ কর্তব্যের ক্ষেত্রে আমাদের মনুষ্যত্বকে স্বকীয় লক্ষ্যরূপে কল্পনার সঙ্গে আচরণটির বৈপরীত্য না থাকাই যথেষ্ট নয়, আচরণটিকে ঐ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও হতে হবে।

অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে দুজন ব্যক্তির কোনো একজনকে উদ্দেশ্য হিসাবে না দেখে উপায় হিসাবে দেখতেই হয়। যখন সংক্রামক রোগগ্রস্ত কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করে রাখি তখন আমরা তাকে সংক্রমনের কারণ হিসাবে বিচার করি, তাকে অন্যের সংক্রমনের উপায় হিসাবে ভাবি। কিন্তু তাকে যদি আলাদা করে না রাখি, তাহলে অপর ব্যক্তিদের তার আরাম বা সুবিধার জন্য উপায় হিসাবে বিচার করা হয়। তাই কাউকে কখনই উপায় হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না এ দাবী সকল ক্ষেত্রে মেনে চলা বোধ হয় সম্ভব নয়। তবে আমাদের মনে হয় কান্টের বক্তব্যের আরও গভীর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই অসংগতি আপাত। আরও উন্নততর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে এখানে নিছক উপায় হিসাবে দেখা হচ্ছে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে নৈতিক নীতিগুলি কেন আমাদের কাছে অবশ্যমান্য হিসাবে প্রতিভাত হয় কান্ট তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নীচের বিবৃতিটিতে, যেটিকে অনেকে নিঃশর্ত আদেশের আর একটি বয়ান হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। "A principle of moral conduct is morally binding on me if and only if I can regard it as a law which I impose on myself."

এর অর্থ : নৈতিক আচরণ সংক্রান্ত কোনো নীতি আমার কাছে অবশ্যমান্য হবে যদি এবং কেবল যদি সেই নিয়মটিকে নিজের উপর স্ব-আরোপিত মনে করতে পারি।

পূর্বালোচিত তৃতীয় বয়ানে যদিও নীতি প্রণয়নকারী সত্তা হিসাবে ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তথাপি নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয়টি যেখানে সুস্পষ্ট নয়। নিঃশর্ত আদেশে আদিষ্ট হয়ে আমরা যে কাজ আমরা করি তা কিন্তু স্বেচ্ছারোপিত বাধ্যবাধকতা। যদি তা না হত, কর্মকর্তা যদি সংশ্লিষ্ট নীতিটিকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন না করত, তাহলে তা নৈতিক বিধি হিসাবে গণ্য হতো না। কান্টের মতে, যুক্তিবান মনুষ্যব্যক্তির কর্ম-প্রয়াস কেবলমাত্র নিঃশর্ত অনুজ্ঞারূপে বিধির কর্তৃত্বের অধীন — এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়, স্বীয় আচরণের বিধি প্রণেতারূপে তার এই বিধির প্রতি আনুগত্য। স্বেচ্ছারোপিত বলেই তা আমরা মানতে বাধ্য থাকি। আসলে নৈতিক বিধি এমন নিয়ম যা আমাদের যুক্তিসত্তাই আমাদের মানতে প্রণোদিত করে। আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞার কাছে এই বিধি মেনে চলাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিভাত হয়। স্ব-আরোপিত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আমরা থাকি বলেই বোধ হয় বলা হয় "There is no holiday in morality."

কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার কান্টের নীতিতত্ত্বকে নিয়ম-উপযোগবাদ (Rule-utilitanism) হিসাবে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস পান। তাঁদের মতে, কান্ট প্রতিশ্রুতিদানের যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতে মনে হয় প্রতিশ্রুতিদানের নিয়মটির সার্বিকীকরণ করতে গিয়ে তার বিপজ্জনক ফলাফল লক্ষ্য করেছেন, এবং এরূপ পরিণামের কথা ভেবেই নিয়মটিকে বেঠিক বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এরূপ বিচার যথোচিত নয়। কান্টের বক্তব্য এরূপ ছিল না যে বিশ্বসুদ্ধ মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকলে তার ফলাফল ভয়ঙ্কর হবে। বরং কান্টের বিবক্ষা ছিল প্রতিটি মানুষ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতি যুক্তির দৃষ্টিতে অকল্পনীয়, অসঙ্গতিপূর্ণও। কারণ সে ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিদান রূপ ব্যবস্থাটিই লোপ পাবে। তাই কান্টের নীতিতত্ত্বকে নিয়ম-কর্তব্যবাদ (Rule-Deontology) হিসাবে বুঝতে হবে। তবে কান্টের নীতিতত্ত্ব যে আকার সর্বস্ব, কঠোর এধরনের সমালোচনা অসঙ্গত নয়। কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞাবিধি কোনো ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি স্বীকার করে না। কোনো এক ব্যক্তির প্রাণ বাঁচানোর জন্য একটি মিথ্যাভাষণও মনে হয় এখানে অনুমোদন পায় না। আসলে কান্ট এখানে সর্বোচ্চ নৈতিক বিধির অনুসন্ধান করেছেন, যেখানে কোনোরূপ অসঙ্গতি, পরনিয়ন্ত্রণের স্পর্শ থাকবে না। তাই নিছক জাগতিক লাভ-লোকসানের হিসাব নিকাশ এখানে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। কান্টের মতে, একটি মিথ্যাভাষণ (এমন কি তা যদি একজন ব্যক্তিকে নিশ্চিত ধ্বংসের থেকে বাঁচাবার জন্যও হয়) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যুক্তিবত্তা, তার মানবিক মর্যাদা, তার অধিজাগতিক স্থিত অস্তিত্ব (noumenal self) কে ক্ষুণ্ণ করে, তাকে অবভাসিক জগতের ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, কামনা বাসনা যুক্ত নিছক এক প্রাণীতে পরিণত করে। পক্ষান্তরে অধি-জগতের বাসিন্দা হিসাবে আমি কেবল এটাই অভিপ্রায় করতে পারি যে সকলে পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবে সত্য কথা বলুক। আসলে কান্টের নীতিতত্ত্বকে বুঝতে হলে আমাদের এই দ্বৈতসত্তার তত্ত্বকে বুঝতে হবে, কান্টের সামগ্রিক সত্তাতত্ত্বের নিরিখে নীতিতত্ত্বের বিচার করতে হবে।

১.২.৩ ■ সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ :

এই পাঠে কর্তব্যবাদী নীতিতত্ত্ব হিসাবে আমরা কান্টের নীতিতত্ত্বের আলোচনা করেছি। যদিও কর্তব্যবাদী তত্ত্ব আরো কয়েকটি আছে, তথাপি কান্টের নিঃশর্ত আদেশের নীতিতত্ত্ব সর্বোৎকৃষ্ট। নিয়ম-কর্তব্যবাদী কান্ট ফলাফলের নিরিখে নয়, কর্তব্যতার নীতির ভিত্তিতে মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করার কথা বলেন। কোনোটি কর্তব্য তা আমাদের ব্যবহারিক প্রজ্ঞা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্দেশিত হয়। কান্ট এই নির্দেশকে নিঃশর্ত আদেশ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিজের বিবেক বা ব্যবহারিক প্রজ্ঞা থেকে উৎসারিত এই কর্তব্যাদেশ অলঙঘনীয়।

১.২.৪ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

বর্তমান পাঠ্যসূচি ও রীতি অনুযায়ী এক একটি প্রশ্ন ১৬ নম্বরের। তবে তার মধ্যে নম্বরের বিভাগ থাকতে পারে। নীচে কয়েকটি প্রশ্ন অনুশীলনের জন্য দেওয়া হল :

1. Distinguish between (a) Consequentialism and eontology, and (b) Act-Deontology and Rule-Deontology
2. What is Good Will, according to Kant ? Eplain its nature. How is it related to Kant's moral principle?
3. Determine the nature of categorical imperative as against hypothetical imperative. How does Kant explain his deontological moral theory in terms of categorical imperative?
4. What is categorical imperative ? State and explain different versions of categorical imperative in connection with Kant's moral theory.
5. Writes short notes on : a) Prudence and morality, b) 'Duty for duty's sake' c) Rule-Deontology and Rule-Utilitarianism d) Autonomy and heteronomy of will.

১.২.৫ ■ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সিলেবাসে যে সব বই -এর উল্লেখ আছে যেগুলি অবশ্যপাঠ্য, তার অতিরিক্ত কয়েকটি বই, প্রবন্ধের নাম এখানে করা হল :

১) সোমনাথ চক্রবর্ত্তী : নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা (প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স)
(বিশেষ করে ষষ্ঠ অধ্যায়)

২) রাসবিহারী দাস : কান্টের দর্শন (রাজ্য পুস্তক পর্ষদ) ('নীতিবিচার' অধ্যায়)

৩) প্রহ্লাদ কুমার সরকার (সম্পাদক) : কান্টের দর্শন (দর্শন ও সমাজ)
(বিশেষ করে ১২ নং মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের 'কান্ট' এর নীতিতত্ত্ব-প্রবন্ধ)

৪) Wikipedia internet edition (সাম্প্রতিক আলোচনার জন্য) (Deontology/Kant ইত্যাদি entries)

একক : ১.৩ ■ উপযোগবাদ (Utilitarianism) : প্রাককথন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উপযোগবাদ পরিণামবাদ বা ফলাফলবাদ (Consequentialism)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ-তত্ত্ব। নৈতিক আত্মবাদ (ethical egoism), পরার্থবাদ (altruism) ইত্যাদি অন্যান্য ফলাফলবাদী তত্ত্ব। এই তত্ত্ব কাজের উপযোগ ফলাফলের ভিত্তিতে কোন কাজের নৈতিক মূল্যায়ন করে। এই উপযোগ ফলাফল বলতে অনেকে বোঝেন সুখবৃদ্ধি। অন্যেরা সুখ ছাড়া জ্ঞান, আত্মোন্নতি ইত্যাদির কথা বলে থাকেন। প্রথম দল যাঁরা সুখের ভাষায় উপযোগকে বোঝেন তাদের সুখবাদী উপযোগবাদী বলা হয়। অন্যদের অ-সুখবাদী বা আদর্শ উপযোগবাদী বলা হয়ে থাকে।

অন্যদিক থেকে উপযোগবাদকে দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে : কর্ম-উপযোগবাগ (Act-utilitarianism) ও নিয়ম-উপযোগবাদ (Rule-Utilitarianism) যাঁরা এক একটি কর্ম উপযোগী কিনা, ভাল কিনা বিচার করেন তাঁদের মতবাদকে কর্ম-উপযোগবাদ বলা হয়। আর যাঁরা এক বা খোধিক নিয়মের নিরিখে কাজের ভাল-মন্দ বিচার করেন তাদের নিয়ম-উপযোগবাদী বলা হয়। কেউ কেউ (যেমন, উইলিয়াম ফ্রাঙ্কেনা) আবার সাধারণ উপযোগবাদ (General Utilitarianism)-এর কথা বলে থাকেন। এখানে যেরূপ বিচার করা হয়, তা অনেকটা এরকম : 'সকলে যদি এমন পরিস্থিতিতে এ রকম কাজ করে তাহলে কি হবে?' আমরা অবশ্য এখানে কেবল বেন্থাম-মিলের উপযোগবাদের আলোচনা করব। বিশেষ করে আমরা মিলের অনুসারী হব।

আর একটা কথা 'উপযোগবাদ' শব্দটির উৎস নিয়ে। 'উপযোগবাদী' (utilitarian) শব্দটি জেরেমি বেন্থাম প্রথম ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। তিনি শব্দটিকে প্রথমে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং পরে ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পত্রে ব্যবহার করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, নাম ছাড়া কোন নতুন বিষয় এক অদ্ভুত জিনিসে পরিণত হতে পারে এবং তাই তিনি 'উপযোগবাদ' শব্দটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। তবে বেন্থাম যে শব্দটি প্রথমে ব্যবহার করেন তা হয়তো মিলের জানা নাও থাকতে পারে। কেননা মিল দাবী করেছেন যে তিনি জন গল্টের উপন্যাস 'Annals of the Parish' থেকে শব্দটি পেয়েছেন।

১.৩.১ ■ মিলের উপযোগবাদ

বলা বাহুল্য, জন স্টুয়ার্ট মিল উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নন, আধুনিক যুগে উপযোগবাদের প্রথম পরিচয় আমরা পাই জেরেমি বেন্থামের রচনার মধ্যে। বেন্থাম তাঁর "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation" গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই 'উপযোগ-নীতি' সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেছেন। এই উপযোগ-নীতিকে নীতিবিচারের ভিত্তি বলে মন্তব্য করেছেন। এই নীতির পরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন "By principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever, according the happiness of the party whose interest is in question ..." মিল-বেন্থামের এই উপযোগবাদী নীতিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন। সামাজিক মানুষের সুখ-বিধানের আদর্শকে সামনে রেখে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কাজের মূল্যায়ন করাই আমাদের নৈতিক আদর্শকে হওয়া উচিত এবিষয়ে মিলের মনে কোনো সংশয় ছিল না। তবে বেন্থামের তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা, একই সঙ্গে কিছু ভুল বোঝাবুঝি ও সমালোচনা, মিলকে এই তত্ত্ব সম্পর্কে পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত করে। মিলের বিখ্যাত 'Utilitarianism' প্রবন্ধটি বেন্থামীয় উপযোগবাদের বিস্তার বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, বেন্থাম সুখের কেবল পরিমাণগত পার্থক্যই স্বীকার করেছেন, যা মিলের মনঃপূত হয় নি। তিনি সুখের গুণগত মাত্রা (qualitative difference) এর কথা বলেছেন। আবার কেন আমি অন্যদের সুখ চাইব-এ প্রশ্নের উত্তরে বেন্থাম কয়েকটি বর্হিনিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। মিল একই সঙ্গে অন্তরের নিয়ন্ত্রণের (internal sanction) এর প্রস্তাব করেছেন। আমরা বলতে পারি, মিল বেন্থামের উপযোগবাদের আদর্শতত্ত্বকে সংস্কৃত ও উন্নত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মিলের উপযোগবাদের আলোচনার আগে আর একটা কথা বলা জরুরী : মিল তাঁর 'Utilitarianism' প্রবন্ধটি রচনার আগে 'On Liberty' প্রবন্ধে চরম ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলেছেন। দ্বিতীয়োক্ত প্রবন্ধে তিনি এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে একজন ব্যক্তি চূড়ান্তভাবে স্বাধীন। কিন্তু যেই মাত্র ব্যক্তির আচার-আচরণ অপরের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে, অপরকে প্রভাবিত করে তখন তার নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাঁর বিখ্যাত ক্ষতি-নীতি (the harm principle) এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে উপযোগতত্ত্ব সেই আদর্শ রক্ষাকবচ যার মাধ্যমে মিল ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। আমরা এখন সরাসরি মিলের "Utilitarianism" প্রবন্ধকে অনুসরণ করে তাঁর উপযোগবাদী নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা করব, অবশ্য সংক্ষেপে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপযোগবাদের মূলনীতিটিকে মিল এভাবে ব্যক্ত করেছেন : "[A] ctions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness." এর অর্থ, যে কাজ যতটা মাত্রায় সুখসৃষ্টির সহায়ক সেই কাজ সেই পরিমাণ সঠিক বা ভাল। বিপরীতে যে কাজ যতটা পরিমাণে দুঃখ-জনক সেই কাজ ততটা মাত্রায় বেঠিক, মন্দ। তবে এখানে 'সুখ' বলতে দুঃখের সংশ্রবহীন সুখকে বুঝতে হবে। আমরা অন্য একটি শব্দ 'আনন্দ' কথাটি এখানে ব্যবহার করতে পারি। যদিও ভারতীয় দর্শনে 'আনন্দ' শব্দটির বিশেষ পারিভাষিক অর্থ আছে, তথাপি মিল কথিত দুঃখের সংশ্রবহীন সুখকে বোঝাতে 'আনন্দ' শব্দটির চেয়ে উপযুক্ত শব্দ আর কিই বা হতে পারে! সেক্ষেত্রে মিলের উপযোগনীতির মানে দাঁড়ালো : যে কাজ যে অনুপাতে আনন্দবর্ধনে উপযোগী সেই কাজ সেই অনুপাতে ভাল বা সঠিক।

উক্ত নীতিতে যদিও 'উপযোগ' (Utility) শব্দটি স্পষ্টত নেই, তথাপি বুঝতে অসুবিধা হয় না মিল আনন্দসৃষ্টিরূপ প্রবণতাকেই এখানে উপযোগিতা বুঝেছেন। অর্থাৎ যে কাজ দুঃখের তুলনায় অধিক আনন্দবর্ধনে উপযোগী সেই কাজ সঠিক, ভাল।

বেন্থাম-প্রস্তাবিত উপযোগবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে এই নীতিতত্ত্ব মানুষের মহত্ত্বকে অস্বীকার করে মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণকারী পশুর স্তরে নামিয়ে এনেছে। এরূপ সমালোচনার উত্তরে মিল বলেন, উপযোগবাদীরা নন, বরং আপত্তিকারীরাই মানুষকে নিম্নস্তরের প্রাণী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে শূকর যে ধরনের সুখ অন্বেষণ করে মানুষও সেরকম সুখের পিছনেই সর্বদা ছুটে বেড়ায়। মিল মন্তব্য করেছেন যে পশুর সুখ আর মানুষের সুখের ধারণা এক নয়। পাশবিক সুখ আনন্দের স্তরে পৌঁছতে পারে না। মানুষের উন্নত সুকোমল বৃত্তি আছে, তার বুদ্ধি আছে, বিবেক আছে, যা — পশুর নেই। তিনি সুন্দর ভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন : পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে মানুষের বৃত্তিসমূহ অধিকতর উন্নত স্তরে অবস্থান করে এবং যখনই একবার এই বৃত্তিসমূহ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা হয় তখনই কোনো কিছু সুখ হিসাবে তার কাছে গণ্য হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এগুলির পরিতৃপ্তি তার উদ্দেশ্য (end) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।

বুঝতে অসুবিধা হয় না মিল এখানে সুখের গুণগত পার্থক্যের (qualitative difference) প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।বেন্থামের সুখ-কলন (hedonistic calculas) সুখের পরিমাণগত পার্থক্যের

(quantitative difference) প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। বেন্থামের সুখকলন (hedonistic calculas) সুখের পরিমাণগত পার্থক্য (quantitive difference) প্রতিই ইঙ্গিত করে। মিল পরিমাণের সঙ্গে গুণগত পার্থক্যের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব সহকারে বিচার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : "It is better to be human being dissatisfied than a fool staisfied, better to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied." মিল স্পষ্টতই উচ্চতর সুখ বলতে উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি তথা মানসিক শান্তিকে বুঝিয়েছেন। এই উচ্চতর সুখ বা আনন্দের পরিমাপ কিভাবে হবে সে প্রসঙ্গে মিল বলেন, "দুটি সুখের মধ্যে যদি একটি সুখ এমন হয় যা পছন্দ করতে নৈতিক বাধ্যবাধকতার অনুভূতি উল্লেখ না করে উভয়ের সম্পর্কে অবহিত সবাই বা প্রায় সবাই একটি সুখের প্রতি সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, তাহলে সেটাই হবে অধিকতর কাম্য সুখ।"

[প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভাল, সুখ-আনন্দের এরূপ গুণগত পার্থক্য স্বীকার করে মিল সুখবাদের (hedonism) মূল ধারা থেকে সরে এসেছেন। পরিমাণের বিচারে সমান দুটি সুখের মধ্যে একটি সুখ কেবল গুণগত তারতম্যের কারণে অপরটির অপেক্ষা উচ্চবর্ণের সুখ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সুখকে স্বতন্ত্র স্বস্থিত মূল্য হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না, সুখের অতিরিক্ত গুণের কথাও চিন্তা হয় না কি?]

উপযোগবাদকে অনেক সময় বিচক্ষণতা (Prudence) বা সুবিধাবাদ বলে ব্যাখ্যা করা হয়, যার সঙ্গে নৈতিকতার যোগ নেই। মিলের মতে এ ধরনের অভিযোগ সত্য নয়। সুবিধাজনক বিচক্ষণতা বলতে শুধু তাই বোঝায় যা ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের অনুকূল, যেমন, একজন মন্ত্রী যখন নিজের মন্ত্রিত্ব টিকিয়ে রাখতে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেয়। নৈতিকতার মধ্যে সংবেদনশীল উচ্চ মানবিক বিবেকবোধ রয়েছে, সার্বিক সুখবিধানের ব্যাপার রয়েছে, যা সুবিধাবাদের মধ্যে নেই। আরো এক আপত্তি মাঝেমধ্যে উঠে : সুখের পিছনে ছোটা কি করে সকলের পরম লক্ষ্য হতে পারে? বৃহত্তর স্বার্থে জীবনে সুখকে যাঁরা জলাঞ্জলি দিয়েছেন সেইসব মহাত্মারা কি তাহলে ভ্রান্তদর্শী? মিল অবশ্য বলবেন যে মহাত্মা নিজের অমূল্য জীবন বির্সজন দিয়ে শহীদ হয়েছেন তিনি যদি বুঝতেন যে তাঁর আত্মোৎসর্গের ফলে জগতের কিছু মাত্র কল্যাণ হবে না তাহলে নিশ্চয়ই ঐ আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হতেন না। তাঁর ভাষায়, "যদি তিনি মনে করতেন যে তাঁর নিজের সুখকে পরিত্যাগ করা স্বশ্রেণীর জীবের কারোর জন্য কোন সুফল উৎপন্ন করবে না, বরং তাদেরকে আরো (খারাপ) অবস্থার মধ্যে ফেলবে - তাহলে তিনি কি আত্মোৎসর্গ করতেন?"

প্রসঙ্গত, উপযোগবাদ সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ — আনন্দ বিধানের আদর্শ প্রচার করে, পরিপূর্ণ আনন্দের আদর্শ নয়। দুঃখকে যতদূর সম্ভব পরিহার করে সম্ভাব্য সর্বাধিক সুখের সন্ধান করা, সমাজ - যথাসম্ভব মন্দের ভাগ কমিয়ে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়াই উপযোগবাদের উদ্দেশ্য।

১.৩.২ ■ উপযোগবাদের প্রমাণ

মিলের উপযোগবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল উপযোগ-নীতির সমর্থনে মিলের প্রমাণ। প্রবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে মিল সার্বিক আনন্দবিধান নৈতিকতার একমাত্র মাপকাঠি-এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিতর্কের

মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষায় যুক্তিটি এরকম : ''The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it. They only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner. I apprehend ..., the sole evidence it is possible to produce that anything is desirable is that people do actually desire it.'' সহজ বাংলায় এর মানে, প্রতিটি ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে দুঃখ পরিহার করে বিশুদ্ধ সুখ অর্থাৎ আনন্দ কামনা (desire) করে। এই বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি : প্রতিটি ব্যক্তির আনন্দ তার নিজের কাছে কাম্য (desirable)। আর এক ধাপ এগিয়ে সমাহার যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় সর্বসাধারণের সুখ আমাদের সকলের কাম্য!

আপাতবিচারে যুক্তিটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হয়। কিন্তু সমালোচকরা দেখিয়েছেন মিলের এই যুক্তি বিভিন্ন ধরনের দোষে দুষ্ট। জি.ই. ম্যুর মিলের এই যুক্তির মধ্যে স্বভাববাদী দোষ (Naturalistic fallacy) এর অভিযোগ তুলেছেন। মানুষ যা কামনা করে, যা চায়, তাই যদি কাম্য বা ভাল বলা হয় তাহলে বাস্তব ঘটনা (fact) এবং নৈতিক মূল্য (value)-এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, 'কাম্য' (desirable) শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে দ্ব্যর্থকতা (ambiguity) এর কথা বলেছেন অনেকেই। 'যা আমরা কামনা করি ' তা 'কাম্য', আবার যা কামনার যোগ্য তা 'কাম্য' বলার অপেক্ষা থাকে না এই দুই প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিল 'কাম্য' এর দুটি অর্থের মধ্যে পার্থক্য মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন। বস্তুতঃ এই পার্থক্যের মধ্যেই বাস্তবতা ও নৈতিকতার পার্থক্য নিহিত আছে। তৃতীয়তঃ, মিলের এই যুক্তি অবৈধ সমাহার দোষে (fallacy of composition) দুষ্ট। 'প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যা ভাল তাই সর্বজনীন ভাল' 'কোনো শহরের প্রতিটি ব্যক্তির অধিকার আছে নিজের বাড়ির দরজা খুলে রাখার, অতএব শহরের সকলের অধিকার আছে যে কোনো বাড়ির দরজা খোলা এই যুক্তির সমতুল্য। আসলে কোনো শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি সম্পর্কে যা সত্য তা সামগ্রিক শ্রেণী সম্পর্কে সত্য নাও হতে পারে।

১.৩.৩ ■ সারসংক্ষেপ ও সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মিলের উপযোগবাদ চিন্তার জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বেন্থাম-মিলের উপযোগবাদের উপর ভিত্তি করে নানা ধরনের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। উপযোগবাদ উদারনীতিবাদ ও কল্যাণমূলক অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি। ব্যবহারিক নীতিতত্ত্বে এই উপযোগবাদ নতুন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। একই সঙ্গে মিল-বেন্থামের সাবেকী উপযোগবাদকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রবণতাও স্পষ্ট। হেনরি সিজউইক প্রমুখ অনেক নীতিতাত্ত্বিক উপযোগবাদের নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। সমকালীন নীতিচিন্তায় উপযোগবাদ নতুন নতুন নাম ধারণ করেছে। কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন কাজের গড় উপযোগিতার ভিত্তিতে নীতিবিচারের তত্ত্বকে বলা হয়ে গড় উপযোগবাদ (Average Utilitarianism)। পিটার সিঙ্গার প্রমুখ পছন্দ উপযোগবাদ (Preference Utilitarianism) কথা বলেছেন : একাধিক বিকল্প

পছন্দের মধ্যে যে পছন্দটি মন্দের তুলনায় অধিক কল্যাণ উৎপন্ন করে সেটিই নীতির বিচারের সঠিক পছন্দ। নামকরণের বৈচিত্র্যে আরো চমক : নঞর্থক উপযোগবাদ (Negative Utilitarianism)। অধিকাংশ উপযোগবাদী যেখানে সদর্থক ভাষায় সর্বাধিক মানুষের সর্বোচ্চ পরিমাণে সুখের ভাষায় নীতিবিচারে প্রস্তাব করেন, নঞর্থক উপযোগবাদ বিপরীতক্রমে দুঃখ, অমঙ্গল বা ক্ষতিকে ন্যূনতম করার কথা বলে।

১.৩.৪ ■ নমুনা প্রশ্ন

1. What is utilitiarianism? Distinguish between act-utilitarianism and rule-utilitarianism, How would you characterise Mill's utilitarianism?
2. State and explain the basic tenets of utilitarianism. Is the theory fully staisfactory?
3. Define the moral principle of utility. How does Mill try prove that general happiness is the only end of morality?
4. How does Mill react to the objections below ?

   a) To suppose that human life has no higher or nobler end than pleasure is to designate man as utterly mean and grovelling.

   b) The utilitarian morality does not recognise self-sacrifice, as the sole end here is to seek for pleasure.

   c) The utilitarian standard is too high for humanity in general to adhere to.

১.৩.৫ ■ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

সিলেবাসে নির্দিষ্ট বই ছাড়া নিম্নোক্ত বইগুলি অবশ্যপাঠ্য :

১) সোমনাথ চক্রবর্ত্তী : নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা, প্রোগেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা (বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়)

২) মুহম্মদ আবদুল বারী : উপযোগবাদ : তত্ত্ব ও সমীক্ষা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (বাংলাদেশ)

৩) ইন্টারনেট

পাঠ একক - ২

অবগতিমূলক নীতিতত্ত্ব : প্রকৃতিবাদ, স্বজ্ঞাবাদ ও বর্ণনাবাদ

একক : ২.০ : উদ্দেশ্য

একক : ২.১ : অধিনীতিবিদ্যা : প্রাক্‌কথন

একক : ২.২ : অবগতিমূলক তত্ত্ব ও অনবগতিমূলক তত্ত্ব

২.২.১ : প্রকৃতিবাদ

২.২.১.১ : প্রকৃতিবাদের সমালোচনা ও সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

২.২.২ : ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদী স্বজ্ঞাবাদ

২.২.২.১ : ম্যুরের নৈতিক প্রকৃতিবাদ খণ্ডন

২.২.২.১.১ : ভাল অসংজ্ঞায়নযোগ্য

২.২.২.১.২ : প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি

২.২.২.১.৩ : মিল ও প্রকৃতিবাদী বিভ্রান্তি : হাডসনের বিচার

২.২.২.১.৪ : ম্যুরের যুক্তির পর্যালোচনা

২.২.২.২ : ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদ

২.২.২.২.১ : স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞানের দাবীর যৌক্তিকতা

২.২.২.৩ : সারসংক্ষেপ ও মন্তব্য

২.২.৩ : বর্ণনাবাদ : প্রাক্‌কথন

২.২.৩.১ : বর্ণনাবাদের মূল বক্তব্য

২.২.৩.১.১ : জে. আর. সার্লের বর্ণনাবাদ

২.২.৩.১.২ : জি. জে. ওয়ারণকের বর্ণনাবাদ

২.২.৩.১.৩ : ফিলিপ্পা ফুটের বর্ণনাবাদ

২.২.৩.২ : সারসংক্ষেপ ও মন্তব্য

২.২.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী / অনুশীলনী

২.২.৫ : গ্রন্থ-নির্দেশিকা

একক : ২.০ ■ উদ্দেশ্য

পাঠ্যসূচির দ্বিতীয় অংশ অধিনীতিবিদ্যা (Metaethics)। অধিনীতিবিদ্যার প্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগুলির পর্যালোচনা আলোচ্য পাঠ-এককের উদ্দেশ্য। প্রথমেই বলে রাখি অধি-নীতিতত্ত্বগুলি জ্ঞানবাদী তত্ত্ব

(Cognitivism) এবং অ-জ্ঞানবাদী তত্ত্ব (Non-cognitivism)-এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সিলেবাস-নির্দেশিত W.D. Hudson -এর 'Modern Moral Philosophy' অনুসরণে তত্ত্বগুলির আলোচনা করব। তবে অন্যান্য দু-একটি সহায়ক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হবে। এই পাঠ এককে আমরা কেবল জ্ঞানবাদী তত্ত্বসমূহের আলোচনায় সীমিত থাকব।

একক : ২.১ ■ অধিনীতিবিদ্যা : প্রাক্‌কথন

সমকালীন নীতিশাস্ত্র, আরো স্পষ্ট করে বললে, বিগত বিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্র, পূর্ব-নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করেই তার দায়িত্ব শেষ করে না। মানুষের কোন্ কাজটি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি ন্যায্য, কোনো মানদণ্ড বা আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করা প্রথম স্তরের অনুসন্ধান (first order inquiry), আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যা যা করে থাকে। দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা শুধুমাত্র এই এক স্তরেই সীমায়িত করে রাখা যায় না। সাধারণতভাবে নৈতিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভাল-মন্দের ধারণা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে, নৈতিক অবধারণের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। নীতিশাস্ত্র যখন এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজে তখন তাকে প্রথম স্তরের বিচার ধারাকে অতিক্রম করে যেতে হয় দ্বিতীয় স্তরের গভীরে। এই ধরণের দ্বিতীয় স্তরের অনুসন্ধান (second-order inquiry) কে অধিনীতিবিদ্যা (metaethics) বলা হয়। একে অনেক সময় নীতি দর্শন (moral philosophy) হিসাবে উল্লেখ করা হয়।

নীতিদর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে মূলতঃ জি.ই. ম্যুরের 'Principia Ethica' (১৯০৩) প্রকাশের পর থেকে আধুনিক অধিনীতিবিদ্যার আলোচনা শুরু হয়। ম্যুর 'ভাল কি?' (What is good?)-এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করেন, যা নীতিশাস্ত্রের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ম্যুরের এ ধরনের বিশ্লেষণী চিন্তাধারার সূত্র ধরেই সমকালীন নীতিশাস্ত্রে স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism), আবেগবাদ (Emotivism), অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদ (Prescriptivism), বর্ণনাবাদ (Descriptivism) প্রভৃতি অধিনীতিতত্ত্বের জন্ম হয়েছে।

একক : ২.২ ■ অবগতিমূলক তত্ত্ব(Cognitivism) ও অনবগতিমূলক তত্ত্ব (Non-cognitivism)

অধি-নীতিতত্ত্বকে জ্ঞানবাদ ও অ-জ্ঞানবাদ — এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এখানে 'জ্ঞান' শব্দটির তাৎপর্য্য আছে জ্ঞানীয় অর্থের ধারণার মধ্যে। জ্ঞানীয় অর্থ বলতে কোন শব্দের নির্দিষ্ট অর্থকে বোঝায়, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান হয়। ফলতঃ, নীতি-দর্শনে জ্ঞানবাদ সেই ধরনের তত্ত্বকে বোঝায় যেখানে মনে করা হয় 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক প্রত্যয়ের বস্তুগত স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং আমরা তা জানতে পারি। একটু ঘুরিয়ে বললে, 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক শব্দগুলি বস্তুগত বৈশিষ্ট্যের সূচক এবং যখন কেউ বলেন 'এটা ভাল' তখন আক্ষরিকভাবেই অবধারণটি একটি বিবৃতিকে প্রকাশ করে, যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। নৈতিক জ্ঞানবাদ হল সেই ধরনের তত্ত্ব যেখানে মনে করা হয় নৈতিক অবধারণগুলি নৈতিক বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক বিবৃতি প্রকাশ করে। আর নৈতিক বিধেয়গুলি, এ মতে, যেহেতু নৈতিক বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রকাশক, সেহেতু

সংশ্লিষ্ট অবধারণগুলি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে।

অপরপক্ষে, নৈতিক অ-জ্ঞানবাদী তত্ত্ব অনুসারে নৈতিক ধারণা তথা বিবৃতিগুলির ঘটনাসংক্রান্ত বিবৃতির মতো কোনো সত্যমূল্য নেই, কোনো জ্ঞানীয় অর্থ নেই। এ মত অনুযায়ী নৈতিক অবধারণগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনোভাব, অনুরোধ, নির্দেশ ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন, যখন কেউ বলেন 'বা:, ভাল কাজ করেছো!' তখন এর মধ্যে দিয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটির প্রতি বক্তার অনুমোদন প্রকাশ পায়। আবার যখন কেউ বলেন, ''কথামতো কাজটি কর'' তখন বক্তা শ্রোতাকে কোনো একটি কাজ কিভাবে করবে তা নির্দেশ করে। এই অনুমোদন বা নির্দেশ-প্রকাশক বিবৃতিগুলির তাই কোনো জ্ঞানীয় মূল্য নেই। এগুলি তাই সত্য নয়, আবার মিথ্যাও নয়। আসলে অ-জ্ঞানবাদী নীতিতাত্ত্বিকেরা নৈতিকতার সেরূপ কোন বস্তুগত ভিত্তি বা সর্বজনীনতা স্বীকার করেন না।

প্রসঙ্গত:, প্রচলিত প্রধান নীতিতত্ত্বগুলির মধ্যে প্রকৃতিবাদ (Naturalism), অপ্রকৃতিবাদ বা স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) ও বর্ণনাবাদ (Descriptivism) জ্ঞানবাদী তত্ত্ব। অন্যদিকে আবেগবাদ (Emotivism) ও নির্দেশবাদ বা পরামর্শবাদ (Prescriptivism) অ-জ্ঞানবাদী তত্ত্ব। তবে বর্ণনাবাদকে আবার কোনো কোনো দার্শনিক জ্ঞানবাদী তত্ত্ব হিসাবেও গণনা করে থাকেন।

২.২.১ ■ প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন সাবেকী প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে-একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তাই প্রকৃতিবাদের আলোচনা প্রথমেই আসে। সাধারণ অর্থে প্রকৃতিবাদ বলতে সেই ধরনের মতবাদকে বোঝায় যা কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বস্তু তথা বৈশিষ্ট্যের ভাষায় যাবতীয় বিষয় —ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদিকে বোঝে। নৈতিক প্রকৃতিবাদ বলতে চায় কথিত নৈতিক প্রত্যয় বা ধারণাগুলির কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, প্রাকৃতিক ঘটনা তথা বৈশিষ্ট্যের ভাষায় এদের ব্যাখ্যা করা যায়। তবে আবেগবাদ বা নির্দেশবাদের মতো নৈতিক প্রকৃতিবাদ কোনো একটি মতবাদ নয়, প্রচলিত বেশ কয়েকটি মতের একটি সমবায়।

প্রকৃতিবাদ জ্ঞানবাদী তত্ত্ব, যেহেতু এই তত্ত্বে নৈতিক অবধারণগুলির সত্যমূল্য স্বীকার করা হয়। 'এটি ভাল' এই অবধারণটি কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, যে বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলে অবধারণের দ্বারা প্রকাশিত বিবৃতিটি সত্য হয়, অন্যথায় মিথ্যা। প্রকৃতিবাদ স্বীকার করে যে নৈতিকতার বিষয়গুলির এক ধরনের বস্তুগততা আছে। তাই নৈতিক বিবৃতি সত্য বা মিথ্যা বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। যদিও এ ধরনের তত্ত্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত নৈতিকতার কোনো সত্তা স্বীকার করে না, তথাপি প্রকৃতিবাদীর কাছে নৈতিকতা কোনো রূপকথা নয়। নৈতিকতার সুসংবদ্ধ বিজ্ঞানও সম্ভব বলে এঁরা স্বীকার করেন। নৈতিক মূল্যের ঘুরপথে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য থেকে নিঃসরণ করার চেষ্টা করে এই তত্ত্ব। যাই হোক, প্রকৃতিবাদের মূল বক্তব্যকে আমরা নিম্নোক্তভাবে সূত্রবদ্ধ করতে পারি :

১) নৈতিক অবধারণগুলি সত্যমূল্যযুক্ত বিবৃতির প্রকাশক এবং তাই জ্ঞানবাদী ও তথ্যপ্রদ।

২) প্রাকৃতিক ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরযোগ্য নয় এমন কোনো নৈতিক ঘটনা এখানে সচরাচর স্বীকৃত হয় না।

৩) নৈতিকতা কোনো ভ্রমাত্মক শাস্ত্র বা রূপকথা নয়। অনেক নৈতিক বিবৃতিকে সত্য বলে সিদ্ধান্ত করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতিবাদ প্রচলিত কয়েকটি অভিমতের সমাহার। বলা যেতে পারে টমাস হবস্, জেরেমি বেন্থাম, জে.এস. মিল, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখ চিন্তাবিদ্দের নীতিতত্ত্বগুলির মাধ্যমেই প্রকৃতিবাদ একটি তাত্ত্বিক চেহারা লাভ করেছে। অবশ্য প্রকৃতিবাদী নৈতিকতার প্রথম পরিচয় আমরা পাই প্রাচীন গ্রীক সাইরেনেইক সম্প্রদায়ের আত্মসুখবাদী নীতিতত্ত্বে। তাঁদের অভিমত ছিল, মানুষের স্বভাব এমনই যে সে সবসময় নিজের সুখের খোঁজ করে। মানব প্রকৃতির এই মনস্তত্ত্ব নীতিতত্ত্বের উৎসভূমি। মানুষ সর্বদা দুঃখের পরিবর্তে সুখ কামনা করে এবং তাই সে মনে করে দুঃখ মন্দ আর সুখ ভাল। এভাবেই নীতিতত্ত্বের সূচনা হয়। হবসের মতে, মানুষ মাত্রেই স্বার্থপর এবং তাই তার কামনাবাসনা আত্মকেন্দ্রিক হয়। তার ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা স্মরণ করেই মানুষ মন্দের তুলনায় ভাল, দুঃখের তুলনায় সুখ কামনা করে। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী মানুষের সেই সমস্ত কাজই নৈতিকভাবে শ্রেয়ঃ যা তাকে সর্বাধিক সুখের সন্ধান দেয়। যে কর্মে ব্যক্তির নিজস্ব সন্তুষ্টিলাভ হয় না সে কাজ ভাল নয়। মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার ভাষায় নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করেন বলে হবসের নীতিতত্ত্ব প্রকৃতিবাদের অভিধাযোগ্য।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বেন্থাম-মিলের উপযোগবাদী সুখবাদের নীতিতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে, এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকৃতিবাদ একটি সুস্পষ্ট আকার লাভ করে। মানুষের স্বভাব তথা মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তথা বৈশিষ্ট্যের ভাষায় বেন্থাম-মিল নৈতিকতাকে বুঝতে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যেহেতু মানুষ স্বভাবতই দুঃখকে পরিহার করে সুখকে পেতে চায়, সেহেতু সুখই আমাদের কাম্যবস্তু। মিল সুখবাদের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন এভাবে : কোনো একটি বস্তু দৃশ্য-এর পক্ষে একমাত্র প্রমাণ এই যে মানুষজন বাস্তবিকই বস্তুটিকে দেখতে পায়। কোনো শব্দ শ্রবণযোগ্য কিনা তা বোঝা যায় মানুষ বাস্তবিক শব্দটি শুনতে পায় কিনা তা বিচার করে। একই রকমভাবে বলা যায় কোনো কিছু কাম্য (desirable) তার পক্ষে প্রমাণ হল মানুষ সত্যিসত্যিই তা কামনা করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক জীব হিসাবে মানুষকে কিছু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। যেমন রাষ্ট্রের আইন না মেনে যদি সুখ চরিতার্থ করতে চায়, তবে তাকে শাস্তি পেতে হয়। এটা বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ। আবার খারাপ আচরণের জন্য ব্যক্তিকে অন্তরের নিয়ন্ত্রণ বিবেকের অনুশাসনে অনুতপ্ত হতে হয়। এটি আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ। এসব নিয়ন্ত্রণের কারণে মানুষ আত্মসুখের পরিবর্তে সর্বাধিক মানুষের সুখ কামনা করতে হয়। তবে বাস্তব মানব-মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এই নীতিতত্ত্ব তাই প্রকৃতিবাদী।

হার্বার্ট স্পেনসারের বিবর্তনবাদী সুখবাদও প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্বের অন্য এক রূপ। তাঁর মতে, নৈতিকতা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় কিছু নয়, ভাল-মন্দের ধারণা বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তিত হয়। প্রাকৃতিক তথা জৈবিক বিবর্তনের ধারা মেনে নৈতিকতা সরল থেকে ক্রমশঃ জটিল ধরণায় পরিণতি লাভ করে। স্পেনসারের মতে, নৈতিকতা ব্যক্তির আবেগ-প্রবণতা এবং যে সমাজে সে বাস করে তার রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আসলে, আমাদের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণকে

আমরা 'ভাল' বলি, আর তার বিপরীতকে বলি 'মন্দ'। এ মতেও যা ভাল তা সকলের জন্য সুখদায়ক, আর যা মন্দ তা সকলের জন্য কষ্টদায়ক। স্পেনসারের নীতিতত্ত্ব এভাবে প্রকৃতিবাদে স্থিত হয়।

২.২.১.১ ■ প্রকৃতিবাদের সমালোচনা ও সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারা বহুকাল ধরে আমাদের নীতিচিন্তাকে প্রভাবিত করে আসছে, কখনও সদর্থকরূপে, কখনও বা নঞর্থকভাবে। এবং এই প্রকৃতিবাদই সেই তত্ত্ব যার সমালোচনা হয়েছে সব থেকে বেশি। বিশেষ করে জি. ই. ম্যুর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শাণিত করেন। এবং ম্যুরের এ সমালোচনার মধ্য দিয়ে অধিনীতিতত্ত্ব গতিলাভ করে। তাই মন্তব্য করা হয়েছে সমকালীন নীতি-দর্শন প্রকৃতিবাদের সমালোচনা বা তার ভিত্তিতে গঠে ওঠা সদর্থক প্রতিক্রিয়া। তাই আমাদের মনে হয় আলাদা করে প্রকৃতিবাদের সমালোচনা বোধ হয় প্রয়োজন নেই। তবুও ম্যুরকে অনুসরণ করে প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে আলোচনা শেষ করছি। প্রথমত: নৈতিক মূল্যকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে প্রকৃতিবাদী তত্ত্বগুলি সাঙঘাতিক এক বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে, ম্যুর যাকে প্রকৃতিবাদী বিভ্রম (Naturalistic fallacy) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। দ্বিতীয়ত: যা প্রাকৃতি, যা বাস্তব তার ভাষায় নৈতিক মূল্যকে বুঝতে গিয়ে এই তত্ত্ব প্রকারান্তরে নীতিতত্ত্বের সম্ভাবনাকেই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

২.২.২ ■ ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদী স্বজ্ঞাবাদ (Non-Naturalistic Intuitionism)

আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ম্যুরের 'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' (১৯০৩) গ্রন্থটি আধুনিক নীতিদর্শনের গতিমুখ স্থির করে দিয়েছে। ম্যুর এই গ্রন্থে বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে নীতিতাত্ত্বিকেরা এতদিন পর্য্যন্ত নীতিশাস্ত্রের মূল প্রশ্নটিকে বোঝার চেষ্টা না করে অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন, এবং এর ফলে নীতিদর্শন শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির (Naturalistic fallacy) সূচনা হয়েছে। ম্যুর প্রচলিত প্রকৃতিবাদী তত্ত্বগুলির অসংগতি তুলে ধরেছেন। যে সব তত্ত্ব প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা ঘটনার (fact) ভাষায় নৈতিক মূল্য (value)-কে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। সে সব তত্ত্বের খন্ডন করে নৈতিক অ-প্রকৃতিবাদ (Moral Non-Naturalism) প্রতিষ্ঠা করেছেন একইসঙ্গে 'ভাল' (good) ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে স্বজ্ঞাবাদ (Intuitionism) এর সূচনা করেছেন।

ম্যুর মনে করেন নীতিশাস্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ পদ বা ধারণা হল ভালত্বের (good-ness) এর ধারণা। অপরাপর নৈতিক ধারণা, যেমন ঔচিত্য, কর্তব্য ইত্যাদি, কমবেশি এই ভালত্বের ধারণার উপর নির্ভরশীল। ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্বের মূল কথা হল 'ভাল' (good) একটি সরল, অসংজ্ঞায়নযোগ্য (indefinable) ধারণা, যা কেবল স্বজ্ঞা (intuition)-র মাধ্যমে জানা যায়। তাই 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক ধারণাকে যদি কেউ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য তথা বাস্তব ঘটনার ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তাহলে মারাত্মক অনুপপত্তির সূচনা হবে, যাকে ম্যুর নাম দিয়েছেন 'প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি' (Natu-

ralistic fallacy)। যাই হোক, ম্যুরের এই অধি-নীতিতত্ত্বের দুটি দিক — একটি নঞর্থক, অন্যটি সদর্থক। প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্বগুলির সমালোচনা করা, তাদের মধ্যে যে প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি ঘটেছে তা দেখানো — এ সব কিছু ম্যুরের নীতিতত্ত্বের নঞর্থক দিক। 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক ধারণা স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা যায় — এই ধারণা আলোচনাকে আমরা সদর্থক দিক বলতে পারি।

২.২.২.১ ■ ম্যুরের নৈতিক প্রকৃতিবাদ খণ্ডন

আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে নৈতিক প্রকৃতিবাদের খণ্ডন এবং নৈতিক স্বজ্ঞাবাদের প্রবর্তনই ম্যুরের মূল উদ্দেশ্য। প্রথমেই ম্যুর দেখাচ্ছেন যে ভালত্ব অসংজ্ঞায়নযোগ্য।

২.২.২.১.১ ■ 'ভাল' অসংজ্ঞায়নযোগ্য (Good as Indefinable)

'ভাল' পদটি অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে ম্যুর প্রথমে তিন ধরনের সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রথমটি আগে থেকে ঠিক করে দেওয়া অর্থ — 'স্টিপুলেটিভ মিনিং'। অন্যটি আভিধানিক অর্থ — 'লেক্সিক্যাল মিনিং'। এই উভয় ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট বস্তুটি উল্লেখ করেই শব্দের অর্থ বিচার করে থাকি। তৃতীয় আর এক ধরনের সংজ্ঞা আছে যা আলোচ্য ক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয় এই সংজ্ঞা কোনো শব্দ দ্বারা কোনো জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে সেটা উল্লেখ করেই কার্যসিদ্ধি করে না, শব্দ-নির্দেশিত বস্তুটির প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করে '...describes the real nature of the object or motion denoted by a word, and ... do not merely tell us what the word is used to mean.'— তবে একটি বিষয় বোঝা দরকার : এ ধরনের সংজ্ঞা তখনই সম্ভব যখন সংশ্লিষ্ট বস্তু বা ধারণাটি জটিল, অংশযুক্ত। আমরা একটি ঘোড়ার এরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি, যেহেতু ঘোড়ার অনেক বৈশিষ্ট্য বা গুণ আছে। আমি যে কোনো এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বসতে পারি 'ঘোড়া চতুষ্পদী' বা 'ঘোড়া দ্রুত দৌড়ায়' ইত্যাদি।

কিন্তু 'ভাল' শব্দটির ক্ষেত্রে এরকম এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ আমরা পাই না যা দিয়ে 'ভাল'-র সংজ্ঞা নির্দেশ করব। ম্যুর লিখছেন : ''Good, than, if we mean by it that quality which we assert to belong to a thing, when we say that the thing is good, is capable of any definition, in the most important sense of that word. The most important sense of 'definition' is that in which a definition states what are the parts which invariably compose a certain whole and in this sense 'good' has no definition because it is simple and has no parts.'' (**Prinicipia Ethica,** pp. 9-10)। ম্যুর বলতে চান 'ভাল' শব্দটি এক সরল গুণকে নির্দেশ করে। আর কোনো সরল ধারণার বিশ্লেষণ সম্ভব নয় — কেবল জটিল বা যৌগিক ধারণারই অংশ-ভিত্তিক বিশ্লেষণ হতে পারে। আসলে সংজ্ঞা দেওয়া বা বিশ্লেষণ করার মানেই হল সংশ্লিষ্ট বিষয়টিকে ক্ষুদ্রতর অংশসমূহে বিভাজিত করে তুলে ধরা। যেমন, যদি মানুষকে আমরা সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে এর জাত্যর্থ (connotation) বুদ্ধিবৃত্তি

এবং জীববৃত্তির রূপ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে বলতে পারি : 'মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব'। কিন্তু যে বস্তু একান্তই সরল, যাকে অন্যেতর সরল উপাদানে ভাঙা যায় না, স্বাভাবিক কারণেই তাকে অসংজ্ঞায়নযোগ্য বলতে হয়।

ম্যুর প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী 'ভালত্ব' একটি সরল ধারণা এবং তাই বিশ্লেষণের যোগ্য নয়, এবং তাই সংজ্ঞায়নযোগ্য নয়। তাঁর মতে, 'ভাল' মানেই ভাল, ঠিক যেমন 'হলুদ' মানে হলুদ। যে কোনো স্বাভাবিক দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তি যেমন সহজেই বোঝেন 'হলুদ' কী ঠিক। তেমনি সাধারণ নৈতিকবোধসম্পন্ন মানুষ সহজেই বোঝেন 'ভাল' কী। তিনি আরও বলেন, 'হলুদ' বলতে যেমন কোনো এক বিশেষ ধরনের কম্পন সৃষ্টি করা বোঝায় না, তেমনি 'ভাল' বলতে যা সুখদায়ক তাকে বোঝায় না। ভালত্বকে কেবল সুখের ভাষায় সংজ্ঞায়িত করলে তা সুখের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সততা, জ্ঞান, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে যা ভাল। আসলে ভালত্বকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন, সর্বদা এ প্রশ্ন উঠতে থাকবেই যে 'তাই কি ভাল?' ম্যুর বলেন 'ভাল' পদটি সংজ্ঞায়নের অতীত এবং তাই একে বলা যায় বর্ণনাতিরিক্ত- 'সুপারভেনিয়েন্ট'। ম্যুরের অ-প্রকৃতিবাদের আরও একটি বক্তব্য হল ভালত্ব এক অ-প্রাকৃত বৈশিষ্ট্য বা গুণ (non-natural property), যা প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণের মাধ্যমে জানা যায় না, কেবল স্বজ্ঞা (intuition) এর মাধ্যমে জানা যায়।

২.২.২.১.২ ■ প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি (The Natualistic fallacy)

ম্যুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার 'প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তি' : 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক প্রত্যয়কে সুখ প্রভৃতি কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য বা কোনো অতি-প্রাকৃত সত্তার সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করতে নীতিশাস্ত্র প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তিতে পড়বে। তাঁর মতে, নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে অতীতের অধিকাংশ নীতিতাত্ত্বিক তাঁদের মতবাদে এই মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 'ভাল'কে মিল উপযোগিতা তথা সুখের ভাষায়, স্পেনসার সামাজিক বিবর্তনের ভাষায়, ব্রাডলী প্রমুখ অতিপ্রাকৃত সত্তার ভাষায় সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। ম্যুর নৈতিক প্রকৃতিবাদ হিসাবে কথিত এসব নীতিতত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, দেখিয়েছেন যে এই নীতিতত্ত্বগুলি প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির শিকার।

ম্যুরের প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির গোড়ার কথা হল, 'ভাল' এক অনন্য সরল ধারণা যাকে কোন কিছুর সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। আর ভালত্ব যে যে সংজ্ঞায়নাতীত তা প্রমাণ করতে গিয়ে ম্যুর পরোক্ষ পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে বলেন, যদি 'ভাল' সরল এবং অসংজ্ঞায়নযোগ্য না হয়, তাহলে দুটি বিকল্প সম্ভব : (ক) 'ভাল' শব্দটি সঠিক বিশ্লেষণের যোগ্য কোনো জটিল ধারণাকে বোঝায়, অথবা (খ) 'ভাল' বলতে মোটেই কিছু বোঝায় না এবং নীতিবিদ্যার নিজস্ব কোনো বিষয় নেই। এই দুই বিকল্পের খণ্ডনের মধ্য দিয়ে ম্যুর নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম বিকল্প সম্পর্কে ম্যুর বলেন, এটি যথার্থ নয় এবং তা এই কারণে যে 'ভাল' -র যে কোনো সংজ্ঞাই দেওয়া হোক না কেন, সর্বক্ষেত্রেই অর্থপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে, সংজ্ঞাটি যথার্থ কিনা। প্রথম বিকল্প খণ্ডনের এই পদ্ধতি 'উন্মুক্ত প্রশ্ন যুক্তি' (Open Question Argument) বলে পরিচিত। দ্বিতীয় বিকল্পটি ম্যুর খণ্ডন করে 'স্ববিরোধিতার প্রমাণ' নামক পদ্ধতির মাধ্যমে।

উন্মুক্ত প্রশ্ন যুক্তি (Open Question Argument) : ম্যুরের উন্মুক্ত প্রশ্ন যুক্তিটির মূল কথা হল : 'ভাল' -কে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন সবক্ষেত্রেই এই প্রশ্নটি উন্মুক্ত থাকে, 'সুখ-ই কি ভাল?' ভালত্ব ও সুখ যদি পরস্পর অভিন্ন হত তাহলে এ ধরনের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু বাস্তবে সুখকে ভাল বলে প্রশ্ন অপেক্ষিত হয় 'কেন জ্ঞান কি ভাল নয়?' ইত্যাদি। ভাল, ম্যুরের মতে, কোনো একটিমাত্র বিশেষ বস্তুর মধ্যে অবস্থান করে না, তাই তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। এর থেকে ম্যুরের সিদ্ধান্ত, ভালত্ব সংজ্ঞাতীত।

স্ববিরোধিতার যুক্তি (Self-Contradiction Test) : ম্যুরের দ্বিতীয় বিকল্পটি ছিল : ভাল বলতে যুক্তিসম্মতভাবে কিছুই বোঝায় না এবং নীতিশাস্ত্র বলতে কিছু সম্ভব নয়। এই বিকল্পটিও গ্রহণযোগ্য নয়। ম্যুর এই স্ববিরোধিতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এর খণ্ডন করেন। প্রথমে বিশ্লেষণকল্পে ধরে নেওয়া যাক 'ভাল' মানে 'সুখ'। ধরে নিই 'ভাল' ও 'সুখ' পদদ্বয়ের ব্যক্তার্থ (denotation) এক, কিন্তু জাত্যর্থ (connotation) ভিন্ন। তখন সংজ্ঞাটির অর্থ দাঁড়ায় : 'ভাল মানেই সুখ, তবে তা ভাল নয়।' এর অর্থ 'ভাল' মানেই ভাল; তবে তা ভাল নয়'। অতএব সংজ্ঞাটি স্ববিরোধী। আবার যদি মনে করি 'ভাল' ও 'সুখ' পদদ্বয়ের বক্তার্থ ভিন্ন, কিন্তু জাত্যর্থ এক, সেক্ষেত্রে সংজ্ঞাটি দাঁড়ায় : 'ভাল সুখ নয়। কিন্তু তা ভাল'। অর্থাৎ, 'ভাল ভাল নয়, কিন্তু তা ভাল', যা স্ববিরোধী।

এভাবে ম্যুর ভালত্বের প্রকৃতিবাদী সংজ্ঞায়নের অসারতা তুলে ধরেন এবং পরোক্ষে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে ভাল-র ধারণাটি সংজ্ঞায়নাতিরিক্ত (supervenient)।

২.২.২.১.৩ ■ মিল ও প্রকৃতিবাদী বিভ্রান্তি : হাডসনের বিচার

ম্যুর যেভাবে প্রকৃতিবাদী বিভ্রান্তির কথা বলেছেন এবং যেভাবে বিশেষ করে মিলের সমালোচনা করেছেন, হাডসনের মনে হয়েছে বিষয়টির আর একবার পুনর্বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যুরের মতে, মিলের "Utilitarianism" প্রবন্ধটি প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির জঘন্য দৃষ্টান্ত — "...as naive and artless a use of the naturalistic fallacy as anybody could desire." (**Principia Ethica,** p. 66) হাডসন বিচার করতে চেয়েছেন : ম্যুর মিলের প্রতি কি ঠিকঠাক সুবিচার করেছেন? মিলের প্রবন্ধের যে অনুচ্ছেদটি এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত করা হয় সেটি হল : "The only proof capable of being given that an object is visible is that people actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In the like manner, I apprehend, the sole exprience it is possible to produce that anything is desirable is that people do actually desire it." ম্যুর ও তার অনুগামী দার্শনিকরা অনেকেই মনে করেন এই অনুচ্ছেদটিতে মিল বেশ কয়েকটি বিভ্রান্তি ঘটিয়েছিল। প্রথমত:, মিল এখানে দ্ব্যর্থকতাজনিত দোষে দুষ্ট : কাম্য 'desirable' এর অর্থ : 'able to be desired' এবং 'ought to be desired'-এই দুয়ের পার্থক্য মেনে চলার কোনো চেষ্টা মিল করেন নি। দ্বিতীয়ত:, মিল এখানে অবৈধ সমাহার দোষ (fallacy of composition) -এর শিকার। প্রতিটি ব্যক্তির কাছে যা ভাল তাই সর্বজনীন ভাল - এ ধরনের যুক্তি অনেকখানি এরকম - কোনো শহরের সকলের অধিকার আছে যে কোনো বাড়ির দরজা খুলে রাখার,

অতএব শহরের সকলের অধিকার আছে তার নিজের বাড়ির দরজা খুলে রাখার!

তবে পরবর্তী কালের কিছু নীতি-দার্শনিক মন্তব্য করেছেন মিল প্রকৃতিবাদী বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন এ অভিযোগ সর্বৈব যথার্থ নয়। মিল নিজে বিতর্কিত প্রমাণের কথা অস্বীকার করেছেন "...questions of ultimate ends do not admit of proof, in the ordinary acceptance of the term." (Utilitarianism, Ch-4)। শুধু তাই নয়, 'System of Logic' গ্রন্থে মিল সুস্পষ্টভাবে ঘটনা প্রকাশক বিবৃতি ('anything is') এবং ঔচিত্যপ্রকাশক বিবৃতি ('something should be') -এর দুয়ের পার্থক্য করেছেন। ফলতঃ ঘটনা থেকে ঔচিত্যকে নিঃসরণ করার ব্যাপারটি মিলের মননের সঙ্গে খাপ খায় না। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন : তবে কি 'Utilitarianism' লেখার সময় মিল মত পরিবর্তন করেছেন? কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বলছে এ সন্দেহ ঠিক নয় : মিল "Utilitarianism" প্রবন্ধটি লেখার পরে '*System of Logic*' -এর পুনর্লিখন করেন, নতুন সংস্করণ বের করেন, কিন্তু সেখানে বিতর্কিত অনুচ্ছেদটির একটি শব্দকেও তিনি পাল্টান নি। যাই হোক, মিলের বিরুদ্ধে ম্যুরের অভিযোগ বাড়াবাড়ি মনে হলেও মিলকে অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার মতো জোরালো প্রমাণ মিলছে না। সাম্প্রতিককালের কিছু নীতিতাত্ত্বিক মিল তাঁদের উপযোগবাদের বক্তব্যকে সাধারণের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য কিছু সাদামাটা যুক্তিতর্ক করেছেন, যাকে যৌক্তিক প্রমাণ হিসাবে ধরে নিয়ে 'ফ্যালাসি'-র কথা বলা যথোচিত নয়। অনেকে একে 'হয়বেস্টিকস্ (hearistics) হিসাবে বুঝতে চেয়েছেন।

২.২.২.১.৪ ■ ম্যুরের যুক্তির পর্যালোচনা

এখন আমরা বিচার করে দেখব ভালত্বের অসংজ্ঞায়নযোগ্যতার পক্ষে ম্যুরের যুক্তি প্রত্যয়-উৎপাদনকারী কিনা। প্রথমত:, উন্মুক্ত প্রশ্ন যুক্তির সাহায্যে ম্যুর যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন — ভালত্ব সংজ্ঞায়নাতীত — তা প্রমাণিত হয় না, প্রমাণ হয় 'ভাল'-র সংজ্ঞার শেষ নেই। ম্যুরের যুক্তির তাৎপর্য অনেকটা এরকম : বাচ্ছাকে স্কুলে পাঠালে শিক্ষক মহাশয় প্রহার করেন। অতএব মা সিদ্ধান্ত নিলেন, বাচ্ছাকে আর কখনো কোন স্কুলে পাঠাবেন না! উন্মুক্ত যুক্তির মাধ্যমে তাই প্রমাণ হয় না যে 'ভাল'-র কোনো সংজ্ঞা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত:, এই যুক্তির সারকথা হল, 'ভাল' সম্পর্কে প্রদত্ত কোনো সংজ্ঞা থেকে বিকল্প সংজ্ঞার উদ্ভব হলে বা তার সম্ভাবনা তৈরি হলে কোনো সংজ্ঞারই যৌক্তিকতা থাকে না। ম্যুরের এই ভাবনা সঠিক মনে হয় না। কেননা জ্ঞানের বিশাল রাজ্যের নতুন নতুন প্রশ্ন উদ্ভাবনের মাধ্যমে এবং উদ্ভাবিত তথ্যের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অনেক সময় তথ্যের সঠিকতা নিরূপিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এক সময় পৃথিবী গ্রহকে আমরা চ্যাপ্টা বলে জানতাম। পৃথিবীর এই ধারণা থেকেই পরে প্রমাণ হয়, পৃথিবী আসলে চ্যাপ্টা নয়, গোল। এর অর্থ কি তাহলে এই যে পৃথিবী সম্পর্কে চ্যাপ্টা বা গোল কিছুই বলা যাবে না!

২.২.২.২ ■ ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদ (Moore's Intuitionism)

ম্যুরের মতে 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক ধারণা, কর্মের সম্ভাব্য ফলাফল আমরা এক বিশেষ বৃত্তি স্বজ্ঞা

(intuition) -র মাধ্যমে জানি। নৈতিক ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ সব কিছুই আমরা জ্ঞাত হই এই স্বজ্ঞার মাধ্যমে, এই বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। স্বজ্ঞার মাধ্যমে আমরা সরাসরি উপলব্ধি করতে পারি যে সত্যনিষ্ঠা ভাল এবং অনৃতভাষণের পরিণিত মন্দ। ম্যুর বেন্থাম-মিলের উপযোগবাদের সমালোচনা করলেও, তিনি নিজে একজন উপযোগবাদী। তবে তিনি 'সত্য কথা বলা ভাল' — এই নৈতিক অবধারণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মিল-বেন্থামের মতো কোনো গুণগত বা পরিমাণগত গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবেন না, কিংবা কোন যৌক্তিক নিঃসরণ প্রক্রিয়ার মুখাপেক্ষী নন। তাঁর মতে, সত্যভাষণ যে ভাল ফলাফলের সহায়ক তা আমরা স্বজ্ঞার মাধ্যমে সরাসরি জানি। আমরা সরাসরি স্বজ্ঞার মাধ্যমে উপলব্ধি করি যে নান্দনিক উপভোগের আনন্দ ও মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ-মায়া ভাল এবং ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা, কুৎসা, বেদনা মন্দ।

তবে উল্লেখ্য যে নীতিতত্ত্বে স্বজ্ঞাবাদের সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও, ম্যুর বলেছেন যে তিনি প্রচলিত অর্থে স্বজ্ঞাবাদী নন। নীতিশাস্ত্রের সাধারণ স্বজ্ঞাবাদী মনে করেন যে স্বতঃসিদ্ধ সত্য হিসাবে কর্মের ভালত্ব-মন্দত্ব এক ধরনের অবরোহাত্মক স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা যায়। ম্যুরের মতে, নৈতিক সিদ্ধান্ত, এমন কি সিজউইকের মতো স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকেও অনুসৃত হয় না। আবার তা হাচিসন, স্যাফট্‌ব্যারীর ব্যাখ্যার মতো ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধও নয়। বস্তুতঃ ম্যুরের নীতিতত্ত্বে কোনো অতি-প্রকৃত বা ধর্মতাত্ত্বিক ধারণারও ছাপ নেই। তাঁর স্পষ্ট বিচার : নীতিশাস্ত্রের এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। নীতিবিচার মূল্যায়নমূলক, যেখানে অপরাপর বর্ণনাত্মক বিজ্ঞানসমূহ বাস্তব ঘটনার বিবৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

স্বজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে ম্যুর বলেন, স্বজ্ঞা হল তাই যা আমাদের সামান্যতম নীতিবোধের সাহায্যে বস্তু বা ঘটনার মধ্যে নিহিত ভালত্ব মন্দত্বকে সরাসরি জানিয়ে দেয়। স্বজ্ঞালব্ধ এই জ্ঞান সর্বজনীন। স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এই জ্ঞান সমরূপে গৃহীত হয়। ব্যাখ্যাকল্পে, ম্যুর বলেন, বর্ণান্ধ নয় এমন ব্যক্তি যেমন জানে হলুদ বর্ণ কি, ঠিক তেমনি নীতি-অন্ধ নয় এমন ব্যক্তিও বোঝে ভালত্ব কি। তবে এই স্বজ্ঞা নিজস্ব উপলব্ধি হলেও ম্যুর একে নিছক বিষয়ীগত মানতে রাজী নন। তাঁর ব্যাখ্যানুযায়ী, স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রাপ্ত নৈতিক জ্ঞান ব্যক্তি অন্যের দ্বারাও উপলব্ধ হতে পারে। অনুরূপভাবে অনুরূপ অবস্থায় একই ধরনের নৈতিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। স্বজ্ঞালব্ধ নীতিজ্ঞান তাই সার্বজনীন ও বিষয়গত (objective)। দুধের শ্বেতত্ব যেমন দুধের মধ্যেই নিহিত এবং তাই তা বিষয়নিষ্ঠ, ঠিক তেমন সততার ভালত্ব সততার মধ্যেই বিরাজ করে এবং তাই তা বিষয়গত। আর একটি কথা, ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদী নীতিজ্ঞানতত্ত্ব নৈতিকতার বিষয়গততা (objectivity) -য় বিশ্বাস করে এবং দাবী করে যে এই বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। তাই অ-প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্ব জ্ঞানবাদী তত্ত্ব (cognitivism)।

২.২.২.২.১ ■ স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞানের দাবীর যৌক্তিকতা (The Claim to Know by Intuition)

ম্যুরের বক্তব্য অনেকাংশে অভিনব, এবং তা আমাদের আকর্ষণ করে। তবে তাঁর অ-প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ — স্বজ্ঞার সাহায্যে জানা (knowing by intuition) — আমাদের

সন্তুষ্ট করতে পারে না, আমাদের প্রত্যয় উৎপাদন করতে পারে না। যদিও ম্যুর দাবী করেছেন যে তিনি ভিন্ন জাতের স্বজ্ঞাবাদী, তথাপি স্বজ্ঞাবাদী হিসাবে অপরাপর স্বজ্ঞাবাদীদের সঙ্গে তিনিও বিশ্বাস করেন যে নৈতিক সত্যসমূহকে স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা যায়। তাঁদের মতে ভালত্ব প্রভৃতি এক সরল অ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং তা একটি ঘটনাকে বোঝায়। যাই হোক, ম্যুরের দাবীর বিচার করতে হলে প্রথমেই আমাদের বিচার করতে হবে — 'আমি জানি যে P' — বলতে ঠিক কি বোঝায়, এবং তারপর বিচার করতে হবে জানার শর্তগুলি 'স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা'র ক্ষেত্রে পালিত হয় কি না।

এখন, আমরা যদি স্মরণ করি আমাদের জানার শর্তগুলি ঠিক কি তাহলে বুঝতে পারব স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানা এইসব শর্ত পূরণ করে কিনা। যদি আমরা এয়ারকে অনুসরণ করি, তাহলে 'আমি জানি যে P' দাবী করতে হলে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।

১) P সত্য হবে (অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বিষয় সত্য হয়ে, অলীক বা মিথ্যা হবে না।)
২) জ্ঞাতা নিশ্চিত হবে যে P সত্য (অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় সত্য হলেই হবে না, জ্ঞাতাকে বিশ্বাস করতে হবে যে P সত্য)
৩) জ্ঞাতার নিশ্চিত হওয়ার পর্যাপ্ত অধিকার (the right to be sure) থাকবে (অর্থাৎ P সত্য এই ব্যাপারে জ্ঞাতার বিশ্বাসের পিছনে উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকবে)।

আমাদের জন্য এই তৃতীয় শর্তটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই এর তাৎপর্য্য বোঝা বেশি জরুরী। এর সহজ অর্থ হল : যে ব্যক্তি কোনো কিছু জানি বলে দাবী করবে তাকে তার দাবীর যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে হবে। বিশ্লেষক জ্ঞানের ক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রতিপাদন, প্রভৃতি পর্যাপ্ত হতে পারে। কিন্তু সংশ্লেষক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়টি বেশ জটিল। বিশেষতঃ যদি প্রশ্ন উঠে 'কেমন করে আপনি জানলেন?' তাহলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উল্লেখ করা হয়। কিন্তু তা শ্রোতাকে সন্তুষ্ট করছে কিনা তা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

হাডসন এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টির পর্যালোচনা করেছেন। প্রথমে একজন মায়ের কথা বলা হয়েছে যিনি জানেন যে তাঁর পুত্র জীবিত, যদিও সে যুদ্ধে মারা গেছে বলেই তালিকায় দেখানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি জিজ্ঞাসা করেন ''কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?'', তখন তিনি হয়ত উত্তর দেবেন, ''আমি তার উত্তর দিতে পারব না। তবে আমি জানি!'' এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে ঐ মাতা বিশ্বাস করেন যে তাঁর পুত্র জীবিত আছে, এবং তাই 'জানা'-র দ্বিতীয় শর্তটি সম্পূরিত হল। এখন ধরে নেওয়া যাক যে তাঁর পুত্রকে ভুল করে মৃতদের তালিকায় দেখানো হয়েছে; আসলে তাকে যুদ্ধবন্দী করে রাখা হয়েছে! কিন্তু এক্ষেত্রেও সত্য বিশ্বাস ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করা হয় নি। জ্ঞানতত্ত্বের পরিভাষায়, তিনি আসলে অনুমান করেছিলেন, সত্যি সত্যি জানতেন না (She didn't realy know. She only guessed right.)।

এই দৃষ্টান্তের সূত্র ধরে হাডসন আমাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে নিয়ে আসছেন। একজন যাদুকর তাঁর শ্রোতাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে একটি তাসের বান্ডিল থেকে তাস টানতে বললেন, এভং প্রতিক্ষেত্রে তারা কি তাস টেনেছে তা ঠিক ঠিক বলে দিলেন। এক্ষেত্রে যাদুকরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি করে

ঠিক ঠিক তাসগুলিকে চিহ্নিত করলেন, তিনি হয়ত বললেন 'ম্যাজিক!' কোনো ব্যাখ্যা দিলে বললে, 'কিভাবে তিনি জানলেন?' জিজ্ঞাসা করলে স্বজ্ঞার কথা বলতে পারেন। এই 'By intuition' উত্তর কিন্তু 'How do you know?' জানার তৃতীয় শর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির কোনো উত্তর হয় কি? হাডসনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী নিম্নোক্ত কারণে এই ধরনের উত্তর সন্তোষজনক নয় :

প্রথমত:, এর ধরনের উত্তর (প্রথম দৃষ্টান্তের) মা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাঁর ছেলে বেঁচে আছে - এর অতিরিক্ত নতুন কিছু বলছেন বলে আমরা কোনো ধারণা করতে পারি না। 'স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানি' — এ ধরনের উত্তর নিছক দ্বিতীয় শর্ত বিশ্বাসের শর্ত-এর পুনরাবৃত্তি ছাড়া কিছু নয়। 'আমি বিশ্বাস করি যে P' -এর অতিরিক্ত 'আমি স্বজ্ঞার মাধ্যমে জানি যে P' - এই বলে নতুন কিছু বলা হয় না। দ্বিতীয়ত:, মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনাক্রমে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ঘটনা কিন্তু বিপরীতও হতে পারে : যদি মায়ের বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ হয়, তাহলে আমরা দুটি ক্ষেত্রে কিরূপ পার্থক্য করতে পারতাম? এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কথিত দৃঢ় বিশ্বাসও মিথ্যা প্রমাণিত হয়। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে "...there does not seem to be anything necessarily different about the intuition, i.e., the feeling of certainty, in two kinds of examples."

তৃতীয়ত:, যদি মায়ের বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণ হয়, এবং ছেলের মৃতদেহ সামনে আসে, তখন কিন্তু ঐ মা এরকম বলতেন না যে 'আমি আগে জানতাম যে সে জীবিত, কিন্তু এখন আমি জানি যে সে মৃত।' বরং তিনি বলবেন 'আমার এই বিশ্বাসে নিশ্চিত ছিলাম যে সে জীবিত, কিন্তু এখন আমি জানছি যে সে মৃত। একমাত্র অর্ধোন্মাদ ব্যক্তি সাক্ষপ্রমাণ বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও বলতে পারেন 'তাহলেও আমি এখনও জানি!'

নৈতিক স্বজ্ঞাবাদীবাদের অবস্থা আরও করুণ। যাদুকর তিনি ঠিক বলছেন কিনা তা তাঁর স্বজ্ঞার অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে যার মাধ্যমে তাঁর দাবীর সত্যতা নিশ্চিত করা যেতে পারে। তিনি দর্শক-শ্রোতাকে বলতে পারেন, 'আপনারা নিজের চোখে দেখুন আমি ঠিক বলছি কিনা'। নৈতিক স্বজ্ঞাবাদীবাদের দাবী সঠিক কিনা তা কিন্তু যাচাই করার অতিরিক্ত কোনো উপায় নেই। কোনো নৈতিক স্বজ্ঞাবাদী যদি বলেন, আমি স্বজ্ঞার সাহায্যে জেনেছি যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অন্যায়, তাঁর দাবী যাথার্থ্য পরীক্ষার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। নৈতিকতা সম্পর্কিত এই স্বজ্ঞাবাদ তাই প্রত্যয়-উৎপাদনকারী নয়।

২.২.২.৩ ■ সারসংক্ষেপ ও মন্তব্য

প্রকৃতিবাদী নীতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে ম্যুর যে অভিযোগ তুলেছেন, যে সব যুক্তি সাজিয়েছেন যেগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক, বিশেষ করে তাঁর প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির ধারণা আমাদের আকর্ষণ করে। এই প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির যেন পরোক্ষে বুঝিয়ে দেয় যে নৈতিকতার বিষয়সমূহকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করলে তা নীতিশাস্ত্রের সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে তোলে। তবে অনুপপত্তি সম্পর্কে পরবর্তীকালে নানা ধরনের ব্যাখ্যা, বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। দু'একজন বলতে চেষ্টা করেছেন এই অনুপপত্তি নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবে ম্যুরের যে স্বজ্ঞাবাদ তা কিন্তু আমাদের প্রত্যয়-উৎপাদন করতে পারেনি। আমাদের মনে হয় স্বজ্ঞার মাধ্যমে নৈতিক বিষয়কে জানার কথা বলা নৈতিকতার ধারণাকে সুস্পষ্ট করার পরিবর্তে

আরও রহস্যাবৃত করে তোলে।

২.২.৩ ■ বর্ণনাবাদ (Descreptivism) : প্রাককথন

সমকালীন অধি-নীতিবিদ্যায় নৈতিক প্রত্যয় তথা অবধারণের অর্থ নিরূপণের চেষ্টা করেছেন নীতিদার্শনিকেরা। এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে কয়েকটি নীতিতত্ত্বের জন্ম হয়েছে, বর্ণনাবাদ যাদের অন্যতম। যতদূর মনে হয় আর.এম. হেয়ার (R.N. Hare) -ই প্রথম 'বর্ণনাবাদ' (Descriptivism) অভিধাটি অধিনীতিতত্ত্বে ব্যবহার করেন, যদিও হেয়ার নিজে বর্ণনাবাদী নন, নির্দেশবাদী বা অনুজ্ঞাবাদী (Prescriptivist)। হেয়ারের প্রয়োগ অনুযায়ী, বর্ণনাবাদ সেই তত্ত্ব যেখানে নৈতিক শব্দ তথা বিবৃতিগুলির মূল্য-সূচক অর্থ বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। অন্যভাবে বললে, বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্য থেকেই মূল্যাত্মক বৈশিষ্ট্যকে নিঃসরণ করা যায়, অন্য ভাষায়, ঘটনা (fact) থেকে মূল্য (value) -কে নিঃসরণের কথা বলে এই অধিনীতিতত্ত্ব। স্পষ্টতই বর্ণনাবাদের সঙ্গে প্রকৃতিবাদী চিন্তাধারার মিল থাকায় অনেকে একে নব্য-প্রকৃতিবাদ (Neo-Naturalism) বলে অভিহিত করে থাকেন।

২.২.৩.১ ■ বর্ণনাবাদের মূল বক্তব্য

বলা বাহুল্য, ঘটনা-ঔচিত্য (Is-Ought) -এর বিতর্কের সূত্র ধরেই বর্ণনাবাদের উদ্ভব ঘটেছে। জে.আর. সার্ল (J.R. Searle), ফিলিপ্পা ফুট (Philippa Foot), জি.জে. ওয়ারণক (G.J. Warnock), কুর্ট বেয়ার (Kurt Baier), এস.ই. টৌলমিন (S.E. toulmin) প্রমুখ নীতি-দার্শনিকদের রচনা ও আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বর্ণনাবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে এটা বলে নেওয়া ভাল যে বর্ণনাবাদ নিজেকে এখনো সুসংহত নীতিতত্ত্ব হিসাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে পারেনি। আমাদের মনে হয়, বর্ণনাবাদী নীতিতাত্ত্বিকেরা তাঁদের সদর্থক বক্তব্যকে কাঙ্খিতভাবে উপস্থাপন করতে পারেন নি। তবে বর্ণনাবাদীদের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

হাডসনের বিশ্লেষণ বর্ণনাবাদীদের মধ্যে অন্ততঃ দুটি ব্যাপারে অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে : প্রথমতঃ, ঘটনামূলক অবধারণ ও ঔচিত্যমূলক অবধারণ স্বতন্ত্র হলেও এদের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করা যায় না — "...not always logically possible to separate the descriptive and the evaluative meanings of a moral jidgement." দ্বিতীয়তঃ, নৈতিকতা কোনোক্রমেই স্বাধীন পছন্দের ব্যাপার নয়, পূর্বগামী ঘটনার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকবেই। অন্যভাবে বললে, ঘটনামূলক বিবৃতি থেকে ঔচিত্যমূলক বিবৃতি নিঃসরণযোগ্য নয় — এই মতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্ণনাবাদের জন্ম, যেখানে ঘটনা থেকে মূল্যকে নিঃসৃত করার বিষয়টিই মূল প্রকিপাদ্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করার প্রয়োজন ঘটনা ঔচিত্য-এর সমস্যাটি ম্যুরের অনেক আগে ডেভিড হিউম তাঁর, 'Treatise on Human Nature' গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, "In every system of

morality, which I have hitherto met with... the author proceeds for sometime in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surprised to find that, instead of the usual copulations of propositions *is* and *is not,* I meet with no propostion that is not connected with an *ought* or an *ought not*.'' অর্থাৎ হিউম বলতে চান, প্রচলিত নীতিতত্ত্বগুলির প্রবক্তারা যুক্তির সাধারণ পথে অগ্রসর হতে হতে 'কি হয়' এবং 'কি হয় না' জাতীয় সংযোজক ব্যবহার করে বসেন, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। হিউম এ ধরণের যুক্তিধারাকে নৈতিকতার অমার্জিত পদ্ধতি ('the valgar system of morality') হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

স্বজ্ঞাবাদী ম্যুর ঘটনাগত বিবৃতি থেকে মূল্যগত বিবৃতি নিগমনের প্রচেষ্টাকে 'প্রকৃতিবাদী বিভ্রম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের প্রচেষ্টার সমালোচনা করে তিনি বলেন ঘটনা থেকে মূল্যকে কখনোই নিঃসরণ করা যায় না। তিনি 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক মূল্যকে সংজ্ঞায়নযোগ্য নয় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। অ-প্রকৃতিবাদী নীতিতাত্ত্বিকেরা অবশ্য প্রায় সকলেই মনে করেন, হিউম তাঁর বক্তব্যে তথ্য থেকে মূল্যের অবরোহণের সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন। এয়ার, স্টিভেনসন, হেয়ার প্রমুখ দার্শনিক এই ব্যাখ্যা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু বর্ণনাবাদীরা হিউমের বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ করেছেন : হিউমের বক্তব্যের মধ্যে 'ঘটনা' থেকে 'ঔচিত্য' কে নিঃসরণের প্রচেষ্টার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষণ অনেকটা এরকম : হিউম প্রকারান্তরে ঘটনা-সংক্রান্ত বিবৃতি ও ঔচিত্য-সংক্রান্ত বিবৃতির মধ্যে সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর বিবৃতিতে 'নিঃসরণ' (deduction) বলতে তিনি প্রচলিত অবরোহ যুক্তিকে বোঝেন নি, সাধারণভাবে অনুমান প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। তিনি এই দু-ধরনের বিবৃতির মধ্যে অন্যান্যদের মতো অনতিক্রম্য যৌক্তিক ব্যবধান স্বীকার করেন নি। তাঁরা হিউমের সামগ্রিক নীতিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছেন যে বাস্তবতা সংক্রান্ত বিবৃতি ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিবৃতি স্বতন্ত্র হলেও মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি বাস্তবতা সংক্রান্ত বিবৃতি থেকে অনুসৃত হতে পারে!

আমরা এখন বর্ণনাবাদী বলে খ্যাত কয়েকজন নীতি-দার্শনিক — সার্ল, ওয়ারণক ও শ্রীমতি ফুটের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরব, যাতে করে বর্ণনাবাদের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

২.২.৩.১.১ ■ জে. আর. সার্লের বর্ণনাবাদ

হিউমের বক্তব্যকে যারা নিজেরে সমর্থনে ব্যাখ্যা করে অপরাপর নব্য-প্রকৃতিবাদীদের মতো সার্লও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে 'বাস্তবতা' (fact = is) থেকে 'ঔচিত্য' (ought) নিঃসরণ করা যায়। তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'How to Derive **Ought** from **Is**' -এ তথ্য-বিষয়ক বিবৃতি থেকে ঔচিত্যমূলক বিবৃতিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে যুক্তিতর্ক হাজির করেছেন। জি. ই. এম. অ্যানস্‌কোম্বকে অনুসরণ করে তিনি বাস্তবতাকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : নিরেট বাস্তবতা (brute fact) এবং বিধিবদ্ধ বাস্তবতা (institutional fact)। বিধিবদ্ধ বাস্তবতা বলতে তিনি প্রথা, রীতি-নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বাঁধা বাস্তবতাকে বুঝেছেন। আর

নিরেট বাস্তবতা বলতে তিনি নিছক ঘটনা বা বিশুদ্ধ তথ্যকে বুঝেছেন তিনি। অবশ্য যে কোনো বিধিবদ্ধ বাস্তবতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নিরেট বাস্তবতার সম্পর্ক থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা তাসখেলার কথা বলতে পারি। তাসখেলা এমন এক বিধিবদ্ধ বাস্তবতা যা সংশ্লিষ্ট নিয়ম-কানুনের দ্বারা বাঁধা; নিয়মনীতি বাদ দিয়ে তাসখেলা বলতে যা বোঝায় তার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। বলা বাহুল্য, এই নিয়মকানুনগুলি নিরেট বাস্তবতা, যার উপর ভিত্তি করে এই বিধিবদ্ধ বাস্তবতার উদ্ভব ঘটে।

সার্লের মতে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে বাধ্য-বাধকতা, দায়িত্ববোধ, প্রতিশ্রুতি, প্রভৃতি বিধিবদ্ধ বাস্তবতা নিরেট বাস্তবতার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। তিনি বিশেষ করে প্রতিশ্রুতির কথা বলেছেন : আমরা কিছু করার জন্য মনস্থির করলাম এবং পরে সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের নানা প্রথা ও রীতি মেনে কাজটি সম্পন্ন করলাম। সার্ল বলতে চান, আমরা নিরেট বাস্তবতা থেকে বিধিবদ্ধ বাস্তবতা গঠন করতে পারি এবং তার থেকে ঔচিত্যমূলক অবধারণে পৌঁছুতে পারি। কিভাবে তা সম্ভব সার্ল প্রতিশ্রুতিদান সংক্রান্ত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন এভাবে :

১) জোনস্ রীতি মেনে এই শব্দগুলি উচ্চারণ করল : 'আমি এতদ্বারা স্মিথ, তোমাকে পাঁচ ডলার দেব কথা দিচ্ছি'।

২) জোনস্ স্মিথকে পাঁচ ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

৩) জোনস্ স্মিথকে পাঁচ ডলার দেওয়ার জন্য নিজেকে বাধ্যতাবোধের মধ্যে আবদ্ধ করল।

৪) জোনস্ স্মিথকে এখন পাঁচ ডলার দিতে বাধ্য।

অতএব,

৫) জোনসের স্মিথকে পাঁচ ডলার দেওয়া উচিত।

সার্ল এই নিঃসরণ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে এখানে আগের বিবৃতির সঙ্গে পরের বিবৃতির অবরোহাত্মক সম্বন্ধ আছে, যদিও তাকে সবক্ষেত্রে যৌক্তিক অনুসৃতি (entailment) বলা চলে না। তবে দুইটি বিবৃতির মধ্যে প্রয়োজনভিত্তিক অতিরিক্ত কোনো বিবৃতি যোগ করলে কাঙ্খিত যৌক্তিক নিঃসৃতি সম্ভব হয়। তবে এই অতিরিক্ত বিবৃতিগুলির কোনোটি মূল্যাত্মক নয়, সেগুলি অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস, বা স্বতঃসত্য বিবৃতি বা শব্দ ব্যবহার-রীতি-সংক্রান্ত বিবৃতি বলে দাবী করেন সার্ল। (মধ্যবর্তী অতিরিক্ত যুক্তি বাক্যগুলির জন্য সার্লের মূল প্রবন্ধ 'How to Derive **Ought** from **Is**' পড়ুন।)

অবশ্য সার্লের এই অভিমতের তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় : অ্যান্টনি ফ্লু (Antony Fley) সার্লের এই নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে 'সম্পূর্ণ অসফল' ('entirely unsuccessful') বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর "On not Deriving 'Ought from Is'" প্রবন্ধে ফ্লু যুক্তিসঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে সার্ল কথিত বিধিবদ্ধ বাস্তবতার ধারণার মধ্যে মূল্য ঢুকে আছে। তিনি সমালোচনার সুরে বলেন, একজন নির্লিপ্ত সংকলকের 'প্রতিজ্ঞা' শব্দটির প্রয়োগ-রীতির বিবরণ করা, আর একজন গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট জীবন-রীতির মধ্যে নিমগ্ন থেকে কথা দেওয়া বা প্রতিজ্ঞা করা—এ দুটি ব্যাপার এক নয়। বস্তুত:, কেউ যদি নির্লিপ্ত অবস্থান থেকে সরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ বাস্তবতার মধ্যে অংশগ্রহণ করতে যায় (সার্লের অনুমান-প্রক্রিয়ার মধ্যে যা লক্ষণীয়) তাহলে বিধির যে মূল্য ঢুকে আছে তা স্বীকার করেই তা সম্ভব, যা এই নি:সরণকে সম্ভব করে।

ফুট-র ভাষায় "[C]ommitment to the incapsulated values which alone warrant us to draw the normative conclusions."

২.২.৩.১.২ ■ জি. জে. ওয়ারণকের বর্ণনাবাদ

সমকালীন নব্য-প্রকৃতিবাদীদের মধ্যে ওয়ারণকের নাম সমধিক পরিচিত। ওয়ারণকের বর্ণনাবাদ কার্যত: হেয়ারের অনুজ্ঞাবাদীদের সমালোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। হেয়ার কান্টীয় আকার-সর্বস্ব সর্বজনীনযোগ্যতা নীতির উপর ভিত্তি করে তাঁর অনুজ্ঞাবাদ (Prescriptivism) প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওয়ারণক তাঁর 'Contemporary Moral Philosophy' গ্রন্থে এ ধরনের আকারবাদের সমালোচনা করে বলেন যে নৈতিকতা সর্বজনীনযোগ্য হলেও তা মানবজীবনের বাস্তব উপাদান থেকে অনুসৃত। তিনি লিখেছেন, "My own view is that morality has at least roughly some specific content."

ওয়ারণকের মতে, আমাদের নৈতিকতা কিছু উপাদানমূলক বৈশিষ্ট্য — যেমন, মানবিক প্রবৃত্তি, উদ্দেশ্য, কামনা-বাসনা, অনুশোচনা, অপরাধবোধ — প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। বাস্তব প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই তা আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে। তাই মানুষের সুখ-দুঃখ, আবেগ-অনুভূতি, অনুশোচনা-অপরাধবোধ ইত্যাদির পরিপেক্ষিতে আমাদের নীতিবোধ ও নৈতিক সমস্যাগুলিকে বিচার করতে হয়। আমাদের চাহিদাও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা তথা মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। বাস্তবতার নিরিখে তাই নৈতিকতাকে বুঝতে হবে। ব্যাখ্যা করে ওয়ারণক বলেন, সমাজবদ্ধ মানুষের বাস্তব চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই আমরা বলি কাউকে আঘাত করা বা শোষণ করা অন্যায়, মন্দ কাজ। তবে নৈতিকতা ব্যক্তি বিশেষের অনুমোদন-অননুমোদনের ব্যাপারমাত্র নয়। নৈতিক মূল্যবোধক বিবৃতিগুলির বাস্তব উপাদানমূলক বৈশিষ্ট্যের কথা বললেও তাঁর নীতিতত্ত্ব প্রকৃতিবাদী অনুপপত্তির শিকার নয় বলে ওয়ারণক দাবী করেছেন। তবে এই দাবী পর্যালোচনা-যোগ্য বলে আমাদের মনে হয়।

২.২.৩.১.৩ ■ ফিলিপ্পা ফুটের বর্ণনাবাদ

জি. জে. ওয়ারণকের মতো ফিলিপ্পা ফুটও মনে করেন মানবিক প্রয়োজন ও চাহিদাই নৈতিকতার ভিত্তি। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে নৈতিকবাদের বর্ণনাত্মক অর্থ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ নেই। একদল অ-প্রকৃতিবাদী 'ভাল' প্রভৃতি নৈতিক শব্দের কেবল মূল্যাত্মক বৈশিষ্ট আছে বলে মনে করেন, তাঁরা নৈতিক ভাষার কোনো বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য স্বীকার করেন না। শ্রীমতি ফুট এধরণের তত্ত্বের সমালোচনা করে বলেন যে নৈতিক অবধারণে আমরা যখন কোনো কিছু ভাল বা ন্যায্য বলি তখন তার সপক্ষে বিশেষ যৌক্তিকতা প্রদর্শন করাই অবধারণটির বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য। ফুটের মতে, বর্ণনাত্মক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যাত্মক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যৌক্তিক ব্যবধান আছে মনে করা সততার অপলাপমাত্র। দু'ধরনের বৈশিষ্ট্য পরস্পর সম্পৃক্ত — এদের সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না। হেয়ার তাঁর 'Descriptivism' প্রবন্ধে 'স্মিথ সাহসী' এই বিবৃতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে এখানে দু'ধরনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পার্থক্য করা যায়, তবে তা অর্থহীন। প্রথমত:, আমরা স্মিথের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছি; এবং দ্বিতীয়ত:, এই বৈশিষ্ট্য তথা তথ্যের মাধ্যমে স্মিথের প্রশংসা করছি। কিন্তু ফুট বলেন, এ ধরনের পৃথকীকরণ অযৌক্তিক ও অর্থহীন।

শ্রীমতি ফুটের স্পষ্ট বক্তব্য : নৈতিক অবধারণের বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যাত্মক স্বতন্ত্র তো নয়ই, বরং এদের মূল্যাত্মক অর্থটি বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

তাঁর 'Goodness and Choice' প্রবন্ধে ফুট আরও বলেন যে কোনো কিছুকে 'ভাল' বলার পিছনে বক্তার স্বাধীন পছন্দের কোনো স্বতন্ত্র ব্যাপার নেই। আমরা যখন কোন কিছুকে ভাল বলি তখন তার ভালত্ব বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই নিরূপিত হয়। বক্তার শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকলেও একেবারে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু 'ভাল' বা 'নায্য' বলা যায় না। অন্যদিকে, শ্রীমতি ফুট অপর একটি প্রবন্ধ 'Morality as a System of Hypothetical Imperatives' -এ কান্টীয় নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নীতিতত্ত্বকে বাতিল করে নিয়মকে শর্তাধীন অনুজ্ঞা হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

একক : ২.২.৩.২ ■ সারসংক্ষেপ ও মন্তব্য

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বর্ণনাবাদীরা প্রকৃতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অধিনীতিতত্ত্বে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। বর্ণনাবাদীরা যা জোরের সঙ্গে বলার চেষ্টা করেছেন তা হল সামাজিক চাহিদা তথা মানবিক প্রয়োজনের নিরিখেই নৈতিকতাকে বিচার করতে হবে। তবে নৈতিকতা বাস্তব প্রয়োজন বোধের সঙ্গে সম্পর্কিত একথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে অনেকক্ষেত্রে বাস্তব চাহিদা আমাদের নীতিবোধকে প্রভাবিত করে পারে না, বরং আমাদের নীতিবোধই আমাদের প্রয়োজন তথা চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমাদের মনে হয়, নীতি-নৈতিকতা সম্পূর্ণ বাস্তবতা-নির্ভর, বর্ণনাবাদীদের এ দাবী সঙ্গত নয়।

একক : ২.২.৪ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী/ অনুশীলনী

1. What is a metaethical theory ? Distinguish in this connection between cognivitism and non-cognitivism.
2. Define ethical naturalism. State and explain the basic tenets of ethical naturalism. Is it a satiscatory theory ?
3. What is non-naturalism ? Elucidate the main ideas of Moore's non-naturalism.
4. Critically explain Moore's contention that 'good' is indefinable.
5. What is wrong with the attempt to define 'good' in terms of some natural characterstics ? Elaborate in this connection Moore's thesis of naturalistic fallacy.
6. Elucidate the basic themes of Moore's intuitionism. It is satisfactory ?
7. Examine, after Hudson, Moore's claim to know moral objects by intuition. Are Moore's arguments cogent ?
8. What is ethical descriptism ? Bring out the basic themes of descriptivism.
9. Critically explain the descriptivist views of Searle, Warnock and Foot.

10. Elucidate Foot's metaethical view of descriptivism. Is it adequate to explain morality as a system of hypothetical imperatives ? Answer with reference to Kant's moral theory.

একক : ২.২.৫ : গ্রন্থ-নির্দেশিকা

সিলেবাস-নির্দিষ্ট পাঠ্যবই W.D. Hudson এর 'Modern Moral Philosophy' গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য। এছাড়া আলোচনার মধ্যে যে সব বই/ প্রবন্ধের উল্লেখ আছে সেগুলি দেখতে পারেন। এতদতিরিক্ত নীচের কয়েকটি প্রবন্ধ/ বই সহায়ক পাঠ হিসাবে পড়ুন :

১. James P. Sterba (ed) *Contemporary Ethics,* Prentice-Hall

২. W. Frankena : *'The Naturalistic Fallacy',* Mind, vol.48

৩. 'Moral Non-Naturalism' : Stanford Encyclopedia of Philosophy at http:// plato.stanford.edu

৪. ডঃ আব্দুল হামিদ : সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা (বাংলাদেশ)

৫. শেখ আবদুল ওয়াহাব : বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা (বাংলাদেশ)

পাঠ একক - ৩

অনবগতিমূলক নীতিতত্ত্ব : আবেগবাদ ও পরামর্শবাদ

পাঠ সংকেত

একক : ৩.০ : উদ্দেশ্য

একক : ৩.১ : প্রাক্‌কথন

একক : ৩.১.১ : আবেগবাদ

৩.১.১.১ : এয়ারের আবেগবাদ

৩.১.১.২ : স্টিভেনসনের আবেগবাদ

৩.১.১.৩ : আবেগবাদের সমালোচনা

৩.১.১.৩.১ : স্টিভেনসনের কি আত্ম-সংগতিপূর্ণ

৩.১.১.৩.২ : স্টিভেনসনের মনস্তাত্ত্বিক অর্থতত্ত্ব

৩.১.১.৪ : সিদ্ধান্তকারী পর্যবেক্ষণ

৩.১.১.৫ : গ্রন্থনির্দেশ

৩.১.১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্ন/ অনুশীলনী

একক : ৩.১.২ : অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদ

৩.১.২.১ : আবেগবাদের বর্জন

৩.১.২.২ : হেয়ারের অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদের ব্যাখ্যা

৩.১.২.২.১ : অনুজ্ঞা বা পরামর্শধর্মিতা

৩.১.২.২.২ : মূল্যাত্মক অবধারণ ও অনুজ্ঞা

৩.১.২.২.৩ : সর্বজনীনযোগ্যতা

৩.১.২.২.৩.১ : সর্বজনীনযোগ্যতা ও বর্ণনাতিরিক্ততা

৩.১.২.২.৪ : যৌক্তিক সম্পর্ক

৩.১.২.৩ : পরামর্শবাদের সমালোচনা

৩.১.২.৪ : সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

৩.১.২.৫ : গ্রন্থ নির্দেশ

৩.১.২.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী/ অনুশীলনী

একক : ৩.০ ■ উদ্দেশ্য

এই পাঠে আমরা অধিনীতিবিদ্যার জ্ঞানবাদী তত্ত্বগুলির মধ্যে সিলেবাসে নির্দিষ্ট আবেগবাদ (Emotivism) এবং পরামর্শবাদ বা অনুজ্ঞাবাদ (Prescriptivism)-এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা করব।

একক : ৩.১ ■ প্রাক্‌কথন

পূর্বের পাঠ এককে ইঙ্গিত করা হয়েছে সমকালীন অধিনীতি তত্ত্বে দুটি ধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারা অনুযায়ী নৈতিকতা বস্তুগত ও সর্বজনীন, এবং তাই নৈতিক বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হয়। দ্বিতীয় ধারা এর বিরোধিতা করে বলে নৈতিকতা ঠিক বিষয়গত নয় এবং এ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান হয় না। এই দ্বিতীয় ধারার অ-জ্ঞানবাদী নীতিতত্ত্ব, যেমন আবেগবাদ ও অনুজ্ঞাবাদ, মনে করে নীতি-নৈতিকতা বিচারকের আবেগ-অনুভূতি, নির্দেশ-অনুজ্ঞার বিষয়। নীতিশাস্ত্র প্রচলিত অর্থে জ্ঞানদান করে না তবে তা আমাদের মনোভাব, পছন্দ-অপছন্দকে প্রকাশ করে আবার আমাদের কর্মের নির্দেশ দেয়, কর্মেও প্রবৃত্ত করে।

অ-জ্ঞানবাদী তত্ত্বের মধ্যে আবেগবাদ ও অনুজ্ঞাবাদ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, তবে সরল বিষয়ীবাদ (Naive Subjectivism) বহুকার্যবাদ (Multifunctionalism) ইত্যাদি আরও দু'একটি তত্ত্ব রয়েছে।

একক : ৩.১.১ ■ আবেগবাদ (Emotivism)

নৈতিক ধারণা ও অবধারণগুলি বস্তুগত কোনো জ্ঞানীয় বিষয়কে তুলে ধরে না; বরং সেগুলি আবেগ-অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দ, ক্ষোভ-উষ্মা প্রকাশ করে মাত্র — এ অভিমতকেই আবেগবাদ বলা হয়। এই ধরনের নীতিতত্ত্বের মূল উৎস যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দর্শন। যদিও মরিৎ শ্লিক, এ.জে. এয়ার, রুডলফ কারনাপ ইত্যাদি অনেকেই যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি আবেগবাদ সংহত রয়েছে ব্রিটিশ দার্শনিক এ.জে. এয়ার (A.J. Ayer) এবং আমেরিকান দার্শনিক সি.এল স্টিভেনসন (C.L. Stevenson) এই দুইজন নীতিবিদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে।

তবে এখানে বলে রাখা ভাল যে 'emotive meaning' অভিধাটি প্রথম ব্যবহার করেন আই.এ. রিচাডস সি. কে. এবং ওগডেন, যাঁদের গ্রন্থ 'The Meaning of Meaning' এ শব্দটি প্রথম প্রকাশ পায়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষপটে বিচার করলে বোঝা যায় নৈতিক প্রকৃতিবাদ ও নৈতিক স্বজ্ঞাবাদ এই উভয় তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে আবেগবাদ জন্ম লাভ করেছে। আগের পাঠে আমরা দেখেছি, স্বজ্ঞাবাদীরা প্রকৃতিবাদকে খণ্ডন করে এক ধরনের অপ্রকৃতিবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ম্যুরের এই অপ্রকৃতিবাদী স্বজ্ঞাবাদও সমকালীন নীতিদার্শনিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। মূলতঃ দুধরনের অভিযোগ বা সমালোচনা স্বজ্ঞাবাদের বিরুদ্ধে আমরা লক্ষ্য করি : (ক) অ-প্রকৃতিবাদ তথা স্বজ্ঞাবাদ নৈতিকবাদ ও অবধারণগুলিকে রহস্যময় অতি-জাগতিক বৈশিষ্ট্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছে, যা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (খ) নৈতিকতার সঙ্গে আমাদের ক্রিয়াকর্মের যে ঘনিষ্ঠযোগ, অন্য ভাষায়, নৈতিক ভাষার যে গতিশীল চরিত্র, উল্লিখিত কোনো তত্ত্বই তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

প্রথম সমালোচনাটি এসেছে হ্বিট্‌গেস্টাইন ও যৌগিক প্রত্যক্ষবাদীদের তরফ থেকে। হ্বিট্‌গেস্টাইন মনে করেন, যে কোনো অর্থ-পূর্ণ-ভাষা বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে জগতের কোনো না কোনো বস্তু বা বস্তুস্থিতিকে নির্দেশ করে। নৈতিক ভাষা বাস্তবতা (fact) নয়, মূল্য (value)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাই ভাষাকে যদি কিছু বোঝাতে হয়, নির্দেশ করতে হয়, তাহলে 'কি আছে' তার বদলে 'কি হওয়া উচিত' - তা নির্দেশ করতে হবে। আমাদের কথিত জগত, যা কি আছে তাই দিয়ে গঠিত সেখানে নীতি নৈতিকতার স্থান কোথায়? হ্বিট্‌গেনস্টাইন তাই নীতিশাস্ত্রকে 'ট্রানসেনডেন্টাল এন্‌ক্যোয়ারী' বলে মনে করেন। আমরা নীতিশাস্ত্রকে অনেকসময় আদর্শনিষ্ঠ বললেও হ্বিট্‌গেনস্টাইন একে বিজ্ঞানরূপে গণ্য করতে চান না। তবে তিনি নৈতিক বিচার অর্থহীন-এমন সিদ্ধান্তে এসেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে সংশয় আছে। কোনো কোনো ব্যাখ্যাকার মনে করেন, হ্বিট্‌গেনস্টাইন নৈতিক বিচারকে অর্থহীন বলেন নি। তিনি শুধু নৈতিক আলোচনা যে যুক্তিকাঠামো অনুসরণ করে এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা যে যুক্তিকাঠামো অনুসরণ করে তার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার চেষ্টা করেছিলেন। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট : তাঁদের মতে নৈতিক অবধারণগুলি আক্ষরিকভাবে নিরর্থক (literally meaningless) অন্যভাবে বললে, এদের কোনো জ্ঞানীয় অর্থ (cognitive meaning) নেই। আমরা এ প্রসঙ্গে প্রথমে এ. জে. এয়ারের বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করব।

৩.১.১.১ ■ এয়ারের আবেগবাদ

তাঁর "Language, Truth and Logic" গ্রন্থে এ.জে. এয়ার মত প্রকাশ করেছেন যে নৈতিক অবধাণগুলি যেহেতু যাচাইযোগ্য নয় সেহেতু এদের কোন জ্ঞানীয় অর্থ নেই। তাঁর মতে যেকোনো বচন অর্থপূর্ণ হতে হলে তাকে বিশ্লেষণাত্মক (analytic) অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক (synthetic) হতে হবে। যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতের বচনসমূহ বিশ্লেষণাত্মক এবং স্ববিরোধিতার নিয়ম তার অর্থকে নিশ্চিত করে। আর অভিজ্ঞতালব্ধ বচনসমূহ, পরিভাষায় যাকে বলে সংশ্লেষক বচন, সেগুলির জ্ঞানীয় অর্থ আছে এবং যাচাইযোগ্যতার নীতি তার অর্থকে প্রতিপাদন করে। আরও স্পষ্ট করে বললে, এয়ার প্রমুখ যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন দুরকম বাক্যেই কেবল জ্ঞানীয় অর্থ প্রকাশ পায় : ১) যে সব বাক্য বিশ্লেষক, যার অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ বুঝলেই বাক্যটি সত্য বা মিথ্যা বলে জানা যায় (যেমন 'সকল গোলটেবিল গোল' বা '২+২=৪') সে সব বাক্য জ্ঞানপ্রদ, তাই সার্থক। ২) যে বাক্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য বাস্তব ব্যাপার (matters of facts) বর্ণিত হয়, যা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে সে বাক্য অর্থপূর্ণ।

এখন, যে সব বাক্যের মাধ্যমে নৈতিক বিচার প্রকাশিত হয় সে সব বাক্য দুটির কোনটিতেই পড়ে না। 'মিথ্যা কথা বলা খারাপ' বা 'কথা দিয়ে রাখা উচিত' বা 'চুরি করা মন্দ কাজ' বাক্যটি যাচাইযোগ্য নয়। আবার এ সব বাক্যের অন্তর্গত শব্দের অর্থ বুঝলেই যে বাক্যগুলিকে সত্য বা মিথ্যা বলে জানা যায় তাও নয়। তাই এ ধরনের বাক্যে কোনো জ্ঞান প্রকাশ পায় না। অর্থ বা মানে বলতে সাধারণভাবে যা বুঝি, সত্য মিথ্যা বলতে যা বুঝি সেরকম কোন জ্ঞানীয় অর্থ এসব বাক্যে প্রকাশ পায় না। কিন্তু বাক্য যখন এসব বাক্য কিছু একটা প্রকাশ করেই, নইলে 'কথা দিয়ে কথা রাখা উচিত' - এ ধরনের বাক্য বুঝি কি করে।

এয়ার প্রমুখ দার্শনিক মনে করেন নৈতিক অবধারণগুলি আসলে আবেগ-প্রকাশক। এদর কেবল আবেগাত্মক অর্থ (emotive meaning) আছে, কথিত অথে জ্ঞানীয় অর্থ (cognitive meaning) নেই। বক্তার আবেগ, অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দ ক্ষোভ-উষ্মা, অনুমোদন-অননুমোদন প্রকাশ পায় এ ধরনের নৈতিক অবধারণগুলির মধ্য দিয়ে।

এয়ারের বিশ্লেষণ অনুযায়ী ''চুরি করা মন্দ কাজ'' বলা, 'আর তুমি চুরি করলে!' বলা একই। দ্বিতীয় বাক্যে যে আবেগাত্মক চিহ্ন '!' রয়েছে। তা শুধু বাড়তি যে বিষয় প্রকাশ করে তা হল বক্তার ঘৃণা বা অননুমোদনরূপ আবেগ। অন্যদিকে 'কথা দিলে কথা রাখা উচিত বলা' বা 'তুমি কথা রেখেছ!' বলা একই। তবে এখানে বক্তার অনুমোদনের দৃষ্টিভঙ্গি (attitude) প্রকাশ পেয়েছে। এয়ার অবশ্য এমন কথাও বলেন যে নৈতিক বাক্যগুলি শুধু যে বক্তার নির্দিষ্ট এক এক ধরনের আবেগ প্রকাশ করে তাই-ই নয়, শ্রোতার প্রতি একটা অনুজ্ঞার ইঙ্গিতও বাক্যগুলি বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, 'সত্য কথা বলা উচিত' - এ বাক্যে সত্যের প্রতি বক্তার অনুরাগ যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি শ্রোতার প্রতি এই অনুজ্ঞাও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে : 'সত্য কথা বল'।

৩.১.১.২ ■ স্টিভেনসনের আবেগবাদ

ম্যুর প্রমুখ অ-প্রকৃতিবাদীদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে সমালোচনা তা ছিল এই তত্ত্ব নৈতিক অবধারণের গতিময় স্বরূপ (dynamic character) কে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি যদি বিচার করেন 'ক' কাজটি অন্যায় তাহলে ঐ ব্যক্তি 'আমি কি 'ক' কাজটি করব? এই প্রশ্ন করতে পারেন বটে, তবে তা বেমানান হবে। কোনো কাজকে যে মুহূর্তে আমরা ন্যায্য হিসাবে বিচার করি সে মুহূর্তেই আমরা ঐ কাজ সম্বন্ধে এক ধারণা পোষণ করতে শুরু করি এবং তদনুসারে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। এটাই নৈতিক বিচারের গতিময়তা।

নৈতিক বিচারের এই গতিময় স্বরূপের যথাযথ যৌক্তিক বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে এলেন দার্শনিক সি. এল. স্টিভেনসন (C.L. Stevenson) তিনি 'Mind' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, বিশেষ করে 'Emotive Meaning of Ethical Terms' - প্রবন্ধে এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁর 'Ethics and Language' গ্রন্থে আবেগবাদী তত্ত্ব প্রচার করেন। দৈনন্দিন জীবনের নৈতিক বিচারের গতি-প্রকৃতি উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর মতবাদ গড়ে তোলেন। তিনি নীতি-আলোচনার তিনটি বৈশিষ্ট্যের পক্ষে সওয়াল করেন। সেগুলি নিম্নোক্তরূপ :

১) নীতি আলোচনায় সত্যিকারের মতৈক্য ও মতানৈক্য-এর উপস্থিতি (presence of agreement and disagreement)

২) নৈতিক পদগুলির চুম্বক-সুলভ আকর্ষণশক্তি (a magnetism)

৩) নীতিশাস্ত্রের জন্য বৈজ্ঞানিক বা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যাচাইকরণ পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। (The scientific or empiricist method of verification is not sufficient for ethics.)

স্টিভেনসন নৈতিকপদ ও বচনগুলির এমনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যাতে এই তিন বৈশিষ্ট্য যথাযথ স্বীকৃতি পায়। তাঁর মতে নৈতিক বচনের আবেগমূলক বৈশিষ্ট্য বা অর্থ মৌলিক তবে এছাড়াও এর এক বর্ণনামূলক অর্থ (descriptive meaning) আছে। বলা বাহুল্য বক্তার আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ও শ্রোতার মধ্যে অনুরূপ আবেগ-অনুভূতির উদ্রেক করাই নৈকির বিচারের গতিময় আবেগীয় অর্থ (emotive meaning)। অধিকন্তু স্টিভেনসন প্রায় সব নৈতিক পদের এক আকর্ষণীশক্তি (magnetism) -র কথা বলেন। ''A person who recognized x to be 'good' must *ipso facto* acquire a strong tendency to act in its favourable than he otherwise would have had.'' অর্থাৎ যদি আমি কোনো কাজকে 'ভাল হিসাবে বিচার করি তাহলে অনুরূপ ভাবে কাজ করার জন্য অধিকতর শক্তিশালী এক প্রবণতা আমার মধ্যে জন্ম নেবে। এটাই নৈতিক ভাষায় গতিময়তা।

যাই হোক, স্টিভেনসন মনে করেন, নৈতিক ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল নীতিবিচারের মঞ্চে সত্যিকারের মতৈক্য এবং মতানৈক্যের উপস্থিতি। এয়ার মনে করতেন, যেহেতু নৈতিক বচনগুলি সত্য-মিথ্যার যোগ্য নয় সেহেতু সত্যিকারের নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মতানৈক্য সম্ভব নয়। কিন্তু স্টিভেনসনের সুস্পষ্ট অভিমত যে ভাল-মন্দের প্রশ্নে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বিরোধ বা মতানৈক্য তা সত্যিকারের মতবিরোধ। তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বাসের মতানৈক্য (disagreement in beliefs) এবং মনোভঙ্গির মতানৈক্য (disagreement in attitudes) — এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যখন দুটি ব্যক্তি একই বিষয় সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করে, আলাদা আলাদা বিশ্বাসে স্থিত হয়, তখন যে মতের অনৈক্য সৃষ্টি হয় তা বিশ্বাসের মতানৈক্য। এক্ষেত্রে দু'জনেই বিশ্বাস করে যে তার অভিমতটিই সঠিক, এবং তাই নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মতের অনৈক্য একই বিষয় সম্বন্ধে দু'জনের বিশ্বাস আলাদা হওয়ায় মতানৈক্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, আমি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারে মতবিরোধের কথা বলতে পারি। একজন প্রাচীনপন্থী মনে করতে পারেন, জন্মদান রূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বাধা দান মন্দ কাজ, অন্যদিকে, বাস্তববাদী প্রগতিশীল কোনো নাগরিক মনে করতে পারেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সকলের বাধা দান মন্দ কাজ, অন্যদিকে, বাস্তববাদী প্রগতিশীল কোনো নাগরিক মনে করতে পারেন জন্মনিয়ন্ত্রণ সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক, জনসংখ্যার অত্যাধিক চাপে ক্লিষ্ট প্রকৃতির পক্ষেও।

পক্ষান্তরে, দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্য তখনই সংঘটিত হয় যখন একই বিষয় সম্পর্কে দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হয়। যেমন, আমরা প্রায় সকলেই মনে করি সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, কি ভাবে? একজন বলতে পারেন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে বৈষ্যম্যের জন্মদাতা মনুবাদী মতাদর্শের মূল্যৎপাদন করা দরকার পক্ষে। অন্যজন সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্য দূর করার পক্ষে। এখন প্রশ্ন, নৈতিক প্রসঙ্গে কোনো ধরনের মতানৈক্য সংঘটিত হয়? স্টিভেনসনের মতে, নৈতিক প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিগত মতানৈক্য (disagreement in attitudes) -ই বেশি ঘটে। বিশ্বাসের মতানৈক্য যে একবারে থাকে না তা নয়, তবে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এই মতানৈক্য কাটিয়ে ওঠা যায়। স্টিভেনসন তাঁর প্রবন্ধে বিশদ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করেছেন যে নৈতিকতার প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের মতানৈক্য থেকেই বিরোধ বা দ্বন্দ্ব আবির্ভূত হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত দৃষ্টিভঙ্গির মতানৈক্যের রূপ নেয়।

এখন প্রশ্ন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই যে বিরোধ তার নিষ্পত্তির উপায় কি? স্টিভেনসন এ প্রসঙ্গে

প্ররোচক পদ্ধতি (persuasive method) এর কথা বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক অর্থতত্ত্বের কথা বলেছেন। প্ররোচক পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা নিজের পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করি। তবে এ প্রক্রিয়ায় আমরা যুক্তিতর্কের চেয়ে আবেগ-অনুভূতির উপর বেশি গুরুত্ব দিই। পরোক্ষ আদেশ বা উপরোধের মাধ্যমে নৈতিক প্রশ্নে বিবদমান দু'পক্ষের উপর প্রভাব বিস্তার করে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই পদ্ধতিকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে স্টিভেনসন নৈতিক পদের প্ররোচক অর্থের কথা বলেছেন।

অন্যদিকে বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের পদ্ধতির ভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টিভেনসন বলেন, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে কেবল বর্ণনামূলক অর্থ (descriptive meaning)-ই থাকে না, আবেগমূলক অর্থও থাকে। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের রাজ্যে কেবল বর্ণনামূলক অর্থই বিদ্যমান। তাই বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে নৈতিক প্রসঙ্গে হুবহু ব্যবহার করা যায় না।

যাইহোক, এখন আমরা স্টিভেনসনকৃত 'এটি ভাল' (This is good) এই নৈতিক বিচারের বিশ্লেষণ করে স্টিভেনসন বক্তব্য বোঝার চেষ্টার করব।

'This is good' -এর নিম্নোক্তরূপ বিশ্লেষণ লক্ষ্য করুন।

১. I approve of this, do so as well (আমি এটা অনুমোদন করি; তুমিও এরকম কর।)

২. I approve of this and I want you to do so as well. (আমি এটা অনুমোদন করি; চাই তুমিও এরকম কর।)

দ্বিতীয় বিশ্লেষণ-বাক্যের শেষ অংশটি বর্ণনামূলক, তবে ঠিক প্ররোচনামূলক বা অ-জ্ঞানমূলক নয়। বাস্তবিক যখন নৈতিক মতভেদ ঘটে, সেখানে যে ধরনের অর্থের কথা বলা হয়েছে তাতে শ্রোতার প্রতিক্রিয়া বা বক্তার উদ্দীপনা জনসাধারণের আবেগকে প্রকাশ করে। আসলে আবেগীয় অর্থ এমন এক শক্তি যার সাহায্যে কোনো পদ বা বাক্য কোনো সরল বা জটিল মনোভাব উদ্রেক করতে পারে বা সরাসরি মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। আবেগ ও মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্টিভেনসন বলেছেন যে আবেগ এমন এক মানসিক অবস্থা যা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানা যায়। কিন্তু মনোভাব বলতে নানা প্রকার মানসিক প্রবণতার জটিল সংযোগকে বোঝায় যেখানে উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়া কাজ করে। বর্ণনামূলক ও আবেগমূলক অর্থের মধ্যে সম্পর্ককে বোঝাতে গিয়ে স্টিভেনসন বলেছেন যে উভয়ের এক দেশ কালের সীমা আছে, যা সময়ে গড়ে ওঠে এবং প্রয়োজনে বা কালের নিয়মে পরিবর্তিত হয়। তবে একই সঙ্গে উভয়ের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হবে এমন কোনো কথা নেই। এ প্রসঙ্গে স্টিভেনসন 'intertia of meaning' এর কথাও বলেছেন। তিনি আবেগমূলক অর্থটির বর্ণনামূলক অর্থের উপর নির্ভরশীলতার ব্যাপারে তিনটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন ১) প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল হতে পারে, দ্বিতীয়টিতে কোন পরিবর্তন হলে প্রথমটিতে পরিবর্তন ঘটে। ২) প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল নাও হতে পারে। তবে বেশির ভাগ সময়ই বর্ণনামূলক অর্থের পরিবর্তন আবেগমূলক অর্থে পরিবর্তন আনে। এবং ৩) প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর আংশিকভাবে নির্ভরশীল হতে পারে, আবেগীয় অর্থটি ব্যঞ্জনার উপর নির্ভর করতে পারে।

এ পর্যন্ত আমরা যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করলাম তা কিন্তু স্টিভেনসনের চূড়ান্ত তত্ত্ব নয়। এটি একটি কার্যকরী কাঠামো, স্টিভেনসনের ভাষায় 'working model' মাত্র। স্টিভেনসনের বিচার অনুযায়ী এই তত্ত্বের একটি সীমাবদ্ধতা আছে। নৈতিক বিচারের অনুজ্ঞামূলক দিকটি এখানে সম্যকরূপে উপস্থিত নয়। তবে তিনি একই সঙ্গে সচেতন যে এই অনুজ্ঞামূলক অংশটিকে এত গুরুত্ব দিলে আবেগবাদের মূলতত্ত্বের প্রতি ঠিক সুবিচার করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'নেশা করা খারাপ' এই বিচারটির কথা বলতে পারি। কার্যকরী কাঠামো (working model) অনুযায়ী এই বিচারটি বোঝায় : ১) আমি নেশা করা কাজটি অনমোদন করি না (বর্ণনাত্মক অংশ)। এখন অনুজ্ঞাত্মক বা প্ররোচনামূলক অংশটির প্রতি নজর দিলেই বোঝা যায় যে এখানে যে অনুজ্ঞার কথা ব্যক্ত হয়েছে তা সাধারণ আদেশ নয়। সাধারণত ব্যক্তির পছন্দ অপছন্দ, রুচি অভিরুচির ব্যাপারটি এরূপ অনুজ্ঞার আওতায় পড়ে না। কেউ যদি হিন্দী সিনেমা পছন্দ না করেন তাহলে জোর করে তাকে পছন্দ করানো যায় না। আবার এরূপ জোর করলে হিন্দী সিনেমার প্রতি তার পছন্দের মনোভাব গড়ে উঠবে — এরকম আশা করা বাতুলতা মাত্র। একই রকম ভাবে অনুমোদন অনুমোদনের বিষয়টিও অনুজ্ঞা প্ররোচনার বিষয় নয়। তাই 'নেশা করা খারাপ' আর 'আমি নেশা করা অনুমোদন করি না, আপনিও করবেন না' — এ দুটি বাক্য সমার্থক নয়।

প্রসঙ্গত স্টিভেনসন এই বিবরণটির নাম দিয়েছেন "the first pattern of analysis" যা কার্যকরী কাঠামো - "working model" এর থেকে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কার্যকরী কাঠামোয় নৈতিক অবধারণের আবেগাত্মক দিকটির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি। প্রতিটি নৈতিক বচনের মধ্যে অনুজ্ঞাত্মক অর্থ খুঁজতে গিয়ে মানুষের স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির প্রতি সুবিচার করা যায় নি। বিশ্লেষণের প্রথম রীতি কিন্তু এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন। তাই এ তত্ত্বের মধ্যে অনুজ্ঞাত্মক কঠোরতা নেই - আছে হৃদয়বৃত্তির কথা, আনুকুল্যের মনোভাব শ্রোতার মনে না জাগলে 'ভাল' কথাটির মর্ম উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্টিভেনসন পরবর্ত্তী পর্যায়ে নৈতিক অবধারণের আরও সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, যাকে বিশ্লেষণের দ্বিতীয় রীতি (the second pattern of analysis) বলা হয়েছে।

৩.১.১.৩ ■ আবেগবাদের সমালোচনা (Criticism of Emotivism)

আবেগবাদের বিচার করতে গিয়ে হাডসন আবেগবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেন; বলেন সমকালীন নীতি বিদ্যার ইতিহাসে স্টিভেনসনের তত্ত্ব এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদ নীতিবিদ্যাকে যেন এক অন্ধগলির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। নৈতিক অবধারণের গতিময় চরিত্রকে (dynamic character) আলোচনা কেন্দ্রে স্থাপন করে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন এয়ার স্টিভেনসনেরা। নৈতিক অবধারণের কাজ কি? - এই প্রশ্নের তিনি ঠিক জবাব চান। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি হয়তো কোথাও কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তাঁর এই বিভ্রান্তি কিন্তু পরবর্ত্তী নীতিআলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

যাই হোক, আবেগবাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হামেশাই উঠে তা হল, স্টিভেনসনের এই তত্ত্ব নৈতিকতার ভিত্তিকেই নড়বড়ে করে দিয়েছে। সত্যিকারের নৈতিক সমস্যার সম্ভাবনাকেই পরোক্ষ আড়াল করে এই আবেগবাদ। নৈতিক অবধারণের অর্থকে নিছক আবেগ-অনুভূতির ভাষার ব্যাখ্যা করে নীতিনৈতিকতাকে রুচিগত পার্থক্যে পর্যবসিত করেছেন আবেগবাদের তাত্ত্বিকেরা।

হাডসন এ প্রসঙ্গে বলেন, এখানে দুটি পৃথক বিচার্য আছে : ১) কোনো ব্যক্তি কি সত্যিসত্যিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে? এবং ২) আমরা কি যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই? তিনি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সদর্থক ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আবেগবাদী তত্ত্বের পর্যালোচনার পর ভাল-মন্দের পার্থক্যের উপর আস্থা হারিয়েছেন এমন অনেকেরে কথা আমরা শুনে থাকি। যদি শৈশব থেকে কাউকে শেখানো হয় যে নৈতিক নিয়মগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে তুলনীয়, বিবেক নামক নৈতিক বৃত্তি স্বজ্ঞার মাধ্যমে নৈতিক সত্যগুলিকে জানে তাহলে তার কাছে স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে আবেগবাদ নৈতিকতার সাক্ষাৎ ভিত্তিকে আঘাত করেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে হাডসন এয়ারকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছেন যে হিউমের বক্তব্যের যৌক্তিক পরিণাম কি হতে পারে আবেগবাদ সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করেছে মাত্র : "Only explores the consequences of a sound and respectable point of logic which was already made by Hume" হিউম সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছিলেন যে বর্ণনামূলক বাক্য থেকে ঔচিত্যমূলক বাক্য নিঃসরণ করা যায় না। আবেগবাদে যা বলা হয়েছে - নৈতিক অবধারণগুলি নিছক বর্ণনামূলক বিবৃতি নয় - এর অর্থ একথা বলা নয় যে নৈতিকতার কোন ভিত্তি নেই। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে : আবেগবাদ নৈতিক অবধারণের অর্থসংক্রান্ত একটি তত্ত্ব, এটি সরাসরি নৈতিক মানদণ্ডের নির্দেশ করে না। হাডসন মন্তব্য করেছেন, "The very existence of emotivism as a theory of morality entails the existence of morality." অধিকন্তু, এটা এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে আবেগবাদের প্রবক্তারাই কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষের মতো জঘন্য নীতি-বিগর্হিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে এয়ার এবং পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে রাসেলের প্রতিবাদ উল্লেখযোগ্য।

অপরদিকে, আবেগবাদের বিরুদ্ধে তথা আপেক্ষিতাবাদ (relativism) -এর অভিযোগ আনা হয়েছে। হাডসন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এ ধরনের অভিযোগ যথার্থ নয়। বিষয়ীবাদী বা ব্যক্তিবাদী মনে করেন নৈতিক পদ বা অবধারণগুলি কোনো একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকে জ্ঞাপন করে মাত্র। কিন্তু স্টিভেনসন প্রথম থেকেই সচেতনভাবে তার আবেগবাদকে আগ্রহতত্ত্ব (Interest theories) থেকে পৃথক করেছেন। হব্‌সের দৃষ্টান্তে উত্থাপন করে তিনি বলেন যে হব্‌স্ যেখানে 'ভাল' বলতে 'আমার ঈপ্সিত' কে বুঝিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন নৈতিক অবধারণের প্রধান কাজ মানুষকে প্রভাবিত করা, বক্তা সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপন করা নয়। তিনি মন্তব্য করেছেন "The difference between the traditional interest theories and my view is like the difference between describing a desert and irrigating them." অধিকন্তু, আপেক্ষিকতাবাদীদের মতে যা কিছুই কোনো ব্যক্তি অনুমোদন করে তাই ভাল। স্টিভেনসনের প্রথম বিশ্লেষণ-রীতি অনুসারে এ রকম মনে হলেও তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথেই এই অভিযোগের খণ্ডন করেছেন। প্রথম বিশ্লেষণ অনুযায়ী - "আমি 'x' কে অনুমোদন করি" এই অর্থটি " 'x' ভাল" এই নৈতিক বিচারের অংশ মাত্র। দ্বিতীয় বিশ্লেষণ-রীতি অনুসরণ করলে এই ভ্রম দূর হয়। হাডসনের বিচারে আবেগবাদকে গ্রহণ করলেই আপেক্ষিকতাবাদকে মেনে নিতে হবে এমন কোনো যৌক্তিক বাধ্যবাধকতা নেই।

৩.১.১.৩.১ ■ স্টিভেনসনের তত্ত্ব কি আত্ম-সংগতিপূর্ণ ? (Is Stevenson self-consistent?)

স্টিভেনসনের দুই ধরনের বিশ্লেষণ-রীতির বিবরণের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অসংগতি রয়েছে বলে জে. ও আর্মসন প্রমুখ সমালোচকরা মনে করেন। হাডসন এই অভিযোগের বিচার করতে গিয়ে আর্মসনের নিম্নোক্ত কয়েকটি কথা উল্লেখ করেছেন।

১. প্রথম বিশ্লেষণ রীতিতে স্টিভেনসন বরাবর বলে এসেছেন 'আমি অনুমোদন করি' (I approve of this) এই বিশ্লেষণ 'ইহা ভাল' (This is good) এর বিশুদ্ধ বর্ণনামূলক অর্থ (purely descriptive)। এর মানে এটি বিশ্বাস সংক্রান্ত, মোটেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত নয় (it has to do only with belief, not at all with attitude)। কিন্তু এই বিবরণের পরবর্ত্তী পর্যায়ে তিনি এই দৃষ্টান্তে দিচ্ছেন : A বলছে 'এটি ভাল' এবং B বলছে উত্তর করছে, 'আমি সম্পূর্ণ একমত। এটা সত্যিই ভাল।' স্টিভেনসন A -এর মন্তব্যের বিশ্লেষণে করছেন এইভাবে: 'আমি এটি অনুমোদন করি; তুমিও এরকম করো।' সেখানে B এর মন্তব্যের বিশ্লেষণে লিখছেন ''আমি সম্পূর্ণ একমত হয়ে এটা অনুমোদন করছি, তুমিও এরকম করে চলো।' তার পরেই তিনি মন্তব্য করছেন, ''The declarative parts of these remarks testifying to convergent attitudes are sufficient to imply the agreement in attitude.'' স্পষ্টতই 'আমি এটি অনুমোদন করছি' এবং 'আমি সম্পূর্ণ একমত হয়ে এটা অনুমোদন করছি' এই বিশ্লেষণ বিশুদ্ধ বর্ণনাত্মক নয়, অর্থাৎ পুরোপুরি দৃষ্টিভঙ্গি মুক্ত নয় (not fully attitude-free)। আর্মসন এভাবে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে 'Stevenson seems to be plainly inconsistent.'।

২. দ্বিতীয় বিশ্লেষণ-রীতি প্রসঙ্গে স্টিভেনসন বলেছেন যে 'ভাল' পদটির অর্থ অস্পষ্ট হলেও সেই অস্পষ্টতা এখন নয় যে কোনো শব্দই x, y, z ইত্যাদি গ্রাহকের জন্য প্রতিস্থাপন করা চলে। কিন্তু আর্মসনের মতে এর পরই 'ভাল' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি শুধু অস্পষ্টতাই সৃষ্টি করেন নি, প্রভূত দ্ব্যর্থকতাও সৃষ্টি করেছেন। 'ভাল' -এর এমন এক প্রয়োগের কথা বলেছেন যা একাধারে সীমিত ও সীমাহীন। আর্মসনের মতে এধরনের বিশ্লেষণ অসংগতিপূর্ণ। প্রথম বিশ্লেষণরীতিতে স্টিভেনসন বলছেন যে, আমি অনুমোদন করি - এই বাক্যটি শুধু যে তথ্য জ্ঞাপন করে তা নয়, অনুমোদনের বিষয় সম্পর্কে এক সম্মতিসূচক মনোভাবও (pro-attitude) জ্ঞাপন করে। কিন্তু পরবর্ত্তী বিশ্লেষণ এই আবেগমূলক অর্থের কোনো উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় অসঙ্গতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্মসন বলেছেন যে স্টিভেনসন 'ভাল' শব্দটির অর্থ এবং প্রয়োগের মানদণ্ডের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন যে 'ভাল' পদটির প্রয়োগের মানদণ্ড যত অসংখ্য প্রকারের হোক না কেন, তার অর্থও অসংখ্য হবে এমন কোনো কথা নেই।

হাডসন অবশ্য মনে করেন যে আর্মসনের সব অভিযোগ যথার্থ নয়। তিনি বিশ্বাস করেন না যে স্টিভেনসন অর্থ ও মানদণ্ডের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারেন নি। স্টিভেনসন অবশ্যই বিশ্বাস করতেন যে 'ভাল' পদটির আবেগীয় অর্থ মোটামুটি স্থির থাকে, যদিও তার প্রয়োগ পৃথক হতে পারে। আসলে

আমাদের মনে হয়, স্টিভেনসন এখানে বলতে চেয়েছেন যে 'ভাল' পদটির পৃথক হতে পারে। আসলে আমাদের মনে হয়, স্টিভেনসন এখানে বলতে চেয়েছেন যে 'ভাল' পদটির আবেগীয় অর্থ ও বর্ণনাত্মক অর্থের মধ্যে পার্থক্য করলে পদটির অর্থের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োগের বৈচিত্র্য উভয়কে ব্যাখ্যা করা যায়।

৩.১.১.৩.২ ■ স্টিভেনসনের মনস্তাত্ত্বিক অর্থতত্ত্ব (Psychological theory of Meaning)

কোনো ভাষা অর্থপূর্ণ কিনা তা দু'ভাবে স্থির করা যেতে পারেঃ ১) কোন মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার প্রবণতা বা শক্তি ভাষার আছে কিনা, এবং ২) ভাষা তার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে কিনা। স্টিভেনসন মনে করেছেন যে ভাষার অর্থপূর্ণতা প্রথম সম্ভাবনাটির উপর নির্ভর করে। কিন্তু হাডসন জোর দিয়ে বলেন, ভাষার অর্থপূর্ণতা নির্ভর করে ভাষা নিয়ম বিধি মেনে চলে কিনা তার উপর। স্টিভেনসন নিয়ম-বিধির ভূমিকাকে একেবারেই স্বীকার করেননি তা নয়। তবে তিনি মনে করতেন, ভাষার বর্ণনামূলক অর্থকে সার্থক করে তোলাই নিয়মগুলির একমাত্র কাজ। আবেগমূলক অর্থের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর মতে, মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার যে প্রবণতা বা ক্ষমতা ভাষার আছে তা যৌক্তিক দিক থেকে ভাষা-সংক্রান্ত নিয়মের অগ্রগামী। হাডসন বলেন, ভাষা কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে কিনা তা একটি আপতিক ব্যাপার (contingent fact)। স্টিভেনসন কার্যতঃ ভাষার অর্থপূর্ণতাকে এই আপতিক বিষয়ের উপর স্থাপন করেছেন যা যথার্থ নয়। হাডসনের মতে, ভাষার অর্থ আছে কিনা তা যৌক্তিক দিক থেকে এক মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে, যা ভাষার কি হওয়া উচিত তা স্থির করে। কিন্তু যা 'উচিত' তাকে 'হয়' এর রূপান্তরিত করা যায় না।

আমাদের মনে হয়, নৈতিক ভাষার কাজ অপরকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রভাবিত করা, এভাবে মনস্তাত্ত্বিক অর্থতত্ত্বের ভাষায় নৈতিকতাকে বুঝলে নৈতিকতাকে প্রচার (propaganda) এর থেকে আলাদা করা যায় না।

৩.১.১.৪ ■ সিদ্ধান্তকারী পর্যবেক্ষণ

কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এয়ার, স্টিভেনসনের আবেগবাদ প্রথমতঃ ম্যুরের স্বজ্ঞাবাদে পর কানাগলি থেকে নৈতিকতাকে বের করে এনে, এবং দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক ভাষার মধ্যে যে একটি শক্তি বা গতিময়তা আছে তার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

৩.১.১.৫ ■ গ্রন্থনির্দেশ

পাঠ্যবই W.D. Hudson : Modern Moral Philosphy ছাড়া নিম্নোক্ত কয়েকটি বই ও প্রবন্ধ পড়া বাঞ্ছনীয়।

১) A.J Ayer : Language, Truth and Logic (Oxford University Press)
২) C.L. Stevenson : Ethics and Language (Yale University Press, London)

৩) C.L. Stevenson : 'The Emotive Meaning of Ethical Terms, **Mind** (article)
৪) শেখ আবদুল ওয়াহাব : বিংশ শতাব্দীর নীতি-দর্শন (বাংলা একাডেমী, ঢাকা)
৫) আবদুল হামিদ : সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা)

৩.১.১.৬ ■ সম্ভাব্য প্রশ্ন/ অনুশীলনী

1. What is emotivism? Consider emotivism as a non-cognitive meta theory.
2. Give a critical account of Ayer's emotivism.
3. What are the basic tenets of Stevenson's emotivism? Discuss after Hudson.
4. In what respects Stevenson's theory is different from that of Ayer? Discuss.
5. Give a critical estimation of Stevenson's emotivist theory.
6. Write short notes on :
   a) Psychogical theory of meaning.
   b) Emotive meaning and Descriptive meaning.
   c) Stevenson's first pattern of analysis.
   d) Dynamic charater of ethical language.
   e) Urmson's criticism of Stevenson's theory.

একক : ৩.১.২ অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদ (Prescriptivism)

বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিনীতিতত্ত্ব হল অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদ (Prescriptivism), যার প্রধান প্রবক্তা আর. এম. হেয়ার (R. M. Hare)। পরামর্শবাদ অনুসারে নৈতিক অবধারণ মাত্রেই পরামর্শমূলক (prescriptive) যা আমাদের নির্দিষ্ট এরকমভাবে কাজ করতে নির্দেশ দেয়। এই পরামর্শ যুক্তির উপর ভিত্তিশীল এবং তাই সামান্যকরণযোগ্য বা সর্বজনীনযোগ্যও বটে। বস্তুতঃ হেয়ারের মতে নৈতিক অবধারণের দুটি বৈশিষ্ট্য পরামর্শধর্মিতা (Prescriptivity) ও সর্বজনীনতা (Universalizability)। বিস্তারিত আলোচনার শুরুতেই আমাদের উৎপত্তির ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, বোঝা প্রয়োজন কিভাবে এয়ার স্টিভেনসনের আবেগবাদের পুনর্বিচারের মাধ্যমে হেয়ারের পরামর্শবাদ সামনে এসেছে।

৩.১.২.১ ■ আবেগবাদের বর্জন (The Rejection of Emotivism)

নৈতিক অবধারণের এক ধরনের গতিময়তা (dynamism) রয়েছে — আবেগবাদী এই অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে হেয়ার একমত। একমত এই বিষয়েও যে নৈতিক অবধারণ নিছক বর্ণনাত্মক নয়। কিন্তু আবেগবাদ

যখন বলে নৈতিক আলোচনা বা অবধারণের মূল লক্ষ্য হল বক্তার মনোভাব প্রকাশ করা এবং একই সঙ্গে শ্রোতার মধ্যে এক ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করা তখন হেয়ার এ মতোর দ্বিমত পোষণ করেন। হেয়ারের সুস্পষ্ট বক্তব্য, নৈতিক বিচারের প্রধান কাজ হল কাউকে নিছক নিজের মতে টেনে আনা বা প্রভাবিত করা নয়, বরং শ্রোতাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া। শিক্ষক যখন বলেন 'তোমার সত্য কথা বলা উচিত' তখন তিনি ছাত্রের আচরণের বর্ণনা দিচ্ছেন না, কোনো কিছু করিয়ে নেওয়ার জন্য তার উপর প্রভাব বিস্তারও করছেন না। তিনি ছাত্রের কি করা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছেন, যে পরামর্শের মধ্যে যুক্তিতর্ক আছে। হেয়ার যা বলতে চান, নৈতিকতার মূল বিষয় কোনো কিছু করা বা না করার পক্ষে ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করা নয়, বরং কোনো এক রকমভাবে কিছু করা বা না করার জন্য কাউকে পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়া। হেয়ার মনে করিয়ে দেন যে কোনো কিছু করার জন্য কাউকে নির্দেশ দেওয়া বা পরামর্শ দেওয়া এবং কোনো কিছু করার পক্ষে কাউকে প্ররোচিত করা — এক জিনিস নয়। কিছু করার জন্য কারোর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করার অর্থ হল তাকে কোনো কিছু করতে প্ররোচিত করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বক্তার উদ্দেশ্য সফল হলেও শ্রোতাকে বক্তার উক্তি যুক্তিসম্মত উপায়ে অনুধাবন না করেই কাজটি সম্পাদন করতে হয়। কিন্তু নৈতিক অনুজ্ঞা বা পরামর্শের ক্ষেত্রে শ্রোতা বক্তার নির্দেশকে যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বিচার করে তবেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং নৈতিক অবধারণের অর্থ কোনো ক্রমেই নিছক আবেগমূলক নয়, পরামর্শ বা অনুজ্ঞামূলক (prescriptive)।

হেয়ারের মতে, আবেগবাদীরা নৈতিক ভাষার যথার্থ স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই নৈতিকতাকে প্রচার (propaganda) থেকে আলাদা করতে পারেন নি। তিনি নিম্নোক্ত যুক্তিতে আবেগবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন :

প্রথমত: আবেগবাদীরা কাজের যৌক্তিকতা (reason for action) এবং কাজের হেতু (cause for action) এই দুয়ের বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত: আবেগবাদ ভাষার অর্থ (meaning) এবং তার পরিণাম-সৃষ্টিকারী শক্তি (perlocutionary-force) এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি।

হেয়ারের প্রথম যুক্তিটি বিশদ করা যাক। স্টিভেনসন মনে করতেন যে নৈতিক বিচারের সপক্ষে দেওয়া যুক্তিগুলি বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সপক্ষে দেওয়া যুক্তির থেকে আলাদা। তিনি বিকল্পের সন্ধান করতে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি ভেবেছেন, নৈতিকতার মূল্য লক্ষ্য হল, কোন কিছু সম্পর্কে ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটানো এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি এ কাজে বেশ কিছু ক্ষেত্রেই সফল হয়, তাই অ-যৌক্তিক এই পদ্ধতিই নৈতিক বিচারে গ্রাহ্য হবে। এই বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে তিনি সেইসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যেগুলি শ্রোতার কাছে কাজের হেতু (cause) হিসাবে কাজ করার, যুক্তি (reason) হিসাবে নয়। নিজের অভিমতে শ্রোতাকে টেনে আনার জন্য তার অনুভূতির উপর প্রভাব বিস্তার করা নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন, কাজটি যুক্তিতর্কের বিচারে যথাযথ কিনা তা নিয়ে তিনি চিন্তা করছেন না।

হেয়ার মনে করেন নৈতিক বিচারের মধ্যে যতেষ্ট যুক্তিতর্কের ব্যাপার (rationality) রয়েছে। কোনো নৈতিক সমস্যা যুক্তিসংগতভাবেই নৈতিক ভাষায় প্রকাশ পায়। তাই নৈতিক আলোচনায় প্রতিপক্ষকে

পরাস্ত করার উপায় হল তাঁর বক্তব্যের পিছনে যে যুক্তি আছে তার অসারতা প্রমাণ করা। হেয়ারের আরও বক্তব্য, নৈতিক যুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনে যে যুক্তি দেখানো হয়, তা ব্যক্তিনিরিপেক্ষ ও সর্বজনীন। তাই, হেয়ারের মতে, নৈতিক বিচার সর্বজনীনযোগ্য বা সার্বিকীকরণ (universalizable)।

হেয়ারের আবেগবাদ বর্জনের দ্বিতীয় যুক্তিটিতে আসা যাক। স্টিভেনসন যে অর্থতত্ত্বে স্থিত হয়েছেন তা হল মনস্তাত্ত্বিক অর্থতত্ত্ব (psychological theory of meaning)। তদনুসারে কোনো পদ বা বাক্যের অর্থ হল শ্রোতার মনে প্রভাব সৃষ্টি করার প্রবণতা। কোনো ভাষা কোনো মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে-এটি অভিজ্ঞতালব্ধ আপতিক বচন। আর কোনো কোনো প্রথা ও বিধি মেনে ভাষা ব্যবহার করলে তা যথার্থ হবে, অর্থপূর্ণ হবে তা স্বতন্ত্র বিষয়। আসলে কোনো ভাষা অর্থপূর্ণ কিনা তা কি কার্য সৃষ্টি করে বা কি প্রতিক্রিয়া ঘটায় তার উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কোনো ভাষার নির্দিষ্ট প্রয়োগরীতি নিয়ম-কানুন মেনে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তার উপর। বক্তাকে কোন কিছু করতে প্রণোদিত করে অর্থাৎ কাজের যে কারণ (cause) তা নৈতিক বচনের অর্থ (meaning) থেকে আলাদা। কোনো উক্তির হেতু ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু উক্তির অর্থ একই থাকে। উক্তির পরিণাম এক কথা, আর নিজের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি তুলে ধরা আরেক কথা। আমরা অস্টিনের ভাষা ধার করে বলতে পারি, কোনো বিবৃতির পরিণামসৃষ্টিকারী শক্তি (perlocutionary force) আর তার অর্থ (meaning) এক জিনিস নয়।

বস্তুতঃ আবেগবাদ নৈতিক বিচারের যুক্তিবত্তাকে অস্বীকার করে। তাই হেয়ার আবেগবাদকে কোনভাবেই মেনে নিতে পারেন নি। হেয়ারের সুস্পষ্ট অভিমত নৈতিকতা এক যুক্তিসিদ্ধ বিষয়, নৈতিক বিচারের সমর্থনে যুক্তিতর্ক দেওয়া যায়। হেয়ার তাঁর অভিমতকে 'a rational kind of non-descriptivism' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

৩.১.২.২ ■ হেয়ারের অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদের ব্যাখ্যা

আর. এম. হেয়ার (R. M. Hare) এর মতে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য নৈতিক অবধারণের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য (তাঁর নিজের ভাষায়, three most important thuths about moral judgement) : ক) নৈতিক অবধারণগুলি এক ধরনের পরামর্শ বা নির্দেশমূলক অবধারণ (prescriptive) খ) সর্বজনীনযোগ্য (universalizable) হওয়ার জন্য তারা অন্যান্য অবধারণ থেকে আলাদা, গ) নৈতিক চিন্তা তথা যুক্তির মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক (logical relation) আছে, যেহেতু পরামর্শধর্মী অবধারণগুলির মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক সম্ভব। আমরা এখন হাডসনকে অনুসরণ করে হেয়ারের নীতি-দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করব।

৩.১.২.২.১ : অনুজ্ঞা বা পরামর্শধর্মিতা (Prescriptivity)

হেয়ারের মতে প্রতিটি নৈতিক অবধারণ এক বিশেষ ধরনের নির্দেশাত্মক অবধারণ বা পরামর্শ। আমরা নৈতিক অনুজ্ঞাও বলতে পারি, যেহেতু এই অবধারণগুলি উপদেশমূলক। 'তোমার ঋণ পরিশোধ করা উচিত' -এ নৈতিক অবধারণে এরূপ নির্দেশ রয়েছে : 'তুমি ঋণ পরিশোধ কর'। কিন্তু এক্ষেত্রে জোর করে

কাজ করিয়ে নেওয়ার কথা নেই। এই আদেশ, নির্দেশ বা অনুজ্ঞা শেষমেষ পরামর্শ হিসাবেই দেখা যেতে পারে। শ্রোতা স্বাধীনভাবে যৌক্তিক পদ্ধতিতে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত থেকে সে কি করবে। আমরা বলতে পারি, এ ধরনের অবধারণগুলি 'action-guiding'। নৈতিক ভাষার এই পরামর্শ বা নির্দেশমূলক স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কল্পে হেয়ার বর্ণনাতিরিক্ততার (supervenience) প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, নৈতিক অবধারণের মূল্যবোধক পদসমূহ (যেমন, 'ভাল', 'যথোচিত', 'ন্যায্য') -এর এক ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে যা ঘটনাবোধক পদসমূহের নেই। হেয়ার ভাষা ব্যবহারের সাধারণ রীতি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে কোনো মূল্যবোধক অবধারণের ক্ষেত্রে যুক্তিতর্কের প্রসঙ্গ তোলা সব সময়ই যুক্তিযুক্ত। এই দৃষ্টান্ত বিচার করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে : 'এটি একটি ভাল বই', 'এটা ঠিক রাস্তা' এবং 'আপনার দর্জির বিল মিটিয়ে দেওয়া উচিত'। প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রোতা জিজ্ঞাসা করতে পারেন 'কেন'? এ ধরনের জিজ্ঞাসার উত্তর হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কিত কোনো এক বা একাধিক বিবরণ : যেমন (যথাক্রমে) বলা যেতে পারে 'এই বই-এর চরিত্রগুলি মজার', 'এই রাস্তাটা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছে দেবে' এবং 'আপনার দর্জি এই ভাবনায় ভর করে আপনার পোষাক বানিয়ে দিয়েছে যে আপনি তার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবেন।' এসব ক্ষেত্রে কিছু অ-মূল্যবোধক বৈশিষ্ট্য ভালত্ব, সঠিকত্ব বা ঔচিত্যের পক্ষে যুক্তি হিসাবে কাজ করছে। আবার এই একই পদগুলির অন্য কিছু প্রয়োগ-ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এ ধরনের উত্তর কখনোই যুক্তিযুক্ত নয়। যদি আমি কাউকে বলি দুটি বস্তু, A ও B, সব দিক থেকেই ভাল এই তফাতটুকু ছাড়া যে A ভাল কিন্তু B তা নয়, তাহলে শ্রোতা বিমূঢ় হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে আমার শ্রোতা জানতে চাইবেন, এগুলি ছাড়া আর কি বৈশিষ্ট্য আছে যা দিয়ে দুটির মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য হবে? পাশাপাশি আমরা যদি বলি, এই বইটি ঐ বইটির সঙ্গে হুবহু এক শুধু এই বইটির লাল মলাট আছে এই যা' তাহলে কিন্তু নতুন করে কোনো জিজ্ঞাসা সামনে আসবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিছু ক্ষেত্রে মূল্যের পার্থক্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভাষায় বর্ণনা করা যায়, কিন্তু অন্য কিছু ক্ষেত্রে তা করা যায় না। নৈতিক মূল্যবোধক শব্দের এই বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যকে 'supervenience' বলা হয়েছে। অন্যভাবে বললে, নৈতিক অবধারণের মূল্যায়ন অতিবর্ত্তী এই বৈশিষ্ট্য বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক, এই বর্ণনাতিরিক্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে হেয়ার বলতে চায়, নৈতিক অবধারণে এই বর্ণনাতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হল নির্দেশধর্মিতা। নৈতিক অবধারণ নিছক কোনো কিছুর বর্ণনা করে না, বরং 'আমার কি করা উচিত?' সে সম্পর্কে নির্দেশ দেয়। নির্দেশ বা পরামর্শ দেওয়াই নৈতিক অবধারণ বা নৈতিক পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে মনে রাখতে হবে পরামর্শ দেওয়া (prescribing) বহুমুখী ক্রিয়া। কোন ছবিকে ভাল বলা বা ছাত্রকে নির্দেশ দেওয়া, বা কি করতে হবে দিগ্‌দর্শন করা ইত্যাদি সব কিছুই পরামর্শ বা নির্দেশের মধ্যে পড়ে। নীতি-দার্শনিকরা নৈতিক মূল্যবোধক অবধারণ তথা পদগুলিকে বর্ণনামূলক বলে ঘোষণা করে তাদের অকেজো করে ফেলেছেন।

৩.১.২.২.২ ■ মূল্যাত্মক অবধারণ ও অনুজ্ঞা (Value judgements and imperatives)

হেয়ারের মতে, মূল্যাত্মক অবধারণ থেকে সংজ্ঞাগতভাবে অনুজ্ঞা (imperative) নিঃসৃত হয়। 'আমার ক-কাজটি করা উচিত' বলা মানেই হচ্ছে 'ক-কাজটি আমাকে করতে দিন'। কেউ যদি প্রথম

অবধারণটিতে সম্মতি জানায়, তাহলে তার থেকে নিঃসৃত হবে যে অনুজ্ঞা তাতে সম্মতি জানাতেই হবে। প্রথমটিতে সম্মতি জানিয়ে যদি কেউ দ্বিতীয়টিতে অসম্মতি জানায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে সেই ব্যক্তি মূল্যবোধক নৈতিক অবধারণটিক প্রকৃত অনুধাবন করতে পারেনি। হেয়ারের ভাষায়, ''Thus to say that moral judgements guide actions and to say that they entail imperatives comes to mean the same thing.'' পরামর্শ বা নির্দেশকতা (prescriptivity) -র ধারণা সুস্পষ্ট হবে যদি আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অভিযোগ বা প্রশ্নের বিচার করি।

১) নৈতিক মূল্যবোধক অবধারণগুলি পরামর্শমূলক, নির্দেশাত্মক - হেয়ারের এই সংজ্ঞা স্বেচ্ছাচারিতা (arbitrary) নয় তো? হেয়ারের বক্তব্য, এই সংজ্ঞা সাধারণ প্রয়োগরীতির (ordinary usage) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাই একে নিছক ব্যক্তিগত খামখেয়ালী হিসাবে ব্যাখ্যা অবান্তর। সাধারণভাবে মূল্যবোধক অবধারণ, এবং বিশেষভাবে নৈতিক অবধারণ, আমাদের পছন্দ-অপছন্দের দিগ্‌দর্শন করে, আমাদের কি করতে হবে বা হবে না সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়। আমরা যখন ভাল-মন্দ কিংবা ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিয়ে যুক্তিতর্ক করি, তখন এরকম বলা অবাস্তব যে এগুলি এমন ধরনের যুক্তিতর্ক যার সিদ্ধান্ত আমাদের কি করতে হবে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই।

২) হাডসন প্রশ্ন তুলেছেন, মূল্যবোধক অবধারণের এমন কোন বৈধ প্রয়োগ রয়েছে যেখানে কোন অনুজ্ঞা বা পরামর্শের ইঙ্গিত থাকে না? এ পর্যন্ত আমরা যেভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি তাতে মনে হচ্ছে হেয়ার যেন বলতে চাইছেন মূল্যবোধক অবধারণের একমাত্র অর্থ পরামর্শদান বা নির্দেশনা। কিন্তু এই ভাবনা সম্পূর্ণতঃ ঠিক নয়। হেয়ার তাঁর "Freedom and Reason" গ্রন্থে তিন ধরনের অর্থের মধ্যে পার্থক্য করেছেন : ''An expression which, in a certain context, has descriptive meaning and no other, I call a *descriptive* term, word or expression, as used in that context, or which has prescriptive meaning (whether or not it also has descriptive meaning) I call a prescriptive term; and one which has both kinds of meaning I call an *evaluative* term.'' স্পষ্টতই, হেয়ার 'Language of Morals' -এ তাঁর অবস্থান থেকে কিঞ্চিৎ সরে এসে বলতে বলতে চাইছেন, সকল মূল্যবোধক অবধারণের বর্ণনাত্মক অর্থ (descriptive meanings) - ও আছে। আসলে সাধারণ কথাবার্তায় যখন আমরা কোনো কিছু ভাল বা মন্দ বলি, তখন ঐ বস্তুর বৈশিষ্ট্যের বা নির্দিষ্ট কিছু গুণের জন্যই আমরা জিনিসটিকে ভাল বা মন্দ বলি। এই ভালত্ব বা মন্দত্ব নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহই সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধক পদটির বর্ণনামূলক অর্থ। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, হেয়ার সেই পুরনো প্রকৃতিবাদে ফিরে আসছেন। হেয়ার মূল্যবোধক পদের যে বর্ণনাত্মক অর্থের কথা বলেছেন তা কিন্তু নির্দেশাত্মক অর্থের অধীন। হাডসনের বিশ্লেষণ অনুসারে, "The descriptive meaning of value words ... is subject to another kind of meaning, namely preserptive.'' এখন তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মূল্যবোধক পদের বর্ণনামূলক অর্থ নির্দেশাত্মক অর্থের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত?

৩) হেয়ার এ প্রসঙ্গে 'primarily evaluative words' এবং 'secondarily evaluative words' এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। নৈতিক প্রসঙ্গে আমরা এখানে 'primarily evaluative words' নিয়ে ভাবিত।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'পরিশ্রমী' (industrious) পদটি মূল্যাত্মক হওয়া সত্ত্বেও এর বর্ণনামূলক অর্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু 'ভাল' (good) পদটি মুখ্যতঃ মূল্যাত্মক (primarily evaluative) পদ এবং তাই অপরাপর মূল্যবোধক পদ থেকে আলাদা। 'পরিশ্রমী' প্রভৃতি পদের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকখানি পূর্ব নির্দিষ্ট। কিন্তু 'ভাল' পদটি থেকে এর প্রয়োগকে আলাদা করতে পারি, এবং এক বৈশিষ্ট্যের বদলে অন্য কিছু প্রতিস্থাপন করতে পারি। এখানে পদটির নির্দেশাত্মক অর্থটি বর্ণনামূলক অর্থ থেকে যৌক্তিক পূর্ববর্তী (logically prior to its descriptive meaning) অর্থাৎ নৈতিক পদগুলি 'primarily evaluative' , এবং এর বর্ণনামূলক নির্দেশাত্মক অর্থের উপর কোন না কোন ভাবে নির্ভরশীল।

৩.১.২.২.৩ ■ সর্বজনীনযোগ্যতা (Universalizability)

হেয়ারের মতে, নৈতিক মূল্যবোধক অবধারণের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সর্বজনীনতা বা সার্বিকীকরণযোগ্যতা (universalizability)। নৈতিক অবধারণ মাত্রেই এমন হবে যে একই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সকল ব্যক্তি বা বিষয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এর মানে, বিশেষ পরিস্থিতিতে কোনো এক ধরনের কাজ ক-ব্যক্তির জন্য করণীয় হয় তাহলে অনুরূপ ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্ম খ- ব্যক্তির জন্যও অবশ্যকরণীয় হবে। হেয়ারের মতে, সর্বজনীন যে কোনো নৈতিক অবধারণের এক অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য, যা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অবধারণের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। আবার এই সর্বজনীনতাই নৈতিক অবধারণের যুক্তিবত্তাকে প্রতিপাদন করে। আবেগবাদীরা মনে করেছেন, নৈতিক পদ বা অবধারণ ব্যক্তির আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ মাত্র, তাই সেখানে সত্য-মিথ্যা, বৈধতা-অবৈধতা প্রমুখ অবান্তর। হেয়ার এর বিরোধিতা করে বলেন যে নৈতিক বিচারের মধ্যে যুক্তি-তর্কের অবকাশ আছে। তাঁর সর্বজনীনযোগ্যতার মানদণ্ড এই যুক্তিবত্তার সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট।

হেয়ারের সর্বজনীনতার ধারণা তাঁর অর্থের ধারণার সঙ্গেই যুক্ত। অর্থপূর্ণ ভাষা সর্বদা নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নীতি অনুসরণ করে। যদি ভাষা-ব্যবহারকে বোধগম্য হতে হয় তাহলে তাকে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। একই বস্তু বা একই পরিস্থিতি বোঝাতে একই ভাষা সব জায়গাতে প্রযুক্ত হবে। বর্ণনাত্মক অর্থযুক্ত পদ বা অবধারণগুলি সর্বজনীনযোগ্য হবে এই অর্থে যে যদি তারা কোনো এক জিনিসকে বোঝায় তাহলে তা সদৃশ সকল বস্তুকে বোঝাবে। (অবশ্য এর খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনাত্মক অর্থ-নিয়মের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে।) তবে মূল্যবোধক ভাষা, বিশেষভাবে নৈতিকমূলকবোধক পদ বা অবধারণের সর্বজনীনতার বিষয়টি একটু জটিল। হেয়ার এ প্রসঙ্গে মূল্যাত্মক পদ এবং বর্ণনাত্মক পদের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের আলোচনা করেছেন। কোনো সংজ্ঞা পূরণ করে এমন যে কোনো বস্তুকে আমি 'ডাক-বাক্স'' বলতে বাধ্য। হেয়ারের ভাষায়, ''If I call a thing red, I am committed to calling anything else like it red. And if I call a thing a good X, I am committed to calling an X like it good.'' সামান্যীকরণযোগ্যতা মূল্যবোধক ও বর্ণনাত্মক উভয় প্রকার ভাষার সাধারণ ধর্ম। তবে হেয়ারের মতে মূল্যায়নমূলক ভাষার সামান্যীকরণ যোগ্যতার বিষয়টি বর্ণনাত্মক ভাষার সামান্যীকরণযোগ্যতার থেকে একটু বেশি জটিল। মূল্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি

কেবল ব্যবহৃত পদের অর্থের সাহায্যে মীমাংসা করা যায় না, কারণ একটি মূল্যাত্মক অবধারণে অর্থ-নিয়ম (meaning-rule) -এর অতিরিক্ত এক সংশ্লেষক মানদণ্ড বা নীতি থাকে। একই ভাষাভাষী দুটি আলাদা দেশের লোকেরা একই বস্তুকে দুটি ভিন্ন নাম দিতে পারে। এ ব্যাপারে কে ঠিক বলছে, কে ভুল বলছে তা নিয়ে তর্ক করা হাস্যকর, কেননা এখানে বির্তকের বিষয়টি হচ্ছে বিশ্লেষক। কিন্তু অভিবাসীদের নিজেদের দেশে ফিরে যেতে বলা নিয়ে যদি দুই যদি রাজনৈতিক দলের মধ্যে বির্তক হয় তাহলে তা হবে সংশ্লেষক। প্রথম ক্ষেত্রে সামান্যীকরণযোগ্যতার ভিত্তি হচ্ছে অর্থের নিয়ম (meaning rule); আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা হল কর্মনীতি (principle of action)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাগুলিকে কেবলমাত্র অর্থের নিয়মের দ্বারা মীমাংসা করা যায় না, তার মীমাংসা করতে গেলে অভিবাসীদের প্রতি কি ধরনের আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার।

৩.১.২.২.৩.১ ■ সর্বজনীনযোগ্যতা ও বর্ণনাতিরিক্ততা (Universalizability and Supervenience)

প্রসঙ্গক্রমে হেয়ার সর্বজনীনযোগ্যতা ও বর্ণনাতিরিক্ততার মধ্যে সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা দেখেছি বর্ণনাতিরিক্ততা নৈতিক বিচারের এক স্বরূপ, যার তাৎপর্য হল মূল্যবোধক যুক্তি সম্পর্ক সব সময় প্রশ্ন করা যেতে পারে। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্ণনাতিরিক্ততার সঙ্গে সর্বজনীনযোগ্যতার সম্পর্ক কিরূপ? হেয়ারের মতে, মূল্যাত্মক অবধারণের যুক্তি সম্পর্কে মর্যাদার প্রশ্ন উঠতে পারে, এবং সেই যুক্তি সার্বিক হতে পারে বা তার সার্বিকীকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু মূল্যাত্মক অবধারণ শুধু নয়, যে কোনো অবধারণের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার সামান্যীকরণের চেষ্টা করতে পারে। হেয়ারের বিশ্লেষণের ধারা অনুসরণ করে হাড্‌সন ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ক ভাল' এই অবধারণের অর্থ শুধু এই নয় যে তার যুক্তিটি আমরা জানতে চাইতে পারি এবং সামান্যীকরণ করতে পারি। বস্তুত আমরা যা জানতে চাই তা হল : ক-এর মধ্যে এমন কি আছে যে তার জন্য ক- কে ভাল বলা হচ্ছে? কিন্তু এর উত্তর 'এর মধ্যে ভালত্ব আছে' যথেষ্ট নয়। এর জন্যই 'ক-ভাল' - এই বচনটি 'ক হলুদ রঙের' এর থেকে স্বতন্ত্র । আবার সামান্যীকরণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্যটি বর্ণনাতিরিক্ততার থেকে আলাদা। হেয়ার কেবল সেই ধরনের যুক্তিকেই বিচারের পক্ষে যথাযথ বলে মনে করেন যার মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি বা ক্ষেত্রের উল্লেখ থাকে না। এ ধরনের যুক্তিকে তিনি 'U-type reason' নাম দিয়েছেন। অপরাপর মূল্যবোধক বিচারের যুক্তিকে তিনি বলেছেন 'E-type reason'। যদিও উভয় প্রকার বিচারের মধ্যে কোনো না কোনো অর্থ নিয়ম প্রচ্ছন্ন থাকে, তথাপি U-type যুক্তির মধ্যে যে সার্বিকতা থাকে তা আবশ্যিক (necessarily universalizable)।

যাই হোক, হেয়ার নির্দেশকতা ও সামান্যীকরণযোগ্যতা ছাড়া আরো তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন : ক) তথ্যের প্রতি আবেদন (an appeal to fact) খ) প্রবণতা ও আগ্রহের প্রতি আবেদন (appeal to inclination and interest) গ) কল্পনার প্রতি আবেদন (appeal to imagination)

ক) সব নৈতিক বিচারের তথ্যের প্রতি আবেদন থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অশ্লীল পত্রপত্রিকার বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া উচিত - এই অবধারণটির কথা ভাবা যেতে পারে। বক্তা তার বিচারের যুক্তি হিসাবে বলতে পারেন 'অশ্লীলপত্র পত্রিকার বিক্রয়ের ফলে যৌন অপরাধ বৃদ্ধি পায়', এখানে এক সার্বিকীকরণযোগ্য তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত আছে। ন্যায় যুক্তির আকারে সাজালে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

সকল পত্র পত্রপত্রিকা যা যৌন অপরাধ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তার বিক্রয় বন্ধ করা উচিত।
অশ্লীল পত্রপত্রিকা যৌন অপরাধ বৃদ্ধির কারণ।
অতএব অশ্লীল পত্রপত্রিকার বিক্রয় বন্ধ করা উচিত।

এখানে প্রধান যুক্তিবাক্যটি একটি সার্বিক ঔচিত্যমূলক বিধি, অপ্রধান আশ্রয়বাক্যটি একটি তথ্যের বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তটি একটি বিশেষ ঔচিত্যমূলক অবধারণ। অশ্লীল পত্রপত্রিকা সম্পর্কে নানা তথ্যের মধ্যে বক্তা কেবল এই তথ্যটি বেছেছেন যে সেগুলির প্রচার বা বিক্রয় অপরাধ-প্রবণতার কারণ। হাডসন্ মন্তব্য করেছেন, তথ্যের প্রতি আবেদন নৈতিক বিচারের বৈশিষ্ট্য ঠিকই, কিন্তু তা নৈতিক বিচারকে অপরাপর বিচার থেকে আলাদা করতে পারে না। একই প্রকার তথ্যের প্রতি আবেদন অন্যান্য বিচারেও দেখা যায়।

খ) দ্বিতীয় শর্তটি প্রবণতা এবং আগ্রহের প্রতি আবেদন বলতে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা বা প্রয়োজনকে বোঝানো হয়েছে, যা আলোচ্য ব্যক্তির আছে বা থাকতে পারে, যা তিনি তৃপ্ত করতে চান। এই আকাঙ্ক্ষা না থাকলে নৈতিক বিচারের প্রয়োজন হত না। হেয়ার অবশ্য স্বীকার করেছেন যে কোনো ব্যক্তি এ ধরনের আবেদনকে তুচ্ছ করে সর্বজনীনতায় স্থিত হতে পারেন। 'সব ইহুদিকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত'- এমন বিশ্বাস পোষণ করে এমন একজন নাৎসীর কথা চিন্তা করা যাক্। ধরা যাক্, ঐ নাৎসীকে কৌশল করে বোঝানো হল যে তাঁর মা-বাবা ইহুদি। হেয়ার বলেন যে এই নাৎসীর পক্ষে 'তাহলে আমার পরিবারকে ধ্বংস করে ফেলা হোক' — এ ধরনের বিচার করার সম্ভাবনা খুবই কম তা ঠিক, কিন্তু যৌক্তিক দিক থেকে অসম্ভব নয়। প্রবণতা বিরোধী হলেও তার বিচার অবশ্যই নৈতিক হবে।

গ) তৃতীয় বিষয়টি কল্পনার প্রতি আবেদন সংক্রান্ত। নৈতিক বিচারের কর্তা নিজেকে অন্য কারোর স্থানে স্থাপন করে ভাবার চেষ্টা করেন। হেয়ার এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের প্রাকল্পিক অবরোহাত্মক বিচারের সঙ্গে নৈতিক বিচারের তুলনা করেছেন। উভয় প্রকার বিচারই অন্বেষণধর্মী, তবে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এক পার্থক্য এই যে বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রাথমিক শর্ত তথ্যের প্রতি আবেদন (matter of fact), যেখানে নৈতিক বিচারের প্রাথমিক শর্ত পূর্বস্বীকার্য সম্বন্ধীয় (matter of supposition) — কোন পূর্ব নির্দিষ্ট নীতির প্রতি আমাদের নিষ্ঠা।

৩.১.২.২.৪ ■ যৌক্তিক সম্পর্ক (Logical Relations)

নৈতিক অবধারণের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য নৈতিক চিন্তনের যৌক্তিক পদ্ধতি-প্রকরণ সম্বন্ধীয় : পরামর্শমূলক অবধারণগুলির মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক সম্ভব। বেশির ভাগ চিন্তাবিদ মনে করেন যে তর্কশাস্ত্রের বিষয়বস্তু বিবৃতি (indicatives) মূলক বাক্যের মধ্যেকার যৌক্তিক সম্পর্ক। কিন্তু হেয়ারের মতে, নির্দেশাত্মক বাক্য বা অনুজ্ঞাসমূহের (imperatives) মধ্যেকার সম্পর্কও যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হতে পারে। তাঁর মতে,

নৈতিক বিচার মাত্রই অবরোহ অনুমান। একটি অনুজ্ঞা নিঃসৃত করা যায়, একটি অনুজ্ঞা আরেকটি অনুজ্ঞার বিরোধীও হয়। 'সব গাড়ি বাঁ দিকে যাও' এই অনুজ্ঞা থেকে 'এই গাড়িটি বাঁ দিকে যাও' এই অনুজ্ঞাটি নিঃসৃত হয়, ঠিক যেমন 'সব গাড়ি বাঁ দিকে যাবে' এই বিবৃতি থেকে 'এই গাড়িটি বাঁ দিকে যাবে'- এই বিবৃতিটি নিঃসৃত হয়। আবার 'থামো' এই অনুজ্ঞাটি 'সাবধানে এগিয়ে চল' এই অনুজ্ঞার বিরোধী, ঠিক তেমন 'তুমি থামবে' বিবৃতিটি 'তুমি সাবধানে এগিয়ে যাবে' - এই বিবৃতিটি বিরোধী।

বিবৃতির মতো বিভিন্ন অনুজ্ঞার মধ্যেও যে যৌক্তিক সম্পর্ক কাজ করে তা বোঝাবার জন্য হেয়ার 'phrastic' এবং 'neustic' এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। বিবৃতি ও অনুজ্ঞার মধ্যে যে অংশটি সাধারণ তাকে তিনি 'phrastic' বলেছেন। সকল যৌক্তিক পদ এই 'phrastic' অংশের অন্তর্গত। আর যে অংশটি অনুজ্ঞা ও বিবৃতিকে আলাদা করে তাকে তিনি 'neustic' বলেছেন। 'phrastic' অংশের কাজ বাক্যটি কি নিয়ে তার বর্ণনা করা (to point out indicate); আর 'neustic' অংশটির কাজ সম্মতিজ্ঞাপন করা (to point out or indicate); আর 'neustic' অংশটির কাজ সম্মতিজ্ঞাপন করা (to nod asset)। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে।

(ক ১) 'দরজাটি বন্ধ করো' — এই অনুজ্ঞাটির নিম্নরেখিত প্রথম অংশটি phrastic, এবং দ্বিতীয় অংশটি 'neustic'

(ক ২) **অদূর ভবিষ্যতে তোমার দরজা বন্ধ করা,** অনুগ্রহ করে।

(খ ১) 'তুমি দরজাটি এখন বন্ধ করবে' — এই বিবৃতিকে বিশ্লেষণ করলে হয় :

(খ ২) **অদূর ভবিষ্যতে তোমার দরজা বন্ধ করা,** হ্যাঁ।

'Phrastic' অংশে মিল থাকার কারণে অনুজ্ঞাসমূহের মধ্যে অন্তঃসম্পর্ক সম্ভব হয়।

৩.১.২.৩ ■ পরামর্শবাদের সমালোচনা (Criticism of Prescriptivism)

হেয়ারের পরামর্শবাদের বেশ কিছু সমালোচনা হয়েছে। হাডসন হেয়ারের পরামর্শতত্ত্ব তথা নির্দেশবাদের বিষয়ে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন : হেয়ারের অধিকাংশ সমালোচকই স্বীকার করবেন যে কোনো ব্যক্তি কোনো নৈতিক আদর্শ বা নীতি মানেন তা জানার সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় হল তিনি বাস্তবিক কি করেন তা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু এসত্ত্বেও তাঁরা হেয়ারের সঙ্গে দুটি বিষয়ে একমত নন। প্রথমত:, নৈতিক ভাষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ উপদেশাত্মক বা নির্দেশকারী — হেয়ারের এই ধারণার বিরুদ্ধে তাঁরা আপত্তি তুলেছেন। বিশেষ করে, এ. সি. ম্যাকইনটায়ার মনে করেন যে এক ব্যক্তি এক ধরনের নৈতিক নীতির সাহয্যে নৈতিক বিচার করতে পারেন, আর এক ধরনের নীতির মাধ্যমে মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করতে পারেন, বা অন্যদের তার নিজের মতো করে জীবন-পরিচালনার উপদেশ দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নৈতিক বিচার কিন্তু নির্দেশাত্মক হবে না। ম্যাকইনটায়ার অবশ্য এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির দূর্বলতার কথা বলছেন না। তিনি বলতে চাইছেন, আন্তরিকভাবে কোনো নৈতিক মানদণ্ডে বিশ্বাসী হয়ে এবং একই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম হয়েও ঐ ব্যক্তি সেই মানদণ্ডকে বাস্তবে প্রয়োগ নাও করতে পারে। হাডসন অবশ্য মন্তব্য করেছেন, "I do not think it can (logically) be said that a man sincerely adheres to moral principles which he does not put into practice if he can." আবার জি. জে. ওয়ারণক

প্রমুখ সমালোচক মন্তব্য করেছেন কোনো নৈতিক অবধারণ করার সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের কাজ-কর্ম করে থাকেন। হেয়ার তাকে এ সংকীর্ণ গণ্ডি অনুজ্ঞা বা পরামর্শের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছেন। তাঁর ভাষায় : "There may be prescribing, certainly; but also may be advising, exhorting, imploring; commanding, condemning, deploring, resolving, confessing, undertaking; and so on, and so on." হেয়ার স্বয়ং ওয়ারণকের এই বক্তব্য অস্বীকার করেন না। তবে তিনি বলেছেন, ওয়ারণক-কথিত যাবতীয় বাক্-ক্রিয়াকে অনুজ্ঞা বা নির্দেশ-ক্রিয়া রূপ জাতির এক একটি প্রজাতি (species of the genus speech-act, prescribing)। অর্থাৎ এসব ক্রিয়াই মূল অনুজ্ঞা-ক্রিয়ার অধীন। হাডসন হেয়ারের এই উত্তর উপযুক্ত বলেই বিবেচনা করেছেন। দ্বিতীয়ঃ, ওয়ারণক বলেন যে কোন ব্যক্তির নৈতিক মানদণ্ড তার কাজের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। তার নৈতিক বিচারকে রুচি, অনুমোদন, আদর্শ বা বিশ্বাসের প্রকাশ রূপেও দেখা যেতে পারে। হাডসন মন্তব্য করেছেন যে এ ব্যাপারে হেয়ার ওয়ারণকের সঙ্গে একমত। হেয়ার কখনও বলেন নি যে নৈতিক বিচার ও ক্রিয়ার মধ্যেকার সম্পর্কটি কেবলমাত্র নির্দেশ বা অনুজ্ঞার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। হেয়ারের যা দাবী তা হল যদি নৈতিক অবধারণ অনুজ্ঞাধর্মী হয় তাহলে ক্রিয়ার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যাবে।

দ্বিতীয় ধরনের সমালোচনা সর্বজনীনযোগ্যতা বা সামান্যীকরণযোগ্যতা (universalizability) সম্বন্ধীয়। হাডসন মন্তব্য করেছেন যে হেয়ারের সামান্যীকরণযোগ্যতার মানদণ্ডটিকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। হেয়ার যখন বলেন নৈতিক বিচারের ভিত্তি এমন কতকগুলি যুক্তি যেগুলি নিশ্চিতভাবে কতকগুলি সাধারণ নীতির উদ্রেক করে এবং প্রয়োগ করে। তিনি কখনও বলেন নি যে নৈতিক বিচার করার অর্থ সর্বদা অপরের নৈতিক সমস্যায় অযাচিত মন্তব্য করা বা ভিন্নমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু হওয়া।

সামান্যীকরণযোগ্যতার আরও একটি ভুল ব্যাখ্যা আছে। কেউ কেউ বলেন, হেয়ারের এই মানদণ্ড নৈতিক সমস্যার পরিস্থিতিগত জটিলতা সম্পর্কে উদাসীন। এমন অনেক জটিল পরিস্থিতি আছে যেখানে নৈতিক বিষয়গুলি যেভাবে সামনে আসে তাতে সামান্যীকরণের বিষয়টি কেমন বেমানান দেখায়। হাডসনের বিচারে হেয়ারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা ঠিক নয়, কেননা হেয়ার অতি যত্নসহকারে সার্বিকতা (universality) এবং সাধারণত্ব (generality) এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তার বিচারে 'বিশিষ্ট' (specific) পদটি 'সাধারণ' (general) এর বিপরীত হতে পারে, কিন্তু 'সার্বিক' (iuniversal) পদটির বিপরীত নয়। তাই সামান্যীকরণযোগ্য হয়েও একটি নৈতিক বিচার অত্যন্ত বিশিষ্ট হতে পারে।

অস্তিবাদী নেতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ম্যাকইনটায়ার হেয়ারে বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অস্তিবাদীরা সামান্যীকৃত নৈতিকতায় বিশ্বাস করেন না। এ প্রসঙ্গে সার্ত্রের বিখ্যাত দৃষ্টান্তটি উত্থাপন করা হয় : সার্ত্রের এক ছাত্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সার্ত্রের কাছে জানতে এসেছিলেন তার কি করা উচিত — যুদ্ধে গিয়ে অগ্রজের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া, নাকি অসহায় মায়ের কাছে থেকে গিয়ে মাকে সঙ্গ দেওয়া? সার্ত্রের মতে, এই প্রশ্নের উত্তর কোন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ নৈতিকতা দিতে পারে না। ব্যক্তিকে নিজেই কর্তব্যকর্ম নির্বাচন করতে হবে। সে স্বাধীনভাবে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে: 'I ought to stay with my mother,' কিন্তু যদি সে এই বিচারই করে তা সামান্যীকরণযোগ্য U-type মূল্যায়ন হবে কি?

উত্তরে হেয়ার বলেন, সার্ত্র যে বক্তৃতা-প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেখানে সার্ত্র মন্দ বিশ্বাসে কেন মানদণ্ডকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে নিজের নৈতিক পছন্দ নিজেই বেছে নেওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানেই তিনি বলেছেন নির্বাচন করার সময় আমরা শুধু নিজের জন্যই নির্বাচন করি না, সকল মানুষের পক্ষে আমি নির্বাচন করি। হেয়ারের বিচারে এই বিষয়টি বোঝানোর জন্যই হয়ত সার্ত্র উপরে উক্ত দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন।

আবার এই সামান্যীকরণযোগ্যতার সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে এটি সত্য হলেও গুরুত্বহীন। এই অভিযোগকে দু'ভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রথমত:, বলা যেতে পারে সামান্যীকরণযোগ্যতার তত্ত্ব সব পরিস্থিতিকে এক করে দেখা, এবং সেজন্য বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্যকারী কোনো মানদণ্ডের সন্ধান করা নিরর্থক হয়ে পড়ে। হাডসন হেয়ারের পক্ষ নিয়ে বলেন যে এই ধরনের অভিযোগ তখনই সত্য হবে যখন পরিস্থিতির বর্ণনা কেবলমাত্র সেই পরিস্থিতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।কিন্তু নৈতিক বর্ণনার ক্ষেত্রে এমন ঘটে না, ঘটে ন-নৈতিক বর্ণনার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত:, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বলা যেতে পারে সামান্যীকরণযোগ্যতা নৈতিক বিচারের কোনো কার্যকরী কাঠামো বোঝাতে পারে না। যিনি নৈতিক বিচার করেছেন তিনি সবসময় নিজের ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষের দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনো নীতিগত পার্থক্য খুঁজে বের করতে পারেন, যা তিনি নাও মেনে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে সামান্যীকরণের মানদণ্ড অকেজা হয়ে পড়বে।

নৈতিক অবধারণের যৌক্তিক সম্পর্কের ব্যাপারে হেয়ারের মতবাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনা হয়েছে। আমরা এখানে শুধু জি. সি. কার্ণারের সমালোচনা উল্লেখ করব। কার্ণার হেয়ারের বিরুদ্ধে প্রথম যে অভিযোগ এনেছেন তা হল : নৈতিক অবধারণের বর্ণনাত্মক অর্থ (descriptive meaning) এবং মূল্যাত্মক অর্থ (evaluative meaning) এই দুই প্রকার অর্থ আছে — হেয়ারের এই অভিমত ভ্রান্ত। কার্ণারের মতে যে কোনো বাক্-ক্রিয়া (speech-act)-র অর্থের দুটি স্তর আছে : (ক) প্রয়োগের কিছু মানদণ্ড বা শর্ত, হেয়ার কথিত phrastic নামক উপাদান, যাকে চিরাচরিতভাবে 'sense' বলা হয়ে থাকে, এবং (খ) কার্য-সম্পাদনকারী শক্তি (illocutionary force), যা 'neustic' উপাদানের মধ্যে নিহিত। কোন্ বাক্-ক্রিয়া এই দুই প্রকার শর্তের উপরই নির্ভরশীল। তাই কার্ণার হেয়ারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অনুজ্ঞা এবং ঔচিত্যমূলক অবধারণের অর্থের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। হেয়ার মনে করেন যে ঔচিতমূলক বিচার থেকে অনুজ্ঞা নিঃসৃত হয়, তাই তাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকবে। তিনি এর সঙ্গে দুটি বৈসাদৃশ্যের কথাও বলেছেন। সে দু'টি হল : (১) অনুজ্ঞা কখনও অতীতকালের হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যম পুরুষে (second person) হয়। কিন্তু ঔচিত্যমূলক বিচার যে কোনো কালের যে কোনো পুরুষে হতে পারে। (২) ঔচিত্যমূলক অবধারণ সবসময় সামান্যীকরণযোগ্য হয়, অনুজ্ঞা কিন্তু সর্বদা হয় না। এই বৈসাদৃশ্য দূর করার জন্য হেয়ার অনুজ্ঞাকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে সকল অনুজ্ঞা সামান্যীকরণযোগ্য হয়। তিনি মনে করেছেন নৈতিক অবধাণকে 'phrastic' ও 'neustic' এই দুটি উপাদানের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করলে এ কাজটি সম্ভব হবে।

কার্ণার এখানে আপত্তি জানিয়ে বলেন, সাধারণ ঔচিত্যমূলক অবধারণগুলিকে এভাবে অনুজ্ঞাতে রূপান্তরিত করলেও, বিশেষ ঔচিত্যমূলক অবধারণকে করা যাবে না। কারণ হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন

প্রথম প্রকারের (সাধারণ) অনুজ্ঞাগুলি (যেমন, 'সর্বদা সত্য কথা বলা উচিত') সামান্যীকরণযোগ্য। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের (বিশেষ) অনুজ্ঞাগুলি সামান্যীকরণযোগ্য নয়। ঔচিত্যমূলক অবধারণের 'neustic' উপাদানটি অনুজ্ঞার 'neustic' অংশের থেকে আলাদা। কার্ণার তাই মনে করেন নৈতিক বিচার ও অনুজ্ঞার মধ্যে যে সাদৃশ্যের কথা হেয়ার বলেছেন তা যথাযথ নয়। হাডসন অবশ্য মন্তব্য করেছেন যে এখানে হেয়ারের বক্তব্য ঠিকভাবে বিবেচিত হচ্ছে না।

৩.১.২.৪ ■ সিদ্ধান্তমূলক পর্যবেক্ষণ

হেয়ারের পরামর্শবাদের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, হয়তো অধিক বিশ্লেষণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও হেয়ারের এই তত্ত্ব কর্তব্যবাদ (deontology) ও ফলাফলবাদ (consequentialism) -এর মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছে। কর্তব্যবাদ, বিশেষ করে কান্টীয় নিয়ম কর্তব্যবাদ খুব বেশি সামান্য-নিয়মনিষ্ঠ, বাস্তবতার প্রতি তাঁর যেন কোনো দায় নেই। অন্যদিকে ফলাফলবাদ, বিশেষ করে কর্ম উপযোগবাদ, সামান্য-নিয়মের তোয়াক্কা করে না। হেয়ারের নীতিতত্ত্ব কর্তব্য-উপযোগবাদের এক আকারগত যৌক্তিক ভিত্তি যোগাতে পেরেছে। যেহেতু নৈতিক বিচার সর্বজনীনযোগ্য সেহেতু তিনি অপর ব্যক্তি সম্পর্কে নৈতিক বিচার করেছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তিনি যদি অপর ব্যক্তির পরিস্থিতিতে থাকেন তাহলে তাঁর সম্পর্কেও একই নৈতিক বিচার প্রযোজ্য হবে : এবং যেহেতু নৈতিক বিচার পরামর্শমূলক বা নির্দেশাত্মক, সেহেতু নৈতিক বিচারটিতে সম্মত হওয়ার অর্থ হচ্ছে বিচারটির অন্তর্নিহিত অনুজ্ঞাটিতে সম্মত হওয়া। হেয়ার বলতে চান, সার্বিক অনুজ্ঞাবাদ বা পরামর্শবাদ আমাদের উপযোগবাদের দিকে নিয়ে যায়।

৩.১.২.৫ ■ গ্রন্থ নির্দেশ

55

W.D. Hudson : Modern Moral Philosophy অবশ্য পাঠ্য। এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত বই ও প্রবন্ধ পড়া বাঞ্ছনীয়।

১. R. M. Hare : The Language of Morals, Oxford university Press, 1952

২. R. M. Hare : Freedom and Reason, The Clarendon Press, 1963

৩. R.M. Hare : 'Impreative Sentences', Mind, 1949

৪. ড. আবদুল হামিদ : সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, বাংলাদেশ।

৩.১.২.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী/ অনুশীলনী

১. What is prescriptism? Explain prescriptivism as a non-cognitive moral theory.

২. Elucidate, after Hare, the motion of prescriptivity. Is it satifcatory?

৩. Explain Hare's thesis of universalizability, Discuss in the connection the criticisms that have been made against this thesis.

৪. State the basic ideas and principles of Hare's prescriptivism. Consider, after Hudson, the criticisms levelled against it by MacIntyre and Kerner.

৫. What are the three most important truths about moral judgements? Discuss after Hare.

৬. Write short notes : a) supervenience, b) prescriptivism and utilitariamism c) U-type reason and E-type reason d) Moral reasoning and facts.

পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যা

দ্বিতীয় অর্ধ

(ফলিত)

অধ্যাপক সুনীল রায়
দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ একক - ৪

স্বস্তিমৃত্যু

বিভাগ - ক

লক্ষণ ও প্রকারভেদ

গঠন

একক : ৪.০ : উদ্দেশ্য

একক : ৪.১ : প্রস্তাবনা

একক : ৪.২ : স্বস্তিমৃত্যু নিয়ে বির্তক - প্রাচীন ও আধুনিক কাল

একক : ৪.৩ : স্বস্তিমৃত্যু কাকে বলে?

একক : ৪.৪ : স্বস্তিমৃত্যর প্রকারভেদ

৪.৪.০ : সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু

৪.৪.১ : নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু

৪.৪.২ : স্বস্তিমৃত্যুর আর একটি বিভেদরীতি

৪.৪.৩ : ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু

৪.৪.৪ : ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু

৪.৪.৫ : অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু

একক : ৪.৫ : সংক্ষিপ্তসার

একক : ৪.৬ : নমুনা প্রশ্নাবলী

একক : ৪.৭ : গ্রন্থপঞ্জী

একক : ৪.০ ■ উদ্দেশ্য

ব্যবহারিক নীতিবিদ্যায় যে সকল সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলির মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা হল স্বস্তিমৃত্যু (Euthanasia)-র সমস্যা। কাকে বলে স্বস্তিমৃত্যু? এর বিভিন্ন প্রকারগুলি কী কী? এই এককটি পাঠ করে এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানা যাবে।

একক : ৪.১ ■ প্রস্তাবনা

মানুষের প্রাণ কী অর্থে মূল্যবান তা নিয়ে আজকালকার নীতি-দার্শনিকেরা একমত নন। একদল দার্শনিক মনে করেন - মানুষের প্রাণ যে মূল্যবান তার কারণ জীববৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ মানুষ হোমোসেপিয়ানস প্রজাতির সদস্য বলেই তার প্রাণ মূল্যবান। আবার কারও কারও মতে মানুষের প্রাণ মূল্যবান কারণ মানুষ যুক্তিবোধ ও আত্মবোধ সম্পন্ন জীব। এরকম জীবকে বলে পোর্সন, প্রথম মতটি গ্রহনীয় নয়; কারণ কেউ হোমোসেপিয়ানস প্রজাতির সদস্য বলে তার প্রাণহরণ নিষিদ্ধ - একথা মানা যায় না। প্রাণনাশের ন্যায্যতা - অন্যায্যতার সাথে প্রজাতিভেদের কোনো সম্বন্ধ নেই। কোনো প্রজাতির সদস্য হওয়া নিছক জীববৈজ্ঞানিক ঘটনা। এরকম জীববৈজ্ঞানিক ঘটনার মধ্যে নৈতিকতার অনুসন্ধান বাতুলতা মাত্র। তবে দ্বিতীয় মতটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। যুক্তিবোধ ও আত্মবোধসম্পন্ন প্রাণের মূল্য উপেক্ষনীয় নয়। কাউকে আত্মবোধসম্পন্ন জীব বলে মানার অর্থ তার অতীত ও ভবিষ্যৎ - বোধ থাকা। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তার কামনা-বাসনায় ছেদ পড়ে, ব্যক্তির আত্মবোধকে হেয় করা হয়। তাছাড়া, কারো ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগ্রহ তার বেঁচে থাকার অধিকার দাবি করতে পারে না। যে ব্যক্তির বেঁচে থাকার আগ্রহ আছে তার প্রাণনাশে তার বেঁচে থাকার অধিকার অস্বীকার করা হয়। এমনকি যুক্তিবোধসম্পন্ন জীব মাত্রই পছন্দ-অপছন্দের অধিকারী। কারও পছন্দ-অপছন্দের বিরুদ্ধে কাজ করা অন্যায়। পরিশেষে যুক্তিবোধ ও আত্মবোধসম্পন্ন জীব মাত্রই স্বভাবত স্বতন্ত্র। এরকম জীবের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আছে। সে ওই সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করতেও সক্ষম। এরকম জীব আপনা থেকে প্রাণনাশে সিদ্ধান্ত না নিলে তার প্রাণনাশ করা অন্যায়। সেক্ষেত্রে তার স্বভাবগত স্বাতন্ত্রের উপর আঘাত হানতে হয়। এই যে প্রাণহরণের কথা বলা হল তার রকমফের আছে। স্বস্তিমৃত্যু এরকম প্রাণহরণের একটা প্রকারভেদ মাত্র।

একক : ৪.২ ■ স্বস্তিমৃত্যু নিয়ে বির্তক — প্রাচীন ও আধুনিক কাল

প্রাচীন গ্রীসে স্বস্তিমৃত্যুকে অমঙ্গল বলে চিহ্নিত করা হতো। সেখানে স্বস্তি মৃত্যুর প্রচলন ছিল না। এ ব্যাপারে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে হিপোক্রিটিস (Hippocratics) -এর নিকট চিকিৎসকেরা এই বলে শপথ বাক্য পাঠ করেন যে তারা কোনো অবস্থাতেই রোগীকে প্রাণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করবেন না। এমনকি যদি তারা একাজের জন্য রোগীর অভিভাবক পর্যায়ের লোকের দ্বারাও অনুরুদ্ধ হন তাহলেও তারা একাজ থেকে বিরত থাকবেন। অনেক নীতিদার্শনিক মনে করেন, তখন থেকেই স্বস্তিমৃত্যু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়।

তবে প্রাচীনকালে কোনো কোনো সমাজে যে স্বস্তিমৃত্যুর প্রচলন ছিল না তা নয়। প্রাচীন হিন্দু সমাজে অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে তার কষ্টের লাঘবের জন্য মৃত্যুর উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান প্রচলিত ছিল। অনেক সমাজেই এ-বিধান আজও কার্যকর হয়ে চলেছে। সক্রেটিস, প্লেটো এবং স্টোয়িক দার্শনিকেরা স্বস্তিমৃত্যুকে নৈতিকভাবে সমর্থন করতেন।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে স্বস্তিমৃত্যু নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল। আধুনিক কালে ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানে এরকম মতভেদ এক তুমুল বিতর্কের আকার ধারণ করেছে। এ বির্তকে অংশগ্রহণকারী দার্শনিকদের মধ্যে আছেন পিটার সিঙ্গার থেকে শুরু করে জেমস্ র‍্যাচেলস, ফিলিপ্পা ফুট, যোসেফ সুলিভ্যান প্রমুখ নীতিদার্শনিক। বর্তমানে বায়ো-এথিক্স বলতে যা বোঝায় তার চর্চায় স্বস্তিমৃত্যুর প্রসঙ্গ অনিবার্য।

একক : ৪.৩ ■ স্বস্তিমৃত্যু কাকে বলে?

বলা বাহুল্য, স্বস্তিমৃত্যুর ধারণাটি স্পষ্ট নয়। এই ধারণাগত অস্পষ্টতার কারণেই দার্শনিক মহলে তুমুল বির্তক।

'Euthanasia' শব্দটির মূল গ্রীক ভাষায় নিহিত। ওই কথামূলের অর্থ প্রকৃষ্ট মৃত্যু (good death)। এ অর্থ অতি ব্যাপক এবং সেই কারণে প্রায় অকেজো।

'Euthanasia' -র আভিধানিক অর্থ শান্ত সহজ মৃত্যু ('a gentle and easy death')। কিন্তু শুধু একথা বললে যা স্বস্তিমৃত্যু নয় তাও স্বস্তিমৃত্যু বলেগণ্য হয়ে পড়বে। আধুনিক কোনো কৌশল প্রয়োগ করে কোনো খুনী কাউকে এমনভাবে খুন করতে পারেন যাতে খুন হওয়া লোকটি মরার আগে বিন্দুমাত্র কষ্টভোগ করেন নি। অর্থ অনুসারে এমন মৃত্যুকেও স্বস্তিমৃত্যু বলে গণ্য করতে হয়। অথচ খুনের ঘটনাকে কেউ স্বস্তিমৃত্যু বলে না। কাজেই এই আভিধানিক অর্থ স্বস্তিমৃত্যুর চরিত্র নির্ধারণে সহায়ক হয় না। প্রকৃত পক্ষে যন্ত্রণাহীন স্বচ্ছন্দ মৃত্যু ঘটিয়ে দেওয়া স্বস্তিমৃত্যুর একটি দিক মাত্র। এর অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। এই দিকটাতে দেখা হয় হতভাগ্য লোকটি মরে বাঁচছে কি না। অর্থাৎ মৃত্যু তার কাছে আশীর্ব্বাদ হয়ে এসেছে কিনা।

স্বস্তিমৃত্যুর আরও দু'টি অর্থের প্রচলন দেখা যায় — (এক) এরকম মৃত্যু ঘটানোর পদ্ধতি এবং (দুই) এরকম মৃত্যু ঘটানোর নেহাত কাজটি। উভয় ক্ষেত্রেই রোগীর ইচ্ছা বা মত উপেক্ষিত। অবশ্য সকল স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রেই রোগী যে মতামত প্রকাশ করে তা নয়। তাহলেও রোগীর অবস্থাকে আমরা কোনো মতে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এই দুটি ক্ষেত্রেই রোগীর অবস্থা উপেক্ষিত।

স্বস্তিমৃত্যুর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। (এক) স্বস্তিমৃত্যু এক ধরনের প্রাণনাশের ঘটনা। (দুই) এ-জাতীয় ঘটনার ক্ষেত্রে অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত এক বা একাধিক ব্যক্তির অনিবার্য উপস্থিতি। (তিন) তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে কেউ না কেউ অবশ্যই তাদের মৃত্যুর ব্যাপারে এগিয়ে আসবে। পরিশেষে এই দয়ার্দ্রচিত্ত লোকেরা যন্ত্রণাকাতর লোকটিকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে।

এ সকল দিক বিবেচনা করে Peter Singer তাঁর *Practical Ethics* হইতে স্বস্তিমৃত্যুর একটি সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন ''...it is now used to refer to the killing of those who are incurably ill and in great pain or distress, for the sake of those killed, and in order to spare them further suffering or distress.'' অর্থাৎ স্বস্তিমৃত্যু বলতে অনারোগ্য ব্যধিতে জর্জরিত মানুষকে কৃপাপরবশ হয়ে মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া বোঝায়। অন্যথায়, নিরীহ মানুষের নিধনও স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা বলে গণ্য হবে।

হিটলারের নাৎসী জার্মানিতে ঘটেছিলও তাই। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জারি করা এক ডিক্রীর বলে হিটলার প্রায় তিন লক্ষ মানুষকে গ্যাস-চেম্বারে মরতে পাঠিয়েছিলেন শুধু এই যুক্তিতে যে তারা অনারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছিল। একথা ঠিক যে তাদের মধ্যে অনেকে ছিল মানসিক রোগী, কেউবা বার্ধক্যে অক্ষম, আবার কেউ বা পারকিনসনে পঙ্গু। হয়তো তাদের সুস্থ হয়ে ওঠাও অসম্ভব ছিল। তবুও একথা মনে করার কারণ নেই যে, হিটলার করুণাবশত এই নিধনযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তা ছিল হিটলারের কাছে আগামী দিনের ইহুদী নিধন পর্বের মহড়া বিশেষ। ওই নিধন পর্বকে কিছুতেই স্বস্তিমৃত্যুর ঘটনা বলা যায় না। স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে দয়ার ব্যাপারটি আবশ্যিক ব্যাপার। অনেকে 'স্বস্তিমৃত্যু'-র প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃপামৃত্যু' শব্দটি চালু করেছেন। তারা স্বস্তিমৃত্যুর এই করুণামূর্তিটির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

একক : ৪.৪ ■ স্বস্তিমৃত্যুর প্রকারভেদ

আমরা স্বস্তিমৃত্যুর বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে যন্ত্রণা কাতর লোকটিকে দয়ার্দ্রচিত্তের লোকেরা মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে। স্বস্তিমৃত্যুর এই দিকটিকে কেন্দ্র করে দুরকম স্বস্তিমৃতুর কথা বলা হয় সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু (active euthanasia) এবং নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু (passive euthanasia)।

৪.৪.০ ■ সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু

রোগীকে চরম কষ্টভোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি দানের লক্ষ্যে যখন সোজাসুজি তার মৃত্যু ঘটিয়ে দেওয়া হয় সেটাই সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। আগেকার দিনে রোগীকে এইভাবে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে প্রাণঘাতী ইনজেকশন, ঘুমের ওষুধের সঙ্গে প্রাণনাশক পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো। পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* বইতে বন্দুকের গুলি ব্যবহার করে স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোর উদাহরণ দিয়েছেন। উদাহরণটি নিম্নরূপ —

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ। George Zygmaniak নামে নিউ জার্সির একজন বাসিন্দা মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়। তার আপাদমস্তক পক্ষাঘাতের কবলে চলে যায়। এই অবস্থায় বাঁচার ইচ্ছা ছিল না তার। এমনকি বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল সে। এরকম পরিস্থিতিতে সে ডাক্তার ও তার ভাই লেস্টারের কাছে মৃত্যু ভিক্ষা চায়। লেস্টার হাসপাতালে খবর নিয়ে জানতে পারে যে জর্জের নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। এমন অবস্থায় লেস্টার একটি বন্দুক নিয়ে হাসপাতালে প্রবেশ করে ও জর্জকে জিজ্ঞেস করে যে, সে পিস্তলের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটাবে কি না। জর্জ সম্মত হলে লেস্টার পিস্তলেরগুলিতে জর্জের জীবনাবসান ঘটায়।

সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সাধারণ পরিস্থিতিতে মেরে ফেলা বলতে যা বোঝায় তার বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। পার্থক্য শুধু একটা জায়গায় এবং তা হল সকর্মক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে ঘটনাটা ঘটানো হয়। সক্রিয় বা সকর্মক স্বস্তিমৃত্যু বহুদেশে বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে।

৪.৪.১ ■ নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু

নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে কারও সাক্ষাৎ কর্মের ভূমিকা থাকে না। রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাহার করে নিয়ে তার মৃত্যুবরণের পথটি প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। অধ্যাপক সিঙ্গার এই প্রসঙ্গে একটি কালান্তক শিশুরোগের কথা উল্লেখ করেছেন। Spina Bifida নামে একটি রোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্ম থেকেই মেরুদণ্ডের কাছাকাছি একটা ছিদ্র থাকে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ওই রোগ চিকিৎসার জন্য আমেরিকার চিকিৎসকগণ এক ধরনের বাল্বের ব্যবহার চালু করেন। তাতে শিশুর শরীরের বাড়তি ফ্লুইড বের করে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল। ফলে এই রোগে শিশুমৃত্যুর হার কমতে থাকে। কিন্তু দেখা গেল যে জীবিত শিশুদের সকলেই বিকলাঙ্গ। অধিকাংশ শিশুই পক্ষাঘাতের স্বীকার, মলমূত্র ত্যাগের উপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রায় প্রত্যেকেরই মেরুদণ্ড ও পা অস্বাভাবিক। জীবিত অর্ধেকেরও বেশী শিশু মানসিক প্রতিবন্ধী। তাছাড়া, তাদের শরীরে সেঁটে দেওয়া বাল্বের সচলতার জন্য বারবার শল্য চিকিৎসাও করতে হচ্ছে। এই ধরনের শিশুরা পরিবারের বোঝা হয়ে উঠল। তারাও প্রচণ্ড যন্ত্রণা, দুঃখ ও কষ্টের শিকার হয়ে বেঁচে রইল।

John Lorber নামে একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ চিকিৎসক Spina Bifida রোগে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা চালান, তাদের চিকিৎসার ফলাফল পর্যালোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি ঘোষণা করেন এই রোগে আক্রান্ত শুধু সেই সকল শিশুকেই চিকিৎসার জন্য নির্বাচন করা উচিত যাদের রোগ তেমন প্রকট নয়। বর্তমানে ইংল্যাণ্ড সহ অনেক দেশে এই নির্বাচন পদ্ধতি বৈধ বলে গৃহীত। এর ফলে ওই রোগে আক্রান্ত কিছু সংখ্যক শিশু শৈশব অবস্থা অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে পারতো। নির্বাচিত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যও অনির্বাচিত শিশুদের তুলনায় কম।

এই নির্বাচন পদ্ধতি অনেকের কাম্য হলেও সিঙ্গার কিন্তু প্রশ্ন তুলেছেন — অনির্বাচিত শিশুদের ক্ষেত্রে কী হবে? Lorber কিন্তু রাখ-ঢাক না করেই বলেছেন যে, অনির্বাচিত শিশুদের স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু ঘটবে। সে মৃত্যুর জন্য শল্য চিকিৎসা বা অন্য কোনো প্রকার সক্রিয় চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয় না। তাদের যন্ত্রণা লাঘব করা হয় মাত্র। কোনো কারণে এরকম শিশুর যদি কোনো সংক্রমণ ঘটে, যে সংক্রমণ একটি স্বাভাবিক শিশুর ক্ষেত্রে ঘটলে তাড়াতাড়ি নিরাময় করা সম্ভব, সেখানে ওই বিকলাঙ্গ শিশুর ক্ষেত্রে কোনো এ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় না, কারণ শিশুটির বেঁচে থাকা বাঞ্ছিত নয়। ওষুধের ক্ষেত্রেও চিকিৎসকেরা তাদের মৃত্যু ঘটানোর সম্মতি দেন এবং অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন। এরকম একটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ —

১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনা। ইন্ডিয়ানার ব্লুমিন্টন শহরে সেবার Down's Syndrome এবং আরও কয়েকটি সমস্যা সহ একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। তার নাম Baby Doe। শিশুটির Oesophagos এর মুখ থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত অংশ যথাযথভাবে গঠিত ছিল না। ফলে Baby Doe মুখে কোনো খাদ্য গ্রহণ করতে পারতো না। শল্য চিকিৎসার সাহায্যে হয়তো তার সমস্যার সমাধান করা যেত। কিন্তু তার মা-বাবা শল্য চিকিৎসায় সায় দেয় নি। ফলে শীঘ্রই শিশুটি মারা যায়। এ ব্যাপারে শিশুটির বাবার স্বীকারোক্তি ছিল এরকম। শিক্ষক হিসেবে তিনি ওই ধরনের বহু রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই

তিনি শিশুটি ও তাঁর সমগ্র পরিবারের স্বার্থে শল্য চিকিৎসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের আইনী অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালত শল্য চিকিৎসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। ফলে শিশুটির মা-বাবার অধিকার স্বীকৃত হয়।

৪.৪.২ ■ স্বস্তিমৃত্যুর আর একটি বিভেদরীতি

স্বস্তিমৃত্যুর আর একটি বিভেদরীতিও লক্ষ্য করা যায়। এই বিভেদরীতি অনুসারে মূল প্রশ্নটি হল — রোগী স্বয়ং মরতে রাজি কিনা? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তিন রকম স্বস্তিমৃত্যুর কথা বলা হয় — ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (Voluntary euthanasia), অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (non-voluntary euthanasia) এবং ইচ্ছা বিহীন স্বস্তিমৃত্যু (involuntary euthansia)।

৪.৪.৩ ■ ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (Voluntary euthanasia)

বর্তমানকালে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুকে আইনী স্বীকৃতি দেবার দাবি তোলা হয় প্রায়ই। অপরের সহায়তায় আত্মহত্যা করা বলতে যা বোঝায় ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু অনেকটা তাই। রোগী এখানে নিজেই মরণ ভিক্ষা চায়। যন্ত্রণা কাতর রোগী এমন অবস্থায় থাকে যেখানে মরণ তার কাছে 'শ্যাম সমান'। অথবা রোগী মৃত্যুভিক্ষা না চাইলেও তার মৃত্যু ঘটানোর প্রস্তাবের সে সায় দিয়ে থাকে। *Jean's Way* নামক গ্রন্থে এরকম স্বস্তিমৃত্যুর একটি নজির খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে Dr. Humphry উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর স্ত্রী কর্কট রোগে ভুগছিলেন। ওই রোগের প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাঁর জীবনাবসান ঘটাবার জন্য Humphry কে অনুরোধ করেন। Humphry কিছু প্রাণনাশক বড়ি সংগ্রহ করে স্ত্রীকে দেন। তিনি সেগুলি খেয়ে মৃত্যু বরণ করেন।

এরকম মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যে ডাক্তারের মধ্যে যন্ত্র নির্মাণের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। Jack Kevorkien মিশিগান শহরে থাকতেন। তিনি একটি সুইসাইড যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। মৃত্যুকামী ব্যক্তি এই যন্ত্রের সাহায্যে সহজেই মৃত্যুবরণ করতে পারতো। যন্ত্রটিতে তিনটি বোতল লাগানো ছিল। প্রতিটি বোতলের সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি করে টিউব। ওই টিউবের সাহায্যে রোগীকে ইনজেক্শন দেওয়া যেত। প্রথম টিউবে রক্ষিত লবণ জল রোগীর দেহে প্রবেশ করানো হতো। পরে রোগী সুইচ টিপে ঘুমের ঔষধ দ্বিতীয় টিউব থেকে সংগ্রহ করতে পারতো। তৃতীয় বোতলে রক্ষিত প্রাণনাশক ওষুধ আপনা থেকেই প্রবিষ্ট হতো। ডাক্তার Kevorkien ঘোষণা করেন যে তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুকামী যে কোনো রোগী মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে পারেন। তবে এরপর ঘটে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস। Janet Adkins Kevorkien এর শরণাপন্ন হলেন। তিনি অনারোগ্য কোনও ব্যাধিগ্রস্থ ছিলেন এবং নিজেই নিজের জীবনাবসান ঘটাবার সিদ্ধান্তের কথা Kevorkien কে জানালেন। Kevorkien যন্ত্রটি ব্যবহারের সম্মতি দিলেন। যন্ত্রটি ব্যবহার কালে Kevorkien ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। Adkins এর

মৃত্যু হল। এই মৃত্যুর ঘটনা Kevorkien পুলিসকে জানালেন। কিন্তু বিচারে Kevor খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। অবশ্য বিচারক তাঁকে শাস্তি দিতে রাজী হন নি। তার কারণ Adkins তার মৃত্যুর জন্য নিজেই দায়ী বলে সাব্যস্ত হন। পরের বছর Kevorkien আরও দু'টি রোগীকে ওই যন্ত্র ব্যবহার করতে দেয় এবং তাদের মৃত্যুও হয়।

ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু বন্দুকের সাহায্যেও ঘটতে পারে এবং সে বন্দুক ডাক্তার বাবুর ব্যবহারে নয়, অন্য কারও ব্যবহারে। এমনই একটি স্বস্তিমৃত্যুর (ঐচ্ছিক) দৃষ্টান্ত দিয়েছেন পিটার সিঙ্গার। সিঙ্গার অন্য কারও ব্যবহারে বন্দুকের গুলির সাহায্যে স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোর কয়েকটি প্রকরণগত ত্রুটি লক্ষ্য করেছেন। যেমন এখানে রোগীর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাক্তারের নিকট থেকে মত নিছক বেসরকারীভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। জর্জ যে সত্যিই মৃত্যু চায় এবং তার এই কামনার বৌদ্ধিক ভিত্তি আছে সে সম্পর্কেও স্বাধীন মত গ্রহণ করা হয় নি। এমনকি নিধনও ডাক্তার দ্বারা সংঘটিত হয় নি। পিস্তলের গুলির চাইতে ইনজেকশন কম যন্ত্রণাদায়ক হতো অবশ্যই।

স্বস্তিমৃত্যু ঐচ্ছিক হবে যদি রোগী সঠিক সময়ে তার মৃত্যুবাসনা জানাতে বা বোঝাতে নাও পারে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও কোনো ব্যক্তি যদি স্বস্তিমৃত্যুর জন্য আবেদন করে যখন, সে দুর্ঘটনায় পতিত কিংবা রোগযন্ত্রণায় কাতর অথচ যখন তার মৃত্যুর ইচ্ছা কেউ জানতে পারছে না, তাহলেও সেক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু ঐচ্ছিক মৃত্যু বলে গণ্য হবে। বর্তমানে কেবলমাত্র নেদারল্যান্ডেই চিকিৎসকেরা স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোর অনুমতি পেয়েছেন। সেখানে দীর্ঘদিন আন্দোলনের ফলে ডাক্তারগণ ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ওই অনুমতি পান। তাঁরা এখন সহজভাবেই মৃত্যুকামীর মৃত্যু ঘটাতে পারেন এবং মৃত্যু-পত্রে তা অনায়াসে লিখতেও পারেন।

8.8.8 ■ ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু (involuntary euthanasia)

Practical Ethics গ্রন্থে অধ্যাপক সিঙ্গার স্বস্তিমৃত্যুর নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

"I shall regard euthanasia as involuntary when the person killed is capable of consenting to her own death, but does not do so either because she is not asked, or because she is asked and chooses to go on living."

সিঙ্গারের এই সংজ্ঞানুসারে সেই ধরনের স্বস্তি মৃত্যুকেই ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু বলা চলে যেখানে রোগী বা রোগিনী সম্মতি জানাবার ক্ষমতাটুকু ব্যাধি জর্জরিত অবস্থায় হারিয়ে ফেলে নি। তিনি তাঁর মৃত্যুতে সম্মতি জানাবার অবস্থায় আছেন। তবে তিনি সেই সম্মতি দেন নি। কারণ সেই ব্যাপারে কেই তাকে জিজ্ঞাসা করে নি, অথবা সেই জিজ্ঞাসা করে থাকলেও তিনি বেঁচে থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন। এখানে আসলে দুটি সংজ্ঞার একত্র সমাবেশ ঘটেছে। সংজ্ঞা দুটির মধ্যে উল্লেযোগ্য প্রভেদও আছে। যে ব্যক্তি বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তাকে নিধন করা এবং যে ব্যক্তি নিহত হবার জন্য সম্মতি দেয়নি তাকে নিধন করার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। তবে শেষোক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত হলে হয়তো সম্মতি দান করতো। কোনো ব্যক্তি যে নিহত হবার সম্মতি দানে সমর্থ তা স্বাভাবিক জীবনে বোঝা শক্ত। তবে সে জিজ্ঞাসিত

হয় নি। কিন্তু প্রশ্ন হল - কেন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি? এ - প্রশ্নের উত্তর অকল্পনীয়। কোনো ব্যক্তি যে সম্মতি দানে সমর্থ এবং মরতে ইচ্ছুক, অথচ তার সম্মতি নেওয়া হয় নি তার কারণ পাওয়া যায়।

হত হবার জন্য সম্মতি দেয়নি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা স্বস্তিমৃত্যু বলে বিবেচিত হবে কেবলমাত্র যদি হত্যা করার অভিপ্রায় হয়ে থাকে নিহত ব্যক্তির অসহনীয় যন্ত্রণার উপশম করা। অবশ্য এভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কোনো ব্যক্তি যে অন্য কোনো ব্যক্তিকে ওই ব্যক্তির ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না তা অভাবনীয়। এরকম স্বস্তিমৃত্যু বাস্তবে খুবই বিরল।

৪.৪.৫ ■ অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু (non-voluntary euthanasia)

অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর সংজ্ঞায় সিঙ্গার বলেছেন, "If a human being is not capable of under-standing the choice between life and death, euthanasia would be neither voluntary, nor involuntary, but non-voluntary."

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি বেঁচে থাকা ও না - বেঁচে থাকার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অক্ষম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাবিহীন কোনোটাই হবে না, বরং তা হবে অনৈচ্ছিক। যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুর সম্মতি জানাতে অক্ষম তারা প্রধানত বিভিন্ন অনারোগ্য রোগগ্রস্ত মানুষ ভীষণভাবে প্রতিবন্ধী শিশু, আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভীষণভাবে আহত, অথবা বার্ধক্যের কারণে বোধশক্তি লুপ্ত। অর্থাৎ এদের ক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু অনৈচ্ছক স্বস্তিমৃত্যু বলে গণ্য। অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর অনেক ঘটনা প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এরকম একটি ঘটনা নিম্নরূপ —

লুই রিপাওলির একটি পুত্রসন্তান ছিল। ছেলেটি জন্ম থেকে শয্যাশায়ী, জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ও অন্ধ। রিপাওলির দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী, "He was just like dead all the time... He couldn't walk, he couldm't talk, he couldn't do anything." পাঁচ বছর বয়সী ওই শিশুটিকে রিপাওলি প্রাণনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে হত্যা করে।

আবার ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এমন একটি ঘটনা যার ফলে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান জীবনমৃত্যু সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবনা-চিন্তা শুরু করতে বাধ্য হয়। স্যামুয়েল লিনারেস নামে জনৈক শিশু কিছু একটা গিলে ফেলে এবং সেটি তার শ্বাসনালীতে আটকে পড়ে। ফলে শিশুটির মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটে। শিশুটিকে একটি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে সে আট মাস অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকে। তার চিকিৎসার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় না। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে অন্যত্র বদলির ব্যবস্থা করে যেখানে তার শ্বাসনালীতে আটকে থাকা বস্তুটিকে বার করার ব্যবস্থাও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা। সেই ব্যবস্থা কায়েম করা তো দূরের কথা, শিশুটিকে অন্যত্র পাঠাবার অনতিপূর্বে তার মা-বাবা হাসপাতালে প্রবেশ করে। কিছুক্ষণ

পর তার মাকে হাসপাতালে পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। তার বাবা কিন্তু একটি পিস্তল বের করে ধাত্রীকে শিশুপুত্রটির কাছ থেকে দূরে থাকতে বলে। তারপর শিশুটির শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার যে প্রক্রিয়াটি হাসপাতালে চলছিল তা মুহূর্তে বন্ধ করে দেয়। শিশুটিকে ওই অবস্থায় কোলে তুলে নিলে সেখানে অবিলম্বে শিশুটি মারা যায়। এরপর শিশুটির বাবা পিস্তলটি ফেলে দেয় এবং পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার বিরুদ্ধে শিশুহত্যার মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু আদালতে বিচারকগণ তাকে শিশুহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নি। শুধু বন্দুক ব্যবহারের জন্য তাকে লঘু শাস্তি ভোগ করতে হয়।

স্পষ্টতই এই ধরনের ঘটনা ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর থেকে ভিন্ন রকম সমস্যা সৃষ্টি করে। রিপাওলির শিশুটির মারা যাবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই। প্রশ্ন হল — এরকম ক্ষেত্রে শিশুর স্বার্থে মৃত্যু ঘটানো হয় কি? এসকল প্রশ্ন অনিবার্যভাবে ওঠে। রিপাওলির শিশুটি যদি সব সময়ই মৃতের ন্যায় পড়ে থাকে তাহলে তো এমনও হতে পারে যে, তার মস্তিষ্ক এমনভাবে ক্ষত-বিক্ষত যে কোনো দুঃখ যন্ত্রণা সে ভোগ করতে পারে না। তাছাড়া সে বাবা-মা বা পরিবারের বোঝা স্বরূপ। তাদের সীমিত অর্থে শিশুটির চিকিৎসা চালানো প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সব ক্ষেত্রের পরিস্থির এক নয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই মৃত্যুকে ঠিক স্বস্তিমৃত্যু বলা যায় না। কারণ কোনো ক্ষেত্রেই শিশুটির কোনো যন্ত্রণাবোধ না থাকায় যন্ত্রণার অবসান করার উদ্দেশ্যে শিশুটির মৃত্যু ঘটানো হয়নি। মা-বাবার মানসিক যন্ত্রণা উপশমের জন্যে, কিংবা চিকিৎসা খাতে মা-বাবার ক্ষয়ক্ষতির লাঘবের জন্যে শিশুটির মৃত্যু ঘটানো হয়েছে।

একক : ৪.৫ ■ সংক্ষিপ্তসার

বর্তমান অধ্যায়টিতে স্বস্তিমৃত্যুর লক্ষণ ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে স্বস্তিমৃত্যুর সংজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকারভেদ ইত্যাদি জানা যাবে। স্বস্তিমৃত্যু বলতে যা বোঝায় তা এক রকম প্রাণহরণের ঘটনা। এরকম প্রাণহরণের ঘটনা প্রাচীন কাল থেকেই বহুদেশে প্রচলিত ছিল। তবে স্বস্তিমৃত্যুর ধারণাটি স্পষ্ট নয়। গ্রীক ভাষায় এর যে মূল কথা পাওয়া যায় তা প্রায় অকেজো। আর অভিধানে এর যে অর্থ পাওয়া যায় তা মেনে নিলে খুনের মতো ঘটনাও স্বস্তিমৃত্যুর বলে গণ্য হয়ে পড়ে। তাই স্বস্তিমৃত্যুর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বস্তিমৃত্যু এক প্রকার প্রাণহরণ, এতে থাকে অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত রোগীর অনিবার্য উপস্থিতি। এরকম ব্যক্তির প্রাণহরণে কৃপাপরবশ হয়ে কেউ এগিয়ে আসেন, উদ্দেশ্য তার যন্ত্রণার অবসান।

স্বস্তিমৃত্যুর বিভেদরীতি দু'টি। একটি বিভেদরীতি অনুসারে স্বস্তিমৃত্যু দু'রকম — সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু ও নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। আর একটি বিভেদরীতি অনুসারে স্বস্তিমৃত্যু তিন রকম — ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও নিরৈচ্ছিক। স্বস্তিমৃত্যু ঐচ্ছিক হলেই সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু হয়ে থাকে। তাই সক্রিয় ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু নিয়েই তার পক্ষে বিপক্ষের দার্শনিকদের মধ্যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

একক : ৪.৬ ■ নমুনা প্রশ্নাবলী

১) স্বস্তিমৃত্যু কাকে বলে? উদাহরণসহ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা কর।

২) স্বস্তিমৃত্যুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক ও নিরৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় কর।

একক : ৪.৭ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১. Pefer Singer, *Practical Ethics,* 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge 1993.

২. *Applied Ethics,* ed, A.P. Dubly, Delhi, 2004.

৩. নবকুমার নন্দী ও মানিক বল, **ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান,** শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কোলকাতা, ২০০১

৪. সোমনাথ চক্রবর্ত্তী, **কথায় কর্মে এথিক্স,** প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা ৭৩,২০০২।

বিভাগ - খ

সমর্থনযোগ্যতা

একক : ৪.৮ : উদ্দেশ্য

একক : ৪.৯ : শিশুহত্যা ও অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু কি সমর্থনযোগ্য?

একক : ৪.১০ : ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু গ্রহণযোগ্য কিনা

একক : ৪.১১ : ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থনযোগ্যতা

একক : ৪.১২ : সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থনযোগ্যতা — রাচেলের অভিমত

একক : ৪.১৩ : স্বস্তিমৃত্যুর আড়ালে জাতি ও গোষ্ঠি হত্যা

একক : ৪.১৪ : সারসংক্ষেপ

একক : ৪.১৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী

একক : ৪.১৬ : গ্রন্থপঞ্জী

একক : ৪.৮ ■ উদ্দেশ্য

প্রথম এককটিতে আমরা স্বস্তিমৃত্যুর লক্ষণ ও প্রকারভেদ আলোচনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি — স্বস্তিমৃত্যুর বিভেদরীতি দু'টি। দু'টি বিভেদরীতিতে মোট পাঁচরকম স্বস্তিমৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। যে কোনো রকম স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্যতার প্রশ্ন স্বাভাবিক। তবে একই যুক্তিতে সকল প্রকার স্বস্তিমৃত্যুকে সমর্থন বা বিরোধিতা করা যায় না। এই এককটিতে আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেক রকম স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থনযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

একক : ৪.৯ ■ শিশুহত্যা ও অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু কি সমর্থযোগ্য ?

অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে রোগীর মরণ-বাঁচনের ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য বোঝার সামর্থ্য থাকে না। গুরুতর রকমের প্রতিবন্ধী কিংবা বৌদ্ধিকভাবে অক্ষম বৃদ্ধদের বেলায় এরকম মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে। তবে পিটার সিঙ্গার অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর বেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য করেছেন। এই পার্থক্য জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ শিশু এবং বয়সে আকস্মিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়া কিংবা বার্ধক্য হেতু বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছে এমন শিশুদের মধ্যে। আমরা জানি, জন্ম থেকে বিকলাঙ্গ শিশুদের কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা থাকে না। কিন্তু বৃদ্ধ বা অন্যভাবে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের ক্ষেত্র তেমন নয়। তাদের এক সময়ে ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা তা হারিয়েছেন।

অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মনে রাখা প্রয়োজন — মানব জীবনের পবিত্রতা ও দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার লক্ষ্য — এই উভয়কে যুগপৎ রক্ষা করা যায় না। কোনো প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করা এবং কোনো একটি স্বাভাবিক শিশুকে হত্যা করার মধ্যে যে পার্থক্য তা জীবনের অধিকার থাকা বা না থাকার প্রশ্ন নয়। প্রতিবন্ধীর জীবনের অধিকার নেই। স্বাভাবিক শিশুর জীবনের অধিকার আছে। নেহাত এই যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের হত্যা করা বিবেচ্য নয়। হত্যার ক্ষেত্রে অন্য রকম প্রসঙ্গও ওঠে। এই পার্থক্যটা প্রায়শই মা-বাবার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর। একটি শিশুর জন্ম সুখবর ঘটনা। মা শিশুকে নয় মাস গর্ভে ধারণ করেন। জন্মের পর থেকে মা-বাবা শিশুকে স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন। তাই শিশুহত্যা ভয়ংকর জিনিস বলে গণ্য হয়। কিন্তু গুরুতর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্মালে বিষয়টি স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। জন্মকালীন অস্বাভাবিকতা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে। জন্মকালীন গুরুতর অস্বাভাবিকতার ক্ষেত্রে শিশুটি জন্ম থেকেই মা-বাবার নিরানন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবন্ধী শিশুর জন্মদাতা মা-বাবা দুঃখবোধ করতে পারে। সে-সকল ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যু নৈতিকভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মনে হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা-বাবা চান না যে প্রতিবন্ধী সন্তানেরা বেঁচে থাকুন। এমন কি স্বাভাবিক শিশু ছাড়া অন্য শিশুকে কোনো মা-বাবাই পোষ্যরূপে গ্রহণ করতে চান না।

শিশুদেরকে এমন চেতন প্রাণীরূপে বিবেচনা করা হয় যাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত আত্ম-সচেতনতার পূর্ণবিকাশ ঘটেনি। সুতরাং আমরা যদি স্বয়ং শিশুদের তাদের মা-বাবার দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষভাবে বিচার করি তাহলে যে নীতিগুলি অ-মানুষ প্রাণীদের হত্যা ও ন্যায্যতা নিয়ন্ত্রিত করবে সেগুলি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কারণ নৈতিকতা বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদের প্রজাতির বিচার অপ্রাসঙ্গিক। জীবনের অধিকার স্বীকার করার স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে — কোনো প্রাণী অস্তিত্বশীল জীব হিসেবে আত্মসচেতন এবং তাদের মানসিক জীবনের ধারাবাহিকতা আছে। যেখানে স্বনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই সেখানে স্বনিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য নয়। সুতরাং শিশুর জীবনের ধর্ম বা গুণকেই গুরুত্ব সহ বিচার করে দেখতে হবে।

এমন পরিস্থিতি আসে যখন কোনো শিশুর জীবন এমনই দুঃখজনক যে ওই অবস্থায় বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। পূর্ব অস্তিত্ব ও উপযোগবাদী ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয় যে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো কারণ থাকে না। এমন অবস্থায় শিশুটিকে আর যন্ত্রণা না ভোগ করতে দিয়ে তাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেওয়াই বিধেয়।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। এমন বিকলাঙ্গ শিশু দেখা যায় যার বেঁচে থাকার ইচ্ছা স্বাভাবিক সিশুর চেয়ে কম। অবশ্য তা এমন পর্যায়ে নয় যে শিশুটির বেঁচে থাকা নিরর্থক। Haemophilia রোগটি এমনই পর্যায়ের। এই রোগে আক্রান্ত শিশুর রক্তক্ষরণ তাকে স্থায়ীভাবে পঙ্গু করে তোলে এবং পরিণামে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। এই ধরনের রক্তপাত অতীব যন্ত্রণাদায়ক। এই রকম রোগী বেশিরভাগ সময় হাসপাতালে কাটায়। তবুও এ-রোগে আক্রান্ত রোগীর জীবনাবসান ঘটানো হবে কিনা তা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। অনেকে এই রোগে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনটাকে অর্থপূর্ণ বলেই মনে করে। উদাহরণ স্বরূপ, সদ্যোজাত কোনো শিশুকে এই রোগে আক্রান্ত বলে জানা গেল। তার বাবা-মা তাকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো তাগিদই অনুভব করছে না। এই রকম ক্ষেত্রে কি স্বস্তিমৃত্যু সমর্থনযোগ্য? এই প্রশ্নের কোনো

সুনিশ্চিত উত্তর আমাদের হাতে নেই। ওই শিশুটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। প্রত্যাশা মতো তার জীবনেও দুঃখের চেয়ে সুখের পরিমাণ বেশি হতে পারে। তাকে হত্যা করার অর্থ হল তাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করা। তাই ওই শিশুটিকে হত্যা করা অন্যায়।

তবে এই উপযোগবাদী তত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। এই রকম ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি ওঠে তা হলো — Haemophilia রোগে আক্রান্ত কোনো শিশুকে হত্যা করা হলে তার মা-বাবার কি আর একটি সন্তান থাকবে যে সন্তান ওই শিশুটি বেঁচে থাকলে সম্ভব হতো না। যদি তাই-ই হয় তাহলে দ্বিতীয় সন্তানটি কি নিহত সন্তানটি চেয়ে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে? এই দুটি প্রশ্নেরই সদর্থক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর। কোনো মহিলা তার দু'টি সন্তান থাকুক এমন আশা করতে পারেন। তাঁর সন্তান ধারণ ক্ষমতা থাকাকালীন একটি সন্তান মারা গেলে তিনি আর একটি সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। ধরে নেওয়া যাক, কোনো মহিলার দু'টি সন্তান আছে। একটি স্বাভাবিক, অন্যটি Haemophilia রোগে আক্রান্ত। রুগ্ন সন্তানটির লালন-পালনের কারণে তৃতীয় কোনো সন্তান তার কাঙ্ক্ষিত নয়। যদি বিকলাঙ্গ শিশুটিকে মরতে দেওয়া হয় তবে তার পক্ষে আর একটি শিশুর জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। একটি স্বাভাবিক শিশুর জীবন Haemophilia রোগে আক্রান্ত শিশুর জীবনের চেয়ে উন্নততর হবে — এই আশা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ শিশুটির মৃত্যুর পর আর একটি শিশুর জন্ম হলে সুখী জীবনের সম্ভাবনা অধিক হয়। অর্থাৎ সুখের সামগ্রিক পরিমাণ বিকলাঙ্গ শিশুটির (চেয়ে বেশি হয়। প্রথম শিশুটির জন্য সুখী জীবনের যে ক্ষতি হয়েছিল দ্বিতীয় শিশুটির) অধিকতর সুখী হবার জন্য সেই ক্ষতি পূরণ হয়ে যায়। তাই Haemophilia রোগে আক্রান্ত শিশু হত্যার জন্য অন্যের উপর কোনো বিপরীত প্রতিক্রিয়া না হলে সামগ্রিক দৃষ্টিতে হত্যা করা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। তবুও প্রশ্ন থেকে যায় — বদল বা স্থানাপন্নতার এই নীতি মানব শিশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা। একেবারে বিকলাঙ্গ শিশুকে সরাসরি হত্যা করা এখনও খুন বলেই গণ্য।

একক : ৪.১০ ■ ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু গ্রহণযোগ্য কিনা

ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু সঙ্গে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর একটা মিল আছে। তা এই যে, উভয় ক্ষেত্রেই রোগী নিজের মৃত্যু সম্পর্কে সম্মতি দানে সমর্থ। আবার উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। তাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে রোগী সম্মতি দিতে সক্ষম, কিন্তু সে তা করে না। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই সম্মতি মেলে।

ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে পিটার সিঙ্গার যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হল — "Would it ever be possible to justify involuntary euthanasia on paternalistic grounds to save someone from extreme agony?" অর্থাৎ চরম যন্ত্রণায় কাতর সন্তানকে যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করার যে পিতৃত্বের দাবি তা কি মেনে নেওয়া সম্ভব? এমন ধরনের দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে দুঃখ অত্যন্ত বেশি ও নিশ্চিত। এরকম ক্ষেত্রে উপযোগবাদী বিবেচনার গুরুত্ব কম। তবুও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক ভাবার আছে। রোগী বেঁচে থাকতে চায় — এটাই তার বাঁচার উপযুক্ততার বড়ো প্রমাণ।

অভিভাবক যুক্তি সম্ভবপর তখনই যখন যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে সে নিজেই জানে না যে ভবিষ্যতে তাকে কি দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যদি তাকে হত্যা না করা তবে শেষ পর্যন্ত তাকে দুঃক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই কারণেই কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে যে সে কোনো বিষাদগ্রস্ত লোকের হাতে পড়েছে। তবে সুখের কথা এই যে, এই ধরনের দৃষ্টান্ত আমরা বাস্তব অপেক্ষা গল্পের মধ্যেই বেশি করে পাই।

বাস্তব জীবনে আমরা যদি সমর্থনযোগ্য ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যুর সম্মুখীন না হই তাহলে আমাদের ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যুর বিপক্ষেই অভিমত প্রকাশ করা উচিত। কল্পনাকে মন থেকে মুছে ফেলতে হবে আমাদের। আমাদের বাস্তব উদ্দেশ্যগুলি মাথায় রাখতে হবে। এই প্রসঙ্গে পিটার সিঙ্গার নৈতিক যুক্তির বিচারমূলক ও সংজ্ঞামূলক স্তরের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। পূর্বোক্ত উদাহরণটির ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক যুক্তি প্রদর্শন করলে ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যুকে সমর্থনযোগ্য বলেই মনে হবে। কিন্তু যদি আমরা তাকে সংজ্ঞামূলক স্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি তাহলে আমরা শুদু একথাই বলতে পারি যে, স্বস্তিমৃত্যু সমর্থনযোগ্য যদি নিহত ব্যক্তিরা (১) মৃত্যুর সম্মতি দিতে অক্ষম হয়ে থাকে নিজেদের ধারাবাহিক অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য না বোঝার কারণে এবং (২) নিজস্ব ধারাবাহিক জীবন বা মৃত্যুর মধ্যে পছন্দ করতে সমর্থ হয়ে থাকে এবং ঐচ্ছিকভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

একক : ৪.১১ ■ ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থনযোগ্যতা

অনেক দেশেই প্রচলিত আইন মেনে স্বস্তিমৃত্যু ঘটানো সম্ভব নয়। তার কারণ অনারোগ্য ব্যধিতে ভোগা অসহনীয় যন্ত্রণায় কাতর রোগীকে রোগীরই অনুরোধে ডাক্তার তার মৃত্যু ঘটালে ওই ডাক্তার খুনের অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকেন। ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থকেরা তাই প্রচলিত আইনের পরিবর্তন দাবি করেন। প্রশ্ন হল, ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু কি নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য? আজকাল ফলিত নীতিবিজ্ঞানীরা ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর পক্ষে-বিপক্ষে নানা রকম যুক্তি উপস্থাপন করে থাকেন। পিটার সিঙ্গার তাঁর *Practical Ethics* বইতে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর বিপক্ষে চারটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

(এক) প্রচলিত উপযোগবাদ অর্থাৎ মিল ও বেন্থাম প্রণীত উপযোগবাদ অনুসারে আত্মসচেতন জীব মাত্রেই নিজের মরণকে ভয় পায়। এরকম জীবহত্যা অন্যান্য জীবিত ব্যক্তিদের উপর যে প্রভাব ফেলে তা ক্ষতিকর।

(দুই) সুখবাদের গণনা প্রণালী অনুসারে মরার চেয়ে বেঁচে থাকাই অধিকতর কাম্য। কিন্তু আত্মসচেতন কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে তার ওই মনোভাব বিঘ্নিত হয়। সুতরাং আত্মসচেতন ব্যক্তিকে হত্যা করা অন্যায়।

(তিন) অধিকার তত্ত্ব অনুসারে কোনো ব্যক্তির ভোগের অধিকার থাকলে আমরা সেই অধিকার হরণ করতে পারি না। কিন্তু ধারাবাহিক অস্তিত্ব বজায় না রেখে কেউ তার অধিকার ভোগ করতে পারে না। অধিকারভোগীর হত্যায় তার ধারাবাহিক অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়। সুতরাং অধিকারভোগী ব্যক্তিকে হত্যা করা অন্যায়।

(চার) বিচারশীল ব্যক্তির স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই বিধেয়, তাকে হত্যা করা অন্যায়। সিঙ্গার এই যুক্তিগুলিকে নিম্নোক্তভাবে খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন।

সিঙ্গারের মতে এমন একটি অবস্থা কল্পনা করা যায় যে অবস্থায় অনারোগ্য ব্যাধিতে জর্জরিত হয়ে কেউ মৃত্যু কামনা করেছেন। যদি ওই ব্যক্তি 'person' না হন অর্থাৎ যুক্তিবোধ ও আত্মবোধসম্পন্ন না হন তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু সমর্থনীয়। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হল : "Do any of the four grounds for holding that it is normally worse to kill a person provide reasons against killing when the individual is a person who wants to die?" অর্থাৎ যুক্তি চারটির কোনোটার মূলে কি যুক্তিবোধ ও আত্মবোধসম্পন্ন মৃত্যুকামীর মৃত্যু ঘটানোর বিরুদ্ধে হেতু খুঁজে পাওয়া যায়? সিঙ্গারের মতে এ-প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ :

সিঙ্গার উপযোগবাদী যুক্তিগুলিকে যথাযথ মনে করেন না। যেখানে মৃত্যুকামীর সম্মতি নিয়ে হত্যা করা হয় সেখানে উপযোগবাদী আপত্তি ধোপে টেকে না। অনারোগ্য রোগে ভোগা মৃত্যুকামীর প্রাণনাশ অন্য ব্যক্তির মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে না বা তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ সৃষ্টি করে না। বরং স্বস্তিমৃত্যু অনুমোদিত না হলে মানুষের এই ভয় হতে পারে যে তাদের জীবন অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত এবং বিপদসঙ্কুল। যারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুকেই অধিক কাম্য বলে মনে করে তাদের কাছে মরণ নয়, জীবনই ভীতির কারণ। নেদারল্যাণ্ডে এক সরকারী কমিশন এক সময় একটি অনুসন্ধান চালায়। তাতে দেখা যায় যে, অনেক অনারোগ্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তিই তাদের চিকিৎসকদের নিকট এরকম প্রতিশ্রুতি চান যে, অসহনীয় যন্ত্রণায় তারা যেন তাদের মৃত্যুতে সাহায্য করেন। তবে এই জাতীয় স্বীকৃতি আদায়ের পর স্বস্তিমৃত্যুর জন্য বেশি করে অনুরোধ আসে নি। দাবি আদায়ের প্রতিশ্রুতি মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। স্বস্তিমৃত্যুর প্রয়োগের প্রয়োজনও কমে আসে সেখানে।

সিঙ্গার দেখিয়েছেন যে, অগ্রাধিকারমূলক উপযোগবাদও স্বস্তিমৃত্যুকেই সমর্থন করে, তার বিরোধিতা করে না। এরকম উপযোগবাদ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এই মতবাদ অনুসারে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষাকে হত্যার বিপক্ষে যেমন একটা যুক্তিরূপে গণ্য করা যায়, তেমনি যারা বেঁচে থাকতে চায় না তাদের নিকট বেঁচে না থাকার আকাঙ্ক্ষাকে হত্যার স্বপক্ষে একটি যুক্তি বলে গণ্য করা যায়।

স্বস্তিমৃত্যুর বিপক্ষে উত্থাপিত অধিকারমূলক তৃতীয় যুক্তিটিকে খণ্ডন করেছেন সিঙ্গার। সিঙ্গারের মতে অধিকার তত্ত্বের একটা মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, ইচ্ছুক হলে কোনো ব্যক্তি তার অধিকার বর্জনও করতে পারে। ব্যক্তির জীবনের অধিকার আছে — একথা বলার অর্থ এই নয় যে, চিকিৎসক তার অনুরোধে তার জীবনের ইতি টানলে তা অন্যায়। এ-রকম ক্ষেত্রে রোগী তার বেঁচে থাকার অনুরোধ বিসর্জন দেয়। তাই যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে না চায় তার ক্ষেত্রে উপযোগিতাবাদী যুক্তি প্রযুক্ত হতে পারে না। ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুর ক্ষেত্রে সাবেকী উপযোগবাদী যুক্তি প্রযোজ্য নয়। এ-রকম ক্ষেত্রে ভীতি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নয়, ভীতি বেঁচে থাকাকে কেন্দ্র করে।

পরিশেষে ব্যক্তির স্বনিয়ন্ত্রণের প্রতি সৌজন্য বা সম্মান প্রদর্শনের নীতি অনুসারে নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনযাপন অবশ্যই কাম্য। এখানে বাইরের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। কিন্তু কর্মকর্তা স্বয়ং সচেতনভাবে মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক হলে স্বনিয়ন্ত্রণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই ব্যক্তির মৃত্যুবরণে সাহায্য করা উচিত।

আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা স্বস্তিমৃত্যুকে বৈধকরণের বিপক্ষে। তারা বলতে পারেন যে, যদিও মৃত্যুবরণ করার জন্য আমরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি, তবুও হত হবার অনুরোধ যে স্বাধীন ও বুদ্ধি-নির্ভর সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। যন্ত্রণা-কাতর অনেক বৃদ্ধ ব্যক্তিরা কি তাদের স্বজন কর্তৃক জীবনের ইতি টানার জন্য অনুরুদ্ধ হন না? এমন কি সম্ভব নয় যে, স্বস্তিমৃত্যু ঘটাবার জন্য অনুরুদ্ধ হবার ভান করে কেউ সরাসরি ব্যক্তিকেই খুন করলো? এমন কি, এরকম মিথ্যা চাপ না থাকলেও যন্ত্রণাক্লিষ্ট এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কোনো ব্যক্তি কি বাঁচা-মরার বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম? সিঙ্গারের মতে এ-সকল প্রশ্ন ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যুকে আইনসম্মত করার ক্ষেত্রে কতকগুলি পদ্ধতিমূলক অসুবিধা মাত্র? এগুলি নৈতিক বিধি বিষয়ক কোনো আপত্তি নয়। নেদারল্যাণ্ডের আদালত কতকগুলি শর্ত মেনে ঐচ্ছিক মনে ঐচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু কায়েম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শর্তগুলি নিম্নরূপ:

(এক) স্বস্তিমৃত্যু যেন চিকিৎসক দ্বারা করানো হয়।

(দুই) স্বস্তিমৃত্যুর জন্য রোগীর যে অনুরোধ তাতে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে।

(তিন) রোগীর সিদ্ধান্ত যেন স্বাধীন, সুবিদিত ও স্থায়ী হয়।

(চার) রোগী অসহনীয় ও অপরিবর্তনীয় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় পতিত হয়।

(পাঁচ) এমন কোনো পথ নেই যাতে রোগীর যন্ত্রণার লাঘব মরণ ভিন্ন অন্য কোনোভাবে করা যায়।

(ছয়) চিকিৎসক যেন আরও একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করেন। দুজন চিকিৎসকই যেন রোগীর মৃত্যু ঘটানোর ব্যাপারে একই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এ-সকল শর্ত মেনে নেদারল্যাণ্ডের চিকিৎসকগণ স্বস্তিমৃত্যু কায়েম করে থাকেন। শর্তগুলি খুনকে স্বস্তিমৃত্যু থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। স্বস্তিমৃত্যুকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়ায় সেখানে যে খুনের সংখ্যা বেড়ে গেছে এমনও নয়।

স্বস্তিমৃত্যুর বিরোধী পক্ষ অবশ্য ডাক্তারদের ভুলের কথা উল্লেখ করে থাকেন। তারা বলেন যে, খুব কম ক্ষেত্রেই রোগীকে দু'জন ডাক্তারদ্বারা পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়া, সব ক্ষেত্রেই যে রোগী অনারোগ্য ব্যধিতে ভুগছে তাও নয়। এক কথায়, তারা বলতে চান — স্বস্তিমৃতুকে স্বীকৃতি দিলে অবাঞ্ছিত মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে যায়।

কিন্তু তা নয়। স্বস্তিমৃত্যুকে আইনী স্বীকৃতি না দিলে মানুষকে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। যে ব্যক্তি স্বস্তিমৃত্যু ঘটানোর জন্য অনুরোধ করেছে সেই ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে সম্ভাবনার অনুকূলে দাঁড়িয়ে তা করেছে, দুঃখ পরিহার করে সে তার বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা বর্জন করেছে। এই নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধিক। তবে স্বস্তিমৃত্যুর বিরোধী পক্ষের অনেকে বলেন যে, প্রান্তিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির যদি উন্নত যত্ন নেওয়া হয় তাহলে তার যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বস্তিমৃত্যু অনাবশ্যক। *On Death and*

Dying Elizabeth, Kubler Ross -এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি দাবি করেছেন যে, ব্যক্তিগত সেবাযত্ন ও ওষুধ প্রয়োগে মানুষ তাদের মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শেখে। যন্ত্রণা ব্যতীতই তারা মৃত্যুবরণ করে।

Kubler Ross -এর কথার সত্যতা একেবারে উপেক্ষনীয় নয়। কারণ আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীর রোগযন্ত্রণার উপশম করা সম্ভব। এ-রকম ক্ষেত্রে রোগীর বুদ্ধিবৃত্তিও কাজ করে। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, মুমূর্ষু রোগীদের খুব কম সংখ্যক পরিমাণই এ-রকম সেবাযত্ন পেয়ে থাকে।

Dr. Timothy Quill নিউইয়র্কে Diane নামে এক রোগীকে ঘুমের ওষুধ প্রদান করেন। রোগীটি ছিলেন লিউকোমিয়া আক্রান্ত। এই ওষুধ খেয়ে রোগীটি তার প্রাণনাশ করতে চেয়েছিল। ডাক্তারবাবুও তা জানতেন। আসলে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রোগীটির দীর্ঘদিনের পরিচয় ছিল। ডাক্তারবাবু অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে Diane -এর সাহসেরও প্রশংসা করেছেন। একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে Quill উল্লেখ করেছেন Diane -এর ঘটনা। তিনি জানিয়েছেন কীভাবে Diane আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তার মৃত্যু নিশ্চিত করাকে একটি নিরাপদ পথ বলে গ্রহণ করে। Dr. Quill -এর মতো চিকিৎসক পাবার সুযোগ অবশ্য সকলের হয় না। Betty Rollin তাঁর *Last Wish* গ্রন্থে তাঁর মায়ের জরায়ুতে কীভাবে কর্কট রোগ জন্মে এবং তা সকল শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তার বর্ণনা দিয়েছেন। এক সকালে তাঁর মা তাঁকে বলেন,

"I've had a wonderful life, but now it's over, or it should be. I'm not afraid to die, but I am afraid of this illness, what it is doing to me... There's never any relief from it now. Nothing but nausea and this pain... There won't be any more chemotherapy. There's no treatment any more. So what happens to me now? I know what happens, I will die slowly? If it benefits my childen I'd be willing. But it's not going to do any good... There's no point in a slow death, none. I've never liked doing things with no point. I've got to end this."

Betty Rollin তাঁর মায়ের ইচ্ছা পূরণের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়েন। চিকিৎসকেরা তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করে, কারণ সাহায্যপ্রাপ্ত আত্মহত্যা আইনত স্বীকৃত নয়। তবে Betty Rollin তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ওই বইটি প্রকাশিত হলে বহু আত্মীয়ের চিঠি পান যাতে উল্লেখ ছিল যে তারা তাঁর মায়ের জীবনাবসান ঘটাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সিঙ্গার এসকল আত্মীয়ের সঙ্গে সুর মিলিয়েই বলেছেন যে যারা জীবননাশ করতে চায় তাদের স্বস্তিমৃত্যুতে অনুমতি না দেবার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

একক : ৪.১২ ■ সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থনযোগ্যতা — রাচেলের অভিমত

চিকিৎসা নীতিবিজ্ঞান চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। তা ফলিত নীতিবিজ্ঞানের একটি অন্যতম অঙ্গ। এই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শান্তসহজ মৃত্যুর পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কতকগুলি ক্ষেত্রে চিকিৎসা বন্ধ রাখা এবং রোগীকে মরতে দেওয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনুমোদনযোগ্য।

তবে রোগীকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনোরকম পদক্ষেপ গ্রহণ, সেখানে অনুমোদনযোগ্য নয়। অধিকাংশ চিকিৎসক এই বিষয়টি স্বীকার করে থাকেন। অর্থাৎ চিকিৎসকদের নিকট স্বস্তিমৃত্যু নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

তবে রাচেলের মতে, এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। রাচেল চিকিৎসকদের ওই জোরালো যুক্তি বিবেচনার কথা বলেছেন। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি গলায় অনারোগ্য কর্কট রোগে ভুগছেন। সেখানে তার যন্ত্রণা অসহনীয় এবং তিনি ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। কোনোভাবেই তার উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। তিনি বেঁচে থাকতে চান না। তিনি ডাক্তারদের কাছে তার জীবনাবসানের অনুরোধ জানিয়েছেন। তাতে তার পরিবারের সদস্যদের অনুমোদনও মিলেছে। এবারে ধরা যাক, রোগীটির বেলায় চিকিৎসা বন্ধ রাখতে সকলে সম্মত হলেন। ডাক্তার তার কাজের সমর্থনে বলতে পারেন, রোগী অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর, তার মৃত্যু যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে। এই অবস্থায় তার মৃত্যু প্রলম্বিত করা শুধু অর্থহীন নয়, অন্যায়ও। কোনো ব্যক্তি যদি চিকিৎসা বন্ধ করে দেয় তাহলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে বিলম্ব হবে এবং তার যন্ত্রণাও প্রলম্বিত হবে। তবে প্রাণনাশক ইনজেকশন প্রয়োগ করে অনতিবিলম্বেই তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। এরকম ক্ষেত্রে রোগীর যন্ত্রণা মুক্তির জন্য চিকিৎসক সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাই এ-রকম মৃত্যুকে বলে সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু। আর নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুতে যে পথে যন্ত্রণা বর্জিত হয় তাই অবলম্বন করা হয়। রাচেল মনে করেন, মানবতার দিক থেকে এই পথ অবলম্বন সঠিক নয়।

দ্বিতীয় আর একটি যুক্তি দিয়েছেন রাচেল। তাঁর মতে নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর মৃত্যু ঘটিয়ে দেওয়া ধীরগতিতে ঘটে এবং তা অপেক্ষাকৃত বেশি যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু প্রাণঘাতী ঔষধ প্রদান খুব কম সময়ে ঘটায় অধিক কার্যকরী এবং যন্ত্রণারহিত। প্রসঙ্গত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়েছেন রাচেল।

এছাড়া রাচেল মনে করেন যে, প্রচলিত তত্ত্ব জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে তার ভিত্তি অহেতুক। প্রসঙ্গত Down's Syndrome রোগে আক্রান্ত শিশুদের কথা বিবেচনা করার কথা বলেছেন রাচেল। এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের শৈল্য চিকিৎসা হয় না, কারণ তাদের জন্মগত ত্রুটি থাকে। ফলে শিশুরা মারা যায়। কিন্তু যেখানে ওই ধরনের ত্রুটি নেই সেখানে শিশু বেঁচে থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ত্রুটি দূর করার জন্য শল্য চিকিৎসা খুব কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু যে কারণে ওই শিশুদের শল্য চিকিৎসা করা হয় না তা হচ্ছে — চিকিৎসক এবং বাবা-মা মনে করেন যে তাদের মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়।

কিন্তু রাচেলের মতে এই অবস্থান অসম্ভব। তাঁর প্রশ্ন — যদি ওই শিশুদের জীবন রক্ষা করা উচিত বলে মনে হয় তাহলে একটা সাধারণ শল্য চিকিৎসার সাহায্য নিলে ক্ষতি কি? কিংবা কেউ যদি মনে করে ওই ধরনের শিশুদের বেঁচে থাকা উচিত নয় তাতেই বা পার্থক্যটা কি ঘটে। যদি অবশ্য ওই শিশুদের ক্ষুদ্রান্ত্র স্বাভাবিক করা যায়? উভয় ক্ষেত্রেই জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। এরকম ক্ষেত্রে Down's Syndrome অসুখটি বিবেচ্য, ক্ষুদ্রান্ত্র নয়।

আবার কোনো কোনো মানুষ মনে করেন যে, সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক পার্থক্য আছে। তা হলো — কাউকে হত্যা করা কোনো ব্যক্তিকে মরতে দেবার চেয়ে মন্দতর। এখানে রাচেলের প্রশ্ন — হত্যা করা স্বয়ং কি মরতে দেবার চেয়ে খারাপ? এই সমস্যার সমাধানের জন্য দীর্ঘ অনুসন্ধান চালিয়েছেন রাচেল। তিনি দু'টি দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করেছেন। দৃষ্টান্ত দু'টির একটি মরতে দেবার ঘটনা, অন্যটি হত্যার।

(দৃষ্টান্ত এক) Smith জানে যে তার খুড়তুতো ভাই মারা গেলে সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হবে। একদিন বিকালে শিশুটি যখন স্নান করছিলো, তখন Smith স্নানাগারে প্রবেশ করে এবং শিশুটিকে জলে নিমজ্জিত করে। সে বিষয়টিকে এমনভাবে সাজায় যেন আকস্মিকভাবে শিশুটির মৃত্যু ঘটেছে।

(দৃষ্টান্ত দুই) Jones জানে যে তার খুড়তুতো ভাই মারা গেলে সে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হবে। Smith-এর মতো সেও শিশুটিকে স্নানাগারে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করে। তবে স্নানাগারে প্রবেশ করে Jones দেখতে পায় যে, শিশুটি পা পিছলে পড়ে গেছে, তার মাথায় আঘাত লেগেছে। Jones আনন্দিত হয়, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শিশুটিকে প্রয়োজনে আরও জলে ডুবিয়ে দেবার মতলব করে। তার প্রয়োজন হয় না, শিশুটি আকস্মিকভাবেই মারা যায়, Jones দেখে, কিন্তু সে কিছু করে না।

দুটি দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য এই — Smith শিশুটিকে হত্যা করে, কিন্তু Jones শিশুটিকে মরতে দেয়। এখন প্রশ্ন — নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের একজনের আচরণ কি অন্যজনের আচরণের চেয়ে ভালো? যদি হত্যা করা এবং মরতে দেবার মধ্যে পার্থক্যটাই নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে বলা উচিত যে Jones -এর আচরণ Smith -এর আচরণের চেয়ে ভালো। কিন্তু আমরা সত্যিই কি তা বলতে চাই? রাচেল তা মনে করেন না। উভয় ব্যক্তিই একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কাজ করেছে। Smith -এর আচরণ থেকে মনে করা যেতে পারে যে সে একজন মন্দ লোক, যদিও এই সিদ্ধান্ত বর্জিত হতে পারে। এমন হতে পারে যে Smith মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। কিন্তু এই একই বিষয় Jones এর আচরণ থেকেও অনুমান করা সম্ভব। এই বিধানের সংশোধন করার প্রশ্ন ওঠে। Jones বলতে পারে যে সে কিছুই করেনি। সে কেবল শিশুটিকে মরতে দিয়েছে। আবার হত্যার চেয়ে মরতে দেওয়া যদি কম মন্দজনক হয় তাহলে এর সপক্ষেও কিছু যুক্তি থাকা দরকার। কিন্তু তা হয় না। এই ধরনের সমর্থন নৈতিক যুক্তির বিকৃত রূপ। আদৌ এটা কোনো সমর্থন নয়।

আসলে স্বস্তিমৃত্যুর যে-সকল দৃষ্টান্ত চিকিৎসকদের বিচার্য সেগুলি আদৌ এরকম নয়। রাচেল মনে করেন, হত্যা করা এবং রোগীকে মরতে দেওয়া নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য খুব কমই। মানবিক কারণে কোনো চিকিৎসক যদি চিকিৎসা বন্ধ রেখে রোগীকে মরতে দেন তাহলে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে যে নৈতিক অপরাধ, এখানেও সেই অপরাধই হয়, অন্ততঃপক্ষে চিকিৎসা বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত তা যদি ভুল হয় অর্থাৎ রোগীর সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যদি থাকে তাহলে চিকিৎসক কিন্তু অপরাধী বলেই বিবেচিত হবেন।

একক : ৪.১৩ ■ স্বস্তিমৃত্যুর আড়ালে জাতি ও গোষ্ঠী হত্যা

স্বস্তিমৃত্যুর বিরুদ্ধে একটা প্রধান অভিযোগ এই যে, স্বস্তিমৃত্যুর সমর্থন জাতি বা গোষ্ঠী হত্যার পথ প্রশস্ত করে। John Lorber ঠিক এই কারণে সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুকে বর্ধন করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন — "আমি স্বস্তিমৃত্যুকে যদিও সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি না, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং সংবেদনশীল ব্যক্তির দ্বারা ঘটালে স্বস্তিমৃত্যু এই ধরনের অবস্থার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ ও মানবিক হয়, তবুও স্বস্তিমৃত্যুকে আইনসিদ্ধ করার অর্থ রাষ্ট্র অজ্ঞ বা ন্যায়-নীতিহীন লোকদের হাতে তাকে এক মারাত্মক অস্ত্ররূপে তুলে দেওয়া। স্বস্তিমৃত্যুকে আইনসিদ্ধ করা হলে কী ধরনের অপরাধ ঘটতে পারে তা জানার জন্য অতীত ইতিহাসে বেশিদূর যেতে হয় না।"

প্রসঙ্গত পিটার সিঙ্গার যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হল — স্বস্তিমৃত্যুই কি পিচ্ছিলপথে নিম্ন মার্গে অবতরণের প্রথম পদক্ষেপ? তাঁর আরও প্রশ্ন — আমাদের বংশধরদের সংযত করার জন্য কতদূর যাওয়া যায়? রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও নির্বিচার গোষ্ঠীহত্যা কি সমর্থনযোগ্য? জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভিজ্ঞাতাকে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে স্বস্তিমৃত্যু যে সমর্থনযোগ্য নয় তা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন Lorber। লিও আলেকজান্ডার নাৎসীদের অপরাধের একটি বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে — ''সর্বশেষে পর্যায়ে নাৎসী অপরাধ কী পর্যায়ে পেঔঁছেছিল গবেষণার ফলে তা সকলের নিকটই সুস্পষ্ট যে প্রথমে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয় থেকে কী পর্যায়ে পৌঁছেছিল গবেষণার ফলে তা সকলের নিকটই সুস্পষ্ট যে প্রথমে তারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করেছিল; একেবারে প্রথম দিকে চিকিৎসকদের মূল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন তারা ঘটায় এবং তা স্বস্তিমৃত্যুর আন্দোলনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী করে। স্বস্তিমৃত্যুর মূল কথা হল — যখন জীবন যাপন করা অর্থহীন বলে মনে হল তখন তাকে হত্যা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রথম দিকে মারাত্মকভাবে অনারোগ্য রোগীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তার পরিধি বিস্তৃত করে সামাজিকভাবে উৎপাদনক্ষম নয়, মতাদর্শ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়, জাতিগতভাবে কাঙ্খিত নয় এবং সর্বশেষে অজার্মান ব্যক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।''

লিও আলেকজান্ডার নাৎসীদের দৃষ্টান্তই বেছে নিয়েছেন। তার কারণ স্বস্তিমৃত্যুর অনেক কর্মসূচি পরবর্তীকালে নাৎসীদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতম অনেক অপরাধের মূল। তবে John lorber আলেকজান্ডারের সঙ্গে একমন নন। Lorber মনে করেন, কোনো কোনো সময়ে কোনো জীবন যে যাপনযোগ্য নয় তা ভাবা সঠিক বলেই বিবেচিত হয়। চিকিৎসা সংক্রান্ত কয়েকজন অর্থনীতিবিদ এ-বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালান। ওই সমীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল — কোন্ অবস্থায় মানুষের বেঁচে থাকাকে মূল্যবান বলে মনে হবে তা নির্ধারণ। ওই সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, অনেকেই বিশেষ পরিস্থিতিতে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে ভাবেন। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রশ্ন ওঠে — কাদের হত্যা করা হবে সে বি,য়ে একটা মানদন্ড প্রয়োগ করা কি অন্যায়?

পিটার সিঙ্গার এরকমই একটি মানদন্ডের কথা বলেছেন। সেটা হলো স্বস্তিমৃত্যুর সীমা লঙঘন করা এবং সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যু প্রয়োগ করা। John Lorber -এর মতো অনেকেই মনে করেন, সক্রিয় স্বস্তিমৃত্যুর কর্মসূচী — কোনো বিবেকহীন স্বৈরাচারী সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বিরোধীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আরও অনেক উপায় বিবেকহীন সরকারের আছে। বিবেকহীন সরকার কৌশলে আত্মহত্যার প্ররোচনা দিতে পারে, এমনভাবে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে যাতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটে, প্রয়োজনে পেশাদারী ঘাতককে দিয়ে বিরুদ্ধে পক্ষের ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারে। তবে সরকারকে এরকম স্বৈরাচারী কর্ম থেকে নিবৃত্ত করার উপায়ও আছে। তা হল সরকার যাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখে সেদিকে নজর দেওয়া।

আসলে নাৎসীদের দ্বারা সংঘটিত স্বস্তিমৃত্যু আদৌ ঐচ্ছিক ছিল না। এমনকি সেগুলিকে অনৈচ্ছিক না বলেও ইচ্ছারহিত বলা ভালো। সিঙ্গার মনে করেন, নাৎসীদরে দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে করুণামৃত্যুর

পরিবর্তে 'Doing away with the useless men' বললে তাদের কর্মসূচীর লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়। নাৎসীরা হত্যার উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছিল ইহুদীদের। জার্মান জাতির রক্তে বিশুদ্ধ আর্য রক্ত বহমান — নাৎসীদের এই বোধই জার্মানদের জাগিয়ে তোলে। নাৎসীরা এই জাতীয়াবোধ থেকেই জার্মানি থেকে ইহুদী তথা অ-জার্মানদের হত্যার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

একক : ৪.১৪ ■ সারসংক্ষেপ

স্বস্তিমৃত্যুর নৈতিক সমর্থনযোগ্যতা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এর মূলে নানা রকম অভিসন্ধি থাকতে পারে। স্বস্তিমৃত্যুর আগে সেরকম অভিসন্ধি জানা বেশি প্রয়োজন। আর একে নীতিহীন চিকিৎসক বা বিবেকহীন সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। কতকগুলি শর্ত মেনে স্বস্তিমৃত্যু ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদনযোগ্য হতে পারে। শর্তগুলি যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

একক : ৪.১৫ ■ নমুনা প্রশ্নাবলী

(এক) সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শান্ত-সহজ মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কী? সক্রিয় শান্ত-সহজ মৃত্যু বিষয়ে রাচেলের অভিমত কী? এই মত কি গ্রহণযোগ্য?

(দুই) ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক এবং ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা কর। ইচ্ছারহিত স্বস্তিমৃত্যু কি নৈতিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য?

(তিন) অনৈচ্ছিক স্বস্তিমৃত্যু কি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

(চার) স্বস্তিমৃত্যু কি জাতি ও গোষ্ঠীহত্যার পথ প্রশস্ত করে? আলোচনা কর।

একক : ৪.১৬ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১. Peter Singer,*Practical Ethics,* Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

২. নবকুমার নন্দী ও মানিক বল, **ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কোলকাতা, ২০০১

৩. সোমনাথ চক্রবর্তী, **কথায় কর্মে এথিক্স** প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা - ৭৩, ২০০২

পাঠ একক - ৫

পরিবেশ - নীতিশাস্ত্র

গঠন

একক : ৫.০ : ভূমিকা

একক : ৫.১ : সংজ্ঞা

একক : ৫.২ : পরিধি

একক : ৫.৩ : পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

৫.৩.১ : পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি

৫.৩.২ : ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

একক : ৫.৪ : চেতন প্রাণীর ঊর্ধ্বে কোনো মূল্য আছে কি?

একক : ৫.৫ : জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি

একক : ৫.৬ : গভীর বাস্তুবাদ

একক : ৫.৭ : পরিবেশ নীতিদর্শনের গুরুত্ব

একক : ৫.৮ : সারসংক্ষেপ

একক : ৫.৯ : নমুনা প্রশ্নাবলী

একক : ৫.১০ : গ্রন্থপঞ্জী

একক : ৫.০ ■ ভূমিকা

পরিবেশ সংরক্ষণ আজকাল চিন্তার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ পরিবেশ দূষণের কারণে আজকাল মানুষের জীবনে নানা রকম সংকটের সৃষ্টি। নির্মল পরিবেশ যে মানুষের জীবনে উপযোগী তা মানুষ আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই পরিবেশ চেতনায় সমৃদ্ধ হবার ফলেই মানবিক শাস্ত্রগুলিও নতুন নতুন রূপ লাভ করে চলেছে। সনাতন অর্থনীতির পাশাপাশি জন্ম নিচ্ছে পরিবেশ-অর্থনীতি। জীব-প্রযুক্তি বিদ্যার চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে দিচ্ছে পরিবেশ প্রযুক্তি বিদ্যা। এমনকি পরিবেশমুখী স্থাপত্যবিদ্যা, পরিবেশ সাংবাদিকতা প্রভৃতি শাস্ত্রও আজ গুরুত্বপূর্ণ অধিতব্য বিষয় হয়ে উঠেছে। হাল আমলে গড়ে ওঠা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রও এরকম একটি শাস্ত্র।

একক : ৫.১ ■ সংজ্ঞা

আক্ষরিক অর্থে যা আমাদের পরিবৃত করে রাখে তাই আমাদের পরিবেশ। গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি থেকে শুরু করে জল, বাতাস, আলো প্রভৃতির দ্বারা আমরা পরিবৃত। তাই এগুলি আমাদের পরিবেশেরই অংশ। মাত্রা বা পরিব্যাপ্তি দিক থেকে পরিবেশের কথা বলতে পারি আমরা। এই দিক দিয়ে পরিবেশ দু'রকম — বৃহৎ ও সঙ্কীর্ণ। বৃহত্তর অর্থে পরিবেশ বলতে যা বোঝায় তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই পরিবেশের অংশ। আবার সঙ্কীর্ণ অর্থে একটি পাঠকক্ষের বা একটি পুকুরের পরিবেশের কথা বলা যায়। পুকুরটি তীর ওই পরিবেশের সীমানা নির্দেশক। ওই সীমানা মধ্যস্থ পুকুরের জল, জলজ উদ্ভিদ, মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি নিয়ে পুকুরের পরিবেশ। এরকম একটি পরিবেশের ক্ষেত্রে তিনটি জিনিস লক্ষণীয় — সীমা, জৈব ও অজৈব উপাদান। পরিবেশের আর একটি শ্রেণীবিন্যাস আছে। আমরা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পরিবেশের কথাও বলতে পারি। কৃত্রিম পরিবেশ মানব-সৃষ্ট। সমাজ, রাষ্ট্র, গ্রাম, শহর প্রভৃতি কৃত্রিম পরিবেশের পর্যায়ভুক্ত। নদী, সাগর, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে। মানুষ তার প্রয়োজনে কৃত্রিম পরিবেশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষের খাদ্য, জল, আশ্রয় প্রভৃতি সরবরাহ করে। কিন্তু প্রকৃতি থেকে এসকল বস্তু সংগ্রহ করে মানুষ প্রকৃতির স্বরূপ বিনষ্ট করে। ফলে মানুষের জীবনে নানা রকম সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে। আজকালকার পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এসকল কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। দার্শনিকেরাও এ-ব্যাপারে পশ্চাৎপদ নন। তারাও মাথা ঘামিয়েছেন এ-ব্যাপারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কেমন হওয়া উচিত? - মূলত এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই হাল আমলের পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে।

নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। অরণ্য ধ্বংস হলে প্রকৃতির অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। যথেচ্ছভাবে কয়লা পোড়ালে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। তাতে অকাল খরা বা অকাল প্লাবনের সৃষ্টি হবে। রেফ্রিজারেটর বানাতে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ব্যবহার করলে ওজোন গহ্বরের স্বাভাবিক শক্তি বিনষ্ট হবে। তাতে ত্বকের ক্যানসার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের এই যে আবহমান কাল থেকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে কয়েকটি ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন অনিবার্যতই উঠে পড়ে। পরিবেশ-নীতিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা মূলত এ-রকম ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিতর্ককেন্দ্রিক দর্শনের একটি শাখা। তাই বলা যায় — মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পটভূমি ও ফলাফল — এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে উদ্ভূত নীতিসূত্রগুলি যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় সেই শাস্ত্র হলো পরিবেশ-নীতিবিদ্যা। এই শাস্ত্র ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত, কেননা বর্তমান যুগে কিছু কিছু সংকট এমন তীব্রতার মাত্রায় পৌঁছেছে যেখানে ব্যবহারিক জীবনে এগুলির মোকাবিলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

একক : ৫.২ ■ পরিধি

মানুষের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ জীবন-প্রণালী, কর্মকৌশল, কর্মাদর্শ ও সূত্র পরিবেশ নীতিবিদ্যার আওতাভুক্ত। মানুষের এসকল কর্মধারার একটা পটভূমিও থাকে। আমরা এসব কাজের ফলাফলকেও উপেক্ষা করতে পারি না। পরিশেষে এসকল কাজের মূলে থাকে জগতের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এসবই পরিবেশ-নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

পরিবেশ-নীতিবিদ্যার স্থান ও কালগত ব্যাপ্তিও সুদূর প্রসারী। জল-জমি-বাতাস জুড়ে পৃথিবীর সমগ্র জীবকুল এর পরিধিতে পড়ে। এমনকি জীবকুল ছাড়িয়েও সৌর জগতের যে বিশাল ব্যাপ্তি তাও এর আলোচ্য বিষয়রূপে গণ্য। মানুষের কর্মের প্রভাব মহাকাশেও পড়ছে। বিগত কয়েক দশক থেকে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির ধ্বংশাবশেষ যেভাবে মহাকাশে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার নৈতিক বিচার পরিবেশ-নীতিবিদ্যারই অঙ্গ।

অবশ্য এরকম বিষয় পরিবেশ-নীতিবিদ্যার আলোচ্য কিনা তা নিয়ে নীতি দার্শনিকেরা একমত নন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন যে, পরিবেশের নিষ্প্রাণ অংশ সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন ওঠে না। তাই ওই সব বিষয় পরিবেশ নীতিবিদ্যার আওতায় আসে না। তবে সেই সকল পরিবেশ-নীতিদার্শনিকদের সংখ্যাই বেশি যাঁরা মনে করেন যে প্রাণ-অপ্রাণের সীমানা বিচার করে পরিবেশ-নীতিবিদ্যার পরিধি নির্ণয় করা ঠিক নয়। তাঁদের মতে, বিশাল বনাঞ্চল থেকে শুরু করে মহাশূন্য অবধি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই নৈতিক মূল্যে মূল্যবান এবং সেই হিসাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়।

স্থানগত ব্যাপ্তির মতো পরিবেশ নীতিবিদ্যার কালগত ব্যাপ্তিও লক্ষ্য করার মতো। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ — তিন কালের কোনোটিই নীতিবিদ্যার (পরিবেশ) বহির্ভূত নয়। অতীতের জীবনে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিবোধ কতটা প্রাধান্য লাভ করেছিল, আদিম অরণ্যচারী জীবনের পরিবেশ চেতনা আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক — এসকল প্রসঙ্গ যেমন পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, তেমনি পরমাণু বিস্ফোবণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী অর্থে জীবকুলের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে তুলতে পারে তাও পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিবেচনায় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

এই দুই রকম ব্যাপ্তি ছাড়া পরিবেশ নীতিবিদ্যার পরিধির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কয়েকটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। প্রসঙ্গ গুলি নিম্নরূপঃ

আমরা জানি সনাতন নীতিবিদ্যা বা আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যার সাথে পরিবেশ-নীতিবিদ্যার পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা এই যে, সনাতন নীতিবিদ্যায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার মানুষ-কেন্দ্রিক। কিন্তু পরিবেশ-নীতিবিদ্যা একমাত্র মানুষকেন্দ্রিক নয়। আদর্শনিষ্ঠ নীতিবিদ্যায় একমাত্র মানুষই স্বগত মূল্যবান। প্রকৃতির যে বিপুল রচনা-সম্ভার তার মূল্য কেবল মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবেই। পরিবেশ-নীতিবিদ্যার বিচার ধারায় প্রকৃতির অনন্ত রচনা-সম্ভারও স্বগত মূল্যবান। আর বিতর্কের সূত্রপাত ঠিক এখানেই।

এরকম একটা বিতর্ক রয়েছে পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূলে। বিতর্কটা একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। প্রশ্নটা এই — প্রকৃতিক পরিবেশের কোন্ কোন্ অংশকে স্বতঃমূল্যবান বলা যায়? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত আছে আর একটি প্রশ্ন — তা বলার ভিত্তিটাই বা কী? পরিবেশ-নীতিদার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ এই দুই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই। কোনো কোনো পরিবেশ-নীতিদার্শনিক মনে করেন, প্রকৃতিতে স্বত-মূল্য আরোপের বেলায়

একমাত্র মানদণ্ড হল সংবেদন-সামর্থ্য। এই মানদণ্ড অনুযায়ী প্রকৃতির যে সকল অংশ সংবেদন বোধসম্পন্ন সেই সকল অংশ স্বতঃমূল্যবান। বলা বাহুল্য, এরা বোধগম্যতা বলতে সুখ-দুঃখের অনুভবের ক্ষমতা বোঝেন। এই অর্থে মানুষ ছাড়া পশুরাও স্বতঃমল্যবান, কারণ তাদের যে ওই বোধ আছে তা সর্বজন-স্বীকৃত। কিন্তু এই বোধগম্যতাকে আর এক শ্রেণীর দার্শনিক স্বতঃমূল্যবান জীবের মানদণ্ড বলে মানতে নারাজ। তাদের মতে কোনো কিছুর স্বত-মূল্য থাকার প্রমাণ তার বৃদ্ধি, বিস্তার, সম্প্রসারণ প্রভৃতি। এই অর্থে সমগ্র জীবকুল তথা মহাশূন্যও স্বতঃমূল্যবান এমনকি জল-জমি-বাতাস প্রভৃতিও এই অর্থে স্বতঃমূল্যবান। বলা বাহুল্য, দু'টি দলই নর-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে। নরকেন্দ্রিকতা বর্জনের পক্ষে উভয় দলেরই সম্মতি আছে। তবে ব্রহ্মাণ্ডে কতটা অংশ স্বতঃমূল্যবান — তা নিয়ে এরা একমত নন।

যে সকল নীতিদার্শনিক পরিবেশকেন্দ্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী তারাও যে সকলে একমত পোষণ করেন তা নয়। যে প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তারা বিতর্কে অংশ নিয়ে থাকেন তা হলো — সকল জীবকে সমান নৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হবে কিনা? এই প্রশ্নটির অনেক বিভাগ-উপবিভাগ আছে। গাছপালা ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের নীতিধর্মগত গুরুত্ব সমান কিনা? একটি বন্য প্রাণী ও মানুষের প্রাণের মূল্য কি এক? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরিবেশ নীতিদার্শনিকেরা পরিষ্কার দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের একদল বলেন সমদৃষ্টির কথা। অন্যদল মাত্রা নির্ণয়ের পক্ষে। দ্বিতীয় দলের মতো বোধসম্পন্নতা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিচারে প্রাণের মূল্য স্থির করতে হবে। যে জীবের বোধসম্পন্নতা বেশি তার নৈতিক মূল্যও বেশি। যে জীবের তা কম তার নৈতিক মূল্যও কম। বিরোধী দল এ বিচারকে পক্ষপাত বিচার বলেই মনে করেন।

পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক পশুকল্যাণকে কেন্দ্র করে। এখানেও দল দু'টি — একদলে রয়েছে পশুকল্যাণবাদীরা, অপরদলে রয়েছেন সংরক্ষণবাদীরা। সংরক্ষণবাদীরা মনে করেন যে সমগ্র বাস্তুব্যবস্থাই আমাদের বিবেচ্য। পশুকল্যাণবাদীদের সঙ্গে সবংরক্ষণবাদীদের বিতর্ক মূলত আঞ্চলিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এরকম একটি সমস্যা গড়ে উঠেছে দলমার দামালদের কেন্দ্র করে। সেখানে হাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশগত ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। বড়ো গাছ ছোটো গাছ, ঘাসবন প্রভৃতি এদের দ্বারা বিনষ্ট হচ্ছে। ফলে অন্যান্য জীবের খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়ছে। এমতাবস্থায় সংরক্ষণবাদীদের প্রস্তাব হচ্ছে — বাস্তুতন্ত্রের স্বার্থে কিছু কিছু বুনো হাতিকে মেরে ফেলা হোক। পশুকল্যাণবাদীরা এরকম প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করে থাকেন। কানাডায় সিল মাছকে কেন্দ্র করে, আফ্রিকায় বুনো হাতিদের কেন্দ্র করে, স্কটল্যান্ডে হরিণকে কেন্দ্র করে এরকম বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

পশুকল্যাণবাদী বা সংরক্ষণবাদী উভয়েই নরকেন্দ্রিকতার বিরোধী, উভয়েই পরিবেশের স্বতঃমূল্য স্বীকার করে থাকেন। তাদের মধ্যে অমিল এই যে, পশুকল্যাণবাদীরা ব্যক্তি পশুদের স্বতঃমূল্য স্বীকার করেন, সংরক্ষণবাদীরা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের স্বতঃমূল্য মেনে থাকেন। এই মূল্য আরোপের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই পরিবেশ নীতিদর্শনে আর একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তবে আজকাল কিছু কিছু পরিবেশ নীতিদার্শনিক এরকম বিতর্কেরও বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে পরিবেশ-দর্শনের সঙ্গে এরকম মূল্য ভাবনার কোনো

সম্পর্ক নেই। এরা বলেন নিবিড় বা গভীর বাস্তবাদের কথা। নিবিড় বাস্তুদর্শনের মূলকথা এই যে, মানুষ যেদিন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে ভাবতে শিখবে সেদিন সে নিজে থেকে পরিবেশের কল্যাণ সাধনে তৎপর হবে। পরিবেশ নীতিদর্শনের তত্ত্বকথার দিনও সেদিন ফুরিয়ে যাবে।

আর একপ্রকার বিতর্ক আছে ব্যক্তিনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মূল্যবোধে বিশ্বাসী নীতিদার্শনিকেরা মনে করেন, পরিবেশের মূল্যায়ন দেশ, কাল, পাত্র ভেদে পৃথক হতে পারে না। এঁদের মতে পরিবেশের মূল্য ব্যক্তিনিরপেক্ষ। অপর পক্ষে সংরক্ষণবাদীরা মনে করেন, কোনো কিছুকে মূল্যবান বলতে বোঝায় তা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে মূল্যবান। ব্যক্তিসাপেক্ষ দৃষ্টির মূল্যবিচার করতে গিয়ে এঁরা আন্তর্ব্যক্তিক তুলনার ভিত্তিতে পরিবেশের মূল্যায়নে ব্যর্থ হন। ফলে পরিবেশ কর্মনীতি নির্ধারণের বেলায় এরা কোনো আন্তর্ব্যক্তিক হেতু খুঁজে পান না। সার্বিক পরিবেশ-নীতি বলে এরা কিছু মানতে পারেন না।

এরকম বিতর্কের আর একটি মাত্রা যোগ করে দিয়েছেন হাল আমলের নারীবাদীরা। নারীবাদীরা নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পান — উভয়েই বঞ্চনার শিকার। তাই প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া নারীর পক্ষে সহজ, পুরুষের পক্ষে নয়। তাছাড়া, নারীর সন্তান ধারণ, সন্তানপালন প্রভৃতি ক্ষমতা জীবনদায়িনী। প্রকৃতির প্রাণদায়িনী ভূমিকাও ঠিক এই গোত্রীয়। আমরা জানি, ১৯৭২-৭৮ খ্রিস্টাব্দে গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে মেয়েরা গাছ বাঁচানোর আন্দোলনে নেমেছিল। তা এজাতীয় একাত্মবোধের একটা বড়ো নিদর্শন। জীবন পণ করে তারা দীর্ঘ সময় ধরে গাছগুলিকে জড়িয়ে ধরে থাকে যাতে বন দপ্তরের কর্মীরা সেগুলি কেটে ফেলতে না পারে। তাতে পরিবারের পুরুষদের সঙ্গে তাদের সংঘাতও বাধে। কিন্তু তাতে এখানকার নারীরা নিরস্ত হয়নি। এমনকি উত্তরপ্রদেশের সরকারের সশস্ত্র বাহিনীও তাদের এই উদ্যমের কাছে হার মানে। নারীবাদীদের মতে মেয়েদের এই ধাত্রীসম ভূমিকা আমাদের পরিবেশ বিষয়ক নীতিবোধে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। তার জন্য সামাজিক জীবন বা সামাজিক নীতিসূত্র প্রণয়ণে এরকম নারীগুণের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

পরিবেশ নীতিদর্শনকে কেন্দ্র করে আরও বহু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পরিবেশ চেতনা, সেই সংক্রান্ত নীতিবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাৎ মঠ, মন্দির, গীর্জা প্রভৃতির কোনো ভূমিকা থাকা উচিত কিনা তাও আজ পরিবেশ নীতিদর্শনের একটি বিতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

একক : ৫.৩ ■ পরিবেশের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

পরিবেশ সংক্রান্ত উল্লিখিত বিতর্কের ফলেই আজ ভাবতে হচ্ছে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, পার্ক পরিচালন ও নৈসর্গিক ভ্রমণ ব্যবস্থা সাধন উচিত কিনা। পরিবেশের প্রতি দু'রকম দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন ওঠে — পাশ্চাত্য ও ভারতীয়।

৫.৩.১ ■ প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি

প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যা বোঝায় তা গড়ে উঠেছে ইহুদী খ্রিস্টধর্ম এবং প্রাচীন দর্শনের প্রভাবে। ইহুদী ও গ্রীক ঐতিহ্য অনুযায়ী পৃথিবীর মূল সত্তা মানুষ। এরা পরস্পর ভিন্নভাবে হলেও মানবকেন্দ্রিক নীতিবিজ্ঞানের পক্ষে। **বাইবেলে** বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বরের রাজত্বে মানুষের অবস্থানই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই তত্ত্বের কথা — ঈশ্বর তাঁরই আদলে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ এবং এমনকি অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও তিনি মানুষকে দিয়েছেন। পৃথিবীর জড়সম্পদ ও অন্যান্য প্রাণী মানুষেরই সম্পদস্বরূপ।

তবে আধুনিক কালে খ্রিস্টানদের মধ্যেই ঈশ্বর প্রদত্ত এই অধিকার নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। খ্রিস্টান পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা এখন বলেন, **বাইবেলে** বর্ণিত এসকল কথাকে এখন আর আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা চলে না। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার ঈশ্বর নিঃশর্তভাবে মানুষের উপর প্রদান করেন নি। তাই মানুষ এই অধিকারকে নির্বিচারে প্রয়োগ করতে পারে না। তাঁরা মনে করেন, মনুষ্যতর প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব ঈশ্বর মানুষকে অর্পণ করেছেন। তা মানুষ করবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে। মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী।

ব্যবহারিক নীতিদর্শনের প্রবক্তা পিটার সিঙ্গারের আপত্তি ঠিক এখানেই। তাঁর মতে **বাইবেল** কথিত এরকম প্রত্যাদেশের কোনো অর্থ নেই। এর কারণ ব্যাখ্যায় **বাইবেলে** বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সিঙ্গার। সেখানে বলা আছে — দুর্বৃত্ত মানুষদের শাস্তিদানের জন্যই ঈশ্বর স্বয়ং একবার পৃথিবীতে জলপ্লাবিত করেন। তাতে অসংখ্য বন্য প্রাণী মারা যায়। **বাইবেল** বর্ণিত কাহিনি মানলে মানুষও সে পৃথিবীতে নদী-উপত্যকা প্লাবিত করবে এমন অনুপ্রেরণার কথা স্বীকার করে নিতে হয়। শুধু প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার মানুষ ঈশ্বরের নিকট থেকে পায় নি। পশুপাখীদের উপর ত্রাস সঞ্চারের অধিকারও মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছে।

প্রশ্ন হল — মানুষ কিভাবে এই অধিকার প্রয়োগ করবে? সিঙ্গার লক্ষ করেছেন যে, এই ব্যাপারে আদি যুগের খ্রিস্টানদের কোনো ধারণাই ছিল না। তখন ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশকে কোনোও না কোনো ভাবে মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করা হতো। সেন্ট অগাস্টিন **বাইবেল** -এর কাহিনি উল্লেখ করে এই অভিমতই সমর্থন করেছেন। ওই কাহিনিতে বলা হয়েছে — যিশুখৃস্ট একবার একদল শূকরকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলার কারণ হয়েছিলেন। অগাস্টিনের মতে প্রাণীহত্যা বা উদ্ভিদহত্যা থেকে বিরত থাকা অন্ধ কুসংস্কার মাত্র।

যিশুখ্রিস্টের মৃত্যুর পর খৃস্টানদের উপাসনাগৃহ বা গীর্জাগুলি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। রোমান গীর্জাগুলি যায় একদিকে, অপরদিকে পড়ে গ্রিক গীর্জাগুলি। তখন গ্রিক দর্শনের অনেক উপাদান খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। মধ্যযুগের বহুদার্শনিক গ্রিক দর্শনের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের মিলন ঘটাতে প্রয়াসী হন। আমরা জানি, টমাস এ্যাকুইনাস আজীবন এ্যারিস্টটলীয় দর্শনের সঙ্গে খ্রিস্টীয় ঈশ্বরতত্ত্বের সাজুয্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়

ব্যাপৃত ছিলেন। এ্যারিস্টটল প্রকৃতিরাজ্যে কতকগুলি স্তর মানতেন। তাঁর মতে, অপেক্ষাকৃত কম যুক্তিবোধসম্পন্ন জীব অপেক্ষাকৃত বেশি যুক্তিবোধসম্পন্ন জীবের বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকবে। উদ্ভিদ প্রাণীর স্বার্থে, বন্য প্রাণী মানুষের স্বার্থে, অধিকাংশ গৃহপালিত পশু মানুষের খাদ্য সরবরাহের জন্য বেঁচে থাকবে।

পরবর্তীকালে এ্যারিস্টটলের এই মতকে সমর্থন করেছেন সেন্ট টমাস এ্যাকুইনাস। ঈশ্বর, মানুষ এবং মানুষের প্রতিবেশীদের প্রতি বিরুদ্ধাচারণকে পাপ বলে অভিহিত করেছেন। অপরপক্ষে মনুষ্যেতর প্রাণী, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মনুষ্যকৃত কোনো কর্মকে তিনি অন্যায় বা পাপ বলে মানতে চাননি।

পাশ্চাত্য দর্শনের এই ঐতিহ্যবাহী ধারা অনুসারে জগৎ মানুষের প্রয়োজন সাধক। স্বয়ং ঈশ্বর প্রকৃতির এবং জগতের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়েছেন মানুষকে। তবে কিভাবে মানুষ তার উপর কর্তৃত্ব করবে তা ঈশ্বরের বিচার্য নয়। একমাত্র মানুষই নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান প্রাণী। প্রাকৃতিক বস্তুর স্বতঃমূল্য নেই। পশু-পাখী, গাছপালা প্রভৃতি মূল্য পরতঃ। তাই উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের ধ্বংস সাধন অন্যায় নয়। তবে প্রাণী-হত্যা, বৃক্ষচ্ছেদন, অরণ্যের বিনষ্টি কোনোভাবে মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হলে অন্যায়।

এ্যারিস্টটল সৃষ্ট গ্রিক দর্শনের ধারাটি মধ্যযুগ পার হয়ে আধুনিক কালে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির স্বার্থে ইউরোপীয় বণিকেরা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা বিভিন্ন দেশের বনাঞ্চল থেকে কাঠ সংগ্রহ করার তাগিদে বনাঞ্চল ধ্বংস করে। তারাই খনিজ সম্পদের সন্ধানে পৃথিবীর বুকে ক্ষতের সৃষ্টি করে। তাদের প্রচেষ্টায় রেলপথ নির্মিত হয় এবং কলকারখানা স্থাপিত হয়। তাতে ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক পরিবর্তন বিঘ্নিত হয়।

পশ্চিমী সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণকে একেবারে বর্জন করে না। অনেক সময় এরকম সাম্রাজ্যবাদ মানব মঙ্গলের কথা বলে। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী গন্ডীর মধ্যে থেকেও মানুষ পারমাণবিক শক্তির বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। ইউরেনিয়ামকে মাটির নীচে রেখে দেওয়াই ভাল, তার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয়। দূষণের বিরুদ্ধেও অনেক যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। আমরা জানি, বৃহৎ কারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ পরিবেশ দূষণের একটি অন্যতম কারণ। বনাঞ্চলের বিনষ্টি ও গ্যাসীয় পদার্থের যথেচ্ছ ব্যবহার বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরের ক্ষতির কারণ। তাতে সমুদ্রে জলস্ফীতি ঘটে। সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকার জলে নিমজ্জিত হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। মিশরের নীলনদের তীরবর্তী অঞ্চল, বদ্বীপ অঞ্চল প্রভৃতি এলাকা এই বিপদের সম্মুখীন। বাংলাদেশের নিম্নভূমি প্রতি বছরই ঝড়ের শিকার হয়। মানুষ, বৃক্ষরাজি ও গবাদি পশু বিনষ্ট হয়। সমুদ্রে জলস্ফীতির কারণে বলিদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ছোটোখাটো দ্বীপের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। বিগত কয়েক বছর দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক অঞ্চলে 'Nanoo' -এর প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক আকার পরমাণু গবেষণা, পারমাণবিক বিস্ফোরণ, রকেট উৎক্ষেপণ প্রভৃতি কারণে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এরকম পরিবর্তন প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল নয়। এ-বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে সতর্কবাণীও উচ্চারিত হয়েছে। একথা ঠিক যে বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে মানুষের বুদ্ধি জয়লাভ করেছে। সে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে মানুষ নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এরকম পরিস্থিতিতে আজকালকার ফলিত নীতিবিজ্ঞানীরা নরকেন্দ্রিক নীতিবিজ্ঞানের কথাই ভেবে চলেছেন। পরিবেশ সংরক্ষণই নীতিবিজ্ঞানের একটা অন্যতম সমস্যারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সমস্যা থেকেই জন্ম হয়েছে পরিবেশ নীতি-শাস্ত্রের।

আমরা যে আধুনিক সভ্যতার গর্ব করে থাকি তার ভিত্তি হল শস্য উৎপাদনকারী উর্বর জমি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৃষ্টিতে পশুচারণের জন্য বিস্তৃত প্রান্তর ঊষর নির্জর প্রান্তর বলে গণ্য হলেও পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আজ তার সংরক্ষণ ও সুফলাকরণের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এক সময়ে গ্রামাঞ্চল ছিল বিশাল অরণ্য পরিবেষ্টিত। কিন্তু বর্তমান পৃথিবীতে এর বিপরীত কথাই সত্য। ঊষর নির্জন প্রান্তরের যে অবশিষ্টাংশ আছে এখনও তাকে বিশাল মানব কর্মসমুদ্রের একটা ছোট্ট দ্বীপ বলেই মনে হয়। কিন্তু বনাঞ্চল এখন দুর্লভ। অধ্যাপক সিঙ্গার মনে করেন, ওই দুর্লভ বস্তুটিকে সংরক্ষণ করাই পরিবেশ-নীতিবিজ্ঞানের লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বলতে যা বোঝায় তা মূলত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্যবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের ফলেই মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করেছে। পরিবেশ নীতিদর্শনের চোখে এ-ধরনের ক্রিয়াকলাপের কুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫.৩.২ ■ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

বিগত ষাটের দশকে পরিবেশ দূষণ সমস্যা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। তখন Lynn White নামে একজন ঐতিহাসিক 'Science' পত্রিকায় একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেন যে, মানুষ কীভাবে পরিবেশকে ব্যবহার করবে তা নির্ভর করে প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে কীভাবে বিচার করে তার উপর। White ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিবেশগত সঙ্কটের জন্য মূলত মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মকেই দায়ী করেন। কারণ ওই ধর্মে প্রচারিত ধারণাসমূহই মানুষকে বুঝিয়েছে যে সে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব কিছুই তার ব্যবহার ও উপভোগের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। নিবন্ধটিতে White -এর একটি প্রস্তাবও ছিল। তা হচ্ছে — পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি পাবার একামাত্র উপায় হচ্ছে খ্রিস্টধর্মীয় ধারণাসমূহ বর্জন করা। White -এর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক সৃষ্টি করে। Thomas Derr নামে একজন চিন্তাবিদ White -এর বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন যে, যে সকল ধর্মে (যেমন, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মে এবং Taoism এবং Shinloism -এ) প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে সেই সকল ধর্ম-প্রধান সমাজেও প্রকৃতিকে শোষণ করার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এমনকি প্রাচীন মিশর, রোম, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদি সভ্যতা সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। O. P. Dwivedi অবশ্য এ-সকল চিন্তাবিদদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। "Classical India" নামক নিবন্ধে তিনি বলেছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় ধর্মগুলি মানুষের মনে প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুললেও আধুনিক কালে নানা কারণে এই মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে।

বৈদিক যুগে সৃষ্টির রহস্য মুনি-ঋষিদের ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অনেক ভাবনাচিন্তার পর আর্যঋষিরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম্ — এই পাঁচটি মহাভূত দ্বারা গঠিত। এরাই সকল প্রকার প্রাণের স্রষ্ঠা ও ধারক। মৃত্যুর পর সবকিছুই পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে পঞ্চ মহাভূতের ভূমিকা যে গুরুত্বপূর্ণ তা বিভিন্ন উপনিষদেও আলোচিত হয়েছে। অথর্ব বেদের একটি অধ্যায় 'পৃথিবী-সূক্ত' নামে পরিচিত। এর শ্লোকসংখ্যা ৬৩। এই অধ্যায়ে আছে পৃথিবীর স্তবগান। এই স্তবগানের মূলে আছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' — এই ধারণা। এই ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর প্রতিটি জীব এক বিশাল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবী জননীর ন্যায় মানুষকে রক্ষা ও পুষ্ট করে। জননীকে অপমান ও নির্যাতন করা যেমন গর্হিত কাজ, তেমনি সর্বশক্তির উৎস পৃথিবীর প্রতি শোষণমূলক আচরণ করাও সমানভাবে গর্হিতকর। পৃথিবীর বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম, যেমন, দৃঢ়তা, কঠিনতা, পবিত্রতা, উর্বরতা প্রভৃতি সকলের জন্য, কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা জাতির জন্য নয়।

ওই **পৃথিবীসূক্তের** একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে, চাষের জন্য বা খনিজ পদার্থ সংগ্রহের জন্য এমনভাবে মাটি খুঁড়তে হবে যাতে পৃথিবীর কলেবর ও আকৃতির কোনো ক্ষতি না হয়। তৃণগুল্মাদির আবরণকে সযত্নে সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে সেখানে। 'পৃথিবীসূক্তে' ভেষজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ এবং নগর অঞ্চলে উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণের কথাও বলা আছে। শুধু মানুষের লোভ ও শোষণের মনোবৃত্তি নয়, গোষ্ঠী বিরোধও যে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর সেকথা মনে রেখে একটি স্তবগানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার লক্ষ্যে পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভুত্ব করা যে অমানবিক তা বিভিন্ন মহাকাব্য ও পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। প্রকৃতিকে শোষণ করতে বারণ করা হয়েছে সেখানে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই পৃথিবী সংরক্ষিত, প্রকাশিত ও বিলীন হয়। তাই প্রাচীন হিন্দুর কাছে ঈশ্বর ও প্রকৃতি এক। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেই ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেন। জন্ম-পুনর্জন্মের চক্রের বিশ্বাসও হিন্দুকে প্রজাতির প্রতি ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শিখিয়েছে। অহিংসার মূলমন্ত্রও অনুরূপ ধারণার ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে। তা সর্বস্তরের প্রাণী ও মানুষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। ঋগ্বেদের সময় থেকেই বৃক্ষপূজা একটি প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে বৃক্ষের সংবেদনশীলতাও স্বীকৃত হয়। বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ একটি পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়। প্রতিটি বৃক্ষেই একটি বৃক্ষদেবতার বাস আছে — এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়। এই ধারণা অনুসারে তুলসীগাছে লক্ষ্মীর বাস, নিমগাছে শীতলার বাস, বেলগাছে শিবের বাস এবং অশ্বত্থগাছে বিষ্ণুর বাস স্বীকার করা হয়।

দূষণ নিবারণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধিনিষেধের কথাও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যায়। তখন রাস্তাঘাটে, রুয়োতে, পুকুরে, মন্দিরে প্রভৃতি স্থানে আবর্জনা নিক্ষেপ দণ্ডনীয় অপরাধ ছিল। কৌটিল্যের **অর্থশাস্ত্রে** তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যথাযথভাবে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। **চরকসংহিতায়** বায়ু দূষণের ক্ষতিকর পরিণামের উল্লেখ আছে। তখন দূষণ নিবারণে জলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা হত। পানীয় জল ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত জলকে দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে

সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন নদীর জলকে পবিত্র বলে গণ্য করা হতো। ***Prayaschitta Tattva*** গ্রন্থে ১৪ রকম অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর দূষণ থেকে যে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির জন্ম হতে পারে তার উল্লেখ পাওয়া যায় **মহাভারতের** অনুশাসনপর্বে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হয় জৈনদের ধর্মগ্রন্থ **আচরণসূত্র**। সেখানে অহিংসানীতি পালনের কথা আছে। এই নীতি অনুসারে কোনো জীবের ক্ষতি হয় এমন কর্মপালন নিষিদ্ধ। সেখানে কেবল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের প্রতি ওই নীতি পালনের কথা বলা হয়নি। কূপ খনন, বড় আকারের অগ্নিকান্ড সাধন, উচ্চৈঃস্বরে আলাপন প্রভৃতির প্রতি সতর্কতা অবলম্বনের কথাও ধ্বনিত হয়েছে।

জৈনদর্শনে শিষ্যদের নিরামিষ আহারের কথা বলা হয়েছে, বলা হয়েছে চারটি মহাব্রতের কথা, যথা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। জৈন তীর্থংকর মহাবীর সমস্ত বর্জনের দ্বারা এই ব্রত পালন করার কথা বলেছেন। এখনও অগ্রগণ্য সকল জৈন সন্ন্যাসীকে এই ব্রত পালন করতে দেখা যায়। তারা বস্ত্রও পরিধান করেন না।

Christopher Key Chapple তাঁর "Jainism and Buddhism" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, জৈনধর্মের এই সকল দিক বাস্তুসংহতিমূলক তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জৈন বিশ্বতত্ত্ব অনুসারে মানুষ জীবন দ্বারা পূর্ণ জগতে বাস করে। **তত্ত্বার্থসূত্র** একটি প্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মানব জন্মকে দুলর্ভ বলা হয়েছে। এই দুলর্ভ জন্ম লাভের উপায় অহিংসানীতি পালন। আর অহিংসানীতি পালনের জন্য গ্রন্থটিতে নিরামিশাষী হতে বলা হয়েছে। Chapple মন্তব্য করেছেন "The resultant vegetarian diet, the conscious decision to lead a non-violent life-style, and the conomitant minimal consumption of resources (particularly evident in the lives of monks and nuns) accord well with the basic tenets of Deep Ecology."

ভারতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জৈন ধর্মাবলম্বীদের অহিংসামূলক ক্রিয়াকলাপের প্রভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞে পশু বলিদানে বিরত হন। জৈন ধর্মপ্রবর্তকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যের কতকগুলি জেলাকে মৃগায়মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেছিলেন। রাইচাঁদভাই মেহ্তা মনে করেন যে, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আন্দোলন গড়ার ক্ষেত্রে জৈন অহিংসা নীতির প্রভাব আছে। সাম্প্রতিক কালে জৈনদের মধ্যে এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মাইকেল টোরিয়াল।

সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন নগরায়ণের সূত্রপাত হয় তখন থেকেই জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়। নগর নির্মাণের জন্য কাঠের প্রয়োজন হলে অরণ্য ধ্বংস হয়। মহাবীর শিষ্যদের কাঠের জিনিস ব্যবহার থেকে বিরত হতে বলেন।

আচার্য তুলসী একজন শ্বেতাম্বর জৈনগুরু। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি অহিংসা আন্দোলন শুরু করেন। তার নাম দেওয়া হয় অনুব্রত আন্দোলন। ওই আন্দোলনে কয়েকটি অঙ্গীকার গৃহীত হয়। একটি অঙ্গীকার এরকম — "I will do my best to avoid contributing to pollution" তিনি মনে করেন যে, জৈন মুক্তির ধারণা গভীর বাস্তবাদী মূলক জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমনকি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে আচার্য মহাপ্রজ্ঞর নেতৃত্বে রাজস্থানে একটি জৈন অধিবেশন হয়। অধিবেশনটির নাম ছিল "The Global Organisation Conference"। ওই অধিবেশনে ঘোষিত হয়

"A person responsible for following the environment is in fact endangering his own existence because he is an integral part of the ecological system... Balanced development takes place only when there is a simultaneous development of human values and the environment is protected."

ঈশ্বরের প্রত্যেকটি সৃষ্টিই হল পবিত্র। তা প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সকল জীবের উপর আধিপত্য আছে ঈশ্বরের, মানুষের নয়। মানুষ ঈশ্বরের হয়ে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে পারে না, পারে না বিভিন্ন প্রাণীর তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে। ঈশ্বরের পবিত্র সৃষ্টি ধ্বংসসাধন মানুষের পক্ষে অনুচিত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল জীবের মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রতিটি প্রজাতির উচিত অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। একের মধ্যে বহু এবং বহুর মধ্যে এক — এভাবেই হিন্দুরা ঈশ্বরের সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখেছে। একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদের সংমিশ্রণও ঘটেছে এভাবে। অন্য জীবের উপর মানুষের কোনো প্রভুত্ব নেই, আছে দায়িত্ব ও কর্তব্য। মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি রূপে ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাই হিন্দুরা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন প্রজাতিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। প্রাণীহত্য বা তার কোনো রূপ ক্ষতিসাধন করা যে অন্যায় তা প্রায় সব হিন্দুশাস্ত্রেই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। **মনুস্মৃতি**-তে বলা হয়েছে যে প্রাণীহত্যা মোক্ষলাভের অন্তরায়। গৃহপালিত পশু বধ করলে নরকে পতিত হবে — একথা আছে **যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি**-তে।

প্রকৃতির প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় আমরা দিয়েছি তার থেকে স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে চেতনা ছিল। আধুনিক কালেও ওই চেতনা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীন ভারতে পরিবেশ সুরক্ষার কাজ কখনও ধর্মীয় কর্তব্য, কখনও প্রশাসনিক কর্তব্যরূপে বিবেচিত হতো। তবে দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনাধীন থাকায় আমাদের পরিবেশ রক্ষায় চেতনায় ভাঙ্গন ধরে। আধুনিক ভারতীয় নীতিবিজ্ঞানীরা প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ চেতনার পুনরুজ্জীবনে তৎপর হয়েছেন।

একক : ৫.৪ ■ চেতন প্রাণীর ঊর্ধ্বে কোনো মূল্য আছে কি?

পরিবেশগত মূল্যের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মূল সমস্যা স্বতঃমূল্যের প্রশ্নে। স্বতঃমূল্যের ব্যাপকতা কতটা? তা কি সকলের মধ্যে, না কি কেবল চেতন প্রাণীর মধ্যে? কিংবা চেতন সীমার ঊর্ধ্বেও? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসায় স্বতঃমূল্য বিষয়ক কিছু কথা মনে রাখা দরকার।

কোনো বস্তু স্বতঃমূল্যবান হবে যদি তা স্বয়ং ভাল বা কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে। এর বিরোধ যান্ত্রিক মূল্যের সঙ্গে। মূল্য কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হলে সে মূল্য যান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের নিজস্ব সুখ স্বতঃমূল্যবান। অপর দিকে অর্থের মূল্য যান্ত্রিক। আমরা অর্থ চাই কারণ এর দ্বারা আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস লাভ করতে পারি।

পরিবেশ নীতিদর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন — পরিবেশের কতটা অংশ স্বতঃমূল্যবান? তা নির্ধারণ করার মাপকাঠিই বা কি? কিছু পরিবেশ নীতিদার্শনিক বলেন, প্রাকৃতিক পরিবেশের কোনো অংশ স্বতঃমূল্যবান বলার মাপকাঠি হল সংবেদ-সামর্থ্য। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের যে অংশে সুখ-দুঃখ বোধ আছে সেই অংশকে স্বতঃমূল্যবান বলা যায়। সুখ-দুঃখবোধ পশু-পক্ষীরও আছে। তাই এই দলের দার্শনিকদের মতে মানুষ ও পশু গোষ্ঠী স্বত-মূল্যবান।

তবে অনেক পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানী কোনো কিছুকে স্বতঃমূল্যবান বিবেচনার মাপকাঠি হিসাবে সংবেদন-সম্পন্নতাকে পরিহার করেছেন। তাদের মতে বৃদ্ধি, প্রসারণ প্রভৃতি হল কোনো কিছুকে স্বতঃমূল্যবান বিবেচনার মাপকাঠি। এই অর্থে পরিবেশের যা কিছু বৃদ্ধি ও বিস্তারসম্পন্ন তাই স্বতঃমূল্যবান। বলা বাহুল্য, প্রথম মত অপেক্ষা দ্বিতীয় মতে স্বতঃমূল্যবান বস্তুর পরিধি ব্যাপকতর। দ্বিতীয় মতে নিছক জীবকুল নয়, অজীবকুলও স্বতঃমূল্যবান হয়ে পড়ে। প্রশ্ন হচ্ছে — জীব-অ-জীব নির্বিশেষে স্বতঃমূল্যবান সকল বস্তুই কি নৈতিক দৃষ্টিতে সমান গুরুত্বপূর্ণ? নাকি তাদের মধ্যে কোনো মাত্রাগত ভেদ আছে?

একক : ৫.৫ ■ জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমাদের নৈতিক বিচার একটা সীমারেখা টানার কথা বলে। এই বিচার অন্যান্য জীবন্ত বস্তুকে সেই সীমার বাইরে রাখে। পিটার সিঙ্গারের প্রশ্ন — এই প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে বৈপ্লবিক বিচ্ছেদ সম্ভব কি? সিঙ্গার মনে করেন, চেতন প্রাণীকে অতিক্রম করে নীতিবিজ্ঞানের সম্ভাব্য পথে বিস্তৃতি সাধন অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু তা হলেও আজকালকার পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানীরা চেতন প্রাণীর স্বার্থ অতিক্রম করার কথা বলেছেন। যে নীতিবিজ্ঞান সমস্ত জীবন্ত বস্তুকে তার অন্তর্ভুক্ত করে তার সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায় Albert Schiweitzer -এর লেখায়। তাঁর ব্যবহৃত বাক্যাংশ 'Reverence for life' বা 'জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা' বহু উদ্ধৃত। Schweitzer তাঁর অবস্থানকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

''সত্যিকারের দর্শন অবশ্যই চেতনার সবচেয়ে তাৎক্ষণিক এবং ব্যাপকতম বস্তু থেকে আরম্ভ হবে এবং তা নিম্নোক্তভাবে সূত্রায়িত হতে পারে :

আমি জীবন যা বাঁচতে চায় এবং আমি জীবনের মধ্যেই অস্তিত্বশীল যে জীবন বাঁচতে ইচ্ছা করে।' ... ঠিক যেমন আমার নিজের বেঁচে থাকার ইচ্ছায় অধিকতর আকাঙ্ক্ষা আছে ... সেরকম আমার চারদিকে সকল বেঁচে থাকার মধ্যেও একই রকম অনুভূতি আছে।''

প্রশ্ন হল — Schweitzer -এর অবস্থানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? সিঙ্গারের মতে তা স্পষ্ট নয়। সিঙ্গারের মতে সকল জীবন সম্পর্কে সৌজন্যতার নীতি প্রদর্শন করার প্রয়াস বিভ্রান্তিকর। উপরন্তু, নদী, উদ্ভিদ এবং নিয়ন্ত্রিত মিসাইলের ক্ষেত্রে যা ঘটছে তার বিশুদ্ধ দৈহিক ব্যাখ্যাদান সম্ভব। যেখানে চেতনার অনুপস্থিতি সেখানে জড় প্রক্রিয়া সম্পর্কে, যে প্রক্রিয়া জীবন্ত বস্তুর জন্ম ও লয় নিয়ন্ত্রিত করে তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন না করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

একক : ৫.৬ ■ গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology)

বিগত পঞ্চাশের দশকে Aldo Leopold নামে একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম এক প্রকার নীতিবিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে ভূমির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে প্রাণীর সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্ক প্রভৃতি হবে এজাতীয় নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। তিনি এর নাম দেন 'ভূমি নীতিশাস্ত্র'। তারপর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে ওই দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্জাগরণ ঘটে। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে নরওয়ের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক Arne Naess একটি প্রবন্ধে গভীর ও অগভীর বাস্তুবাদের কথা বলেন। অগভীর বাস্তুবাদ প্রচলিত নৈতিক সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অগভীর বাস্তুচিন্তায় নিযুক্ত পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মানুষের পানীয় জলের চিন্তায় ব্যস্ত। তারা বিজন বনাঞ্চল সংরক্ষণ করতে চায় যাতে মানুষ সেখানে ভ্রমণের আনন্দ পায়। এরকম বাস্তুচিন্তা নরকেন্দ্রিক। কিন্তু গভীর বাস্তুবাদ ভিন্ন কথা বলে। গভীর বাস্তুবাদীরা বলেন সমগ্র জীবজগতের কথা। সেখানে মানুষের সম্ভাব্য উপকার বড়ো কথা নয়।

জীবকেন্দ্রিক পরিবেশ-ভাবনা মানুষের স্বার্থ ছাড়িয়েও জীবন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। গভীর বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের সীমা আরও ব্যাপক। গোটা প্রজাতি বাস্তুব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমগ্র জীব ও উদ্ভিদকুলের স্বার্থ চিন্তা থেকে গভীর বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের উদ্ভব। Leopold তাঁর নীতিবিজ্ঞানের ভিত্তির কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে — যা সমগ্র জীবকুলের স্থায়িত্ব, সৌন্দর্য ও সংহতির বিকাশ সাধনে সক্ষম তাই ভাল, এবং যা তা করবে না তাই মন্দ। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের পর বাস্তু আন্দোলন শুরু হয়। Arne বাস্তু আন্দোলনের কয়েকটি নীতির কথা বলেছেন —

১) বিশ্বে মানুষ এবং অ-মানুষ প্রাণীর কল্যাণ, বৃদ্ধি ও বিকাশ স্বতঃমূল্যবান।

২) জীবের প্রাচুর্য ও বিভিন্নতা এই মূল্য অর্জনে সক্ষম নয়। প্রাণধারণের ঐকান্তিক প্রয়োজন ছাড়া জীবনীশক্তির ক্ষতিসাধন করার কোনো অধিকার মানুষের থাকতে পারে না।

Naes -এর কথা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর প্রস্তাবিত নীতিবিজ্ঞান কেবল জীবন সংক্রান্ত। কিন্তু তা নয়। এই নীতিবিজ্ঞানে 'জীবকুল' পদটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। সাধারণভাবে জীবন্ত নয় এমন বস্তু যথা, নদী, মাঠ-ঘাট, আর্থব্যবস্থা প্রভৃতি জীবকুলের মধ্যে পড়ে। Richard Sylvan এবং Val Plumwood হলেন দু'জন অস্ট্রেলীয় পরিবেশবিদ্। তাঁরাও নীতিবিজ্ঞানকে জীবিত প্রাণীর মধ্যে সীমিত না রেখে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির মঙ্গল সাধন করা কিম্বা কোনো সংগত কারণ ছাড়া সে ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন না করার বাধ্যবাধকতাকেও নীতিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। Paul Tayor -ও মনে করেন, প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর প্রতি জীবনের মূল্য আরোপ করা জরুরী। সম্প্রতি Bill Devall এবং George Sessions বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের বর্ণনায় বলেছেন, ''জীবকেন্দ্রিক সমতা বিষয়ক সংজ্ঞা হচ্ছে যে জীবকুলের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুরই বেঁচে থাকার এবং বর্ধিত হবার সমান অধিকার আছে এবং সেভাবেই তারা প্রত্যেকে নিজেকে বর্ধিত করতে পারে। এই সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তুসংস্থার তাবৎ জীবকুল সত্তা-সমগ্রের অংশ হিসাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং স্বতঃংমূল্যের দিক থেকে এরা সকলেই সমান অর্থাৎ গভীর বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আত্মসচেতন ও সংবেদনশীল জীবন যে স্বতঃমূল্যবান তা নিয়ে

কোনো সমস্যা নেই। মনুষ্যেতর জীব অর্থাৎ কীট-পতঙ্গ, উদ্ভিদ, পাহাড় প্রভৃতি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সংবেদনশীল ও আত্মসচেতন জীবের সঙ্গে এদের সমান স্বতঃমূল্য কীভাবে প্রমাণিত হয়? এটা কি এই কারণে যে, প্রতিটি জীব বাস্তুসংস্থানে তাদের নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে এবং সেই ভূমিকা নির্ভর করে তাদের বেঁচে থাকার উপর? এমন কি যদি এর দ্বারা প্রমাণিতও হয় যে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব এবং উদ্ভিদের স্বতঃমূল্য আছে তবুও কীট-পতঙ্গ কিম্বা উদ্ভিদের মূল্য সম্পর্কে এরা কিছুই বলে না; কেননা বাস্তু সংস্থানকে সামগ্রিকভাবে টিকে থাকতে হলে কোনো ব্যক্তিই আবশ্যিক নয়। তাছাড়া সকল জীবন পরস্পর সম্পর্কিত এবং সমগ্রের অংশ — একথার অর্থ এই নয় যে এদের সকলেরই স্বতঃমূল্য আছে। এরা মূল্যবান শুধু এই কারণে যে সমগ্রের স্বার্থে তাদের প্রয়োজন। অবশ্য এরকম প্রশ্ন উত্থাপন যথাযথ নয়। বাস্তুবাদী-নীতিভাবনার লক্ষ্য সমগ্র বাস্তুসংস্থান, কোনো বিশেষ জীব নয়।''

আজকালকার পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানীরা বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। অনেকেই মতে এরকম নীতিবিজ্ঞান সম্ভব হতে পারে যদি উচ্চতর স্তরে তা প্রযুক্ত হয়। এ বিজ্ঞান থেকে মূল্য অর্জন করার মূলে আছে এক প্রকার বিশুদ্ধতা। এই বিশুদ্ধতার কথা হচ্ছে — বাস্তুসংস্থান কেবল ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টিমাত্র নয়। Johnson কোনো প্রজাতি সম্পর্কে কথা বলতে প্রস্তুত শুধু এই অর্থে যে প্রজাতির প্রতিটি সদস্যদের স্বার্থ সমষ্টি থেকে স্বতন্ত্র। একটা বাস্তুসংস্থানের স্বার্থ বিবেচনা করা আমাদেরই স্বার্থ। Johnson -এর মতো Mathews -ও মনে করেন যে বাস্তুসংস্থানের অন্তর্গত বস্তুগুলিও আত্মোপলব্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন।

এখানে একটি দার্শনিক প্রশ্নের সূত্রপাত। কোনো বাস্তুসংস্থানকে যার স্বার্থ আছে এমন ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা যায় কি? এছাড়াও বাস্তুসংস্থানমূলক নৈতিকতা আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কেননা গাছ-পাতা, প্রজাতি, বাস্তুসংস্থানের স্বার্থ আছে — শুধু একথা বলাই যথেষ্ট নয়। বলতে হবে — তারা নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও স্বার্থবান। কোনো স্বার্থ যে নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তা প্রমাণ করার উপায় হচ্ছে — যে সত্তার স্বার্থ সিদ্ধি হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন করা। ঠিক একই প্রশ্ন আত্মোপলব্ধির বেলায়ও ওঠে। বলা বাহুল্য, এরকম প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর সচেতন প্রাণীর থেকেই পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে James Lovelock এর ***Gaia – A New Look at Life on Earth*** গ্রন্থের কথা প্রণিধানযোগ্য। বৃক্ষরাজি, বাস্তুসংস্থান ও প্রজাতি পাথরবৎ। তারা প্রাণীর মতো নয়। সুতরাং চেতন ও অচেতন প্রাণীর মধ্যে যে বিভাজন তা নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সুদৃঢ় ভিত্তি পর্যন্ত বিস্তৃত।

তবে গভীর বাস্তুবাদী নীতিবিজ্ঞানের নৈতিক ভিত্তি বর্ধন করার অর্থ এই নয় যে, নির্ঝন বন-সংরক্ষণের বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এ-সবেরই অর্থপূর্ণতা এক ধরনের যুক্তি-নির্ভর। যুক্তিগুলি উদ্ভিদ, প্রজাতি ও বাস্তুসংস্থানের স্বতঃমূল্য কেন্দ্রিক। একে যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা না যায় তাহলে নীতিবিজ্ঞানকে চেতন প্রাণীর মধ্যেই সীমিত থাকতে হবে।

একক : ৫.৭ ■ পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের গুরুত্ব

Practical Ethics বইতে পিটার সিঙ্গার লিখেছেন: "In the long run, the set of ethical virtues praised and the set of ethical prohibitions adopted by the ethics of specific societies will always reflect the conditions under which they must live and work in order to survive."

সিঙ্গারের এই বিবৃতির গুরুত্ব অপরিসীম; কারণ বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন কোনো সমাজের নীতি যদি তা বিচার না করে তাহলে সে সমাজ টিকে থাকতে পারে না। বর্তমানে আর একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি আমরা। বিশ্বে বিপুল আকারে জনস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক বিকাশজনিত উপপণ্য যে কোনো সমাজকে বিলুপ্ত করার পুরনো শর্তগুলিকে জীইয়ে রেখেছে। সিঙ্গার মনে করেন এই সঙ্কট মোকাবিলার নীতিবিজ্ঞান এখনও বিকশিত হয় নি। যে কাজ পরিবেশের ক্ষতি সাধন করবে তাকে অন্যায় বলে গণ্য করতে হবে। নতুন যে পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে এটাই তার মূল কথা। এটাই হবে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি — পরিবেশের নৈতিক সম্পর্ক।

পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানের পরিধি নরকেন্দ্রিক নীতিবিজ্ঞানের পরিধির চেয়ে অনেক ব্যাপক। একটি মোটরগাড়ী চালানোয় যে ক্ষতি হয় তা যৌন আচরণ হেতু সৃষ্ট নৈতিক সমস্যার চেয়ে ঢের বেশী। পরিবেশ নীতিবিজ্ঞান অর্থ, খাদ্য এবং অনুরূপ সংস্থানগুলিকে রক্ষা এবং বৃদ্ধি করাকে নৈতিক গুণ বলে বিবেচনা করে, কিন্তু সেগুলির অসংযমী ব্যবহারকে নৈতিকভাবে অন্যায় বলে গণ্য করে। আমরা সাইকেল চালানো, মোটরগাড়ী চালানো এবং জলে স্কিইং করার মধ্যে যে পার্থক্য করি তা রুচির পার্থক্য। কিন্তু পরিবেশ নীতিবিজ্ঞান এই পার্থক্যকে নৈতিক পার্থক্য বলে গণ্য করে। মোটরগাড়ী চালানো বা জলে স্কিইং করার জন্য প্রয়োজন কনিজ তেল। তাতে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। কিন্তু সাইকেল চালানোয় তা ঘটে না। তাই মোটরগাড়ী চালানো নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য চিত্তবিনোদনের উপায় বলে গণ্য হতে পারে না।

সিঙ্গারের মতে পরিবেশ নীতিবিজ্ঞানের পরিধি চিহ্নিত করা সহজ। একেবারে মৌলিক স্তরে এই নীতিবিজ্ঞান সংবেদনশীল সকল প্রাণীর স্বার্থ রক্ষার কথা বিবেচনা করে। এই নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত হয় নির্জন বনাঞ্চল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিপাসুদের নান্দনিক অভিজ্ঞতা। পরিবেশমূলক নীতিবিজ্ঞান উপযোগবাদের সামগ্রিক ভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সিঙ্গার পরিবেশ-নীতিবিজ্ঞানে বস্তুতান্ত্রিক সমাজে আদর্শ বর্জনের পক্ষে। তিনি ভোগ্য পণ্যের প্রতি মানুষের আসক্তিকে সমর্থন করেন না। পরিবর্তে এই নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির সুপ্ত সামর্থ্যের বিকাশ ও বাস্তব সাফল্য এবং আত্ম-সন্তুষ্টির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। এই নীতিবোধ থেকে ব্যক্তির চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ঘটে। মানুষ শেখে মিতব্যয়ী হতে। মানুষের অমিতব্যয়িতা পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে। কোনো বস্তুকে অযত্নে ছুড়ে ফেলা দেবার অর্থ সেই বস্তুর ধ্বংস সাধন, কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ হরণ। আমরা আমাদের বিশ্বকে রক্ষা করতে পারি যদি পরিবেশগতভাবে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে লভ্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে থাকি। একান্ত প্রয়োজন না হলে গাছ-পালা, তরু-লতা বিনষ্ট করাও উচিত নয়। এক কথায়, পরিবেশ নীতিবিজ্ঞান বাস্তু সংস্থানের সুসংরক্ষণের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

অমিতব্যয়িতার দৃষ্টিভঙ্গিরও পূর্ণমূল্যায়নের কথা বলেছেন সিঙ্গার। তাঁর মতে সঙ্কটময় এই পরিস্থিতিতে খাদ্যবস্তু সহ অন্যান্য সকল রকম অপচয় সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বারিজাত বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তার চেয়ে ওই অঞ্চলের বৃক্ষরাজির মূল্য অনেক বেশি। দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবিবেচনায় বারিজাত বনাঞ্চলের গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজ উৎপাদনও বিক্রয়জাত পণ্যের অপচয়; কারণ গাছ কেটে কাঠের টুকরো তৈরির উদ্দেশ্যে কাগজ প্রস্তুতকারী ব্যবসায়িক নিকট তা বিক্রীত হচ্ছে। স্থলপথে মোটরযানে ভ্রমণ কিংবা জলপথে স্কিইং—এর ফলে কনিজ তৈলের অপচয় হলে জল ও স্থল দুইই দূষিত হয়। অত্যধিক খনিজ তৈলের ব্যবহার বায়ুস্তরের উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন খনিজ তৈল দুর্লব ছিল তখন রাস্তার স্তম্ভে যে জিজ্ঞাসাসূচক বাক্যটি লেখা ছিল তা হচ্ছে —''তোমার যাত্রা কি বাস্তবিক আবশ্যিক?'' এর উদ্দেশ্য ছিল খনিজ তেলের অপচয় বন্ধ করা। দৃষ্ট এবং তাৎক্ষণিক বিপদ সম্পর্কে জাতীয় ঐক্যের এই আবেদন খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল। আমাদের পরিবেশের এই বিপদ তাৎক্ষণিক না হলেও খুবই কঠিন এভং সেজন্য প্রয়োজন অনাবশ্যক ভ্রমণে খনিজ তৈলের অপচয় বন্ধ করা। অন্য দিক থেকেও কনিজ তৈল ব্যবহারে মিতব্যয়ী না হলে অল্পদিনের মধ্যে পৃথিবীর সীমিত তৈলসম্পদ নিঃশোষিত হবে, মানব সভ্যতা বিপদের সম্মুখীন হবে।

ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানও খাদ্যের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অপচয়কে বন্ধ করা উচিত বলে বিবেচনা করে। মানুষ বিপুল পরিমাণ গবাদি পশু পালন করে মাংসের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের উৎপাদিত শস্যের ৩৮ শতাংশ গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আবার গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও মানুষের প্রায় গুণ। পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলিতে যেখানে হাজার হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং অপুষ্টিতে মারা যায় সেখানে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা যে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তা আমরা লক্ষ্য করি না। অন্য দিকে বিত্তবান দেশগুলিতে পশুখাদ্যের জন্য ব্যবহৃত শস্যও দরিদ্র দেশের অনেক শিশুর জীবন রক্ষা করতে পারতো। আবার শিল্পোন্নত দেশগুলি প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল ব্যবহার করার জন্য দায়ী। পশুখাদ্যের জন্য প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার ওই সকল দেশের জমিতে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে নাইট্রো অক্সাইড নামক আরো এক প্রকার গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং তা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। আছে বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধন। সর্বত্র বনাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এর অন্যতম কারণ বৃক্ষচ্ছেদন। তবে একথা বেশিরভাগ শিল্পোন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বনাঞ্চল তৈরি করে যখন পশুচারণ ক্ষেত্র তৈরি হয় তখন সেখানে লক্ষ লক্ষ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হয়ে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করে। এর ফলে যে মিথেন গ্যাস তৈরি হয় তার অন্তত ২০ শতাংশ ভাগ এর জন্য দায়ী। সূর্য যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বিতরণ করে মিথেন গ্যাস তার চেয়ে ২৫ গুণ বেশি উত্তাপ সৃষ্টি করে। রাসায়নিক সারও মিথেন গ্যাস উৎপন্ন করে; কারণ এই সার মাটিতে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ই অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পচে যায় না। উদ্ভিদ ভিত্তিক আমাদের যে খাদ্য তার বহুল অংশ এভাবেই উৎপন্ন হচ্ছে।

এসব দিক বিবেচনা করে সিঙ্গার আমিষ আহার সম্পর্কে মিতাচারী হবার কথা বলেছেন। কম আমিষ ভোজনে কম গৃহপালিত পশু প্রয়োজন এবং তার ফলে কম বনাঞ্চল নষ্ট হবে। সুতরাং আমিষের চেয়ে

নিরামিষ আহার অনেক ভাল। সিঙ্গার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কথাও বলেছেন। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে পৃথিবীতে যে আর্থ-সামজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেখানে অর্থই আসল কথা। অর্থের বিনিময়ে সবকিছু লাভ করা যায়। পুঁজিবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলি মুনাফার আশায় এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রচুর সম্পদ লুণ্ঠন করেছে। খনিজ দ্রব্যের সন্ধানে বিভিন্ন দেশের মাটি খুঁড়ে সেই সকল দেশের বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করেছে। সুতরাং একটি সুন্দর বিশ্ব রচনার জন্য প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বন্ধ হওয়া। এটাই হবে ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত।

পরিবেশের ব্যবহার ও তজ্জনিত সমস্যাগুলি ব্যাপকভাবে পৃথিবীর সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা শঙ্কিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক যদি শুধু খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে পরিণত হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত খাদকের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং প্রকৃতি ও পরিবেশকে ব্যবহার করার সময় মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সতর্কবাণীই উচ্চারণ করেছিলেন এঙ্গেলস্। *Dialectics of Nature* গ্রন্থে তিনি বলেচেন, "প্রকৃতিকে জয় করা সম্পর্কে আমাদের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে নিমগ্ন হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকটি জয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। একথা সত্য যে প্রত্যেকটি জয় আমাদের প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দেয়, কিন্তু তা প্রথম দিকে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার, অভাবনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ফলে প্রথমটির সাফল্যকে বাতিল করে দেয়। এভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের সচেতন করে দেওয়া হয় যে প্রকৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব ভিন্ন দেশীয় জনগণের উপর একজন বিজেতার কর্তৃত্ব করার মতো নয়। একটা রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আমাদের মস্তিষ্ক সহ আমরা প্রকৃতিরই একটা অংশ, তার মধ্যেই আমরা বাস করি।" এর দেড়শো বছর পর 'The Economist' পরিবেশ ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে।

যে বাস্তুসংস্থানের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল তাকে রক্ষা করার পক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হচ্ছে এই — বিভিন্ন বাস্তুসংস্থান বিভাজিকাকে, বৃষ্টিপাতকে, খাদ্যসরবরাহকে এবং মাটিকে রক্ষা করে। আমাদের বাস্তুসংস্থান এতই বৃহৎ যে সে নিজেই নিজস্ব জলবায়ু সৃষ্টি করে, বৃষ্টিপাত ঘটায়, উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। বনাঞ্চল ভূ-পৃষ্ঠে উষ্ণতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে রক্ষা কবচ। আমরা বনাঞ্চলে কেটে নিঃশেষে করতে পারি না। যদি তা করি তাহলে আবহাওয়া মন্ডলের প্রচুর ক্ষতি হবে।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে বাংলাদেশ থেকে মোজাম্বিকা পর্যন্ত বনাঞ্চল কেটে ফেলার ফলে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় ব্যাপকভাবে খরা, আকস্মিক বন্যা, মাটির বাঙন দেখা দিচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা। যাই হোক খুব অল্প লোকই বাস্তুসংস্থানের জৈব-বৈচিত্র্যের প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন করতে পারে। তবে অধিকতর প্রজাতিকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোধগম্য। বাস্তুসংস্থানে অধিক প্রজাতি রাখার অর্থ অধিক স্থায়ীত্বের প্রতিশ্রুতি। অধিক সংখ্যক প্রজাতি কোনো বাস্তুসংস্থানে থাকার অর্থ —বাস্তুসংস্থানটির প্রাণবন্ত হওয়া। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতি একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়। ফলে বিভিন্ন উপাদানের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয়।

কোনো প্রজাতির একেবারে লুপ্ত হয়ে যাওয়াও কঠিন। সমস্ত রকমের শস্য, বাগানের বৃক্ষ, গৃহপালিত পশু — সকলেরই পূর্বপুরুষ আগে বন্য ছিল। মানুষের খাদ্যের ৬০ ভাগ গম, ভুট্টা, ধান প্রভৃতি জাত।

পূর্বপুরুষদের জৈব বৈচিত্র্য রক্ষা করার উপর নির্ভর করে তাদের ধারাবাহিক গ্রহণযোগ্যতা। জৈব-বৈচিত্র্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেই নূতন নূতন প্রজাতির জন্ম সম্ভব হতে পারে।

একক : ৫.৮ ■ সারসংক্ষেপ

পরিবেশ সংরক্ষণ আজকাল চিন্তার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবেশ বলতে আক্ষরিক অর্থে তাকেই বোঝায় যা আমাদের পরিবৃত করে রাখে। বর্তমান কালে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা পরিবেশ বলতে বিজন বনাঞ্চলে থেকে মহাকাশ অবধি বুঝে থাকেন। এক কথায়, ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার সবই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। পরিবেশের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আজকালকার পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতের অনুকূল। তাই পরিবেশ সংরক্ষণের প্রশ্নে আমাদের উচিত প্রাচীন ভারতীয় ভাবনার পুনরুজ্জীবন। বাস্তুবাদের পরিবেশ নীতি বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বাস্তুবাদ দু'প্রকার — গভীর ও অগভীর। অগভীর বাস্তুচিন্তা প্রচলিত নৈতিক সংগঠনের মধ্যেই সীমিত। কিন্তু গভীর বাস্তুচিন্তায় মানুষ এবং অ-মানুষ প্রাণীর কল্যাণ ও বিকাশ স্বতঃমূল্যবান।

একক : ৫.৯ ■ নমুনা প্রশ্নাবলী

(এক) পরিবেশ নীতিদর্শন কাকে বলে? এর পরিধি আলোচনা কর।

(দুই) পরিবেশের প্রতি প্রাচীন ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল? পরিবেশের প্রতি জৈন ও বৌদ্ধদের দৃষ্টিভঙ্গিত উপর গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা কর।

(তিন) টীকা লেখ :

ক) জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার নীতি

খ) চেতন প্রাণীর ঊর্ধ্বে কোনো মূল্য আছে কি?

গ) পরিবেশনীতিবিদ্যায় আলোচিত বিতর্কিত বিষয় সমূহ

একক : ৫.১০ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১. Peter Singer, ***Practical Ethics***, 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

২. ***Applied Ethics***, ed., A. P. Dubey, Delhi, 2004.

৩. নবকুমার নন্দী ও মানিক বল, **ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞান**, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি, কোলকাতা, ২০০১

৪. সোমনাথ চক্রবর্তী, **কথায় কর্মে এথিক্স**, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, কোলকাতা -৭৩, ২০০২

৫. সন্তোষ কুমার পাল : ফলিত নীতিশাস্ত্র : প্রথমখণ্ড, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০১২

Philosophy 2nd paper Part 1

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	1%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.docdroid.net Internet Source	<1%
2	wbsesa.org Internet Source	<1%
3	dodl.klyuniv.ac.in Internet Source	<1%
4	www.wbnsou.ac.in Internet Source	<1%
5	pdfcoffee.com Internet Source	<1%
6	ia903103.us.archive.org Internet Source	<1%
7	Submitted to University of Adelaide Student Paper	<1%
8	en.m.wikipedia.org Internet Source	<1%
9	"A Companion to Environmental Philosophy", Wiley, 2001 Publication	<1%

10	www.encyclopedia.com Internet Source	<1 %
11	Submitted to Australian National University Student Paper	<1 %
12	www.bipulsaha.com Internet Source	<1 %
13	Christopher Key Chapple. "Jainism and Buddhism", Wiley, 2001 Publication	<1 %
14	Submitted to The American School Foundation, A.c. Student Paper	<1 %
15	ebin.pub Internet Source	<1 %
16	quotations.asia Internet Source	<1 %
17	pilatus.web.psi.ch Internet Source	<1 %
18	folk.uio.no Internet Source	<1 %
19	Carla Bagnoli. "The Appeal of Kantian Intuitionism", European Journal of Philosophy, 2009 Publication	<1 %
20	listserv.cddc.vt.edu	

	Internet Source	<1%
21	zh.b-ok.org Internet Source	<1%
22	mafiadoc.com Internet Source	<1%
23	pratclif.com Internet Source	<1%
24	archive.org Internet Source	<1%
25	ir.amu.ac.in Internet Source	<1%
26	Submitted to University of Wales, Lampeter Student Paper	<1%
27	documents.mx Internet Source	<1%
28	murshidabad.gov.in Internet Source	<1%
29	"Utilitarianism and on Liberty", Wiley, 2003 Publication	<1%
30	clesnes.blog.lemonde.fr Internet Source	<1%
31	Ott, Christoph. "Zum effektiven Einsatz des Adaptiven Zufallstests", Universität Ulm.	<1%

	Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften, 2009. Publication	
32	Submitted to University of Liverpool Student Paper	<1 %
33	J. C. MacKenzie. "Moral Scepticism and Moral Conduct", Philosophy, 2009 Publication	<1 %
34	corpus.ulaval.ca Internet Source	<1 %
35	bugs.freedesktop.org Internet Source	<1 %
36	Dieter J. G. Schneider. "Ziele und Mittel der Betriebswirtschaftslehre", Springer Science and Business Media LLC, 1978 Publication	<1 %
37	data.nanet.go.kr Internet Source	<1 %
38	docplayer.org Internet Source	<1 %
39	Gábor Németh. "Topológia-megőrző vékonyító algoritmusok tervezése és vázközelítések kvantitatív összehasonlítása", University of Szeged, 2012 Publication	<1 %

40	Miguel Angel Garcia March. "Modelización y simulación de dispositivos micrométricos basados en estructuras espaciales de solitones ópticos.", Universitat Politecnica de Valencia, 2008 Publication	<1 %
41	www.arts.ed.ac.uk Internet Source	<1 %
42	"New Studies in Ethics", Springer Science and Business Media LLC, 1974 Publication	<1 %
43	Esch, Harald. "Ishikawa Zellen als in vitro Testsystem für Estrogenität: Etablierung und Anwendung auf verschiedene Klassen endokrin aktiver Substanzen", Universität Karlsruhe, 2003. Publication	<1 %
44	Hahn, Matthias. "Verfahren zur Metallartefaktreduktion und Segmentierung in der medizinischen Computertomographie", Universitätsverlag Karlsruhe, Karlsruhe, 2006. Publication	<1 %
45	J. Beringer, J. -F. Arguin, R. M. Barnett, K. Copic et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2012 Publication	<1 %

46	Kröger, Henner and Kutrib, Martin(Arbeitsgruppe Informatik). "Informatik an der JLUG : "Interdiziplinärer Workshop"", Justus-Liebig-Universität Gießen, 2006. Publication	<1 %
47	Pantring, Heinz. "Schulische Umwelterziehung und Umweltbewußtsein ", 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport. 02: Sozialwissenschaften, Medien und Sport, 2008. Publication	<1 %
48	Scheid, Martin. "Einfluss der 6 1 S - 6 3 P-Resonanz auf die Lyman-alpha-Erzeugung in Quecksilber ", 08: Physik, Mathematik und Informatik. 08: Physik, Mathematik und Informatik, 2010. Publication	<1 %
49	Weth, Christian von der. "Individuelle datenbankgestützte Reputationsberechnung in virtuellen Gemeinschaften", Universität Karlsruhe, 2009. Publication	<1 %
50	wethepeople-barakvalley.com Internet Source	<1 %
51	www.coursehero.com Internet Source	<1 %

52	"Zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Lebens / Regulations of Civil Law to Safeguard the Autonomy of Patients at the End of Their Life", Springer Nature, 2000 Publication	<1 %
53	Grandy, Holger. "Formale Verifikation der Korrektheit sicherheitskritischer Java Anwendungen", University of Augsburg, GERMANY, OPUS, 2008. Publication	<1 %
54	osms.wbsed.gov.in Internet Source	<1 %
55	Bernd Gräfrath. "Moral Sense und praktische Vernunft", Springer Science and Business Media LLC, 1991 Publication	<1 %
56	Naumann, Felix. "Quality-driven Query answering for Integrated Information Systems ", Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2002. Publication	<1 %
57	Necip Fikri Alican. "Mill's Principle of Utility: Origins, Proof, and Implications", Brill, 2022 Publication	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 17
Submission title:	Philosophy 3rd Paper Part 1
File name:	Philosophy_3rd_Paper_Total_Book_2013.pdf
File size:	1.83M
Page count:	154
Word count:	81,069
Character count:	287,032
Submission date:	29-Jul-2022 07:08AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876567865

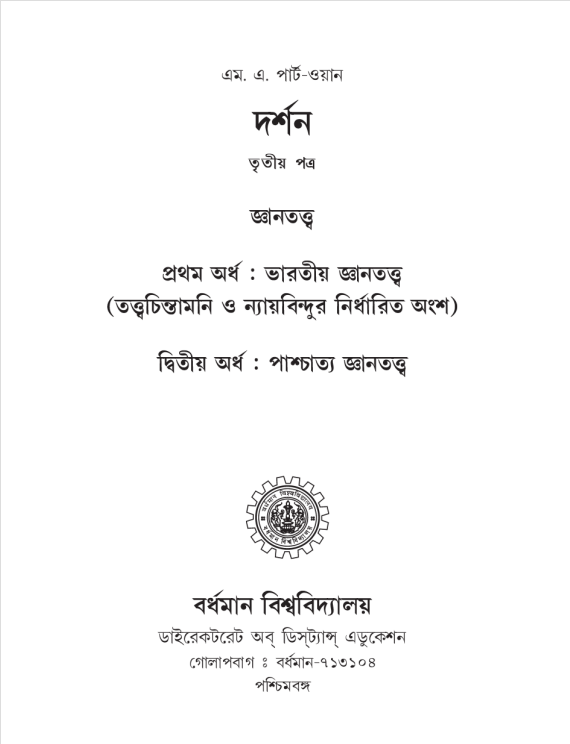

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

তৃতীয় পত্র

জ্ঞানতত্ত্ব

প্রথম অর্ধ : ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব
(তত্ত্বচিন্তামনি ও ন্যায়বিন্দুর নির্ধারিত অংশ)

দ্বিতীয় অর্ধ : পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন
গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 3rd Paper Part 1

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:08AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876567865
File name: Philosophy_3rd_Paper_Total_Book_2013.pdf (1.83M)
Word count: 81069
Character count: 287032

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

তৃতীয় পত্র

জ্ঞানতত্ত্ব

প্রথম অর্ধ : ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব
(তত্ত্বচিন্তামনি ও ন্যায়বিন্দুর নির্ধারিত অংশ)

দ্বিতীয় অর্ধ : পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন

গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য, দর্শন বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক দিলীপ মোহান্ত, দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান-পুনর্মুদ্রন-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যেগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বতমার্ন উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন তৃতীয় পত্রের সংকলনে রয়েছে তৃতীয় পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে '' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম অর্ধ (তত্ত্বচিন্তামনি)

ন্যায় দর্শনের দু'টি সম্প্রদায় - 'প্রাচীন' ও 'নব্য'। প্রাচীন ন্যায়ের উন্নতি ও ক্রমবিকাশে বৌদ্ধ তার্কিকগণের এবং নব্য ন্যায়ের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশে অদ্বৈত বেদান্তীগণের বিশেষ অবদান আছে। তাছাড়া জয়ন্তের দর্শনকে ন্যায়শাস্ত্রের 'মধ্যযুগীয় দর্শন' বলা হয়। কালক্রমে নব্যন্যায়ে আবার দুটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে - মিথিলায় নব্যন্যায় ও বঙ্গে নব্যন্যায়। মিথিলায় নব্যন্যায়ের আবার দু প্রকার ব্যাখ্যাশৈলী দেখা যায় - একটি মণিকার প্রবর্ত্তিত ও অন্যটি দর্পণকার প্রবর্ত্তিত। তবে যজ্ঞপতি উপাধ্যায় ছাড়া কোন নব্যনৈয়ায়িক দর্পণকারের মতের সমর্থক ছিলেন না। ফলে মিথিলায় কেবল মণিকারের দর্শনেরই পঠন-পাঠন চলে। বঙ্গে নব্য-ন্যায়েরও আবার জাগদীশী ও গাদাধরী এই দু প্রকার ব্যাখ্যার ধারা রয়েছে। কিছু অভিনব মতবাদ প্রবর্তনে ও পরিবেশনায় বঙ্গীয় নব্যন্যায়ে নূতনত্ব লক্ষিত হলেও বঙ্গীয় নব্য নৈয়ায়িকগণ মণিকারের দর্শনকেই প্রধানত বিশ্লেষণ করেছেন। সুতরাং এটি অবিসংবাদিত যে, গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থ নব্য ন্যায়ের মূল উৎস। গঙ্গেশের নব্যন্যায়কে 'প্রমাণশাস্ত্র' বলে। প্রমাণতত্ত্ব বুঝতে হলে প্রামাণ্যবাদের বিচার আবশ্যক।

গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি**-র প্রামাণ্যবাদের ওপর দূরশিক্ষায় সংশ্লিষ্ট দর্শনের কোর-ফ্যাকাল্টি শ্রীমান্ মলয় রায়ের লেখা পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। এই পাঠ-উপকরণগুলি দূরশিক্ষা নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে। প্রতিটি ইউনিট কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে প্রধানত প্রামাণ্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, মীমাংসকগণের মতে প্রামাণ্যের গ্রাহক নিয়ে মতানৈক্য, স্বতস্ত্ব শব্দের অর্থ এবং জ্ঞানসামান্য ও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপত্তিবাক্য সমূহ **চিন্তামণি**-র টীকা ও অনুটীকার আলোকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

আমি আনন্দের সাথে এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করেছি। এগুলি প্রসাদগুণযুক্ত ও গাম্ভীর্যপূর্ণ। পাঠ-উপকরণগুলি দূর-শিক্ষার্থীদের একান্ত উপযোগী হবে বলে আমি মনে করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কারণ তারা আমাকে এই উপকরণগুলির সম্পাদনা করার সুযোগ দিয়েছেন। পাঠ-প্রণেতা শ্রীমান্ মলয় রায়ের নব্যন্যায়ের দূরহতত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশনার নৈপুণ্য আমায় মুগ্ধ করেছে। আমি তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করছি।

অমরনাথ ভট্টাচার্য

অবতরণিকা

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রামাণ্যবাদের আলোচনা একটি বিশেষ স্থান অর্জন করে আছে। সকল পদার্থের প্রতিষ্ঠা প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল। জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চিত না হলে অন্য পদার্থের নিশ্চয় সম্ভব হয় না। এজন্য সকল প্রামাণ্যবাদী ভারতীয় দার্শনিকই উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিপক্ষে প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠায় যত্নশীল হয়েছেন।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের শিক্ষার্থীকে প্রামাণ্যবাদ সম্বন্ধে অবহিত করা একান্ত আবশ্যক। একথা মনে রেখে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ রচিত **প্রত্যক্ষচিন্তামণি**-র অন্তর্গত প্রামাণ্যবাদের নির্ধারিত অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই গ্রন্থের ওপর দূরশিক্ষার্থীর জন্য পাঠ-উপকরণ প্রস্তুত করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত হয়। আমি তিনটি ইউনিটে এই পাঠ-উপকরণগুলি দূর-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে প্রস্তুত করেছি। শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে মূল ও স্থলবিশেষে গ্রন্থের কিছু অংশ এখানে সংযোজন করেছি। অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুমতি সাপেক্ষে তার রচিত প্রবন্ধ হতে বঙ্গানুবাদ এখানে সংকলন করেছি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ ও দর্শন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। কারণ এদের সকলের আনুকূলেই আমি পাঠ-উপকরণগুলি প্রস্তুত করার সুযোগ পেয়েছি। আমার শিক্ষক ও গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অতি সযত্নে পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করেছেন। তার সম্পাদনার ফলে আমার পাঠ-উপকরণগুলি নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্যে আমি শ্রদ্ধাঘন প্রণতি জানাই।

মলয় রায়

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম অর্ধ (ন্যায়বিন্দু)

ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে বৌদ্ধ দার্শনিকদের অবদান অনন্যসাধরণ। এক সময় ন্যায় ও বৌদ্ধদার্শনিকদের মধ্যে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হিসাবে যে তর্কবিতর্কের পরম্পরা ছিল, তার ফলশ্রুতি স্বরূপ উভয় দর্শনই সূক্ষ্ম যৌক্তিক বিশ্লেষণে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই বৌদ্ধদার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান জানা না থাকলে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ও যুক্তিশাস্ত্রের ধারাবাহিকতার সূত্র বুঝে ওঠা দুস্কর। বৌদ্ধদার্শনিকদের মধ্যে নাগার্জুন, দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির দার্শনিক রচনাসমূহ মৌলিকতার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। আধুনিক প্রতীচ্যের দর্শনে ইমান্যুয়েল কান্টের যে গুরুত্ব, ধ্রুপদী ভারতীয় দর্শনে ধর্মকীর্তির অবদান অনুরূপ প্রণিধানযোগ্য।

ধর্মকীতির অন্যতম প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ 'ন্যায়বিন্দু' সূত্রাকারে রচিত, অবয়বে ক্ষীণ, কিন্তু বিষয় ও যৌক্তিক সমৃদ্ধিতে গভীরভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থখানির বিভিন্ন টীকার মধ্যে ধর্মোত্তর ও বিনীতদেব রচিত টীকা দুখানিই পন্ডিত সমাজে বহুল প্রচলিত। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থটি মূলতঃ প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান- এই তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে দর্শনের স্নাতকোত্তর পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত এই পাঠ্যোপকরণটিতে ড. রজত ভট্টাচার্য্য প্রথম দুটো পরিচ্ছেদ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের ওপর দুটি এবং স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদের ওপর একটি একক (ইউনিট)-এ ভাগ করে পাঠ্যোপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যনির্ভর ও যুক্তি সমৃদ্ধ এই রচনা। পাঠ্যোপকরণটিতে নির্বাচিত একক সমূহকে অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে পাঠ্যক্রম অনুসারে উপস্থাপিত ও দূরশিক্ষার বিদ্যার্থীর উপযোগী করে পরিবেশিত। বিষয়-বিন্যাসে ও ভাষার সাবলীলতায় ড. ভট্টাচার্য্যের এই রচনা অনন্য। মুখ্যতঃ দূরশিক্ষার বিদ্যার্থীদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পাঠ্যোপকরণটি রচিত হলেও ভাষায় ড.ভট্টাচার্য্যকৃত এই রচনা সাধারণ পাঠকেরও কৌতুহল মেটাতে পারবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েব ডাইরেক্‌রেট অব্‌ ডিসট্যান্স এডুকেশন- এর কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পাঠ্যোপকরণগুলি সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলে আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

দিলীপ কুমার মোহান্ত
প্রফেসর
দর্শন বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অবতরণিকা

অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বিশিষ্ট বৌদ্ধ দার্শনিক আচার্য ধর্মকীর্তি মোট সাতটি গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন যে ন্যায়াদি আস্তিক দর্শন সমূহে এবং নাস্তিক জৈন দর্শনে প্রতিপক্ষরূপে তাঁর মত উদ্ধৃত, বিশ্লেষিত ও সমালোচিত হয়েছে। ধর্মকীর্তির সেই সাতটি গ্রন্থের অন্যতম ন্যায়বিন্দুর প্রথম দুটি পরিচ্ছেদ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে দর্শনের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অন্যতম পাঠ্যাংশ।

আমি এই পাঠ্যাংশকে তিনটি একক-এ (ইউনিট-এ) এবং প্রতিটি একককে অনেকগুলি অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে দূরশিক্ষার নির্ধারিত আঙ্গিকে পরিমার্জিত নবরূপে উপস্থাপন করে পাঠ্যোপকরণটি রচনা করেছি। দূরশিক্ষার্থীরা আমার এই রচনার দ্বারা উপকৃত হলে আমার প্রয়াস সফল হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পাঠ্যোপকরণ রচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন বলে আমি সেই কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রজত ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকের নিবেদন

দ্বিতীয় অর্ধ (পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা পাঠক্রমের গুণগত মান উন্নত ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এর পাঠ উপকরণগুলির সংস্কার করার কাজ চলছে। এই পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাই প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে, পাঠ-উপকরণগুলিতে বিষয়বস্তুর পরিবেশনা এমন হওয়া উচিত যাতে ছাত্রছাত্রীরা অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া স্বচেষ্টাতেই তা অনুধাবন করতে পারে। বলা বাহুল্য, পাঠ-উপকরণগুলির এই সংস্কার সাধনের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার দায়িত্বে রয়েছেন দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা।

বর্তমানে পুস্তিকাটিতে আলোচিত হয়েছে দর্শনশাস্ত্রের স্নাতকোত্তর পাঠ্যসূচীর তৃতীয় পত্র/দ্বিতীয় অর্ধ, বিষয় **পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা**। পুস্তিকাটির রচয়িতা অধ্যাপিকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়কে সুচিন্তিতভাবে সংশ্লিষ্ট উপবিষয়সমূহে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং বোধগম্য ভাষায় সেগুলি পরিবেশিত হয়েছে। প্রতিটি পাঠ শুরু হয়েছে পাঠের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা দিয়ে এবং বিষয়-উপবিষয়ের আলোচনা শেষ হয়েছে পাঠের সারসংক্ষেপ, নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ করে। ফলে প্রতিটি পাঠ-উপকরণ একটি পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করেছে। পাঠ-উপকরণগুলি নিঃসন্দেহে ছাত্রোপযোগী ও ছাত্রসহায়ক হয়েছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা বিভাগ এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। যথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই দূরশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা ড. মোহন পাল, সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষ এবং দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টি শ্রী মলয় রায়কে— যাঁদের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই পাঠ-উপকরণগুলি লেখা ও সম্পাদনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।

বর্ধমান
২৭ জুন, ২০০৯

আমিনুল হক্
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
দর্শন বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রথম অর্ধ

তত্ত্বচিন্তামনি ও ন্যায়বিন্দু

ড. মলয় রায়
কোর-ফ্যাকাল্টি
দর্শন বিভাগ, ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক রজত ভট্টাচার্য্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা

অধ্যাপক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম অর্ধ : পর্যায় -১
তত্ত্বচিন্তামণি

ইউনিট	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রামাণ্যজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	৩-১১
২	মীমাংসক মতে প্রামাণ্যের জ্ঞান ও স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ	১২-১৭
৩	জ্ঞানপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপত্তি	১৮-২৭

প্রথম অর্ধ : পর্যায় - ২
ন্যায়বিন্দু

ইউনিট		
১	গ্রন্থপরিচিতি, অনুবন্ধ ও সম্যক্ জ্ঞান	৩১-৪৪
২	প্রত্যক্ষ	৪৫-৬১
৩	স্বার্থানুমান	৬২-৭৩

দ্বিতীয় অর্ধ

প্রথম পাঠ:	জ্ঞানের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of Knowledge)	৭৭-৯৩
দ্বিতীয় পাঠ:	জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস : গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা ও ঐ সমস্যা বিষয়ে দার্শনিক প্রতিক্রিয়া (Knowledge and Justified True Belief : The Gettier Problem and Responses to the Gettier Problem)	৯৫-১০৫
তৃতীয় পাঠ:	সংশয়বাদ ও জ্ঞানের সম্ভাবনা (Scepticism and the Possibility of Knowledge)	১০৭-১২৬
চতুর্থ পাঠ:	জানার দাবীর যৌক্তিকতা (Justification of Knowledge Claims)	১২৭-১৪২

তত্ত্বচিন্তামনি

(নির্ধারিত অংশ)

প্রথম অর্ধ

পর্যায় গ্রন্থ – ১

ড. মলয় রায়

কোর ফ্যাকাল্টি, দর্শন বিভাগ

ডিসট্যান্স এডুকেশন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট - ১ ঃ প্রামাণ্যজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ পরিকল্পনা

১.১ পাঠের উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ গ্রন্থপরিচয়

১.৪ গ্রন্থকারের পরিচিতি

১.৫ নব্যন্যায়ে প্রামাণ্য

- ১.৫.১ ন্যায়শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন
- ১.৫.২ প্রমাণতত্ত্ব উপপাদন মণিকারের উদ্দেশ্য
- ১.৫.৩ 'প্রামাণ্য' শব্দের অর্থ

১.৬ প্রামাণ্যজ্ঞানের উপযোগিতা

- ১.৬.১ অপ্রামাণ্যবাদীর আক্ষেপ
- ১.৬.২ প্রবৃত্তির কারণ অর্থনিশ্চয়, প্রামাণ্যনিশ্চয় নয়
- ১.৬.৩ গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ পাঠের উদ্দেশ্য

গঙ্গেশের পরিচয়, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের উপযোগিতা, প্রমাণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, মাধ্যমিক মতে অর্থনিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ ও গঙ্গেশের মতে সামান্যত প্রবৃত্তির প্রতি প্রামাণ্যনিশ্চয় কারণ - ইহা বিশ্লেষণ করা এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১.২ প্রস্তাবনা

গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্য ন্যায়ের প্রবর্তক। তিনি 'মণিকার' নামে পরিচিত। **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থের প্রত্যক্ষখন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি প্রামাণ্যবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রামাণ্য সম্পর্কে তার এই আলোচনার বিভিন্ন দিক আছে। প্রমা বলতে বোঝায় যথার্থজ্ঞান, আর প্রামাণ্য হল বিষয়কে প্রকাশ করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য। প্রামাণ্য শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয় - প্রমাকরণত্ব ও প্রমাত্ব। প্রমাজ্ঞানের

করণকে প্রমাণ বলে। প্রমাণে প্রামাণ্য থাকে। প্রামাণ্য প্রমাণের ধর্ম অর্থাৎ বিষয়কে প্রকাশ করার যোগ্যতা। প্রামাণ্য শব্দটি প্রমাত্বকেও বোঝায়। বিষয়কে প্রকাশ করার সামর্থ্য বস্তুতঃ প্রমাণে থাকলেও তা প্রমাজ্ঞানে অনুবর্তিত হয়। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে যথাযথভাবে সরাসরি প্রকাশ করে। প্রামাণ্যবাদ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য শব্দটি প্রমাত্বকে বোঝায়। প্রামাণ্য বিচারের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি - স্বতঃ ও পরতঃ। তবে প্রামাণ্য স্বতঃ না পরতঃ এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এই মতভেদ প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই উৎপত্তিতে যেমন প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব বিচার করা হয়, তেমনি প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তিতেও তার স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্বের বিচার করা হয়। প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্বের আলোচনা এই পাঠক্রমে করা হয়েছে।

১.৩ গ্রন্থপরিচয়

তত্ত্বচিন্তামণি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের রচিত নব্য-ন্যায়ের আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে প্রভাকরের মত বিশেষভাবে খন্ডিত হয়েছে। এই গ্রন্থকে অবলম্বন করে শতাধিক টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছে। এর ফলে তর্কশাস্ত্রের পুষ্টি সাধিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন **তত্ত্বচিন্তামণি** প্রণেতা গঙ্গেশ। পরবর্তীকালে আনুমানিক ১৫১০ খ্রীঃ রঘুনাথ শিরোমণি এই গ্রন্থের আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া জগদীশ, গদাধর ও মথুরানাথ এই গ্রন্থের উপর টীকা গ্রন্থ রচনা করেন।

মিথিলায় প্রথম নব্য-ন্যায়ের সৃষ্টি হয়। **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থটি নব্য ন্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি** দর্শনের জগতে অভিনব সৃষ্টি। পরবর্তী নব্য ন্যায়ের লেখকগণ **তত্ত্বচিন্তামণি-** র আলোকেই তাদের গ্রন্থ রচনা করেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়েই নব্য-ন্যায়ের বিস্তার ঘটে। মিথিলা থেকে নব্য-ন্যায়ের ছাত্ররা নিজের অঞ্চলে ফিরে গিয়ে তাদের নিজস্ব ভাষায় নব্য-ন্যায় চর্চার টোল চালু করেন। এই গ্রন্থে প্রধানত প্রমাণতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটি প্রত্যক্ষচিন্তামণি, অনুমানচিন্তামণি, উপমানচিন্তামণি ও শব্দচিন্তামণি এই চারটি খন্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রভাকর মীমাংসার প্রমাণাংশের বহু সিদ্ধান্ত খন্ডিত হয়েছে।

গঙ্গেশ **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থের প্রথম খন্ডে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেন। এই অধ্যায়টিকে 'প্রত্যক্ষচিন্তামণি' বলে। প্রত্যক্ষচিন্তামণিতে যে বিষয়গুলি রয়েছে, তা হল - মঙ্গলবাদ, প্রামাণ্যবাদ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, সন্নিকর্ষবাদ, সমবায়বাদ, অভাববাদ, প্রত্যক্ষকারণবাদ, মনোঽণুত্ববাদ, অনুব্যবসায়বাদ, নির্বিকল্পকবাদ ও সবিকল্পকবাদ। গ্রন্থের শুরুতেই গঙ্গেশ মঙ্গলাচরণের উপযোগিতা নিয়ে বিস্তৃত বিচার করেন। এই প্রকরণটি 'মঙ্গলবাদ' নামে অভিহিত। এরপর 'প্রামাণ্যবাদ' নামে প্রকরণটি রচনা করেন। এই প্রকরণে জ্ঞানের প্রামাণ্য নিয়ে বিস্তৃত বিচার করা হয়েছে।

১.৪ গ্রন্থকারের পরিচিতি

গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায় দর্শনের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তিনি নব্য ন্যায়ের প্রধান প্রবর্তক। অনেকে উদয়নকে নব্য-ন্যায়ের প্রবর্তক বললেও বস্তুতঃ গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থেই নব্য-

ন্যায়ের সামগ্রিক রূপটি বিবৃত হয়েছে। এই জন্যই গঙ্গেশকে নব্য ন্যায়ের রূপকার ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক বলা হয়। তার দর্শনচিন্তাকে কেন্দ্রকরেই নব্য ন্যায়ের বিস্তৃতি। বঙ্গবাসীর মতে গঙ্গেশোপাধ্যায় বাঙ্গালী, কিন্তু মিথিলাবাসী; এবং মিথিলাবাসীগণের মতে তিনি মৈথিলী ও মিথিলাবাসী উভয়ই। গঙ্গেশের জন্মস্থান উত্তর ভারতের মিথিলায়, যা বর্তমানে বিহারের অন্তর্ভুক্ত। প্রসিদ্ধি আছে, গঙ্গেশ জন্মগ্রহণ করেন ও বড় হয়ে ওঠেন 'চাদানা' নামক গ্রামে। কিন্তু তিনি উদয়নের গ্রাম কারিয়ন, যা দ্বারভাঙ্গা থেকে পশ্চিম-পূর্বদিকে ১২ মাইলদূরে অবস্থিত, সেখানে তার পরবর্তী জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও কাশ্যপ গোত্রীয় ছিলেন। তিনি কোন অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। প্রসিদ্ধি আছে, তার দুটি স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তিন পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন বর্ধমান উপাধ্যায়। গঙ্গেশ সম্পর্কে নানাবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত থাকলেও ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা শিক্ষক।

১.৫ নব্য ন্যায়ে প্রামাণ্য

১.৫.১ ন্যায়শাস্ত্র পাঠের প্রয়োজন

ন্যায়মতে পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। এ বিষয়ে মহর্ষি গোতম সূত্রকার মহর্ষি কণাদকে অনুসরণ করেছেন। বৈশেষিক মতে, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছটি তত্ত্বের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা যে জ্ঞান, তাই হ'ল পদার্থসমূহের তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান থেকেই অপবর্গ প্রাপ্তি হয়। কিন্তু মহর্ষি গোতম **ন্যায়সূত্র** গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রে বলেছেন, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতন্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান - এই ষোলটি তত্ত্বের যথাযথ জ্ঞান হলে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভ হয়। মহর্ষি অক্ষপাদ ন্যায়দর্শনের প্রথম প্রবক্তা। গোতম মুনির অন্য নাম অক্ষপাদ। মাধবাচার্য তাঁর **সর্বদর্শনসংগ্রহ** গ্রন্থে ন্যায়দর্শনকে 'অক্ষপাদদর্শন' বলেছেন। সম্ভবতঃ গঙ্গেশের পর হতেই 'গোতমীয় দর্শন' বা 'অক্ষপাদীয় দর্শন' ন্যায়দর্শন নামে পরিচিত হয়। গোতম প্রবর্তিত ন্যায়দর্শন 'আন্বীক্ষিকী' নামেও অভিহিত হয়। 'ঈক্ষা' শব্দের অর্থ 'মনন'। প্রত্যক্ষ ও আগমের দ্বারা ঈক্ষিত বিষয়ের পুনরায় ঈক্ষাকে 'অন্বীক্ষা' বলে। অন্বীক্ষা এই দর্শনের উদ্দেশ্য বলেই একে 'আন্বীক্ষিকী' বলে। এই আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রকে তর্কশাস্ত্রও বলা হয়।

প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় পন্ডিত সমাজে আঠারো প্রকার বিদ্যাস্থানের কথা বলা হয়েছে। এই আঠারো প্রকার বিদ্যাস্থান হল - ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, যর্জুবেদ, অথর্ববেদ এই চারটি বেদ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ - এই ছয়টি বেদাঙ্গ, মীমাংসা দর্শন, ন্যায়দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র। এই আঠারো প্রকার বিদ্যাস্থানের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। ন্যায়দর্শন কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা নয়। 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে কৌটিল্য ন্যায়শাস্ত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মানাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা"। অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্র সকল বিদ্যার প্রদীপ, সকল কর্মের উপায় ও সকল ধর্মের আশ্রয়। ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি পদার্থকে অবলম্বন করে অন্যান্য বিদ্যা তাদের নিজ নিজ তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছে। আবার ন্যায়শাস্ত্র যেহেতু সকল কর্মের উপায়, সেহেতু ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী পরিশোধিত প্রমাণাদির দ্বারাই অন্য বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকাশিত হয়। এছাড়া, ন্যায়শাস্ত্র সকল ধর্মের অনুষ্ঠানে রক্ষক। ন্যায়বিদ্যার দ্বারা বিচারপূর্বক কর্তব্য কর্ম নির্ণয় করে পুরুষ বহু কষ্টসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকে। মোক্ষপ্রাপ্তি ন্যায় শাস্ত্রপাঠের মুখ্য প্রয়োজন হলেও এর লৌকিক উপযোগিতাও রয়েছে। তাই ন্যায়শাস্ত্রকে সকল শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয় ।

১.৫.২ প্রমাণতত্ত্ব উপপাদন মণিকারের উদ্দেশ্য

(মূল) তত্র প্রেক্ষাবত্প্রবৃত্ত্যর্থং প্রমাণাদিষোড়শপদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ইত্যাদাবসূত্রয়ৎ। তেষ্বপি প্রমাণাধীনা সর্বেষাং ব্যবস্থিতিরিতি প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে।
(অনু) (মোক্ষলাভের হেতু তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষী) বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের ন্যায়শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জন্য প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ হয় ইহা (মহর্ষি গোতম) প্রথম সূত্রে (ন্যায় সূত্র ১.১.১) বলিয়াছেন। সকল পদার্থের প্রতিপাদন প্রমাণের অধীন বলিয়া (শাস্ত্রে উদ্দিষ্ট) প্রমাণাদি ষোলটি পদার্থের মধ্যে কেবল প্রমাণ পদার্থ এখানে (আলোচ্য গ্রন্থে) বিবেচিত হইবে।

মোক্ষলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের ন্যায়শাস্ত্রে প্রবৃত্তির জন্য সূত্রকার মহর্ষি গোতম প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতে মুক্তি লাভ হয় এ কথা প্রথম সূত্রে বলেছেন। ন্যায়শাস্ত্র যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক তা এই সূত্রে প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রাচীন ন্যায়ে গোতম ষোলটি পদার্থ আলোচনা করেছেন। আর নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় তার **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থে প্রধানত প্রমাণতত্ত্ব উপপাদন করেছেন।

গঙ্গেশ প্রাচীন নৈয়ায়িক গোতম সম্মত পনেরোটি পদার্থ পরিহার করলেন কেন ইহা এখানে বিবেচ্য। বৌদ্ধ ও প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পরস্পর পরস্পরের মত খন্ডন করেন এবং এর ফলে প্রাচীন ন্যায় ও বৌদ্ধ তর্কবিদ্যার বিশেষ বিস্তার ঘটে। কিন্তু উদয়নাচার্যের **ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, আত্মতত্ত্ববিবেক, তাৎপর্যপরিশুদ্ধি, লক্ষণাবলী** প্রভৃতি গ্রন্থে বৌদ্ধমত সম্পূর্ণভাবে খন্ডিত হয়। বৌদ্ধমত খন্ডিত হওয়ার ফলে নৈয়ায়িকগণের কোন প্রতিপক্ষ না থাকায় ন্যায়শাস্ত্রের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এখানেই প্রাচীন ন্যায়ের অবসান ঘটে। আর আচার্য উদয়নকেই প্রাচীন ন্যায়ের সর্বশেষ নৈয়ায়িক বলা হয়।

অদ্বৈতবেদান্তীগণের প্রমেয়তত্ত্বের ওপর বল্লভাচার্য তাঁর **ন্যায়লীলাবতী** গ্রন্থে নানাবিধ আপত্তি উদ্ভাবন করেন। আর শ্রীহর্ষ তার **খন্ডনখন্ডখাদ্য** গ্রন্থে অদ্বৈতমত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়শাস্ত্রের ষোলটি পদার্থ অকাট্য যুক্তিতে খন্ডন করেন। ন্যায়শাস্ত্রের সকল পদার্থের খন্ডন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, এটা উপলব্ধি করেই গঙ্গেশ তাঁর **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থে শুধুমাত্র প্রমাণতত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। গঙ্গেশ প্রবর্তিত এই ন্যায়শাস্ত্রই হল নব্য ন্যায় বা প্রমাণশাস্ত্র।

ন্যায়দর্শনকে প্রাচীনন্যায় ও নব্যন্যায় - এই দুটি স্তরে ভাগ করা যায়। মহর্ষি গোতম থেকে শুরু কওে উদয়ন পর্যন্ত ন্যায়দর্শন হল প্রাচীন ন্যায়দর্শন। প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়ের মূল পার্থক্য হল, প্রাচীন ন্যায়ে গোতমের ষোলটি পদার্থ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু নব্য ন্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল প্রমাণতত্ত্ব। তবে গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি**-তে প্রমাণতত্ত্ব ছাড়াও পদার্থবিদ্যা, গণিতবিদ্যা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ন্যায়ের ভাষা সাবলীল হলেও নব্যন্যায়ের ভাষা জটিলতায় পূর্ণ। এছাড়াও নব্যন্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ। তবে গঙ্গেশের মতবাদ কোন অভিনব মতবাদ নয়; তার মতবাদের বিশেষত্ব হল, সব কিছু সম্বন্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা এবং অভিনব পরিবেশনা।

নব্যন্যায়ের আদিপ্রবর্তক প্রসঙ্গে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শোনা যায় ব্যোমশিবাচার্যের **সপ্তপদার্থী** এই মতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। কারো কারো মতে উদয়নাচার্য নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তক। আবার অন্য সম্প্রদায়ের বক্তব্য, মণিকার গঙ্গেশই নব্য ন্যায়ের প্রথম প্রবক্তা। কেউ কেউ বলেন, দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি নব্যন্যায়ের পথিকৃৎ। তবে এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে যা বিবেচ্য তা হল, নব্যন্যায়ের প্রথম সূচনা হয় উদয়নাচার্যের গ্রন্থসমূহে, নব্যন্যায়ের প্রকৃত স্বরূপটি পাওয়া যায়

গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি**-তে, আর নব্যন্যায়ের চরম পরিণতি ঘটে রঘুনাথ শিরোমণির **দীধিতি**-তে। 'মিথিলায় নব্যন্যায়' ও 'বঙ্গে নব্যন্যায়' - নব্যন্যায়ের এই প্রভেদ রয়েছে। এর কারণ হল গঙ্গেশের নব্যন্যায়ে প্রাচীন ন্যায়ের তুলনায় খুব বেশী অভিনব মতবাদ স্বীকৃত না হলেও রঘুনাথের নব্যন্যায়ে অনেক নতুন মতবাদের উল্লেখ রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থকেও নব্যন্যায় বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, গঙ্গেশ কেন ন্যায় সম্প্রদায়ের স্বীকৃত ষোলটি পদার্থকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র প্রমাণতত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন? এর উত্তরে গঙ্গেশ বলেন, প্রমেয়াদি পদার্থের নিশ্চয় প্রমাণের নিশ্চয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রমাণতত্ত্বের নিশ্চয়কে বাদ দিয়ে প্রমেয়াদি পদার্থের নিশ্চয় সম্ভব নয়। এখানেই প্রমাণতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা। তাই গঙ্গেশ অপ্রামাণ্যবাদীদের সমস্ত আপত্তি খন্ডন করে প্রমাণতত্ত্ব বিশ্লেষণেই সর্বাধিক প্রাধান্য দেন।

১.৫.৩ 'প্রামাণ্য' শব্দের অর্থ

ভারতীয় দর্শনে আমাদের জ্ঞান কখনো যথার্থ বা সত্য হয়, আবার কখনো অযথার্থ বা মিথ্যা হয়। জ্ঞান যথার্থ হলে তাকে প্রমা বলে। আর জ্ঞান অযথার্থ হলে তা অপ্রমা হয়। যে জ্ঞান প্রমা হয়, তাতে প্রমাত্ব থাকে, আর যে জ্ঞান অপ্রমা হয় তাতে অপ্রমাত্ব থাকে। প্রমাত্ব হল প্রামাণ্য এবং অপ্রমাত্ব হল অপ্রামাণ্য।

'প্রামাণ্য' শব্দটি 'প্রমাণ' শব্দের সাথে ষ্ণ্য প্রত্যয় যোগ করে নিষ্পন্ন হয়েছে। প্রমাণ শব্দটি প্রমাজ্ঞানের করণ ও প্রমা এই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'অনট্' প্রত্যয়টি করণ বাচ্যে ব্যবহৃত হলে প্রমাণ শব্দটির অর্থ হয় প্রমার করণ (প্রমীয়তে অনেন ইতি)। আর ভাববাচ্যে ব্যবহৃত হলে প্রমাণ শব্দটির অর্থ হয় প্রমাত্ব (প্রমায়াঃ ভাবঃ)। 'প্রমীয়তে যৎ তৎ' এই ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী গঠিত 'প্রমাণ' শব্দ প্রমাজ্ঞানকে বোঝায়। সুতরাং প্রামাণ্য শব্দটি প্রমাকরণত্ব ও প্রমাত্ব এই দুটি অর্থেই প্রযুক্ত হয়। প্রামাণ্য বলতে বোঝায় বিষয়কে প্রকাশ করার যোগ্যতা বা সামর্থ্য। প্রামাণ্য প্রমাণে থাকে এবং তা প্রমাজ্ঞানে অনুবর্তিত হয়। তবে প্রামাণ্যবাদ প্রকরণে প্রামাণ্য বলতে প্রমাত্বকে বোঝায়, প্রমাকরণত্বকে নয়।

ভারতীয় দর্শনে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি সম্পদায় প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করেন। তাই এই সকল সম্প্রদায় প্রামাণ্যবাদী। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনগণও প্রমাণের প্রামাণ্য সমর্থন করেন। প্রমাণের সংখ্যা নিয়ে এই সব দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও তার প্রামাণ্যে সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ই একমত হয়েছেন। কিন্তু মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও **তত্ত্বোপপ্লবসিংহ** এর প্রণেতা জয়রাশি ভট্ট প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এরা অপ্রামাণ্যবাদী। গঙ্গেশ এখানে মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মত খন্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন।

১.৬ প্রামাণ্যজ্ঞানের উপযোগিতা

(মূল) অথ কিং প্রামাণ্যজ্ঞানেন? প্রবৃত্তিমাত্রে তস্য ব্যভিচারাৎ। বহুবিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যে প্রবৃত্তিশ্চাবশ্যকার্থনিশ্চয়াদেব।

(অনু) আচ্ছা বল, প্রামাণ্যজ্ঞানের কি প্রয়োজন? (অর্থাৎ প্রামাণ্যজ্ঞানের কোনও উপযোগিতা নেই।) যেহেতু সামান্যতঃ প্রবৃত্তির প্রতি উহার ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। বহু বিত্তসাধ্য, বহু ব্যয়সাধ্য এবং বহু কষ্টসাধ্য কর্মে আবশ্যিক অর্থনিশ্চয় হইতেই (পুরুষের) প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক ও অদ্বৈতবেদান্তী প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। এদের প্রামাণ্যবাদী বলা হয়। আবার চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। প্রামাণ্যবাদীরা বলেন, প্রতিটি সফল প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রামাণ্যের জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে। ফলে যে কোন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রামাণ্যের জ্ঞানকে কারণ বলতে হবে।

১.৬.১ অপ্রামাণ্যবাদীর আক্ষেপ

মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও জয়রাশি প্রভৃতি বৈতন্ডিকরা প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এরা অপ্রামাণ্যবাদী। অপ্রামাণ্যবাদীরা বলেন, কোন প্রমাণ বিষয়কে নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করতে পারে না। ফলে প্রামাণ্যের জ্ঞান না থাকলেও কোন অসুবিধা হয় না। জ্ঞাতা পুরুষ কোন বিষয়কে নিশ্চিতভাবে না জেনেও তাতে প্রবৃত্ত হতে পারে। প্রবৃত্তির প্রতি প্রামাণ্যের জ্ঞান কারণ নয়। অর্থের নিশ্চয়ই পুরুষের প্রবৃত্তির কারণ। বিষয়ের সঠিক নিশ্চয় হলেই পুরুষ কোন কিছু গ্রহণে বা বর্জনে প্রবৃত্ত হয়। তাই বহু বিত্তসাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য কিংবা বহু ব্যয়সাধ্য কোন কর্মে ব্যক্তি যে প্রবৃত্ত হয় সেখানেও প্রামাণ্যের নিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ না মেনে অর্থনিশ্চয়কেই কারণ বলতে হবে।

কোন একজন কৃষক যখন কর্ষণকার্যে প্রবৃত্ত হয় তখন সে ফল অবশ্যই পাবে এরূপ জ্ঞানে প্রবৃত্ত হয় না। বরং ফল পাওয়ার আশায় বা সম্ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়। একইভাবে যুদ্ধে অবশ্যই জয়ী হব এই নিশ্চিত জ্ঞান নিয়ে কোন যোদ্ধা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। যুদ্ধে তার জয়ের আশা বা সম্ভাবনা থাকে এই ধারণা নিয়েই সে যুদ্ধকার্যে নিয়োজিত হয়।

কিন্তু প্রামাণ্যবাদীরা বলেন, প্রামাণ্য জ্ঞান না থাকলে বহুবিত্তসাধ্য ও বহুশ্রমসাধ্য কর্মে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় না। যেমন জন্মান্তরে বা লোকান্তরে ফলের কামনায় যে যাজ্ঞিকগণ কর্মে প্রবৃত্ত হন, সেই স্থলে শ্রুতিবাক্যের জ্ঞানের ওপর প্রামাণ্যজ্ঞান না থাকলে প্রবৃত্ত হতে পারে না। তাই প্রামাণ্যবাদী বলেন, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্তি ঘটে না। প্রবৃত্তির প্রতি ইষ্টসাধনতার জ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান কারণ। এভাবে প্রামাণ্যবাদীরা বলেন, জন্মান্তরে ও লোকান্তরে ফলের কামনায় বহু বিত্তসাধ্য ও শ্রমসাধ্য কর্মে প্রবৃত্তি প্রামাণ্য জ্ঞান ছাড়া হয় না।

প্রামাণ্যবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে অপ্রামাণ্যবাদী বলেন, জ্ঞান বা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ নয়, অর্থনিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ। অর্থের নিশ্চয় জ্ঞান হলেই বহুশ্রমসাধ্য ও বহুবিত্তসাধ্য কর্মে মানুষের প্রবৃত্তি ঘটে।

১.৬.২ প্রবৃত্তির কারণ অর্থনিশ্চয়, প্রামাণ্যনিশ্চয় নয়

(মূল) ন চ যস্য সংশয়ব্যতিরেকনিশ্চয়ৌ প্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধকৌ তন্নিশ্চয়স্তদ্ধেতুঃ অনুমিতৌ ব্যাপ্তেরিবেতি বাচ্যম্।

তৎসন্দেহে সত্যর্থসন্দেহেনার্থানিশ্চয়াদেবা প্রবৃত্তেঃ
তত্র তয়োরপ্রতিবন্ধকত্বাৎ।

(অনু) যাহার সংশয় এবং অভাব-নিশ্চয় (যে স্থলে) প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয়, উহার নিশ্চয় ঐ প্রবৃত্তির কারণ হয়; যেমন অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান (কারণ হয়)। (প্রামাণ্যবাদী গঙ্গেশের) এইরূপ মত সঙ্গত নহে। (জ্ঞানের) প্রামাণ্যে সংশয় জাগিলে (উহার) বিষয়ে সংশয় হওয়ায়

বিষয়ের নিশ্চয় না থাকিবার জন্য প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু প্রামাণ্যের সংশয় ও অভাব-নিশ্চয় প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় না। (ইহাই এখানে অপ্রামাণ্যবাদীর বক্তব্য)।

গঙ্গেশের **তত্ত্বচিন্তামণি**-র প্রামাণ্যবাদ প্রকরণে প্রামাণ্যজ্ঞানের উপযোগিতা প্রদর্শন প্রসঙ্গে অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের মত বিধৃত করা হয়েছে। অপ্রামাণ্যবাদীর মতে, প্রামাণ্য নিশ্চয় নিষ্প্রয়োজন, অর্থ নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ।

প্রামাণ্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকগণ প্রামাণ্যজ্ঞানের উপযোগিতা স্বীকার করেন। তারা বলেন, প্রামাণ্যের জ্ঞান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। এই প্রসঙ্গে যে সার্বিক নিয়মটি দেখানো হয়েছে তা হল - যার সংশয় কোন কিছুর প্রতিবন্ধক হয়, তার নিশ্চয় সেই বিষয়ের কারণ হয়। সামগ্রী উপস্থিত থাকলে যা কার্যের উৎপত্তিতে বাধা সৃষ্টি করে তাকে প্রতিবন্ধক বলে। কোন বিষয়ে সংশয় থাকলে তাতে কারও প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই সংশয়ের অভাবকে সেই স্থলে প্রবৃত্তির কারণ বলতে হবে। যেমন, যে কার্যের প্রতি যেটি প্রতিবন্ধক হয়, ঐ প্রতিবন্ধকের অভাব ঐ কার্যের প্রতি কারণ হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব হল সকল কার্যের সাধারণ কারণ। অনুরূপভাবে যার অভাব নিশ্চয় প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয়, তার নিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ হয়। যেমন অনুমিতি জ্ঞানের স্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। নব্য নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তির স্মরণকে করণ বলেন। কিন্তু প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেন। তবে ব্যাপ্তি স্মরণের কারণতা উভয় নৈয়ায়িক সম্প্রদায় সমর্থন করেন। ব্যাপ্তিতে সংশয় থাকলে অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এজন্য ব্যাপ্তির সংশয়কে অনুমিতি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলা হয়। ব্যাপ্তির সংশয় অনুমিতির প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যাপ্তির নিশ্চয়কে অনুমিতির কারণ বলতে হবে। আবার ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অভাব থাকলে অনুমিতিজ্ঞান প্রতিরুদ্ধ হয়। তাই ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অভাবের অভাবও অনুমিতির কারণ হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব যেহেতু কার্যের কারণ হয়, সেহেতু এস্থলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অনুমিতির কারণ বলতে হবে। এই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের সার্বিক নিয়মটি প্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবধ্য - প্রতিবন্ধকভাবের স্থলেও প্রযোজ্য। প্রামাণ্যবাদীরা বলেন, প্রবৃত্তির প্রতি প্রামাণ্যের সংশয় প্রতিবন্ধক। ঘটজ্ঞানে প্রামাণ্য আছে কিনা এরূপ সংশয় থাকলে ঘটার্থী ব্যক্তির ঘটে প্রবৃত্তি হয় না। কাজেই ঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য সংশয় ঘটে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। এজন্য ঘটজ্ঞানের প্রামাণ্যনিশ্চয় ঘটে প্রবৃত্তির কারণ। আরও বলা যায় যে 'ঘটজ্ঞানটি প্রমা নয়' - এরূপ প্রামাণ্য নিশ্চয়ের অভাব থাকলেও বা অপ্রামাণ্যের নিশ্চয় থাকলেও ঘটার্থী ব্যক্তির ঐ স্থলে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ঘটজ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় বা ঘটজ্ঞানের অপ্রামাণ্য নিশ্চয়ের অভাবকে প্রবৃত্তির কারণ বলতে হবে। ইহাই এস্থলে প্রামাণ্যবাদীর বক্তব্য।

এখানে অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ আপত্তি করতে পারেন, আলোচ্য সার্বিক নিয়ম অনুযায়ী অর্থনিশ্চয়কেই প্রবৃত্তির কারণ বলা চলে। প্রামাণ্যবাদীরা বলেছেন, যার সংশয় বা অভাব নিশ্চয় যার প্রতি প্রতিবন্ধক হয়, তার নিশ্চয় তার প্রতি কারণ। অপ্রামাণ্যবাদী বলেন, প্রামাণ্যজ্ঞানে সংশয় থাকলে বিষয়ে সংশয় দেখা দেবে। কাজেই প্রামাণ্যের সংশয়কে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক স্বীকার না করে অর্থের সংশয়কেই প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক স্বীকার করতে হবে। সুতরাং প্রামাণ্যের নিশ্চয়কে প্রতিবন্ধকের অভাব না বুঝে অর্থের নিশ্চয়কেই প্রতিবন্ধকের অভাব বলা যেতে পারে। তাই পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী অর্থের সংশয় প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক ও অর্থের নিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ। কাজেই প্রামাণ্যজ্ঞানকে প্রবৃত্তির কারণ স্বীকার না করে অর্থের নিশ্চয়কেই প্রবৃত্তির কারণ বলা যুক্তিসংগত হবে। ইহাই অপ্রামাণ্যবাদীর আক্ষেপ।

১.৬.৩ গঙ্গেশের সিদ্ধান্ত

(মূল) **ন। প্রামাণ্যসংশয়ানন্তরমিদমিত্থমেবেত্যবধারণস্য নিষ্কম্পপ্রবৃত্ত্যঙ্গস্য প্রামাণ্যনিশ্চয়াধীনত্বাৎ।**

(অনু) ইহা (অপ্রামাণ্যবাদীর আপত্তি) যুক্তিসঙ্গত নয়। যেহেতু (কোন জ্ঞানের) প্রামাণ্যে সংশয় হইবার পর নিষ্কম্প (অর্থাৎ দ্বিধাহীন) প্রবৃত্তির অঙ্গস্বরূপ 'ইহা এইরূপ' এইভাবে জ্ঞানের যে নিশ্চয় হয় উহা প্রামাণ্যের নিশ্চয়ের অধীন (অর্থাৎ জ্ঞানের নিশ্চয় প্রামাণ্যের নিশ্চয় ব্যতিরেকে হয় না)।

গঙ্গেশ তার প্রামাণ্যবাদ প্রকরণে, অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধের আপত্তির বিরুদ্ধে বলেন, অর্থনিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ হতে পারে না। তিনি বলেন, অপ্রামাণ্যবাদী কখনো কখনো অর্থনিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ বললেও নিষ্কম্প প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে অর্থনিশ্চয়কে প্রবৃত্তির কারণ বলতে পারবে না। দ্বিধাহীন প্রবৃত্তি হল নিষ্কম্প প্রবৃত্তি। আমাদের কখনো দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় আবার কখনো দ্বিধাহীন অবস্থায় প্রবৃত্তি হয়। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় পুরুষের প্রবৃত্তি ঘটলে, ঐ প্রবৃত্তির কারণ অর্থের নিশ্চয় হতে পারে। কিন্তু দ্বিধাহীন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রামাণ্যের নিশ্চয়ই প্রবৃত্তির কারণ হবে। যখন কোন জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় উৎপন্ন হয় তখন প্রামাণ্যের নিশ্চয় না হওয়া পর্যন্ত সংশয় থেকেই যায়। তাই প্রামাণ্যের নিশ্চয় হলে প্রামাণ্যে সংশয়দূরীভূত হয়, এর ফলে নিষ্কম্প প্রবৃত্তি জন্মায়। তাই প্রামাণ্যনিশ্চয় নিষ্কম্প প্রবৃত্তির অঙ্গ। সুতরাং যে স্থলে প্রামাণ্যের সংশয় দেখা দেয়, সেইস্থলে ঐ সংশয়ের পর প্রামাণ্যের নিশ্চয় না হলে পুরুষের নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হয় না। 'ঘটজ্ঞানটি প্রমা কি না' এরূপ সংশয় থাকলে 'ঘটজ্ঞানটি প্রমা' এই জ্ঞান না হওয়ায় ঘটার্থী ব্যক্তির ঘটে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং কোন জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় হবার পর 'এটি এইরূপ' এভাবে অবধারণাত্মক জ্ঞান না উৎপন্ন হলে নির্দ্বিধায় কোন প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং নির্দ্বিধায় প্রবৃত্তির স্থলে প্রামাণ্যজ্ঞানের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে - ইহাই মণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বক্তব্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, প্রামাণ্যবাদ প্রকরণের শেষে গঙ্গেশ বলেছেন, প্রামাণ্যের জ্ঞান সর্বত্র প্রবৃত্তির কারণ হয় না। কারণ, প্রামাণ্যের জ্ঞান না থাকলেও সফল প্রবৃত্তি হয়। যেমন যেখানে জ্ঞান উৎপত্তির পর ঝটিতি প্রবৃত্তি হয়, সেক্ষেত্রে প্রামাণ্যের কোন জ্ঞান থাকে না, অথচ প্রবৃত্তি সার্থক হয়। তাই সার্থক প্রবৃত্তি হতে হলে পুরুষের প্রামাণ্যের জ্ঞান আবশ্যক নয়, জ্ঞানে প্রামাণ্য স্বরূপতঃ থাকলেই হবে। গঙ্গেশ এই প্রকরণের পরিশেষে বলেছেন, প্রামাণ্যের জ্ঞান প্রবৃত্তির কারণ নয়, অপ্রামাণ্যের জ্ঞানের অভাবই প্রবৃত্তির কারণ।

১.৭ সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ন্যায়ে প্রমাণ পদার্থ আলোচিত হলেও নব্য ন্যায়ে প্রমাণতত্ত্ব বিশদভাবে বিবেচিত হয়েছে। গঙ্গেশ নব্য ন্যায়ের প্রধান প্রবর্তক। তিনি **তত্ত্বচিন্তামণি** গ্রন্থে প্রমাণতত্ত্ব উপপাদন করেছেন। প্রামাণ্য বলতে প্রমাকরণত্ব ও প্রমাত্ব উভয়কে বোঝালেও প্রামাণ্যবাদের প্রেক্ষাপটে প্রামাণ্য শব্দের দ্বারা প্রমাত্ব বিবক্ষিত হয়ে থাকে। অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের আপত্তি বিশ্লেষণ করে গঙ্গেশের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রামাণ্যজ্ঞানের উপযোগিতা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থনিশ্চয় স্থলবিশেষে প্রবৃত্তির কারণ হলেও উহা সকল প্রবৃত্তির কারণ হয় না। প্রামাণ্যনিশ্চয়ই প্রবৃত্তিমাত্রের কারণ। কোন জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় দেখা দিলে প্রামাণ্যের জ্ঞান না থাকলে দ্বিধাগ্রস্ত প্রবৃত্তি হতে পারে, নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হয় না। নিষ্কম্প প্রবৃত্তির জন্য প্রামাণ্যের জ্ঞান আবশ্যক।

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

প্রামাণ্য

'প্রমাণ' শব্দ থেকে 'প্রামাণ্য' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন প্রমাণ শব্দ প্রমাজ্ঞানের করণকে বোঝায়। ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন প্রমাণ শব্দ প্রমাজ্ঞানকে বোঝায়। সুতরাং প্রমাকরণত্ব ও প্রমাত্ব - এই দুই অর্থেই প্রামাণ্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। মীমাংসক মতে, জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী হতে প্রামাণ্য উৎপন্ন হয় ও জ্ঞানের ভাসক সামগ্রীর দ্বারা প্রামাণ্য জ্ঞাত হয়। ন্যায় মতে প্রামাণ্য জ্ঞানের উৎপাদক সামগ্রী জন্য নয়, গুণজন্য এবং জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রী দ্বারা প্রামাণ্য জ্ঞাত নয়, অতিরিক্ত প্রমাণ হতে জ্ঞাত হয়।

অর্থনিশ্চয়

অর্থ বলতে ঘটাদি জ্ঞেয় বিষয়কে বোঝায়। বিষয়ের নিশ্চয়তাই হল অর্থনিশ্চয়। অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধরা প্রবৃত্তির প্রতি প্রামাণ্যনিশ্চয়কে কারণ বলেন না। জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় হলে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। সুতরাং অর্থের সংশয় প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। যে কার্যের যেটি প্রতিবন্ধক, ঐ প্রতিবন্ধকের অভাব ঐ কার্যের কারণ হয়। অর্থের সংশয় প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক। কাজেই অর্থের নিশ্চয় প্রবৃত্তির কারণ। এ কথা অপ্রামাণ্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধরা বলেন।

নিষ্কম্প প্রবৃত্তি

ইষ্টসাধনতার জ্ঞান ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান হতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রবৃত্তি দুপ্রকার - দ্বিধাগ্রস্ত প্রবৃত্তি ও নির্দ্বিধায় প্রবৃত্তি। দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় যে সব প্রবৃত্তি জন্মায় তা কখনো সফল ও কখনো বিফল হয়ে থাকে। কিন্তু নিষ্কম্প প্রবৃত্তি সব সময় সফল হয়। দ্বিধাহীন প্রবৃত্তিকে নিষ্কম্প প্রবৃত্তি বলে। জ্ঞানের প্রামাণ্যে সংশয় হলে প্রামাণ্যের নিশ্চয় হওয়ার পর প্রামাণ্য সংশয় দূরীভূত হলে নিষ্কম্প প্রবৃত্তি হয়।

১.৯ নমুনা - প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Does *arthaniœcaya* produce activity? Explain Gaṅgeœa's position, refuting the objection of the opponent.

Short Type

1. What is *prāmāòya*?
2. What is the purpose of study of Nyāya philosophy?

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. উপাধ্যায় গঙ্গেশ, **তত্ত্বচিন্তামণি**, প্রত্যক্ষ খন্ড, প্রথম ভাগ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, মোতীলাল বনারসী দাস, বারাণসী (১৯৭৪)
2. Bhattacharya Amarnath, "*Pratyakºācintamaòi (Prāmānyavāda)*" in 'Darshan - Manjari', The University of Burdwan Journal of Philosophy, vol.-7, Burdwan (2004)
3. Mohanty J. N., *Gaṅgeśa's Theory of Truth*, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi (2006)

ইউনিট - ২ ঃ মীমাংসক মতে প্রামাণ্যের জ্ঞান ও স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ

পাঠ পরিকল্পনা

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

২.২ জ্ঞপ্তিপক্ষে মীমাংসক মত

২.২.১ স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য

২.২.২ জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত

২.২.৩ উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব

২.৩ মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ

২.৩.১ মীমাংসক মতে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ

২.৩.২ নব্য নৈয়ায়িক গদাধরের মতে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৬ নমুনা-প্রশ্নাবলী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ পাঠের উদ্দেশ্য

প্রামাণ্যবাদের দুটি আলোচ্য বিষয় - প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি। এই দুটি বিষয়ই স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব উভয়পক্ষে বিবেচিত হয়। স্বতস্ত্ব বলতে অন্যকে অপেক্ষা না করা ও পরতস্ত্ব বলতে অন্যকে অপেক্ষা করা বোঝায়। উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব এবং মীমাংসক ও নব্য নৈয়ায়িক গদাধরের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

২.২ জ্ঞপ্তিপক্ষে মীমাংসক মত

(মূল) ননু স্বত এবাস্তু তন্নিরূপণম্।

(অনু) যদি বল, প্রামাণ্যের জ্ঞান স্বতঃই (অর্থাৎ নিজ হইতে অথবা নিজজাতীয় হইতে) নিরূপিত হউক্।

আলোচ্য পঙ্‌ক্তিটিতে গঙ্গেশ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণের মত উত্থাপন করেছেন। প্রামাণ্যের পরতস্ত্ব উপপাদিত হলেই অপ্রামাণ্যবাদীর মত ও প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব এই উভয়পক্ষই নিরাকৃত হবে। এই অভিপ্রায়ে গঙ্গেশ মাধ্যমিকগণের মত খন্ডন করে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদীর মত উপস্থাপন করেছেন।

২.২.১ স্বতঃ প্রামাণ্য ও পরতঃ প্রামাণ্য

জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞান-সামগ্রী হতে উৎপন্ন হয় কিনা - এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনে দুটি ভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এর একটিকে বলা হয় স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ এবং অপরটিকে বলা হয় পরতঃ প্রামাণ্যবাদ। 'স্বতঃ' শব্দের অর্থ পরানপেক্ষ। আর 'পরতঃ' শব্দের অর্থ পরাপেক্ষ। প্রামাণ্যবাদের আলোচনার দুটি দিক - প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি। প্রামাণ্যের উৎপত্তিপক্ষে আলোচনা করা হয়, কিভাবে প্রামাণ্য জ্ঞানে উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞপ্তিপক্ষে আলোচিত হয়, কিভাবে প্রামাণ্য জ্ঞাত হয়। উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয় পক্ষেই প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব বিবেচিত হয়ে থাকে। উৎপত্তিগত স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ অনুযায়ী প্রামাণ্য নিজের উৎপত্তিতে জ্ঞানের উৎপাদকসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত কোন আবশ্যিক শর্তকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু উৎপত্তিগত পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অনুযায়ী প্রামাণ্য নিজের উৎপত্তিতে গুণ নামক অতিরিক্ত শর্তকে অপেক্ষা করে। জ্ঞপ্তিগত পরতঃপ্রামাণ্যবাদে বলা হয়, প্রামাণ্য জ্ঞানের গ্রাহক হতে অতিরিক্ত কোন প্রকাশক হতে জ্ঞাত হয়। জ্ঞপ্তিগত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদে স্বীকার করা হয় যে, প্রামাণ্য জ্ঞানের গ্রাহকের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। কাজেই উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিগত স্বতঃপ্রামাণ্যে পরানপেক্ষত্ব এবং উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিগত পরতঃপ্রামাণ্যে পরাপেক্ষত্ব থাকে। মীমাংসকগণ উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্যকে পরানপেক্ষ বলেন। আর নৈয়ায়িকগণ উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্যকে পরাপেক্ষ বলে। এজন্যই মীমাংসকগণকে স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী ও নৈয়ায়িকগণকে পরতঃপ্রামাণ্যবাদী বলা হয়।

২.২.২ জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত

বিভিন্ন ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায় জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, তেমনি জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়েও তাদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এবিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মত উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সাংখ্যমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং স্বতঃই গৃহীত হয়।
বৌদ্ধমতে জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ উৎপন্ন হয় ও পরতঃ গৃহীত হয়।
মীমাংসামতে জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতঃ উৎপন্ন ও স্বতঃ গৃহীত হয়।
ন্যায়মতে জ্ঞানের প্রামাণ্য পরতঃ উৎপন্ন ও পরতঃ গৃহীত হয়।

সুতরাং দেখা যায় যে, জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ পরস্পর বিপরীত দুটি মত পোষণ করেন।

২.২.৩ উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তিতে প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব ও পরতস্ত্ব

উৎপত্তিগত স্বতঃ প্রামাণ্য

যে সকল শর্ত থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদি ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য ঐ সকল শর্ত থেকে একই সাথে উৎপন্ন হয়, তাকে উৎপত্তিগত স্বতঃ প্রামাণ্য বলে। স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী মীমাংসক বলেন, প্রামাণ্য গুণজন্য নয়, উহা পরাপেক্ষ নয়। উহা স্বতঃসিদ্ধ। আপ্তপ্রণীতত্বরূপ গুণ হতে উৎপন্ন না হওয়ায় বেদবাক্য অপ্রমাণ হতে পারে। সেজন্য মীমাংসকগণ বলেন, জ্ঞানের প্রামাণ্য জ্ঞানের উৎপাদক সমষ্টি (কারণকূট) হতে জ্ঞানের সাথেই উৎপন্ন হয়। প্রামাণ্য হল জ্ঞানের স্বীয় বিষয়নিশ্চায়ক সামর্থ্য। উহা

জ্ঞানের শক্তিস্বরূপ। ওই সামর্থ্য অন্য কোন কারণ হতে জন্মায় না। একই উৎপাদক সামগ্রী হতে জ্ঞানের সাথে প্রামাণ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। ইহাই হল প্রামাণ্যের উৎপত্তিগত স্বতস্ত্ব বা পরানপেক্ষতা।

উৎপত্তিগত পরতঃ প্রামাণ্য

যে সকল শর্ত থেকে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় যদি ঐ সকল শর্ত হতে জ্ঞানের প্রামাণ্য উৎপন্ন না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত শর্ত অর্থাৎ গুণের প্রয়োজন হয়, তাকেই উৎপত্তিগত পরতঃপ্রামাণ্য বলে। সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের প্রতি, পরামর্শ অনুমিতির প্রতি, শক্যার্থে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ উপমিতির প্রতি এবং শাব্দবোধে যোগ্যতা কিংবা তাৎপর্যের প্রমাজ্ঞানই গুণ। ইহাকেই উৎপত্তিগত পরাপেক্ষতা বলে।

জ্ঞপ্তিগত স্বতঃপ্রামাণ্য

জ্ঞানের যা প্রকাশক উহা যদি জ্ঞানের প্রামাণ্যের প্রকাশক হয়, তবে তাকে জ্ঞপ্তিগত স্বতঃপ্রামাণ্য বলে। তবে জ্ঞানের প্রকাশ নিয়ে মীমাংসক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রভাকর মীমাংসকগণ স্বপ্রকাশবাদী। এরা ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদ মানেন। এই মতে, জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞান এই তিনটি একই প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায়। তবে ঘটাদি বিষয় জ্ঞেয়রূপে, আত্মা জ্ঞানের আশ্রয়রূপে এবং জ্ঞান জ্ঞানরূপে জ্ঞাত হয়। এরা বলেন, যে ভাসক সামগ্রী বিষয়কে প্রকাশ করে উহাই জ্ঞানের প্রকাশের কারণ। বিষয়ের গ্রাহক জ্ঞানের প্রকাশের ন্যায় প্রামাণ্যেরও প্রকাশক হয়। কুমারিল ভট্ট ও তার অনুগামীরা জ্ঞানকে পরপ্রকাশ বলেন। এই মতে জ্ঞান অনুমেয়। জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতির দ্বারা প্রাথমিক ব্যবসায় জ্ঞান জানা যায়। জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি হল জ্ঞানের গ্রাহক এবং তা জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও গ্রাহক। মুরারি মিশ্র পরপ্রকাশবাদ মানেন। তবে তার মতে জ্ঞান অনুমেয় নয়, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। অনুব্যবসায় নামক মানসজ্ঞানের দ্বারা ব্যবসায় জ্ঞান জ্ঞাত হয়। জ্ঞানের গ্রাহক অনুব্যবসায় প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়। জ্ঞানের প্রকাশ নিয়ে মতভেদ থাকার জন্যই মীমাংসকগণের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদে এরূপ মতভেদ দেখা যায়।

জ্ঞপ্তিগত পরতঃপ্রামাণ্য

জ্ঞানের যা প্রকাশক তা প্রামাণ্যের প্রকাশক হয় না, প্রামাণ্য অতিরিক্ত অনুমান প্রমাণ হতে জানা যায়। প্রবৃত্তি সফল হলে তা হতে জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমিত হয়। একথা ন্যায়-বৈশেষিকরা বলেন। ন্যায় মতে জ্ঞানের প্রকাশক অনুব্যবসায় ও প্রামাণ্যের প্রকাশক সফলপ্রবৃত্তিহেতুক অনুমিতি।

গঙ্গেশ **তত্ত্বচিন্তামণি**-তে নব্যন্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের পরতঃ প্রামাণ্য স্থাপন করেন। নব্যমতে অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায় জ্ঞান গৃহীত হয়। অনুব্যবসায় মনোজন্য জ্ঞান। ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায় জ্ঞানের বিষয়। অনুব্যবসায় একপ্রকার মানসপ্রত্যক্ষ। এই জ্ঞান মনঃসংযোগরূপ লৌকিক এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলৌকিক উভয় সন্নিকর্ষ হতে জন্মায়। পরতঃ প্রামাণ্যবাদী গঙ্গেশ বলেন, অনুব্যবসায় নামে মানসজ্ঞান ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশ করে, কিন্তু তার প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে না। জ্ঞানের প্রামাণ্য সফল প্রবৃত্তি হতে অনুমিত হয়। একেই বলে জ্ঞপ্তিগত পরতঃ প্রামাণ্য।

২.৩ মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ

২.৩.১ মীমাংসক মতে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ

প্রামাণ্যের জ্ঞান কীভাবে হয় - ইহা জ্ঞপ্তিগত প্রামাণ্যবাদে আলোচিত হয়ে থাকে। পরতঃ প্রামাণ্যবাদী ন্যায় বৈশেষিক বলেন, প্রথমে জ্ঞান জ্ঞাত হয়, পরে তার প্রামাণ্য অন্য প্রমাণের দ্বারা জানা যায়। ইহাকে জ্ঞপ্তিগত পরতস্ত্ব বলে। কিন্তু স্বতঃ প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণ বলেন, জ্ঞান ও তার

প্রামাণ্য একই ভাসকসামগ্রী দ্বারা যুগপৎ প্রকাশিত হয়। ইহাই হল প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব বা প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তিগত পরানপেক্ষতা। স্বতস্ত্ববাদীর মতে, জ্ঞানের প্রকাশকই প্রামাণ্যের প্রকাশক হয়। জ্ঞানের প্রকাশক হতে অতিরিক্ত কোনও জ্ঞান প্রামাণ্যের জ্ঞানে অপেক্ষিত নয়।

প্রামাণ্যের 'স্বতস্ত্ব' বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করা আবশ্যক। 'নিজ হতে' কিংবা 'নিজজাতীয় হতে' ইহাই স্বতঃ শব্দের অর্থ। প্রথমটিকে 'স্বস্মাৎ'-পক্ষ ও দ্বিতীয়টিকে 'স্বকীয়াৎ'-পক্ষ বলা হয়। প্রভাকর মীমাংসকগণ 'স্বস্মাৎ'-পক্ষ এবং ভাট্টমীমাংসক ও মুরারি মিশ্র 'স্বকীয়াৎ'-পক্ষ সমর্থন করেন। প্রভাকর মীমাংসকগণ বলেন, প্রামাণ্য 'নিজ হতে' প্রকাশিত হয়, বস্তুতঃ ইহা অর্থবহ নয়। প্রভাকর মীমাংসকগণ ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদ মানেন। তাঁদের মতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ। উহা বিষয়, জ্ঞান ও জ্ঞানের আশ্রয়কে যুগপৎ প্রকাশ করে। তবে উহা বিষয়কে সংবেদ্যরূপে, আত্মাকে আশ্রয়রূপে এবং নিজেকে সংবিৎরূপে প্রকাশ করে। ইহাকে ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদ বলে। প্রভাকর মতে যাহা জ্ঞানের উৎপাদকসামগ্রী উহাই হল জ্ঞানে প্রামাণ্যের উৎপাদক সামগ্রী। ঐ একই সামগ্রী জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ করে এবং ঐ সামগ্রী জ্ঞানকেও প্রকাশ করে। এ মতে বিষয়ের প্রকাশকই জ্ঞানের প্রকাশক এবং উহাই ঐ জ্ঞানে প্রামাণ্যের প্রকাশক। ইহাই হল, 'স্বস্মাৎ' - পক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ।

কুমারিল ভট্ট ও তার অনুগামীগণ এবং মুরারি মিশ্রের মতে 'স্বকীয়াৎ'-পক্ষ অনুযায়ী স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ হল - প্রামাণ্য নিজজাতীয় হতে প্রকাশিত হয়। ভাট্ট ও মুরারি বলেন, জ্ঞানের যে গ্রাহক, উহা প্রামাণ্যেরও গ্রাহক হয়। কিন্তু জ্ঞানের গ্রাহক নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ভাট্ট ও মুরারি পরঃপ্রকাশবাদী। তবে মুরারির মতে প্রাথমিক জ্ঞান অনুব্যবসায়গ্রাহ্য। ব্যবসায় জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলে। ইহা একপ্রকার মানসজ্ঞান। মুরারি বলেন, লৌকিক সন্নিকর্ষ হতেই এই মানসজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তার মতে, জ্ঞানের গ্রাহক অনুব্যবসায় প্রামাণ্যেরও গ্রাহক। জ্ঞানের প্রামাণ্য সজাতীয় অনুব্যবসায় দ্বারাই গৃহীত হয়। ইহাই হল মুরারির মতে জ্ঞপ্তিপক্ষে প্রামাণ্যের পরানপেক্ষতা। কিন্তু ভাট্টগণ বলেন, জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানের দ্বারা প্রাথমিক ব্যবসায় জ্ঞান অনুমিত হয়। 'জ্ঞাততা' শব্দের অর্থ 'প্রাকট্য'। কোনও বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হলে ঐ বিষয়ে 'জ্ঞাততা' নামক ধর্ম উৎপন্ন হয়। ঐ জ্ঞাততা হতে বিষয়ের পূর্ববর্তী জ্ঞান অনুমিত হয়। ঐ জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি প্রাথমিক জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। সুতরাং ভাট্ট মতে জ্ঞানের গ্রাহক জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হয়। ইহাই হল ভাট্ট মতে 'স্বকীয়াৎ' - পক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ।

২.৩.২ নব্যনৈয়ায়িক গদাধরের মতে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ

গদাধর ভট্টাচার্য্য **প্রামাণ্যবাদ** - **গাদাধরী**-তে দীধিতিকারের সম্মত 'স্বস্মাৎ' ও 'স্বকীয়াৎ' এই উভয় পক্ষকে দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দে 'স্ব' শব্দটিকে প্রামাণ্য ও প্রামাণ্যের জ্ঞান - এই দুই প্রকার অর্থে ধরে স্বতঃ প্রামাণ্যবাদীগণের 'স্বস্মাৎ' ও 'স্বকীয়াৎ' - এই দুই পক্ষ বিশ্লেষণ করেছেন। 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্য ধরলে 'স্বস্মাৎ'-পক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অর্থ হবে - প্রামাণ্য নিজ হতে ও 'স্বকীয়াৎ' পক্ষে প্রামাণ্য নিজ জাতীয় হতে গৃহীত হয়। এই পক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের অনুগত লক্ষণ হবে - 'স্বাশ্রয়গ্রাহকগ্রাহ্যত্ব'। কিন্তু প্রাভাকরগণ জ্ঞানের কোনও গ্রাহক স্বীকার করেন না। তারা জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলেন। প্রভাকর মতে বিষয়ের গ্রাহকই জ্ঞানের গ্রাহক। প্রাভাকরগণ বলেন, যে সামগ্রী জ্ঞান উৎপন্ন করে ঐ সামগ্রী জ্ঞানে প্রামাণ্য উৎপন্ন করে, ঐ সামগ্রী বিষয়কে প্রকাশ করে, ঐ সামগ্রী জ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং ঐ একই সামগ্রী জ্ঞানের প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে। সুতরাং প্রামাণ্য বিষয়ের গ্রাহকের দ্বারা গৃহীত হয় - ইহাই এই পক্ষে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ। 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্য ধরলে 'স্বকীয়াৎ' পক্ষে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ হবে - প্রামাণ্য নিজের আশ্রয় প্রাথমিক জ্ঞানের

গ্রাহক সজাতীয় জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এখানে ভাট্টমীমাংসকগণ সজাতীয় জ্ঞান বলতে জ্ঞাততালিঙ্গক-অনুমিতিকে এবং মুরারি মিশ্র অনুব্যবসায় জ্ঞানকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং ভাট্ট মতে, জ্ঞানের গ্রাহক সজাতীয় জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতির দ্বারা এবং মুরারির মতে, জ্ঞানের গ্রাহক সজাতীয় অনুব্যবসায় জ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্য গৃহীত হয়। ইহাই হল 'স্বকীয়াৎ'-পক্ষে 'স্বাশ্রয়গ্রাহকগ্রাহ্যত্ব' শব্দের অর্থ।

গদাধর ভট্টাচার্য 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্যের জ্ঞান ধরেও 'স্বস্মাৎ' ও 'স্বকীয়াৎ' এই উভয়পক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' শব্দের বৈকল্পিক অর্থ দেখিয়েছেন। 'স্বস্মাৎ'-পক্ষ প্রভাকর মীমাংসকগণের সমর্থিত। 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্যের জ্ঞান ধরলে এই মতে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের অর্থ হবে - 'স্ববিষয়কজ্ঞানসাক্ষাৎকারবিষয়ত্ব'। এখানে 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্যের জ্ঞান এবং 'বিষয়' শব্দের অর্থ প্রামাণ্যের আশ্রয় প্রাথমিকজ্ঞানের বিষয়। প্রামাণ্য যেমন প্রামাণ্যজ্ঞানের বিষয় হয় তেমনই প্রাথমিকজ্ঞানের বিষয়ও প্রামাণ্যজ্ঞানের বিষয় হয়। সেজন্য এখানে গদাধর 'বিষয়' বলতে ঘটাদি বিষয়কে বুঝিয়েছেন। বিষয়ের প্রকাশের সাথে জ্ঞান এবং তার প্রামাণ্যও প্রকাশিত হয়। এজন্য স্বতোগ্রাহ্যত্ব বলতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের সাক্ষাৎকারের বিষয়ত্বকে বোঝায়। 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্যের জ্ঞান বুঝলে 'স্বকীয়াৎ'-পক্ষে ভাট্ট ও মুরারির সম্মত 'স্বতোগ্রাহ্য' পদের অনুগত অর্থ হবে - 'স্ববিষয়কজ্ঞানসজাতীয়জ্ঞানবিষয়ত্ব'। পূর্বোক্ত রীতিতে এস্থলে 'স্ব' বলতে প্রামাণ্যের জ্ঞানকে, বিষয় বলিতে ঘটাদিবস্তুকে, জ্ঞান বলিতে ওই বিষয়ের প্রাথমিকজ্ঞানকে এবং সজাতীয়জ্ঞান বলতে ওই প্রাথমিকজ্ঞানের গ্রাহক জ্ঞাততালিঙ্গক-অনুমিতি কিংবা অনুব্যবসায়কে বুঝতে হবে। ভাট্টমতে, সজাতীয় জ্ঞানটি হল অনুমিতি জ্ঞান এবং মুরারির মতে প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রামাণ্যের জ্ঞান প্রাথমিক জ্ঞানের সজাতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়-ইহাই এইপক্ষে 'স্বতোগ্রাহ্য' পদের অর্থ।

২.৪ সারসংক্ষেপ

জ্ঞানে প্রামাণ্যের উৎপত্তি কিভাবে হয় ও কিভাবেই বা প্রামাণ্য জানা যায় তা প্রামাণ্যবাদ প্রকরণে আলোচিত হয়ে থাকে। এবিষয়ে স্বতঃপ্রামাণ্য ও পরতঃপ্রামাণ্য এই দুটি মতবাদ প্রসিদ্ধ। স্বতস্ত্ব বলতে বোঝায় পরকে অপেক্ষা না করা। আর পরতস্ত্ব বলতে বোঝায় পরকে অপেক্ষা করা। নৈয়ায়িকগণ প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয় স্থলেই পরতস্ত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু মীমাংসকেরা উৎপত্তি ও জ্ঞপ্তি উভয়স্থলেই প্রামাণ্যকে স্বতঃ বলেন। প্রাভাকর মীমাংসক স্বস্মাৎ পক্ষ ও ভাট্ট এবং মুরারি স্বকীয়াৎ পক্ষ স্বীকার করেন। উভয়পক্ষে প্রামাণ্যের অনুগত লক্ষণ হল 'স্বাশ্রয়গ্রাহকগ্রাহ্যত্ব'। গদাধরের মতে প্রামাণ্য ও প্রামাণ্যের জ্ঞান উভয়কে 'স্ব' শব্দের অর্থ ধরে স্বস্মাৎ ও স্বকীয়াৎ পক্ষে স্বতোগ্রাহ্য শব্দের চার প্রকার অর্থ হতে পারে।

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

অনুব্যবসায়

ব্যবসায় বলতে সবিকল্পক জ্ঞানকে বোঝায়। এটি এক প্রকার বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ - এই তিনটি ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয়। অনুব্যবসায় ব্যবসায় জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান। ব্যবসায় জ্ঞান যেমন বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি অনুব্যবসায় ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশ করে। এটি একপ্রকার মানস

জ্ঞান। পরপ্রকাশবাদী নৈয়ায়িক ও মীমাংসক মুরারি মিশ্র অনুব্যবসায় জ্ঞানকে ব্যবসায় জ্ঞানের প্রকাশক বলেন। অনুব্যবসায় অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় হয় না।

জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি

কোন বিষয় জ্ঞাত হলে ঐ বিষয়ে জ্ঞাততা নামক ধর্ম জন্মায়। একথা ভাট্ট মীমাংসকেরা বলেন। ভাট্টমতে জ্ঞান এক প্রকার ক্রিয়া। তাই জ্ঞান হতে বিষয়ে জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়। যেখানে যেখানে বিষয়ে জ্ঞাততা জন্মায় ঐ সব স্থলে ঐ সব বিষয়ের জ্ঞান পূর্বে থাকে। এইভাবে ভাট্টরা দেখিয়ে থাকেন যে সর্বত্র জ্ঞাততা হতে পূর্ববর্তীজ্ঞান অনুমিত হয়। একেই জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি বলে। ভাট্ট মতে জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি জ্ঞানের ও তার প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়।

ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষ

প্রভাকর মীমাংসকরা ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। এদের মতে ঘটাদি বিষয়, আত্মা ও জ্ঞান - এই তিনটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়। তবে ঘটাদি বিষয় জ্ঞেয় রূপে, জ্ঞান জ্ঞান রূপে ও আত্মা জ্ঞানের আশ্রয় রূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়। যে জ্ঞানে যেটি বিষয় হয় তারা সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। কাজেই ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষদ অনুযায়ী জ্ঞেয় বিষয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা - এই তিনটি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়।

২.৬ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Explain the Bhatta position that *pramanya* of a cognition is known by *jnatatalingakanumiti*.

Short Type

1. Distinguish between *svatastva* and *paratastva*.
2. What is *anuvyavasaya*?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. উপাধ্যায় গঙ্গেশ, **তত্ত্বচিন্তামণি**, প্রত্যক্ষ খন্ড, প্রথম ভাগ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, মোতীলাল বনারসী দাস, বারাণসী (১৯৭৪)
2. Bhattacharya Amarnath, "*Pratyaksacintâmani (Prâmânyavâda)*" in 'Darshan - Manjari', The University of Burdwan Journal of Philosophy, vol.-7, Burdwan (2004)
3. Mohanty J. N., *Gangeœa's Theory of Truth*, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi (2006)

ইউনিট - ৩ ঃ জ্ঞানপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপত্তি

পাঠ পরিকল্পনা

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য

৩.২ 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ

৩.৩ জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যে প্রথম বিপ্রতিপত্তি

- ৩.৩.১ প্রথম বিপ্রতিপত্তি বাক্যটির তাৎপর্যার্থ
- ৩.৩.২ 'যাবৎ' শব্দের সার্থকতা
- ৩.৩.৩ 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' শব্দ যোজনার উপযোগিতা
- ৩.৩.৪ 'সামগ্রী' পদটির তাৎপর্য

৩.৪ সকল জ্ঞানের প্রামাণ্যে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তি

- ৩.৪.১ বিপ্রতিপত্তি বাক্যের অর্থ
- ৩.৪.২ বিধিপক্ষের অর্থ
- ৩.৪.৩ নিষেধপক্ষের অর্থ

৩.৫ সামান্যত জ্ঞানের প্রামাণ্যে তৃতীয় বিপ্রতিপত্তি

- ৩.৫.১ বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ
- ৩.৫.২ বিপ্রতিপত্তি বাক্যটির অর্থ
- ৩.৫.৩ 'এব' শব্দের সার্থকতা
- ৩.৫.৪ প্রামাণ্যের আশ্রয় নির্ণয়

৩.৬ জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যে চতুর্থ বিপ্রতিপত্তি

- ৩.৬.১ বিপ্রতিপত্তিবাক্য প্রদর্শন
- ৩.৬.২ বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ বিচার
- ৩.৬.৩ 'প্রত্যেকমেব বা' অংশের তাৎপর্য

৩.৭ সিদ্ধসাধন দোষ ও তার সমাধান

৩.৮ পঞ্চম বিপ্রতিপত্তি বিশ্লেষণ

৩.৯ সারসংক্ষেপ

৩.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.১১ নমুনা - প্রশ্নাবলী

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ পাঠের উদ্দেশ্য

প্রামাণ্য বিচারের পূর্বে প্রামাণ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে জিজ্ঞাসা থাকা আবশ্যক। জিজ্ঞাসা আবার সংশয়কে অপেক্ষা করে। কাজেই শিক্ষার্থীর মনে সংশয় জাগিয়ে জানার ইচ্ছা উৎপন্ন করতে পারলে তবেই বিচারে প্রবৃত্তি হয়। এজন্য বিপ্রতিপত্তির স্বরূপ এবং জ্ঞানসামান্যের প্রামাণ্য ও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপত্তি বাক্যসমূহের সাথে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.২ 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ

প্রতিপত্তি শব্দের অর্থ জ্ঞান। বিপ্রতিপত্তি শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ জ্ঞান। সংশয়জনক বাক্যকে 'বিপ্রতিপত্তিবাক্য' বলে। সিদ্ধান্তপক্ষ বিচার করার যেমন পদ্ধতি আছে, তেমনি পূর্বপক্ষের পরীক্ষাও আবশ্যক। যে কোন বিষয়ে বিচার করতে হলে ঐ বিষয়ে সংশয় থাকা আবশ্যক; কেননা সংশয় না থাকলে বিচারের কোন প্রসঙ্গই আসে না। এইজন্য বাদী ও বিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষ শুনে মধ্যস্থ বা উদাসীন তৃতীয় ব্যক্তির মনে সংশয় জাগে। একে বিপ্রতিপত্তি বলে। যে বাক্য থেকে সংশয় জন্মায় তাকে 'বিপ্রতিপত্তিবাক্য' বলা হয়। তবে বিপ্রতিপত্তি বলতে সংশয় ও সংশয়জনক বাক্য উভয়কেই বোঝায়। বিপ্রতিপত্তি বাক্য উদ্ভাবন করলে পাঠকের মনে সংশয় দেখা দেয়। তখন তার মনে জিজ্ঞাসা হয়। এর ফলে সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য সংশয়কে বিচারের অঙ্গ বলে। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয়ের জনক হওয়ায় তাকেও বিচারের অঙ্গ বলা হয়। বাৎস্যায়ন একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধধর্মের নিশ্চয়কে বিপ্রতিপত্তি বলেছেন। যেমন আত্মা নিত্য, আত্মা অনিত্য - এইরূপ বিরুদ্ধ জ্ঞান। একই আত্মায় নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব এই দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে না। তবে অন্যত্র ভাষ্যকার সংশয়জনক বিরুদ্ধার্থক বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তি বলেছেন। পরবর্তী নৈয়ায়িকগণও বিরুদ্ধার্থের বোধক একটি বাক্যকেই 'বিপ্রতিপত্তিবাক্য' বলেছেন। 'আত্মা নিত্যো নবা' এইরূপ বাক্যই হল বিপ্রতিপত্তি বাক্য। সংশয় সর্বদা প্রত্যক্ষ হয়, পরোক্ষজ্ঞান সংশয়াত্মক হয় না। সুতরাং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলেছেন, বিপ্রতিপত্তিবাক্য হতে মানস সংশয়ই জন্মায়। বিপ্রতিপত্তি বাক্য উভয়কোটির স্মারক হয়ে সংশয়ের প্রযোজক হয়। কাজেই যে কোন গ্রন্থে বিচার করার পূর্বে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করা হয়। বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন করে বিচার করার রীতি উদয়নের **ন্যায়কুসুমাঞ্জলি** ও **আত্মতত্ত্ববিবেক** এবং শ্রীহর্ষের **খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে** দেখা যায়। তাদের রীতি অনুসরণ করে গঙ্গেশ প্রামাণ্যের প্রকাশ নিয়ে বিপ্রতিপত্তিবাক্য উদ্ভাবন করেন ও পরে তার বিচার করেন।

৩.৩ জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যে প্রথম বিপ্রতিপত্তি

৩.৩.১ প্রথম বিপ্রতিপত্তি বাক্যটির তাৎপর্যার্থ

(মূল) জ্ঞানপ্রামাণ্যং তদপ্রামাণ্যগ্রাহকযাবজ্জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীগ্রাহ্যং ন বা।

(অনু) জ্ঞানের প্রামাণ্য, যাহা অপ্রামাণ্যের গ্রাহক হয় না জ্ঞানের ঐরূপ ভাসক সামগ্রী হইতে উৎপন্ন সকল জ্ঞানের বিষয় হয় কিনা। (অর্থাৎ অপ্রামাণ্যের গ্রাহক নয় এমন যে জ্ঞানের গ্রাহক, প্রামাণ্য ঐ গ্রাহকের সামগ্রীজন্য জ্ঞানের বিষয় হয় কি না? এটিই প্রথম বিপ্রতিপত্তি)।

গঙ্গেশ প্রামাণ্যের জ্ঞপ্তিপক্ষে যে পাঁচটি বিপ্রতিপত্তিবাক্য বিধৃত করেছেন তাদের মধ্যে প্রথম চারটি সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্য এবং শেষটি জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। আলোচ্য বিপ্রতিপত্তিটি প্রথম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি অনেকেই উদ্ভাবন করে বিচার করেছেন। এ স্থলে

বিধিপক্ষটি মীমাংসকগণের ও নিষেধপক্ষটি নৈয়ায়িকগণের সম্মত। বিধিপক্ষে বলা হয়েছে, 'প্রামাণ্য জ্ঞানের গ্রাহক সামগ্রীর দ্বারা প্রকাশিত হয়'। আর নিষেধপক্ষে বলা হয়েছে, 'প্রকাশিত হয় না'। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে প্রামাণ্য বলতে প্রমাত্বকে বোঝানো হয়েছে। মীমাংসকরা বলেন, জ্ঞান ও তার প্রামাণ্য একই সাথে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের প্রকাশের সামগ্রী আর প্রামাণ্যের প্রকাশের সামগ্রী একই। প্রাভাকর, ভাট্ট ও মুরারি মিশ্র সকলেই স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী হলেও জ্ঞানের গ্রাহক নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে জ্ঞান ও তার প্রামাণ্য একই গ্রাহক সামগ্রীর দ্বারা প্রকাশিত হয় — ইহা সকল মীমাংসকই স্বীকার করেন। স্বপ্রকাশবাদী প্রাভাকরগণ জ্ঞানের গ্রাহক না মানলেও বিষয়ের গ্রাহককেই তারা জ্ঞানের গ্রাহক বলে থাকেন। যে সামগ্রী বিষয়কে প্রকাশ করে উহাই জ্ঞানকে প্রকাশ করে এবং ঐ একই সামগ্রী জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। পরপ্রকাশবাদী ভাট্টগণ বলেন, জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি জ্ঞান ও তার প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়। মুরারির মতে, অনুব্যবসায় জ্ঞানকে যেমন প্রকাশ করে তেমনই উহার প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। মীমাংসকগণ বলেন, জ্ঞান জ্ঞাত হলে তার প্রামাণ্য অজ্ঞাত থাকে না; একই প্রকাশসামগ্রীর দ্বারা তার প্রকাশ ঘটে।

৩.৩.২ 'যাবৎ' শব্দের সার্থকতা

বিপ্রতিপত্তিতে 'যাবৎ' শব্দটির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ। 'যাবৎ' শব্দের অর্থ সকল। 'গ্রাহ্য' শব্দের অন্তর্গত 'গ্রহ' শব্দের সাথে 'যাবৎ' শব্দটির অন্বয় হবে। কাজেই 'সকল জ্ঞানের গ্রাহক' এটি বিপ্রতিপত্তির অর্থ নয়। 'জ্ঞানের গ্রাহকসামগ্রী হতে উৎপন্ন সকল জ্ঞানের বিষয়' — এটিই এখানে বিবক্ষিত অর্থ। 'যাবৎ' শব্দটি বিপ্রতিপত্তিতে প্রদত্ত না হলে ন্যায়মত বিধিপক্ষে অনুপ্রবিষ্ট হত। কারণ নৈয়ায়িকগণ স্থলবিশেষে জ্ঞানের গ্রাহককে প্রামাণ্যের গ্রাহক বলেন। যে স্থলে অনুমিতি জ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্য অনুমিত হয় সেই স্থলে প্রাথমিকজ্ঞান ও উহার প্রামাণ্য যুগপৎ ঐ অনুমানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'যাবৎ' শব্দটি প্রয়োগের ফলে বিধিপক্ষে ন্যায়মতের অনুপ্রবেশ ঘটে না। কারণ ন্যায়মতে সকল স্থলে জ্ঞানের গ্রাহক ও প্রামাণ্যের গ্রাহক এক হয় না। কিন্তু মীমাংসক মতে প্রামাণ্য সর্বদা জ্ঞানের গ্রাহকের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। একথা বোঝানোর জন্যই এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যে 'যাবৎ' শব্দটি দেওয়া হয়েছে এবং সামগ্রীজন্য জ্ঞানের সাথে অন্বয় করে এর অর্থ বুঝতে হবে। মীমাংসার প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বলেন, জ্ঞানের প্রকাশসমষ্টি হতে যে সব জ্ঞান জন্মায়, প্রামাণ্য তাদের সকলের বিষয় হয়। মীমাংসক মতে, 'জ্ঞানগ্রাহকসামগ্রীজন্য যাবজ্জ্ঞান বিষয়ত্ব' প্রামাণ্যে থাকে। এখানে প্রাভাকর মতে, বিষয়ের গ্রাহকই জ্ঞানের গ্রাহক। ভাট্টমতে, জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি জ্ঞানের গ্রাহক। আর মিশ্র মতে, অনুব্যবসায় জ্ঞানের গ্রাহক। যারাই জ্ঞানের গ্রাহক তারাই প্রামাণ্যের গ্রাহক হয় - এটি বিধিপক্ষের অর্থ।

৩.৩.৩ 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' শব্দ যোজনার উপযোগিতা

প্রথম বিপ্রতিপত্তিতে যে 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' পদটি দেওয়া হয়েছে তার বিশেষ উপযোগিতা আছে। বিপ্রতিপত্তিতে 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' পদটি প্রযুক্ত না হলে বিধিপক্ষ নিরর্থক হত। অনেকস্থলে জ্ঞানের গ্রাহকসমষ্টি অপ্রামাণ্যের গ্রাহক হয় বলে তার ব্যাবৃত্তির জন্য বিপ্রতিপত্তিতে 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। "ক' নামে জ্ঞানটি অযথার্থ, যেহেতু ..." ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের অপ্রামাণ্য অনুমিত হয়। এই অনুমিতি জ্ঞানটি 'ক' নামে জ্ঞানের গ্রাহকও বটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের গ্রাহক যেমন প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়, তেমনি জ্ঞানের গ্রাহক কখনও কখনও অপ্রামাণ্যেরও গ্রাহক হয়। এই অসুবিধাটি এড়ানোর জন্যই বিপ্রতিপত্তিতে 'তদপ্রামাণ্যাগ্রাহক' এই পদটি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

জ্ঞানের যে গ্রাহক অপ্রামাণ্যের গ্রাহক হয় না এইরূপ গ্রাহকসমষ্টি হতে উৎপন্ন সকল জ্ঞান প্রামাণ্যের গ্রাহক হয় - ইহা বিধিপক্ষের ফলিতার্থ।

৩.৩.৪ 'সামগ্রী' পদটির তাৎপর্য

প্রথম বিপ্রতিপত্তিতে 'সামগ্রী' পদটিরও বিশেষ তাৎপর্য আছে। এখানে পুনরায় আশঙ্কা হতে পারে, প্রাথমিক জ্ঞানের গ্রাহক যেমন সজাতীয় অন্য জ্ঞান হয় তেমনি আত্মাও জ্ঞানের গ্রাহক হয়। কাজেই প্রাথমিক জ্ঞানকে আত্মা প্রকাশ করে একথা বলা চলে। সমস্ত জ্ঞান আত্মায় থাকে। সেজন্য আত্মা সকল জ্ঞানের গ্রাহক। কিন্তু আত্মায় যে সকল জ্ঞান থাকে তারা সকলেই প্রাথমিক জ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন ভাট্ট মতে জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি ও মুরারির মতে অনুব্যবসায় প্রাথমিক জ্ঞানের প্রকাশক হয়। এমনকি, প্রাভাকরের মতেও প্রাথমিক জ্ঞান নিজের প্রকাশের জন্য অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। এই অসুবিধাদূর করার জন্য 'সামগ্রী' শব্দ যোজিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, যে সকল শর্ত মিলিতভাবে জ্ঞানকে প্রকাশ করে তারাই প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে। কাজেই প্রাথমিক জ্ঞানের গ্রাহকসামগ্রীজন্য জ্ঞান প্রাথমিক জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়। সুতরাং যে সকল আবশ্যিক শর্ত মিলিতভাবে কোনও জ্ঞানকে প্রকাশ করে তারাই ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে ইহাই এখানে বিধিপক্ষের অর্থ।

৩.৪ সকল জ্ঞানের প্রামাণ্যে দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তি

৩.৪.১ বিপ্রতিপত্তি বাক্যের অর্থ

(মূল) তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞানগ্রাহ্যং ন বা।

(অনু) (জ্ঞানের প্রামাণ্য) ঐ (প্রামাণ্যের আশ্রয়) জ্ঞানের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন নহে এইরূপ (অজন্য) জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় কিনা।

'প্রাথমিক জ্ঞান যে জ্ঞানের বিষয় হয় ঐ জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্য গৃহীত হয় কিনা' ইহা দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির অর্থ।

'প্রামাণ্য গৃহীত হয়' — এটি বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ, 'প্রামাণ্য গৃহীত হয় না' - এটি নিষেধপক্ষ। প্রাভাকর, ভাট্ট এবং মুরারি মিশ্র বিধিপক্ষ সমর্থন করেন এবং নৈয়ায়িকগণ নিষেধপক্ষ সমর্থন করেন।

৩.৪.২ বিধিপক্ষের অর্থ

এই বিপ্রতিপত্তিতে 'তজ্‌জ্ঞান' বলতে যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বিবেচিত হবে ঐ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। ঐ জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানকে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান' বলে। অর্থাৎ প্রামাণ্যের আশ্রয় জ্ঞান যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান' বলা হয়। যেমন - 'তজ্‌জ্ঞান' বলতে যদি ১নং জ্ঞানকে বুঝি, তাহলে ২নং জ্ঞানটি হবে তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। তবে তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে মীমাংসকদের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাভাকরগণ বলেন, প্রাথমিক জ্ঞানই হচ্ছে তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। ভাট্টরা বলেন, জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। কিন্তু মুরারি বলেন, অনুব্যবসায় হচ্ছে তজ্‌জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান।

যে জ্ঞান তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞান হতে উৎপন্ন হয় না, ঐ জ্ঞান প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে ইহা বিধিপক্ষের অর্থ। 'তজ্‌জ্ঞান' বলতে ১নং জ্ঞানকে বুঝলে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞান' হবে ২নং জ্ঞান। ঐ ২নং জ্ঞান হতে উৎপন্ন হয় না এরূপ অনেক জ্ঞান আছে। এদের মধ্যে ২নং জ্ঞান নিজেও নিজ হতে উৎপন্ন হয় না বলে ২নং জ্ঞানকেই এখানে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞান' বলা হয়েছে। ভাট্ট মতে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞান' হল জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি, প্রাভাকর মতে বিষয়ের ভাসক এবং মুরারির মতে অনুব্যবসায়। ঐ তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞান প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে। ইহাই এই স্থলে বিধিপক্ষের পর্যবসিত অর্থ।

৩.৪.৩ নিষেধপক্ষের অর্থ

নৈয়ায়িকগণের সম্মত নিষেধপক্ষটি বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ন্যায়মতে 'তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞান' বলতে অনুব্যবসায়কে বুঝতে হবে। অনুব্যবসায় হল প্রাথমিক জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান। অনুব্যবসায় হতে উৎপন্ন হয় না এমন কোন জ্ঞান প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে না - ইহা নিষেধ পক্ষের অর্থ। ন্যায়মতে অনুব্যবসায় জ্ঞান হতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রামাণ্যের প্রকাশক হয়। অনুব্যবসায় হবার পর জ্ঞাতা পুরুষের সার্থক প্রবৃত্তি ঘটলে ঐ সকল প্রবৃত্তি হতে ব্যবসায় জ্ঞানের প্রামাণ্য অনুমিত হয়। সফল প্রবৃত্তি হল প্রামাণ্যের অনুমাপক। ঐ সফল প্রবৃত্তিলিঙ্গক অনুমিতি অনুব্যবসায় জ্ঞান হতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং তজ্‌জ্ঞানবিষয়কজ্ঞানাজন্যজ্ঞান অর্থাৎ অনুব্যবসায় হতে উৎপন্ন হয় না এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা প্রামাণ্যের প্রকাশ হয় না। ইহাই দ্বিতীয় বিপ্রতিপত্তির নিষেধপক্ষের অর্থ।

৩.৫ সামান্যত জ্ঞানের প্রামাণ্যে তৃতীয় বিপ্রতিপত্তি

৩.৫.১ বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ

(মূল) স্বাশ্রয়গ্রাহকেণ গৃহ্যত এব ন বা।

(অনু) (জ্ঞানের প্রামাণ্য) নিজের আশ্রয় (প্রাথমিক জ্ঞানের) যাবতীয় গ্রাহকের দ্বারা গৃহীত হয় কিনা।

এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যটির নিষেধপক্ষটি নৈয়ায়িকগণ সমর্থন করেন। কিন্তু কারা বিধিপক্ষটি সমর্থন করেন তা নিয়ে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মথুরানাথ তর্কবাগীশ **তত্ত্বচিন্তামণির** ওপর **রহস্য** নামে টীকা লেখেন। তিনি এই টীকায় প্রথমে বলেন, প্রাভাকর, ভাট্ট ও মুরারি এই তিন শ্রেণীর মীমাংসকই বিধিপক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু পরে আবার তিনি বলেন, এখানে বিধিপক্ষটি কেবল মুরারি মিশ্রেরই সম্মত। এখানে মুরারি মিশ্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষটি বিশ্লেষণ করা হবে।

৩.৫.২ বিপ্রতিপত্তিবাক্যটির অর্থ

তৃতীয় বিপ্রতিপত্তিতে 'স্বাশ্রয়গ্রাহক' শব্দটি 'স্ব', 'আশ্রয়' ও 'গ্রাহক' এই তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। বিপ্রতিপত্তিতে 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্য। এখানে 'আশ্রয়' বলতে বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞানের প্রামাণ্য বিবেচিত হবে ঐ জ্ঞানকে। মুরারির দৃষ্টিভঙ্গীতে এখানে 'গ্রাহক' বলতে অনুব্যবসায় জ্ঞানকে বুঝতে হবে। 'গ্রাহক' বলতে জ্ঞানের প্রকাশকে বোঝায়। অনুব্যবসায় একপ্রকার মানস প্রত্যক্ষ। কাজেই মুরারি মিশ্রেরদৃষ্টিতে এখানে স্বাশ্রয়গ্রাহক বলতে স্বাশ্রয়বিষয়ক সাক্ষাত্‌কারকে বোঝায়। মুরারি

বলতে চান, যে অনুব্যবসায় জ্ঞান প্রাথমিক জ্ঞানকে প্রকাশ করে ঐ অনুব্যবসায় প্রাথমিক জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে।

৩.৫.৩ 'এব' শব্দের সার্থকতা

তৃতীয় বিপ্রতিপত্তিতে যে 'এব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার বিশেষ উপযোগিতা আছে। এখানে 'এব' শব্দের অর্থ 'সকল'। 'সকল' শব্দটি গ্রাহক শব্দের সঙ্গে অন্বিত হবে। জ্ঞানের সকল গ্রাহকের দ্বারা প্রামাণ্য জ্ঞান হবে — ইহা বিধিপক্ষের অভিপ্রেত অর্থ। 'এব' শব্দটি প্রযুক্ত না হলে মীমাংসক মত হতে ন্যায় মতের পার্থক্য দেখানো যাবে না। বিধিপক্ষটি নৈয়ায়িকদেরও সম্মত একথা বলা যেতে পারতো। এর ফলে নৈয়ায়িকের মতও এই বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষে অনুপ্রবিষ্ট হবে। নৈয়ায়িকরা বলেন, কোন কোন স্থলে অনুমিতির দ্বারা ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্য গৃহীত হয়। তাঁরা একথা কখনোই বলেন না যে, জ্ঞানের গ্রাহক সর্বত্র প্রামাণ্যের গ্রাহক হবে। কিন্তু মীমাংসকরা বলেন, প্রামাণ্য সবসময় জ্ঞানের গ্রাহকের দ্বারাই গৃহীত হবে। মীমাংসা মতের সাথে ন্যায় মতের এই পার্থক্য বোঝানো জন্য এখানে 'এব' শব্দটি দেওয়া হয়েছে।

৩.৫.৪ প্রামাণ্যের আশ্রয় নির্ণয়

সকল প্রাথমিক জ্ঞানের প্রামাণ্য বিধিপক্ষের লক্ষ্য নয়। সমস্ত প্রাথমিক জ্ঞানেরই জ্ঞান হয় না। যে প্রাথমিক জ্ঞান উৎপন্ন হবার পরই জ্ঞাতা সংজ্ঞাহীন হয়, সে স্থলে অনুব্যবসায় হয় না। আবার একই বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানের স্থলে প্রতিটি প্রাথমিক জ্ঞানের অনুব্যবসায় সম্ভব নয়। সে জন্য টীকাকার মথুরানাথ বলেন, যে জ্ঞানের অনুব্যবসায় হতে পারে ঐ জ্ঞানের প্রামাণ্যই আলোচ্য বিষয়।

৩.৬ জ্ঞানমাত্রের প্রামাণ্যে চতুর্থ বিপ্রতিপত্তি

৩.৬.১ বিপ্রতিপত্তি বাক্য প্রদর্শন

(মূল) স্বাশ্রয়েণ গৃহ্যতে এব ন বেতি প্রত্যেকমেব বা।

(অনু) (জ্ঞানের প্রামাণ্য) নিজের আশ্রয়ের (অর্থাৎ প্রাথমিক জ্ঞানের) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াই থাকে, কিনা। এইপ্রকারে (উক্ত চারটি অথবা) প্রত্যেকটি-ই (সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্যে) বিপ্রতিপত্তি (বুঝিতে হইবে)।

প্রামাণ্য নিজের সকল আশ্রয়ের দ্বারা গৃহীত হয় কিনা? এই চতুর্থ বিপ্রতিপত্তির নিষেধপক্ষ নৈয়ায়িকগণের সম্মত। বিধিপক্ষের সমর্থক প্রসঙ্গে টীকাকারগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মথুরানাথ তর্কবাগীশ প্রামাণ্যবাদের **রহস্য** টীকায় বলেছেন, প্রাভাকর মীমাংসকগণ এই বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষের সমর্থক।

৩.৬.২ বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ বিচার

আলোচ্য বিপ্রতিপত্তিবাক্যটিতে 'স্ব' শব্দের অর্থ প্রামাণ্য। 'আশ্রয়' বলতে ঐ প্রামাণ্যের আশ্রয় জ্ঞানকে বোঝায়। প্রামাণ্যের আশ্রয় জ্ঞানের যা বিষয় তা প্রামাণ্যেরও বিষয় হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের যেটি

গ্রাহক হবে, তা জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও গ্রাহক হবে। সুতরাং প্রাভাকরগণ বলেন, প্রামাণ্যের বিষয় হতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়। ইহা বিধিপক্ষের অর্থ। মথুরানাথ বলেন, বিধিপক্ষের এরূপ অর্থ বুঝলে প্রাভাকরগণের সম্মত স্বতঃপ্রামাণ্যবাদই পাওয়া যাবে। রঘুনাথ শিরোমণি তার **দীধিতি** টীকায় বলেন, কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাদীর সাথে একসঙ্গে বিবাদ করতে পারে না। সেজন্য কেবলমাত্র প্রাভাকর মীমাংসককেই এখানে বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষের সমর্থক বুঝতে হবে। গদাধর ভট্টাচার্য্য তাঁর **গাদাধরী** টীকায় বলেন, যে কোন একটি মীমাংসকের মতকে এখানে বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষরূপে স্বীকার করলেই অভীষ্টসিদ্ধ হয়। সকল মীমাংসকগণের মত বলা নিস্প্রয়োজন।

প্রাভাকর মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ। জ্ঞানের কোন গ্রাহক নেই। জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশসামগ্রীর দ্বারা প্রকাশিত হয়। সেজন্য এখানে 'স্বাশ্রয়' শব্দটি গৃহীত হয়েছে। বস্তুতঃ প্রাভাকর মতে প্রামাণ্যের গ্রাহক জ্ঞানটি প্রামাণ্যের আশ্রয় জ্ঞান থেকে অতিরিক্ত নয়। এজন্য এখানে 'গ্রাহক' শব্দটির উল্লেখ না থাকায়, কেবল 'আশ্রয়' পদটির উল্লেখ থাকায় বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ যে প্রাভাকরগণেরই সম্মত তা প্রতিপন্ন হয়।

টীকাকার মথুরানাথ বিধিপক্ষটি মীমাংসকগণের সম্মত বলে ব্যাখ্যা করলেও কোনও কোনও টীকাকার মনে করেন, বিধিপক্ষে তিন শ্রেণীর মীমাংসকগণের প্রামাণ্যবাদ বিবক্ষিত হয়েছে। মুরারি মিশ্রের মতে 'স্বাশ্রয়গ্রাহকযাবদনুব্যবসায়েন গৃহ্যতে' ইহাই বিধিপক্ষের অভিপ্রেত অর্থ। তাঁর মতে প্রামাণ্য জ্ঞানের গ্রাহক অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয়। যে অনুব্যবসায় ব্যবসায় জ্ঞানকে প্রকাশ করে, সেই অনুব্যবসায় ব্যবসায় জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। বিধিপক্ষটি ভাট্টমতে বিশ্লেষণ করলে তার এরূপ আকার হবে — 'স্বাশ্রয়গ্রাহকযাবজ্জ্ঞাততালিঙ্গকানুমিত্যা গৃহ্যতে'। ভাট্টগণ বলেন, কোন একটি জ্ঞান উৎপন্ন হলে জ্ঞেয় বস্তুতে 'জ্ঞাততা' নামে একটি ধর্ম জন্মায়। জ্ঞাততা জ্ঞানপূর্বক হয় বলে জ্ঞাততা হতে জ্ঞান অনুমিত হয়। এই জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি যেমন জ্ঞানকে প্রকাশ করে, তেমনি জ্ঞানের প্রামাণ্যকেও প্রকাশ করে। এভাবে একদেশী টীকাকারেরা গঙ্গেশের উদ্ভাবিত এই বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষটি তিন শ্রেণীর মীমাংসকের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন।

এখানে আপত্তি হতে পারে যে, জ্ঞান হলে জ্ঞেয় বিষয়ে 'জ্ঞাততা' নামে ধর্ম উৎপন্ন হয় একথা ন্যায়-বৈশেষিকগণ মানেন না। কাজেই স্বাশ্রয়গ্রাহকজ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতির দ্বারা প্রামাণ্যের জ্ঞান হয় না, একথা নৈয়ায়িকগণ কখনও বলবেন না। এজন্য কোন কোন টীকাকার এখানে জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি স্বীকার না করে অনুমিতিমাত্র স্বীকার করেন। এভাবে 'স্বাশ্রয়গ্রাহকানুমিত্যা গৃহ্যতে' এটি হবে বিপ্রতিপত্তিটির বিধিপক্ষের অর্থ।

কিন্তু এরূপ অর্থ স্বীকার করলে অন্য অসঙ্গতি দেখা দেয়। ন্যায়মতে কোন কোন স্থলে অনুমিতি জ্ঞান প্রামাণ্যকে প্রকাশ করে। যেমন 'ক' নামক জ্ঞানটি প্রমা, যেহেতু ... ইত্যাদি অনুমানের দ্বারা এখানে 'ক' নামক জ্ঞানটির প্রামাণ্য জানা যায়। ঐ 'ক' নামক জ্ঞানের গ্রাহকও হচ্ছে এই অনুমিতি জ্ঞান। সুতরাং 'স্বাশ্রয়গ্রাহকানুমিত্যা গৃহ্যতে' এই বিধিপক্ষের মধ্যেই নৈয়ায়িকগণের পরতঃ প্রামাণ্য অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে বিপ্রতিপত্তির যদি কোন নিষেধপক্ষই না থাকে তবে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শনও নিরর্থক হবে। এজন্য টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষের অর্থ করেন - "স্বাশ্রয়গ্রাহকযাবদনুমিত্যা গৃহ্যতে"। প্রামাণ্য তার আশ্রয়ের গ্রাহক সকল অনুমিতির দ্বারাই গৃহীত হবে - এটি ভাট্টমতে বিধিপক্ষের অর্থ। ভাট্টগণ বলেন, জ্ঞানের প্রামাণ্য সর্বদা জ্ঞানের গ্রাহক অনুমিতির দ্বারা গৃহীত হবে। নৈয়ায়িকগণ কোনও কোনও অনুমিতি জ্ঞানকে জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রাহক বলেন।

কিন্তু প্রামাণ্য সবস্থলে অনুমিতির দ্বারাই প্রকাশিত হবে - একথা তারা স্বীকার করেন না। ন্যায়মতে সাধারণত সফল প্রবৃত্তি হতে প্রামাণ্য অনুমিত হয়। সুতরাং দীধিতিকার রঘুনাথ প্রদত্ত বিধিপক্ষের অর্থ স্বীকার করলে বিধিপক্ষে ন্যায়মতের অনুপ্রবেশ ঘটবে না। এর ফলে বিপ্রতিপত্তিটির অর্থ সঙ্গত হবে।

৩.৬.৩ 'প্রত্যেকমেব বা' অংশের তাৎপর্য

বিপ্রতিপত্তিতে 'প্রত্যেকমেব বা' এই অংশটি যোজনা করবার বিশেষ অভিপ্রায় আছে। গঙ্গেশের বক্তব্য হল, উক্ত চারটি বিপ্রতিপত্তি মিলিতভাবে সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় উৎপন্ন করতে পারে। অথবা প্রত্যেকটি বিপ্রতিপত্তি জ্ঞানসামান্যের প্রামাণ্যে সংশয়জনক হতে পারে।

৩.৭ সিদ্ধসাধন দোষ ও তার সমাধান

(মূল) যত্তু যোগজধর্মসামান্যলক্ষণপ্রত্যাসত্ত্যা স্বাশ্রয়প্রামাণ্যং তেনৈব গৃহ্যত ইত্যংশতঃ সিদ্ধসাধনম্, অতো যোগজধর্মাদ্যজন্যত্বং বিশেষণমিতি। তন্ন; পরং প্রত্যসিদ্ধেঃ। প্রামাণ্যমাত্রপক্ষত্বে প্রামাণ্যং স্বাশ্রয়েণ গৃহ্যতে ত্রবেত্যুদ্দেশ্যপ্রতীতেরসিদ্ধেশ্চ নাংশতঃ সিদ্ধসাধনম্।

(অনু) কেহ বলিতে পারেন যে, (যোগীগণের অলৌকিক প্রত্যক্ষে সকল বস্তু বিষয় হয় বলিয়া) যোগজ সন্নিকর্ষ ও (সাধারণের পক্ষে জ্ঞানত্ব প্রভৃতি) সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা (প্রামাণ্যের) আশ্রয় জ্ঞানের প্রামাণ্য নিজের দ্বারাই গৃহীত হয়; এইজন্য (পূর্বোক্ত চারটি বিপ্রতিপত্তিতে) অংশতঃ সিদ্ধসাধন দোষ হয়। সুতরাং (বিপ্রতিপত্তিগুলির পক্ষ জ্ঞানে) 'যোগজধর্মাদ্যজন্যত্ব' এই বিশেষণটি দিতে হইবে। এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। যেহেতু প্রতিপক্ষীগণের (মীমাংসকগণের) নিকট ইহা অপ্রসিদ্ধ এবং যেহেতু সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্য পক্ষরূপে বিবক্ষিত হওয়ায় প্রামাণ্য নিজের সকল আশ্রয়ের (অর্থাৎ গ্রাহকের) দ্বারা গৃহীত হয় এইরূপ (উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অনুমিতি) জ্ঞানের (পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্য) অসিদ্ধ, (সুতরাং) অংশতঃ সিদ্ধসাধন হয় নাই।

স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণ এখানে পুনরায় আপত্তি করেছেন — পূর্বোক্ত চারটি বিপ্রতিপত্তিতে জ্ঞানসামান্যের প্রামাণ্য হল পক্ষ এবং প্রকাশত্ব সাধ্য। কিন্তু ন্যায় মতে যোগীগণ যোগজসন্নিকর্ষের মাধ্যমে যেমন অতীত, অনাগত, দূরস্থ, ব্যবহিত ও সূক্ষ্ম বস্তু প্রত্যক্ষ করেন তেমনই সকল জ্ঞান এবং তার প্রামাণ্য যুগপৎ প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং যোগজ প্রত্যক্ষের স্থলে জ্ঞানের গ্রাহক প্রামাণ্যের গ্রাহক হয় ইহা সিদ্ধ থাকায় অংশতঃ সিদ্ধসাধনদোষের প্রসঙ্গ হয়। সিদ্ধ বস্তুর পুনরায় সাধনকে 'সিদ্ধসাধন' বলে। ইহা এক প্রকার নিগ্রহস্থান। প্রতিপক্ষীগণ আরও বলেছেন, ন্যায় মতে কখনও কখনও সামান্যলক্ষণ প্রত্যাসত্তির মাধ্যমে অনুব্যবসায় প্রামাণ্যের গ্রাহক হয়। পূর্ববর্তী কোনও জ্ঞানের প্রামাণ্য জানবার পর যদি ঐ জাতীয় অন্য একটি জ্ঞানকে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জানা যায় তখন পূর্ববর্তী জ্ঞানের সাজাত্যের ফলে সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তির দ্বারা ঐ জাতীয় জ্ঞানের প্রামাণ্য যুগপৎ গৃহীত হয়। ইহার ফলে সিদ্ধসাধন দোষ হবে। সুতরাং 'জ্ঞানপ্রামাণ্যম্' এই পক্ষে 'যোগজধর্মাদ্যজন্যত্ব' এই বিশেষণটি যোজনা করা আবশ্যক। যোগজসন্নিকর্ষ বা সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন নয় এইরূপ জ্ঞানের প্রামাণ্যই বিপ্রতিপত্তি সমূহের পক্ষরূপে বিবক্ষিত ইহা বলতে হবে।

এর উত্তরে গঙ্গেশ বলেছেন যে, মীমাংসকগণ এইরূপ আপত্তি করতে পারবেন না, যেহেতু তারা সামান্যলক্ষণ ও যোগজসন্নিকর্ষ স্বীকার করেন না। তাছাড়া, সিদ্ধবস্তুর সাধন সর্বত্র দোষের হয় না। প্রাচীন মতে সাধ্যের সিদ্ধি পরার্থানুমিতির প্রতিবন্ধক হলেও নিজের অনুমিতিতে তা দোষের হয় না। যারা সিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাবকেই পক্ষতা বলেন তাঁদের মতে সিষাধয়িষা থাকলে সাধ্যের সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না বলে দোষের হয় না। সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞান অনুমিৎসার অভাববিশিষ্ট সিদ্ধ্যভাবরূপ পক্ষতার বিরোধী হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সাধ্যজ্ঞানের ইচ্ছা দুই প্রকার হয় — সাধ্যজ্ঞানসামান্যের ইচ্ছা ও সাধ্যজ্ঞানবিশেষের ইচ্ছা। সকল বিশেষের জ্ঞান কোনদিনই সম্ভব হয় না বলে যে কোন বিশেষ জ্ঞান হতেই সামান্যজ্ঞানের ইচ্ছা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধ্যজ্ঞানবিশেষের ইচ্ছা থেকেই যায়। যেহেতু ইষ্যমাণ বিষয় হতেই ইচ্ছার নিবৃত্তি ঘটে। কাজেই অনুমান করবার ইচ্ছা হলে সাধ্যের সিদ্ধি থাকলেও অনুমান হয়। সুতরাং জ্ঞানের প্রামাণ্য স্থলবিশেষে সিদ্ধ থাকলেও পরমত খণ্ডনের উদ্দেশ্যে সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপত্তি প্রদর্শন দোষাবহ হয় নি।

৩.৮ পঞ্চম বিপ্রতিপত্তি বিশ্লেষণ

(মূল) যদ্বা ঘটোহয়মিতি জ্ঞানপ্রামাণ্যং এতজ্জ্ঞানগ্রাহ্যং ন বা, এতজ্জ্ঞানগ্রাহকমাত্রগ্রাহ্যং ন বেতি।

(অনু) অথবা 'এইটি ঘট' এই জ্ঞানের প্রামাণ্য এই জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় কি হয় না, (অথবা) এই জ্ঞানের সকল গ্রাহকের দ্বারা গৃহীত হয় কি হয় না।

আলোচ্য বিপ্রতিপত্তিতে জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্যে সংশয় উদ্ভাবিত হয়েছে। এখানে বিপ্রতিপত্তি দুভাবে বিবৃত হয়েছে। 'ইহা ঘট' এই জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্য এই জ্ঞানগ্রাহ্য কিনা। এই বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ প্রাভাকর মীমাংসকগণ ও নিষেধপক্ষ নৈয়ায়িকগণের সম্মত। 'এইটি ঘট' এরূপ জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্য এই জ্ঞানের গ্রাহকের দ্বারা গৃহীত হয় কিনা এই বিপ্রতিপত্তির বিধিপক্ষ ভাট্টমীমাংসক ও মুরারি মিশ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিষেধপক্ষ নৈয়ায়িকগণের দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। সামান্যতঃ জ্ঞানের প্রামাণ্য জানবার ইচ্ছা নিবৃত্ত হলেও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্য জানবার ইচ্ছা থেকেই যায়। এজন্য গঙ্গেশ পঞ্চম বিপ্রতিপত্তিতে জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্যে সংশয় দেখিয়েছেন।

৩.৯ সারসংক্ষেপ

এই ইউনিটে বিপ্রতিপত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সংশয়জনক বাক্যকে বিপ্রতিপত্তি বাক্য বলে। বিপ্রতিপত্তি বাক্য পড়লে বা শুনলে শিক্ষার্থীর মনে সংশয় ও তার ফলে জিজ্ঞাসা হয়। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে বিচারে প্রবৃত্তি হয়। এই অভিপ্রায়ে প্রামাণ্যবাদ বিশ্লেষণের পূর্বে গঙ্গেশের উদ্ভাবিত জ্ঞানসামান্যের প্রামাণ্যে চারটি বিপ্রতিপত্তিবাক্য ও জ্ঞানবিশেষের প্রামাণ্যে একত্রে বিবেচিত দুটি বিপ্রতিপত্তিবাক্য সবিচার আলোচিত হয়েছে। সকল বিপ্রতিপত্তিবাক্যের নিষেধপক্ষ নৈয়ায়িকগণ ও বিধিপক্ষ মীমাংসকগণ সমর্থন করেন। বিধিপক্ষের সমর্থক নিয়ে স্থলবিশেষে টীকাকারগণের মতভেদও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

৩.১০ প্রধান শব্দগুচ্ছ

বিপ্রতিপত্তি

'প্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ জ্ঞান। 'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ বিরুদ্ধ জ্ঞান। একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হলে তাকে বিপ্রতিপত্তি বলে। বিপ্রতিপত্তির অর্থ সংশয়। সংশয় জনক বাক্যকেও বিপ্রতিপত্তি বলা হয়। বাদী ও বিবাদীর বিরুদ্ধ পক্ষ শুনে তৃতীয় মধ্যস্থ ব্যক্তির মনে যে সংশয় হয়, তাকে বিপ্রতিপত্তি বলা হয়। বিপ্রতিপত্তিবাক্য সংশয় ও জিজ্ঞাসা উৎপন্ন করে বিচারে পাঠকের প্রবৃত্তি উৎপাদন করে। এজন্য একে বিচারের অঙ্গ বলা হয়।

সিদ্ধসাধন

প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ বা জ্ঞাত বিষয়কে পুনরায় প্রমাণান্তরের দ্বারা প্রতিপাদন করাকে সিদ্ধসাধন বলে। ইহা একপ্রকার নিগ্রহস্থান। বাদী বা বিবাদী অপরকে পরাস্ত করার জন্য সিদ্ধসাধন উদ্ভাবন করে থাকেন। ইহা একপ্রকার দোষ। সিদ্ধি থাকলে পুনরায় সাধন দোষের হলেও তা সর্বত্র দোষের হয় না। পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক হলেও অনুমিৎসা থাকলে যথার্থ অনুমিতি হয়।

৩.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. *tajjnanavisayakajnanajanyajnanavisayatvam* - Explain the *Vidhipaksa* of the *vipratipatti* from the Mimamsa points of view.

Short Type

4. What is *vipratipatti*?
5. What is *siddhasadhana*?

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. উপাধ্যায় গঙ্গেশ, **তত্ত্বচিন্তামণি**, প্রত্যক্ষ খন্ড, প্রথম ভাগ, কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, মোতীলাল বনারসীদাস, বারাণসী (১৯৭৪)
2. Bhattacharya Amarnath, "*Pratyaksacintâmani (Prâmânyavâda)*" in 'Darshan - Manjari', The University of Burdwan Journal of Philosophy, vol.-7, Burdwan (2004)
3. Mohanty J. N., *Gangeœa's Theory of Truth*, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi (2006)

ন্যায়বিন্দু

প্রথম অর্ধ

পর্যায় গ্রন্থ —২

অধ্যাপক রজত ভট্টাচার্য্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

একক - ১ ঃ গ্রন্থ পরিচিতি, অনুবন্ধ ও সম্যক্ জ্ঞান

পাঠপরিকল্পনা

১.১ গ্রন্থ পরিচিতি

১.১.১ ন্যায়বিন্দু বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রকরণ

১.১.২ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে পরিচ্ছেদ বিভাজন ও অনুবন্ধ নির্দেশ

১.১.৩ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিক্ষার্থীর জন্য রচিত

১.১.৪ গ্রন্থটি সৌত্রান্তিক ও যোগাচার মতানুসারী

১.২ অনুবন্ধ

১.২.১ অনুবন্ধ কী?

১.২.২ গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধের উল্লেখ কেন যুক্তিযুক্ত?

১.২.৩ গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধের অনুল্লেখে অনর্থসম্ভাবনা

১.২.৪ অর্থসম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বলে ন্যায়বিন্দুতে অনুবন্ধের উল্লেখ

১.২.৫ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ

১.২. ৬ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম অনুবন্ধ ঃ অভিধেয়

১.২.৭ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবন্ধ ঃ প্রয়োজন

১.২.৮ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের তৃতীয় অনুবন্ধ ঃ সম্বন্ধ

১.২.৯ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের চতুর্থ অনুবন্ধ ঃ প্রয়োজনের প্রয়োজন

১.৩ সম্যক্জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপন ও প্রকারভেদ

১.৩.১ সম্যক্ জ্ঞান কেন অবিসংবাদি জ্ঞান বা অবিসংবাদক জ্ঞান?

১.৩.২ একই সম্যক্ জ্ঞান কীভাবে প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে পারে?

১.৩.৩ অবিসংবাদি জ্ঞান বা অবিসংবাদক জ্ঞান কী?

১.৩.৪ সম্যক জ্ঞানে প্রদর্শকত্ব, প্রবর্তকত্ব এবং প্রাপকত্ব

১.৩.৫ অধিগত বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নয়

১.৩.৬ জ্ঞানের 'অবিসংবাদন' বলতে ঠিক কী বুঝায়?

১.৩.৭ সম্যক্ জ্ঞান কত প্রকার ও কী কী?

১.৩.৮ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার জ্ঞান কেন সম্যক্ জ্ঞান নয়?

১.৩.৯ দুই প্রকার সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়

১.৪ সারসংক্ষেপ

১.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ গ্রন্থ পরিচিতি

১.১.১ ন্যায়বিন্দু বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রকরণ

ন্যায়বিন্দু বৌদ্ধ আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত একটি গ্রন্থ। এটি বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ। গ্রন্থটি আকারে খুবই ছোট। এটি সূত্রাকারে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের একটি প্রকরণ।

যে গ্রন্থে কোন শাস্ত্রের সকল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে একটি বিশেষ বিষয় বেছে নিয়ে সেই বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাকে প্রকরণ বলা হয়। প্রকরণে সমগ্র শাস্ত্রের অন্তর্গত একটি নির্বাচিত বিষয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে বলে সেই আলোচনা সুবিন্যস্ত, সুস্পষ্ট ও নতুন বিচার যুক্ত হয়ে থাকে।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করেন নি, ঐ শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক্ জ্ঞান-এর ব্যুৎপাদন করেছেন। বুৎপাদন কথাটির অর্থ বিরুদ্ধ মত খণ্ডণ পূর্বক প্রতিপাদন বা সংশয় বিমুক্তিরূপ প্রতিপাদন। তাই ন্যায়বিন্দুকেও প্রকরণ বলা হয়। প্রকরণ শ্রেণীর শাস্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রাচীন রীতি অনুযায়ী গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর প্রথম সূত্রে ঐ গ্রন্থের অভিধেয় বা বিষয়বস্তু, প্রয়োজন ইত্যাদি অনুবন্ধের উল্লেখ করেছেন।

১.১.২ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে পরিচ্ছেদ বিভাজন ও অনুবন্ধ নির্দেশ

গ্রন্থটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সেগুলি হল ১) প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, ২) স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ এবং ৩) পরার্থানুমান পরিচ্ছেদ[১]। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদের সূত্র সংখ্যা ২১ এবং স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদের সূত্র সংখ্যা ৪৮।

প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অভিধেয় অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়, ঐ গ্রন্থের প্রয়োজন, গ্রন্থটির অক্ষর রাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের অভিধেয়ের এবং প্রয়োজনের সম্বন্ধ, সম্যক্ জ্ঞানের প্রকার, প্রত্যক্ষের লক্ষণ, প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক, প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ, প্রত্যক্ষে অর্থসারূপ্য ও অর্থপ্রতীতি — ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আবার স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদে স্বার্থানুমানের স্বরূপ, লিঙ্গের স্বরূপ এবং লিঙ্গের প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা আছে।

---

১ পরার্থানুমান পরিচ্ছেদ বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে দূরশিক্ষা পদ্ধতিতে এম.এ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে না থাকায় এই পাঠ্যোপকরণ (অর্থাৎ স্ট্যডি মেটেরিয়েল-এ) এর আলোচনা করা হল না।

১.১.৩ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিক্ষার্থীর জন্য রচিত

ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু ছাড়াও ছয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি মোট সাতটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল - ১) ন্যায়বিন্দু, ২) প্রমাণবার্তিক, ৩) প্রমাণবিনিশ্চয়, ৪) হেতুবিন্দু, ৫) সম্বন্ধ পরীক্ষা, ৬) বাদন্যায় এবং ৭) সন্তানান্তরসিদ্ধি। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে সে বিষয়ে প্রমাণবার্তিক ও প্রমাণবিনিশ্চয় গ্রন্থ দুটিতে অনেক কথা বলা আছে। এই তিনটি গ্রন্থের তুলনা মূলক বিচার করে তিব্বতি ঐতিহাসিক বু তোন তাঁর *হিস্ট্রি অব্ বুদ্ধিজম্* গ্রন্থে বলেছেন যে ধর্মকীর্তির ন্যায়বিন্দু, প্রমাণবিনিশ্চয় ও প্রমাণবার্তিক — এই তিনটি গ্রন্থ যথাক্রমে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মধ্যমবুদ্ধি এবং মন্দবুদ্ধি শিক্ষার্থীর জন্য রচিত। বস্তুত ন্যায়বিন্দু গ্রন্থটি সূত্রাকারে রচিত অতিসংক্ষিপ্ত , কিন্তু অতিভাববাহি হওয়াতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাড়া এর পাঠোদ্ধার প্রায় অসম্ভব।

১.১.৪ গ্রন্থটি সৌত্রান্তিক ও যোগাচার মতানুযায়ী

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ন্যায়বিন্দু প্রকরণটি যদিও সৌত্রান্তিক আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ, তবু ন্যায়বিন্দুর প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্র বিচার করে দেখা যায় যে, এই প্রকরণটি কেবলমাত্র সৌত্রান্তিক মতানুসরণে রচিত নয়, এটি সৌত্রান্তিক ও যোগাচার এই দুই মতেই সার্থক হতে পারে।

১.২ অনুবন্ধ

১.২.১ অনুবন্ধ কী?

কোন গ্রন্থ সম্পর্কীত যে সমস্ত তথ্য বা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান পাঠককে ঐ গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করে, গ্রন্থটি সম্পর্কিত সেই সমস্ত তথ্য বা বিষয়কে দার্শনিক পরিভাষায় সাধারণত অনুবন্ধ বলা হয়। যেমন ১) গ্রন্থটির অভিধেয় বা বিষয়বস্তু কী, ২) গ্রন্থটি পাঠকের কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে, ৩) গ্রন্থটি লেখকেরই বা কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে, ৪) গ্রন্থের সঙ্গে তার অভিধেয় বা বিষয়বস্তুর সম্বন্ধ কী, ৫) গ্রন্থের সঙ্গে তার প্রয়োজনের সম্বন্ধ কী, ৬) গ্রন্থটির অধিকারী বা যোগ্য পাঠক কে — ইত্যাদি।

১.২.২ গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধের উল্লেখ কেন যুক্তিযুক্ত?

আশংকা হতে পারে যে, গ্রন্থকার গ্রন্থের আভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ ইত্যাদির কথা বললেও প্রেক্ষাবান বা বিচারশীল ব্যক্তি গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অভিধেয়, প্রয়োজন ইত্যাদি সম্পর্কীত গ্রন্থকারের বক্তব্যকে প্রামাণিক বা যুক্তিসংঙ্গত বলে মনে নাও করতে পারেন। সুতরাং গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এই আশংকার উত্তরে বলা হয় যে অনুবন্ধাদির প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হলে বিচারশীল ব্যক্তির মনে যে অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তার প্রভাবেই তাঁরা ঐ গ্রন্থপাঠে আগ্রহী হন। তাছাড়া ক্রীড়া বা আমোদের জন্য যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁদের উক্তি অসত্য হতে পারে, কিন্তু শিষ্য শিক্ষার্থে শাস্ত্রকারেরা যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাতে অসত্য উক্তি থাকতে পারে না, কারণ অসত্য কথা বলার প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি

শাস্ত্রকারদের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা নেই। শাস্ত্রকারগণ যে বিষয়ের কথা বলেন সেই বিষয়ে পাঠকের মনে স্বভাবিক ভাবেই আগ্রহ বা উৎসুক্য জন্মে। সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থের প্রারম্ভে অনুবন্ধাদির উল্লেখ যুক্তিযুক্ত।

১.২.৩ গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধের অনুল্লেখে অনর্থসম্ভাবনা

কোন গ্রন্থকার যদি গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধদির উল্লেখ না করেন, তবে পাঠকের মনে অনেক অনর্থসম্ভাবনা উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ পাঠকের মনে হতে পারে যে,

১) গ্রন্থটির বিষয়বস্তু এবং গ্রন্থটিতে প্রদত্ত উপদেশ কাকদন্ত পরীক্ষার মত নিষ্প্রয়োজন,

২) তক্ষকের মণি ধারণ করে জ্বর তাড়াবার উপদেশের মত অসম্ভব বা অসাধ্য, কিংবা

৩) মাতার পুনর্বিবাহ বিষয়ে প্রদত্ত উপদেশের মত অনভিপ্রেত।

এছাড়া, পাঠক আরও ভাবতে পারেন যে,

৪) এই গ্রন্থে বর্ণিত উপায়ের চেয়ে সহজতর উপায়ে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সিদ্ধি সম্ভব, এমনকি

৫) এই গ্রন্থ তার অভিধেয় প্রতিপাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ।

১.২.৪ অর্থসম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বলে ন্যায়বিন্দুতে অনুবন্ধের উল্লেখ

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার ধর্মোত্তরের মতে, পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার অনর্থসম্ভাবনার অন্তত একটির শিকার হলেই পাঠক গ্রন্থটি বর্জন করবেন। তাই, অভিধেয় ইত্যাদির উল্লেখের দ্বারা পাঠকের মনে অনর্থসম্ভাবনার বিপরীত অর্থসম্ভাবনা উৎপন্ন হয় বলে পাঠক গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হবেন।

১.২.৫ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা বিষয়ে মতভেদ

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা বিষয়ে ঐ গ্রন্থের দুই টীকাকার ধর্মোত্তর এবং বিনীতদেবের মধ্যে মতভেদ আছে। তাছাড়া ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার প্রচলিত রীতি অনুসারে নানা গ্রন্থে যে চারটি অনুবন্ধ আলোচিত হতে দেখা যায়, সেগুলি হল — আধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন। ধর্মোত্তর কিন্তু কেবলমাত্র শেষোক্ত তিনটি অনুবন্ধকেই ন্যায়বিন্দুর অনুবন্ধ বলে স্বীকার করেছেন। অপর দিকে বিনীতদেব ধর্মকীর্তি-স্বীকৃত ঐ তিনটি অনুবন্ধ ছাড়াও প্রয়োজনের প্রয়োজন নামক অপর একটি অনুবন্ধ স্বীকার করেছেন। সুতরাং, ধর্মোত্তরের মতে ন্যায়বিন্দুর অনুবন্ধের সংখ্যা তিন, যথা — অভিধেয় বা বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন; কিন্তু বিনীতদেবের মতে ঐ গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা চার, এবং এগুলি হল অভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনের প্রয়োজন। এই দুই টীকাকার অধিকারী নামক সাধারণভাবে স্বীকৃত অনুবন্ধের উল্লেখ না করলেও বলা যায় যে পুরুষার্থ সিদ্ধিতে ইচ্ছুক পুরুষ মাত্রই ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অধিকারী বা যোগ্য পাঠক। যাই হোক বিনীতদেব যেহেতু ধর্মকীর্তি-স্বীকৃত তিনটি অনুবন্ধ স্বীকার করেও চতুর্থ একটি অনুবন্ধ স্বীকার করেছেন, সেহেতু সাধারণভাবে বলা যায়, ন্যায়বিন্দুর অনুবন্ধের সংখ্যা তিন, যথা- অভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ। তবে বিনীতদেব স্বীকৃত চতুর্থ অনুবন্ধ প্রয়োজনের প্রয়োজনও অপর একটি অনুবন্ধ। সুতরাং, ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা চার।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম সূত্রটি হল — ''সম্যগ্‌জ্ঞানপূর্বিকা সর্বপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদ্ ব্যুৎপাদ্যতে।'' এই সূত্রের অন্তর্গত 'তৎ' এবং 'ব্যুৎপাদ্যতে' — এই দুটি পদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে যথাক্রমে অভিধেয় এবং প্রয়োজন নির্দেশ করা হয়েছে। অপর দুই অনুবন্ধ ঐ সূত্রে সামর্থ্যের দ্বারা নির্দেশিত।

১.২. ৬ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম অনুবন্ধ ঃ অভিধেয়

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের পূর্বোক্ত প্রথম সূত্রের অর্থ হল সকল পুরুষার্থ সিদ্ধির পূর্বভাবী হল সম্যক্ জ্ঞান, তাই এর আলোচনা বা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে ঐ গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞান বিষয়েই আলোচনা করা হচ্ছে অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অভিধেয় বা বিষয়।

স্বভাবতই প্রত্যাশা জন্মে যে ঐ গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ এবং প্রকারভেদ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। কিন্তু দেখা যায় যে ঐ গ্রন্থে ধর্মকীর্তি সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ না করেই প্রকার উল্লেখ করেছেন এবং সম্যক্ জ্ঞানের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রমাণবার্ত্তিক গ্রন্থে ধর্মকীর্তি বলেছেন, ''প্রমাণমবিসংবাদি জ্ঞানম্'' — অর্থাৎ অবিসংবাদি জ্ঞানই প্রমাণ। ব্যবস্থাপক সম্যক্ জ্ঞানই ব্যবস্থাপ্যরূপে প্রমা। সুতরাং, প্রমাণবার্ত্তিকে প্রদত্ত প্রমাণের লক্ষণ থেকে সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণ নির্ণয় করা সম্ভব। তাই ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের পূর্বোক্ত টীকাকারদ্বয় বলেছেন, 'অবিসংবাদকং জ্ঞানম্ সম্যগ্‌জ্ঞানম্''।[২]

১.২.৭ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবন্ধ ঃ প্রয়োজন

কোন গ্রন্থের শরীর গঠিত হয় শব্দ এবং তার অর্থ দিয়ে। শব্দ ও অর্থের প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন। শব্দের প্রয়োজন তার নিজের অর্থকে প্রতিপাদন করা। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থ-প্রতিপাদন শব্দের প্রয়োজন। অপরদিকে অর্থের প্রয়োজন হল পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্যক্তির চাহিদা পূরণ।

প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায় যে প্রয়োজন ছাড়া কেউ কোন কাজ করে না। এমন কি মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিও বিনা প্রয়োজনে কোন কাজ করে না। বিচারশীল ব্যক্তিগণ তো প্রয়োজন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হবার পরই কোন কর্মে প্রবৃত্ত হন। যে বস্তু বা বিষয়কে উপাদেয়, হেয় বা উপেক্ষণীয় রূপে নিশ্চয় করে মানুষ তাকে যথাক্রমে গ্রহণ করতে, ত্যাগ করতে অথবা উপেক্ষা করতে প্রবৃত্ত হয়, সেই বস্তু বা বিষয়কে প্রয়োজন বলা হয়।

আচার্য যখন কোন প্রকরণ রচনা করেন, তখন তাঁর প্রয়োজন শিষ্যের উপকারের জন্য একটি নির্বাচিত বিষয়ে সংশয় বিমুক্তিরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা। শিষ্যেরও তেমনি নিজের সংশয় নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজন ঐ বিষয়ে সংশয় বিমুক্তিরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ বা পাঠ করা।

তাই ন্যায়বিন্দু নামক প্রকরণ রচনায় আচার্যের প্রয়োজন কী এবং ঐ গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠে শিষ্যেরই বা প্রয়োজন কী — এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজন হল সম্যক্‌জ্ঞানের বুৎপাদন। ন্যায়বিন্দু নামক প্রকরণ রচনা এবং ঐ প্রকরণ শ্রবণ বা পাঠ — এই দুয়েরই প্রয়োজন হল সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন। আচার্যের প্রয়োজন হল শিষ্যশিক্ষার্থে গ্রন্থ রচনার দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানের বুৎপাদন করা এবং শিষ্যের প্রয়োজন হল সম্যক্ জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নিজের সংশয় নিবৃত্তির জন্য ঐ গ্রন্থ শ্রবণ বা পাঠ করা।

১.২.৮ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের তৃতীয় অনুবন্ধ ঃ সম্বন্ধ

যেহেতু ন্যায়বিন্দু নামক প্রকরণটি রচনা করা হয়েছে সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদনের প্রয়োজনে, সেহেতু এই প্রকরণটি বা তার শব্দরাশি সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন-এর উপায় এবং সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন এই প্রকরণটির উপেয়। অর্থাৎ, এই প্রকরণটি বা তার শব্দরাশি হল উপায় এবং সম্যক্ জ্ঞানের স্বরূপ প্রতিপাদন হল প্রকরণটি বা তার শব্দরাশির উপেয়। সুতরাং, ন্যায়বিন্দু নামক গ্রন্থটি বা তার শব্দরাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের প্রয়োজনের সম্বন্ধ হল উপায়-উপেয় সম্বন্ধ এবং ন্যায়বিন্দুর অভিধেয় সম্যক্জ্ঞান-এর সঙ্গে ঐ গ্রন্থের সম্বন্ধ হল প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ।

ধর্মোত্তর ন্যায়বিন্দু নামক প্রকরণটিকে সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদনের উপায় বলতে গিয়ে বলেছেন, ''অয়মেবোপায়ো নান্যঃ''। তাঁর এই উক্তির দুটি অর্থ হতে পারে, যথা- ১) সম্যক্জ্ঞানের বুৎপাদনের জন্য এই প্রকরণটিই উপায়, অন্য কিছু উপায় নয়, অথবা ২) সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদনের জন্য এই প্রকরণটি অবশ্যই একটি উপায়, অন্য কিছু নয়, প্রথম অর্থে ধর্মোত্তরের উক্তিকে ব্যাখ্যা করলে সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদনের জন্য রচিত, ধর্মকীর্তির অন্যান্য গ্রন্থ অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। তাই দ্বিতীয় অর্থে উক্তিটির ব্যাখ্যা করতে হবে।

১.২.৯ ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের চতুর্থ অনুবন্ধ ঃ প্রয়োজনের প্রয়োজন

বিনীতদেবের মতে সকল পুরুষার্থসিদ্ধি হল ন্যায়বিন্দুর প্রয়োজনের প্রয়োজন। কারণ, ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজন-- সম্যক্জ্ঞানের ব্যুৎপাদন সকল পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ, সকল পুরুষার্থসিদ্ধির জন্যই সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন প্রয়োজন। পুরুষের (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির) আকাঙ্খিত বা ইপ্সিত বস্তুই পুরুষার্থ। ধর্মোত্তরের মতে, পুরুষার্থ দুই প্রকার, যথা — হেয় (বা পরিত্যাগযোগ্য) এবং উপাদেয় (বা গ্রহণযোগ্য)। বিনীতদেবের মতে, পুরুষার্থ তিন প্রকার, যথা— হেয় (বা পরিত্যাগযোগ্য), উপাদেয় (বা গ্রহণযোগ্য) এবং উপেক্ষণীয় (বা উপেক্ষার যোগ্য)। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা যে সিদ্ধি ঘটে, যেমন — হেয় বস্তুর হান (বা পরিত্যাগ)-রূপ ক্রিয়া, উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ-রূপ ক্রিয়া এবং উপেক্ষণীয় বস্তুর উপেক্ষা-রূপ ক্রিয়া — তাকে বলা হয় অনুষ্ঠান। হেয় বস্তুর হান, উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ এবং উপেক্ষণীয় বস্তুর উপেক্ষা-রূপ অনুষ্ঠানই পুরুষার্থসিদ্ধি।

যথার্থ জ্ঞান না থাকলে পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। তাই, পুরুষার্থসিদ্ধি-মাত্রই সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, অন্য কোন ভাবে নয়। অসম্যক্ বা মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। জ্ঞান যে বস্তুকে প্রদর্শন করে, তাকে লাভ করাই অর্থসিদ্ধি এবং যে জ্ঞানের দ্বারা প্রদর্শিত বস্তু লাভ করা যায়, তাকে সম্যক্ জ্ঞান বলা হয়। সম্যক্ জ্ঞান ছাড়া পুরুষার্থসিদ্ধি হয় না। তাই, সম্যক্ জ্ঞান সকল প্রকার পুরুষার্থসিদ্ধির পূর্বভাবী।

সকল পুরুষার্থসিদ্ধি বা সকল প্রকার পুরষার্থসিদ্ধির অর্থ হল যে কোন পুরুষের যে কোন কালের লৌকিক, অলৌকিক, নিকটবর্তী, দূরবর্তী এবং হেয়, উপাদেয় ও উপেক্ষণীয় ইত্যাদি যে কোন ধরণের পুরুষার্থের সিদ্ধি। তাই, সকল পুরুষার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন প্রয়োজন।

১.৩ সম্যক্‌জ্ঞানের লক্ষণ নিরূপন ও প্রকারভেদ

১.৩.১ সম্যক্ জ্ঞান কেন অবিসংবাদি জ্ঞান বা অবিসংবাদক জ্ঞান?

জ্ঞান দুই প্রকার, যথা — সম্যক্ জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান এবং অসম্যক্ জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান। আবার ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপ্য ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার বলে মনে হয়। ফলে একই জ্ঞান ব্যবস্থাপক রূপে প্রমাণ এবং ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা বলে তখনই গণ্য হয়, যখন ঐ জ্ঞানটি যথার্থ হয়। সুতরাং বলা যায়, যে সম্যক্ জ্ঞান ব্যবস্থাপক রূপে প্রমাণ, সেই সম্যক্‌জ্ঞানই ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা। প্রমাণের লক্ষণ জানা গেলে প্রমার লক্ষণও জানা যাবে এবং যেহেতু একই সম্যক্ জ্ঞান প্রমা এবং প্রমাণ উভয়েই হতে পারে, সেহেতু প্রমাণের লক্ষণ জানা গেলে সম্যক্ জ্ঞানের লক্ষণও জানা যাবে।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের দুই টীকাকার ধর্মোত্তর এবং বিনীতদেব ঐ গ্রন্থের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অবিসংবাদক জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলেছেন। তাঁদের ভাষায়, 'অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্ জ্ঞানম্'। যেহেতু ধর্মকীর্তি নিজেও তাঁর প্রমাণবার্তিক গ্রন্থে বলেছেন, 'প্রমাণমবিসংবাদি জ্ঞানম্' এবং যেহেতু ধর্মকীর্তির মতানুসারে ব্যবস্থাপক রূপে যে সম্যক্ জ্ঞান প্রমাণ, সেই সম্যক্ জ্ঞানই ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা, সেহেতু 'প্রমাণবার্তিক' নামক গ্রন্থে তাঁর দেওয়া প্রমাণের লক্ষণ থেকে সম্যক্ জ্ঞানের প্রকৃতিও জানা যায়। ধর্মকীর্তি যেহেতু প্রমাণবার্তিকে অবিসংবাদি জ্ঞানকে প্রমাণ বলেছেন, সেহেতু সহজেই বলা যায়, সম্যক্ জ্ঞান হল অবিসংবাদি জ্ঞান। কারণ, প্রমাণ হল সেই ব্যবস্থাপকরূপী অবিসংবাদি জ্ঞান, যা ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা। সহজভাবে বলা যায়, যে অবিসংবাদি জ্ঞান ব্যবস্থাপক রূপে প্রমাণ, সেই অবিসংবাদি জ্ঞানই ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা বলে গণ্য হওয়ায় অবিসংবাদি জ্ঞানমাত্রই সম্যক্ জ্ঞান।

১.৩.২ একই সম্যক্ জ্ঞান কীভাবে প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে পারে?

প্রমার করণই প্রমাণ এবং প্রমাণের ফলই প্রমা। প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব বিদ্যমান। সাধ্য-সাধনভাব আবার দুই প্রকার হতে পারে। যথা — জন্য-জনকভাব এবং ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাব। সাধারণত নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণ প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান সাধ্য-সাধনভাবকে জন্য-জনকভাবরূপে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু ধর্মকীর্তি প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান সাধ্য-সাধনভাবকে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাবরূপে নির্দেশ করে থাকেন। তাঁদের মতে, পাক ও অগ্নির মধ্যে যে জন্য-জনকভাব আছে, প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে সেরকম কোন ভাব নেই। অগ্নি পাকের উৎপাদক বা জনক এবং পাক অগ্নির উৎপাদ্য বা জন্য। কিন্তু, প্রমাণ প্রমার উৎপাদক বা জনক নয় এবং প্রমা প্রমাণের উৎপাদ্য বা জন্য নয়। প্রমাণ নিয়ামক এবং প্রমা প্রমাণের নিয়াম্য। অর্থাৎ প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে নিয়াম্য-নিয়ামকভাব বিদ্যমান, জন্য-জনকভাব নয়।

এই নিয়াম্য-নিয়ামকভাবকে ব্যাবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাবও বলা হয়। প্রমাণ যদি প্রমার উৎপাদক বা জনক হত এবং প্রমা যদি প্রমাণের উৎপাদ্য বা জন্য হত, তবে একই জ্ঞান প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে পারত না। যেহেতু প্রমাণ প্রমার নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক এবং প্রমা প্রমাণের নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপ্য মাত্র। সেহেতু একই জ্ঞান প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে কোন বাধা নেই। কারণ, নিয়ামক বা ব্যবস্থাপকরূপে যে জ্ঞান প্রমাণ, নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপ্যরূপে সেই জ্ঞানই প্রমা হতে পারে।

১.৩.৩ অবিসংবাদি জ্ঞান বা অবিসংবাদক জ্ঞান কী?

জানা প্রয়োজন, অবিসংবাদক জ্ঞান বা অবিসংবাদি জ্ঞান বলতে ঠিক কি বুঝানো হয়েছে। যা সংবাদক নয়, তা বিসংবাদক এবং যা বিসংবাদক নয়, তা অবিসংবাদক। অনুরূপভাবে বলা যায়, যা সংবাদি নয়, তা বিসংবাদি এবং যা বিসংবাদি নয়, তা অবিসংবাদি। 'সংবাদক' শব্দটিকে যথাক্রমে 'বি' এবং 'অ' শব্দ দিয়ে দুইবার প্রতিষেধ করে 'অবিসংবাদক' শব্দটি পাওয়া গেছে। সুতরাং 'অবিসংবাদক' মানে 'সংবাদক' এবং 'অবিসংবাদি' মানে 'সংবাদি'। আমাদের প্রত্যহিক জীবনে যখন কোন ব্যক্তি কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করে, তখন আমরা বলি যে ঐ ব্যক্তিটি ভুল সংবাদ দেয়নি। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিটিকে অবিসংবাদক বা সংবাদক বলা যায়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে। যে জ্ঞানের দ্বারা উপদর্শিত বস্তুকে লাভ করতে আমাদের প্রবৃত্তি যথাযথ ভাবে পরিচালিত হয়, তাকে অবিসংবাদক জ্ঞান বলা হয়। জ্ঞানে উপদর্শিত বস্তুকে লাভ করতে আমাদের প্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে বলে সম্যক্ জ্ঞান প্রমাণ।

সাধারণত 'অবিসংবাদক' বলতে অবিপরীত বুঝায়। তাই, অবিসংবাদক জ্ঞান বা অবিসংবাদি জ্ঞান সাধারণ অর্থে অবিপরীত জ্ঞান। কিন্তু 'অবিসংবাদক' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন, বৌদ্ধ, বিজ্ঞানবাদী যোগাচার সম্প্রদায় জ্ঞান ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা স্বীকার করেন না বলে তাঁদের মতে জ্ঞানে আবির্ভূত বস্তুমাত্রই বিপরীত বা ভ্রান্ত। তাছাড়া বৌদ্ধ সৌত্রন্তিক সম্প্রদায়ের মতে তো জ্ঞান ভিন্ন অন্য বস্তুর সত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নয়, অনুমেয়মাত্র। সম্ভবত এই কারণেই টীকাকারগণ 'অবিসংবাদক' কথাটির অর্থ করেছেন প্রবৃত্তি-বিষয়-প্রদর্শক বা অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শক।

১.৩.৪ সম্যক্ জ্ঞানে প্রদর্শকত্ব, প্রবর্তকত্ব এবং প্রাপকত্ব

সেই জ্ঞানকেই অবিসংবাদক বলা হয়, যে জ্ঞান অক্রিয়াসমর্থ বস্তুকে প্রবৃত্তির বিষয়রূপে প্রদর্শন করে, অর্থাৎ ঐ অর্থের আকারকে দেখিয়ে দেয়। এই জ্ঞান হবার পর আমরা ঐ অর্থ বা বস্তুটির প্রতি প্রবৃত্ত হই এবং তাকে পাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রদর্শকত্বই প্রবর্তকত্ব। কারণ, জ্ঞান বলপূর্বক পুরুষকে অর্থপ্রাপ্তির জন্য প্রবৃত্ত করে না বা অর্থ তৈরী করে পুরুষকে সেই অর্থটি পাইয়ে দেয় না। জ্ঞানে প্রবৃত্তির বিষয়টি প্রদর্শিত হয় বলে জ্ঞান প্রবর্তক এবং প্রবর্তক জ্ঞানে প্রাপণশক্তি আছে বলে সেই জ্ঞানই প্রাপক। অবশ্য, জ্ঞানে প্রথমে বস্তুর প্রদর্শন, তারপর সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের প্রবর্তন এবং পরিশেষে বস্তু প্রাপ্তি -- এরূপ কোন পরম্পরা থাকে না। বস্তুত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদর্শকত্বই প্রবর্তকত্ব এবং প্রবর্তকত্বই প্রাপণশক্তি। সুতরাং, যে জ্ঞান প্রদর্শক, সেই জ্ঞানই প্রবর্তক ও প্রাপক। আবার যে জ্ঞান অর্থ-প্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক, সেই জ্ঞানেই অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয়।

অর্থপ্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপে যে জ্ঞান অর্থপ্রতীতি জন্মায়, সেই জ্ঞান প্রমাণ এবং সেই একই জ্ঞানে অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয় বলে সেই জ্ঞানটিই ঐ প্রমাণের ফল বা প্রমা। এক কথায়, অর্থপ্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপে যে জ্ঞান প্রমাণ সেই জ্ঞানই অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতিরূপে ঐ প্রমাণের ফল বা প্রমা। সুতরাং প্রমাণ প্রমার করণ বা সাধন এবং প্রমা প্রমাণের ফল হলেও, প্রমাণ ও প্রমা দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞান নয়, একই জ্ঞানের নিয়ামক-নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপক-ব্যবস্থাপ্যরূপ মাত্র। তাই, এক কথায়, অবিসংবাদক জ্ঞান মানে প্রাপক জ্ঞান।

'প্রাপকত্ব' করার অর্থ জ্ঞানে প্রদর্শিত বস্তুটির প্রতি আমাদের প্রবৃত্তিকে পরিচালনা করা। যে জ্ঞান অগ্নিকে প্রদর্শন করে, সেই জ্ঞানই ঐ অগ্নিকে প্রবৃত্তির বিষয় বলেও প্রদর্শন করে। তাই আমরা অগ্নি দর্শনের পর সেই অগ্নি প্রাপ্তির জন্য অগ্রসর হই। অন্য ভাবে বলা যায়, যে জ্ঞানের দ্বারা পুরুষ কোন বিষয়কে প্রথম জানতে পারে, সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েই সে ঐ বিষয়কে লাভ করতে পারে। পুরুষকে এইভাবে প্রবর্তিত করতে অন্য একটি জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই।

১.৩.৫ অধিগত বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নয়

অধিগত বিষয়ের জ্ঞানকে সম্যক্ জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। অর্থাৎ যে, বিষয়ের জ্ঞান পূর্বে হয়ে গেছে, সেই বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান নয়। পর্বতস্থ অগ্নিকে প্রথমে অনুমানের দ্বারা জেনে, পরে প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যেতে পারে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের মত যথার্থ নয়।

বৌদ্ধমতে, একটি প্রমাণের দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয় একবার জ্ঞাত হলে সেই বিষয়ে পুনরায় কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা অযৌক্তিক। প্রমাণের একবার প্রয়োগেই যখন একটি বস্তু জানা হয়ে যায়, তখন ঐ জ্ঞাত বস্তুকে আবার জানবার চেষ্টা সম্পূর্ণ অর্থহীন। সুতরাং কোন বস্তুর ধারাবাহিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানটি যথার্থ হতে পারে, দ্বিতীয়াদি পরবর্তী ক্ষণগুলিতে উৎপন্ন জ্ঞানগুলি যথার্থ হতে পারে না অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান হতে পারে না।

১.৩.৬ জ্ঞানের 'অবিসংবাদন' বলতে ঠিক কী বুঝায়?

আমাদের জানা প্রয়োজন, 'অবিসংবাদি জ্ঞানই প্রমাণ' বলতে ধর্মকীর্তি কী বুঝিয়েছেন এবং জ্ঞান অবিসংবাদি হওয়া বা জ্ঞানের 'অবিসংবাদন' বলতে ঠিক কী বুঝায়।

ধর্মকীর্তি বলেছেন ''অর্থক্রিয়াস্থিতিঃ অবিসংবাদনম্''। 'অর্থক্রিয়াস্থিতি' কী? অর্থক্রিয়াস্থিতি হল 'যথোপদর্শিতার্থস্য ক্রিয়ায়াঃ স্থিতিঃ'। 'যথোপদর্শিতার্থ' মানে জ্ঞানে একটি বস্তু যেভাবে উপদর্শিত হয়েছে। তাই 'যথোপদর্শিতার্থস্য ক্রিয়ায়াঃ স্থিতিঃ'' বলতে জ্ঞানে একটি বস্তু যেভাবে উপদর্শিত হয়েছে তার যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়ার জ্ঞানে স্থিতি বা থাকা বুঝায়। স্বভাবত, 'যথোপদর্শিতার্থস্য ক্রিয়ায়াঃ স্থিতিঃ'' হল প্রমাণযোগ্যতা বা অবিসংবাদন। এরূপ অবিসংবাদন-বিশিষ্ট জ্ঞানকেই অবিসংবাদি জ্ঞান বলা হয়।

অর্থক্রিয়ার জ্ঞান হবার পর যদি ঐ বস্তুকে লাভ করবার জন্য পুরুষের দৈহিক প্রবৃত্তি নাও উৎপন্ন হয়, তাহলেও ঐ জ্ঞানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হবে। এমন কী পূর্বোক্তরূপ জ্ঞান হবার পর যদি কোন প্রতিবন্ধের কারণে ঐ বস্তু লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রবৃত্তি সফল না হয়, তাহলেও ঐ জ্ঞানকে প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হবে। যেমন, অগ্নির অর্থক্রিয়ার জ্ঞান হবার পর যদি পুরুষ ঐ অগ্নি স্পর্শ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু স্পর্শ করবার ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে সেই অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যায়, তাহলেও সেই পুরুষের ঐ অগ্নি-জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান। কারণ, তার জ্ঞানে অর্থক্রিয়ার স্থিতি ছিল। আর অর্থক্রিয়ার স্থিতি থাকলেই জ্ঞান অবিসংবাদি হয়।

তবে অর্থক্রিয়ার স্থিতি-যুক্ত বা প্রবৃত্তিবিষয়প্রদর্শক সম্যক্ জ্ঞানকে 'নিয়তার্থপ্রদর্শকও বলা হয়েছে। এখানে 'নিয়ত' শব্দের অর্থ ব্যবস্থিত বা অনিবার্যভাবে সম্বন্ধিত। সুতরাং 'নিয়তার্থপ্রদর্শক' বলতে

অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুতে ব্যবস্থিত বুঝায়। আবার অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুতে ব্যবস্থিত বলার অর্থ হল বস্তুর যে রূপটি অর্থক্রিয়াসমর্থ, সেই রূপে ব্যবস্থিত। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমান অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুতে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ এই দুই প্রকার জ্ঞান নিয়ত অর্থপ্রদর্শক। তাই সম্যক্ জ্ঞানের প্রকারভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি বলেছেন, সম্যক্ জ্ঞান দ্বিবিধ — প্রত্যক্ষ ও অনুমান।

১.৩.৭ সম্যক্ জ্ঞান কত প্রকার ও কী কী?

ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞানের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেন নি, শুধু শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে সম্যক্ দুই প্রকার -- প্রত্যক্ষ ও অনুমান। তিনি ঐ গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও প্রকারভেদে আলোচনা করলেও অনুমানের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেন নি। শুধু শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রত্যক্ষ তাঁর মতে চার প্রকার, যথা — ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন ও যোগীজ্ঞান এবং অনুমান দুই প্রকার, যথা — স্বার্থানুমান পরার্থানুমান। এই দুই প্রকার অনুমান অত্যন্ত ভিন্ন বলে এদের কোন সাধারণ লক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে ধর্মকীর্তি চার প্রকার প্রত্যক্ষ ও দুই প্রকার অনুমানের লক্ষণ আলোচনা করেছেন।

১.৩.৮ প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্য যে কোন প্রকার জ্ঞান কেন সম্যক্ জ্ঞান নয়?

সাক্ষাৎকারী ও বিকল্প ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। এই দুই শ্রেণীর প্রত্যেকটি কিন্তু যথার্থ ও অযথার্থ হতে পারে। সাক্ষাৎকারী যথার্থ জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ এবং সাক্ষাৎকারী অযথার্থ জ্ঞান হল প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান। যথার্থ বিকল্প জ্ঞান হল অনুমান এবং অযথার্থ বিকল্প জ্ঞান হল প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্য কোন প্রকার জ্ঞান বলতে প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্নকে বুঝানো হয়েছে। এই সমস্ত জ্ঞান অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর নিয়ত প্রদর্শক হয় না বলে এই জ্ঞানগুলি সম্যক্ জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্য জ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায়, সেটি অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয় অথবা ভাব ও অভাব-এর মধ্যে অনিয়ত হয়। প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য সমস্ত জ্ঞান বিকল্প জ্ঞান। অনুমানও বিকল্প জ্ঞান। তবে লিঙ্গজ ও অলিঙ্গজ ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার। অনুমান লিঙ্গ জ বিকল্প জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান। লিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ অনুমান লিঙ্গসম্বদ্ধ বা লিঙ্গনিয়ত হওয়ার জন্য অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুকে অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রদর্শন করে বলে সম্যক্ জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন — ইত্যাদি অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান সৎ ও অসতে নিয়ত না হওয়ার জন্য অসম্যক্ জ্ঞান। যদিও প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান অর্থক্রিয়াকারী বস্তুর প্রত্যক্ষের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়, তবু এই জ্ঞান অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান বলে অযথার্থ। সুতরাং কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানই যথার্থ জ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান, অন্য যে কোন প্রকার জ্ঞান অসম্যক্ জ্ঞান।

১.৩.৯ দুই প্রকার সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়

ধর্মকীর্তি বলেছেন, প্রতক্ষের বিষয় স্বলক্ষণ এবং অনুমানের বিষয় সামান্যলক্ষণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বস্তুর অকৃত্রিম ও অনারোপিত রূপের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, অর্থাৎ বস্তুর পরমার্থ সৎরূপের জ্ঞান হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেই বস্তুর অকৃত্রিম রূপ জ্ঞানে ভাসমান হয়। পরে সেই জ্ঞান বিকল্প সহযোগে ঐ বস্তুকে প্রদর্শন

করায়। তবে অনুমানে যে বস্তুটি প্রবৃত্তির বিষয় হয়, তা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় না, লিঙ্গ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয় হয়।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ভাসমান বস্তুটি সাক্ষাৎভাবে সংশয়, বিপর্যয় মুক্ত রূপে জ্ঞানের বিষয় হলেও অনুমানে লিঙ্গের সঙ্গে সংবদ্ধ রূপে পরোক্ষ ভাবে সংশয়, বিপর্যয় মুক্ত রূপে একটি বস্তুর জ্ঞান হয়। এই দুই প্রকারের জ্ঞান সুনির্দিষ্ট ভাবে বস্তুর প্রদর্শক, তাই এই দুই প্রকার জ্ঞানই প্রমাণ, অন্য কোন প্রকার জ্ঞান প্রমাণ নয়। প্রবৃত্তি দ্বারা লভ্য বস্তু প্রদর্শন করায় বলে এই দুই প্রকার জ্ঞানই প্রাপক জ্ঞান এবং প্রাপকত্ব ধর্মের স্থিতির জন্যই এই দুই প্রকার জ্ঞান প্রমাণ।

অন্যভাবে বলা যায়, কেবলমাত্র এই দুই প্রকার জ্ঞান নিয়তার্থপ্রদর্শক বলে প্রমাণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে যে বস্তুর স্বরূপকে প্রতিভাসিত করে, সেই বস্তুটিকে অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপে ব্যবস্থিত দেখায়। অনুমান সাক্ষাৎভাবে বস্তুর স্বরূপকে প্রতিভাসিত করতে না পারলেও, পরোক্ষভাবে একটি বস্তুকে অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপে ব্যবস্থিত দেখায়। অনুমানে তাদাত্ম ও তদুৎপত্তি সম্বন্ধের দ্বারা লিঙ্গের সঙ্গে সম্বদ্ধ বস্তুটি অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপে ব্যবস্থিত হয়। অবশ্য অনুমানে অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সৎ বস্তুকে সৎরূপে এবং অসৎ বস্তুকে অসৎরূপে লিঙ্গসম্বদ্ধভাবে ব্যবস্থিত জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান নিয়ত অর্থপ্রদর্শক বলে এই দুই প্রকার জ্ঞান প্রমাণ, অন্য কোন প্রকার জ্ঞান প্রমাণ নয়।

১.৪ সারসংক্ষেপ

ন্যায়বিন্দু আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ব ও যুক্তিবিদ্যার গ্রন্থ। এটি সূত্রাকারে লিখিত একটি প্রকরণ। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে ধর্মকীর্তি সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করেন নি, ঐ শাস্ত্রের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক্ জ্ঞান-এর বুৎপাদন করেছেন। ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর প্রথম সূত্রে ঐ গ্রন্থের অভিধেয় বা বিষয়বস্তু, প্রয়োজন ইত্যাদি অনুবন্ধের উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সেগুলি হল — ১) প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ, ২) স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ এবং ৩) পরার্থানুমান পরিচ্ছেদ। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে (ক) ন্যায়বিন্দুর অনুবন্ধ — অভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, এবং প্রয়োজনের প্রয়োজন (খ) সম্যক্ জ্ঞানের প্রকার, (গ) প্রত্যক্ষের লক্ষণ, প্রতিবন্ধক, বিষয়, প্রকারভেদ, (ঘ) প্রত্যক্ষে অর্থসারূপ্য ও অর্থপ্রতীতি — ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আবার স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদে স্বার্থানুমানের স্বরূপ, লিঙ্গের স্বরূপ এবং লিঙ্গের প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা আছে।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম সূত্রের অন্তর্গত 'তৎ' এবং 'ব্যুৎপাদ্যতে'-- এই দুটি পদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে যথাক্রমে অভিধেয় এবং প্রয়োজন নির্দেশ করা হয়েছে। অপর দুটি অনুবন্ধ ঐ সূত্রে সামর্থের দ্বারা নির্দেশিত। কোন গ্রন্থ সম্পর্কীত যে সমস্ত বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান পাঠককে ঐ গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী করে, সেই সমস্ত বিষয়কে সাধারণত অনুবন্ধ বলা হয়। যেমন, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু কী, ২) গ্রন্থটি কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ করবে, ৩) গ্রন্থের সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর এবং প্রয়োজনের সম্বন্ধ কী — ইত্যাদি। কোন গ্রন্থকার যদি গ্রন্থারম্ভে অনুবন্ধাদির উল্লেখ না করেন, তবে পাঠকের মনে অনেক অনর্থসম্ভাবনা উৎপন্ন হতে পারে। এই কারণে পাঠকের মনে অর্থসম্ভাবনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের সূত্রে ঐ গ্রন্থের অভিধেয়, প্রয়োজন ইত্যাদি অনুবন্ধের উল্লেখ করেছেন।

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা বিষয়ে ঐ গ্রন্থের দুই টীকাকার ধর্মোত্তর এবং বিনীতদেবের মধ্যে মতভেদ আছে। ধর্মোত্তরের মতে ন্যায়বিন্দুর অনুবন্ধের সংখ্যা তিন, যথা — অভিধেয় বা বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন; কিন্তু বিনীতদেব ধর্মকীর্তি-স্বীকৃত তিনটি অনুবন্ধ স্বীকার করেও চতুর্থ একটি অনুবন্ধ স্বীকার করেছেন, যথা— প্রয়োজনের প্রয়োজন। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অভিধেয় বা বিষয় হল স্যমক্ জ্ঞান, প্রয়োজন হল সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন, গ্রন্থটির শব্দরাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের প্রয়োজনের সম্বন্ধ হল উপায়-উপেয় সম্বন্ধ এবং সম্যক্জ্ঞান-এর সম্বন্ধ হল প্রতিপাদক-প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ এবং সকল পুরুষার্থসিদ্ধি হল ন্যায়বিন্দুর প্রয়োজনের প্রয়োজন।

জ্ঞান দুই প্রকার, যথা — সম্যক্ জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান এবং অসম্যক্ জ্ঞান বা অযথার্থ জ্ঞান। আবার ব্যবস্থাপক ও ব্যবস্থাপ্য ভেদে জ্ঞান দুই প্রকার বলে মনে হয়। ফলে, একই জ্ঞান ব্যবস্থাপক রূপে প্রমাণ এবং ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা বলে তখনই গণ্য হয়, যখন ঐ জ্ঞানটি যথার্থ হয়। যে সম্যক্ জ্ঞান ব্যবস্থাপক রূপে প্রমাণ, সেই সম্যক্জ্ঞানই ব্যবস্থাপ্য রূপে প্রমা। সুতরাং ধর্মকীর্তি যেহেতু প্রমাণবার্তিকে অবিসংবাদি জ্ঞানকে প্রমাণ বলেছেন, সেহেতু সহজেই বলা যায়, সম্যক্ জ্ঞান হল অবিসংবাদি জ্ঞান।

দুই টীকাকার ধর্মোত্তর এবং বিনীতদেব অবিসংবাদক জ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলেছেন। সাধারণত 'অবিসংবাদক' বলতে অবিপরীত বুঝায়। তাই অবিসংবাদক জ্ঞান বা অবিসংবাদি জ্ঞান সাধারণ অর্থে অবিপরীত জ্ঞান। কিন্তু 'অবিসংবাদক' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করলে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সম্ভবত এই কারণেই টীকাকারগণ 'অবিসংবদক' কথাটির অর্থ করেছেন প্রবৃত্তি-বিষয়-প্রদর্শক বা অর্থক্রিয়াসমর্থ বস্তুর প্রদর্শক। জ্ঞানে প্রবৃত্তির বিষয়টি প্রদর্শিত হয় বলে জ্ঞান প্রবর্তক, এবং প্রবর্তক জ্ঞানে প্রাপণশক্তি আছে বলে সেই জ্ঞানই প্রাপক। বস্তুত, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদর্শকত্বই প্রবর্তকত্ব এবং প্রবর্তকত্বই প্রাপণশক্তি। সুতরাং, যে জ্ঞান প্রদর্শক, সেই জ্ঞানই প্রবর্তক ও প্রাপক। আবার যে জ্ঞান অর্থ-প্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক, সেই জ্ঞানেই অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয়। অর্থপ্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপে যে জ্ঞান অর্থপ্রতীতি জন্মায়, সেই জ্ঞান প্রমাণ এবং সেই একই জ্ঞানে অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয় বলে সেই জ্ঞানটিই ঐ প্রমাণের ফল বা প্রমা। যে বিষয়ের জ্ঞান পূর্বে হয়ে গেছে, সেই বিষয়ের জ্ঞান সম্যক্জ্ঞান নয়। বৌদ্ধ মতে, একটি প্রমাণের দ্বারা কোন বস্তু বা বিষয় একবার জ্ঞাত হলে সেই বিষয়ে পুনরায় কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা অযৌক্তিক।

গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি বলেছেন, সম্যক্ জ্ঞান দ্বিবিধ - প্রত্যক্ষ ও অনুমান। ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞানের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেন নি, শুধু শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তাঁর মতে সম্যক্ জ্ঞান দুই প্রকার — প্রত্যক্ষ ও অনুমান। তিনি ঐ গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ ও প্রকারভেদ আলোচনা করলেও অনুমানের কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেন নি, শুধু শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রত্যক্ষ তাঁর মতে চার প্রকার, যথা — ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন ও যোগীজ্ঞান এবং অনুমান দুই প্রকার যথা — স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। এই দুই প্রকার অনুমান অত্যন্ত ভিন্ন বলে এদের কোন সাধারণ লক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয় নি। তবে ধর্মকীর্তি চার প্রকার প্রত্যক্ষ ও দুই প্রকার অনুমানের লক্ষণ আলোচনা করেছেন।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়া অন্য জ্ঞানের দ্বারা যে বস্তু পাওয়া যায়, সেটি অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয় অথবা ভাব ও অভাব-এর মধ্যে অনিয়ত হয়। প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য সমস্ত জ্ঞান বিকল্প জ্ঞান। অনুমানও বিকল্প জ্ঞান।

তবে লিঙ্গজ ও অলিঙ্গজ ভেদে বিকল্প জ্ঞান দুই প্রকার। অনুমান লিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান। লিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান অর্থাৎ অনুমান — লিঙ্গনিয়ত হওয়ার জন্য অর্থক্রিয়াসমর্থ-বস্তুকে অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রদর্শন করে বলে সম্যক্ জ্ঞান। কিন্তু প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, সংশয়, বিপর্যয়, স্মৃতি ও স্বপ্ন — ইত্যাদি অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান সৎ ও অসতে নিয়ত না হওয়ার জন্য অসম্যক্ জ্ঞান। যদিও প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান অর্থক্রিয়াকারী বস্তুর প্রত্যক্ষের দ্বারাই প্রবর্তিত হয়, তবু এই জ্ঞান অলিঙ্গজ বিকল্প জ্ঞান বলে অযথার্থ । সুতরাং কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানই যথার্থ জ্ঞান বা সম্যক্ জ্ঞান অন্য যে কোন প্রকার জ্ঞান অসম্যক্ জ্ঞান।

ধর্মকীর্তি বলেছেন, প্রত্যক্ষের বিষয় স্বলক্ষণ এবং অনুমানের বিষয় সমান্যলক্ষণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বস্তুর অকৃত্রিম ও অনারোপিত রূপের সাক্ষাৎ প্রতীতি হয়, অর্থাৎ বস্তুর পরমার্থ সৎ রূপের জ্ঞান হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেই বস্তুর অকৃত্রিম রূপ জ্ঞানে ভাসমান হয়। পরে সেই জ্ঞান বিকল্প সহযোগে ঐ বস্তুকে প্রদর্শন করায়। তবে অনুমানে যে বস্তুটি প্রবৃত্তির বিষয় হয়, তা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় না, লিঙ্গ দর্শনের মাধ্যমে জ্ঞানের বিষয় হয়।

১.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

প্রকরণ ঃ যে গ্রন্থে কোন শাস্ত্রের সকল প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে নির্বাচিত একটি বিশেষ বিষয়ে সুবিন্যস্ত, সুস্পষ্ট ও নতুন বিচারযুক্ত বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাকে প্রকরণ বলা হয়। ন্যায়বিন্দু একটি প্রকরণ।

বুৎপাদন ঃ বিরুদ্ধমত খণ্ডণপূর্বক প্রতিপাদন। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন করা হয়েছে।

অনুবন্ধ ঃ কোন গ্রন্থ সম্পর্কীত যে সমস্ত তথ্য বা বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান পাঠককে ঐ গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী করে তুলতে সাহায্য করে, সেগুলিকে অনুবন্ধ বলা হয়। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অনুবন্ধের সংখ্যা চার, যথা- অভিধেয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজনের প্রয়োজন। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রথম সূত্র হল 'সম্যগ্জ্ঞানপূর্বিকা সর্বপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদ্ ব্যুৎপাদ্যতে'- এই সূত্রের অর্ন্তগত 'তৎ' এবং ' ব্যুৎপাদ্যতে' — এই দুটি পদের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে যথাক্রমে অভিধেয় এবং প্রয়োজন নির্দেশ করা হয়েছে। অপর দুই অনুবন্ধ ঐ সূত্রে সামর্থের দ্বারা নির্দেশিত।

অভিধেয় ঃ কোন গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ন্যায়বিন্দুর অভিধেয় হল সম্যক্ জ্ঞান।

সম্যক্জ্ঞান ঃ সম্যক্ জ্ঞান মানে যথার্থ জ্ঞান। যে জ্ঞান অবিসংবাদক বা অবিসংবাদি, তাকে সাম্যক্ জ্ঞান বলে। এরূপ জ্ঞান সংশয়মুক্ত, বিপর্যয় বা ভ্রান্তিশূণ্য, অনধিগত বিষয়ক (অর্থাৎ কোন অজ্ঞাত বিষয়ের সর্বপ্রথম প্রতীতি) এবং অর্থক্রিয়াকারী হয়ে থাকে।

প্রয়োজন ঃ কোন গ্রন্থ রচনা কিংবা পাঠের পক্ষে যে যুক্তি বা আবশ্যকতা থাকে, তাকে ঐ গ্রন্থের প্রয়োজন বলে। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজন হল সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন।

সম্বন্ধ ঃ কোন গ্রন্থের অক্ষররাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের অভিধেয়ের এবং প্রয়োজনের সম্পর্ক হল তৃতীয় অনুবন্ধ সম্বন্ধ। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের অক্ষররাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের অভিধেয়ের সম্বন্ধ

হল প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধ এবং ঐ গ্রন্থের অক্ষররাশির সঙ্গে ঐ গ্রন্থের প্রয়োজনের সম্বন্ধ হল উপায়-উপেয় সম্বন্ধ।

প্রয়োজনের প্রয়োজন ঃ কোন গ্রন্থের প্রয়োজনের পক্ষে যে যুক্তি বা আবশ্যকতা থাকে, তাকে ঐ গ্রন্থের প্রয়োজনের প্রয়োজন বলে। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজন হল সম্যক্ জ্ঞানের ব্যুৎপাদন।
সম্যক্জ্ঞানের ব্যুৎপাদন সকল পরুষার্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক। তাই ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের প্রয়োজনের প্রয়োজন হল সকল পুরুষার্থসিদ্ধি।

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. Explain the *abhidheya*, *prayojana*, *sambandha* and *prayojana* of *prayojana* of the treatise *Nyayabindu*.
2. What is *samyak jnana*? What are the types of *samyak jnana*? Explain after the treatise *Nyayabindu*.

Short answer type :

1. Why is *samyak jnana* called *avisamvadi jnana* or *avisamvadaka jnana*?
2. What is *purusartha*? What is meant by *purusarthasiddhi*? What, again is *sarvapurusarthasiddi*?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (সম্পাদিত) ঃ *আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত ন্যায়বিন্দু (আচার্য ধর্মোত্তর রচিত টীকা সহ)*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০০৬

২) সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার আচার্য (সম্পাদিত) ঃ *ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু*, প্রত্যক্ষ ও স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ, অখণ্ড সংস্করণ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭

৩) Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol I, Dover Publications, Inc. New York, 1962

৪) Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol II, Dover Publications, Inc. New York, 1962

পাঠপরিকল্পনা

২.১ প্রত্যক্ষের লক্ষণ

২.১.১ প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্র ও তার অর্থ

২.১.২ প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়

২.১.৩ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদটি সংযোজনের যৌক্তিকতা

২.১.৪ কল্পনার লক্ষণসূত্র ও তার অর্থ

২.১.৫ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'অভ্রান্তম্' পদটি সংযোজনের হেতু

২.১.৬ প্রত্যক্ষে ভ্রান্তির কারণ

২.১.৭ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' পদটি সংযোজনের যৌক্তিকতা

২.২ প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ

২.২.১ ইন্দ্রিয়জ্ঞান

২.২.২ মনোবিজ্ঞান

২.২.৩ আত্মসংবেদন

২.২.৪ যোগীজ্ঞান

২.৩ প্রত্যক্ষের বিষয় ঃ স্বলক্ষণ

২.৪ স্বলক্ষণ-ভিন্ন বিষয় ঃ সামান্যলক্ষণ

২.৫ প্রত্যক্ষে অর্থসারূপ্য

২.৬ প্রত্যক্ষে অর্থপ্রতীতির সিদ্ধি

২.৭ সারসংক্ষেপ

২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ প্রত্যক্ষের লক্ষণ

২.১.১ প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্র ও তার অর্থ

ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের চতুর্থ সূত্রটি হল প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্র। সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

''তত্র কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্।''

সাধারণভাবে এই সূত্রটির অর্থ হল — (প্রত্যক্ষ ও অনুমান-রূপ) দুই প্রকার সম্যক্ জ্ঞানের মধ্যে যে সম্যক্ জ্ঞানটি কল্পনাস্বভাব ও ভ্রান্তি রহিত, তাকে প্রত্যক্ষ বলে। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ হল সেই সম্যক্ জ্ঞান, যেটি কল্পনাস্বভাবশূণ্য ও ভ্রান্তিরহিত। সাধারণত, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। কিন্তু ধর্মকীর্তি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলেননি। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়াও আরো তিন প্রকার জ্ঞান আছে, যেগুলি কল্পনাস্বভাবশূণ্য ও ভ্রান্তিরহিত এবং সেই কারণে প্রত্যক্ষ-পদবাচ্য। ধর্মকীর্তির মতে, চার প্রকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপধর্ম অর্থসাক্ষাৎকারিত্ব হলেও কল্পনাপোঢ়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব তার ব্যবর্তক ধর্ম। এই দুটি ধর্ম প্রত্যক্ষকে অন্য জ্ঞান থেকে পৃথক করে।

২.১.২ প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যক্ষের লক্ষণসূত্রটিতে যে তিনটি পদ আছে, যথা— 'তত্র', 'কাল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' এবং 'প্রত্যক্ষম্', তাদের মধ্যে 'তত্র' পদটির অর্থ 'সেখানে'। নির্ধারণে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে পদটিকে প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষকে সম্যক্ জ্ঞান-সমুদায়ের একদেশরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই, ঐ পদের দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানের দুই প্রকার — প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সমুদায় বা একত্রাবস্থান থেকে প্রত্যক্ষকে পৃথক করে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সাধারণভাবে মনে হয়, সূত্রটিতে 'প্রত্যক্ষম্' পদটি লক্ষ্য এবং 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' তার লক্ষণ। কিন্তু, এখানে 'প্রত্যক্ষম্' ও 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' এর মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাসম্বন্ধ নেই। বিনীতদেবের মতে 'প্রত্যক্ষম্' হল সংজ্ঞা এবং 'কল্পনাপোঢ়ভ্রান্তম্' সংজ্ঞী। সংজ্ঞা মানে 'নাম' এবং সংজ্ঞী মানে 'যার নাম আছে' অর্থাৎ 'নামযুক্ত বস্তু'। নামযুক্ত বস্তু বললে স্বরূপের কথা বলা হয় না। তাই ধর্মকীর্তি বলেছেন 'প্রত্যক্ষম্' হল উদ্দেশ্য এবং 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' হল বিধেয়। বস্তুত, বিধেয় উদ্দেশ্যের স্বরূপ প্রকাশ করে, অর্থাৎ বিধেয়ের দ্বারা উদ্দেশ্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়।

ধর্মোত্তরের মতে, বুৎপত্তিগত অর্থে প্রত্যক্ষ হল প্রতিগতমাশ্রিতমর্থম্ বা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান। সাধারণত ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। কিন্তু ধর্মকীর্তি কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উৎপন্ন জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ বলেননি। তাঁর মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ছাড়াও আরো তিন প্রকার অর্থসাক্ষাৎকারী জ্ঞান আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ পদবাচ্য। অর্থাৎ তাঁর মতে, প্রত্যক্ষ চার প্রকার, যথা — ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন এবং যোগীজ্ঞান। এই চার প্রকার প্রত্যক্ষই অর্থসাক্ষাৎকারী জ্ঞান। তাই, যে জ্ঞান অর্থসাক্ষাৎকারী তাকে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ বলা হয় (''যৎ কিঞ্চিদর্থস্য সাক্ষাৎকারী জ্ঞানং তৎ প্রত্যক্ষমুচ্যতে'')। কিন্তু, 'অর্থসাক্ষাৎকারিত্ব' প্রত্যক্ষের স্বরূপ-ধর্ম হলেও 'কল্পনাপোঢ়ত্ব' ও 'অভ্রান্তত্ব' তার ব্যবর্তক ধর্ম। এই দুটি ধর্ম প্রত্যক্ষকে অন্য প্রমাণ বা জ্ঞান থেকে ব্যবৃত্ত করে বা পৃথক করে।

২.১.৩ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদটি সংযোজনের যৌক্তিকতা

প্রত্যক্ষের লক্ষণে কেবলমাত্র 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদটি সংযোজনের দ্বারাই অনুমান নিবৃত্তি সম্ভব হয়। শুদ্ধ (বা নির্বিকল্পক) প্রত্যক্ষ ছাড়া কোন জ্ঞানই কল্পনাপোঢ় নয়। শুদ্ধ (বা নির্বিকল্পক) প্রত্যক্ষে বস্তুর অকৃত্রিম ও অনারোপিত রূপের জ্ঞান হয়। নির্বকল্পক প্রত্যক্ষই কল্পনাপোঢ় ও অভ্রান্ত। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ফল। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়েই অভ্রান্ত হলেও কল্পনাপোঢ় নয়, কল্পনাযুক্ত। (প্রত্যক্ষের লক্ষণে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষেরই স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাবহারে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ ও অনুমান উভয়েই প্রমাণরূপে স্বীকৃত হলেও পরমার্থ সৎ বস্তুর জ্ঞানে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই প্রমাণ।)

২.১.৪ কল্পনার লক্ষণসূত্র ও তার অর্থ

'কল্পনাপোঢ়ম্' এই সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য হল 'কল্পনায়া অপোঢ়ম্'। 'অপোঢ়ম্' কথাটির অর্থ শূন্য বা রহিত। সুতরাং 'কল্পনাপোঢ়ম্' কথাটির অর্থ কল্পনাশূন্য বা কল্পনারহিত। আচার্য ধর্মকীর্তি 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের পঞ্চম সূত্রে 'কল্পনা' শব্দের অর্থ নির্দেশ করেছেন এইভাবে — ''অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাসাপ্রতীতিঃ কল্পনা'' । অর্থাৎ, যে প্রতীতি জ্ঞানকে শব্দের দ্বারা প্রকাশের যোগ্য করে দেয়, তাকে কল্পনা বলে।

'অভিলাপ' শব্দের অর্থ বাচক বা শব্দ। অভিলাপের সঙ্গে সংসর্গ হল অভিলাপসংসর্গ। যখন একটি বস্তুর জ্ঞানে অভিধেয়বস্তুর আকার ও তার বাচক শব্দের আকার গ্রাহ্যাকারে মিলিত হয়, তখন সেই মিলনকে অভিলাপসংসর্গ বলে। অভিলাপসংসর্গযুক্ত প্রতিভাসপ্রতীতি বা জ্ঞান যেমন কল্পনা, অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস-প্রতীতিও তেমনি কল্পনা। এককথায়, যে জ্ঞানে বস্তুর আকারের প্রতিভাস শব্দ-সংসর্গের যোগ্য, তাকে কল্পনা বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, নীল (বর্ণ)-এর প্রথম দর্শনে নীলের আভাস মাত্র হয়, 'এটা নীল'— এরূপ জ্ঞান হয় না। তাই, এই জ্ঞান অভিলাপসংসর্গ-রহিত এবং সেই কারণে নির্বিকল্পক। কিন্তু, যখন 'এটা নীল'— এরূপ জ্ঞান হয়, তখন এই জ্ঞান অভিলাপসংসর্গযুক্ত হওয়ায় সবিকল্পক। তবে শব্দব্যবহার জানা না থাকায় শিশু ও মূকব্যক্তির যে কেবল নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় না, এমন নয়। তারা যখন একটি দৃশ্যমান বস্তুকে পূর্বদৃষ্ট বস্তুরূপে দর্শন করে, তখন তাদের জ্ঞানটি কল্পনাযুক্ত হওয়ায় (শব্দসংসর্গ-যুক্ত না হলেও) শব্দ-সংসর্গযোগ্য। তাই শিশু ও মূকব্যক্তির জ্ঞানে অভিলাপসংসর্গযুক্ত প্রতিভাস না থাকলেও অভিলাপসংসর্গযোগ্য প্রতিভাস থাকে। যা অভিলাপসংসর্গযোগ্য তার অভিলাপসংসর্গযুক্ত হতে কোন যৌক্তিক বাধা নেই। সুতরাং, অভিলাপসংসর্গযোগ্য এবং অভিলাপসংসর্গযুক্ত — এই উভয় প্রকার প্রতিভাস-প্রতীতিকেই কল্পনা বলে নির্দেশ করা হয়েছে।

কল্পনা সাধারণত পাঁচপ্রকার, যথা — জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম ও দ্রব্য। এই পাঁচ প্রকার কল্পনার উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

(১) নামকল্পনা ঃ ইনি চৈত্র, (২) জাতিকল্পনা ঃ এই প্রাণীটি গরু, (৩) গুণকল্পনা ঃ বস্তুটি সাদা, (৪) ক্রিয়াকল্পনা ঃ দেবদত্ত যাচ্ছে, (৫) দ্রব্য কল্পনা ঃ মানুষটি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এই পাঁচ প্রকার কল্পনাই মিথ্যা। কারণ, প্রথমোক্ত তিন প্রকার কল্পনার ক্ষেত্রে অভেদে ভেদ আরোপ করা হয় এবং শেষোক্ত দুই প্রকার কল্পনার ক্ষেত্রে ভেদে অভেদ আরোপ করা হয়। অবশ্য ধর্মকীর্তির মতে, সর্বপ্রকার কল্পনাই মূলত নামকল্পনা। 'প্রমাণবিনিশ্চয়' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন, 'অভিলাপিনী প্রতীতিঃ কল্পনা''। অর্থাৎ, যে প্রতীতিকে নাম বা শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা যায় তাকে কল্পনা বলা হয়। নাম বা শব্দ দিয়েই তো জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য ইত্যাদিকে প্রকাশ করা যায়। কল্পনামাত্রই মনের সৃষ্টি, যা বস্তুধর্ম থেকে ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায়, (ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ক্ষেত্রে) কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের নিকট উপস্থিত হওয়ামাত্র ঐ বস্তুর যে স্ফুট বা স্পষ্টরূপের প্রতীতি হয়, তা কল্পনাশূন্য বা নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞান ক্ষণিক স্বলক্ষণ বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান। এটা বস্তুর অকৃত্রিম অনারোপিত রূপের জ্ঞান। পরক্ষণে ঐ বস্তুটিকে আমরা এটা ঘট, এটা পট — ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করি। তখন ঐ ক্ষণিক স্বলক্ষণ বস্তুতে নামজাত্যাদি কল্পনা আরোপ করি। অর্থাৎ ঐ বস্তুটিকে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য ইত্যাদি বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করি। এই জ্ঞান সবিকল্পক বা সামান্যলক্ষণ বস্তুর জ্ঞান।

২.১.৫ প্রত্যক্ষের লক্ষণে অভ্রান্তম্ পদটি সংযোজনের হেতু

আচার্য্য বিনীতদেব 'অভ্রান্তম্' পদটিকে ব্যাখ্যা করেছেন ''ন ভ্রান্তম্ অভ্রান্তম্''— এই ভাবে। অর্থাৎ, যে জ্ঞান ভ্রান্ত নয়, তাই অভ্রান্ত। তাঁর মতে, এরূপ জ্ঞান প্রাপক-বিষয়ে অবিসংবাদক, আলম্বন-বিষয়ে নয়। 'অভ্রান্তম্' পদটিকে আলম্বন-বিষয়ে অবিসংবাদক অর্থে গ্রহণ করলে সম্যক্ জ্ঞান বিষয়ে যোগাচার মত খণ্ডিত হয়। যোগাচার মতানুযায়ী, বুদ্ধের জ্ঞান ভিন্ন সকল আলম্বন জ্ঞানই ভ্রান্ত। কারণ, যোগাচারগণ মনে করেন যে, জ্ঞানাতিরিক্ত কোন বাহ্যবস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, 'অভ্রান্তম্' পদটিকে প্রাপক-বিষয়ে অবিসংবাদক অর্থে গ্রহণ করলে যোগাচার এবং সৌত্রান্তিক — এই উভয় মত গ্রাহ্য হয়। আবার আচার্য ধর্মোত্তর 'অভ্রান্তম্' পদটিকে ব্যাখ্যা করেছেন 'অর্থ-ক্রিয়াক্ষমে বস্তুরূপে'বিপর্যস্তম্'' এইভাবে। অর্থাৎ, যে জ্ঞান বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপের বিপরীত হয় না এবং অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপের প্রকাশক তা অভ্রান্ত। বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ কী? সন্নিবেশ (বা গঠন বিশেষ)- রূপ উপাধি বিশিষ্ট (ইন্দ্রিয়গোচর) পরমানু সংঘাতকেই বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপ বলা হয়েছে। বিশেষ প্রকার সন্নিবেশের জন্য রূপাদি পরমাণুই ঘটাদি-রূপে জলবহনাদি অর্থক্রিয়াতে সমর্থ হয়। যে জ্ঞান বস্তুর অর্থক্রিয়াসমর্থ রূপের প্রকাশক তা অভ্রান্ত।

২.১.৬ প্রত্যক্ষে ভ্রান্তির কারণ

প্রত্যক্ষে ভ্রান্তি নানা কারণে হয়ে থাকে। গ্রন্থকার আচার্য ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর ষষ্ঠ সূত্রে ভ্রান্তির চারটি কারণ দেখিয়েছেন। যেমন, ইন্দ্রিয়গত, বিষয়গত, স্থানগত এবং শরীরগত। উদাহরণের সাহায্যে প্রত্যক্ষের ভ্রান্তির এই কারণগুলি ব্যাখ্যা করা যাক।

ইন্দ্রিয়গত কারণে ভ্রান্তি ঃ তিমির রোগগস্থ ব্যক্তিরা যে একটি চাঁদে দুটি চাঁদ দেখে, তা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ নয়, প্রত্যক্ষাভাস। এরূপ ভ্রান্তি ঘটে ইন্দ্রিয়গত কারণে।

বিষয়গত কারণে ভ্রান্তি ঃ একটি অলাত বা মশালের আশু (দ্রুত) ঘুর্ণনের ফলে অলাত চক্রের যে জ্ঞান হয়, সেটি বিষয়গত কারণে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ। একটি মশালকে দ্রুত ঘুরালে দূর থেকে মনে হয় একটি আলোকচক্র যেন স্থির হয়ে আছে। মশালটি ধীরে ঘুরালে ঐরকম আলাকচক্রের জ্ঞান হয় না।

স্থানগত কারণে ভ্রান্তি ঃ চলমান নৌযানাদি থেকে স্থির বস্তুকে যে গতিশীল বলে জ্ঞান হয়, তা স্থানগত কারণে উৎপন্ন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ।

শরীরগত কারণে ভ্রান্তি ঃ বাত, পিত্ত ও কফের বৈষম্যের ফলে শরীরে যে বৈষম্য উৎপন্ন হয়, তার প্রভাবে জ্বলন্ত স্তম্ভ দর্শনের মত যে সমস্ত জ্ঞান হয় সেগুলি শরীরগত কারণে উৎপন্ন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ।

২.১.৭ প্রত্যক্ষের লক্ষণে 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' পদটি সংযোজনের যৌক্তিকতা

আচার্য বিনীতদেবের মত অনুযায়ী বলা যায়, দ্বিচন্দ্র জ্ঞান (বা তিমির রোগগ্রস্থ রোগীর জ্ঞান) জাতীয় অসম্যক্ জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য 'অভ্রান্তম্' পদটি এবং অনুমানের নিবৃত্তির জন্য 'কল্পনাপোঢ়ম্' পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে প্রয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রত্যক্ষকে 'কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তম্' বলাতে স্বপ্নজ্ঞান এবং রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ইত্যাদি অসম্যক্ জ্ঞান যে প্রত্যক্ষের অন্তর্গত নয়, তা বুঝা যায়। তবে আচার্য ধর্মোত্তর এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, 'কল্পনাপোঢ়ম্' ও 'অভ্রান্তম্' পদ দুটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে সংযোজন করা হয়েছে প্রত্যক্ষের স্বরূপ বিষয়ে বিপ্রতিপত্তি (বা বিরুদ্ধ মত) নিরাকরণের জন্য, অনুমান নিবৃত্তির জন্য নয়।

আচার্য ধর্মোত্তরের মতে, প্রত্যক্ষ সর্ববাদি সম্মতভাবে অর্থসাক্ষাৎকারী জ্ঞান বলে স্বীকৃত হলেও তার অপর দুটি বৈশিষ্ট্য হল কল্পনাপোঢ়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব। অর্থসাক্ষাৎকারিত্বই যদি প্রত্যক্ষের স্বরূপ হয়, তবে প্রত্যক্ষের লক্ষণে তার অপর দুটি বৈশিষ্ট্য কল্পনাপোঢ়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব সংযোজনের যৌক্তিকতা কী? এরূপ আপত্তির উত্তরে আচার্য ধর্মোত্তরের বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞানে সংশয়ের ও ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে বলেই বলা হয়েছে— বস্তুর সাক্ষাৎকারী জ্ঞান যদি কল্পনা সংযোগ রহিত ও অভ্রান্ত হয়, তবে তা যথার্থ প্রত্যক্ষ বলে স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন, স্থির বৃক্ষকে গমনশীল বৃক্ষরূপে দর্শন করবার মত ভ্রান্ত প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণেই 'অভ্রান্তম্'পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে সংযোজনের সার্থকতা। চলমান যান থেকে স্থির বৃক্ষকে গমনশীল বৃক্ষরূপে দর্শন করবার পর সেই বৃক্ষের জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে আমরা একটি বৃক্ষকে অবশ্যই পাই। সুতরাং, এই জ্ঞান অবিসংবাদক। এরূপ আশংকার উত্তরে বলা হয়েছে যে, গমনশীল বৃক্ষ দর্শনান্তর সেই বৃক্ষের জ্ঞানের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে আমরা যে বৃক্ষকে পাই সেটি যদি স্থির বৃক্ষ হত, তবে আমাদের জ্ঞানটি অবিসংবাদক বা সম্যক্ জ্ঞান হত। কিন্তু, গমনশীল বৃক্ষ লাভ করতে উদ্যত হয়ে আমরা একটি স্থির বৃক্ষ পাই। ফলে আমাদের জ্ঞানটি বিসংবাদক হয়ে পড়ে। তাই 'ভ্রম জ্ঞানে অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব'— এরূপ বিপ্রতিপত্তি নিরাকরণের জন্যই প্রকৃতপক্ষে 'অভ্রান্তম্' পদটি প্রত্যক্ষের লক্ষণে সংযোজিত।

গ্রন্থকার আচার্য ধর্মকীর্তি তাই বলেছেন, বস্তুর অকৃত্রিম ও অনারোপিত রূপের কল্পনা ও সর্বপ্রকার ভ্রান্তি রহিত জ্ঞানই যথার্থ প্রত্যক্ষ।

২.২ প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ

আচার্য ধর্মকীর্তি 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের চতুর্থ সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে— ''তত্র কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্''। অর্থাৎ তাঁর মতে, 'প্রত্যক্ষ ও অনুমান-রূপ দুই প্রকার সম্যক্ জ্ঞানের মধ্যে যা কল্পনাস্বভাব ও ভ্রান্তি রহিত তাকে প্রত্যক্ষ বলে।' প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করবার পর তিনি কল্পনার স্বরূপ ও ভ্রান্তির কারণ নির্দেশ করেছেন ঐ গ্রন্থের যথাক্রমে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে। তারপর তিনি প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের সপ্তম সূত্রে ধর্মকীর্তি প্রত্যক্ষের প্রকার বিষয়ে বিবিধ বিপ্রতিপত্তি (বা বিরুদ্ধ মত) নিরাকরণের জন্য বলেছেন— 'তচ্চতুর্বিধম্''। 'তৎ শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষকে নির্দেশ করা হয়েছে এবং 'চতুর্বিধম্' পদের অর্থ 'চার প্রকার'। তাই সূত্রটির অর্থ হল 'প্রত্যক্ষ চার প্রকার'। 'ন্যায়বিন্দু'র অন্যতম টীকাকার ধর্মোত্তর মনে করেন যে যাঁরা মনোবিজ্ঞান, স্বসংবেদন ও যোগীজ্ঞানে দোষ

উদ্ভাবন করেন, তাঁদের মত খণ্ডনের জন্যই বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ চার প্রকার। এই চার প্রকার প্রত্যক্ষ হল — (১) ইন্দ্রিয়জ্ঞান, (২) মনোবিজ্ঞান (৩) স্বসংবেদন ও (৪) যোগীজ্ঞান। 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের অষ্টম থেকে একাদশ সংখ্যক সূত্রে ধর্মকীর্তি এই চতুর্বিধ প্রত্যক্ষের লক্ষণ যথাক্রমে নির্দেশ করেছেন।

২.২.১ ইন্দ্রিয়জ্ঞান

'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের অষ্টম সূত্র হল ''ইন্দ্রিয়জ্ঞানম্''। টীকাকার ধর্মোত্তরের মতে, 'ইন্দ্রিয়জ্ঞানম্'' বলতে গ্রন্থকার ধর্মকীর্তি ''ইন্দ্রিয়স্য জ্ঞানম্'' বা ''ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানম্'' বুঝিয়েছেন। ''ইন্দ্রিয়স্য জ্ঞানম্''- এর অর্থ ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান এবং ''ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানম''- এর অর্থ ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান। 'ইন্দ্রিয়জ্ঞান'কে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বললে বৈভাষিক মত খণ্ডিত হয়। বৈভাষিক মতে ইন্দ্রিয়ই দ্রষ্টা। তাঁরা বলেন, ''চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি''। অর্থাৎ চক্ষুই রূপ দর্শন করে। কিন্তু ধর্মকীর্তির মতে ইন্দ্রিয় দ্রষ্টা নয়, জ্ঞানই দ্রষ্টা। জ্ঞানই রূপ দর্শন করতে পারে, চক্ষু-ইন্দ্রিয় রূপের দ্রষ্টা নয়। তাই রূপাদি দর্শনের ক্ষেত্রে জ্ঞানই প্রমাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রমাণ নয়। তবে, 'ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান' বললে শুধু বৈভাষিক মত খণ্ডিত হয় এমন নয়, যাঁরা বলেন, রূপাদির জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সাথে যোগ থাকায় ইন্দ্রিয়ই প্রমাণ — সেই মীমাংসকদের মতও খণ্ডিত হয়।

কিন্তু, 'ইন্দ্রিয়জ্ঞান'কে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বললে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বুঝায় না ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞানও বুঝায়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদি ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষনয়, অনুমান। কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির জ্ঞান হলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান অনুমান প্রমাণের দ্বারা হয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা হয় না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তাদের কার্য থেকে তাদের অস্তিত্ব অনুমান করি মাত্র। তাই, 'ইন্দ্রিয়জ্ঞান'- এর দ্বারা যাতে ইন্দ্রিয়বিষয়ক জ্ঞান বা ইন্দ্রিয়ানুমান না বুঝায়, সেই উদ্দেশ্যে ধর্মোত্তর 'ইন্দ্রিয়জ্ঞান'-এর অর্থ করেছেন— 'ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান' বা 'ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান'। 'ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান' অবশ্যই ইন্দ্রিয়ানুমান থেকে ভিন্ন।

২.২.২ মনোবিজ্ঞান

আচার্য ধর্মকীর্তি 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের নবম সূত্রে মনোবিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে — 'স্ববিষয়ানন্তর বিষয়সহকারিণেন্দ্রিয়জ্ঞানেন সমনন্তর প্রত্যয়েন জনিতং তন্মনোবিজ্ঞানম্''। 'স্ব' শব্দের অর্থ 'আপন' বা 'নিজের' এবং 'অনন্তর' শব্দের অর্থ 'অন্তর বা ব্যাবধান রহিত'। যেহেতু এই সূত্রের পূর্ববর্তী সূত্রে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে, তাই 'স্ব' শব্দের দ্বারা এখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। তাই 'স্ববিষয়ান্তর' কথাটির অর্থ হল 'ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আপন বিষয়ের অব্যবহিত পরবর্তী'। আবার 'সমনন্তর' কথাটির অর্থ হল সম বা সমান জাতীয় এবং অনন্তর বা ব্যবাধান রহিত। সুতরাং, সাধারণভাবে সূত্রটির অর্থ হল এই যে, (ইন্দ্রিয়জ্ঞানের) আপন বিষয়ের অব্যবহিত পরক্ষণে ঐ বিষয়ের সহকারী সমনন্তর প্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে মনোবিজ্ঞান বলে।

যে ক্ষণে ইন্দ্রিয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তার ঠিক পরক্ষণেই মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ফলে, ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান একসন্তানবর্তি বা একই সন্তানপ্রবাহের অন্তর্গত। এই দুই প্রকার জ্ঞানের মধ্যে অন্তর বা ব্যবধান না থাকায় দ্বিতীয় ক্ষণে জাত জ্ঞান মনোবিজ্ঞানকে প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সমানজাতীয় বলা হয়েছে। প্রথম ক্ষণে স্বলক্ষণ বস্তুর একটি ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান হয়, যাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলা হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান উৎপন্ন হবার ঠিক পরক্ষণে অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্ষণে অপর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই দ্বিতীয় জ্ঞানটি হল মনোবিজ্ঞান।

এই যে একটি জ্ঞান উৎপন্ন হবার অব্যবহিত পরক্ষণে অপর একটি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়— এই জ্ঞানক্ষণ-পরম্পরাকে বলে জ্ঞানধারা। একটি জ্ঞানধারায় পূর্ববর্তী জ্ঞানক্ষণটি হল উপাদান এবং তার ঠিক পরবর্তী জ্ঞানক্ষণটি হল উপাদেয়। জ্ঞানধারান্তর্গত উপাদানজ্ঞানকে সমনন্তর প্রত্যয় বলা হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মনোবিজ্ঞানের উপাদানজ্ঞান। তাই মনোবিজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয়জ্ঞানটি ঐ মনোবিজ্ঞানের সমনন্তর প্রত্যয়। জ্ঞানধারান্তর্গত দ্বিতীয় ক্ষণটিকে এককার্যকারী অর্থে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহকারী বলা হয়েছে। সহকারী দুই প্রকার হতে পারে। যথা—'পরস্পর সহকারী' (অর্থাৎ যা পরস্পরের সহায়তায় একটি অতিশয় উৎপন্ন করে সেই অতিশয় থেকে কার্য উৎপন্ন করে) এবং 'এককার্যকারী' (অর্থাৎ, যা একত্রে কার্য উৎপাদন করে)। সুতরাং, মনোবিজ্ঞানের তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা — ১) মনোবিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়, ২) মনোবিজ্ঞানের বিষয়টি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয়ের সমান (বা হুবহু প্রতিরূপ) এবং ৩) যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে একটি মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞানটি ও তার কার্য মনোবিজ্ঞান একই সন্তানপ্রবাহের (বা জ্ঞানধারার) অন্তর্গত। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিবিধ আপত্তি খণ্ডিত হয়।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা এই বিপ্রতিপত্তি খণ্ডিত হয় যে অন্ধ-বধিরাদিরও মনোবিজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। যেহেতু মনোবিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়, সেহেতু যে ব্যক্তির কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়জ্ঞান হয়নি, তার ঐ বিষয়ে মনোবিজ্ঞান হতে পারে না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 'মনোবিজ্ঞান গৃহীতগ্রাহী'— এই বিপ্রতিপত্তির খণ্ডন হয়। যেহেতু মনোবিজ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় থেকে ভিন্ন (কারণ, বিষয় দুটি সমান হলেও এক নয়), তাই 'মনোবিজ্ঞানে জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান হয়' — এই আপত্তি খণ্ডিত হয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা 'মনোবিজ্ঞান যোগীজ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়'— এরূপ বিপ্রতিপত্তির নিরাস হয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান একই সন্তানপ্রবাহের বা জ্ঞানধারার অন্তর্গত। কিন্তু, (অপর ব্যক্তির) ইন্দ্রিয়জ্ঞান বিষয়ে যোগীজ্ঞান পরসন্তানবর্তী।

২.২.৩ আত্মসংবেদন

আচার্য ধর্মকীর্তি আত্মসংবেদনের লক্ষণ 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের দশম সূত্রে এইভাবে নির্দেশ করেছেন — ''সর্বচিত্তচৈত্তানামাত্মসংবেদনম্''। অর্থাৎ, সকল বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানই চিত্ত এবং সুখ, দুঃখাদি মানস অবস্থাগ্রাহী বিজ্ঞান হল চৈত্ত। যে সমস্ত জ্ঞানে কোন বিষয় থাকে, যেমন নীল, পীত ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান,

সেগুলি যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে নানা প্রকার হয়ে থাকে। তবু এই সমস্ত বিবিধ জ্ঞানে বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞানমাত্রই স্বসংবেদ্য। আবার যে সমস্ত জ্ঞানে কোন বিষয় থাকে না, যেমন — সুখ, দুঃখাদি মানস অবস্থার জ্ঞান, সেগুলিও স্বসংবেদ্য। বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞান অথবা মানস অবস্থাগ্রাহী বিজ্ঞান — যে কোন প্রকার বিজ্ঞানই সাক্ষাৎজ্ঞান। এক কথায়, এমন কোন মানস অবস্থা নেই, যা প্রত্যক্ষ হয় না বা সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞাত হয় না। বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞান বা চিত্ত এবং মানস অবস্থাগ্রাহী বিজ্ঞান বা চৈত্ত যে ভাবে জ্ঞাত হয়, তাই আত্মসংবেদন।

২.২.৪ যোগীজ্ঞান

আচার্য ধর্মকীর্তি চতুর্থ প্রকার প্রত্যক্ষ যোগীজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে— ''ভূতার্থভাবনা প্রকর্ষপর্যন্তজং যোগীজ্ঞানং চেতি''। এখানে 'ভূত' শব্দের অর্থ সদ্রূপ বস্তু। অর্থাৎ যা প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, চারটি আর্যসত্য — (১) দুঃখ, (২) দুঃখসমুদয়, (৩) দুঃখনিরোধ এবং (৪) দুঃখনিরোধমার্গ। 'ভাবনা' শব্দের অর্থ কোন বিষয়কে নিরন্তর চিত্তে স্থাপন করা। সুতরাং আর্যসত্যাদির মত সদ্রূপ বস্তুর (বা প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিত বস্তুর) নিরন্তর চিত্তে ধারণা করাই 'ভূতার্থভাবনা'। আর্যসত্যাদির মত সদ্রূপ বস্তুর নিরন্তর চিত্তে ধারণা করা বলতে উক্ত বিষয়ে বাধাহীন বা বিরামহীনভাবে চিন্তা করা বুঝায়। এককথায়, 'ভূতার্থভাবনা' হল আর্যসত্যাদির মত সদ্রূপ বস্তু বিষয়ে ধারাবাহিক চিন্তা প্রবাহ। ভূতার্থভাবনার আরম্ভ বা অভ্যুদয় থেকে এই ভাবনার অন্ত পর্যন্ত উক্ত ধারাবাহিক চিন্তা প্রবাহের প্রতিটি ক্ষণে ভাব্যমান বস্তুটি ক্রমশ অস্ফুট থেকে স্ফুট হতে থাকে। ধারাবাহিক চিন্তা প্রবাহের প্রথম ক্ষণে ভাব্যমান বস্তুটি প্রায় অস্ফুট থাকে। তারপর এই বস্তুটি ক্রমশ স্ফুট হতে থাকে। ভূতার্থভাবনায় ভাব্যমান বস্তুটির অস্ফুট থেকে স্ফুট হতে আরম্ভ করা বা অভ্যুদয়কে বলে প্রকর্ষ। ভাব্যমান বস্তু পরিপূর্ণ স্ফুট না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ক্ষণে ঐ বস্তুটি ক্রমশ স্ফুট হতে থাকে। ভাব্যমান বস্তুর এইভাবে স্ফুট হতে থাকাকে বলে প্রকর্ষের গতি। স্ফুট-ভাব পরিপূর্ণ হবার ঠিক পূর্বের অবস্থা প্রাপ্তিকে বলে প্রকর্ষপর্যন্ত। ভূতার্থভাবনার প্রকর্ষপর্যন্ত থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে বলে যোগীজ্ঞান। যোগীজ্ঞানে প্রকর্ষের গতি সম্পূর্ণ থেমে যায় এবং ভাব্যমান বস্তুটি হাতে রাখা আমলকীর মত পরিপূর্ণ স্ফুট হয়। এই জ্ঞানে ভাব্যমান বস্তুটি সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় বলেই যোগীজ্ঞান নির্বিকল্পক। কারণ, বস্তুস্বরূপ যে জ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে প্রদর্শিত, সেই জ্ঞান নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। এই জ্ঞানের বিষয় বিকল্প রহিত বলে শুদ্ধ। শুদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান অবিসংবাদক। তাই যোগীজ্ঞান অবিসংবাদক বা যথার্থ জ্ঞান। আচার্য ধর্মোত্তরের মতে যোগ শব্দের অর্থ সমাধি। যিনি সমাধি লাভ করেছেন তিনিই যোগী। আর্যসত্যাদির মত সদ্রূপ বস্তু বিষয়ে যোগীর অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জ্ঞানই যোগীজ্ঞান বা যোগীপ্রত্যক্ষ।

২.৩ প্রত্যক্ষের বিষয় ঃ স্বলক্ষণ

আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থের এয়োদশ সূত্রে স্বলক্ষণ-এর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এইভাবে ঃ

''যস্যার্থস্য সন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাং জ্ঞানপ্রতিভাসভেদস্তৎ স্বলক্ষণম্''।

অর্থাৎ যে বিষয়ের সন্নিধান অথবা অসন্নিধানের ফলে জ্ঞানপ্রতিভাসের স্ফুটতার ভেদ হয়, সেই বিষয়টিকে

স্বলক্ষণ বলা হয়। এখানে 'অর্থ' শব্দে জ্ঞানের বিষয় বা প্রয়োজন নির্দেশ করা হয়েছে। আচার্য ধর্মকীর্তির মতে অর্থ দুই প্রকার, যথা — হেয় বা পরিত্যাগযোগ্য এবং উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য। আচার্য বিনীতদেবের মতে অর্থ তিন প্রকার, যথা হেয় বা পরিত্যাগযোগ্য, উপাদেয় বা গ্রহণযোগ্য এবং উপেক্ষণীয় বা উপেক্ষার যোগ্য। 'যস্যার্থস্য' মানে জ্ঞানের যে বিষয়টির। আচার্য ধর্মোত্তরের মতে 'সন্নিধান' শব্দের অর্থ নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান (নিকটদেশাবস্থানম্) এবং 'অসন্নিধান' শব্দের অর্থ দূরবর্তী স্থানে অবস্থান (দূরদেশাবস্থানম্)। কিন্তু আচার্য বিনীতদেবের মতে 'সন্নিধান' মানে 'যোগ্যদেশে স্থিতি' এবং 'অসন্নিধান' মানে 'অযোগ্যদেশে স্থিতি' অথবা 'সর্বথা সর্বত্র অভাব'। জ্ঞানপ্রতিভাসভেদ বলতে উভয় টীকাকার জ্ঞান প্রতিভাসের স্ফুটতার তারতম্য বুঝিয়েছেন। 'প্রতিভাস' শব্দটি 'অর্থক্রিয়াকারী বস্তুর জ্ঞানে ভাসমান রূপ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এই দুই টীকাকারের সংযুক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী আলোচ্য সূত্রের অর্থ নিম্নরূপ ঃ

হেয়, উপাদেয় বা উপেক্ষণীয় যে জ্ঞান-গ্রাহ্য বিষয়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান বা যোগ্যদেশে স্থিতির জন্য জ্ঞান প্রতিভাস বিস্ফুট হয় এবং দূরবর্তী স্থানে অবস্থান বা অযোগ্যদেশে স্থিতি কিংবা সর্বথা সর্বত্র অভাবের জন্য জ্ঞানপ্রতিভাস অস্ফুট হয়, জ্ঞানের সেই বিষয়টিকে স্বলক্ষণ বলা হয়।

অর্থাৎ, যদি জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়টি যত নিকটে বা যোগ্যদেশে থাকে, জ্ঞানপ্রতিভাস তত স্ফুট হয়, যত দূরে বা অযোগ্যদেশে থাকে জ্ঞানপ্রতিভাস তত অস্ফুট হয় এবং ঐ বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলে জ্ঞানপ্রতিভাস সম্পূর্ণ অস্ফুট হয়, তবে জ্ঞানের দ্বারা গ্রাহ্য সেই বিষয়টিকে স্বলক্ষণ বলা হয়। গ্রাহ্য স্বলক্ষণ বিষয় অর্থক্রিয়াক্ষম। অর্থাৎ এরূপ বিষয় জ্ঞানে আকার সমর্পন করে। নিকটস্থ স্বলক্ষণ জ্ঞানে বিস্ফুটআকার সমর্পন করে এবং দূরস্থ স্বলক্ষণ জ্ঞানে অস্ফুট আকার সমর্পন করে। তবে স্ফুটত্ব ও অস্ফুটত্ব প্রতিভাসের ধর্ম, বিষয়ের ধর্ম নয়। যদি কোন প্রতিভাস স্ফুট এবং অপর কোন প্রতিভাস অপেক্ষাকৃত অস্ফুট হয়, তবে প্রতিভাসের স্ফুটত্ব ও অস্ফুটত্বের কারণও নিশ্চয়ই ভিন্ন হবে। নিকটস্থ স্বলক্ষণ বিস্ফুট প্রতিভাস সৃষ্টির কারণ এবং দূরস্থ স্বলক্ষণ অপেক্ষাকৃত অস্ফুট প্রতিভাস সৃষ্টির কারণ। কিন্তু দূরে বা নিকটে, যোগ্যদেশে বা অযোগ্যদেশে থাকার কারণে জ্ঞানপ্রতিভাসের স্ফুটতার ভেদ হলেও স্বলক্ষণের অর্থক্রিয়াকারীত্বের কোন ভেদ হয় না। ইন্দ্রিয় সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ বস্তু জ্ঞানে আকার সমর্পন করে। তাই স্বলক্ষণ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বা প্রত্যক্ষের বিষয়। আচার্য ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর দ্বাদশ সূত্রে স্বলক্ষণকেই প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ''তস্য বিষয়ঃ স্বলক্ষণম্''। অর্থাৎ তার (মানে প্রত্যক্ষের) বিষয় স্বলক্ষণ। আচার্য ধর্মোত্তর ন্যায়বিন্দুর এই দ্বাদশ সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, চার প্রকার প্রত্যক্ষের বিষয়ই স্বলক্ষণ। 'স্ব' মানে অসাধারণ অর্থাৎ একান্তই নিজের এবং 'লক্ষণ' মানে তত্ত্ব। সুতরাং, বস্তুর একান্ত নিজের তত্ত্ব বা অসাধারণ রূপ হল স্বলক্ষণ।

আচার্য দিঙ্‌নাগ বস্তুর যে দুটি রূপের কথা বলেছেন, তার একটি হল বিশেষ রূপ বা অসাধারণ রূপ এবং দ্বিতীয়টি সামান্য রূপ বা অসাধারণ রূপ। এই দুটি রূপকে যথাক্রমে স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণ বলা হয়। যেমন, একটি বিশেষ ঘটের যে বিলক্ষণ রূপ যা তাকে অন্য ঘট থেকে পৃথক করে, তাকে ঐ ঘটের বিশেষ রূপ বা স্বলক্ষণ বলা হয় এবং সব ঘটের যে সাধারণ রূপ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, তাকে ঘটের সামান্য বা সাধারণ রূপ বা সামান্যলক্ষণ বলা হয়। সামান্য বা সাধারণ রূপ আরোপিত ও কৃত্রিম এবং বিশেষ রূপ বা স্বলক্ষণ অনারোপিত ও অকৃত্রিম। বস্তুর এই অকৃত্রিম ও অনারোপিত রূপকে আচার্য

ধর্মকীর্তি পরমার্থসৎ বলেছেন। তাঁর কথায়, 'তদেব পরমার্থসৎ'। যে বস্তু নিকটে থাকলে স্ফুট এবং দূরে থাকলে অস্ফুটরূপে প্রতিভাত হয়, সেই স্বলক্ষণই পরমার্থসৎ। কারণ ''অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণত্বাদ্ বস্তুনঃ''। অর্থাৎ অর্থক্রিয়ার সামর্থ্যই পরমার্থসৎ বা প্রকৃত সৎ-বস্তুর লক্ষণ। অর্থক্রিয়া বলতে অর্থের ক্রিয়া বা প্রয়োজন নিষ্পত্তি বুঝায়। হেয় বস্তুর হান বা পরিত্যাগ, উপাদেয় বস্তুর গ্রহণ এবং উপেক্ষণীয় বস্তুর উপেক্ষাই অর্থক্রিয়া বা প্রয়োজন নিষ্পত্তি। কাল্পনিক বস্তুর অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা প্রয়োজন নিষ্পত্তির সামর্থ্য নেই। কেবলমাত্র পরমার্থসৎ বস্তুর অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা প্রয়োজন নিষ্পত্তির সামর্থ্য থাকে। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রকৃত অগ্নিই অর্থক্রিয়াসামর্থ্য যুক্ত বা প্রয়োজন নিষ্পত্তির সামর্থ্যযুক্ত। প্রকৃত অগ্নি নিকটে থাকলে স্পষ্ট প্রতিভাস সৃষ্টি করে এবং দূরে থাকলে অস্পষ্ট প্রতিভাস সৃষ্টি করে। সামর্থ্য মানে শক্তি। প্রয়োজন নিষ্পত্তির শক্তি যে বস্তুর লক্ষণ সেই বস্তুই অর্থক্রিয়াসামর্থ্যলক্ষণ বস্তু এবং এরূপ বস্তুই স্বলক্ষণ ও পরমার্থসৎ।

২.৪ স্বলক্ষণ-ভিন্ন বিষয় ঃ সামান্যলক্ষণ

আচার্য দিঙ্‌নাগ বস্তুর যে সামান্য রূপের কথা বলেছেন, যে রূপ আরোপিত ও কৃত্রিম, সেই সামান্যলক্ষণের স্বরূপ নির্দেশ করেছেন আচার্য ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দুর ষোড়শ সূত্রে এইভাবে ঃ

''অন্যৎ সামান্যলক্ষণম্''। অর্থাৎ অন্য বিষয়টি সামান্যলক্ষণ। অন্য বিষয় বলতে আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের ত্রয়োদশ সূত্রে বর্ণিত স্বলক্ষণ থেকে ভিন্ন বিষয় — অর্থাৎ, স্বলক্ষণ-এর বিপরীত স্বরূপ বিশিষ্ট বস্তু নির্দেশ করেছেন। 'ন্যায়বিন্দু'র ত্রয়োদশ সূত্রে প্রদত্ত স্বলক্ষণের স্বরূপ বিষয়ে দুই টীকাকার আচার্য বিনীতদেব ও আচার্য ধর্মোত্তর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বলক্ষণের বিপরীত বিষয় সামান্যলক্ষণের স্বরূপ এইভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে ঃ

হেয়, উপাদেয় বা উপেক্ষণীয় যে জ্ঞানবিষয়ের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান বা যোগ্যদেশে স্থিতির জন্য, দূরবর্তী স্থানে অবস্থান বা অযোগ্যদেশে স্থিতি কিংবা সর্বথা সর্বত্র অভাবের জন্য জ্ঞানপ্রতিভাসের স্ফুটতার ভেদ হয় না, জ্ঞানের সেই বিষয়টিকে সামান্যলক্ষণ বলা হয়। অর্থাৎ, যদি জ্ঞানের বিষয়টি নিকটে বা যোগ্যদেশে থাকলেও জ্ঞান প্রতিভাস অস্ফুট হয়, দূরে বা অযোগ্যদেশে থাকলেও জ্ঞান প্রতিভাস অস্ফুট হয়, এমনকি ঐ বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলে জ্ঞান প্রতিভাস অস্ফুট হয়, তবে জ্ঞানের সেই বিষয়টিকে সামান্যলক্ষণ বলা হয়। এরূপ বিষয় অর্থক্রিয়াক্ষম নয়। অর্থাৎ, এরূপ বিষয় জ্ঞানে বিস্ফুট আকার সমর্পন করতে সক্ষম। 'সামান্য' মানে সাধারণ অর্থাৎ যা একান্তই নিজের নয়— এবং 'লক্ষণ' মানে তত্ত্ব। সুতরাং, যা একটি বস্তুর একান্তই নিজের তত্ত্ব বা অসাধারণ রূপ নয়, অনেক বস্তুর সাধারণ রূপ তাই সামান্যলক্ষণ। আচার্য ধর্মোত্তর 'সাম্যান্যেন লক্ষণম্ সামান্যলক্ষণ' — এইভাবে সামান্যলক্ষণের অর্থ করেছেন। এখন জানা প্রয়োজন, সামান্যের দ্বারা লক্ষিত বস্তুরূপটি কী?

বৌদ্ধ মতে, ঘটপটাদি প্রতিটি বস্তুই ক্ষণিক। প্রতি ক্ষণে বস্তু পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রত্যক্ষে যে ক্ষণে আমরা একটি বস্তুকে পাই, সেটি পরক্ষণে নষ্ট হয়ে একটি বস্তুসন্তান বা ক্ষণসন্তান উৎপন্ন হয়। তারপর সেই ক্ষণসন্তান নষ্ট হয়ে অপর একটি ক্ষণসন্তান উৎপন্ন হয়। এভাবে ধারাবহিকভাবে ক্ষণসন্তান উৎপন্ন হতে থাকে। এই ক্ষণপ্রবাহের অর্ন্তগত প্রতিটি ক্ষণের যে সামান্য বা সাধারণ রূপ — তাকে

সামান্যলক্ষণ বলে। যেমন, একটি ঘট প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষণপ্রবাহ। এই ক্ষণপ্রবাহের অর্ন্তগত সন্তানগুলির সামান্য বা সাধারণ রূপকে ঘটের সামান্যলক্ষণ বলে। আবার সব ঘটের যে সাধারণ রূপ জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়, তাকেও ঘটের সামান্য বা সাধারণ-রূপ বা সামান্যলক্ষণ বলা হয়। ঘটের এই সামান্য বা সাধারণ-রূপ আরোপিত ও কৃত্রিম। স্বভাবত, সামান্যলক্ষণ বিকল্প জ্ঞানের বিষয়।

তবে সব বিকল্প জ্ঞানের বিষয় সামান্যলক্ষণ নয়। বিকল্প জ্ঞান নানা প্রকার হয়। প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান, অনুবাদ, শব্দ, স্মৃতি ও ভ্রান্তি। এগুলির মধ্যে একমাত্র অনুমানের ক্ষেত্রে সামান্যলক্ষণ বিষয় হয়ে অবিনাভাবী হয়। কারণ প্রমাণের বিষয় হবার জন্য অর্থের সঙ্গে অবিনাভাব থাকা আবশ্যক। সকল বিকল্প জ্ঞানের মত অনুমানের বিষয় যদিও কাল্পনিক, তবু কেবলমাত্র অনুমানের বিষয় লিঙ্গের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই অনুমান ছাড়া অন্য বিকল্প জ্ঞান সম্যক্ জ্ঞান বা প্রমাণ নয়। প্রত্যক্ষ ও অনুমান — এই দুই প্রকার প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষের বিষয় যেহেতু স্বলক্ষণ এবং প্রমাণের দুই প্রকার বিষয়ের মধ্যে স্বলক্ষণ-ভিন্ন বিষয় যেহেতু সমান্যলক্ষণ, সেহেতু সামান্যলক্ষণ অনুমানরূপ প্রমাণের বিষয়। সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আচার্য ধর্মকীর্তি তাই ন্যায়বিন্দু'র সপ্তদশ সূত্রে সামান্যলক্ষণকে অনুমানের বিষয়রূপে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ''সোঽনুমানস্য বিষয়''। অর্থাৎ সামান্যলক্ষণ অনুমানের বিষয়। আচার্য ধর্মোত্তর এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''সোঽনুমানস্য বিষয়ে গ্রাহ্যরূপ''। অর্থাৎ, সামান্যলক্ষণ অনুমানের গ্রাহ্য বিষয়।

তবে বিকল্প জ্ঞানের বিষয় হওয়াতে সামান্যলক্ষণ আচার্য ধর্মকীর্তির মতে পরমার্থসৎ নয়। কারণ অর্থক্রিয়ার সামর্থ্যই পরমার্থসৎ বা প্রকৃত সৎ-বস্তুর লক্ষণ এবং অর্থক্রিয়া বলতে অর্থের ক্রিয়া বা প্রয়োজন নিষ্পত্তি বুঝায়। যেহেতু সামান্যলক্ষণ বস্তুমাত্রই কাল্পনিক এবং কাল্পনিক বস্তুর হান, গ্রহণ বা উপেক্ষারূপ অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা প্রয়োজন নিষ্পত্তির সামর্থ্য নেই, সেহেতু এরূপ বস্তু দূরে কিংবা নিকটে যে স্থানেই থাকুক, জ্ঞান প্রতিভাস স্ফুট হবার কোন সম্ভবনা নেই। যেমন, কাল্পনিক অগ্নি দাহ-রূপ অর্থক্রিয়াসামর্থ্য বা প্রয়োজন নিষ্পত্তির সামর্থ্যযুক্ত নয়। প্রকৃত অগ্নি যেভাবে নিকটে থাকলে স্পষ্ট প্রতিভাস সৃষ্টি করে এবং দূরে থাকলে অস্পষ্ট প্রতিভাস সৃষ্টি করতে পারে, কাল্পনিক অগ্নির সেরূপ প্রয়োজন নিষ্পত্তির শক্তি বা অর্থক্রিয়াসামর্থ্য নেই। কাল্পনিক অগ্নির দূরত্ব ও নৈকট্যও কাল্পনিক। সুতরাং এরূপ বস্তু পরমার্থসৎ হতে পারে না।

২.৫ প্রত্যক্ষে অর্থসারূপ্য

আচার্য ধর্মকীর্তি 'নায়বিন্দু' গ্রন্থে কল্পনাস্বভাব রহিত অভ্রান্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অর্থপ্রতীতিরূপত্ব হেতু ঐ জ্ঞানকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল বলেছেন। এই গ্রন্থের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ সূত্রে তিনি যথাক্রমে বলেছেন ঃ

'' তদেব চ প্রত্যক্ষং জ্ঞানং প্রমাণফলম্'' এবং 'অর্থপ্রতীতিরূপত্বাৎ''।

অর্থাৎ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অর্থপ্রতীতিরূপত্বহেতু প্রত্যক্ষ-প্রমাণের ফল। প্রমাণের ফলকে প্রমা বা প্রমিতি বলা হয়। স্বভাবত, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল বলতে প্রত্যক্ষ প্রমা বা প্রত্যক্ষ প্রমিতি বুঝায়। সুতরাং, আচার্য ধর্মকীর্তির মতে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং তার ফল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমা

বা প্রত্যক্ষ প্রমিতি, স্বরূপত অভিন্ন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল-বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত খণ্ডণের উদ্দেশ্যে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ-ফলের মধ্যে জন্য-জনকভাব বিদ্যমান বলে নৈয়ায়িকাদি যে সমস্ত দার্শনিক মনে করেন, তাঁদের মত আচার্য ধর্মকীর্তির পূর্বোক্ত মতের দ্বারা খণ্ডিত হল।

প্রমার করণই প্রমাণ এবং প্রমাণের ফলই প্রমা। প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব বিদ্যমান। সাধ্য-সাধনভাব আবার দুই প্রকার। যথা — জন্য জনকভাব এবং ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাব। সাধারণত নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণ প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান সাধ্য-সাধনভাবকে জন্য-জনকভাব রূপে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু আচার্য ধর্মকীর্তি প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে বিদ্যমান সাধ্য-সাধনভাবকে ব্যবস্থাপ্য-ব্যাবস্থাপকভাব-রূপে নির্দেশ করে থাকেন। তাঁদের মতে, পাক ও অগ্নির মধ্যে মধ্যে যে জন্য-জনকভাব আছে, প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে সেরকম কোন ভাব নেই। অগ্নি পাকের উৎপাদক বা জনক এবং পাক অগ্নির উৎপাদ্য বা জন্য। কিন্তু, প্রমাণ প্রমার উৎপাদক বা জনক নয় এবং প্রমা প্রমাণের উৎপাদ্য বা জন্য নয়। প্রমাণ প্রমার নিয়ামক এবং প্রমা প্রমাণের নিয়াম্য। অর্থাৎ, প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে নিয়াম্য-নিয়ামকভাব বিদ্যমান, জন্য-জনকভাব নয়। এই নিয়াম্য-নিয়ামকভাবকে ব্যবস্থাপ্য-ব্যাবস্থাপকভাবও বলা হয়। প্রমাণ যদি প্রমার উৎপাদক বা জনক হত এবং প্রমা যদি প্রমাণের উৎপাদ্য বা জন্য হত, তবে একই জ্ঞান প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে পারত না। যেহেতু প্রমাণ প্রমার নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক এবং প্রমা প্রমাণের নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপ্য মাত্র, সেহেতু একই জ্ঞান প্রমা ও প্রমাণ উভয়ই হতে কোন বাধা নেই। কারণ নিয়ামক বা ব্যবস্থাপকরূপে যে জ্ঞান প্রমাণ, নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপ্যরূপে সেই জ্ঞানই প্রমা হতে পারে। এখন দেখা যাক, কিভাবে ব্যবস্থাপকরূপে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রমাণ, ব্যবস্থাপ্যরূপে সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রমা হতে পারে।

অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ হবার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপন্ন কল্পনা রহিত অভ্রান্ত জ্ঞানে অর্থটি প্রতিভাসিত হয় বলে সেই জ্ঞানটি প্রদর্শক জ্ঞান। জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রদর্শকত্বই প্রবর্তকত্ব। কারণ, জ্ঞান বলপূর্বক পুরুষকে অর্থপ্রপ্তির জন্য প্রবৃত্ত করে না বা অর্থ তৈরী করে পুরুষকে সেই অর্থ পাইয়ে দেয় না। জ্ঞানে প্রবৃত্তির বিষয়টি প্রদর্শিত হয় বলে জ্ঞান প্রবর্তক এবং প্রবর্তক জ্ঞানে প্রাপনশক্তি আছে বলে সেই জ্ঞানই প্রাপক। অবশ্য বৌদ্ধ মতে জ্ঞানে প্রথমে বস্তুর প্রদর্শন, তারপর সেই বস্তুর প্রতি পুরুষের প্রবর্তন এবং পরিশেষে বস্তু প্রাপ্তি — এরূপ কোন পরম্পরা থাকে না। বস্তুত, জ্ঞানের অর্থ প্রদর্শকত্বই প্রবর্তকত্ব এবং প্রবর্তকত্বই প্রাপনশক্তি। সুতরাং, যে জ্ঞান প্রদর্শক, সেই জ্ঞানই প্রবর্তক ও প্রাপক।

আবার যে জ্ঞান অর্থ- প্রদর্শক প্রবর্তক ও প্রাপক, সেই জ্ঞানেই অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয়। অর্থপ্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপে যে জ্ঞান অর্থপ্রতীতি জন্মায়, সেই জ্ঞান প্রমাণ এবং সেই একই জ্ঞানে অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতি হয় বলে সেই জ্ঞানটিই ঐ প্রমাণের ফল বা প্রমা। এক কথায়, অর্থপ্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপে যে জ্ঞান প্রমাণ সেই জ্ঞানই অর্থাবগম বা অর্থপ্রতীতিরূপে ঐ প্রমাণের ফল বা প্রমা। সুতরাং প্রমাণ প্রমার করণ বা সাধন এবং প্রমা প্রমাণের ফল হলেও, প্রমাণ ও প্রমা দুটি স্বতন্ত্র জ্ঞান নয়, একই জ্ঞানের নিয়ামক-নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপক ব্যবস্থাপ্য রূপ মাত্র।

এখন জানা প্রয়োজন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অর্থপ্রতীতির ব্যাবস্থাপক-রূপী জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপ কী। ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের বিংশ সূত্রে আচার্য ধর্মকীর্তি বলেছেন ঃ ''অর্থসারূপ্যমস্য প্রমাণম্''।

অর্থাৎ অর্থের সঙ্গে সারূপ্য বা সাদৃশ্য হল অর্থপ্রতীতিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমার সাধন বা প্রমাণ। কিন্তু পূর্বে বলা হল, অর্থপ্রদর্শক প্রবর্তক ও প্রাপক-রূপী জ্ঞানটি প্রমাণ এবং এখন বলা হচ্ছে অর্থসারূপ্যই প্রমাণ — একটি জ্ঞান এবং অপরটি তার বৈশিষ্ট্য — এই দুই-এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই তো? উত্তরে বলা হয়েছে, বৌদ্ধ মতে গুণ ও গুণীর মধ্যে কোন ভেদ না থাকায় বর্তমান ক্ষেত্রেও কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে যে জ্ঞানটিকে প্রমাণ বলা হয়েছে, সেটি অর্থসারূপ্য ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যভাবে বলা যায়, অর্থসারূপ্যযুক্ত জ্ঞানই প্রমাণ। বস্তুত একটি জ্ঞান তখনই প্রাপক হয়, যখন সেটি প্রবর্তক হয় এবং ঐ জ্ঞানটি তখনই প্রবর্তক হয় যখন সেটি অর্থপ্রদর্শক হয়। আবার, জ্ঞানটি কেবলমাত্র তখনই অর্থ প্রদর্শক হতে পারে, যখন সেটি অর্থসদৃশ হয়, অর্থাৎ অর্থের আকার ধারণ করে। সুতরাং, অর্থের সঙ্গে সারূপ্য বা সাদৃশ্যটি অর্থপ্রতীতিরূপ জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয় এবং অর্থসারূপ্যযুক্ত জ্ঞান বা অর্থাকার জ্ঞানই প্রমাণ।

অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ হলে আমরা সেই অর্থ বা বস্তুটিকে যে রূপ-রসাদিযুক্ত রূপে জানতে পারি, তার কারণ হল — অর্থেন্দ্রিয় সংযোগে উৎপন্ন জ্ঞানটি অর্থের আকার ধারণ করে। অর্থাৎ জ্ঞানটি অর্থসদৃশ হয়। যেমন, নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু দর্শনে যে নীল-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান নীলসদৃশ বা নীল আকার বিশিষ্ট হয়। জ্ঞান যখন অর্থ বা বিষয়কে প্রকাশ করে, তখন তো নিরাকার থাকতে পারে না। নিরাকার জ্ঞানের পক্ষে রূপ-রসাদি বিশিষ্ট বস্তু প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যেমন, জ্ঞান যদি নিরাকার হত, তবে নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু-দর্শনে উৎপন্ন জ্ঞানে নীলকে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞানে তার আকার সমর্পন করে বলে জ্ঞান নীলসদৃশ বা নীল আকার বিশিষ্ট হয় এবং জ্ঞান নীলসদৃশ হয় বলেই জ্ঞান নীল প্রকাশে সক্ষম হয়। অর্থ বা বস্তুর আকারে জ্ঞানের আকারিত হওয়াই জ্ঞানের অর্থসারূপ্যযুক্ত বা অর্থসদৃশ বা অর্থাকার হওয়া। জ্ঞানের এরূপ অর্থসারূপ্যযুক্ত বা অর্থসদৃশ বা অর্থাকার হওয়াই প্রমাণ।

তবে বৌদ্ধ মতে সারূপ্য বা সাদৃশ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। এমন কি সারূপ্যের কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। সারূপ্য বা সাদৃশ্য নিছক কল্পনা মাত্র। সারূপ্য বা সাদৃশ্যের বোধ মূলত 'অন্যব্যাবৃত্তি-বোধ। যেমন, গো-সারূপ্য বা গো-সাদৃশ্য হল গো-ভিন্ন অন্য বস্তু থেকে ভিন্নত্ব। এক কথায়, অসারূপ্য-ভিন্নত্ব বা অসাদৃশ্য-ভিন্নত্বই সারূপ্য বা সাদৃশ্য। নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু- দর্শনে উৎপন্ন জ্ঞান যে নীল সারূপ্যযুক্ত হয় সেই নীল-সারূপ্য মূলত অ-নীলভিন্নত্ব। অর্থাৎ নীল-সারূপ্য প্রকৃতপক্ষে অ-নীলঅ-সারূপ্য। সুতরাং, 'অন্যব্যাবৃত্তি-রূপ সারূপ্যই বৌদ্ধ মতে প্রমাণ।

অর্থসারূপ্যকে কেন প্রমাণ বলা হবে? — তার উত্তর পাওয়া যায় ন্যায়বিন্দু গ্রন্থের একবিংশ সূত্রে। সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

''তদ্‌বশাদর্থপ্রতীতিসিদ্ধেঃ'' অর্থাৎ, অর্থসারূপ্যবশে অর্থপ্রতীতিসিদ্ধ হয় বলে অর্থসারূপ্য প্রমাণ। সূত্রটি ব্যাখ্যা করা যাক্।

সূত্রস্থ 'তৎ' শব্দে অর্থস্যরূপ্য 'তদ্‌বশাৎ' বলতে অর্থসারূপ্যবশে এবং 'অর্থপ্রতীতি' শব্দে অর্থের অববোধ বা পরিচ্ছিত্তি বুঝানো হয়েছে। 'অর্থপ্রতীতিসিদ্ধেঃ' করার অর্থ অর্থের প্রতীতি, অর্থের অববোধ বা অর্থের পরিচ্ছিত্তি সিদ্ধ হয় বলে। সুতরাং, সম্পূর্ণ সূত্রের অর্থ হল — যেহেতু অর্থসারূপ্যবশে অর্থপ্রতীতি

সিদ্ধ হয়, সেহেতু অর্থসারূপ্য প্রমাণ। পূর্ববর্তী সূত্রে অর্থের সঙ্গে জ্ঞানের সরূপ্য বা সাদৃশ্যকে প্রমাণ বলা হয়েছে এবং এই সূত্রে অর্থসারূপ্যকে প্রমাণ বলার কারণ নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থসারূপ্যের দ্বারা অর্থপ্রতীতি সিদ্ধ হয়, এই কারণে এই সূত্রে অর্থসারূপ্যকে প্রমাণ বলা হয়েছে। একটি জ্ঞান যখন তার অর্থের সঙ্গে সারূপ্য বা সাদৃশ্য লাভ করে, তখন সেই অর্থের সঙ্গে ঐ জ্ঞানের সারূপ্য বা সাদৃশ্য লাভ করা বা জ্ঞানটির অর্থাকার হওয়াকে প্রমাণ বলা হয়। একটি বস্তু বা অর্থের জ্ঞান ঐ বস্তু বা অর্থের জ্ঞান-রূপে তখনই সিদ্ধ হয়, যখন ঐ বস্তু বা অর্থের সাদৃশ্য রূপ করণের দ্বারা সেই জ্ঞানটি নিষ্পন্ন হয়। একটি জ্ঞানকে কেবলমাত্র তখনই একটি বিশেষ বস্তু বা অর্থের জ্ঞান বলা যাবে, যখন সেই জ্ঞানটি ঐ বস্তু বা অর্থের আকার বিশিষ্ট হবে। অর্থাকরতা বা অর্থের আকার-বিশিষ্টতা বাদ দিলে সেই জ্ঞানটিকে ঐ বিশেষ বস্তু বা অর্থের জ্ঞান বলা যাবে না। অর্থাকার বা অর্থের আকার-বিশিষ্ট না হলে জ্ঞান অর্থসাক্ষাৎকারী হতে পারে না এবং অর্থসাক্ষাৎকারী জ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অর্থসাক্ষাৎকারী জ্ঞানের দ্বারা অর্থপ্রতীতিসিদ্ধ হয়।

২.৬ প্রত্যক্ষে অর্থপ্রতীতির সিদ্ধি

ধর্মকীর্তি বলেছেন, অর্থপ্রীতির সিদ্ধি হল প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল। কিন্তু প্রশ্ন হল — জ্ঞান অর্থাকার হলে, অর্থাৎ জ্ঞানে অর্থসারূপ্য থাকলে, কিভাবে জ্ঞানের দ্বারা অর্থপ্রতীতি সিদ্ধ হয়। যে ক্ষণে একটি অর্থের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, সেই ক্ষণে জ্ঞানে ঐ অর্থের নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ঐ অর্থের আকার স্ফুটভাবে ভাসমান হয়। তারপর জ্ঞানে স্ফুটভাবে ভাসমান সেই অর্থের নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। প্রত্যক্ষের প্রথম ক্ষণে অর্থের যে নির্ভাস হয়, সেটি নির্বিকল্পক এবং পরে যে নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে সেটি সবিকল্পক। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এমনই এক শুদ্ধ সংবেদন যা কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কল্পনা উদ্বুদ্ধ হলে এটা নীল, এটা ঘট — ইত্যাদি সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বিজ্ঞান অর্থসদৃশ বা অর্থাকার হয় এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষে সেই অর্থাকার বিজ্ঞানের নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। যেমন, নীলের তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়া মাত্র জ্ঞানে নীলের নির্ভাস হয়, অর্থাৎ নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তুর আকার স্ফুটভাবে ভাসমান হয় এবং পরে 'এটা নীল' — এরূপ নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি বা নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। নীল-প্রতীতিরূপ নিশ্চয় জ্ঞান একটি প্রত্যক্ষপৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান। এই জ্ঞানকে অধ্যবসায়ও বলা হয়। নীলের তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয় সংযোগ হওয়া মাত্র জ্ঞানে নীলের যে নির্ভাস হয়, নীলের সেই নির্ভাস যথার্থই নীলজ্ঞান কিনা তা নিশ্চিত করে 'এটা নীল' এরূপ সেই প্রথম ক্ষণের প্রত্যক্ষের পৃষ্ঠভাবী বিকল্প জ্ঞান বা অধ্যবসায়। জ্ঞান অর্থাকার বা অর্থসাদৃশ্য লাভ না করলে বিকল্প জ্ঞান বা অধ্যবসায়ের দ্বারা তার নিশ্চয় হয় না। নীল তথা নীলবর্ণ বিশিষ্ট বস্তু দর্শনের পর বিজ্ঞান নীলসাদৃশ্য লাভ না করলে 'এটা নীল'-এরূপ জ্ঞান হবে না। সুতরাং নীলসারূপ্যবশতঃই নীলজ্ঞানের সিদ্ধি বা নিষ্পত্তি হয়। আচার্য ধর্মোত্তর তাই যথার্থই বলেছেন, ''নীলসদৃশং তু অনুভূয়মানং নীলস্য সংবেদনমবস্থাপ্যতে''। যদিও নীল দর্শন কালে 'এটা নীল' কিংবা 'নীল দেখছি' — এরূপ বোধ হয়, 'নীল সদৃশ দেখছি'— এরূপ অনুভব হয় না, তবু আমরা যখন নীল দেখি, তখন বস্তুত নীল সদৃশই দেখি। সুতরাং নীল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে নীলসারূপ্য হল ব্যবস্থাপন-হেতু বা ব্যবস্থাপক এবং নীলজ্ঞান বা নীলসংবেদন তার ব্যবস্থাপ্য। নীলসারূপ্যের দ্বারা সিদ্ধ নীলসংবেদন নীলেরই সংবেদন,

পীত, কৃষ্ণ — ইত্যাদি অন্য কিছুর নয়। এই নিশ্চয় প্রত্যয়ের দ্বারা নীলসারূপ্য নীলজ্ঞান বা নীলসংবেদনের ব্যবস্থাপন-হেতু ব্যবস্থাপক হয় এবং নীলজ্ঞান বা নীলসংবেদন তার ব্যবস্থাপ্য হয়। অর্থাৎ 'এটা নীল' — এরূপ অধ্যবসায়ে নিশ্চয় হয় যে ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে উৎপন্ন নীলের প্রাথমিক জ্ঞানটি নীলের জ্ঞান, অন্য কিছু নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ তো চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তা হলে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ই তো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ। এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধের বক্তব্য এই যে ইন্দ্রিয়, আলোক ইত্যাদি যেহেতু সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সাধারণ শর্ত, সেহেতু এগুলি প্রত্যক্ষাদি কোন জ্ঞানেরই নিয়ামক নয়। এমনকি, অর্থগত বিশেষও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের নিয়ামক নয়। কারণ, জ্ঞানের দ্বারাই অর্থগত বিশেষ নিরূপিত এবং অর্থসারূপ্যের দ্বারাই অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। তাই অর্থসারূপ্যই অর্থপ্রতীতির নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক এবং অর্থপ্রতীতি অর্থসারূপ্যের নিয়াম্য বা ব্যবস্থাপ্য। অতএব, অর্থসারূপ্য প্রমাণ এবং অর্থপ্রতীতি প্রমা বা প্রমিতি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে বাহ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ তো চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে, তা হলে চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ই তো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ বা প্রমাণ। এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধের বক্তব্য এই যে ইন্দ্রিয়, আলোক ইত্যাদি যেহেতু সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সাধারণ শর্ত, সেহেতু এগুলি প্রত্যক্ষাদি কোন জ্ঞানেরই নিয়ামক নয়। এমনকি, অর্থগত বিশেষও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের নিয়ামক নয়। জ্ঞানের দ্বারাই অর্থগত বিশেষ নিরূপিত হয়। কেবলমাত্র অর্থসারূপ্যের দ্বারাই অর্থের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। তাই অর্থসারূপ্যই অর্থপ্রতীতির নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক এবং অর্থপ্রতীতি অর্থসারূপ্যের নিয়াম্য বা ব্যাবস্থাপ্য। অতএব অর্থসারূপ্য প্রমাণ এবং অর্থপ্রতীতি প্রমা বা প্রমিতি।

তবে অর্থসারূপ্যরূপী নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি বিকল্পাত্মক অধ্যবসায় বা নিশ্চয় জ্ঞানের দ্বারা ব্যবস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত অসৎকল্প অর্থাৎ প্রায় অসতের মতই থাকে। এই অবস্থায় অর্থপ্রতীতিরূপ প্রমাণ-ফল অনিষ্পন্ন থাকে। অর্থসারূপ্যের দ্বারা ব্যবস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত সাধকতমত্বের অভাবে বিজ্ঞান নিরাকার থাকে, প্রমাণ হয় না। বিকল্পাত্মক অধ্যবসায় বা নিশ্চয় জ্ঞান উৎপন্ন হলে বিজ্ঞান সারূপ্যের জন্যই অর্থপ্রতীতিরূপে অবস্থিত হয়। যদি তাই হয়, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে বিকল্পাত্মক অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতে না পারে, তবে তো নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বা শুদ্ধ প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলা যাবে না। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হলে বস্তুর সাক্ষাৎ ছাড়াই যে কোন বস্তুর জ্ঞান হতে পারে। কারণ, বিকল্প জ্ঞান বস্তুর সাক্ষাৎ ছাড়াই উৎপন্ন হতে পারে বলে ঐ জ্ঞানে যে কোন বস্তুর প্রতীতি হতে পারে। তাই ধর্মোত্তর বলেছেন, ''প্রত্যক্ষবলোৎপন্নো দ্রষ্টব্যঃ''। অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সামর্থ্যে উৎপন্ন বিকল্প জ্ঞানেই অর্থ-সাক্ষাৎকার ঘটে। নীলের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরই যদি পীতের বিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে নীলের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষটি হবে অসৎকল্প এবং পীতের বিকল্প জ্ঞানটি হবে অযথার্থ। নীলের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বলে উৎপন্ন নীলবোধরূপ সবিকল্পক জ্ঞানটিতে নীল তথা নীলবস্তু নিশ্চিত হয়, উৎপ্রেক্ষিত-রূপে নয়। সুতরাং, অর্থসারূপ্য-রূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষটিই প্রমাণ এবং অর্থসারূপ্যের দ্বারা ব্যাবস্থাপিত সেই জ্ঞানটিই অর্থপ্রতীতি বা অর্থাববোধ।

২.৭ সারসংক্ষেপ

আচার্য ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন এইভাবে—

''তত্র কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষম্''।

অর্থাৎ দুই প্রকার সম্যক্ জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে যে সম্যক্ জ্ঞান কল্পনাস্বভাব শূন্য এবং ভ্রান্তি রহিত তাকে প্রত্যক্ষ বলে। প্রত্যক্ষ চারপ্রকার— ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মসংবেদন এবং যোগীজ্ঞান।

১) ইন্দ্রিয় জ্ঞান হল ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞান। ২) ইন্দ্রিয় জ্ঞানের আপন বিষয়ের অব্যবহিত পরবর্তী ক্ষণে ঐ বিষয়ের সহকারী সমন্তর প্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাকে মনোবিজ্ঞান বলে। ৩) সকল বিষয়গ্রাহী বিজ্ঞান ও মানস অবস্থাগ্রাহী বিজ্ঞান স্বসংবেদ্য — এদের জ্ঞান মনোবিজ্ঞান। ৪) যে কোন সদ্রুপ বস্তুর ধারাবাহিক চিন্তাপ্রবাহে ঐ ভাব্যমান বস্তু ক্রমশ অস্ফুট থেকে স্ফুট হতে হতে সম্পূর্ণ স্ফুট হবার পূর্বক্ষণ থেকে সহসা পরিপূর্ণ স্ফুট হয়, তখন ঐ জ্ঞানকে যোগীজ্ঞান বলে।

প্রত্যক্ষের বিষয় হল স্বলক্ষণ। যে বিষয়ের সন্নিধান অথবা ও অসন্নিধানের ফলে জ্ঞানপ্রতিভাসে ভেদ সূচিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিভাস স্ফুট অথবা অস্ফুট হয়, তাকে স্বলক্ষণ বলে। স্বলক্ষণ, বিজ্ঞানে তার অকৃত্রিম আকার সমর্পন করে। অপরদিকে স্বলক্ষণের বিপরীত সামান্যলক্ষণ কিন্তু অনুমানের বিষয়। সামান্যলক্ষণ জ্ঞানপ্রতিভাসে স্ফটতার মাত্রার তারতম্য ঘটাতে সক্ষম।

যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্থসারূপ্যহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অর্থপ্রতীতিরূপত্বহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমা। প্রমা ও প্রমাণের মধ্যে কোন জন্য-জনক-ভাব সম্বন্ধ নেই, ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপক ভাবসম্বন্ধ আছে। অর্থের সঙ্গে সারূপ্য বা সাদৃশ্য হল প্রমাণ এবং সেই সারূপ্যের ফলে যে অর্থপ্রতীতি হয়, সেটি হল প্রমা। সুতরাং সুস্পষ্টভাবে বলা যায় — প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অর্থসারূপ্যরূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি প্রমাণ এবং সেই অর্থসারূপ্যের দ্বারা ব্যবস্থাপিত অর্থপ্রতীতি বা অর্থাববোধ প্রমা।

২.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

প্রত্যক্ষ	ঃ	কল্পনাস্বভাবশূন্য ও ভ্রান্তিরহিত জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ।
কল্পনা	ঃ	শব্দের সঙ্গে সংসর্গযুক্ত অথবা সংযর্গযোগ্য প্রতিভাস প্রতীতি হল কল্পনা।
ইন্দ্রিয় জ্ঞান	ঃ	ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান
মনোবিজ্ঞান	ঃ	ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আপন বিষয়ের অব্যবহিত পরক্ষণে ঐ বিষয়ের সহকারী সমন্তর প্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে মনোবিজ্ঞান বলে।
আত্মসংবেদন	ঃ	স্বসংবেদ্য চিত্ত ও চৈত্তের জ্ঞান আত্মসংবেদন।
চিত্ত	ঃ	বিষয়মাত্রগ্রাহী বিজ্ঞান।
চৈত্ত	ঃ	মানস অবস্থাগ্রাহী বিজ্ঞান।

যোগীজ্ঞান ঃ ভাব্যমান সদ্রূপবস্তু অস্ফুট থেকে স্ফুট হতে হতে সম্পূর্ণ স্ফুট হবার ঠিক পূর্ববর্তী ক্ষণ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান হল যোগীজ্ঞান।

স্বলক্ষণ ঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হল স্বলক্ষণ। এরূপ বিষয়ের সন্নিধানের অথবা অসন্নিধানের ফলে জ্ঞান প্রতিভাসের স্ফুটতার মাত্রার তারতম্য ঘটে— অর্থাৎ সন্নিধানে থাকলে জ্ঞানপ্রতিভাস বিস্ফুট হয় এবং অসন্নিধানে থাকলে জ্ঞান প্রতিভাস অস্ফুট হয়।

সামান্যলক্ষণ ঃ অনুমানের বিষয়। এরূপ বিষয় স্বলক্ষণের বিপরীত।

সারূপ্য ঃ সমান রূপতা বা সাদৃশ্য

অর্থপ্রতীতি ঃ অর্থ বা বিষয়ের প্রতীতি বা বোধ।

২.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. a. How does Dharmakirti define *pratyaksa*? – Explain
   b. In this connection discuss the nature and types of *kalpana*.
2. Explain, after Dharmakirti, the different types of *pratyaksa*.
3. a.. What is *svalaksana*?
   b. What again is *samanyalaksana*? – Discuss in details

Short type :

1. What does Dharmakirti mean by *arthasarupya*? Discuss
2. Explain after Dharmakirti the meaning and significance of the term *arthapratiti*.

২.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১) চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (সম্পাদিত) ঃ *আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত ন্যায়বিন্দু (আচার্য ধর্মোত্তর রচিত টীকা সহ)*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০০৬

২) সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (সম্পাদিত) ঃ *ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু*, প্রত্যক্ষ ও স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ, অখণ্ড সংস্করণ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭

Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol I, Dover Publications, Inc. New York, 1962

Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol II, Dover Publications, Inc. New York, 1962

একক - ৩ ঃ স্বার্থানুমান

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ গ্রন্থপরিচিতি

৩.১ স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদে অনুমানের লক্ষণ নির্দেশ না করার পক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি

৩.২ স্বার্থানুমানের লক্ষণ

৩.২.১ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'তত্র' শব্দটির অর্থ

৩.২.২ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'লিঙ্গ' কথাটির অর্থ

৩.২.৩ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'ত্রিরূপ লিঙ্গ' কথাটির অর্থ

৩.২.৪ লিঙ্গের প্রথম রূপ ঃ ''লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্বমেব'' (নিশ্চিতম্)

৩.২.৫ লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপ ঃ (লিঙ্গস্য) '' সপক্ষ এব সত্ত্বম'' (নিশ্চিতম্)

৩.২.৬ লিঙ্গের তৃতীয় রূপ ঃ (লিঙ্গস্য) '' অসপক্ষে এব অসত্ত্বমেব নিশ্চিতম্''

৩.২.৭ অনুমেয়

৩.২.৮ সপক্ষ

৩.২.৯ অসপক্ষ

৩.৩ ত্রিরূপ লিঙ্গের প্রকারভেদ

৩.৩.১ অনুপলব্ধি লিঙ্গ

৩.৩.২ স্বভাব লিঙ্গ

৩.৩.৩ কার্য লিঙ্গ

৩.৩.৪ অনুপলব্ধি লিঙ্গের প্রকারভেদ

৩.৩.৪.১ স্বভাবানুলব্ধি

৩.৩.৪.২ কার্যানুপলব্ধি

৩.৩.৪.৩ ব্যপকানুপলব্ধি

৩.৩.৪.৪ স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি

৩.৩.৪.৫ বিরুদ্ধোপলদ্ধি

৩.৩.৪.৬ বিরুদ্ধ ব্যাপ্তোপলব্ধি

৩.৩.৪.৭ কার্যবিরুদ্ধোপলব্দি

৩.৩.৪.৮ ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি

৩.৩.৪.৯ কারণানুপলব্ধি

৩.৩.৪.১০ করণবিরুদ্ধোপলব্ধি

৩.৩.৪.১১ কারণ বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি

৩.৪ সারসংক্ষেপ

৩.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদে অনুমানের লক্ষণ নির্দেশ না করার পক্ষে সম্ভাব্য যুক্তি

ন্যায়বিন্দুর প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশের পর প্রত্যক্ষের প্রকারভেদ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমানের লক্ষণ নির্দেশ না করে প্রথমেই অনুমানের প্রকারভেদ করা হয়েছে এইভাবে — ''অনুমানং দ্বিধা'' ''স্বার্থং পরার্থঞ্চ'', অর্থাৎ অনুমান দুই প্রকার — স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান।

এর কারণ হিসাবে টীকাকারগণ বলেছেন যে অনুমানের দুটি প্রকার — স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান অত্যন্ত ভিন্ন হওয়াতে এদের কোন একটি সাধারণ লক্ষণ নিরূপণ করা যায়নি। তাঁদের মতে স্বার্থানুমান হল জ্ঞানাত্মক এবং পরার্থানুমান শব্দাত্মক। যেহেতু স্বার্থানুমানে ত্রিরূপ লিঙ্গের দ্বারা প্রমাতার মধ্যেই পরোক্ষ অর্থের বোধ হয়, সেহেতু স্বার্থানুমানকে জ্ঞানাত্মক বলা হয়েছে। আবার যেহেতু পরার্থানুমানে ন্যায়বাক্যের সাহায্যে অন্য ব্যক্তিকে পরোক্ষ অর্থের বোধ করানো হয়, সেহেতু পরার্থানুমান শব্দাত্মক। স্বভাবতই টীকাকারদের মতে এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় এদের একটি সাধারণ লক্ষণ নিরূপণ করা সম্ভব নয় বলে ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে অনুমানের কোন লক্ষণ নির্দেশ না করে প্রথমেই অনুমানের প্রকারভেদ করেছেন। কারণ প্রকারভেদে ব্যক্তিভেদ হয় এবং ব্যক্তিভেদ হলে প্রতি ব্যক্তির জন্য যথোপযুক্ত লক্ষণ নির্দেশ করা সম্ভব।

৩.২ স্বার্থানুমানের লক্ষণ

ধর্মকীর্তি ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে স্বার্থানুমানের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন এইভাবে —

''তত্র স্বার্থং ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্।''

অর্থাৎ ত্রিরূপ লিঙ্গ থেকে অনুমেয়তে যে জ্ঞান হয়, তাকেই স্বার্থানুমান বলে। প্রাথমিকভাবে বলা যায়, তিনটি রূপযুক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট লিঙ্গ বা (অনুমানের) হেতুকে আশ্রয় করে অনুমেয় বিষয়ের যে জ্ঞান হয়, অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত বিশেষধর্মীর যে জ্ঞান হয়, তাকেই স্বার্থানুমান বলে।

৩.২.১ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'তত্র' শব্দটির অর্থ

স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রটিতে ব্যবহৃত 'তত্র' শব্দটির মানে হল 'সেখানে'। 'সেখানে' বলতে সূত্রটিতে 'অনুমানের দুটি অত্যন্ত ভিন্ন প্রকার — 'স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের আলোচনার ক্ষেত্রে' বোঝানো হয়েছে। 'তত্র স্বার্থম্' বলতে অনুমানের দুটি অত্যন্ত ভিন্ন প্রকার — স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের আলোচনার ক্ষেত্রে ক্রমানুসারে প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্বার্থানুমান বোধিত।

৩.২.২ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'লিঙ্গ' কথাটির অর্থ

যার দ্বারা পরোক্ষ অর্থটি জানা যায় তাকে লিঙ্গ বলে। যেমন, ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা অগ্নির জ্ঞান হয় বলে ধূম অগ্নির লিঙ্গ। লিঙ্গ শব্দের একটি অর্থ তাই 'হেতু'। পবর্তস্থ ধূমের প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে পর্বতস্থ অদৃশ্য অগ্নির পরোক্ষ জ্ঞানরূপ অনুমানের ক্ষেত্রে ধূম হল হেতু, অগ্নি হল সাধ্য এবং পর্বত হল পক্ষ।

লিঙ্গ শব্দের অন্য একটি অর্থ হল কারণ। কারণ নানা প্রকার হতে পারে। যথা — ১) উৎপাদক, ২) জ্ঞাপক এবং ৩) নিশ্চায়ক। বীজ অঙ্কুর উৎপাদনের হেতু, তাই বীজ অঙ্কুরের উৎপাদক। প্রদীপ ঘট-পটাদির প্রকাশক রূপে ঐ সব বস্তুর জ্ঞাপক। কিন্তু লিঙ্গ উৎপাদক বা জ্ঞাপক কোন অর্থেই পরোক্ষ অর্থের বোধ ঘটায় না। কারণ পরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদনে লিঙ্গের কোন নিজস্ব যোগ্যতা নেই। বীজের অঙ্কুর উৎপাদনের মত লিঙ্গ যেমন পরোক্ষ অর্থের বোধ উৎপাদন করে না, তেমনি প্রদীপের মত অপ্রকাশিত বস্তুকে তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত করতে পারে না। লিঙ্গ কেবল উপস্থিত থাকলেই হয় না, বর্তমানে লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হওয়াও আবশ্যক। শুধু তাই নয়, প্রদীপ যেমন প্রকাশের কাজে অন্য কিছু অপেক্ষা করে না, লিঙ্গ কিন্তু সাধ্যের সাথে তার অবিনাভাবী সম্বন্ধকে অপক্ষা করে। তাই লিঙ্গ নিশ্চায়ক। পরোক্ষ অর্থের সাথে সে যে অবিনাভাবী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ — এটার সে নিশ্চায়ন ঘটায়। লিঙ্গের এই নিশ্চায়ন ঘটানোর মধ্যেই ধর্মকীর্তির ত্রিরূপ লিঙ্গের ধারনা নিহিত।

৩.২.৩ স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে ব্যবহৃত 'ত্রিরূপ লিঙ্গ' কথাটির অর্থ

ত্রিরূপ কথার অর্থ তিনটি রূপ। সুতরাং, ত্রিরূপ লিঙ্গ কথাটির অর্থ লিঙ্গ বা হেতুর তিনটি রূপ। বলা যেতে পারে, লিঙ্গ বা হেতুর তিনটি রূপ হল তার তিনটি পৃথক অবস্থা। ধর্মকীতির মতে লিঙ্গের এই তিনটি রূপ হল যথাক্রমে —

- ''লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বমেব'' (নিশ্চিতম্) — অর্থাৎ অনুমেয়ে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া,
- (লিঙ্গস্য) ''সপক্ষ এব সত্ত্বম্'' (নিশ্চিতম্) — অর্থাৎ সপক্ষে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া,
- (লিঙ্গস্য) ''অসপক্ষে চাসত্ত্বমেব নিশ্চিতম্'' — অর্থাৎ অসপক্ষে লিঙ্গের অবশ্য অনুপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া।

৩.২.৪ লিঙ্গের প্রথম রূপ ঃ ''লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বমেব'' (নিশ্চিতম্)

ধর্মকীর্তির মতে লিঙ্গের প্রথম রূপটি হল — অনুমেয়ে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হওয়া। তাঁর ভাষায় — ''লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বমেব'' (নিশ্চিতম্)। ধর্মোত্তর একে বলেছেন পক্ষধর্মত্ব-নিশ্চয়। অনুমেয় কী? — এর উত্তর ধর্মকীর্তি দিয়েছেন অনুমেয়ের লক্ষণ সূত্রে। সাধারণভাবে বলা যায়, অনুমেয় হল সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ বা জিজ্ঞাসিত ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মী।লিঙ্গের প্রথম রূপের বর্ণনায় 'সত্ত্ব' শব্দের

পর 'এব' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা অসিদ্ধ হেত্বাভাস নিবারিত হয়েছে। যেমন, যদি বলা হয়, 'শব্দ অনিত্য, যেহেতু শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ', তবে পক্ষাসিদ্ধ হেত্বাভাস হবে। কারণ এখানে অনুমেয় শব্দ হল জিজ্ঞাসিত বিশেষধর্মী। অনিত্যতা-রূপ ধর্মের দ্বারা ধর্মী শব্দ বিশিষ্ট কি না — এই জিজ্ঞাসার উত্তরে এখানে বলা হয়েছে — হ্যাঁ, শব্দ অনিত্যতা- রূপ ধর্মবিশিষ্ট, যেহেতু শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অথচ, আমরা জানি, শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। এখানে লিঙ্গের প্রথম রূপটি অনুপস্থিত।

আবার 'নিশ্চিত' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সকল সন্দিগ্ধাসিদ্ধ হেত্বাভাস নিরস্ত হয়েছে। লিঙ্গ যদি বর্তমানে প্রত্যক্ষলব্ধ হয়, তবে সেই লিঙ্গের সঙ্গে সাধ্যের সম্বন্ধ বলেই সেই লিঙ্গ থেকে তার সঙ্গে সম্বদ্ধ সাধ্যের অনুমান হতে পারে, অন্যথায় হেত্বাভাস হবে। উৎপাদক বা জ্ঞাপক নয় বলে লিঙ্গ কেবলমাত্র যোগ্যতার দ্বারা পরোক্ষ জ্ঞানের হেতু হয় না। কোন অতীত বা অনাগত (তথাকথিত) লিঙ্গ থেকে অনুমান হয় না। পরোক্ষ বিষয়ের সঙ্গে অবিনাভাব সম্বন্ধের দ্বারা কেবলমাত্র বর্তমানে প্রত্যক্ষগোচর লিঙ্গই পরোক্ষ বিষয় প্রতিপাদন করে, অন্যভাবে নয়। সুতরাং অনুমেয়ে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত হতে হবে — একথা বলার দ্বারা লিঙ্গের প্রথম রূপটি সর্বপ্রকার অসিদ্ধ ও সন্দিগ্ধ হেতু নিরস্ত করেছে।

৩.২.৫ লিঙ্গের দ্বিতীয়রূপ ঃ (লিঙ্গস্য) ''সপক্ষ এব সত্ত্বম্'' (নিশ্চিতম্)

ধর্মকীর্তির মতে লিঙ্গের দ্বিতীয়রূপটি হল সপক্ষে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি জ্ঞাত হওয়া। সপক্ষ কী ? — এই প্রশ্নের উত্তর ধর্মকীর্তি দিয়েছেন সপক্ষের লক্ষণ-সূত্রে। লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপের বর্ণনায় 'এব' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সাধারণ-অনৈকান্তিক হেত্বাভাস নিরাকৃত হয়েছে। যদি বলা হয়, ' শব্দঃ অনিত্যঃ প্রমেয়ত্বাৎ,' তবে সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ঘটে। কারণ এখানে প্রমেয়ত্ব হেতুটি সপক্ষেই থাকে এমন নয়, আকাশাদি নিত্য বস্তুরূপ বিপক্ষেও থাকে। সুতরাং এটি সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস, প্রকৃত হেতু নয়। ধর্মকীর্তি প্রদর্শিত লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপের দ্বারা এরূপ সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস নিরাকৃত হয়েছে। কারণ লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে লিঙ্গ বা হেতুর সত্বা সপক্ষেই থাকবে, অর্থাৎ বিপক্ষে নয়। কিন্তু পূর্বোক্ত উদাহরণে লিঙ্গের সত্বা সপক্ষ এবং বিপক্ষ উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। (অর্থাৎ সাধ্য ধর্মের সমান ধর্ম বিশিষ্ট অর্থ বা স্থল বিশেষই সপক্ষ। একটি অনুমানের পক্ষে যে সাধ্যটি থাকে তার যে সামান্য রূপ, তাকে সাধ্যধর্ম বলা হয়, সেটি যে যে স্থলে থাকে, সেই স্থলকে ঐ অনুমানের সপক্ষ বলা হয়।)

লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপের বর্ণনায় 'সত্ত্ব' শব্দটি প্রয়োগের দ্বারা বিরুদ্ধ-হেত্বাভাস নিরাকৃত হয়েছে। যেমন, 'শব্দঃ নিত্যঃ কৃতকাত্বাৎ' — এই অনুমানটিতে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস ঘটেছে। কারণ শব্দ নিত্য, যেহেতু তাতে কৃতকত্ব অর্থাৎ উৎপন্নত্ব কিংবা কার্যত্ব আছে — এরূপ বললে দেখা যায় যে আকাশাদি নিত্য পদার্থ — যেগুলি এখানে শব্দের সপক্ষ, সেগুলিতে কৃতকত্ব হেতুটি অনুপস্থিত, অথচ নিত্যের বিরুদ্ধ বস্তুর মধ্যে কৃতকত্ব বিদ্যমান। সপক্ষে হেতুর সত্ব বা উপস্থিতি নিশ্চিত রূপে থাকবে — একথা বলার দ্বারা পূর্বোক্তরূপ হেত্বাভাস নিরস্ত হয়েছে।

যেহেতু সপক্ষে অবশ্যই আছে কিনা নিশ্চিত নয় — সেটি সন্দিগ্ধান্বয়-অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। যেমন, 'সর্বজ্ঞঃ কশ্চিদ্ বক্তৃত্বাৎ' — অর্থাৎ ইনি সর্বজ্ঞ, যেহেতু তিনি বক্তা। এই অনুমানে বক্তৃত্ব (অর্থাৎ বক্তা হওয়া ব্যাপারটি) সকল সপক্ষে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ পুরুষে নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত নয়, সন্ধিগ্ধ। সর্বজ্ঞ পুরুষে

বক্তৃত্ব থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপে বলা হয়েছে, হেতুকে অবশ্যই নিশ্চিত রূপে সপক্ষে থাকতে হবে। ফলে সন্দিগ্ধান্বয়-অনৈকান্তিক হেত্বাভাস নিরস্ত হল।

৩.২.৬ লিঙ্গের তৃতীয় রূপ ঃ (লিঙ্গস্য) ''অসপক্ষে অসত্বমেব নিশ্চিতম্''

ধর্মকীর্তির মতে লিঙ্গের তৃতীয় রূপটি হল — অসপক্ষে (অর্থাৎ বিপক্ষে) অবশ্যই লিঙ্গের অনুপস্থিতি নিশ্চিত রূপে জ্ঞাত হওয়া। তাঁর ভাষায় — ''অসপক্ষে অসত্বমেব নিশ্চিতম্''। অসপক্ষ কী? এর উত্তর ধর্মকীর্তি দিয়েছেন অসপক্ষের লক্ষণসূত্রে। সাধারণভাবে বলা যায়, পক্ষে বিদ্যমান সাধ্যধর্মটি যে যে স্থলে থাকে না, সেগুলিই অসপক্ষ। অন্যভাবে বলা যায়, কোন অনুমানের সাধ্যধর্ম যে যে স্থলে অনুপস্থিত, সেই সেই স্থলকেই ঐ অনুমানের অসপক্ষ বা বিপক্ষ বলা হয়। এখানে লিঙ্গের তৃতীয়রূপে 'অসত্ব' শব্দের গ্রহণের দ্বারা বিরুদ্ধ হেত্বাভাস নিরস্ত হয়েছে। কারণ, যে হেতু কেবলমাত্র বিপক্ষে থাকে তাকে বিরুদ্ধ হেতু বলে। যেমন, 'শব্দঃ নিত্যঃ কৃতকাত্বাৎ' — এই অনুমানটিতে কৃতকত্ব হল হেতু, শব্দ হল পক্ষ, নিত্য হল সাধ্য এবং নিত্যত্ব হল সাধ্যধর্ম। হেতু কৃতকত্ব অসপক্ষে থাকতে পারে না। অর্থাৎ যে স্থলে সাধ্যধর্ম নিত্যত্ব অনুপস্থিত, সে স্থলে হেতু কৃতকত্ব বা উৎপন্নত্ব থাকতে পারে না, কিন্তু আমরা জানি কৃতকত্ব নীলাদি অনিত্য বস্তুতে বিদ্যমান। সুতরাং এই অনুমানে প্রকৃত হেতু নেই, বিরুদ্ধ হেতু আছে। লিঙ্গের তৃতীয় রূপে এজাতীয় হেত্বাভাস নিরস্ত হয়েছে।

আবার 'এব' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা বিপক্ষের একদেশে উপস্থিত সাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস নিরস্ত করা হয়েছে। যেমন, শব্দ প্রযত্নের দ্বারা উৎপন্ন বলে অনিত্য — এরূপ অনুমানের অসপক্ষ হল আকাশ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি । কারণ 'প্রযত্নের দ্বারা উৎপন্নত্ব' আকাশ, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে নেই। কিন্তু অনিত্যত্ব হেতুটিআকাশে অনুপস্থিত থাকলেও বিদ্যুতে উপস্থিত। লিঙ্গের তৃতীয় রূপের বর্ণনায় 'এব' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা এরূপ হেত্বাভাস নিরস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া 'এব' শব্দটি 'অসত্ত্ব' শব্দের পরে ব্যবহার করার ফলে 'হেতুটি অবশ্যই বিপক্ষে উপস্থিত থাকবে' — এই অর্থই প্রকাশ পেয়েছে।

আবার 'ইনি সর্বজ্ঞ নন, কারণ ইনি বক্তা'— এরূপ অনুমানে যে সন্দিগ্ধ অসপক্ষ-ব্যবৃত্তিক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস ঘটে, তার নিরসনের জন্য 'এব' শব্দের পর ' নিশ্চিতম্' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি বক্তা হতে পারেন কিনা — এটা নিশ্চিত নয়, সন্দিগ্ধ বিষয়। তাই লিঙ্গের তৃতীয়রূপ অনুযায়ী হেতুটি অসপক্ষে অবশ্যই অনুপস্থিত আছে কিনা এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

৩.২.৭ অনুমেয়

''অনুমেয়োঽত্র জিজ্ঞাসিত বিশেষো ধর্মী'' — এভাবেই ধর্মকীর্তি অনুমেয়ের লক্ষণ দিয়েছেন। এর অর্থ হল — এখানে (মানে স্বার্থানুমানের লক্ষণসূত্রে) অনুমেয় হল সেই ইষ্ট ধর্মী, যার বিশেষ (তথা ধর্ম) জানতে ইচ্ছা হয়েছে। সাধারণত ধর্মধর্মীসমুদায় এবং কেবল ধর্ম — এই দুটি ভিন্ন অর্থে অনুমেয় শব্দের ব্যবহার হয়। কিন্তু স্বার্থানুমানের লক্ষণ-সূত্রে এই দুই অর্থে অনুমেয় শব্দের ব্যবহার হয়নি বলে ধর্মকীর্তি বলেছেন, এখানে অনুমেয় বলতে 'জিজ্ঞাসিত বিশেষঃ ধর্মী' বুঝানো হয়েছে।

৩.২.৮ সপক্ষ

লিঙ্গের দ্বিতীয় রূপ ঃ ''সপক্ষ এব সত্ত্বম্'' (নিশ্চিতম্)। স্বভাবত মনে প্রশ্ন জাগে, স্বপক্ষ কী? উত্তর পাওয়া যায় এই সূত্রে —

''সাধ্যধর্মসামান্যেন সমানোঽর্থঃ সপক্ষঃ''।

অর্থাৎ সাধ্যধর্মসামান্যের দ্বারা যে অর্থ বা স্থলবিশেষ সমান, তাকে সপক্ষ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, পক্ষে বিদ্যমান সাধ্যধর্ম অন্য যে যে স্থলে থাকে, সেই সেই স্থলকে সপক্ষ বলে। 'পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'' — এই অনুমানে সাধ্য হল বহ্নি এবং সাধ্যধর্ম হল বহ্নির সামান্য-রূপ। পক্ষ পর্বতে বহ্নির যে সামান্য-রূপ থাকে, সেটি মহানস (রান্নাঘর), যজ্ঞভূমি — ইত্যাদি স্থলেও থাকে বলে সেই সেই স্থল পক্ষের সমান বা পক্ষ-সদৃশ। যা পক্ষের সমান বা পক্ষ-সদৃশ তা-ই সপক্ষ। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' — এই অনুমানে বহ্নির সামান্য-রূপ পক্ষে সাধ্যধর্ম রূপে থাকলেও সপক্ষে সিদ্ধধর্মরূপে থাকে।

৩.২.৯ অসপক্ষ

লিঙ্গের তৃতীয় রূপ ঃ 'অসপক্ষে অসত্ত্বমেব নিশ্চিতম্''। জানা প্রয়োজন, অসপক্ষ কী। উত্তর পাওয়া যায় ধর্মকীর্তি রচিত এই সূত্রে —

''ন সপক্ষোঽসপক্ষঃ''

অর্থাৎ যা সপক্ষ নয়, তাই অসপক্ষ। এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ধর্মোত্তর বলেছেন, সপক্ষ যা হতে পারে না, তাই অসপক্ষ। পক্ষে বিদ্যমান সাধ্যধর্ম যে যে স্থলে থাকে, সেই সেই স্থলকে যেহেতু সপক্ষ বলে, সেহেতু পক্ষে বিদ্যমান সাধ্যধর্ম যে যে স্থলে থাকে না, সেই সেই স্থলকে অসপক্ষ বলে। তাঁর কথায়—

''ততোঽন্যস্তদ্বিরুদ্ধস্তদভাবশ্চেতি''।

অর্থাৎ তার (মানে সপক্ষ) থেকে অন্য (বা ভিন্ন), তার বিরুদ্ধ এবং তার অভাব — এই তিনটি কারণে কোন অর্থ (বা স্থল) সপক্ষ হয় না, অসপক্ষ হয়।

১) **সপক্ষ থেকে অন্য** ঃ 'এটা ক্ষিতি বা পৃথিবী), কারণ এটা গন্ধযুক্ত' — এই অনুমানে জল গন্ধহীন বলে গন্ধযুক্ত যে কোন সপক্ষ থেকে অন্য বা ভিন্ন।

২) **সপক্ষের বিরুদ্ধ** ঃ পর্বতটি বহ্নিমান, কারণ এতে ধূম দেখা যাচ্ছে' — এই অনুমানে জলাশয়াদি বহ্নিহীন হওয়ায় বহ্নিমান সপক্ষ মহানসাদির বিরুদ্ধ।

৩) **সপক্ষের অভাব** ঃ 'এটা ক্ষণিক, কারণ এতে সত্ত্ব বা অর্থক্রিয়াকারীত্ব আছে' — এই অনুমানে খরগোশের সিং অসপক্ষ, যেহেতু সেটি অর্থক্রিয়াকারী ক্ষণিক সদ্বস্তুর অভাবমাত্র — যার কোন রূপই নেই।

ধর্মোত্তর বলেন যে সপক্ষের অভাব সাক্ষাৎভাবে সপক্ষের অভাব বলেই জ্ঞান হয়; কিন্তু সপক্ষের অন্য এবং সপক্ষের বিরুদ্ধ সামর্থ্যবশত (পরোক্ষভাবে) সপক্ষের অভাবরূপে জ্ঞান হয়। ফলে তিনটি ক্ষেত্রেই সপক্ষের অভাব থাকে।

৩.৩ ত্রিরূপ লিঙ্গের প্রকার

তিনটি রূপ বিশিষ্ট লিঙ্গ কিন্তু একপ্রকার নয়। ধর্মকীর্তি বলেছেন,

''ত্রিরূপানি চ ত্রীণ্যেব লিঙ্গানি।''

অর্থাৎ ত্রিরূপ বিশিষ্ট লিঙ্গ তিন প্রকারই হয়। এই তিনপ্রকার লিঙ্গ কী কী? এর উত্তর পাওয়া যায় নিম্নোক্ত সূত্রে —

''অনুপলব্ধিঃ স্বভাবঃ কার্য্যং চেতি।''

অর্থাৎ পক্ষধর্মত্ব, সপক্ষসত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব — এই তিনটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত লিঙ্গমাত্রই অনুপলব্ধি লিঙ্গ, স্বভাব লিঙ্গ ও কার্য লিঙ্গ — এই তিন প্রকার লিঙ্গের যে কোন একপ্রকার অবশ্যই হবে। বিপরীত ভাবে বলা যায়, অনুপলব্ধি লিঙ্গ, স্বভাব লিঙ্গ এবং কার্য লিঙ্গ — এই তিন প্রকার লিঙ্গের প্রত্যেকটিই পক্ষধর্মত্ব, সপক্ষসত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব — এই তিন রূপ বিশিষ্ট হবে।

৩.৩.১ অনুপলব্ধি লিঙ্গ

ধর্মকীর্তির মতে অনুপলব্ধি লিঙ্গের দ্বারা 'এখানে ঘট নেই'— এজাতীয় ব্যবহার সিদ্ধ হয়। ঘট নেই মানে ঘটের অভাব। বৌদ্ধ মতে অভাব প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। ধর্মকীর্তি বলেছেন,

''তত্রানুপলব্ধির্যথা ন প্রদেশবিশেষে ক্বচিদ ঘটঃ উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেরিতি।''

অর্থাৎ সেখানে (মানে তিনপ্রকার লিঙ্গের মধ্যে) অনুপলব্ধি লিঙ্গ হল এরকম — কোন বিশেষ স্থানে ঘট নেই, কারণ ঘটটি উপললব্ধিজনক সামগ্রীর অন্তর্ভূক্ত হলেও ঘটের উপলব্ধি হচ্ছে না। যেহেতু ঘটাভাব কোন বস্তু নয়, সেহেতু ঘটাভাবকে প্রত্যক্ষ করে 'ঘট নেই' — এরূপ ব্যবহার হতে পারে না। উপলব্ধির অভাব হল একটি লিঙ্গ যার দ্বারা কোন একটি বিশেষ স্থানে ঘট নেই — এরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়। এরূপ লিঙ্গ হল অনুপলব্ধি লিঙ্গ। 'এখানে ঘট নেই' এরূপ জ্ঞানে ঘট উপলব্ধি লক্ষণপ্রাপ্ত — অর্থাৎ উপলব্ধি যোগ্য বা প্রত্যক্ষযোগ্য।

যে ঘট এখানে নেই, সেটিকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলা যাবে কীভাবে? উত্তরে বলা হয়েছে, ঐ ঘট প্রত্যক্ষের সকল কারণের মধ্যে কেবলমাত্র ঘট ছাড়া অন্য সব কারণ বিদ্যমান থাকলে ঘটটিকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলা হবে। এক্ষেত্রে অবিদ্যমান ঘটে প্রত্যক্ষত্ব সমারোপ করা হয়। ধরে নেওয়া হয়, যদি সেটি থাকত, তবে সেটি প্রত্যক্ষযোগ্য হত। দর্শনসামগ্রী উপস্থিত থাকলেও যা দৃশ্য হবে না, তার অনুপলব্ধিকে অদৃশ্যানুপলব্ধি বলে। অদৃশ্যানুপলব্ধি সম্যক্ জ্ঞানের হেতু হয় না। কেবলমাত্র দৃশ্যানুপলব্ধিই সম্যক্ জ্ঞানের হেতু হতে পারে।

যখন একটি জ্ঞানের সাথে সম্বদ্ধ দুটি বস্তুর মধ্যে একটির উপলব্ধি হয় এবং জানা যায় যে অপর বস্তুটি ছাড়া ঐ অপর বস্তুর স্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হবার সব কারণগুলো একত্র উপস্থিত আছে, তখন ঐ

জ্ঞানের সাথে ঐরূপ সম্বদ্ধ বস্তুদ্বয়কে একজ্ঞানসংসর্গী বলে। যেমন, ভূতলে ঘট আছে — এরূপ জ্ঞানে ঘট ও ভূতল একে অপরের অপেক্ষায় একজ্ঞানসংসর্গী। এরূপ একজ্ঞানসংসর্গী বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটির উপলব্ধি হলেই বোঝা যায় যে অপরটির উপলব্ধির সকল কারণ বিদ্যমান আছে, কেবলমাত্র সেই অপর বস্তুটি নিজে অনুপস্থিত। অনুপলব্ধি লিঙ্গ বস্তুর বিধির সাধন নয়, প্রতিষেধের সাধন। প্রতিষেধ কথার অর্থ অভাব। অনুপলব্ধি বা অভাবরূপ হেতু সার্বিক নিষেধের হেতু নয়, সম্যক্ জ্ঞানের কারণরূপে কোন না কোন বস্তুর সাধক।

ধর্মকীর্তির মতে কোন বস্তুর অনুপলব্ধিতে সেই বস্তুটি প্রত্যক্ষযোগ্য হবার মূলে ঐ বস্তুর স্বভাববিশেষ হল একটি কারণ, তিনি বলেন, জ্ঞানের অন্য কারণগুলি বিদ্যমান থাকলে একটি বস্তু প্রত্যক্ষ হবেই, যদি সেই বস্তুটি বিদ্যমান থাকে — বস্তুর এই যে স্বভাব — সেটিই হল স্বভাববিশেষ।

৩.৩.২ স্বভাবলিঙ্গ

''স্বভাবঃ স্বসত্তামাত্রভাবিনি সাধ্যধর্মে হেতুঃ''। অর্থাৎ সাধ্যধর্মের অনুমিতিতে যা নিজ সত্তামাত্রের দ্বারাই হেতু হয়, তাই স্বভাবলিঙ্গ — এভাবেই ধমকীর্তি স্বভাবলিঙ্গের লক্ষণ দিয়েছেন। ধর্মোত্তর এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—

যে সাধ্য অন্যনিরপেক্ষভাবে হেতুর সত্তামাত্রের অপেক্ষা করে বর্তমান থাকে, অন্যকিছুর অপেক্ষা করে না — সেটি স্বসত্তামাত্রভাবী সাধ্য। এরূপ সাধ্যের যা স্বভাব, তাই হেতু বা লিঙ্গ, এটা সাধ্য থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এর উদাহরণ দিয়েছেন ''যথা বৃক্ষোঽয়ং শিংশপাত্বাদিতি'' — এই সূত্রে। সূত্রটির অর্থ হল ঃ এটি বৃক্ষ, কারণ এটি শিংশপা। এখানে 'এটি' ধর্মী, 'বৃক্ষ' সাধ্য এবং 'শিংশপাত্ব' হেতু। এটি শিংশপা বলেই বৃক্ষ। শিংশপার স্বভাবই বৃক্ষত্ব, অতএব শিংশপা হলেই বৃক্ষ হবে। সাধারণ ধর্মই এখানে বৃক্ষত্ব ব্যবহারের হেতু বা নিমিত্ত, অন্য কিছু নয়। স্বভাবলিঙ্গ বস্তুর বিধির গমক বা অনুমাপক হেতু।

৩.৩.৩ কার্য্যলিঙ্গ

ধর্মকীর্তি কার্যলিঙ্গের লক্ষণ দেন নি, উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — 'কার্য্যং যথাগ্নিরত্র ধূমাদিতি'। অর্থাৎ, এখানে অগ্নি আছে, কারণ এখানে ধূম আছে — এটাই কার্যের উদাহরণ। এই উদাহরণে 'অগ্নি', সাধ্য, 'অত্র' বা 'এখানে' ধর্মী এবং 'ধূম' হেতু। ব্যবহারে কার্যকারণভাব প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধির দ্বারা নিশ্চিত হয়। যেমন, কার্যধূম থাকলে কারণ অগ্নিও থাকবে, এবং কারণ অগ্নি অনুপস্থিত থাকলে কার্য ধূমও অুপস্থিত থাকে। ধর্মোত্তর মনে করেন, দুটি বস্তুর মধ্যে যে কার্যকারণ ভাব বা তদুৎপত্তি সম্বন্ধ আছে, সেটি লোকে প্রত্যক্ষ ও অনুপলম্ভের দ্বারা নির্ণয় করে। যেহেতু, তার মতে, লোকপ্রসিদ্ধ কার্যলিঙ্গের স্বরূপ নিয়ে কোন মতভেদ নেই, সেহেতু ধর্মকীর্তি কার্যলিঙ্গের লক্ষণ বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। স্বভাব লিঙ্গের মত কার্যলিঙ্গও বস্তুর বিধির গমক বা অনুমাপক হেতু।

৩.৩.৪ অনুপলব্ধির প্রকারভেদ

ধর্মকীর্তি বলেছেন, ''সা চ প্রয়োগভেদাদেকাদশপ্রকারা''। অর্থাৎ প্রয়োগের ভেদ অনুযায়ী অনুপলব্ধি একাদশ প্রকার। ন্যায়বিন্দুতে ধর্মকীর্তি যে একাদশ প্রকার অনুপলব্ধির উদাহরণ দিয়েছেন সেগুলি হল —

১) স্বভাবানুপলব্ধি, ২) কার্য্যানুপলব্ধি , ৩) ব্যাপকানুপলব্ধি, ৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি, ৫) বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি, ৬) বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি, ৭) কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি, ৮) ব্যপকবিরুদ্ধোপলব্ধি, ৯) কারণানুপলব্ধি, ১০) কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি ১১) কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি।

৩.৩.৪.১ স্বভাবানুপলব্ধি

ধর্মকীর্তি স্বভাবানুপলব্ধির যে উদারণ দিয়েছেন সেটি হল — 'এখানে ধূম নেই, কারণ সেটি উপলব্ধির যোগ্য হলেও তার অনুপলব্ধি হচ্ছে।' উপলব্ধির সকল কারণ উপস্থিত থাকলে উপলব্ধ হওয়াই ধূমের স্বভাব। কিন্তু এই স্বভাবের অনুপলব্ধি হচ্ছে। এটাই স্বভাবানুপলব্ধি।

৩.৩.৪.২ কার্য্যানুপলব্ধি

ধর্মকীর্তি প্রদত্ত কার্য্যানুপলব্ধির উদাহরণ—'এখানে ধূমের অভাব আছে, অতএব প্রতিবন্ধবিহীন — সামর্থ্যযুক্ত ধূমের কারণ এখানে নেই।' কার্যের অনুপলব্ধিমাত্র থেকে কারণের অনস্তিত্ব অনুমান করা যায় না। কিন্তু কারণের কার্য্যোৎপাদন সামর্থ্য যদি প্রতিবন্ধবিহীন হয়, তবে সেই কারণ কার্য উৎপাদন না করে বিদমান থাকতে পারে না। তাই অপ্রতিবদ্ধ সামর্থ্যকে কারণের বিশেষণ করা হয়েছে। কার্যের অনুপলব্ধি থেকে অপ্রতিবদ্ধ সামর্থ্য কারণেরই অনুপলব্ধি বা অভাব অনুমিত হতে পারে।

৩.৩.৪.৩ ব্যাপকানুপলব্ধি

প্রতিষেধ্য ব্যাপ্য বস্তুর যা ব্যাপক তার অনুপলব্ধি হল ব্যাপকানুপলব্ধি। ধর্মকীর্তি প্রদত্ত উদাহরণ — 'এখানে শিংশপা নেই। কারণ এখানে বৃক্ষ নেই।' এই উদাহরণে প্রতিষেধ্য ব্যাপ্য বস্তু শিংশপার যা ব্যাপক, অর্থাৎ বৃক্ষ, তার অনুপলব্ধি বোঝান হয়েছে। এরূপ অনুপলব্ধিই ব্যাপক্বানুপলব্ধি।

৩.৩.৪.৪ স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি

প্রতিষেধ্য বস্তুর যা স্বভাব তার বিরুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট বস্তুর উপলব্ধি হল স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি। উদাহরণ - 'এখানে অগ্নি আছে, অতএব এখানে শীতস্পর্শ নেই।' এই উদাহরণ অনুযায়ী এখানে শীতস্পর্শ অগ্নির বর্তমানত্বহেতু প্রত্যক্ষ যোগ্য নয়। যেখানে অগ্নি প্রত্যেক্ষ হচ্ছে, সেখানে শীতস্পর্শের নিষেধ এই প্রকার অনুপলব্ধি।

৩.৩.৪.৫ বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি

প্রতিষেধ্য বস্তুর যা বিরুদ্ধ তার কার্যের উপলব্ধি যদি অনুমাপক হেতু হয, তবে সেটি বিরুদ্ধকার্যোপলব্ধি বলে গণ্য হবে। যেমন, 'এখানে ধূম আছে বলে শীতস্পর্শ নেই।' এই উদাহরণে প্রতিষেধ্য হল শীতস্পর্শ, তার বিরুদ্ধ অগ্নির কার্য, ধূম অনুমাপক, তাই এটি বিরুদ্ধ কার্য্যোপলব্ধি লিঙ্গ।

৩.৩.৪.৬ বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি

বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধির উদাহরণ দিতে গিয়ে ধর্মকীর্তি বলেছেন, 'উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী নয়, কারণ বিনাশের জন্য অন্য হেতুর অপেক্ষা থাকে'। প্রতিষেধ্য, অর্থাৎ যা নেই বলে জ্ঞান হবে, তার যেটি বিরুদ্ধ, তার সাথে ব্যাপ্ত অন্য ধর্মের উপলব্ধি হল বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি।

৩.৩.৪.৭ কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি

ধর্মকীর্তি কার্যবিরুদ্ধোপলব্ধির যে উদাহরণ দিয়েছেন সেটি এরকম — 'এখানে অবাধিত সামর্থ্যযুক্ত শীতলতার কারণগুলি নেই, যেহেতু এখানে অগ্নি আছে।' প্রতিষেধ্য, তথা যার প্রতিষেধ করা হচ্ছে, তার কার্যের যা বিরুদ্ধ, তার উপলব্ধি হল কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি।

৩.৩.৪.৮ ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি

ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধির উদাহরণ ধর্মকীর্তি দিয়েছেন এই ভাবে — 'এখানে তুষারস্পর্শ নেই, যেহেতু এখানে অগ্নি আছে।' প্রতিষেধ্যের যে ব্যাপক, তার যা বিরুদ্ধ, তার উপলব্ধি হল ব্যাপকবিরুদ্ধোলব্ধি।

৩.৩.৪.৯ কারণানুপলব্ধি

ধর্মকীর্তি কারণানুপলব্ধির উদারহণ দিয়েছেন এইভাবে — 'এখানে ধূম নেই, কারণ এখানে অগ্নির অভাব আছে।' সুতরাং, এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রতিষেধ্য, তথা যার প্রতিষেধ করা হচ্ছে, তার কারণের অনুপলব্ধি হল কারণানুপলব্ধি। যেখানে কার্য থাকলেও অপ্রত্যক্ষ, সেখানে কার্যের অভাব সিদ্ধিতে কারণানুপলব্ধি হেতুর প্রয়োগ হয়।

৩.৩.৪.১০ কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি

প্রতিষেধ্যের (মানে যার প্রতিষেধ করা হচ্ছে তার) কারণের বিরুদ্ধটির উপলব্ধি হল কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি। উদাহরণ — 'এর (মানে এই ব্যাক্তিটির) রোমহর্ষাদি নেই মানে শীতস্পর্শে (রোমাঞ্চ ইত্যাদি হচ্ছে না), কারণ সে (শীতের বিরুদ্ধ) দহনবিশেষ অগ্নির নিকটে আছে। যেখানে শীতস্পর্শ বিদ্যমান থাকলেও প্রত্যক্ষযোগ্য নয় এবং শীতস্পর্শে সৃষ্ট বিশেষ ধরণের রোমাঞ্চ ইত্যাদিও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, সেখানে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে এরূপ হেতুর প্রয়োগ করা হয়।

৩.৩.৪.১১ কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি

প্রতিষেধ্যের কারণের বিরুদ্ধটির যে কার্য, তার উপলব্ধি হল কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি। উদাহরণ — 'এই প্রদেশ (শীতস্পর্শে সৃষ্ট) রোমহর্ষাদিবিশেষযুক্ত (অর্থাৎ বিশেষ প্রকার রোমঞ্চ ইত্যাদির দ্বারা যুক্ত) পুরুষবান নয়, কারণ এখানে ধূম আছে।' যেখানে (শীতস্পর্শ জাত) রোমহর্ষাদি প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, শীতস্পর্শের অনুভব হচ্ছে না এবং (শীতস্পর্শে জাত রোমহর্ষাদির বিরুদ্ধ) অগ্নিও প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, কিন্তু ধূম প্রত্যক্ষ হচ্ছে, সেখানে কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি হেতুর প্রয়োগ হয়।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

ন্যায়বিন্দুর স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদে ধর্মকীর্তি প্রথমে অনুমানের প্রকারভেদ করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুমান দুই প্রকার স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। তারপর তিনি স্বার্থানুমানের লক্ষণ দিয়েছেন এইভাবে — ''তত্র স্বার্থং ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানম্''। অর্থাৎ ত্রিরূপ লিঙ্গ থেকে অনুমেয়তে যে জ্ঞান হয়, তাকে স্বার্থানুমান বলে। ত্রিরূপ লিঙ্গ বলতে ধর্মকীর্তি ১) অনুমেয়ে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া, ২) সপক্ষে লিঙ্গের অবশ্য উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া এবং ৩) অসপক্ষে লিঙ্গের অবশ্য অনুপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া বুঝেছেন। যা পক্ষসদৃশ তাই সপক্ষ এবং অনুমেয় হল জিজ্ঞাসিতবিশেষধর্মী। তারপর ধর্মকীর্তি লিঙ্গের প্রকারভেদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ত্রিরূপলিঙ্গ তিনপ্রকার, যথা -— অনুপলব্ধিলিঙ্গ , স্বভাবলিঙ্গ এবং কার্যলিঙ্গ। এখানে এই তিন প্রকার লিঙ্গের উদাহরণ-সহ স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে এবং অনুপলব্ধি লিঙ্গের একাদশ প্রয়োগের প্রত্যেকটির ধর্মকীর্তি প্রদত্ত উদাহরণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই একাদশ প্রকার অনুপলব্ধিলিঙ্গ হল ঃ ১) স্বভাবানুপলব্ধি, ২) কার্য্যানুপলব্ধি , ৩) ব্যাপকানুপলব্ধি, ৪) স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি, ৫) বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি, ৬) বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি, ৭) কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি, ৮) ব্যপকবিরুদ্ধোপলব্ধি, ৯) কারণানুপলব্ধি, ১০) কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি ১১) কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি।

৩.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

স্বার্থানুমান	-	ত্রিরূপলিঙ্গ থেকে অনুমেয়তে যে জ্ঞান হয় তাই স্বার্থানুমান।
সপক্ষ	-	পক্ষ সদৃশ।
অসপক্ষ	-	যা পক্ষ সদৃশ নয়।
অনুমেয়	-	জিজ্ঞাসিত বিশেষধর্মী।
একজ্ঞানসসসর্গী	-	একটি জ্ঞানে সংসর্গ আছে এমন দুটি বস্তু।
প্রতিষেধ	-	অভাব এবং অভাব-ব্যবহার।

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. How does Dharmakirti define *svarthanumana*? – Discuss
2. Explain after Dharmakirti the classification of *trirupa-linga*.

Short answer type

1. Explain the following :

a) *anumeya*

b) *sapaksa*

c) *asapaksa*

d) *trirupa linga*

e) *svabhava linga*

f) *karya linga*

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১) চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (সম্পাদিত) ঃ *আচার্য ধর্মকীর্তি রচিত ন্যায়বিন্দু (আচার্য ধর্মোত্তর রচিত টীকা সহ)*, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ২০০৬

২) সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার (সম্পাদিত) ঃ *ধর্মকীর্তি বিরচিত ন্যায়বিন্দু*, প্রত্যক্ষ ও স্বার্থানুমান পরিচ্ছেদ, অখণ্ড সংস্করণ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৭

৩) Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol I, Dover Publications, Inc. New York, 1962

৪) Stcherbatsky, F. Th. : *Buddhist Logic*, Vol II, Dover Publications, Inc. New York, 1962

৫). Prasad, Rajendria : *Dharmakirti's Theory of Inference : Revaluation and Reconstruction*, Oxford, New Delhi, 2002

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা

দ্বিতীয় অর্ধ

অধ্যাপক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাঠ (Unit-I)

জ্ঞানের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of Knowledge)

পাঠ সংকেত ঃ

১.০ উদ্দেশ্য (Aim)

১.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

১.২ 'জানা' ক্রিয়াপদটির বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার (Different Uses of the Verb 'To Know')

১.২.১ পরিচিতি অর্থে (In the Sense of Being Acquainted With)

১.২.২ দক্ষতা অর্থে (In the sense of Knowing How)

১.২.৩ বাচনিক অর্থে (In the sense of Knowing That)

১.৩ জ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Features of Knowledge)

১.৪ জ্ঞান এবং জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় (Knowledge and Cognitive Mental State)

১.৫ বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত (Necessary and Sufficient Conditions of 'Knowing That')

১.৬ শর্তসমূহের বিশ্লেষণ (An Analysis of the Conditions)

১.৬.১ সত্যতার শর্ত (The Truth Condition)

১.৬.২ বিশ্বাসের শর্ত (The Belief Condition)

১.৬.৩ যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্ত (The Justification Condition)

১.৭ সারসংক্ষেপ (Summary)

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

১.০ : উদ্দেশ্য (Aim)

দার্শনিক আলোচনায় যে সমস্ত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা অথবা জ্ঞানবিদ্যা বা জ্ঞানতত্ত্ব। জ্ঞানতত্ত্বে যে সমস্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয় তাদের তালিকাটিও একটি দীর্ঘ তালিকা। উদাহরণস্বরূপ, এই তালিকায় অর্ন্তভুক্ত হল জ্ঞান, প্রত্যক্ষ, অনুমান, প্রমাণ, কল্পনা, স্মৃতি, ভ্রান্তি, সংশয়, নিশ্চিতি এবং সংশ্লিষ্ট আরও বহু বিষয়। জ্ঞানের প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনা একটি প্রাথমিক আলোচনা, এই আলোচনা থেকে আমরা জ্ঞানবিদ্যার অর্ন্তগত বিষয়সমূহকে বোঝার জন্য কিছু প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারি।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সঙ্গত কারণেই জ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনা করার জন্য দার্শনিকগণ সর্বপ্রথম জ্ঞানের সংজ্ঞা নিরূপণ করার চেষ্টা করেন। জ্ঞানের সংজ্ঞা বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা জ্ঞানবিদ্যার বহু আলোচিত বিষয়ে আলোকপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বাস, যৌক্তিকতা ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক, সংশয়বাদীদের সংশয় আমরা আদৌ জানতে পারি কি না, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা জানি বলে দাবী করি তার সবগুলিকে আমরা জানতে পারি কি না ইত্যাদি।

১.১ : প্রস্তাবনা (Preamble)

বর্তমানকালে দার্শনিকগণ সাধারণতঃ একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে কোন দার্শনিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন, এই পদ্ধতিটিকে বলা যায় ভাষা-বিশ্লেষণ পদ্ধতি। একথা প্রাথমিকভাবে বেশ বোঝা যায় যে (দার্শনিক সমস্যা সমাধান করার জন্য) ভাষা-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে একটি ভাষার অন্তর্গত কোন অভিব্যক্তি অথবা অভিব্যক্তিসমূহ ঐ ভাষায় কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করা হয়। একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে কোন একটি দার্শনিক সমস্যার সমাধানের জন্য যে সমস্ত অভিব্যক্তি অথবা অভিব্যক্তিসমূহের ব্যবহার পর্যালোচনা করা হয় সেগুলি ঐ দার্শনিক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, **কার্যকারণ নিয়ম** অথবা **মন** বিষয়ক দার্শনিক আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা পর্যালোচনা করেন যে এই শব্দগুলি অথবা এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শব্দগুলি আমাদের ভাষায় কিভাবে ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলির আমাদের ভাষায় ব্যবহার সংক্রান্ত এই দার্শনিক পর্যালোচনা অথবা দার্শনিকদের শব্দার্থ বিশ্লেষণ করা অবশ্য কেবলমাত্র শব্দগুলির অভিধানগত অর্থ জানা অথবা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ জানা নয়। উদাহরণস্বরূপ, 'কার্যকারণ নিয়ম' অথবা 'মন' এবং এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শব্দগুলির অভিধানগত অর্থ এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ জানা সত্ত্বেও একজন দার্শনিক খোঁজ করতে পারেন এবং পরীক্ষা করতে পারেন ঠিক কোন কোন ক্ষেত্রে 'কার্যকারণ নিয়ম' (অথবা 'মন' বা মানসিক প্রক্রিয়া) সংক্রান্ত শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, অথবা এই শব্দগুলির বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের বা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কোন মিল অথবা কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আছে কি না, যদি থাকে তাহলে তা কি, ইত্যাদি। অর্থাৎ ভাষা বিশ্লেষণ বা শব্দার্থ বিশ্লেষণ বলতে দার্শনিকগণ যা বোঝেন তা হল সংশ্লিষ্ট শব্দগুলির গভীর এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ। জ্ঞানের প্রকৃতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে দার্শনিকগণ খোঁজ করেন যে

'জানা' ক্রিয়াপদটির প্রচলিত ভাষায় কতরকম প্রয়োগ আছে, এই বিভিন্নপ্রকার প্রয়োগের মধ্যে কোন মিল বা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে কি না, জানা বলতে কোন বিশেষ ধরনের মানসিক পর্যায়ের কথা বলা হয় কি না ইত্যাদি। দার্শনিক এয়ার (A. J. Ayer) কে অনুসরণ করে জ্ঞানের প্রকৃতি সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা প্রথমে আলোচনা করব।

১.২ : 'জানা' ক্রিয়াপদটির বিভিন্নপ্রকার ব্যবহার (Different Uses of the Verb 'To Know')

প্রচলিত ভাষায় 'জানা' ক্রিয়াপদটি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। নিম্নলিখিতগুলি 'জানা' ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের কতিপয় উদাহরণ :

ক) আমি রামকে জানি।
খ) আমি গোলাপবাগের রাস্তা জানি
গ) আমি এই গানের সুরটি জানি
ঘ) আমি গীটার বাজাতে জানি।
ঙ) আমি জানি যে আগামীকাল বৃষ্টি হবে।
চ) আমি জানি যে দুই আর দুই যোগ করে চার হয়।

'জানা' ক্রিয়াপদটির ব্যবহারের এই বিভিন্নপ্রকার দৃষ্টান্তসমূহকে দার্শনিকগণ মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এই শ্রেণীগুলি নিম্নরূপ :

১.২.১ : পরিচিত অর্থে জানা (Knowing in the Sense of Being Acquainted With)

'আমি আমার বন্ধুকে জানি' বা 'আমি রামকে জানি' বাক্যগুলিতে 'জানা' ক্রিয়াপদটি পরিচিতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আমি রামকে জানি' বাক্যটি ব্যবহার করে আমি বোঝাতে চাই যে রামের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বা রাম আমার পরিচিত।

১.২.২ : দক্ষতা অর্থে জানা (Knowing in the Sense of Knowing How)

'জানা' ক্রিয়াপদটি প্রায়ই দক্ষতা বা পারদর্শিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 'আমি সাইকেল চালাতে জানি', 'আমি সাঁতার জানি' বাক্যগুলিতে 'জানা' ক্রিয়াপদটি দক্ষতা বা পারদর্শিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন দার্শনিক দক্ষতা অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে তাঁরা ক্রিয়াপদটিকে দক্ষতাসূচক বা পারদর্শিতাসূচক ক্রিয়াপদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, দার্শনিক Gilbert Ryle এই ক্রিয়াপদটিকে 'capacity verb' বা দক্ষতাসূচক ক্রিয়াপদ বলেছেন। তাঁর মতে এমনকি 'জানা' ক্রিয়াপদটির যে সমস্ত ব্যবহারকে আমরা পরিচিত অর্থে জানা অথবা ব্যাপারজ্ঞান বা তথ্যসংক্রান্ত জ্ঞান অর্থে জানার দৃষ্টান্ত বলে মনে করি সেই ব্যবহারগুলিকেও দক্ষতা অর্থে

জানার দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন 'আমি রামকে জানি' অথবা 'আমি ইতিহাসের কোন তথ্য জানি' বাক্যগুলি ব্যবহার করে আমি বোঝাতে চাই যে আমার এক ধরনের দক্ষতা আছে বা আমি এক ধরনের কাজ করতে পারি। 'আমি রামকে জানি' বলে আমি বোঝাতে চাই যে রামকে দেখলে আমি চিনতে পারব অথবা তার সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা দিতে পারব। 'আমি ইতিহাসের কোন তথ্য জানি' বলে আমি বোঝাতে চাই যে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে আমি ইতিহাসের ঐ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারব।

১.২.৩ : বাচনিক অর্থে জানা (Knowing in the Sense of Knowing That)

বাচনিক অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হল 'আমি জানি যে আকাশ হয় নীল', 'আমি জানি যে গাছের পাতা হয় সবুজ' ইত্যাদি। বাচনিক অর্থে জানা বোঝাতে 'জানি যে' (know that) অথবা 'জানে যে' (knows that) ধরনের অভিব্যক্তিগুলি ব্যবহৃত হয় এবং এই অভিব্যক্তিগুলির পরে একটি বচন ব্যবহৃত হয়। বাচনিক অর্থে জ্ঞান হল একটি ব্যাপার বা ঘটনা সংক্রান্ত জ্ঞান (knowing that something is the case)। বস্তুতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ দেখব যে 'জানা' ক্রিয়াপদটির বাচনিক অর্থে ব্যবহারটিই দার্শনিকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ : জ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য (Common Features of Knowledge)

একটি (সাধারণ) নাম যখন বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা বস্তুগুলিকে ঐ নাম বা অভিব্যক্তিটির দৃষ্টান্ত বলা হয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ঐ বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা বস্তুগুলি, যাদের সম্বন্ধে একই অভিব্যক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাদের সকলের মধ্যে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি আছে যার জন্য তাদের সম্বন্ধে একই অভিব্যক্তি (বা সাধারণ নাম) ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন মনে করা হয় যে, যে সমস্ত ব্যক্তিদের আমরা 'কবি' বলি তাদের সকলের মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common feature) বা একটি নির্দিষ্ট গুণ উপস্থিত থাকার জন্য আমরা তাদের সকলকেই কবি বলি। দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ একই নাম দ্বারা অভিহিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে এইরূপ কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির কথা বলেন। আবার কোন কোন দার্শনিক এইরূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা মনে করেন যে একই নাম বা অভিব্যক্তি যে সমস্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে এক ধরনের মিল বা সাদৃশ্য (resemblance) আছে।

A. J. Ayer তার বই *The Problem of Knowledge* এ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন যে 'জানা' ক্রিয়াপদটির প্রয়োগের বিভিন্নপ্রকার দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য (common feature) অথবা সাদৃশ্য (resemblance) আছে কি না।

এই অনুসন্ধানের প্রারম্ভে তিনি উইটগেনষ্টাইন (Wittgenstein) এর একটি অভিমত পরীক্ষা করেছেন। উইটগেনষ্টাইন এর মতে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত নেই, তাদের মধ্যে কেবল এক ধরনের সাদৃশ্য আছে। তিনি মনে করেন যে একই নাম দ্বারা

অভিহিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে না, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকে। এই সাদৃশ্য সরাসরি সাদৃশ্য (straightforward resemblance) অথবা অপেক্ষাকৃত কম সরাসরি সাদৃশ্য (less straightforward resemblance) হতে পারে। যেমন দুটি নীল ফিতের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা হল সরাসরি সাদৃশ্য; আবার একটি নীল ফিতে এবং একটি নীল রঙের খাতার মধ্যে যে সাদৃশ্য তা অপেক্ষাকৃত কম সরাসরি সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য অনেকসময় এত কম হতে পারে যে একই নাম দ্বারা অভিহিত দৃষ্টান্তসমূহ একই দিক (aspect) থেকে পরস্পর সদৃশ একথা বলা যায় না। উইটগেনষ্টাইন এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন খেলার দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন। এমন কোন বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বলতে পারি না যা সব খেলার মধ্যে উপস্থিত। কোন কোন খেলায় হার জিত থাকে, কোন কোন খেলায় নিয়ম থাকে, কোন কোন খেলা মজার জন্য খেলা হয়; কোন খেলায় শারীরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কোন কোন খেলা বুদ্ধির খেলা; আবার কোন কোন খেলার ফলাফল ভাগ্যের (luck) উপর নির্ভর করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কোনটিই সব খেলাতে উপস্থিত থাকে না। উইটগেনষ্টাইন এর মতে এই বিভিন্নপ্রকার 'খেলা'র দৃষ্টান্তের মধ্যেও একধরনের সাদৃশ্য আছে। তিনি এই ধরনের সাদৃশ্যকে 'পারিবারিক' সাদৃশ্য (family resemblance) বলেছেন। একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কোন একদিক থেকে বা এক বিষয়ে সকলের মিল (সাদৃশ্য) না থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেমন কারও কারও মধ্যে চোখের রঙ এর মিল (সাদৃশ্য), কারও কারও মধ্যে মুখের গড়ন এর মিল, আবার কারও কারও মধ্যে উচ্চতার মিল থাকতে পারে। উইটগেনষ্টাইন এই পারিবারিক সাদৃশ্যকে বলেছেন 'Complicated network of similarities'। তার মতে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টান্তের মধ্যেও এই ধরনের 'পারিবারিক সাদৃশ্য' আছে।

অধ্যাপক A. J. Ayer মনে করেন যে একই নাম দ্বারা অভিহিত বিভিন্ন দৃষ্টান্তসমূহের মধ্যে কোন সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে বলা অথবা তাদের মধ্যে একধরনের সাদৃশ্য আছে বলা আসলে একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করা। যদি দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অন্তত কিছু সাদৃশ্য থাকে যাতে আমরা একই নাম তাদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে তাদের মধ্যে কিছু সাধারণ উপকরণ আছে। এই উপকরণটি অবশ্য ঐ নামটি ব্যাতীত অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করে নির্দেশ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টান্তে আবশ্যিকভাবে উপস্থিত এমন কোন সাধারণ উপকরণের সন্ধান কি পাওয়া সম্ভব?

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে জানার সঙ্গে সত্যতার একটি আবশ্যিক সম্পর্ক আছে। বিশেষতঃ 'জানা' ক্রিয়াপদটি যখন বাচনিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন 'আমি জানি' বা 'সে জানে' এই দাবিগুলি যথাযথ হওয়ার একটি আবশ্যিক শর্ত হল, যে বচনটি জানি (অথবা কেউ জানে) বলে দাবি করা হচ্ছে সেই বচনটির সত্যতা। কিন্তু বাচনিক অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বচনটির সত্যতা একটি আবশ্যিক শর্ত হলেও প্রশ্ন হতে পারে যে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের অন্যান্য প্রকার দৃষ্টান্তগুলির ক্ষেত্রে

তা কিভাবে সম্ভব? কারণ সত্য (অথবা মিথ্যা) হতে পারে একটি বচন অথবা অবধারণ। কিন্তু বাচনিক অর্থে যখন 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করা হয় তখন আবশ্যিকভাবে একটি বচনের উপস্থিতি থাকলেও 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের অন্যান্য দৃষ্টান্ত সমূহের ক্ষেত্রে যেমন, পরিচিতি অর্থে বা দক্ষতা অর্থে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বচনের উপস্থিতি থাকে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না।

দার্শনিকগণ মনে করেন যে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের সমস্ত প্রকার দৃষ্টান্তকেই বাচনিক অর্থে জানার দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব। যেমন, যখন আমি পরিচিতি অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করে বলছি 'আমি রামকে জানি', তখন আমি রাম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিতে সক্ষম, যেহেতু সে আমার পরিচিত। যদি আমি তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবরণ দিতে নাও পারি, তাহলেও আমি অন্ততপক্ষে এটুকু বলতে পারি 'এই ব্যক্তি হয় রাম' (This is Ram)। এইভাবে বুঝলে সমস্তপ্রকার পরিচিতি অর্থে জ্ঞানই বিবৃতিমূলক বা বাচনিক অর্থে জ্ঞান এবং এই বিবৃতিগুলি ব্যাপার (fact) সংক্রান্ত বিবৃতি বলে মনে হয়।

কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে — একটি শিশুর তার মাকে জানা বা একটি কুকুরের তার প্রভুকে জানার (পরিচিত অর্থে) দৃষ্টান্তগুলিকে কি এইভাবে বিবরণমূলক বা ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান অথবা বাচনিক জ্ঞান (knowing a fact) হিসাবে উপস্থিত করা সম্ভব? একটি শিশু যে তার মাকে জানে অথবা একটি কুকুর যে তার প্রভুকে জানে তার নিদর্শন পাওয়া যায় তাদের আচরণে। কিন্তু একটি শিশু বা কুকুর সচেতনভাবে একটি বচন বা অবধারণ গঠন করতে সক্ষম একথা বলা যায় না। তাহলে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের এই ধরনের দৃষ্টান্তগুলিকে কিভাবে ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান (knowing a fact) বলা যেতে পারে?

কোন কোন দার্শনিক অবশ্য ব্যাপারজ্ঞান বলতে কোন একটি বচন বা অবধারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া বোঝেন না। তারা ব্যাপারজ্ঞান বলতে বোঝেন একরকমভাবে আচরণ করা বা আচরণ করার প্রবণতা থাকা। অধ্যাপক Ayer দেখিয়েছেন যে আমরা যদি ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান হওয়া বলতে বুঝি বিশেষ একরকম ভাবে আচরণ করা অথবা আচরণ করার প্রবণতা থাকা (disposition to behave in certain ways) তাহলে একটি শিশুর তার মাকে জানা অথবা একটি কুকুরের তার প্রভুকে জানার মত দৃষ্টান্তগুলিকে ব্যাপার জ্ঞানের দৃষ্টান্ত হিসাবে উপস্থাপিত করা যায়। কারণ শিশু তার মাকে জানে একথা বোঝা যায় যখন দেখি যে শিশুটি তার মাকে দেখলে বিশেষ একরকম আচরণ করে (হাত, পা ছোঁড়ে, বা কাছে আসার চেষ্টা করে), যদিও সে সচেতনভাবে একথা চিন্তা করতে সক্ষম নয় যে 'এই হয় আমার মা'। একটি কুকুরের তার প্রভুকে জানার দৃষ্টান্তটিও অনুরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

দক্ষতা (knowing how) অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলিও সবসময় বিবরণমূলক হয় না। কেউ কোন বিষয়ে পারদর্শী বলতে একথা বোঝায় না যে সে কিভাবে কাজটি সম্পন্ন করছে তার বর্ণনা দিতে অবশ্যই সক্ষম হবে। এমনকি দক্ষতা যদি বৌদ্ধিক দক্ষতা হয় তাহলেও ঐরূপ দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কার্যপদ্ধতির বিবরণ দিতে সক্ষম নাও হতে পারে। তবে আমরা যদি একথা মেনে নিই যে ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান (knowing a fact) বলতে বোঝায় বিশেষ একধরনের আচরণ করার প্রবণতা (disposition to behave in certain ways) তাহলে দক্ষতা অর্থে জানার দৃষ্টান্তগুলিকেও ব্যাপার জ্ঞান (knowing a fact) হিসাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। কারণ দক্ষতা অর্থে জানা বলতে একধরনের আচরণ করার পারদর্শিতা থাকা বা প্রবণতা থাকা বোঝায়।

সুতরাং ব্যাপার জ্ঞান (knowing a fact) অথবা কোন বচনকে সত্য বলে জানা (knowing something to be true)-র বিষয়টিকে এইরূপ ব্যাপক অর্থে বুঝলে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলিকে ব্যাপারজ্ঞান হিসাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব।

১.৪ : জ্ঞান এবং জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় (Knowledge and Cognitive Mental State)

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল — 'জানা কি একধরনের বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া অথবা বিশেষ মানসিক পর্যায়?' লক্ষণীয় যে এখানে এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমরা 'জানা' ক্রিয়াপদটি বাচনিক অর্থে ব্যবহার করব। আমাদের আলোচ্য প্রশ্নটির উত্তরে দার্শনিকদের মধ্যে মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে জানা একধরনের বিশেষ মানসিক পর্যায় এবং তাঁদের মতে এই পর্যায়গুলি ভ্রান্তির সম্ভাবনা মুক্ত (infallible)। এই পর্যায়গুলি ভ্রান্তির সম্ভাবনা মুক্ত এই অর্থে যে এগুলি যে বিষয় সম্বন্ধীয় সেগুলি অবশ্যই সত্য এবং কখনই মিথ্যা হতে পারে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এইরূপ বিশেষ মানসিক পর্যায় এর অধিকারী, অথচ এই মানসিক পর্যায়ের মাধ্যমে তার কাছে যা উপস্থাপিত হচ্ছে তা মিথ্যা এমন কখনও হতে পারে না। এই দিক থেকে জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় থেকে পৃথক। কারণ বিশ্বাস সত্য অথবা মিথ্যা উভয় প্রকার হতে পারে। এই মত অনুযায়ী কোন একজন ব্যক্তি যখন বলে যে সে একটি বচন জানে অথচ বচনটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, তখন সে দুটি ভুল করেছে। প্রথমতঃ সে একটি মিথ্যা বচন জানে বলে দাবি করেছে। আমরা কেউ কোন একটি বচন জানি অথচ বচনটি মিথ্যা এমন হতে পারে না। কারণ বচনটির সত্যতা ঐ বচনটির জানার একটি আবশ্যিক শর্ত। দ্বিতীয়তঃ সে যে মানসিক পর্যায়টিকে জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় বলে মনে করেছে সেটি জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় নয়। কারণ ঐ মানসিক পর্যায়টি জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় হলে বচনটি মিথ্যা হতে পারত না। জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত কোন বচন কখনও মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে না। এই মতবাদের সমর্থক দার্শনিকগণের মতে এইরূপ বিশেষ জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় কোন কিছু জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত।

কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে যে—কেউ কোন বিষয় জানে বলতে কি একথা বোঝায় যে সে সবসময় ঐ বিষয় সংক্রান্ত মানসিক পর্যায়ে রয়েছে (অর্থাৎ সে অন্তত ঐ বিষয়ে নিজের মনে চিন্তা করেছে)? Prof. Ayer এই প্রসঙ্গে Gilbert Ryle এর একটি বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন। Ryle তাঁর *The Concept of Mind* বইয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে 'জানা' অভিব্যক্তিটি কোন মানসিক পর্যায়কে নির্দেশ করে না। 'জানা' ক্রিয়াপদটি একটি দক্ষতা সূচক ক্রিয়াপদ (capacity verb)। কোন বিষয় জানা বলতে বোঝায় বিশেষ পরিস্থিতিতে একধরনের বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করা বা প্রদর্শন করার প্রবণতা (disposition) থাকা। যেমন কেউ ইতিহাসের কোন বিষয় জানেন বলতে একথা বোঝায় না যে তিনি সবসময় ঐ বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। তিনি জানেন এই অর্থে যে বিশেষ পরিস্থিতিতে তিনি বিশেষ একধরনের পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম, অর্থাৎ উপযুক্ত পরিস্থিতিতে তিনি ইতিহাসের ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন অথবা তাঁর আলোচনা করার প্রবণতা থাকবে।

তবে অবশ্যই একথা সত্য যে একজন কোন একটি বিষয় জানেন অথচ সেই বিষয় নিয়ে তিনি কখনও চিন্তা করেননি এমন হতে পারে না। এবং বলা যেতেই পারে যে বিষয়টি নিয়ে অন্তত একবার চিন্তা করাটি বাস্তবায়িত হয় একটি মানসিক পর্যায়ের মাধ্যমে। এবং এই মানসিক পর্যায় হল জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়।

তাহলে এইপ্রকার জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়ের প্রকৃত স্বরূপটি কি? সত্যই কি 'জানা' বলতে এইরূপ বিশেষ কোন জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়কে বোঝায়?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান করতে হলে প্রথমে আমাদের কোন কিছু জানার আবশ্যিক শর্তগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ধ্রুপদী মত অনুযায়ী একজন ব্যক্তি S এর P বচনটিকে জানার আবশ্যিক শর্ত হল নিম্নলিখিতগুলি :

১। P হয় সত্য

২। S বিশ্বাস করে যে P (অথবা S নিশ্চিত যে P)

৩। S এর P কে বিশ্বাস করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে।

এই তিনটি আবশ্যিক শর্তের মধ্যে P বচনটি সত্য হওয়ার শর্তটি S এর কোন মানসিক পর্যায়ের উপর নির্ভর করে না। S এর P বচনটিকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটিও মানসিক পর্যায় নির্ভর নয়। বরং S এর P বচনটি বিশ্বাস করার শর্তটিকে কোন কোন দার্শনিক মানসিক পর্যায় সংক্রান্ত শর্ত বলতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় যদি একধরনের বিশেষ (special) মানসিক পর্যায় হয় তাহলে জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় অবশ্যই সাধারণ বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় থেকে ভিন্ন হবে। এই ভিন্নতা নিশ্চয়তার তারতম্য দ্বারা নিরূপিত হতে পারে বলে কেউ ভাবতে পারেন। অর্থাৎ তাঁরা বলতে পারেন যে সাধারণ বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় থেকে আমরা যে ধরনের নিশ্চিতি পাই, জ্ঞানের মানসিক পর্যায় থেকে তার চাইতে ভিন্ন ধরনের, এমন কি আরও উন্নত ধরনের নিশ্চিতি পাই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণ বিশ্বাসের কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত হতেও পারি আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা যথেষ্ট নিশ্চিত নাও হতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, আমি বলতে পারি — 'আমার বিশ্বাস ট্রেনটির ছাড়ার সময় সকাল সাতটা যদিও আমি ও ব্যাপারে তেমন নিশ্চিত নই'। কিন্তু আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাস দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসও হতে পারে এবং এই নিশ্চিতি বোধ এতটাই দৃঢ় হতে পারে যে তার চাইতে অধিকতর দৃঢ় নিশ্চিতির বোধ আর সম্ভব নয়। কিন্তু এইরূপ নিশ্চিতির বোধ থাকা সত্ত্বেও একটি বিশ্বাস জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত না হবার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে। যেমন একটি সম্পূর্ণ দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসও মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে। অথচ কোন কিছু জানার সময় একজন যতখানি দৃঢ় নিশ্চিত হতে পারে তার চাইতে এই নিশ্চিতি কোন অংশে কম নয়। সুতরাং কখনও কখনও এমন হতে পারে যে কেউ তার মিথ্যা বিশ্বাস সম্বন্ধে ততটাই দৃঢ় নিশ্চিত যতখানি সে তার জ্ঞাত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত। সুতরাং এমন কথা বলা যায় না যে জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় থেকে ভিন্ন এক ধরনের এক বিশেষ মানসিক পর্যায় কারণ জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায় আমাদের অধিকতর নিশ্চিতি প্রদান করে।

জানা বলতে এই ধরনের কোন নিশ্চিতির অনুভূতির কথা বা একধরনের বিশেষ মানসিক পর্যায়ের কথা বলা হয় না। এই প্রসঙ্গে আমরা Prof. Austin এর একটি মত এর কথা উল্লেখ করতে পারি। Prof. J. L. Austin তাঁর একটি প্রবন্ধ 'Other Minds' -এ দেখিয়েছেন যে 'আমি জানি' এই উক্তিটি বর্ণনামূলক উক্তি (descriptive utterance) নয় এটি একটি কর্ম সম্পাদনমূলক উক্তি (performative utterance)। একটি বর্ণনামূলক উক্তি ব্যবহার করে কোন কিছু বর্ণনা করা হয়। যেমন 'এখন বৃষ্টি পড়ছে' এই উক্তিটি ব্যবহার করে একজন সেই সময়ের আবহওয়ার বর্ণনা দিতে পারে। অতএব 'এখন বৃষ্টি পড়ছে' এই উক্তিটি একটি বর্ণনামূলক উক্তি। অপরপক্ষে 'প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হোক' এই উক্তিটি ব্যবহার করে কেউ কোন কিছু বর্ণনা করতে পারে না। এইরূপ উক্তি করে কেউ প্রার্থনা করে, অর্থাৎ প্রার্থনা করার কাজটি করতে পারে। সেই কারণে এটি একটি কর্মসম্পাদনমূলক উক্তি। 'আমি জানি যে...' এই ধরণের উক্তি ব্যবহার করে আমি কোন কিছু বর্ণনা করি না, আমার মানসিক পর্যায় সংক্রান্ত কোন বিবরণই দিই না বরং ঐ কথাটি বলে আমি কিছু কাজ (কর্মসম্পাদন) করি। যেমন 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে আগামীকাল আমি আসতে দেরী করব না' — এই উক্তিটিতে 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি' এই অংশটির কোন বর্ণনামূলক ব্যবহার নেই, কর্মসম্পাদনমূলক ব্যবহার আছে। ঐ অংশটি ব্যবহার করে আমি একটি কাজ করি, সেই কাজটি হল প্রতিজ্ঞা করার কাজ। অনুরূপভাবে 'আমি জানি যে আগামীকাল ছুটি থাকবে' এই বাক্যটিতেও 'আমি জানি যে' বাক্যাংশটির কোন বর্ণনামূলক ব্যবহার নেই, কর্মসম্পাদনমূলক ব্যবহার আছে। এ বাক্যাংশটি ব্যবহার করে আমি একটি কাজ করি। সেই কাজ হল বাক্যাংশটির পরে যে বচনটি ব্যবহৃত হয়েছে (উপরের উদাহরণটিতে 'আগামীকাল ছুটি থাকবে' এই বচনটি) সেই বচনটির সত্যতা সম্বন্ধে কথা দেওয়ার বা দায়িত্ব নেওয়ার কাজ। যদি বচনটি সত্য না হয় তাহলে আমি যাদের কাছে বলেছি 'আমি জানি যে আগামীকাল ছুটি থাকবে' তারা (দায়িত্ব পালন না করার জন্য) আমার কাছে কৈফিয়ত চাইতে পারে। অপরপক্ষে আমি যখন বলি 'আমি বিশ্বাস করি যে আগামীকাল ছুটি থাকবে' তখন আমি এইরূপ কোন দায়িত্ব নেবার কাজ করছি না। এবং বচনটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হলেও কোন ব্যক্তির আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবার কোন অধিকার থাকবে না।

'আমি জানি...' এই উক্তিটি কর্মসম্পাদনমূলক এবং বর্ণনামূলক নয় — এই আলোচনাটি এখানে প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে এই আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে যখন আমরা বলি 'আমি জানি...' তখন আমরা আমাদের কোন বিশেষ মানসিক পর্যায় সম্বন্ধে কিছু বিবরণ দিই না।

Prof. Ayer অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে বৈজ্ঞানিকগণ এবং দার্শনিকগণ কোন বিশেষ শব্দকে একটি বিশেষ অর্থে (in a technical sense) ব্যবহার করতে পারেন। এবং সেইভাবে কোন দার্শনিক এমন ইচ্ছা করতেই পারেন যে 'জানা' ক্রিয়াপদটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং এই বিশেষ অর্থ অনুযায়ী কোন কিছু জানা বলতে বোঝাবে (ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত) জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়ে থাকা। কিন্তু Ayer মনে করেন যে দার্শনিকগণ যদি এইরূপ বিশেষ (technical) অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন তবে তার ফল খুব সুবিধাজনক হবে না। কারণ ঐ অর্থে আমরা কেউ কোনদিন কোন কিছু জানি একথা বলতে পারব না। এর কারণ হল এই যে এমন কোন মানসিক পর্যায় কারও হতেই পারে না যার থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির (মানসিক পর্যায়টি যে ব্যাপার সম্বন্ধীয়) বাস্তবানুগ হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারি — কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে কোন একজন যতই দৃঢ় নিশ্চিত হোক না কেন তার

থেকে একথা কখনই যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয় না যে বচনটি সত্য। এরকম ভাবার মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই যে কোন একটি বচনের সত্যতা সম্বন্ধে একজন সম্পূর্ণ নিশ্চিত অথচ বচনটি আসলে মিথ্যা। বস্তুতঃ কোন বচনের সত্যতা কখনও কারও মানসিক পর্যায় দ্বারা নির্ধারিত হয় না। যুক্তিবিজ্ঞানের স্বতঃসত্য বচনগুলি নিজে নিজে সত্য (true by themselves), এগুলির সত্যতা কোন ব্যক্তির মানসিক পর্যায়ের উপর নির্ভর করে না। একথা অবশ্য সত্য যে কোন কোন বচনের সত্যতা অন্য কিছু বচনের সত্যতা থেকে যুক্তি বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী নিঃসৃত হয়। এবং বচনগুলি যে যৌক্তিক নিয়ম অনুযায়ী নিঃসৃত হচ্ছে তা বুঝতে পারলে তাহলেই আমরা সেগুলিকে সত্য বলে চিনতে পারি। এই বুঝতে পারা অবশ্যই একপ্রকার জ্ঞানীয় ক্রিয়া (cognitive act)। কিন্তু এই বুঝতে পারার মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কখনই যুক্তিবিজ্ঞানের এই বচনগুলির সত্যতা নির্ধারিত হয় না। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলির সত্যতাও শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা এবং ঐ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতি বিষয়ে নিশ্চিতিবোধ অভিন্ন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। আমার বর্তমানের মাথাব্যাথার অনুভূতি দ্বারা 'আমি এখন মাথাব্যাথা অনুভব করছি' এই বিবৃতিটির সত্যতা নির্ধারিত হয়। যদি আমার সত্যই ঐ অভিজ্ঞতা (মাথাব্যাথা) হয় এবং বিবৃতিটি আমার বোধগম্য হয় তাহলে আমি বিবৃতির সত্যতা অনুধাবন করতে পারি। ঐরূপ অভিজ্ঞতা লাভও তাহলে একধরনের জ্ঞানীয় ক্রিয়া (cognitive act)। কিন্তু এই জ্ঞানীয় ক্রিয়াগুলি কোন নিশ্চিতির বোধ সম্বলিত বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া নয়।

'জানা' ক্রিয়াপদটির সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা যে বচনটি জানি বলে দাবি করি সে বচনটি অবশ্যই সত্য হবে (দাবিটি যদি যথার্থ হয়)। কিন্তু এই বিবৃতিটি দুরকম অর্থে গৃহীত হতে পারে :

১। আমরা যে বচনটি জানি বলে দাবি করছি সেটি অবশ্যই সত্য হবে, এবং

২। যে বচনটি আমরা জানি বলে দাবি করছি তা একটি আবশ্যিক সত্য (necessary truth) হবে।

এই দুটি অর্থের মধ্যে প্রথমটি ঠিক এবং দ্বিতীয়টি ভুল। কারণ দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী আবশ্যিক সত্য বচন ব্যতীত অন্য কোন বচন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সম্ভব নয়। তাই এটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ। 'জানা' ক্রিয়াপদটি প্রচলিত ভাষায় আমরা যে ভাবে ব্যবহার করি তাতে একথা কখনই বলা যায় না যে আবশ্যিক সত্য বচন ব্যতীত অন্য বচন আমরা জানি না।

তাছাড়া আবশ্যিক বা অনিবার্য সত্যগুলি যে সংশয়ের বাইরে, অর্থাৎ এদের বেলায় যে আমাদের ভুল হতে পারে না এমন নয়। বচনগুলি নিজে নিজে সত্য হলেও আমরা এগুলি যখন জানি তখন আমরা ভুল করতে পারি। কাজেই 'জানা' ক্রিয়াপদটি যদি প্রচলিত অর্থে ব্যবহার না করে কেউ বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন, যে অর্থ অনুযায়ী কোন কিছু জানি বলতে বোঝায় যে সেই বিষয়ে আমাদের ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই তাহলে ঐ অর্থ অনুযায়ী আমরা কোন বচনই জানতে পারব না। কারণ এমন কোন বচন নেই যার সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। এমনকি গণিত বা যুক্তিবিদ্যার আবশ্যিক বচনগুলিও নয়। সুতরাং 'জানা' হল ভ্রান্তির সম্ভাবনা মুক্ত কোন বিশেষ মানসিক পর্যায় — এই মতবাদটি একটি ভ্রান্ত মতবাদ।

প্রচলিত ভাষায় 'জানা' ক্রিয়াপদটি বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল বাচনিক অর্থে 'জানা' ক্রিয়াপদটির ব্যবহার। বাচনিক জ্ঞান (Knowing in the sense of knowing that) হল ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞান (knowing a fact)। এই বাচনিক জ্ঞান বা ব্যাপার সংক্রান্ত জ্ঞানই জ্ঞানবিদ্যার

মুখ্য আলোচ্য বিষয়। জ্ঞান এর সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা 'জানা' ক্রিয়াপদটি বাচনিক অর্থেই ব্যবহার করব।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সংজ্ঞা যথাযথ হতে হলে তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন, কতরকম বিভিন্নপ্রকার সংজ্ঞা হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মতামত আছে। সেই সমস্ত মতামতের কথা আলোচনা না করে, আমরা এখানে আলোচনা করব বিভিন্ন দার্শনিকগণ কিভাবে S জ্ঞানে যে P (S knows that P) এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নির্দেশ করেছেন।

১.৫ : বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত (Necessary and Sufficient Conditions of 'Knowing That')

যুক্তিবিজ্ঞানে 'A হল B এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত'— বাক্যটিকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় : A, যদি এবং কেবলমাত্র যদি B (A, if and only if B)। এই বাক্যটিকে প্রতীকের সাহায্যে 'A↔B' এইভাবে প্রতীকায়িত করা হয়। এই বচনটিকে একটি সংযৌগিক বচন হিসাবেও প্রকাশ করা হয়। এই সংযৌগিক বচনটি হল '(A→B) & (B→A)' যা দুটি প্রাকল্পিক বচনকে সংযুক্ত করে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'A→B' প্রকাশ করে যে **যদি** A **হয় তাহলে** B **হবে** (If A then B) অর্থাৎ A হল B এর পর্যাপ্ত শর্ত (Sufficient Condition); A না ঘটলেও B ঘটতে পারে, কিন্তু A ঘটলে B ঘটবেই। অপরপক্ষে 'B→A' প্রকাশ করে যে A **না ঘটলে** B **ঘটবে না**, অর্থাৎ A হল B এর আবশ্যিক শর্ত (Necessary Condition)। সুতরাং 'A↔B' বা '(A→B) & (B→A)' দ্বারা একথা প্রকাশিত হয় যে A হল B এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত।

আমরা এখন S জ্ঞানে যে P এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলি কোন কোন দার্শনিক যেভাবে নির্দেশ করেছেন তা উল্লেখ করব।

Plato তাঁর *Meno* তে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিতভাবে :

S জানে যে P যদি এবং কেবলমাত্র যদি —

(ক) P সত্য হয় (P is true)
এবং (খ) S বিশ্বাস করে যে P (S believes that P)
এবং (গ) S হয় P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত (S is justified in believing that P)।

অধ্যাপক A. J. Ayer তাঁর *The Problem of Knowledge* এ নিম্নলিখিত ভাবে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলির উল্লেখ করেছেন :

S জানে যে P যদি এবং কেবলমাত্র যদি —

(ক) P সত্য হয় (P is true)
এবং (খ) S হয় P সম্বন্ধে নিশ্চিত (S is sure that P)
এবং (গ) S এর P সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অধিকার থাকে (S has the right to be sure that P)।

S এর P কে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলিকে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে Roderick

Chisholm তাঁর *Perciving : A Philosophical Study* গ্রন্থে বিবৃত করেছেন নিম্নলিখিতভাবে :

S জানে যে P, যদি এবং কেবলমাত্র যদি —

(ক) P সত্য হয় (P is true)

এবং (খ) S স্বীকার/গ্রহণ করে যে P (S accepts P)

এবং (গ) S এর P কে স্বীকার/গ্রহণ করার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকে (S has adequate evidence that P)।

১.৬ : শর্তসমূহের বিশ্লেষণ (An Analysis of the Conditions)

বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত এই তিনজন দার্শনিক যেভাবে নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে কিছু কিছু মিল এবং কিছু অমিল লক্ষ্য করা যায়। এই মিল ও অমিলগুলি পরীক্ষার পূর্বে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞাতেই (ক), (খ) এবং (গ) এই **তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি নিরপেক্ষভাবে** S এর P কে জানার **আবশ্যিক শর্ত**। অর্থাৎ ঐ তিনটি শর্তের কোন একটি পূরণ না হলে 'S জানে যে P' একথা বলা যাবে না। অপরপক্ষে প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞাতেই (ক), (খ) ও (গ) এই **তিনটি শর্ত একত্রে** S এর P কে জানার **পর্যাপ্ত শর্ত**। অর্থাৎ ঐ তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি পূরণ হলে তবেই বলা যাবে যে একজন (একটি বচন) জানে। প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞার মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে বলা যায় যে এই তিনটি সংজ্ঞা অনুযায়ী জানা হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস (justified true belief)। এই তিনটি শর্ত এখন আমরা পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

১.৬.১ : সত্যতার শর্ত (The Truth Condition)

প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞাতেই সত্যতার শর্তটিকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। যে বচনটি কোন একজন জানে বলে দাবি করে তার দাবিটি সঠিক (correct) হতে হলে সংশ্লিষ্ট বচনটিকে অবশ্যই সত্য হতে হবে। যেমন, আমি যদি দাবি করি যে আমি জানি আগামী ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন হবে এবং কেউ যদি আমার কাছে এরূপ দাবি করার কারণ জানতে চায় তাহলে আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন আমি ঐ বচনটিকে সত্য বলে মনে করছি। এবং শেষ পর্যন্ত বচনটি যদি সত্য প্রতিপন্ন না হয় তাহলে আমার বচনটি জানার দাবি ভুল (incorrect) প্রমাণিত হবে। কিন্তু আমি যদি বলি যে আমি একটি বচন বিশ্বাস করি এবং বচনটি পরবর্তীকালে ভুল প্রমাণিত হয় তাহলেও 'আমি বিশ্বাস করি' এই দাবিটি ঠিক নয় একথা বলা যাবে না।

কারণ বিশ্বাস সত্যও হতে পারে (true belief) আবার মিথ্যাও হতে পারে (false belief)। কিন্তু 'মিথ্যা জ্ঞান', 'ভ্রান্ত জ্ঞান' এই কথাগুলি স্ববিরোধী। সত্যতার শর্তটি যে বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক শর্ত তা প্রতীকের সাহায্যে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$KSP \rightarrow$ P is true (P হয় সত্য)

[KSP : S জানে যে P]

অবশ্য সত্যতার শর্তটিকে কিভাবে বুঝতে হবে সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কোন

কোন দার্শনিক সত্যতার শর্তটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে কেবলমাত্র সেই বচনগুলিই জানি বলে দাবি করা যায় যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সত্যতার শর্তটিকে এইভাবে বুঝলে আমরা আদৌ কোন বচন জানি বলে দাবি করতে পারি কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। A. J. Ayer প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন যে এমন কোন বচন নেই যেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি বচনগুলি নিজে নিজে আবশ্যিক সত্য হলেও আমরা এগুলিকে বোঝার সময় ভুল করতে পারি। এই দার্শনিকগণ মানুষের ভুল করার সম্ভাবনার (human fallibility) উপর গুরুত্ব দেন। এর অর্থ এই নয় যে আমরা সবসময় ভুল করছি, কিন্তু আমাদের ভুল করার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না।

তাহলে কি আমরা কোন বচন জানি বলে দাবি করতে পারি না? এর উত্তরে বলা যায় যে আমরা কেউ যখন একটি বচন জানি বলে দাবি করি তখন বচনটি সত্য বলে গ্রহণ করি এবং সেই কারণেই বচনটি জানি বলে দাবি করি; (যখন জানি বলে দাবি করি তখন এই দাবি করি না যে, বচনটি সম্বন্ধে ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই) কিন্তু পরবর্তীকালে বচনটি মিথ্যা প্রমাণিত হলে জানার দাবি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য থাকব (one would have to withdraw his claim to knowledge)।

আবার কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে 'জানা' এক ধরনের বিশেষ মানসিক পর্যায়। এই বিশেষ মানসিক পর্যায় বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় থেকে এই দিক থেকে পৃথক যে জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়গুলি আমাদের কাছে যা উপস্থাপিত করে সেগুলি সত্য ব্যতীত মিথ্যা হতে পারে না। অপরপক্ষে বিশ্বাসের মানসিক পর্যায়গুলির মাধ্যমে আমরা যা পাই সেগুলি সত্য অথবা মিথ্যা উভয়ই হতে পারে। জ্ঞাত বচনগুলির সত্যতা তাদের মতে, এই জ্ঞানীয় মানসিক পর্যায়গুলি দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। Ayer *তাঁর The Problem of Knowledge* -এ দেখিয়েছেন যে এইরূপ কোন মানসিক পর্যায় থাকতে পারে না যার দ্বারা একটি বচনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ কোন একটি বচনের সত্যতা, সে বচন যুক্তিবিজ্ঞান বা গণিতের, আবশ্যিক বচনগুলিই হোক, অথবা অভিজ্ঞতালব্ধ বচনই হোক — কখনও কারও মানসিক পর্যায় দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে না। তাছাড়া কোন একটি বচন সম্বন্ধে কারও মানসিক পর্যায় যদি এমনও হয় যে সে ঐ বচনটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় নিশ্চিত, তা সত্ত্বেও বচনটি মিথ্যা হতে পারে। সুতরাং কেউ কোন একটি বচন জানে বললে একথা বোঝায় না যে সে যে বচনটি জানে সেটি কখনও মিথ্যা হতে পারে না, অর্থাৎ ঐ বচনটির সত্যতা কোন মানসিক পর্যায় দ্বারা নির্ধারিত হয়।

'একটি বচনকে জানি বলে দাবি করলে বচনটিকে অবশ্যই সত্য হতে হবে' এটি কেবলমাত্র একটি ভাষার ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য (statement of a lingustic fact)। প্রচলিত ভাষায় 'জানা' ক্রিয়াপদটি যেভাবে ব্যবহৃত হয় তাতে একটি বচনের সত্যতা ঐ বচনটিকে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত।

১.৬.২ : বিশ্বাসের শর্ত (The Belief Condition)

Plato তাঁর *Meno* তে জানার যে তিনটি আবশ্যিক শর্তের কথা বলেছেন তার মধ্যে দ্বিতীয় শর্তটি হল বিশ্বাসের শর্ত। S এর P কে জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হল এই যে S P কে বিশ্বাস করবে। প্রতীকের সাহায্যে এই শর্তটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

Ksp $\rightarrow$ Bsp

[Ksp : S knows that P (S জানে যে P)]

[Bsp : S believes that P (S বিশ্বাস করে P)]

Chisholm জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত যেভাবে নির্দেশ করেছেন তাতে দ্বিতীয় শর্তটিকে S এর P বচনটিকে স্বীকার/গ্রহণ (accept) করার কথা বলা হয়েছে। একটি বচনকে বিশ্বাস করা এবং সেটিকে গ্রহণ করার মধ্য বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকলেও বচনটিকে বিশ্বাস করা এবং বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার (to be sure) মধ্যে পার্থক্য আছে। Ayer নির্দেশিত সংজ্ঞা অনুযায়ী S এর P বচনটি জানার একটি আবশ্যিক শর্ত হল S এর P বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। কেউ কোন একটি বচন সম্বন্ধে নিশ্চিত এর থেকে একথা নিঃসৃত হয় যে সে বচনটিকে বিশ্বাস করে। কিন্তু কেউ কোন একটি বচন বিশ্বাস করে — এর থেকে একথা নিঃসৃত হয় না যে সে ঐ বচনটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। কারণ এমন হতেই পারে যে কেউ কোন একটি বচন বিশ্বাস করে যদিও সে ঐ বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, একথা বলার মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই যে আমার বিশ্বাস ট্রেনটি ছাড়ার সময় সকাল আটটা, যদিও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আমি নিশ্চিত নই। অবশ্য কখনও কখনও বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিশ্চিতির বোধও যুক্ত থাকতে পারে। এমনকি একজন একটি বচনকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে এতটাই নিশ্চিত হতে পারে যার চাইতে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া আর সম্ভব নয়। কিন্তু অন্য কোন কারণবশতঃ এই দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস জ্ঞান হিসাবে পরিগণিত না হতে পারে। অর্থাৎ একটি বচন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিকতর নিশ্চিতির বোধ যা হতে পারে তা যে কেবল সংশ্লিষ্ট বচনটিকে জানার ক্ষেত্রেই সম্ভব তা নয়, বচনটিকে বিশ্বাস করার ক্ষেত্রেও (যা অন্য কোন শর্ত পূরণ না হওয়ার জন্য জ্ঞান বলে বিবেচিত হয় না) সম্ভব। তবে একটি বচনকে জানার আবশ্যিক শর্ত কি কেবল বচনটিকে বিশ্বাস করা অথবা বচনটি সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া, অথবা এর কোনটাই নয়, সে সম্পর্কে দার্শনিকগণ একমত নন।

কোন কোন দার্শনিক বিশ্বাসের শর্তটিকে জানার আবশ্যিক শর্ত হিসাবে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে জানার মানসিক পর্যায় এবং বিশ্বাসের মানসিক পর্যায় দুপ্রকার পৃথক মানসিক পর্যায়। জানার মানসিক পর্যায় ভ্রান্তির সম্ভাবনামুক্ত কিন্তু বিশ্বাসের সঙ্গে ভ্রান্তির সম্ভাবনা জড়িত থাকে। তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ দার্শনিক স্বীকার করেন যে জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন বচন আমরা জানি অথচ বচনটি সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস নেই এমন হতে পারে না।

১.৬.৩ : যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্ত (The Justification Condition)

বাচনিক অর্থে জানার বা 'S জানে যে P' এর আর একটি আবশ্যিক শর্ত হল যে S এর P সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে 'S জানে যে P' এই বচনটি থেকে একথা আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় যে P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে S যুক্তিযুক্ত। প্রতীকের সাহায্যে বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

Ksp → JBsp

[Ksp : S knows that P (S জানে যে P)]

[J Bsp : S is justified in believing that P (S এর P সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত)]

প্রদত্ত তিনটি সংজ্ঞায় যুক্তিযুক্ত হবার শর্তটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। Plato তাঁর *Meno* তে তৃতীয় শর্তটিকে যুক্তিযুক্ত হবার শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। Ayer প্রদত্ত তৃতীয় শর্তটি হল নিশ্চিত হবার অধিকার থাকা এবং Chisholm ঐ শর্তটিকে নির্দেশ করেছেন বিশ্বাসের সপক্ষে যথোপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকার শর্ত হিসাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একটি বিশ্বাসের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকা এবং বিশ্বাসটি যুক্তিযুক্ত হওয়া (অথবা বিশ্বাসটি বিষয়ে নিশ্চিত হবার অধিকার থাকা) একই কথা নয়। এদের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত হলেও দ্বিতীয় প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন দার্শনিক এমন কথা মনে করতেই পারেন যে কোন একটি বিশ্বাসের সপক্ষে আমরা যতই সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করি না কেন আমরা কখনই সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারি না অথবা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবার অধিকার অর্জন করতে পারি না। অপরপক্ষে, কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতের স্বতঃসিদ্ধ (self evident), পূর্বতসিদ্ধ (a priori) বচনগুলি এবং মৌলিক অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলির (basic empirical propositions) সপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) থাকে না কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হতে পারে (অথবা এগুলি সম্বন্ধে একজনের নিশ্চিত হবার অধিকার থাকতে পারে)। অবশ্য সাধারণভাবে মনে করা হয় যে কোন একটি বচনকে বিশ্বাস করার সপক্ষে যথোপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকলে তবেই বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে একজন যুক্তিযুক্ত (অথবা তার বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অধিকার আছে) একথা বলা যায়।

যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস হল জ্ঞান। কিন্তু কেবলমাত্র সত্য বিশ্বাস (যুক্তিযুক্ত না হলে) জ্ঞান হতে পারে না। 'S এর কোন একটি বচন P সম্বন্ধে সত্য বিশ্বাস আছে' — এর থেকে একথা নিঃসৃত হয় না যে 'S জানে যে P'। কেবলমাত্র সত্য বিশ্বাস যে জ্ঞান নয় তা নিম্নলিখিত উদাহরণটির সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। কোন একজন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির অন্যমনস্কভাবে একটি মই এর তলা দিয়ে হেঁটে যাবার পর মনে হল যে তার কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই ব্যাপারে তার বিশ্বাস গভীর অর্থাৎ সে দৃঢ় নিশ্চিত। এরকম অবস্থায় যদি সে সত্যই কিছু দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয় তাহলে তার দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস সত্য হবে। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতেও আমরা একথা বলতে পারি না যে ঐ ব্যক্তি জানত যে সে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে চলেছে। কারণ তার বিশ্বাস সত্য হলেও তা যুক্তি দ্বারা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সমর্থিত ছিল না। প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে, অন্ধসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কেউ যদি কিছু বিশ্বাস করে এবং তার বিশ্বাস যদি ঘটনাচক্রে সত্যও হয়, তাহলেও আমরা সাধারণতঃ তার জ্ঞান হয়েছে বলে স্বীকার করি না। কারণ এক্ষেত্রে সে জ্ঞানলাভের স্বীকৃত পদ্ধতিগুলির কোনটিই অবলম্বন করে নি। সেই কারণে সে নিশ্চিত হবার অধিকার অর্জন করতে পারে নি। তার বিশ্বাস সত্য হলেও যুক্তিযুক্ত নয়। তার বিশ্বাস সত্য এই কারণে যে ঐ বিশ্বাসটি বাস্তব ঘটনার অনুরূপ। কিন্তু একজন ব্যক্তি তার বিশ্বাস সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত একথা বললে ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা হয়, একথা স্বীকার করা হয় যে ঐ ব্যক্তির নিশ্চিত হবার অধিকার আছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কখন আমরা বলতে পারি যে একজন ব্যক্তির বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত, অথবা তার নিশ্চিত হবার অধিকার আছে?

বলা বাহুল্য যে এই প্রশ্নের উত্তর বিষয়ে দার্শনিকগণ একমত নন। সংশয়বাদীগণ যখন বলেন যে আমাদের জ্ঞান সম্ভব নয়, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা 'জানি' বলে থাকি সেই সমস্ত ক্ষেত্রগুলির সবগুলিতেই আমরা জানি এমন নয়, তখন তাঁরা আমাদের নিশ্চিত হবার অধিকার অথবা যুক্তিযুক্ত হবার

শর্তটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জানার জন্য একটি আবশ্যিক শর্ত যে যুক্তিযুক্ত হওয়া অথবা নিশ্চিত হবার অধিকার থাকা, সে বিষয়ে তাদের কোন সংশয় নেই। তাঁদের বক্তব্য হল যে, যে সকল ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ একজনের নিশ্চিত হবার অধিকার আছে (অথবা সে তার বিশ্বাস সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত) বলে থাকি, তার সবগুলিতে ঐ ব্যক্তির নিশ্চিত হবার অধিকার থাকে না।

আর একটি সংশয়বাদী যুক্তি হল এই যে যুক্তিযুক্ত হবার শর্তটি অনবস্থা দোষ (infinite regress) এ দুষ্ট। S এর P বচনটি জানার জন্য P বচনটির সত্য হওয়া আবশ্যিক। ধরা যাক P বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে S এর যুক্তি হল Q বচনটি। তাহলে S এর Q সম্বন্ধেও যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। যদি S এর Q সম্বন্ধে বিশ্বাস R বচনটি দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে S এর R সম্বন্ধেও যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। এইভাবে একটি অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন দার্শনিক অবশ্য এই দোষ খন্ডন করার চেষ্টা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে।

প্রচলিত ভাষায় অবশ্য আমরা জানা ক্রিয়াপদটি যেভাবে ব্যবহার করে থাকি তাতে একথা স্পষ্ট যে জ্ঞান (knowledge) এবং কেবলমাত্র সত্য বিশ্বাস (mere true belief) এর মধ্যে পার্থক্য আছে।

১.৭ : সারসংক্ষেপ (Summary)

'জানা' এই ক্রিয়াপদটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হল ব্যাপার জ্ঞান (knowing a fact) অর্থে। এই অর্থে স্পষ্টতই জানার সঙ্গে সত্যতার একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে। একটি বচন জানি অথচ বচনটি সত্য নয় একথা স্ববিরোধী। কিন্তু এর থেকে একথা নিঃসৃত হয় না যে জানা একটি বিশেষ মানসিক পর্যায়। এমন কোন মানসিক পর্যায় নেই যার থেকে জ্ঞাত বচনটির সত্যতা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং কোন মানসিক পর্যায়ই আমাদের কোন একটি বচন সম্পর্কে কখনই এতটা নিশ্চিতি দিতে পারে না যাতে বচনটি ভুল হবার সম্ভবনা রহিত। বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলিকে প্রচলিত মত অনুযায়ী এইভাবে বিবৃত করা যায় যে জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস।

১.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions)

1. a) What are the senses in which the verb 'to know' is used in the following statements?

   i) I know Harry.

   ii) I know how to play the guitar.

   iii) I know that it will rain tomorrow.

   b) Explain whether these different uses of the verb 'to know' can be represented as instances of 'knowing a fact'.

2. Explain some of the different senses in which the verb 'to know' is used. Discuss whether these different sorts of uses have any common feature.

3. Can knowing be represented as a matter of being in some special mental state? Answer after Ayer.

4. Is knowing an infallible state of mind? Discuss after Ayer.

5. State, following Ayer, the necessary and sufficient conditions of knowing that something is the case. Explain the conditions briefly.

6. Can one know a proposition to be true without being sure that the proposition is true? Discuss.

7. In what sense does knowing involve 'the right to be sure'?

8. Short notes :

   a) Knowing that

   b) Knowing how

   c) The verb 'to know' as a capacity verb

   d) The sentence 'I know...' as a performative utterance.

   e) Infallible state of mind.

   f) Knowing and believing

   g) The distinction between believing a statement and being sure about it.

   h) The distinction between 'knowing how' and 'knowing that'.

১.৯ : গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. A. J. Ayer, *The Problem of Knowledge*, Penguin Books, 1956
2. D. M. Armstrong, *Belief, Truth and Knowledge*, Cambridge University Press, London, 1973
3. K. Lehrer, *Theory of Knowledge*, Routledge, London, 1990

দ্বিতীয় পাঠ (Unit-II)

জ্ঞান ও যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস : গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা ও ঐ সমস্যা বিষয়ে দার্শনিক প্রতিক্রিয়া
(Knowledge and Justified True Belief : The Gettier Problem and Responses to the Gettier Problem)

পাঠ সংকেত

২.০ উদ্দেশ্য (Aim)

২.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

২.২ গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা (The Gettier Problem)

২.২.১ গেটীয়ারের পূর্বস্বীকৃতি সমূহ (Gettier's Presuppositions)

২.২.২ গেটীয়ারের বিরোধী দৃষ্টান্তসমূহ (Gettier's Counter examples)

২.৩ গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা সংক্রান্ত দার্শনিক প্রতিক্রিয়া (Responses to the Gettier Problem)

২.৩.১ গেটীয়ার স্বীকৃত প্রথম সূত্রটির সমালোচনা (Criticism of Gettier's First Presupposition)

২.৩.২ গেটীয়ার স্বীকৃত দ্বিতীয় সূত্রটির সমালোচনা (Criticism of Gettier's Second Presupposition)

২.৩.৩ একটি চতুর্থ শর্ত (A Fourth Condiion)

২.৪ সারসংক্ষেপ (Summary)

২.৫ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Question)

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

২.০ উদ্দেশ্য (Aim)

সঙ্গত কারণেই জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা করার পূর্বে জ্ঞান (বাচনিক অর্থে) এর সংজ্ঞা বিষয়ে আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক। আমরা পূর্বের এককটিতে বাচনিক অর্থে জ্ঞান এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তসমূহ কি হতে পারে—এই বিষয়ে কয়েকটি প্রচলিত মত আলোচনা করেছি। এই মতগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে কিছু

পার্থক্য থাকলেও বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তসমূহকে প্রায়শই এইভাবে প্রকাশ করা হয়ে থাকে যে **জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস**। কিন্তু কোন কোন দার্শনিক এই বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। E. L. Gettier তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করেছেন যে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস মাত্রই জ্ঞান এমন নয়। এই এককটিতে আমরা দেখব যে কিভাবে গেটীয়ার 'জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস' এই অতি প্রচলিত মতটি খণ্ডন করেছেন। গেটীয়ারের মতটিও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দার্শনিক কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। এই সমালোচনাগুলির কয়েকটি আমরা এখানে আলোচনা করব।

২.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

আমরা পূর্বের এককটিতে আলোচনা করেছি যে, B হল A এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত এই বাক্যটিকে যুক্তিবিজ্ঞানের ভাষায় এইভাবে প্রকাশ করা যায় যে

(ক) A যদি এবং কেবলমাত্র যদি B

অথবা (খ) A যদি B এবং A কেবলমাত্র যদি B।

এই বাক্যদুটির মধ্যে (খ) বাক্যটি স্পষ্টতই দুটি বাক্যের সংযোজন (conjunction)। এই বাক্যের প্রথম সংযোগীটি বলে যে B হল A এর পর্যাপ্ত শর্ত এবং দ্বিতীয় বাক্যটি বলে যে B হল A এর আবশ্যিক শর্ত। যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী একটি সংযৌগিক বচন সত্য হয় যখন তার সংযোগীগুলি একত্রে সত্য হয়। কিন্তু যে কোন একটি সংযোগী মিথ্যা হলেই সমগ্র সংযৌগিক বচনটি মিথ্যা হয়। সুতরাং (খ) বচনটি মিথ্যা হবে যদি এর প্রথম সংযোগীটি মিথ্যা হয় এবং সেক্ষেত্রে (ক) বচনটিও মিথ্যা হবে। অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি দেখানো যায় যে B A এর পর্যাপ্ত শর্ত নয় তাহলে প্রমাণিত হবে যে B হল A এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত—একথা মিথ্যা।

'S জানে P' এর আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তগুলি (necessary and sufficient conditions) হল :

(১) P হয় সত্য;

(২) S বিশ্বাস করে যে P; এবং

(৩) S P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত।

এই তিনটি শর্তের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে S এর P বচনটি জানার আবশ্যিক শর্ত। এই আবশ্যিক শর্তগুলি প্রকাশ করা যেতে পারে নিম্নলিখিতভাবে:

(ক) (১) যদি S জানে যে P তাহলে P সত্য;

(২) যদি S জানে যে P তাহলে S বিশ্বাস করে যে P; এবং

(৩) যদি S জানে যে P তাহলে S P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত।

অপরপক্ষে S এর P বচনটি জানার পর্যাপ্ত শর্ত (sufficient condition) হল ঐ তিনটি শর্ত একত্রে। S এর P বচনটি জানার পর্যাপ্ত শর্তটি প্রকাশ করা হয় নিম্নলিখিত ভাবে:

(খ) যদি (১) P সত্য হয় এবং

(২) S বিশ্বাস করে যে P এবং

(৩) S P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হয়,

তাহলে S জানে যে P।

গেটীয়ার দেখিয়েছেন যে উল্লিখিত তিনটি শর্ত বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নয়, কারণ **(ক)** সত্য হলেও **(খ)** সত্য নয়। সুতরাং জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস- এই প্রচলিত মতটি ত্রুটিপূর্ণ।

২.২ গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা (The Gettier Problem)

Edmund L. Gettier ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "Is Justified True Belief Knowledge?" এ দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে জ্ঞান শুধুমাত্র যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস নয়, কারণ উল্লিখিত তিনটি শর্ত S এর P বচনটিকে জানার আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। অর্থাৎ **(ক)** সত্য হলেও **(খ)** মিথ্যা।

২.২.১ গেটীয়ারের পূর্বস্বীকৃতিসমূহ (Gettier's Presuppositions)

গেটীয়ার দেখিয়েছেন যে এমন কিছু দৃষ্টান্ত দেখানো সম্ভব যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই তিনটি শর্তের প্রত্যেকটিই পূরণ হয়েছে কিন্তু S সম্বন্ধে একথা বলা যাবে না যে সে P বচনটি জানে। তিনি তাঁর প্রবন্ধে এরূপ দুটি বিরোধী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিরোধী দৃষ্টান্তগুলি দুটি স্বীকৃত সূত্রের (presupposition) উপর প্রতিষ্ঠিত। গেটীয়ারের প্রথম পূর্ব স্বীকৃতিটি নিম্নরূপ—

(ক) একটি বচন মিথ্যা হলেও একজন সেই বচনটিকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হতে পারে।

বস্তুতঃ যুক্তিযুক্ত হওয়া বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি তাতে কোন একটি বিশ্বাস সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে বিশ্বাসটির সত্য হওয়া অনিবার্যভাবে সম্পর্কিত নয়। উদাহরণস্বরূপ, আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণার ভিত্তিতে **আজ** আমি এই বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হতে পারি যে 'আগামীকাল বৃষ্টি হবে'। যদিও আজ বচনটির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব যাচাই করা সম্ভব নয়। অথবা **আজ** কোনভাবেই বলা যাবে না যে বচনটি সত্য। বচনটি সত্য হবে যদি আগামীকাল সত্যই বৃষ্টি হয়। অন্যথা বচনটি মিথ্যা হবে। কিন্তু যেহেতু আমি জানতে পেরেছি যে আবহাওয়া দপ্তর ঘোষণা করেছে আগামীকাল বৃষ্টি হবে সেহেতু বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমি যুক্তিযুক্ত। সুতরাং একটি বিশ্বাস সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটির সঙ্গে বিশ্বাসটির সত্য হওয়ার শর্তটির মধ্যে কিছু ব্যবধান আছে। অন্যভাবে বলা যায় যে সত্যতার শর্তটি যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটির অন্তর্ভুক্ত নয়। গেটীয়ার তার প্রবন্ধে এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গেটীয়ারের দ্বিতীয় পূর্বস্বীকৃতিটি নিম্নরূপ —

(খ) যদি S একটি বচন P কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হয়, P থেকে Q নিঃসৃত হয় (Q follows from P), **S P বচনটি থেকে Q বচনটি যথাযথভাবে নিঃসৃত করতে পারে এবং ফলস্বরূপ সে Q বচনটি বিশ্বাস করে তাহলে Q বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে S যুক্তিযুক্ত হবে।**

গেটীয়ারের এই দুটি পূর্বস্বীকৃতি সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে এই দুটি পূর্বস্বীকৃতিই একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়ার বা যৌক্তিকতার ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত।

২.২.২ গেটীয়ারের বিরোধী দৃষ্টান্ত সমূহ (Gettier's Counterexamples)

তাঁর পূর্ব স্বীকৃতি দুটির উপর নির্ভর করে গেটীয়ার দুটি বিরোধী দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এই বিরোধী দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করে যে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস হলেই জ্ঞান হবে এমন নয়। গেটীয়ার প্রদত্ত বিরোধী দৃষ্টান্তগুলি নিম্নরূপ :

১) স্মিথ এবং জোনস্ একটি সংস্থার কোন একটি পদে চাকরির জন্যে আবেদন করেছেন। ঐ সংস্থার একজন কর্তাব্যক্তি স্মিথকে নিশ্চিত করেছেন যে জোনস-ই চাকরিটি পাবে। এছাড়া স্মিথ কিছুক্ষণ আগে জোনস্ এর পকেটের মুদ্রাগুলি গুণে দেখেছে যে জোনস্ এর পকেটে দশটি মুদ্রা আছে। অতএব স্মিথ-এর এই বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে এবং সেই কারণে সে এই বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত যে—

(অ) জোনস্ চাকরিটি পাবে এবং জোনস্ এর পকেটে দশটি মুদ্রা আছে (Jones will get the job and Jones has ten coins in his pocket.)।

ধরা যাক যে এই বচনটি থেকে জোনস্ নিম্নলিখিত বচনটি নিঃসৃত করে ও ফলস্বরূপ বিশ্বাস করে:

(আ) যে ব্যক্তি চাকরিটি পাবে তার পকেটে দশটি মুদ্রা আছে (The man who will get the job has ten coins in his pocket)।

গেটীয়ারের দ্বিতীয় পূর্ব স্বীকৃতিটির ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে স্মিথ **(আ)** বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারেও যুক্তিযুক্ত।

এখন ধরা যাক যে ঘটনাচক্রে জোনস্ এর পরিবর্তে আসলে স্মিথই চাকরিটির জন্য নির্বাচিত হয়েছে যদিও স্মিথ সেকথা জানে না। এবং স্মিথ জানে না যে স্মিথের পকেটেও দশটি মুদ্রা আছে। তাহলে শেষ পর্যন্ত স্মিথ চাকরিটির জন্য নির্বাচিত হওয়ার ফলে ও তার পকেটে দশটি মুদ্রা থাকার জন্য **(আ)** বচনটি **সত্য** হয়েছে, উপরন্তু স্মিথ **(আ)** বচনটি **বিশ্বাস করে** এবং ঐ বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে সে যুক্তিযুক্ত। সুতরাং স্মিথ এর **(আ)** বচনটি জানার জন্য (প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী) যে তিনটি শর্তপূরণ হওয়া প্রয়োজন সেই তিনটি শর্তই পূরণ হয়েছে। কিন্তু স্মিথ **(আ)** বচনটি জানে একথা আমরা বলতে পারি না। এখানে লক্ষণীয় **(আ)** বচনটি যে সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সত্য সেই ঘটনাগুলি স্মিথ এর অজানা এবং যে বচনটির ভিত্তিতে স্মিথ **(আ)** বচনটি সত্য বলে বিশ্বাস করছে এবং বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত সে বচনটি অর্থাৎ **(অ)** বচনটি আসলে মিথ্যা। সুতরাং বলা যায় যে প্রস্তাবনায় যেভাবে S এর P বচনটি জানার পর্যাপ্ত শর্ত নির্দেশ করা হয়েছে (প্রচলিত মত অনুযায়ী) তা মিথ্যা। কারণ **(খ)** তে নির্দেশিত তিনটি শর্তই পূরণ হওয়া সত্ত্বেও S একটি বচন P-কে জানে না এমন হতে পারে।

২) গেটীয়ার এর দ্বিতীয় বিরোধী দৃষ্টান্তটির সাহায্যে একইভাবে দেখানো হয়েছে যে একটি বচন সম্বন্ধে একজনের যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস থাকতে পারে কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় না যে সে ঐ বচনটি জানে। দ্বিতীয় বিরোধী দৃষ্টান্তটি এইরূপ:

স্মিথ এর একটি বন্ধু আছে যার নাম জোনস্। এবং স্মিথ বহুদিন ধরে জোনস্কে একটি ফোর্ড গাড়ী

চালাতে দেখেছে। ইদানীংকালেও জোনস্ একটি ফোর্ড গাড়ী চালাবার সময় স্মিথকে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং স্মিথ এর এই বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে—

(ই) জোনস্ এর একটি ফোর্ড গাড়ী আছে (Jones owns a Ford)।

সুতরাং স্মিথ এই বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত। ধরা যাক যে স্মিথ এর একটি বন্ধুর নাম ব্রাউন, যে বর্তমানে কোথায় আছে তা স্মিথ এর অজানা। স্মিথ নিজের ইচ্ছে মত কয়েকটি জায়গার নাম পছন্দ করে নিম্নলিখিত বচনগুলি তৈরি করে এবং বচনগুলিকে **(ই)** বচনটি থেকে নিঃসৃত করে:

(ঈ) হয় জোনস্ এর একটি ফোর্ড গাড়ী আছে অথবা ব্রাউন এখন বস্টন-এ থাকে (Either Jones owns a Ford or Brown is in Boston)।

(উ) হয় জোনস্ এর একটি ফোর্ড গাড়ী আছে অথবা ব্রাউন বর্তমানে বার্সিলোনায় থাকে (Either Jones owns a Ford or Brown is in Barcelona)।

(ঊ) হয় জোনস্ এর একটি ফোর্ড গাড়ী আছে অথবা ব্রাউন এখন ব্রেষ্ট লিটভস্ক এ থাকে (Either Jones owns a Ford or Brown is in Brest Litovsk)।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে **(ঈ)**, **(উ)** এবং **(ঊ)** বচনগুলি **(ই)** বচনটি থেকে যুক্তিবিজ্ঞানের addition rule অনুযায়ী নিঃসৃত হয়।

স্মিথ **(ই)** বচনটি বিশ্বাস করে ও বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত; **(ই)** বচনটি থেকে (ঈ), **(উ)** ও **(ঊ)** বচনগুলি নিঃসৃত হয় এবং স্মিথ **(ই)** বচনটি থেকে ঐ বচনগুলি নিঃসৃত করে। সুতরাং স্মিথ (ঈ), **(উ)** ও (ঊ) বচনগুলি বিশ্বাস করার ব্যাপারেও যুক্তিযুক্ত।

এখন ধরা যাক যে স্মিথ যদিও জানে না, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্রাউন বর্তমানে বার্সিলোনায় থাকে। আরও ধরা যাক যে জোনস্ এর বর্তমানে কোন ফোর্ড গাড়ী নেই। স্মিথকে ইদানীং তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার সময় জোনস্ একটি ভাড়া করা ফোর্ড গাড়ী চালাচ্ছিল। সুতরাং **(উ)** বচনটির দ্বিতীয় বিকল্পটির সত্য হওয়ায় বচনটি সত্য হয়েছে; স্মিথ **(উ)** বচনটি বিশ্বাস করে; এবং সে **(উ)** বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্মিথ এর **(উ)** বচনটি জানার জন্য পর্যাপ্ত শর্তগুলির সবকটিই পূরণ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি না যে স্মিথ **(উ)** বচনটি জানে। আসলে স্মিথ **(উ)** বচনটির প্রথম বিকল্পটি সত্য বলে মনে করে যেটি আদৌ সত্য নয়। আসলে **(উ)** বচনটির দ্বিতীয় বিকল্পটি সত্য কিন্তু স্মিথ আদৌ জানে না যে ঐ বিকল্পটি সত্য।

এই দুটি বিরোধী দৃষ্টান্তের সাহায্যে গেটীয়ার দেখিয়েছেন যে জানার প্রচলিত সংজ্ঞায় S এর P কে জানার জন্য যে শর্তগুলিকে পর্যাপ্ত শর্ত বলে নির্দেশ করা হয় সেই শর্তগুলি আদৌ জানার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এবং এই কারণে জানার প্রচলিত সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ।

২.৩ : গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যা সংক্রান্ত দার্শনিক প্রতিক্রিয়া (Responses to the Gettier Problem)

জানার প্রচলিত সংজ্ঞাটি যে ত্রুটিপূর্ণ তা দেখাতে গিয়ে গেটীয়ার যে সমস্যাটির কথা বলেছেন সে বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে গেটীয়ার জ্ঞানের প্রচলিত সংজ্ঞাটির ত্রুটি আবিষ্কার করতে গিয়ে যে দুটি পূর্ব স্বীকৃতির (Presupposition) কথা বলেছেন সেই পূর্বস্বীকৃতিগুলি ত্রুটিপূর্ণ। এই গোষ্ঠীর দার্শনিকদের মধ্যে আবার কোন কোন দার্শনিক প্রথম পূর্বস্বীকৃতিটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করেন এবং কোন কোন দার্শনিক দ্বিতীয় পূর্ব স্বীকৃতিটি ত্রুটিপূর্ণ বলেন। অপরপক্ষে কিছু দার্শনিক গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যাটিকে যথার্থ সমস্যা বলে স্বীকার করেন; তাঁরা বিশ্বাস করেন করেন যে সত্যতা, বিশ্বাস এবং যুক্তিযুক্ততার শর্তগুলি জানার আবশ্যিক শর্ত হলেও পর্যাপ্ত শর্ত নয়। কিভাবে জানার পর্যাপ্ত শর্ত নির্দেশ করা সম্ভব তা স্থির করতে গিয়ে এঁরা জানার প্রদত্ত তিনটি পযার্প্ত শর্তের অতিরিক্ত আরো কিছু শর্তের কথা বলেন।

২.৩.১ : গেটীয়ারের প্রথম পূর্বস্বীকৃতিটির সমালোচনা (Criticism of the first presupposition of Gettier)

রবার্ট আলমেডার (Robert Almeder) গেটীয়ারের প্রথম পূর্বস্বীকৃতিটিকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত প্রবন্ধ 'Truth And Evidence' এ এই মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন মিথ্যা বচন সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস কখনও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। গেটীয়ার এর প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে একটি বিশ্বাসের সত্যতার শর্তটি ও বিশ্বাসটির যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটি পরস্পর নিরপেক্ষ। যেমন, গেটীয়ার প্রদত্ত প্রথম বিরোধী দৃষ্টান্তটিতে স্মিথ এই বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত যে ''জোনস্ হয় সেই ব্যক্তি যে চাকরিটি পাবে এবং জোনস্ এর পকেটে দশটি মুদ্রা আছে'', যদিও বচনটি মিথ্যা, কারণ এর প্রথম সংযোগীটি মিথ্যা। কিন্তু Almeder মনে করেন একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটির মধ্যে সত্যতার শর্তটি নিহিত আছে এবং সেই কারণে একটি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস অবশ্যই সত্য হবে।

Almeder এর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন William Hoffmann তিনি মনে করেন যে একটি বিশ্বাসের সত্য হওয়ার শর্তটি ও বিশ্বাসটির যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটির মধ্যে কিছু দূরত্ব বা ফাঁক আছে। Hoffmann তাঁর প্রবন্ধ 'Almeder on Truth and Evidence' এ দুটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি পরিস্ফুট করেছেন। প্রথম দৃষ্টান্তটিতে তিনি কল্পনা করেছেন যে একজন ব্যক্তি হোটেলের বারান্দায় বসে অকারণেই মেঝের একটি নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চিন্তা করেছেন ঐ স্থানটি তার ভার সহ্য করতে পারবে কিনা। ঐ স্থান দিয়ে যারা যাতায়াত করছে তাদের তিনি লক্ষ্য করছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঐ ব্যক্তির চাইতে বেশি ওজন সম্পন্ন। আবার কেউ কেউ তার চাইতে কম ওজনসম্পন্ন। এইভাবে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করার পর এই বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে তিনি যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ পেলেন যে— 'মেঝের ঐ স্থানটি তার ভার

সহ্য করতে পারবে' — সুতরাং বলা যায় যে তিনি ঐ বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত। শেষ পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ঐ স্থান দিয়ে হেঁটে গেলেন ও স্থানটি অটুট রইল।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির কল্পনীয় অন্যান্য সব ঘটনাগুলিই প্রথমটির মত কেবল দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে ঐ ব্যক্তি (স্মিথ) ঐ স্থান দিয়ে হেঁটে যাওয়ার স্থানটি ভেঙে পড়ল। এই দৃষ্টান্ত দুটিতেই ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস যে 'মেঝের ঐ স্থানটি তার ভার সহ্য করতে পারবে' যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তটিতে তার বিশ্বাসটি সত্য হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে তার যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। এই দৃষ্টান্তদুটির সাহায্যে Hoffmann দেখিয়েছেন একইরকম যুক্তিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও একটি বিশ্বাস যেমন সত্য হতে পারে — তেমনি মিথ্যাও হতে পারে। অর্থাৎ যুক্তিযুক্ততার শর্তটির মধ্যে সত্যতার শর্তটি নিহিত আছে এমন নয়।

২.৩.২ : গেটীয়ারের দ্বিতীয় পূর্বস্বীকৃতিটির সমালোচনা (Criticism of the Second Pre-supposition of Gettier)

গেটীয়ারের দ্বিতীয় পূর্ব স্বীকৃতিটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না যে সমস্ত দার্শনিক তাঁদের মধ্যে Fred Dretske এবং Irving Thalberg এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

Dretske মনে করেন যে যুক্তিযুক্ত হবার শর্তটি একটি বচন থেকে নিঃসৃত অন্য বচনগুলিতে পরিবাহিত হবার যোগ্য নয়। অর্থাৎ কোন একটি বচনকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে একজন ব্যক্তি যুক্তিযুক্ত হলেও ঐ বচনটি থেকে নিঃসৃত অন্য একটি বচনকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে সে যুক্তিযুক্ত না হতেও পারে। Dretske তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে যে উদাহরণগুলি দিয়েছেন সেগুলি বিভিন্ন কারণে ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু Dretske-র বক্তব্যের, সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ দিকটি হল এই যে জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস এই প্রচলিত মতটির গেটীয়ার প্রদত্ত বিরোধী দৃষ্টান্তগুলি ছাড়াও আরও অনেক বিরোধী দৃষ্টান্ত গঠন করা সম্ভব যেগুলিতে যুক্তিযুক্ত হবার শর্তটি বচন থেকে বচনান্তরে পরিবাহিত হবার অপেক্ষা রাখে না, অর্থাৎ সেগুলিতে গেটীয়ারেব দ্বিতীয় স্বীকৃতিটির আদৌ কোন প্রয়োগ নেই।

Chisholm তাঁর *Theory of Knowledge* -এ এইরূপ একটি উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণটি হল এই যে একজন ব্যক্তি দূর থেকে সামনের মাঠে একটি ভেড়া দেখে বিশ্বাস করছেন যে 'সামনের মাঠে একটি ভেড়া আছে'। এই বিশ্বাসটি সম্বন্ধে তিনি যুক্তিযুক্ত। এখন ধরা যাক যে তিনি যেটিকে ভেড়া বলে মনে করছেন সেটি আদৌ ভেড়া নয়, সেটি আসলে একটি কুকুর এবং আরও ধরা যাক যে ঐ কুকুরটির কাছেই, ঝোপের আড়ালে একটি ভেড়াও আছে। তাহলে ঐ ব্যক্তির বিশ্বাস, যে 'সামনের মাঠে একটি ভেড়া আছে' এটি যুক্তিযুক্ত, সত্য বিশ্বাস, যদিও আমরা একথা বলতে পারি না যে ঐ ব্যক্তি জানেন যে সামনের মাঠে একটি ভেড়া আছে। এই দৃষ্টান্তটি জানার প্রচলিত সংজ্ঞার বিরোধী দৃষ্টান্ত হলেও এই দৃষ্টান্তটিতে গেটীয়ার স্বীকৃত দ্বিতীয় সূত্রটির কোন প্রয়োগ নেই।

Thalberg মনে করেন যে গেটীয়ার প্রদত্ত বিরোধী দৃষ্টান্তগুলিতে দ্বিতীয় সূত্রটির প্রয়োগ যথাযথ নয়। তাঁর মতে গেটীয়ার এর প্রথম বিরোধী দৃষ্টান্তটিতে দ্বিতীয় সূত্রটি দুবার প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম প্রয়োগটি নিম্নরূপ:

(১) জোনস্ চাকরিটি পাবে
এবং (২) জোনস্ এর পকেটে দশটি মুদ্রা আছে
এই দুটি বচন সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস থেকে একটি ভিন্ন বচন—
(৩) জোনস্ চাকরিটি পাবে এবং জোনস্ এর পকেটে দশটি মুদ্রা আছে

সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবার বিষয়টি নিঃসৃত করা হয়েছে। কিন্তু Thalberg উল্লেখ করেছেন যে সম্ভাব্যতার নিয়ম অনুযায়ী একটি সংযৌগিক বচনের সম্ভাবনা (এখানে (৩) এর সত্য হবার সম্ভাবনা) সংযুক্ত বচনগুলির একক ভাবে সত্য হবার সম্ভাবনা অপেক্ষা কম। ('P' ও 'Q' উভয়েরই সত্য হবার সম্ভাবনা $^{১}/_{২}$। কিন্তু 'P.Q' এর সত্য হবার সম্ভাবনা $^{১}/_{৪}$)। অবশ্য গেটীয়ার এর বিরুদ্ধে Thalberg এর প্রধান এবং দ্বিতীয় সমালোচনাটি হল এই যে (৩) থেকে গেটীয়ার যে বচনটি নিঃসৃত করেছেন, (দ্বিতীয় সূত্রটি দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করে) অর্থাৎ (৪) 'যে ব্যক্তি চাকরিটি পাবে তার পকেটে দশটি মুদ্রা আছে', এই বচনটি (৩) থেকে বৈধভাবে নিঃসৃত হয় না। তিনি মনে করেন যে (৩) একটি বিশিষ্ট (Singular) বচন কিন্তু (৪) একটি সামান্য (universal) বচন। এবং একটি বিশিষ্ট বচন বা একটি ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধীয় বচন থেকে একটি সামান্য বচন বা শ্রেণীসম্বন্ধীয় বচন নিঃসৃত হতে পারে না।

Thalberg এর প্রথম সমালোচনার উত্তরে এ কথা বলা যায় যে গেটীয়ার (১) এবং (২) সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত হওয়া থেকে (৩) সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি নিঃসৃত করেননি। তাছাড়া কেবলমাত্র (১) থেকে অথবা কেবলমাত্র (২) থেকে (৩) নিঃসৃত হয় না। সুতরাং কেবলমাত্র (১) সম্বন্ধে অথবা কেবলমাত্র (২) সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি থেকে (৩) সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত হবার বিষয়টি নিঃসৃত হয় না। অতএব Thalberg এর প্রথম সমালোচনাটি গ্রহণযোগ্য নয়।

Thalberg এর দ্বিতীয় সমালোচনাটিও যুক্তিবিজ্ঞান এর নিয়ম অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ (৪) এ ব্যবহৃত অভিব্যক্তিটি 'একমাত্র যে ব্যক্তি চাকরিটি পাবে' (the man who will get the job) হল একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা (definite description)। একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই অর্থে একটি নির্দিষ্ট বর্ণনা সম্বলিত একটি বাক্য একটি সামান্য বচন (universal proposition) বা শ্রেণী সম্বন্ধীয় বচন নয়।

Thalberg দু ধরনের যুক্তিযুক্ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সাক্ষ্যভিত্তিক যুক্তিযুক্ত হওয়া (evidential justification) এবং পদ্ধতিগতভাবে যুক্তিযুক্ত হওয়া (strategic justification)। স্পষ্টতই যুক্তিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি যখন একটি বচন থেকে নিঃসৃত বচনে পরিবাহিত হয় বলে আমরা মনে করি তখন আমরা পদ্ধতিগতভাবে যুক্তিযুক্ত হওয়ার কথা বলি। অপরপক্ষে যুক্তিযুক্ত হওয়ার জন্য যখন আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণের কথা বলি, তখন সাক্ষ্যভিত্তিক যুক্তিযুক্ত হওয়ার কথা বলি। Thalberg মনে করেন যে সাক্ষ্যভিত্তিক যুক্তিযুক্ত হওয়ার ধারণাটি পদ্ধতিগতভাবে যুক্তিযুক্ত হওয়ার ধারণাটির বর্হিভূত। অর্থাৎ প্রথমটি দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু বিশেষতঃ জ্ঞানবিদ্যায় 'justification' বা 'যুক্তিযুক্ত হওয়া'র ধারণাটি যেভাবে বোঝা হয় তাতে 'যুক্তিযুক্ত হওয়া' ও 'সাক্ষ্যপ্রমাণ' (evidence) এর ধারণাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। কাজেই জ্ঞানবিদ্যায় আমরা একটি বিশ্বাসের-যুক্তিযুক্ত হওয়ার কথা যখনই বলি, তা যেভাবেই হোক না কেন, তাতে সাক্ষ্যপ্রমাণ (evidence) এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

২.৩.৩ : একটি চতুর্থ শর্ত (A Fourth Condition)

গেটীয়ার তাঁর প্রবন্ধে কিছু বিরোধী দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী S এর P বচনটি জানার জন্য যে তিনটি পর্যাপ্ত শর্তের কথা বলা হয় সেগুলি আসলে পর্যাপ্ত নয় অর্থাৎ এই তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান হচ্ছে না এমন হতে পারে। কোন কোন দার্শনিক গেটীয়ার উত্থাপিত সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করেছেন ঐ তিনটি শর্তের সঙ্গে আরও একটি শর্ত (একটি চতুর্থ শর্ত) যোগ করে। তাঁর বলতে চেয়েছেন যে এই চারটি শর্ত একত্রে S এর P বচনটি জানার পর্যাপ্ত শর্ত হতে পারে।

বলা বাহুল্য, এই চতুর্থ শর্তটি কি হতে পারে এ বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে চতুর্থ শর্ত হিসাবে বিভিন্ন দার্শনিক যে সব শর্ত নির্দেশ করেছেন সেগুলির প্রত্যেকটিই একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, এই বিষয়টি হল একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে সত্যতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই শর্তটি কখনও কখনও এইভাবে নির্দেশ করা হয়েছে যে S এর P বচনটির প্রতি বিশ্বাস যে সমস্ত বচন দ্বারা সমর্থিত, তার মধ্যে কোন মিথ্যা বচন থাকবে না'। John Pollock তাঁর *Contemporary Theories of Knowledge* নামক বইয়ে এই শর্তটিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করেছেন:

S's grounds for believing P do not include false propositions.

এই মত অনুযায়ী S এর P বচনটি জানার চতুর্থ শর্ত হল এই যে S এর P বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে যে যুক্তিসমূহ বা যে সাক্ষ্যপ্রমাণসমূহ থাকবে, কোন মিথ্যা বচন তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

এই শর্তটিকেই অপেক্ষাকৃত ভিন্নভাবে কোন কোন দার্শনিক উপস্থাপিত করেছেন। তাঁদের মতে একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হতে হলে তা এমনভাবে যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হতে হবে যাতে পরবর্তীকালে অন্য কোন বিশ্বাস (সত্য বিশ্বাস) দ্বারা সেটি নাকচ (বা মিথ্যা প্রমাণিত) না হতে পারে। এই মত অনুযায়ী জ্ঞান হল অপরাভূত বিশ্বাস (indefeasible belief)। বিষয়টি স্পষ্টভাবে এইভাবে বলা যায় যে 'S P বচনটি জানে' এইরূপ দাবি করার অর্থ হল এই দাবি করা যে S এর P বচনটি সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস আছে এবং এই যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস পরবর্তীকালে কোন সত্য বচনের উপস্থিতিতে অথবা অন্য কোন কারণে বাধিত অথবা নাকচ (defeated) হতে পারে না। জ্ঞানের এইরূপ একটি সংজ্ঞার কথা Chisholm বলেছেন। সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ:

...h is known by s = Df. h is accepted by s; h is true; and h is non defeasibly evident for s.

অর্থাৎ ''s h বচনটি জানে'' এর সংজ্ঞা হল এই যে s h বচনটিকে স্বীকার (বিশ্বাস) করে, h একটি সত্য বচন, এবং s এর কাছে h বচনটির গ্রহণযোগ্যতা পরাভূত বা বাধিত হবার সম্ভাবনারহিত।

এই প্রসঙ্গে আমরা Robert Nozick প্রদত্ত একটি জ্ঞানের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি, যেটি প্রচলিত জ্ঞানের সংজ্ঞার একটি পরিমার্জিত রূপ। এই সংজ্ঞাটিতেও যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসের সঙ্গে সত্যতার সম্পর্ক যে ঘনিষ্ট সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। Nozick প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হল :

S knows that P if and only if

(1) P is true
(2) S believes P
(3) If P were not true, S wouldn't believe that P
(4) If P were true, S believes that P.

অর্থাৎ S P বচনটি জানে যদি এবং কেবলমাত্র যদি

(১) P সত্য হয়—
(২) S P বচনটি বিশ্বাস করে—
(৩) P বচনটি সত্য না হলে S P বচনটি বিশ্বাস করে না
(৪) P বচনটি সত্য হলে S P বচনটি বিশ্বাস করে।

যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস এবং সত্যতার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে S এর P বচনটি জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত নির্দেশ করার এইরূপ প্রচেষ্টার একটি ত্রুটির কথা কোন কোন দার্শনিক বলেছেন। এই ত্রুটিটি হল যে অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস ও সত্যতার সম্পর্কটি আকস্মিক (depends on chance)। Almeder এর সমালোচনা করতে গিয়ে Hoffmann যে দৃষ্টান্তটির কথা বলেছেন (আমরা ইতিপূর্বে গেটীয়ার স্বীকৃত প্রথম সূত্রটির সমালোচনা প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করেছি) তাতে এই আকস্মিকতার বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্থাৎ অনেকসময়ই আমরা দেখি যে কোন একটি বিশ্বাসের ব্যাপারে একইরকমভাবে যুক্তিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বাসটি কখনও কখনও সত্য আবার কখনও কখনও (কোন আকস্মিক কারণবশতঃ) মিথ্যা হতে পারে। বিভিন্ন দার্শনিক অবশ্য এই আকস্মিকতার সম্পর্কটিকে কোন শর্ত আরোপ করে অনিবার্য (necessary) সম্পর্কে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করেছেন। (আমরা এখানে এই বিষয়ে আর আলোচনা করব না।)

Keith Lehrer জানার পর্যাপ্ত শর্ত হিসাবে একটি চতুর্থ শর্ত নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন কারণে কয়েকবার পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করার পর শেষ পর্যন্ত তিনি শর্তটি নির্দেশ করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে :

If S is completely justified in believing any false statement p which entails, but is not entailed by h, then S should be completely justified in believing h, even if he were to suppose that p is false.

অর্থাৎ যদি S একটি মিথ্যা বচন p কে বিশ্বাস করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত হয় যেটি থেকে অপর একটি বচন h নিঃসৃত হয়, যদিও h থেকে p নিঃসৃত হয় না, তাহলে S h বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত হবে এমনকি যদি সে একথাও ধরে নেয় যে p বচনটি মিথ্যা।

Lehrer এর এই চতুর্থ শর্তটি বোঝা যেতে পারে এইভাবে যে একটি বচন h কে বিশ্বাস করার জন্য S এর যে সমস্ত যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তার মধ্যে একটি যদি মিথ্যা বচনও থাকে, যে বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে S এর যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে তাহলেও S এর h বচনটি সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস থাকতে পারে। কারণ ঐ মিথ্যা বচনটি ছাড়াও তার h বচনটি বিশ্বাস করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি থাকতে পারে। Lehrer প্রদত্ত এই চতুর্থ শর্তটি আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলেও কোন কোন কোন দার্শনিক এই শর্তটিরও কিছু অসুবিধার উল্লেখ করেছেন।

২.৪ : সারসংক্ষেপ (Summary)

Edmand L. Gettier তাঁর প্রবন্ধ "Is Justified True belief knowledge?" এ বাচনিক অর্থে জানার অতি প্রচলিত সংজ্ঞার যথার্থতা বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে এই মত বহুল প্রচলিত ছিল যে জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস। গেটীয়ার তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান হয়নি এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে গেটীয়ারের এই প্রবন্ধটির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রবন্ধটি জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনায় একটি বৃহৎ পরিবর্তনের সূচনা করে।

২.৫ : নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Question)

1. How does Gettier reject the view that knowledge is justified true belief?
2. What are the two principles that Gettier assumes in arguing that knowledge is not merely justified true belief? Give the counter examples and explain how he shows that knowledge is not merely justified true belief.
3. How would you employ Gettier's argument against Ayer's conception of knowledge?
4. How would you employ Gettier's argument against Chisholm's definition of knowledge?
5. State and explain the two principles assumed by Gettier to show that justified true belief is not knowledge.
6. Explain the views of Almeder and Hoffmann in connection with the first principle accepted by Gettier.
7. Examine the views of Dretske and Thalberg in connection with the second principle accepted by Gettier.
8. What exactly is the problem to which Gettier draws our attention in his paper "Is Justified True Belief Knowledge?" Explain.
9. Discuss briefly the attempt to solve the problem by adding a fourth condition in terms of undefeated justification.

২.৬ : গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. E. L. Gettier, 'Is Justified True Belief Knowledge?' in A. P. Griffiths(ed.), *Knowledge and Belief*, Oxford University Press, London, 1967.
2. Sutapa Saha, *Evidence and Truth : Responses to the Gettier Problem,* Allied Publishers Limited, 1994.
3. John Pollock, *Contemporary Theories of Knowledge*, Hutchinson, London
4. R. Chisholm, *Theory of Knowledge,* Prentice-Hall of India, 1974.

তৃতীয় পাঠ (Unit-III)

সংশয়বাদ ও জ্ঞানের সম্ভাবনা (Scepticism and the Possibility of Knowledge)

পাঠ সংকেত

৩.০ উদ্দেশ্য (Aim)

৩.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

৩.২ বিভিন্ন প্রকার সংশয়বাদ (Different Types of Scepticism)

৩.৩ বিভিন্ন প্রকার সংশয়বাদী যুক্তি (Different Types of Sceptical Arguments)

৩.৩.১ সংরক্ষিত মস্তিষ্ক সংক্রান্ত যুক্তি (Argument Concerning Brains in Vats)

৩.৩.২ ভ্রান্তি সংক্রান্ত যুক্তি (The Argument from Error)

৩.৩.৩ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যুক্তি (Argument from Experience)

৩.৪ দার্শনিক সংশয়বাদ (Philosophical Scepticism)

৩.৫ পূর্বতঃসিদ্ধ বচন (*A Priori* Proposition)

৩.৬ আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি (I Think, therefore I Am)

৩.৭ মৌলিক বাক্য (Basic Statement)

৩.৮ সংশয়বাদী যুক্তিসমূহ (Sceptical Arguments)

৩.৮.১ সংশয়বাদী যুক্তিসমূহের ধরন (The Pattern of Secptical Arguments)

৩.৮.২ সংশয়বাদীদের মোকাবিলা করার বিভিন্ন উপায় (Different Methods of Answering the Sceptics)

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions)

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

৩.০ উদ্দেশ্য (Aim)

সংশয়বাদ জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংশয় পোষন করে। এই মতবাদ অনুযায়ী জ্ঞান আদৌ সম্ভব নয় অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞান সম্ভব বলে আমরা মনে করি তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান সম্ভব নয়। এই এককটিতে আমরা সংশয়বাদ বিষয়ে আলোচনা করব এবং এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার সংশয়বাদী যুক্তি, সংশয়বাদের বিভিন্ন প্রকার ও এই মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু দার্শনিকদের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা ও পরীক্ষা করব।

৩.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

বাচনিক অর্থে জানার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্তসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে একজন ব্যক্তি S এর P বচনটি জানার একটি অন্যতম আবশ্যিক শর্ত হল এই যে P বচনটি বিশ্বাস করার ব্যাপারে S কে যুক্তিযুক্ত হতে হবে অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে S এর P বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অধিকার থাকতে হবে। কিন্তু কখন আমরা বলতে পারি যে একজন ব্যক্তির কোন একটি বচন সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত অথবা তার ঐ বচনটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অধিকার আছে— এই প্রশ্নটির কোন নির্দিষ্ট উত্তর দার্শনিকদের কাছ থেকে আমরা পাই না। কোন কোন দার্শনিক এই ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তাঁদের মতে একটি বচন সম্বন্ধে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হওয়া অথবা নিশ্চিত হবার অধিকার থাকা বলতে বোঝায় এতটাই যুক্তিযুক্ত হওয়া বা নিশ্চিত হবার অধিকার থাকা যাতে ঐ বচনটি ভুল হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। এই অর্থে যুক্তিযুক্ত হলে অথবা নিশ্চিত হবার অধিকার থাকলে যে একজন জানে একথা বলা যাবে— এ বিষয়ে তাঁদের কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য হল এই যে ততখানি যুক্তিযুক্ত বা নিশ্চিত হবার অধিকার আমরা কখনই অর্জন করতে পারিনা। আমরা যতই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখি না কেন, ভুল হবার সম্ভাবনা আমাদের থেকেই যায়। যেহেতু আমরা ভুল হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারি না, সেই কারণে আমরা কখনই সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারি না বা নিশ্চিত হবার অধিকার অর্জন করতে পারি না। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্ত হল যে যথার্থ অর্থে 'জ্ঞান' এর পরিধি অত্যন্ত সীমিত। এই ধরনের মতবাদ যে সমস্ত দার্শনিক পোষণ করেন তাঁরা সংশয়বাদী দার্শনিক হিসাবে পরিচিত। কারণ তাঁরা মনে করেন যে যেহেতু আমরা কখনই সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হবার অধিকার অর্জন করতে পারি না এবং যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্তটি জানার একটি আবশ্যিক শর্ত সেই কারণে 'আমরা জানি' একথা আমরা কখনই বলতে পারি না, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা বলি 'আমরা জানি' তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা জানি না।

৩.২ বিভিন্ন প্রকার সংশয়বাদ (Different Types of Scepticism)

প্রাথমিকভাবে সংশয়বাদী মতবাদগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— **চরম সংশয়বাদ** (Extreme form of Secpticism) এবং **নরম সংশয়বাদ** (Moderate form of Secpticism)। চরম সংশয়বাদ অনুযায়ী জ্ঞান অসম্ভব, আমরা আদৌ কিছু জানতে পারি না। নরম সংশয়বাদ বলে যে আমরা যা কিছু জানি বলে দাবি করি তার সব কিছু জানি না। অন্যভাবে বলা যায় যে নরম সংশয়বাদ অনুযায়ী যে সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞান সম্ভব বলে মনে করা হয় অথবা আমরা মনে করি যে আমরা জানি তার সবগুলিতেই আমরা জানি বা আমাদের জ্ঞান হয় এমন নয়।

সংশয়বাদের আরও দুটি প্রকার হল **সামগ্রিক সংশয়বাদ** (Global Scepticism) এবং **আংশিক সংশয়বাদ** (Local Scepticism)। সামগ্রিক সংশয়বাদীদের সংশয় যে কোন বিষয়ে জ্ঞানের সম্ভাবনা সম্বন্ধে। এঁদের সংশয় কোন নির্দিষ্ট পরিধি বা সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এদের সংশয় সর্বব্যাপী। কিন্তু আংশিক সংশয়বাদ কোন একটি নির্দিষ্ট পরিধির অন্তর্ভূক্ত বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্ভাবনার কথা অস্বীকার করলেও ঐ পরিধির বহির্ভূত বিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব একথা বলে না।

সংশয়বাদ আবার **দার্শনিক সংশয়বাদ** অথবা **বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ** হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদে কোন একটি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয় অন্য কোন নির্ভরযোগ্য স্বীকৃত তথ্য বা সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে। যেমন একজন ঐতিহাসিক যখন ইতিহাসের কোন স্বীকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করেন তখন তাঁর সংশয়ের ভিত্তি হিসাবে থাকে নতুন প্রাপ্ত ও অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি। এই সমস্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি তাঁর সংশয়ের পরিধির বাইরে থাকে। এই ধরনের সংশয়বাদী হলেন একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একজন বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী অবশ্যই একজন আংশিক সংশয়বাদী (Local Sceptic)। কারণ তাঁর সংশয়ের পরিধি সর্বব্যাপী নয়।

অপরপক্ষে একজন দার্শনিক সংশয়বাদী কোন তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না, কারণ তাঁর মতে এমন কোন তথ্য বা সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যা সংশয়ের উর্দ্ধে। যৌক্তিক দিক থেকে সংশয়যোগ্য এমন সব কিছুকেই একজন দার্শনিক সংশয়বাদী সংশয় করেন। উদাহরণস্বরূপ, একজন দার্শনিক সংশয়বাদী যখন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যথার্থ জ্ঞানের উৎস নয় বলে মনে করেন, তখন তার যুক্তি এমন নয় যে কিছু যথার্থ প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি যে কিছু প্রত্যক্ষ ভ্রমাত্মক। তার বক্তব্য হল এই যে কোন প্রত্যক্ষই যথার্থ বা সংশয়ের পরিধির বাইরে নয়।

৩.৩ বিভিন্ন প্রকার সংশয়বাদী যুক্তি (Different Types of Sceptical Arguments) :

সংশয়বাদীগণ তাঁদের মতের সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি উপস্থাপিত করেন তার মধ্যে এখানে আমরা তিন প্রকার সংশয়বাদী যুক্তি আলোচনা করব। যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

৩.৩.১ সংরক্ষিত মস্তিষ্ক সংক্রান্ত যুক্তি (Argument Concerning Brains in Vats) :

যুক্তিসংগত ভাবে আমরা একটি মনুষ্য মস্তিষ্কের কথা চিন্তা করতে পারি যা একটি গবেষণাগারে কিছু রাসায়নিক তরলের মধ্যে সংরক্ষিত এবং একজন সুদক্ষ গবেষক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কল্পনা করা যেতে পারে যে ঐ মস্তিষ্কটি একটি কম্পিউটার এর সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত যাতে ঐ কম্পিউটারটি যান্ত্রিক ভাবে মস্তিষ্কটিতে অভিজ্ঞতাসমূহ সরবরাহ করতে পারে। এইরূপ একটি (সফল) গবেষণার ক্ষেত্রে ঐ মস্তিষ্কটির পক্ষে এমন কোন অভিজ্ঞতা লাভ করা কখনই সম্ভব নয় যার দ্বারা সে জানতে পারবে যে অন্যান্য মনুষ্য মস্তিষ্কের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য আছে। কোন মস্তিষ্ক (তা সে মনুষ্যদেহের সঙ্গে যুক্ত মস্তিষ্কই হোক অথবা রসায়নাগারে সংরক্ষিত মস্তিস্কই হোক) কখনও লব্ধ অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু জানতে পারে না। এবং কেবলমাত্র লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন মস্তিষ্ক কখনই নিজে নিরূপণ করতে পারে না যে সে একটি সংরক্ষিত মস্তিষ্ক; একথাও সে নিরূপণ করতে পারে না যে সে একটি সংরক্ষিত মস্তিষ্ক নয়। সংশয়বাদীদের এই যুক্তি অনুযায়ী কোন এক জ্ঞাতা যদি একথা জানতে না পারে যে সে একটি সংরক্ষিত মস্তিষ্ক নয় তাহলে তার পক্ষে আরও অনেক কিছুই জানা অসম্ভব। যেমন, তার পক্ষে একথা জানা সম্ভব নয় যে সে চেয়ারে বসে একটি বই পড়ছে। যুক্তিটিকে এই ভাবে বোঝা যেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে ধরা যাক যে একজন জ্ঞাতা a অন্ততঃ যদি এটুকু জানে যে সে চেয়ারে বসে বই পড়ছে

তাহলে সে জানে যে সে সংরক্ষিত মস্তিষ্ক নয়। কিন্তু a জানে না যে সে সংরক্ষিত মস্তিষ্ক নয়। সুতরাং *Modus tollens* নিয়ম অনুসারে a জানে না যে চেয়ারে বসে বই পড়ছে।

সংশয়বাদীদের এই যুক্তিটি নিম্নলিখিত সূত্রটির উপর প্রতিষ্ঠিত :

১) [Kap & Ka (p→ q)] → Kaq

এই সূত্র অনুযায়ী যদি a জানে যে p এবং a আরও জানে যে p থেকে q নিঃসৃত হয় তাহলে a জানে যে q।

১) সূত্রটির একটি পরিবর্তিত রূপ হল :

২) [~ Kaq & Ka (p→q)] → ~Kap

এই সূত্র অনুযায়ী a যদি q বচনটি না জানে এবং যদি সে জানে যে p থেকে q নিঃসৃত হয় তাহলে সে p বচনটি জানতে পারে না।

[~ Kaq & Ka (p → q)] → ~ Kap

~ Kaq

Ka (p→q)

∴ ~ Kap

(২) নং সূত্রটি স্বীকার করে নিলে, (এই যুক্তি অনুযায়ী) যেহেতু কোন একজন (a) কখনই জানতে পারে না যে সে একটি সংরক্ষিত মস্তিষ্ক নয় (~Kaq) সেহেতু সে এমন কোন বচন (p) জানতে পারে না, যেটির সম্বন্ধে সে একথা জানে যে ঐ বচনটি (p) সত্য হলে সে সংরক্ষিত মস্তিষ্ক হতে পারে না (q)।

এই ধরনের যুক্তির একটি রূপ আমরা ডেকার্টের দর্শনে পাই। এই যুক্তি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি (a) জানতে পারে না যে সে স্বপ্ন জগতে নেই। সুতরাং সে এমন কোন বচন (p) জানতে পারে না, যে বচনটির সম্বন্ধে সে জানে যে সেই বচনটি থেকে নিঃসৃত হয় যে সে স্বপ্নজগতে নেই।

এই সংশয়বাদী যুক্তিটি অবশ্য সর্বাত্মক সংশয়বাদ (Global Scepticism) সমর্থন করে না, কারণ এই যুক্তিতে অন্ততঃপক্ষে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে a জানে যে p→q যার প্রতীকায়িত রূপ হল Ka (p→q)।

৩.৩.২ ভ্রান্তি সংক্রান্ত যুক্তি (The Argument from Error)

এই সংশয়বাদী যুক্তিটি ভ্রান্তির সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে। একথা স্পষ্ট যে এক সময়ে কোন একজন ব্যক্তির কোন বিষয়ে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তার বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হতে পারে। অতএব কোন এক সময়, যখন সে কোন কিছু জানে বলে দাবি করছে তখনও যে সে ভুল করছে না এমন কথা বলা যায় না। ধরা যাক, গতকাল সকালে আমি দাবি করেছিলাম 'আমি জানি আজ বিকেলে বৃষ্টি হবে'। আমার দাবির ভিত্তি ছিল আবহাওয়া দপ্তরের ঘোষণা, আকাশের পুঞ্জীভূত মেঘ প্রভৃতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

আমি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিলাম; গতকাল বিকেলে বৃষ্টি হয়নি। বস্তুতঃ ভবিষ্যৎ বিষয়ক অন্যান্য দাবির ন্যায় এই দাবিটিও সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে অতিক্রম করে যায়। সুতরাং অনুরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে যদি আজ সকালে আমি পুনরায় দাবি করি যে 'আমি জানি আজ বিকালে বৃষ্টি হবে' তাহলে আমাকে একথাও স্বীকার করতে হবে যে গতকাল 'আমি জানি' বলে আমি যে দাবিটি করেছিলাম সেই দাবিটিও যথাযথ ছিল। কিন্তু যদি আমি স্বীকার করে নিই যে গতকাল সকালে 'আমি জানি' বলে যে দাবিটি করেছিলাম তা যথাযথ ছিল না তাহলে আজও আমি অনুরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে 'জানি' বলে দাবি করতে পারব না। কারণ একমাত্র যে সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আমি সকালবেলায় আজ বিকালের (ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত) আবহাওয়ার সম্বন্ধে 'জানি' বলে জোরালো (Strong) দাবি করতে পারি, সেই সাক্ষ্যপ্রমাণ (ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে) আমার পক্ষে বা কারো পক্ষেই সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

এই উদাহরণটিতে অতীতের ভ্রান্তির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালের জানার দাবি সম্বন্ধে সংশয় করা হয়েছে। কিন্তু ভ্রান্তি সংক্রান্ত যুক্তিটি আসলে ভ্রান্তির সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভুল হবার কাল্পনিক সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিলেও এই যুক্তিটিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। যুক্তিটি এই কথা বলে যে আমরা প্রায়ই ভুল করি এবং ভবিষ্যতেও অনুরূপ ক্ষেত্রে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং আমরা কখনই জানি দাবি বলে করতে পারি না।

৩.৩.৩ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত যুক্তি (Argument from Experience)

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আমরা যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারি না, সেই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে কখনও কখনও জ্ঞান লাভ করতে পারি অভিজ্ঞতালব্ধ অন্যান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ইতিপূর্বে যা প্রত্যক্ষ করেছি তার ভিত্তিতে আমি আরোহ অনুমানের সাহায্যে জানতে পারি যে, যে টেবিলটির উপর কাগজ রেখে আমি এখন লিখছি, সেই টেবিলটির তলায় কি আছে, অথবা কিছুক্ষণ আগে আমি যে ঘরে বসেছিলাম সেই ঘরে এখন কতজন মানুষ আছে এবং কি কি আসবাব আছে। ধরা যাক, দশ মিনিট আগে আমি আমার ঘরের দেরাজে একটি খাতা রেখেছি এবং তারপর দেরাজটি আর খুলিনি। বর্তমানে আমি এই বচনটি জানি বলে দাবি করতে পারি যে 'আমার ঘরের দেরাজে একটি খাতা আছে'। আমার এইরূপ দাবি করার সপক্ষে যুক্তি হিসাবে থাকতে পারে আমার ইতিপূর্বের অভিজ্ঞতা এবং আমার বিশ্বাস যে একই ধরনের বস্তু সমূহ একইপ্রকার আচরণ করে।

কিন্তু দার্শনিক হিউম একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে উল্লিখিত শেষ বিশ্বাসটির সপক্ষে আমার কোন যুক্তি থাকা সম্ভব নয়। সকল বস্তুই যে একই পরিস্থিতিতে একই প্রকার আচরণ করবে এটি কোন অনিবার্য সত্য নয় বা বিশ্লেষক বচন নয়। এই বাক্যটিকে মিথ্যা ধরে নিলে স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হতে হয় না। অভিজ্ঞতার সাহায্যেও বচনটির সত্যতা প্রতিপাদিত হয় না। কারণ প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা কতখানি নির্ভরযোগ্য তা যথেষ্ট প্রশ্নের অপেক্ষা রাখে। তাছাড়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা অভিজ্ঞতা অতিরিক্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারি না। এই প্রসঙ্গে হিউমের সংশয়বাদী যুক্তিটি হল এই যে অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানলাভের নির্ভরযোগ্য

পদ্ধতি বলে মনে করার সপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নেই। কারণ অভিজ্ঞতার সপক্ষের সমস্ত যুক্তিগুলি একথা মেনে নেয় যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আমরা জানি যে অভিজ্ঞতা নির্ভরযোগ্য নয়।

৩.৪ দার্শনিক সংশয়বাদ (Philosophical Scepticism)

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে একজন দার্শনিক সংশয়বাদী যৌক্তিকভাবে সন্দেহ করা যায় এমন সবকিছুকেই সন্দেহ করেন। যেহেতু যৌক্তিক দিক থেকে কোন জ্ঞানই সন্দেহের উর্দ্ধে নয় সে কারণে একজন দার্শনিক সংশয়বাদীর সংশয় সর্বাত্মক। অর্থাৎ একজন দার্শনিক সংশয়বাদী মনে করেন যে জ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়। এই মতবাদ হল চরম সংশয়বাদ।

বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদ কিন্তু চরম সংশয়বাদ নয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটা সময় বিশ্বাস করা হত যে যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে এক ধরনের পাখি দেখা গেলে সেই যুদ্ধে জয় হবে। যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবানী করার এই পদ্ধতি সম্পর্কে কেউ সন্দেহ করতে পারেন এবং তাঁর সন্দেহের সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমান হিসাবে তিনি কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারেন যে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে ঐরূপ পাখি দেখা সত্বেও যুদ্ধে জয় হয়নি। এইরূপ সন্দেহ বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদের সন্দেহ।

কিন্তু একজন দার্শনিক সংশয়বাদী তাঁর সন্দেহের সপক্ষে এইরূপ কোন অভিজ্ঞতার কথা বলেন না। একজন দার্শনিক সংশয়বাদী যখন ভবিষ্যৎবাণী করার কোন পদ্ধতি সম্বন্ধে সন্দেহ করেন তখন তিনি যে কোন প্রকার ভবিষ্যৎবাণী করার পদ্ধতিকেই সন্দেহ করেন। তাঁর বক্তব্য হল যে অতীত বা বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে কোন অনুমানই অবৈধ , অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নয়। একজন দার্শনিক সংশয়বাদী যখন বলেন যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যথার্থ জ্ঞানের উৎস নয়, তখন তিনি একথা বলতে চান না যে কোন কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যে ভ্রমাত্মক তা আমরা জানতে পারি কিছু যথার্থ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে। তাঁর যুক্তি হল এই যে সকল প্রকার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই সমানভাবে সংশয়যোগ্য, কোন কোন ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ যথার্থ এবং কতকগুলি ভ্রমাত্মক এমন নয়। তাঁরা একথা বলেন না যে কোন কোন ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ভ্রান্তির কারণ হয়। তাঁরা বলেন যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে আমরা আদৌ জড় বস্তুর অস্তিত্বের কোন প্রমান পাই কি না তা সন্দেহের বিষয়।

অনুরূপভাবে একজন দার্শনিক সংশয়বাদী একথা বলেন না যে স্মৃতি সকল সময় যথার্থ জ্ঞান দেয় না, তাঁর সংশয়ের বিষয় হল স্মৃতি আদৌ অতীত সম্পর্কিত জ্ঞান দিতে পারে কি না। বর্তমান অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা অতীত সম্পর্কে যথার্থ অনুমান কখনও করতে পারি কি না তা তাদের সন্দেহের বিষয়। অপরের অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমরা আদৌ জানতে পারি কি না তাও তাঁরা সন্দেহ করেন। এগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁদের বক্তব্য যে আমরা যতই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করি না কেন, আমাদের ভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। "... So far from encouraging us to be more circumspect, his argument is designed to show that however circumspect we are it makes no difference : ..." (Ayer, *The Problem of Knowledge*, p.37)

এই ধরনের সর্ব্বাত্মক সংশয়, যা দার্শনিক সংশয়বাদের বৈশিষ্ট, যথার্থ ও অযথার্থের মধ্যে, ভ্রান্ত ও অভ্রান্তের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না। তাই অনেকে মনে করেন যে দার্শনিক সংশয়বাদ সহজেই খন্ডন করা যায়। গিলবার্ট

রাইল তাঁর গ্রন্থ *Dilemmas*-এ একটি রূপকের সাহায্যে এই ধরনের সংশয়বাদের অসুবিধা কি তা বুঝিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে 'There can be false coins only where there are coins made of the proper materials by the proper authorities ' অর্থাৎ নকল মুদ্রা থাকতে পারে তখনই যখন যথার্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথার্থ উপাদানে গঠিত মুদ্রা (আসল মুদ্রা) থাকে। অন্যভাবে বলা যায় আসল মুদ্রা না থাকলে 'নকল মুদ্রা' কথাটি অর্থপূর্ণ হয় না। অনুরূপভাবে, ভ্রান্তি কথাটি অর্থপূর্ণ হয় তখনই যখন যথার্থ জ্ঞান বলে কিছু থাকে। একটি প্রত্যক্ষকে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বলে চিহ্নিত করতে গেলে দেখাতে হবে যে সেটির সঙ্গে একটি যথার্থ প্রত্যক্ষের বিরোধ আছে। সব প্রত্যক্ষই ভ্রমাত্মক বললে 'ভ্রম' কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে।

অপেক্ষাকৃত নরম সংশয়বাদীরা অবশ্য মনে করেন যে আমাদের সব প্রত্যক্ষই যে ভ্রমাত্মক এমন নয় কিন্তু আসলে আমরা জানতে পারি না যে কোন প্রত্যক্ষটি ভ্রমাত্মক নয়। কিন্তু এই ধরনের অপেক্ষাকৃত নরম সংশয়বাদও রাইল এর সমালোচনাটি এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ যতক্ষন পর্যন্ত আমরা কোন একটি প্রতক্ষকে যথার্থ বা অভ্রান্ত বলে গ্রহণ না করছি ততক্ষণ আমরা কোন একটি প্রত্যক্ষকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে পারি না। রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে বুঝতে পারি তখনই যখন বুঝতে পারি যে ভুলবশতঃ যেটিকে সাপ বলে জেনেছিলাম (অর্থাৎ সাপ এর ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ হয়েছিল) সেটি আসলে রজ্জু (রজ্জুর যথার্থ প্রত্যক্ষ হওয়ার ফলে প্রতিপন্ন হয়েছে) / অমূল প্রত্যক্ষের বেলাতেও আমার যে অমূল প্রত্যক্ষ হয়েছিল তা বুঝতে পারি যখন দেখি যে, যে বস্তুটি প্রত্যক্ষ করছি বলে মনে করেছিলাম তার আসলে কোন অস্তিত্ব নেই। স্মৃতির ক্ষেত্রেও যে ভ্রান্তি হয় তা গ্রহণযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য কোন অতীত সংক্রান্ত তথ্য থেকে প্রতিপন্ন হয়।

কিন্তু Ayer মনে করেন যে রাইলের এই যুক্তি সিদ্ধান্তমূলক নয়। তিনি স্বীকার করেন যে প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত কোন একটি বচনকে যথার্থ বলে মেনে না নিলে অন্য কোন একটি প্রত্যক্ষ সংক্রান্ত বচনকে অযথার্থ বলা যায় না। কিন্তু তার থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যে বচনটি কে আমরা যথার্থ বা গ্রহণযোগ্য বলছি সেটির বেলায় আমাদের কোন ভুল হতে পারে না। তাঁর মত হল যে আমাদের সব প্রত্যক্ষই ভ্রান্ত একথা বলার কোন অর্থ হয় না— একথা মেনে নিয়েও আমরা বলতে পারি যে কোন প্রত্যক্ষই ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে পারে। কোন একটিকে অযথার্থ বলে বাদ দিতে হলে অন্য কোন একটিকে অবশ্যই যথার্থ বলে স্বীকার করতে হবে — কিন্তু তার থেকে একথা নিঃসৃত হয় না যে যেগুলিকে আমরা যথার্থ বলে স্বীকার করে নিচ্ছি সেগুলির বেলায় ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অধ্যাপক Ayer এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দার্শনিক সংশয়বাদীদের যুক্তিকে পরিপুষ্টও করা যায় না, আবার খন্ডনও করা যায় না।

অভিজ্ঞতা সংশয়বাদী যুক্তিকে পরিপুষ্ট করে না, কারণ একজন দার্শনিক সংশয়বাদী বা সামগ্রিক সংশয়বাদী কোন সাক্ষ্য প্রমাণকেই নির্ভরযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। সব সাক্ষ্যপ্রমাণই যদি সমানভাবে সংশয়যোগ্য হয় তাহলে অভিজ্ঞতার এক্ষেত্রে কোন কিছুই করার থাকে না। যদি সংশয়টি এমন হয় যে, কোন একটি বিষয়কে অযথার্থ বলছি কারণ তার বিপক্ষে কিছু অপেক্ষাকৃত অধিক নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে, সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার একটি ভূমিকা থাকতে পারে। একজন বৈজ্ঞানিক কোন একটি প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে সন্দিহান হতে পারেন এবং তাঁর যুক্তি হতে পারে যে এই প্রকল্পটি একটি অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও

ব্যাপকভাবে গৃহীত কিছু তত্ত্বের বিরোধী। এক্ষেত্রে ঐ বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করছেন। কিন্তু যদি একজন বলেন যে কোন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পই গ্রহণযোগ্য নয় — সব আরোহ যুক্তিই অবৈধ তাহলে তাঁর মতবাদ কোন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারণ তাঁর বক্তব্য হল, যে কোন প্রকল্প বা তত্ত্বের সপক্ষে আমরা যতই সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করি না কেন, তার দ্বারা ঐ প্রকল্পটির বা তত্ত্বটির গ্রহণযোগ্যতা কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় না।

অভিজ্ঞতা অবশ্য একজন দার্শনিক সংশয়বাদীর যুক্তি খন্ডনও করতে পারে না। কারণ সর্বোপরি একজন দার্শনিক সংশয়বাদীর দাবী হল যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে, ভ্রান্তি যে ঘটবেই একথা তিনি বলেন না; এবং এই বক্তব্যটিকে অভিজ্ঞতার সাহায্যে খন্ডন করা যায় না।

কোন বচন সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করা অথবা সেটি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এয়ার বলেছেন যে যখন কোন একটি বচন সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার অধিকার আছে বলে আমরা দাবি করি তখন ঐ দাবির ভিত্তি হতে পারে এই যে হয় বচনটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য; অথবা এমন হতে পারে যে বচনটির সত্যতা আমাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সরাসরি নির্ধারিত হয়; আবার এমনও হতে পারে যে বচনটি এমন কোন বচন অথবা কতিপয় বচন থেকে বৈধ ভাবে নিঃসৃত, যে বচন অথবা বচনগুলি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হবার অধিকার আছে। যাঁরা আমাদের নিশ্চিত হবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা অর্থাৎ সংশয়বাদীরা বলেন যে এমন কি যে বচনগুলি সম্বন্ধে আমরা মনে করি যে সেগুলির আর কোন যৌক্তিকতা প্রমাণের প্রয়োজন নেই সেগুলিও সংশয়ের উর্দ্ধে নয়। এয়ার পরীক্ষা করেছেন যে এমন কোন বচন আছে কি না যেগুলির সত্যতা সব রকম সংশয়ের সম্ভাবনার উর্দ্ধে।

৩.৫ পূর্বতঃসিদ্ধ বচন (*A Priori* Propositions)

বচনসমূহকে অনেকসময় পূর্বতঃসিদ্ধ (*a priori*) বচন এবং অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical or *a posteriori*) বচন এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্পষ্টতঃই অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলি অভিজ্ঞতাভিত্তিক, এগুলির সত্যতা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। বিপরীতভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ বচনগুলির সত্যতা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না এগুলি অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং যৌক্তিক নিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য (true by virtue of the laws of logic)। যেহেতু এই বচনগুলির সত্যতা যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় সেই জন্য পূর্বতঃসিদ্ধ সত্য (*a priori* truths) গুলি অনিবার্য সত্য (necessary truths)। এগুলি কখনও মিথ্যা হতে পারে না। যুক্তিবিজ্ঞান এবং গণিতে আমরা এইরূপ বচন পাই। এই বচনগুলি অস্বীকার করলে স্ববিরোধীতায় পর্যবসিত হতে হয়। 'এখন হয় বৃষ্টি পড়ছে অথবা বৃষ্টি পড়ছে না' অথবা '2+2= 4' এই বচনগুলি যৌক্তিক সত্য, এগুলি অনিবার্য সত্য বচন। এর নিষেধক 'এখন বৃষ্টি পড়ছে না এবং বৃষ্টি পড়ছে' অথবা '2+2≠4' এগুলি স্ববিরোধী বচন।

অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলি অবশ্য কখনই অনিবার্য সত্য নয় কারণ এগুলি যৌক্তিক নিয়ম নির্ভর সত্য বচন নয়। একটি যৌক্তিক নিয়ম ভিত্তিক বচন কোন বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে পারে না। অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলি একটি বাস্তব পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়। এই বচনগুলি অনিবার্য নয়। এগুলি আপতিক বা শর্তসাপেক্ষ (Contingent)। এগুলি সত্য হতে পারে অথবা মিথ্যা হতে পারে। একজন অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে এয়ার স্বীকার করেন

যে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান সম্ভব। অভিজ্ঞতাগুলি নিজে নিজে সত্য বা মিথ্যা, যথার্থ বা অযথার্থ হতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলিকে যখন আমরা ভাষা ব্যবহার করে বিবৃত করি, একটি বচনের সাহায্যে, তখন একটি বচন সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে।

পূর্বতঃসিদ্ধ অনিবার্য বচনগুলি একদিক থেকে সুরক্ষিত এই জন্য যে এগুলি সত্য হলে আর কোন পরিস্থিতিতেই মিথ্যা হতে পারে না। কোন একটি সম্ভাব্য জগতের কথা চিন্তা করা যেতে পারে যেখানে এইরূপ কোন সত্যের ব্যবহার নেই, কিন্তু তেমন একটি জগতেও এইরূপ একটি বচন মিথ্যা একথা বলা যাবে না। অন্যভাবে বলা যায় যে অনিবার্য বচনগুলি কোন সম্ভাব্য জগতেই মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু এই অর্থে পূর্বতঃসিদ্ধ বচনগুলি সত্য, অথবা মিথ্যা হবার সম্ভাবনা রহিত হলেও এগুলি সংশয়ের অতীত একথা বলা যাবে না। অর্থাৎ এমন কি যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতের অনিবার্য বচনগুলিও সংশয়ের উর্দ্ধে নয়। যুক্তিবিজ্ঞান ও গণিতেও ভুল সম্ভব। '2+2=4' অথবা 'হয় এখন বৃষ্টি পড়ছে অথবা এখন বৃষ্টি পড়ছে না' এই ধরনের যৌক্তিক সত্যগুলি নিজে নিজে সত্য (true by themselves), এগুলিকে কোন পরিস্থিতিতেই মিথ্যা প্রতিপন্ন (falsify) করা যায় না। কিন্তু এগুলি আমরা যখন জানি তখন আমাদের জানার বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে। এইরূপ একটি বচনের মধ্যে যে সমস্ত ধারণাগুলি নিহিত আছে সেই ধারণাগুলিকে আমরা ভুল ভাবে গ্রহণ করতে বা বুঝতে পারি। এইরূপ বচনগুলি নিজে নিজে বিরোধবাধক নিয়ম দ্বারা সুরক্ষিত এই অর্থে যে এগুলির নিষেধকগুলি স্ববিরোধী (self-contradictory) হবে। কিন্তু এইরূপ কোন নিয়ম দ্বারা আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনা যে আছে এই বক্তব্যটি 'মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে' (human fallibility) এই বাস্তব সত্যটিকেই মনে করিয়ে দেয়। এছাড়াও Ayer মনে করেন যে এমন কোন বিশেষ মানসিক পর্যায় (special, infallible state of mind) আমাদের নেই যা ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত।

কেউ মনে করতে পারেন যে কোন একটি পূর্বতঃসিদ্ধ বচন ভ্রান্ত বলার অর্থ হল যে এটি কোন একটি, অথবা একগুচ্ছ পূর্বতসিদ্ধ সত্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, যেটি বা যেগুলি সন্দেহের উর্দ্ধে (বা সংশয়ের নাগালের বাইরে)। Ayer উল্লেখ করেছেন যে এইরূপ মনে করার কোন যুক্তি নেই। এমন কোন পূর্বতঃসিদ্ধ বচন নেই, বা পূর্বতঃসিদ্ধ বচনসমূহের এমন কোন শ্রেণী নেই, যা সন্দেহের নাগালের বাইরে।

তবে পূর্বতঃসিদ্ধ বচনগুলির ক্ষেত্রে আমাদের যে সবসময় ভুল হচ্ছে এমন নয়। এবং সেই কারণে এই ক্ষেত্রে সংশয় যে খুব গুরুত্বপূর্ণ (serious) এমন নয়। কিন্তু সংশয় গুরুত্বপূর্ণ নয় বলার অর্থ এই নয় যে এই বচনগুলি সংশয়ের নাগালের বাইরে। মানুষের ভ্রান্তির সম্ভাবনা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ এই সংশয়ও থাকবে। এই সংশয় অভিজ্ঞতাভিত্তিক বচনের ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য পূর্বতঃসিদ্ধ বচনের ক্ষেত্রেও ততখানিই প্রযোজ্য।

৩.৬ আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি (I Think, therefore, I Am)

'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি' এই সূত্রটি দার্শনিক Rene Descartes এর দর্শনের প্রথম সূত্র, একথা সুবিদিত। Descartes, যাঁকে আধুনিক দর্শনের জন্মদাতা (Father of Modern Philosophy)

বলা হয়, তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ। তিনি গণিতশাস্ত্র এবং গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত পদ্ধতিকে (অবরোহ পদ্ধতি) যথাযথ ও বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞান লাভের পদ্ধতি বলে মনে করতেন। তিনি গণিতের ন্যায় একটি সুদৃঢ় ও নিঃসন্দিগ্ধ ভিত্তির উপর জ্ঞানতত্ত্ব (epistemology) কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে তিনি দর্শন আলোচনার প্রারম্ভে একটি নিশ্চিত সত্যের অনুসন্ধান করেছিলেন যেটি সমস্ত প্রকার সন্দেহের উর্দ্ধে। একজন গণিতবিদ হিসাবে তিনি এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে এমন কি গণিতের সত্য বচনগুলিও সন্দেহের উর্দ্ধে নয়। সুতরাং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন কোন সত্য খুঁজে বের করা যা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত সত্য।

ডেকার্ত আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি প্রতারক দৈত্যের কল্পনা করেছেন। যেন একটি প্রতারক দৈত্য আমাদের সবসময় প্রতারণা করছে, যার ফলে যেগুলি সত্য নয় এমন কিছু বচন আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করছি। এমন হতে পারে যে আমরা প্রতারক দৈত্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে ঐ বচনগুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করছি। অর্থাৎ এই সব বচনগুলির ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতারিত হবার বা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রতারক দৈত্যের নাগালের বাইরে (অর্থাৎ সংশয়ের উর্দ্ধে বা ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত) কোন বচন খুঁজে পাওয়াই ডেকার্তের উদ্দেশ্য ছিল। এবং তিনি চেয়েছিলেন গাণিতিক পদ্ধতির অনুসরণে জ্ঞানবিদ্যা বা দর্শনেও কোন সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীত সত্য বচন থেকে যৌক্তিক নিয়ম অনুযায়ী অন্য কিছু সত্য বচন নিঃসৃত করতে।

এইরূপ একটি সুনিশ্চিত বচনের সন্ধান তিনি পেয়েছেন বলে মনে করেন, যেটি হল 'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি'। এটি তাঁর দর্শনের প্রথম সূত্র (first principle) হিসাবে বিখ্যাত। এই বচনটির বেলায় আমাদের যে ভ্রান্তির অবকাশ নেই এর সপক্ষে তাঁর যুক্তি হল যে আমি চিন্তা করছি কি না এই বিষয়ে আমি যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করতে পারি না। অর্থাৎ, 'আমি সন্দেহ করছি আমি চিন্তা করছি কি না' — এই বচনটি এমন একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে বর্ণনা করে যেখানে সন্দেহটি যুক্তিসঙ্গত নয় (unwarranted)। প্রতারক দৈত্য দ্বারা প্রতারিত হয়েও যদি আমি (ভুলবশতঃ) বিশ্বাস করি যে আমি চিন্তা করছি তাহলেও একথা (ভুল করেও বিশ্বাস করার জন্য একজন 'আমি' থাকবে যে বিশ্বাস (ভুল বিশ্বাস) করে সে অস্তিত্বশীল। সুতরাং ডেকার্তের সিদ্ধান্ত হল আমি যদি চিন্তা করছি (অথবা বিশ্বাস করছি) তাহলে একথা সন্দেহাতীত যে আমি চিন্তা করছি, এবং তা যদি হয় তাহলে একথাও সন্দেহাতীত যে আমি অস্তিত্বশীল (অন্ততঃ যতক্ষন আমি চিন্তা করছি ততক্ষণ)।

এয়ার তাঁর *The Problem of Knowledge* গ্রন্থে ডেকার্তের এই সূত্রটি এবং যুক্তিটি পর্যালোচনা করেছেন।

Ayer মনে করেন যে ডেকার্ত 'আমি চিন্তা করি' এবং এর থেকে অনুসৃত 'আমি হই অস্তিত্বশীল' সূত্রটিকে সন্দেহের পরিসীমার বাইরে বলে মনে করেন । কিন্তু এই সূত্রটি যে নিশ্চিত সত্য তা এয়ার অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে কোন একজনের পক্ষে যৌক্তিক দিক থেকে সন্দেহ করা অসম্ভব নয় যে সে চিন্তা করছে। ডেকার্ত এইরূপ সন্দেহকে অযৌক্তিক বলেছেন, কিন্তু তিনি দেখাননি যে কি ভাবে 'আমি সন্দেহ করি যে আমি চিন্তা করি' বাক্যটি স্ববিরোধী হতে পারে।

এয়ার আরও উল্লেখ করেছেন যে 'আমি চিন্তা করছি' বা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলির কোনটিই অনিবার্য সত্য নয়। এগুলির নিষেধকগুলিও স্ববিরোধী নয়। এগুলি বাস্তব সত্য যে 'আমি চিন্তা করছি' অথবা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' কিন্তু এই বচনগুলি সত্য নয় এমন চিন্তার মধ্যে কোন স্ববিরোধীতা নেই। আমি চিন্তা করছি, কিন্তু আমি চিন্তাশীল না হতেও পারতাম। আমি অস্তিত্বশীল, কিন্তু আমি না থাকতেও পারতাম। অর্থাৎ এমন একটি সম্ভাব্য জগতের কথা চিন্তা করা সম্ভব, যেখানে আমি আছি অথচ আমি চিন্তাশীল নই, অথবা আমি সেখানে আদৌ অস্তিত্বশীল নই। সুতরাং 'আমি চিন্তা করি' অথবা 'আমি আছি' এগুলির কোনটিই যৌক্তিক সত্য নয়।

অবশ্য যৌক্তিক সত্যগুলিও ভ্রান্তির সম্ভাবনামুক্ত নয়। এয়ার উল্লেখ করেছেন যে একটি কারণে 'আমি চিন্তা করছি ' বা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বচনগুলি সর্বদা সত্য হবে যদিও ডেকার্ত এই কারণটি কখনও উল্লেখ করেননি। এই কারণটি হল এই যে এইরূপ বচনগুলির কোনটিকে সন্দেহ করা থেকেই বচনটির সত্যতা নিঃসৃত হয়। 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বচনটিকে আমি সন্দেহ করছি এর থেকেই নিঃসৃত হয় যে 'আমি হই অস্তিত্বশীল'। এই বচনটি সত্য, কারণ সন্দেহ করতে হলেও আমাকে অস্তিত্বশীল হতে হবে। অনুরূপভাবে 'আমি হই চিন্তাশীল' এই বচনটিকে আমি সন্দেহ করতে গেলেই বচনটির সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয় কেননা সন্দেহ করাও হল চিন্তা করা।

একজন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিকোন থেকেও এয়ার 'আমি চিন্তা করি' এবং ' আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলি পরীক্ষা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি Hume এর মত এর উল্লেখ করেছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম এর মতে 'আমি' বা 'মন' বা 'আত্মা' র কোন অভিজ্ঞতা (মুদ্রণ বা impression) আমাদের হয় না। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হল " When I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure. I never catch myself at any time without a perception, and never can observe anything but the perception..." অর্থাৎ অন্তদর্শনে আমি কখনও 'আমি' বা 'মন' বলে কোন দ্রব্য পাই না, কতগুলি অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করি মাত্র।

যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা মনে করেন যে একটি বচনের অর্থপূর্ণ হওয়া নির্ভর করে বচনটি অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাইযোগ্য কিনা তার উপর। ' আমি' এই অভিব্যাক্তিটি যাকে নির্দেশ করে এমন কোন দ্রব্যের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না বলে 'আমি চিন্তাশীল' অথবা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাইযোগ্য নয়, সেই কারণে এগুলি যথার্থ বিবৃতি (genuine proposition) প্রকাশ করে না অর্থাৎ এগুলি অর্থপূর্ণ বচন নয়। যদিও 'Mr. A হন সচেতন' অথবা ' Mr .A হন চিন্তাশীল' অথবা 'Mr .A হন অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলি অর্থপূর্ণ বচন প্রকাশ করে এমন কি যখন আমিই Mr.A । এর কারণ, এয়ার মনে করেন যে, যদি আমার নাম Mr .A হয় তাহলেও 'আমি' এবং 'Mr. A' এই অভিব্যক্তি দুটি সমার্থক নয়। তা যদি হত তাহলে আমি হই Mr.A বাক্যটি বিশ্লেষক বচন হত এবং তথ্য জ্ঞাপক হত না, কিন্তু 'আমি হই Mr.A' বাক্যটি তথ্যজ্ঞাপক।

তবে Ayer উল্লেখ করেছেন যে 'আমি হই সচেতন' বা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলি কখনও কখনও অর্থবহ হতে পারে। কখনও কখনও এই বাক্যগুলি যথার্থ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

যেমন আমি যদি হঠাৎ অচেতন হয়ে যাই তাহলে চেতনা ফিরে পাবার পর অন্যান্য ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে পারি 'আমি হই সচেতন' এবং এই উক্তিটি তাদের কাছে তথ্যজ্ঞাপক হতে পারে। অনুরূপভাবে 'আমি হই অস্তিত্বশীল' বাক্যটিও কখনও কখনও তথ্যজ্ঞাপক হতে পারে। একটি তথ্যজ্ঞাপক বচন অর্থপূর্ণ নয় একথা কখনও বলা যায় না। সুতরাং এই বচনগুলি কখনও কখনও অর্থপূর্ণ হয়। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে কি ভাবে 'আমি হই অস্তিত্বশীল' বা 'আমি চিন্তা করি' অথবা 'আমি হই সচেতন' এই বাক্যগুলি অর্থপূর্ণ হয়, যখন 'আমি' এই অভিব্যক্তিটির সঙ্গে যুক্ত কোন অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না। এয়ার এই প্রশ্নটির উত্তর দেবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অচেতন হয়ে যাবার পর চেতনা ফিরে পেয়ে অন্যদের প্রশ্নের উত্তরে যদি আমি বলি 'আমি হই সচেতন', তখন আমি বলছি 'আমি হই ,সচেতন ' কিন্তু যারা শুনছে, অর্থাৎ যাদের কাছে এই উক্তিটি তথ্যজ্ঞাপক বা অর্থপূর্ণ হচ্ছে, তারা বাক্যটিকে অন্যভাবে বুঝছে। তারা আমাকে যে ভাবে চেনে, যে বর্ণনার দ্বারা চিহ্নিত করে (the description they identify me by) , 'সেই বর্ণনা দ্বারা বর্ণিত ব্যক্তি হন সচেতন' এইভাবে তারা বাক্যটির অর্থ বোঝে। এই কারণে বাক্যটি তাদের কাছে অর্থপূর্ণ। কিন্তু আমি যখন নিজেকে নিজে বলি 'আমি হই সচেতন' তখন আমি আমাকে কোন বর্ণনা দ্বারা চিহ্নিত করি না, সুতরাং এই বাক্যটি ব্যবহার করে আমি নিজেকে কোন কিছু বলতে সক্ষম হই না।

এয়ার মনে করেন যে 'আমি চিন্তা করি' বা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বচনগুলি অদ্ভুত ধরনের (peculiar)। এর কারণ হল অন্যান্য অভিজ্ঞতালব্ধ বচনের মত এগুলি ব্যবহৃত হলে এগুলির সত্য অথবা মিথ্যা হবার সম্ভাবনা থাকে না। এগুলির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল (peculiarity) এই যে ব্যবহৃত হলে, অর্থাৎ কেউ যদি এইরূপ বাক্য উচ্চারন করে তাহলে, এগুলি সত্য ব্যতীত মিথ্যা হতে পারে না। যদি কেউ যদি এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করে তাহলে এগুলি মিথ্যা হতে পারে না, সত্য হতে বাধ্য। যদি কেউ দাবি করেন যে 'আমি হই চিন্তাশীল' অথবা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' তবে তার দাবি অবশ্যই বৈধ হবে কারণ এই দাবির বৈধতা ঐ দাবি করার শর্তস্বরূপ (its being valid is a condition of its being made) । লক্ষণীয় যে এইরূপ বচনগুলি উচ্চারণ করলে এগুলি কখনই মিথ্যা হতে পারে না। এগুলি মিথ্যা হলে এগুলি উচ্চারিত হতে পারে না।

কিন্তু এয়ার দেখিয়েছেন যে ঠিক এই কারণেই এই বাক্যগুলি বিবৃতি হিসাবে শ্রেণীচ্যুত। 'আমি হই অস্তিত্বশীল' যদি কেউ বলেন তাহলে উচ্চারিত বাক্যটি সত্য ছাড়া মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু এই বাক্যটি যা বলে তা শুধু 'আমি' বললেই বলা হয়ে যায়। যেমন 'এটি অস্তিত্বশীল' বাক্যটির ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র 'এটি ' বললে যতটুকু বলা হয়, 'এটি অস্তিত্বশীল' বললে তার চাইতে বেশী কিছু বলা হয় না।

সাধারণভাবে একটি বিবৃতিতে (অনপেক্ষ বচনের ক্ষেত্রে) একটি উদ্দেশ্য অংশ ও একটি বিধেয় অংশ থাকে। বিবৃতির বিধেয় অংশটি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে। কিন্তু 'এটি অস্তিত্বশীল' অথবা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এইরূপ বাক্যগুলির ক্ষেত্রে বিধেয় অংশগুলি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই বলতে সক্ষম হয় না। বিধেয় অংশটি বিধেয় হওয়ার উপযুক্ত কোন কাজই করে না। সেই কারণে এইরূপ বচনের বিধেয় অংশটিকে এয়ার বলেছেন 'sleeping partner' বা ঘুমন্ত অংশীদার। বিধেয় অংশটি বিধেয়ের কাজ না করার ফলে এই ধরনের বাক্যগুলি বিবৃতি হিসাবে শ্রেণীচ্যুত (degenerate)। কারণ এই বাক্যগুলি ব্যবহার করে কেউ কিছু বলতে বা বিবৃতি দিতে সক্ষম হয় না। এগুলি আদৌ তথ্যমূলক নয়।

৩.৭ মৌলিক বাক্য (Basic Statement)

নিশ্চিত সত্যের ধারণাটি দার্শনিক আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিশেষতঃ জ্ঞানবিদ্যায় দার্শনিকগণ সংশয়াতীত সত্য বা নিশ্চিত সত্যের আদর্শটি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত এই কারণে যে কোন কোন দার্শনিক মনে করেন এইরূপ কোন সত্যের সন্ধান না পাওয়া গেলে সংশয়বাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন যুক্তিই থাকবে না। তাই তাঁরা অনুসন্ধান করেন এক নিশ্চিত সত্যের যা ডেকার্তের প্রতারক দৈত্যের নাগালের বাইরে, অর্থাৎ সুনিশ্চিত সত্য। এইরূপ কোন সুনিশ্চিত সত্যের সন্ধান না পাওয়া গেলে কোন কিছুকে এমনকি সম্ভাব্যও বলা যাবে না।

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ বাক্যগুলি নিজে নিজে (by themselves) সত্য (অনিবার্য সত্য) হলেও সেগুলি জানতে গিয়ে আমরা ভুল করতে পারি। অভিজ্ঞতালব্ধ বচনগুলি সাধারণভাবে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে এবং এগুলির বেলায় আমাদের ভ্রান্তি হতে পারে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। 'আমি হই সচেতন' অথবা 'আমি হই অস্তিত্বশীল' এই বাক্যগুলি অবশ্য ব্যবহৃত হলে সত্য ছাড়া মিথ্যা হতে পারে না। কারণ এদের সত্যতা এদের উচ্চারিত হবার শর্তস্বরূপ। কিন্তু এগুলি বিবৃতি হিসাবে শ্রেণীচ্যুত এই কারণে যে এগুলি আদৌ তথ্যজ্ঞাপক নয় বা এগুলি দ্বারা কিছু বিবৃত হয় না।

কোন কোন দার্শনিক অবশ্য একধরনের অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্যের কথা বলেন যেগুলি যৌক্তিকভাবে সংশয়াতীত এবং সেই সঙ্গে যথার্থই তথ্যজ্ঞাপক (genuinely informative)। এইরূপ বিবৃতিগুলি হল ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতি (statements about one's own immediate experience) উদাহরণস্বরূপ, 'আমি এখন মাথা ব্যাথা অনুভব করছি' (I feel a headache now), 'এটি আমার কাছে নীল বলে মনে হচ্ছে' (This seems to me to be blue) ইত্যাদি। এই ধরনের বিবৃতিগুলিতে একটি নির্দেশাত্মক (demonstrative) এবং একটি বর্ণনাত্মক (descriptive) উপাদান থাকে। এই ধরনের বিবৃতিগুলি একজনের সরাসরি প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা। এইরূপ বিবৃতি ব্যবহার করে আমি যদি মিথ্যা বলি তাহলে আমি অন্যদের বিভ্রান্ত করতে পারি। কিন্তু এগুলি যেহেতু আমার নিজস্ব সরাসরি প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার বর্ণনা সেহেতু এগুলি ব্যবহার করে আমি কখনও আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারি না। এবং এগুলি আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার (immediate experience) বর্ণনা বলে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আমার নিজের কোন সংশয় থাকতে পারে না। আমি নিজে যখন মাথা ব্যাথা অনুভব করছি তখন আমার নিজের এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমার কোন সংশয় থাকতে পারে না। আমি যখন নীল রং দেখছি তখন আমি যে নীল রং দেখছি সে বিষয়ে আমি নিজে কোন সন্দেহ করতে পারি না। তাৎক্ষণিক অপরোক্ষ অভিজ্ঞতার প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই একথা বলা যায়। যেহেতু এই ধরনের বাক্য ব্যবহার করে আমি কেবলমাত্র আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছি, আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোন কিছুর কথা বা কোন অস্তিত্বের কথা বলছি না সেহেতু এই ধরনের বিবৃতিগুলির সত্যতা কেবলমাত্র আমার অভিজ্ঞতা দ্বারাই নির্ধারিত হয়, অপর কারও পক্ষে যেমন এগুলির সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয় একইভাবে অপর কারও পক্ষে এগুলি খন্ডন করা বা অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

একজন অভিজ্ঞতাবাদী হিসাবে Ayer মনে করেন যে একটি বাস্তব ঘটনা সংক্রান্ত বিবৃতির সত্যতা অথবা মিথ্যাত্ব নির্ধারিত হতে পারে কোন না কোন অভিজ্ঞতা দ্বারা। এবং বিবৃতিগুলির সত্যমূল্য নির্ধারণ করার এই

পদ্ধতিতে ব্যক্তির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। এর কারণ হল এই যে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি এক একটি অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি হিসাবে কাজ করে। এই জন্য এই প্রকার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলিকে মৌলিক বিবৃতি বা মৌলিক বচন বলা হয়। এই মৌলিক বিবৃতি (basic statement) গুলি অন্যান্য অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলির সত্যমূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতিতে ভিত্তি (foundation) হিসাবে কাজ করে। যাচাইকরণ পদ্ধতিতে (process of verification) কিছু বচন যাচাই করা হয় অন্য যাচাইযোগ্য বচন দ্বারা, বা অন্য কিছু যাচাইযোগ্য বচনের উপর ভিত্তি করে। যে সমস্ত বচনগুলি যাচাই করার জন্য অন্য যাচাইযোগ্য বচনের উপর নির্ভর করতে হয় সেই বচনগুলিকে অমৌলিক (non-basic) বচন বলা হয়। কিন্তু এই যাচাইকরণ পদ্ধতির শেষ প্রান্তে যে অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি থাকে সেগুলি আর (যাচাইকরণের জন্য) অন্য কোন বচনের উপর নির্ভর করে না, সেগুলি সরাসরি অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাইকৃত হয়। এই বচনগুলিই অভিজ্ঞতাসমূহকে সরাসরি ছবির ন্যায় উপস্থাপিত করে। এই বচনগুলিই হল মৌলিক (basic) বচন। এই বচনগুলিকে আর কোন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয় না, কারণ একমাত্র এই বচনগুলিকেই চূড়ান্ত ভাবে যাচাইযোগ্য মনে করা হয়। এগুলিই যাচাইকরণ পদ্ধতির প্রান্তসীমায় অবস্থিত এবং এই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি মৌলিক, এগুলিকে অসংশোধনযোগ্য (incorrigible) বলে মনে করা হয়।

কিন্তু এয়ার দেখিয়েছেন যে এই বচনগুলি অসংশোধনযোগ্য বলার অর্থ এই নয় যে এগুলির সত্যতা বা মিথ্যাত্ব সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পরবর্তীকালে আর কোন পরিবর্তন হবে না। অন্যভাবে বলা যায় যে এই বচনগুলি অসংশোধনযোগ্য এই অর্থে নয় যে এগুলিকে একবার সত্য বলে স্বীকার করে নিলে পরবর্তীকালে এগুলির সত্যতা সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। যদি এই অর্থে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলিকে অসংশোধনযোগ্য মনে করা হয় তাহলে ভুল হবে। এয়ার একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। ধরা যাক, আমি এখন এই মূহূর্তে মাথাব্যাথা অনুভব করে আজকের দিনলিপিতে (diary) এই মূহূর্তের সময়ের উল্লেখ করে আমার এই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে রাখলাম। পরবর্তীকালে কোন একসময় দিনলিপির ঐ অংশটি পড়তে গিয়ে ঐ সময়ের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে আমার মনে হতে পারে যে আমি ঐ সময় ঐ বিবৃতিটি সঠিক লিখিনি। অর্থাৎ ঐ সময়কার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিটিকে আমি পরবর্তীকালে সংশোধন করা প্রয়োজন মনে করতে পারি। সুতরাং একজন ব্যাক্তির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি এই অর্থে অসংশোধনযোগ্য নয় যে এগুলি একবার সত্য বলে স্বীকার করে নিলে পরবর্তীকালে এগুলিকে আর অস্বীকার করা যাবে না। অর্থাৎ এয়ার দেখাতে চেয়েছেন যে এই মৌলিক বচনগুলির ক্ষেত্রেও আমরা সম্পূর্ণভাবে নিসংশয় হতে পারি না, এগুলির বেলাতেও আমাদের ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে।

তবে এই বচনগুলিকে কতগুলি শর্তসাপেক্ষে অসংশোধনযোগ্য বলা যায়। এই ধরণের বিবৃতিগুলি সংশয়াতীত ভাবে জানা যায় কেবলমাত্র যখন বিবৃতিগুলি করা হয় সঠিক ব্যক্তি দ্বারা , সঠিক পরিস্থিতিতে এবং সঠিক সময়ে। (They are known incorrigibly when they are made by the right person in the right circumstances and at the right time.) কিন্তু এই শর্তগুলি সবসময় পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমন কি আমি নিজেও আমার পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করতে পারি।

সুতরাং Ayer এর মতে একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি (statements about one's own immediate experience) কতগুলি শর্তসাপেক্ষে, ক্ষণেকের জন্য সংশয়াতীত বা অসংশোধনযোগ্য হলেও, অসংশোধনযোগ্যতা এই বিবৃতি বা বচনগুলির বৈশিষ্ট্য নয়। শর্তগুলি পরিবর্তিত হয়ে গেলেই এই বচনগুলি আবার সংশয়যোগ্য বা সংশোধনযোগ্য হয়ে পড়ে। সেই কারণে Ayer একথা অস্বীকার করেন যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বিবৃতিগুলি একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যে শ্রেণীর বিবৃতি সমূহের বৈশিষ্ট্য হল এদের অসংশোধনযোগ্যতা বা অসংশয়যোগ্যতা। (It is, therefore, misleading to talk of a class of incorrigible or indubitable, statements as though 'being incorrigible or being induibitable' were properties which belonged to statements in themselves.)

সুতরাং এই আলোচনা থেকে নিঃসৃত হয় যে অসংশোধনযোগ্য বচন বলতে যা বোঝায় এবং তার থেকে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ বা নিশ্চিত হওয়ার যেটুকু আশ্বাস পাই তা জ্ঞানের জগতে বিশেষ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। যে কোন একটি বচন অসংশোধনযোগ্য হতে পারে কেবলমাত্র একটি ব্যক্তির কাছে, ক্ষণেকের জন্য এবং তখনই যখন ঐ ব্যক্তির সেই বিবৃতি দ্বারা বর্ণিত অভিজ্ঞতাটি হচ্ছে। এই মুহূর্ত্তকালের জন্য অসংশোধনযোগ্য বচনের আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারে দীর্ঘস্থায়ী কিছু সংযোজন করার মত কোন যোগ্যতা নেই।

৩.৮ সংশয়বাদী যুক্তিসমূহ (Sceptical Arguments)

সংশয়বাদীদের সংশয়ের বিষয় এমন কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে সমস্ত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি সমূহকে সহজে অগ্রাহ্য করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, তাদের সন্দেহের বিষয়গুলি হল আমাদের জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস, বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্ব সমূহের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস, অপরের মনের অস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস অথবা অতীত সংক্রান্ত বিশ্বাস। সংশয়বাদীদের যুক্তি হল যে এগুলিরর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা যে অনুমান সমূহের উপর নির্ভর করি সেই অনুমানগুলি অবৈধ। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, যে কিভাবে আমরা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বহির্জগতের বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি, কিভাবে সাধারণ বুদ্ধির জগৎ থেকে বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্ব সমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, অপরের বাহ্যিক আচার আচরণ থেকে তার আভ্যন্তরীণ, চিন্তা, ইচ্ছা, অনুভূতি সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি এবং কিভাবেই বা বর্তমান কালের ঘটনা বিষয়ক জ্ঞান থেকে অতীত সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

৩.৮.১ সংশয়বাদী যুক্তিসমূহের ধরন (The Pattern of Sceptical Arguments)

সংশয়বাদীগণ আমাদের জ্ঞান— যেমন, জড়বস্তুর অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্বসমূহের অস্তিত্ববিষয়ক জ্ঞান, অন্যের মন বা মানসিক পর্যায় বিষয়ক জ্ঞান অথবা অতীত সংক্রান্ত জ্ঞান ইত্যাদির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁদের মতে এই দৃষ্টান্তগুলি মূলতঃ এক ধরনের অনুমানভিত্তিক জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এই অনুমানগুলি যথার্থ কি না—এই বিষয়ে সংশয়বাদীগণ সংশয় পোষণ করেন। তাঁদের মতে এইরূপ

অনুমানগুলির ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যসমূহ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্পর্কটি যথাযথ নয়। তবে সংশয়বাদীদের সংশয়ের বিভিন্ন দৃষ্টান্তগুলির বেলায় সমস্যাগুলি ও সেই সমস্যা সংক্রান্ত যুক্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের যুক্তিগুলির ধরন প্রতিটি ক্ষেত্রে একই প্রকার। অধ্যাপক A. J. Ayer সংশয়বাদী যুক্তিগুলির চার ধরনের পর্যায়ের কথা বলেছেন।

সংশয়বাদীদের যুক্তির প্রথম পর্যায়টিতে বলা হয় যে উপরোক্ত অনুমান সমূহের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকে পাওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাক্যের উপর নির্ভর করি। যেমন বলা হয় যে (বর্হিজগতের) বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে জানতে হলে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অর্থাৎ জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে জানার জন্য একমাত্র উপায় হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি। কিন্তু এই অনুমান নির্ভর জ্ঞানের আশ্রয়বাক্যসমূহ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত হলেও সিদ্ধান্ত কখনই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত নয়। সিদ্ধান্ত হল ভিন্ন স্তরের—বর্হিজগতের বস্তু বিষয়ক। অনুরূপভাবে বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্বসমূহ যেমন এটম্, ইলেকট্রন ইত্যাদি আমরা অভিজ্ঞতার দ্বারা জানতে পারি না, এগুলি সম্বন্ধে আমরা জানি অনুমানের সাহায্যে। দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা এদের কার্যকারিতা জানতে পারি এবং ঐ সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। স্পষ্টতঃই সাধারণ অভিজ্ঞতা বিষয়ক বিবৃতিগুলি অর্থাৎ আশ্রয়বাক্যগুলি বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্বসম্বন্ধীয় বিবৃতি অর্থাৎ সিদ্ধান্ত থেকে পৃথক স্তরের। আবার আমরা যখন অপরের মন সম্বন্ধীয় তথ্যাদি জানার দাবি করি তখন তা করি তার বাহ্যিক আচার আচরণ বা তার দৈহিক পর্যায় সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে। এক্ষেত্রেও একজনের দৈহিক পর্যায় সংক্রান্ত অথবা বাহ্যিক আচার-আচরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি (আশ্রয়বাক্য সমূহ) এবং তার মানসিক পর্যায় সংক্রান্ত তথ্যাদি (সিদ্ধান্ত) কখনই এক স্তরভুক্ত নয়। অতীত সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত তথ্য জানি বলে দাবি করি (সিদ্ধান্ত) তা করি বর্তমানে প্রাপ্ত তথ্যাদির (আশ্রয়বাক্য) ভিত্তিতে। সুতরাং এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রমাণাদি বা আশ্রয়বাক্য সংক্রান্ত আমাদের যে জ্ঞান তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত জ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ (বা সরাসরি) সম্পর্ক নেই।

সংশয়বাদী যুক্তির দ্বিতীয় পর্যায়টিতে দেখানো হয় যে পূর্বোক্ত অনুমানগুলির ক্ষেত্রে যুক্তিবাক্যসমূহের থেকে সিদ্ধান্ত অবরোহ পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয় না। যেমন, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ — তা যতই বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হোক না কেন তার থেকে কখনই একথা নিঃসৃত হয় না যে বর্হিজগতের বস্তু অস্তিত্বশীল। বিজ্ঞান স্বীকৃত তত্ত্ব সমূহের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিবৃতি গুলি তাদের কার্যসমূহ সংক্রান্ত বিবৃতি থেকে অবরোহ মূলক ভাবে নিঃসৃত হয় না। একজনের দৈহিক আচার আচরণ ও পর্যায় সংক্রান্ত বিবৃতি থেকেও, অবরোহের নিয়ম অনুযায়ী, তার কোন মানসিক পর্যায় সংক্রান্ত বিবৃতি নিঃসৃত করা যায় না। একইভাবে বর্তমানের কোন সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে অতীতের ঘটনা বিষয়ক কোন বিবৃতির সত্যতা অবরোহ অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে যে আশ্রয়বাক্যগুলি সত্য অথচ সিদ্ধান্ত মিথ্যা। অর্থাৎ যুক্তিবাক্যগুলি থেকে সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় না।

তৃতীয় পর্যায়ে সংশয়বাদীগন দেখাতে চান যে এই অনুমানগুলি আরোহমূলকও নয়। আরোহ অনুমানের সাহায্যে আমরা অবশ্য কখনও কখনও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যা বাস্তব কোন কারণ বশতঃ বর্তমানে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নয়। কিন্তু বর্হিজগতের বস্তু সম্বন্ধীয় ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কোন কালেই সম্ভব নয়। সেই কারণেই কোন কোন দার্শনিক এইরূপ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন,

এমনকি এইরূপ বস্তু বিষয়ক কোন সিদ্ধান্তকে তাঁরা অর্থহীন বলেন। তবে অর্থহীন না বললেও অন্ততঃ এটুকু বলা যায় যে এইরূপ সিদ্ধান্তের কোন আরোহমূলক ভিত্তি নেই। আরোহ মূলক অনুমান একটি নির্দিষ্ট স্তরে আমাদের অগ্রসর হতে সাহায্য করে। কিছু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আমরা আরোহ অনুমানের ভিত্তিতে কিছু অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত বচন অনুমান করতে পারি। কোন একজন ব্যক্তির কিছু বাহ্যিক আচার-আচরণ জানা থাকলে তার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে কোন একটি পরিস্থিতিতে সে কিরূপ আচরণ করবে তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু আরোহ অনুমানের সাহায্যে আমরা কখনই কোন একটি বিশেষ স্তর থেকে অপর একটি স্তরে পৌঁছাতে পারি না। যেমন, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক আচার -আচরণ সংক্রান্ত জ্ঞান এর ভিত্তিতে তার মন বা মানসিক পর্যায় সম্বন্ধীয় জ্ঞান আরোহ অনুমানের দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়।

সংশয়বাদীদের যুক্তির শেষ পর্যায়ে (চতুর্থ পর্যায়ে) বলা হয় যে উক্ত অনুমানগুলি যেহেতু অবরোহমূলক বা আরোহমূলক নয়, এগুলির কোন যৌক্তিকতাই নেই। এই ধরনের অনুমানগুলি অনুমান হিসাবে গ্রাহ্য নয়। বর্তমান কালের ঘটনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অতীত কালের ঘটনা সম্বন্ধে অনুমান করতে পারি না, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক আচার-আচরন সংক্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা তার মন বা মানসিক পর্যায় সম্বন্ধে কিছু জানার দাবি করতে পারি না; আমাদের ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা জড় বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে কিছুই অনুমান করতে পারি না।

সংশয়বাদীদের যুক্তির এই প্রতিটি পর্যায়ে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হল এই যে উপরোক্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যে সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আমরা জানি বলে দাবি করি সেই সাক্ষ্যপ্রমাণ গুলি উপযুক্ত ধরণের নয়। অর্থাৎ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছি, সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি ও সেই সিদ্ধান্তের মধ্যে কিছু ফাঁক বা ব্যবধান আছে।

৩.৮.২ সংশয়বাদীদের মোকাবিলা করার বিভিন্ন উপায় (Different Methods of Answering the Sceptics)

বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় সংশয়বাদীদের যুক্তির বিভিন্ন পর্যায়কে খণ্ডন করেন।

সংশয়বাদী যুক্তির প্রথম পর্যায়টির মোকাবিলা করে যে দার্শনিক মতবাদ তার নাম লৌকিক বস্তুবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ একথা স্বীকার করেন না যে উল্লিখিত অনুমান সমূহের ক্ষেত্রে যুক্তি বাক্যের সঙ্গে সিদ্ধান্তের কোন সরাসরি সম্বন্ধ নেই। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা বলেন যে জাগতিক বস্তু সমূহ (physical objects) সরাসরি প্রত্যক্ষযোগ্য, তাছাড়া তাঁদের মতে এরূপ চিন্তার মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই যে 'এ্যটম' বা 'ইলেকট্রন' এর মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষযোগ্য হবে, অথবা বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে অপরের মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে এবং স্মৃতির সাহায্যে সরাসরি অতীতের জ্ঞানলাভ সম্ভব হবে।

অবহ্রাসবাদী বা রূপান্তরবাদী (reductionists) দার্শনিকগণ সংশয়বাদী যুক্তির প্রথম পর্যায়টিকে অস্বীকার না করলেও, দ্বিতীয়টিকে অস্বীকার করেন। তবে সংশয়বাদী যুক্তিতে উল্লিখিত অনুমানগুলির যুক্তিবাক্যসমূহের সঙ্গে সিদ্ধান্তের যে ব্যবধান বা ফাঁকের কথা বলা হয় সেই ব্যবধানটি লৌকিক বস্তুবাদ

এবং অবহ্রাস বা রূপান্তরবাদ এই দুই মতবাদই কমানোর চেষ্টা করেন। রূপান্তরবাদ বা অবহ্রাসবাদ অনুযায়ী জাগতিক বস্তুসমূহ (physical objects) ইন্দ্রিয় উপাত্ত সমূহ দ্বারা যৌক্তিকভাবে গঠিত (logical constructs)। তাঁদের মতে ব্যক্তির মন বা মানসিক পর্যায় সংক্রান্ত বিবৃতি সমূহ তার বাহ্যিক আচরণ সংক্রান্ত বিবৃতির সাহায্যে অনুবাদযোগ্য (বা রূপান্তর যোগ্য)। অনুরূপভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসংক্রান্ত বিবৃতিসমূহ ঐ তত্ত্ব সমূহের কার্য (effect) সংক্রান্ত বিবৃতির সাহায্যে অনুবাদযোগ্য বা রূপান্তরযোগ্য এবং এই শেষোক্ত বিবৃতিগুলি অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা যাচাই করতে পারি। একইভাবে তাঁরা বলেন যে অপরের মন সংক্রান্ত বিবৃতিগুলিকে ব্যক্তির (অথবা ব্যক্তি সমূহের) বাহ্যিক আচরণ সংক্রান্ত বচনে রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং অতীতের ঘটনাবলী সংক্রান্ত বিবৃতিগুলিকেও বর্তমান কালের এবং ভবিষ্যৎ কালের ঘটনা সংক্রান্ত বিবৃতির সাহায্যে অনুবাদ করা সম্ভব। এবং এই রূপান্তরিত বা অনুদিত বিবৃতিগুলি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

সংশয়বাদীদের যুক্তির তৃতীয় পর্যায়টিকে খন্ডন করেন বৈজ্ঞানিক মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগন (Scientific approach)। এঁরা সংশয়বাদী যুক্তির প্রথম দুটি পর্যায়ের যৌক্তিকতা স্বীকার করলেও তৃতীয় পর্যায়টিকে অস্বীকার করেন। তাঁরা একথা মানেন যে সংশয়বাদীগণ সঠিক ভাবেই উল্লিখিত যুক্তিগুলিতে যুক্তিবাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যে একটি ফাঁক আছে তা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতবাদ্ অনুযায়ী এই ফাঁকটি পূরণ করা সম্ভব আরোহ যুক্তির সাহায্যে। তাঁদের মতে বস্তুবাদীরা যেমন বলেন যে জড়দ্রব্য সরাসরি আমরা প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতার সাহায্যে জানতে পারি, প্রকৃতপক্ষে আমরা সেভাবে জানতে না পারলেও এগুলিকে আমরা পরোক্ষভাবে জানতে পারি আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কারণ হিসাবে। স্মৃতির উপাদানগুলিও যে সমস্ত সম্ভাব্য প্রকল্পের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব তা হল অতীতের ঘটনাবলীর বাস্তব সংঘঠন; এবং আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা অনুভূতির অভিজ্ঞতার থেকে সাদৃশ্যনুমানের সাহায্যে অপরের চিন্তা বা অনুভূতির কথাও আমরা বলতে পারি।

পরিশেষে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণের পদ্ধতির সাহায্যে (by the method of descriptive analysis) সংশয়বাদী যুক্তির একপ্রকার মোকাবিলা করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সংশয়বাদীদের যুক্তির যুক্তিবাক্য বিষয়ে জোর দেওয়া হয় না বা যুক্তিবাক্যের সঙ্গে সিদ্ধান্তের যে ফাঁক সেই বিষয়েও কিছু বলা হয় না। এবং এই পদ্ধতি একথাও স্বীকার করে যে উল্লিখিত যুক্তিগুলি আরোহমূলক অথবা অবরোহমূলক কোনটিই নয়। কিন্তু তার জন্য উল্লিখিত যুক্তিগুলি নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না।এগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখানো যায় যে আমরা নিশ্চিতভাবে জড়বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমরা অপরের চিন্তা, অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি বিভিন্ন প্রকার অতীত সংক্রান্ত তথ্যাদি যথার্থই স্বীকার করে নিই। অর্থাৎ এই ভাবে আমরা দৈনিন্দিন জীবনে কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করি। যদিও এই অনুসৃত পদ্ধতিগুলির যৌক্তিকতা কোন ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় অথবা আবশ্যিক নয়। এঁদের মতে সংশয়বাদীদের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয় কারণ এই সমস্যাগুলির বাস্তবানুগ নয়।

৩.৯ সারসংক্ষেপ (Summary)

সংশয়বাদ হল সংশয় অথবা সন্দেহ করার প্রবণতা, এই সংশয় সমস্ত বিষয় সংক্রান্তও হতে পারে অথবা একটি বিশেষ পরিসীমা বা গন্ডীর মধ্যেও আবদ্ধ থাকতে পারে। এই মতবাদ অনুযায়ী যে কোন সাধারণভাবে গ্রাহ্য অথবা প্রতিষ্ঠা করার যোগ্য জ্ঞান অনিশ্চিত। এই মতবাদ এই সংশয় পোষণ করে যে মানুষের পক্ষে আদৌ কোন সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব কি না। তাঁরা স্বীকৃত সমস্ত সূত্র , যৌক্তিকতার সমস্ত মানদন্ড বিষয়েই প্রশ্ন তোলে এবং এগুলি আদৌ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। এই কারণে তাঁদের মতে জ্ঞান আদৌ সম্ভব নয়, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা জানি বলে দাবি করি তার বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা জানি না।

৩.১০ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions) :

1. What is sceptism? State and explain the following two sceptical arguments :

   a) The argument concerning brains in vats

   b) The argument from error

2. What is philosophical scepticism? State and explain the difference between philosophical and scientific scepticism.

3. What is philiosophical scepticism? Analyse the patterns of sceptical argu ments.

4. Explain after Ayer, the precise nature of philosophical scepticism. Ellucidate the remark : 'If experience cannot justify the sceptic, neither can it refute him.'

5.a) Distinguish between philosophical and scientific scepticism.

   b) On what ground does Ryle attempt to refute philosophical sceptism?

   c) How does Ayer reply to Ryle?

6. "The quest for certainly has played a considerable part in the history of philosophy"

   a) What is the nature of the 'quest' referred to above?

   b) Explain clearly the nature of certainty with reference to *a priori* statements.

7. Do the sentences like 'I exist' or 'I am conscious' express genuine propositions? Answer after Ayer.

8. Does the Cartesian 'I think, therefore I am' represent a statement that is beyond doubt? Discuss with reference to Ayer's views.

9. a) What is a basic proposition ?

   b) What constitutes the 'evidence' in the case of such a proposition?

   c) Why does Ayer think that such propositions may be doubted?

10. What are basic statements ? In what sense are they held to be 'incorrigible' ? Discuss, after Ayer.

11. Is it possible to have statements which are informative and are at the same time incorrigibly known? Discuss with reference to Ayer.

12. Are 'I think' and 'I exist' truths of logic? Do you think that these sentences express genuine propositions?

13. Analyse the pattern of sceptical arguments. What are the different methods of answering the sceptics?

৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography)

1. A.J Ayer, *The Problem of Knowledge*, Penguin Books, 1956.
2. A.J Ayer, *Philosophical Essays*, Macmillan, 1969.
3. Dancy, *An Introduction to Contemporary Epistemology*, Oxford, Blackwell, 1985.
4. A.J Ayer, *The Foundations of Empirical Knowledge*, Macmillan, 1940.

চতুর্থ পাঠ (Unit IV)

জানার দাবির যৌক্তিকতা (Justification of Knowledge Claims)

পাঠ সংকেত

৪.০ উদ্দেশ্য (Aim)

৪.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

৪.২ ভিত্তিবাদ (Foundationalism)

৪.২.১ অনবস্থা দোষ সংক্রান্ত যুক্তি (The Regress Argument)

৪.২.২ ভিত্তিবাদের প্রকার (Types of Foundationalism)

৪.২.৩ সমালোচনা (Criticism)

৪.৩ সংগতিবাদ (Coherentism)

৪.৩.১ যৌক্তিক সম্পর্ক হিসাবে সংগতির সম্পর্ক (The Relation of Coherence as a Logical Relation)

৪.৩.২ সংগতিবাদের প্রকার (Types of Coherentism)

৪.৩.৩ সমালোচনা (Criticism)

৪.৪ নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliabilism)

৪.৪.১ নির্ভরযোগ্যতাবাদের প্রকার (Types of Reliabilism)

৪.৪.১.১ সূচক নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliable Indicator Theories)

৪.৪.১.২ প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliable Process Theories)

৪.৪.১.৩ আর্মস্ট্রং এর নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Armstrong's Account of Reliabilism)

৪.৪.২ সমালোচনা (Criticism)

৪.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions)

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

৪.০ উদ্দেশ্য (Aim)

পূর্বের অধ্যায়টিতে আমরা সংশয়বাদীদের দার্শনিক মত, তাদের যুক্তি ইত্যাদি আলোচনা করেছি। আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারা সংশয়বাদীদের এই বক্তব্য সমর্থন করতে পারি না যে জ্ঞান সম্ভব নয়। সাধারণ বুদ্ধি মতবাদ এই কথা স্বীকার করে নেয় যে আমরা জানি, জ্ঞান সম্ভব এবং বাস্তব জীবনে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাসের অবদান অনস্বীকার্য। বহু বিখ্যাত দার্শনিকও এই মত পোষণ করেন যে আমাদের বিশ্বাসসমূহের মধ্যে যেমন কিছু অযৌক্তিক বিশ্বাস আছে তেমনি কোন কোন বিশ্বাস অবশ্যই যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস। সাধারণ মানুষ অবশ্য এই প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত নয় যে একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত কখন হতে পারে অথবা বিশ্বাসের যৌক্তিকতার উপযুক্ত মানদণ্ড কি। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাভাবনায় এই প্রশ্নগুলি জ্ঞানবিদ্যার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বলা যেতে পারে মূলতঃ এই প্রশ্নগুলি জ্ঞানবিদ্যায়, বিশেষতঃ জ্ঞান এর সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে। যখন আমরা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে বলি যে, সে P বচনটি জানে তখন আমরা স্বীকার করে নিই যে ঐ ব্যক্তির বচনটির সম্বন্ধে বিশ্বাস অবশ্যই যুক্তিযুক্ত এবং সত্য। যুক্তিযুক্ত হওয়ার ধারণা এবং সত্যতার ধারণা উভয়ই ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective)। জানার ক্ষেত্রে সত্যতার একটি অনস্বীকার্য ভূমিকা আছে। আমাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সত্যতার মধ্যে যৌক্তিকতা মধ্যস্থতার কাজ করে বলে কোন কোন দার্শনিক মনে করেনন।

The basic role of justificaton is that of a *means* to truth, a more directly attainable mediating link between our subjective starting point and our objective goals.

৪.১ প্রস্তাবনা (Preamble)

প্রাচীন বা সাবেকী জ্ঞানবিদ্যায় বাচনিক অর্থে জানবার যে তিনটি আবশ্যিক শর্তের কথা বলা হয়েছে তাদের অন্যতম একটি শর্ত হল যুক্তিযুক্ত হওয়ার শর্ত বা যৌক্তিকতার শর্ত। জ্ঞান হল যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস।

কেবলমাত্র সত্য বিশ্বাস কখনই জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না যদি তা যুক্তিযুক্ত না হয়। এই কারণে বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়ার বিষয়টি জ্ঞানবিদ্যায় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। সংশয়বাদীগণ যখন বলেন যে আমরা আদৌ কিছু জানি না বা জানতে পারি না, অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা জানি বলে দাবি করি তার সব ক্ষেত্রে আমরা জানি না—তখন তাঁরা আসলে বলতে চান যে ঠিক যতখানি যুক্তিযুক্ত হলে আমরা জানি বলে দাবি করতে পারি ততখানি যুক্তিযুক্ত আমরা কখনই হতে পারি না। 'যুক্তিযুক্ত' সত্য বিশ্বাস যে জ্ঞান এই বিষয়ে কোন দ্বিমত পোষণ না করলেও সংশয়বাদীদের বক্তব্য হল যে যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ততার শর্তটি পূরণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি সেগুলিতে আসলে ঐ শর্তটি পূরণ হয় না। এই বিষয়টিকে A. J. Ayer তাঁর *The Problem of Knowledge* বইয়ে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করেছেন :

"What the sceptic contends is that our markings are two high, that the grounds on which we are normally ready to concede the right to be sure are more worthless than we think;....." (P 35).

অর্থাৎ যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা সাধারণত একটি সত্য বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিই সেই সাক্ষ্যপ্রমাণগুলি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলিকে আমরা যতখানি গুরুত্ব দিই এগুলি ততখানি গুরুত্ব পাবার যোগ্য নয়।

সুতরাং জ্ঞানবিদ্যায় যুক্তিযুক্ততা বিষয়ক প্রশ্নগুলি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রশ্নগুলি হল নিম্নলিখিতরূপ : আমরা কি আদৌ কোন একটি বিশ্বাস সম্বন্ধে ততখানি যুক্তিযুক্ত হতে পারি যতখানি যুক্তিযুক্ত হলে আমরা জানি বলে দাবি করতে পারি? কখন আমরা বলতে পারি যে কোনো একটি বিশ্বাস সম্বন্ধে একজন যুক্তিযুক্ত (One is justified in believing a proposition)?

এই পাঠটিতে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে দ্বিতীয় প্রশ্নটি। এই প্রশ্নটির উত্তর যৌক্তিকতা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দিয়েছে। এই মতবাদগুলি বা তত্ত্বগুলি আমরা এখন আলোচনা করব।

৪.২ ভিত্তিবাদ (Foundationalism)

ভিত্তিবাদ অনুযায়ী আমাদের কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসের ভিত্তি বা foundation হল অপর কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস। অর্থাৎ কিছু কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস আছে যেগুলির যৌক্তিকতা অপর কিছু যৌক্তিক বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত হয়। এই মতবাদ অনুসারে আমাদের যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস সমূহের মধ্যে দু'ধরনের বিশ্বাস আছে : ১) কতকগুলি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস যাদের যৌক্তিকতা পরোক্ষভাবে প্রতিপন্ন হয় (Those beliefs which are mediately justified) এবং ২; কতকগুলি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস যাদের যৌক্তিকতা সরাসরি প্রতিপন্ন হয় বা সাক্ষাৎভাবে প্রতিপন্ন হয় (Those beliefs which are immediately justified)। এগুলির মধ্যে দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসগুলিকে বলা হয় মৌলিক বিশ্বাস (basic belie)। এই ধরনের বিশ্বাসের যৌক্তিকতা অন্য কোনো বিশ্বাসের যৌক্তিকতা থেকে নিঃসৃত হবার অপেক্ষা রাখে না। এগুলি নিজে নিজেই যুক্তিযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ 'তোমাকে দেখে অসুস্থ মনে হচ্ছে' - আমার এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা আমার অন্য কোনো বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। এর যৌক্তিকতা নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র আমি তোমাকে কেমন দেখছি তার দ্বারা। অনুরূপ ভাবে "২+৩=৫" — আমার এই বিশ্বাসটির যৌক্তিকতাও সাক্ষাৎভাবে আমার কাছে প্রতিপন্ন হয়। মৌলিক বিশ্বাসগুলি আমাদের অন্যান্য যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস সমূহের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। অপরপক্ষে, প্রথম ধরনের যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসগুলি অ-মৌলিক (non-basic) বিশ্বাস, কারণ এই বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা মৌলিক নয়, অর্থাৎ এগুলির যৌক্তিকতা অপর কিছু যৌক্তিক বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক কালের প্রখ্যাত ভিত্তিবাদী দার্শনিক Roderick M. Chisholm-এর মতে সাক্ষাৎ যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস বা মৌলিক বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা পুনরাবৃত্তির (reiteration) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, 'আমার মনে হচ্ছে যে আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে' - আমার এই বিশ্বাসটির যৌক্তিকতা কেবলমাত্র এই ঘটনাটির দ্বারা নির্ধারিত হয় যে আমার মনে হচ্ছে যে আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মৌলিক বিশ্বাস সমূহের একটি শ্রেণী (A class of basic belief) আছে বলে স্বীকার করে নেওয়াই হল ভিত্তিবাদ বা Foundationalism-এর বৈশিষ্ট্য। কারণ বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধীয় আর একটি মতবাদ Coherentism বা সংগতিবাদও একথা স্বীকার করে যে আমাদের কিছু বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নির্ভর করে সেগুলি কিভাবে অন্য কিছু বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত তার উপর। কিন্তু যৌক্তিক বিশ্বাস সমূহের ভিত্তি হিসাবে এক প্রকার মৌলিক বিশ্বাস আছে একথা সংগতিবাদ বা coherentism স্বীকার করে না।

৪.২.১ অনবস্থা দোষ সংক্রান্তর যুক্তি (The Regress Argument)

ভিত্তিবাদের সমর্থকগণ তাঁদের মতবাদের সমর্থনে একটি যুক্তি প্রদান করেন যেটিকে বলা যায় অনবস্থা দোষ সংক্রান্তর যুক্তি। যুক্তিটি নিম্নরূপ :

ভিত্তিবাদ অনুযায়ী আমাদের যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা কোন না কোন যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত হয়। একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা যে বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত হচ্ছে সেই বিশ্বাসটিকেও আবার আর একটি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস দ্বারা যৌক্তিকভাবে সমর্থিত হতে হয়। প্রতিটি বিশ্বাসকেই যদি আর একটি বিশ্বাস দ্বারা সমর্থিত হতে হয় তাহলে একটি অনন্তর শৃঙ্খল তৈরি হবে যাকে বলা হয় অনবস্থা দোষ। এই অনবস্থা দোষটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ভিত্তিবাদীগণ এমন কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস আছে বলে স্বীকার করেন যেগুলির আর অপর যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস দ্বারা যৌক্তিক ভাবে সমর্থিত হবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ এই বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা অন্য কোন যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত হয় না এগুলি নিজে নিজেই যুক্তিযুক্ত। এগুলিই হল মৌলিক বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে John Pollock লিখেছেন - "It is the existence of epistemologically basic beliefs that distinguishes foundational theories from coherence thories. Basic beliefs must be justified independently of reasoning, if a belief can only be justified through reasoning, its justfication is dependent on the justification of the beliefs from which the reasoning proceeds, and hence , by definition , it is not a basic belief. অর্থাৎ জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে মৌলিক বিশ্বাসের অস্তিত্ব সঙ্গতিবাদ থেকে ভিত্তিবাদকে পৃথক করে। মৌলিক বিশ্বাসগুলি কোন যুক্তির উপর নির্ভর না করেই যুক্তিযুক্ত। কোন না কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে যে সমস্ত বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নির্ধারিত হয় সেগুলি মৌলিক বিশ্বাস হতে পারে না। কারণ সেগুলির যুক্তিযুক্ত হওয়া নির্ভর করে অপর কোন যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসের উপরে।

এই মতবাদ অনুযায়ী প্রতিটি অমৌলিক যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস একটি পিরামিডের শীর্ষবিন্দুর সঙ্গে তুলনীয়, যে পিরামিডের ভিত্তি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ও সুনিশ্চিত।

এই বিষয়ে Anthony Quinton এর মত নিম্নরূপ : "If any beliefs are to be justifed at all... there must be some terminal beliefs that do not owe their credibility to others. For a belief to be justified it is not enough for it to be accepted, let alone merely entertained : there must

also be good reason for accepting it. Furthermore, for an inferential belief to be justified the beliefs that support it must be justified by themselves. There must, therefore, be a kind of belief that does not owe its justification to the support provided by others. Unless this were so, no belief would be justified at all, for to justify any belief would require the antecedent justification of an infinite series of beliefs".

তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হল যে কোন বিশ্বাসকে যুক্তিযুক্ত হতে হলে কিছু প্রান্তিক বিশ্বাস থাকতে হবে যেগুলির গ্রহণযোগ্যতা অন্য কোন বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা যদি অপর একটি বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে শেষের বিশ্বাসটিরও যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শেষ পর্যন্ত এমন কিছু বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যেগুলির যৌক্তিকতা অন্য কোন বিশ্বাস দ্বারা সমর্থিত হবার অপেক্ষা রাখে না। তা না হলে কোনদিনই কোন বিশ্বাসের যৌক্তিকতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, কারণ একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার পূর্ববর্তী কোন না কোন বিশ্বাসের প্রয়োজন হবে যেটির যৌক্তিকতা অপর আর একটি বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। এইভাবে একটি অনন্ত শৃঙ্খল (infinite series)-এর সূচনা হবে।

এইরূপ একটি অনন্ত শৃঙ্খলের সম্ভাবনাকে অথবা অনবস্থা দোষের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করার জন্য সংশয়বাদীদের বিপক্ষে ভিত্তিবাদী দার্শনিকগণ বলেন যে আমাদের জ্ঞান কিছু মৌলিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মৌলিক সত্যগুলি আমাদের সমস্ত জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে ইদানিং কালে একজন ভিত্তিবাদী দার্শনিক হিসাবে Roderick M. Chisholm এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অভিজ্ঞতা লব্ধ বচনগুলিকে directly evident বা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রমাণিত বচন এবং বা পরোক্ষভাবে গ্রহণযোগ্য সত্য হিসাবে প্রমাণিত বচন এই দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণযোগ্য বচনগুলি হল স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বতঃপ্রামাণ্য। এগুলির সত্যতা অন্য কোন বচনের উপর নির্ভর করে না। Chisholm লিখেছেন - "We might think of the directly evident as that which constitutes is own evidence for we have characterized it in terms of what is self presenting, in terms of that which is apprehended through itself". অর্থাৎ "directly evident" বচনগুলি হল যেগুলি স্বতঃ প্রামাণ্য এই অর্থে যে এর নিজের মধ্যেই নিজের সাক্ষ্য প্রমাণ নিহিত আছে এবং এগুলির সত্যতা এগুলির মধ্যে দিয়েই জানা যায়।

৪.২.২ ভিত্তিবাদের প্রকার (Types of Foundationalism)

বিভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিত্তিবাদী মত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে কিছু পূর্বতঃসিদ্ধ সত্য বা যৌগিক সত্যের অনুসন্ধান করেছেন। যেমন Descartes এই মত প্রকাশ করেছেন যে যথার্থ জ্ঞান এমন কিছু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

হবে যা সন্দেহের উর্দ্ধে এবং যার সম্বন্ধে আমাদের ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

Locke যদিও একজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ছিলেন, তাহলেও তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে উন্নত ধরনের জ্ঞান আমরা পাই সজ্ঞা থেকে (intuitive knowledge) এবং অবরোহ পদ্ধতির দ্বারা ঐ জ্ঞান থেকে নিঃসৃত ও প্রমাণিত সত্য থেকে (demonstrative knowledge) ।

অপরপক্ষে অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ আমাদের সমস্ত জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বহু যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে কিছু অমাধ্যম, সরল ও প্রান্তিক অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এইরূপ অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতিগুলিকে basic statement বা মৌলিক বিবৃতি বলা হয়।

এই মৌলিক বিবৃতিগুলিকে কোন কোন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী ভ্রান্তির সম্ভাবনা মুক্ত (infallible) বলেছেন। আবার কোন কোন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী ভ্রান্তির সম্ভাবনা যুক্ত (fallible) বলেছেন। সেই কারণে দুই ধরনের ভিত্তিবাদ (foundationalism) এর উৎপত্তি হয়, fallible foundationalism এবং infallible foundationalism। উদাহরণ স্বরূপ, Moritz Schlick ভিত্তিবাদের সমর্থনে একধরনের কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ বচনের কথা বলেছেন যেগুলি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত (absolutely certain) এবং সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তির সম্ভাবনা মুক্ত (infallible and incorrigible) । এই ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বচনের উদাহরণ হল 'Here now F'। এখানে 'Here now' এই অভিব্যক্তিটি অভিজ্ঞতার পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে এবং বিধেয়টি বা 'F' ঐ অভিজ্ঞতাটির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ এই বিবৃতিগুলি Schlick এর মতে সত্য বই মিথ্যা হতে পারে না। এই ধরনের বাক্যগুলির অর্থ বোধগম্য হওয়া আর এগুলির সত্যতা উপলব্ধি হওয়া একই কথা। এখানে লক্ষণীয় যে Descartes প্রমুখ দার্শনিকগণও যৌক্তিক বিশ্বাস-এর ভিত্তি হিসাবে এমন একটি সত্যের সন্ধান করেছিলেন যা সন্দেহের অতীত এবং ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত। এই ধরনের ভিত্তিবাদী দার্শনিক (যাঁরা বলেন মৌলিক বিশ্বাসগুলি ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত) মতবাদ হল চরম বা কঠোর ভিত্তিবাদ। (Infallible foundationalism or radical foundationalism)

অপেক্ষাকৃত নরম ভিত্তিবাদ (Modest foundationalism) শুধুমাত্র বলে যে মৌলিক বিশ্বাসগুলির যৌক্তিকতা অপর কোন যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না, এগুলির যৌক্তিকতা নিজে নিজেই প্রতিপন্ন হয় (self justified)। কিন্তু এই মৌলিক বিশ্বাসগুলি, যেগুলি অন্যান্য বিশ্বাস সমূহের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করে, সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত (certain)– ভ্রান্তির সম্ভাবনা রহিত (infallible or incorrigible) হতেই হবে একথা এই মতবাদ বলে না। এই ধরনের মতবাদ আমরা পাই যাদের বক্তব্যে তাদের মধ্যে একজন হলেন Nelson Goodman। তাঁর মতে, "To say that some statements must be initially credible if any statement is even to be credible at all is not to say that any statement is immune from withdrawal" অর্থাৎ কোন বিবৃতিকে মৌলিক বিবৃতি বলার অর্থ এই নয় যে এগুলি সংশোধনের (বা প্রত্যাহার করার) উর্দ্ধে।

৪.২.৩ সমালোচনা (Criticism) :

Foundationalism বা ভিত্তিবাদের সমর্থকগণ আমাদের যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস সমূহকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেন। কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস (মৌলিক বিশ্বাস সমূহ) ভিত্তির স্তরভূক্ত আবার অন্য কিছু (অ-মৌলিক) বিশ্বাস প্রথম স্তরের বিশ্বাসগুলির দ্বারা সমর্থিত হওয়ার কারণে যুক্তিযুক্ত। অনুরূপভাবে আরও কিছু যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস দ্বিতীয় স্তরের বিশ্বাস দ্বারা সমর্থিত হতে পারে এবং এই প্রক্রিয়াটি এই ভাবে চলতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস সমূহের মধ্যে এই সমর্থিত হওয়ার সম্পর্কটি একমুখী (Asymmetric)। ভিত্তিবাদের সমালোচকগণ মূলতঃ দুটি দিক থেকে এই মতবাদের সমালোচনা করেন। একটি হল তাঁরা কোন মৌলিক বিশ্বাস আছে একথা স্বীকার করতে চান না।

বিখ্যাত দার্শনিক Quine মনে করেন যে কোন একটি বচন সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে কেবল একটি তন্ত্র (System of belief) বা ভাষা (System of language) র প্রেক্ষিতে। কাজেই কোন মৌলিক বচন নেই এই অর্থে যে ঐ তন্ত্র বা ভাষা নিরপেক্ষভাবে কোন বচনই নিজে নিজে সত্য বা মিথ্যা অথবা গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

এছাড়াও ভিত্তিবাদের সমালোচকগণ মনে করেন যে আমাদের বিশ্বাসসমূহের মধ্যে সমর্থিত হওয়ার সম্পর্কটি একমুখী (Asymmetric) নয় পরস্পরমুখী বা পারস্পরিক (Symmetric)।

৪.৩ সংগতিবাদ (Coherentism)

Coherence theory বা সংগতিবাদ অনুযায়ী একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত বলতে বোঝায় যে ঐ বিশ্বাসটি আমাদের অন্যান্য যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস সমূহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে স্পিনোজা, লাইবনিজ, হেগেল এবং ব্রাডলি প্রমুখ দার্শনিকগণ সংগতিবাদের প্রবক্তা এবং পরবর্তী কালে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মধ্যে Otto Neurath, Carl Hempel প্রমুখ দার্শনিকগণ এই মত সমর্থন করেন। বর্তমানকালে Keith Lehrer হলেন সংগতিবাদের একজন উল্লেখযোগ্য প্রবক্তা। সংগতিবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসসমূহ সমমর্যাদাসম্পন্ন এই অর্থে যে কোন একটিকে আমরা নিজে নিজে যুক্তিযুক্ত (self-justified or self evident) বলতে পারি না। অথবা কোনো বিশ্বাস মৌলিক এবং কোনো বিশ্বাস অমৌলিক এমন নয়। সমস্ত বিশ্বাসসমূহ মিলে একটি তন্ত্র বা system গঠিত হয় যেখানে বিশ্বাসগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত থাকে যে কোন একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবার জন্য অন্যগুলির উপর নির্ভর করে। এই বিষয়ে von Wright লিখেছেন "There is nothing other than one's belief to which one can appeal in the justification of belief. There is no exit from the circle of one's beliefs." একটি তন্ত্রের বাইরে একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতার আলোচনা অর্থহীন। এই কারণে কোনো একটি বিশ্বাস অন্যগুলি ব্যাতিরেকে নিজে নিজে সত্য বা যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। কারণ একটি তন্ত্রের অন্তর্গত একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা ঐ তন্ত্রটির অন্যান্য যুক্তিযুক্ত বিশ্বাসগুলির সঙ্গে যৌক্তিকভাবে সম্পর্কিত।

৪.৩.১ যৌক্তিক সম্পর্ক হিসাবে সংগতির সম্পর্ক (The Relation of Coherence as a logical relation)

সংগতিবাদ অনুযায়ী জ্ঞানগত দিক থেকে অথবা যুক্তিযুক্ত হবার দিক থেকে কোন একটি বিশ্বাস অন্য কোন বিশ্বাস অপেক্ষা কখনই অগ্রগণ্য হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে কোন একটি তন্ত্রের অন্তর্গত বিশ্বাসসমূহের মধ্যে কোনটি অন্যগুলি অপেক্ষা প্রাথমিকভাবে গ্রাহ্য এমন নয়। এই মতবাদ বলে যে বিশ্বাস সমূহের মধ্যে সমর্থিত হবার সম্পর্কটি একমুখি (asymmetric) নয়, পরস্পরমুখী (Symmetric) বা পারস্পরিক। কারণ বিভিন্ন যৌক্তিক বিশ্বাসসমূহ যেহেতু একটি তন্ত্রের অন্তর্গত, এগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যৌক্তিক সম্পর্কে সম্পর্কিত এবং কোন একটির সত্যমূল্যের পরিবর্তন অন্যান্যগুলির সত্যমূল্যকে প্রভাবিত করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে 'সংগতি' কথাটির এখানে Logically consistent বা যৌক্তিক সংগতিপূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। কারণ দুটি বাক্য পরস্পর যৌক্তিক দিক থেকে সংগতিপূর্ণ (অথবা অসংগতিবিহীন) হতে পারে এমনকি যদি তারা যৌক্তিক দিক থেকে পরস্পর নিরপেক্ষ (Logically independent) হয় তাহলেও। যেমন 'কলমটি হয় নীল' এবং 'আজ বৃষ্টি হয়েছে' এই দুটি বাক্যই একই সঙ্গে সত্য হতে পারে। অর্থাৎ বাক্য দুটি পরস্পর সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এই বাক্যদুটি যৌক্তিক দিক থেকে পরস্পর নিরপেক্ষ এই কারণে যে একটির সত্যমূল্য দ্বারা অপরটির সত্যমূল্য কোনভাবেই প্রভাবিত হয় না। এই অর্থে দুটি বচন সংগতিপূর্ণ বলতে বোঝায় বচন দুটির মধ্যে অসংগতি নেই (নঞর্থক অর্থে)। বিশ্বাসসমূহের যৌক্তিকতা বিষয়ক মতবাদ হিসাবে সংগতিবাদ যখন একটি তন্ত্রের অন্তর্গত বিশ্বাসসমূহের মধ্যে সংগতির কথা বলে তখন সেই সংগতির সম্পর্ক এমন নয় যে দুটি বিশ্বাস পরস্পর সংগতিপূর্ণ অথচ তারা যৌক্তিক দিক থেকে পরস্পর নিরপেক্ষ, অর্থাৎ একটির সত্যমূল্য অপরটির সত্যমূল্যকে প্রভাবিত করে না। এখানে সংগতি কথাটি ব্যবহৃত হয় বিশ্বাসসমূহের মধ্যে একটি সদর্থক সম্পর্ক হিসাবে। এই মতবাদ অনুযায়ী একটি তন্ত্রের অন্তর্গত প্রতিটি বিশ্বাস অন্যান্য বিশ্বাসগুলির সঙ্গে যৌক্তিক ভাবে সম্পর্কিত, অর্থাৎ প্রতিটির যৌক্তিকতা বা সত্যতা অন্যগুলির যৌক্তিকতা বা সত্যতাকে প্রভাবিত করে। Pollock এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "Coherence theories insist that all beliefs have the same fundamental epistemic status, and the justifiability of a belief is determined jointly by all of one's beliefs taken together" (*Contemporary Theories of Knowledge*, p.67)

৪.৩.২ সংগতিবাদের প্রকার (Types of Coherentism)

প্রাথমিকভাবে সংগতিবাদের দুটি প্রকার হতে পারে :- ১) **দুর্বল** এবং ২) **কঠোর সংগতিবাদ**। **দুর্বল সংগতিবাদ** অনুযায়ী একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নির্ভর করে ঐ বিশ্বাসটি কতখানি তার তন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়গুলির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ (অন্যান্য বিষয়গুলি হল প্রত্যক্ষ, স্মৃতি ইত্যাদি) তার উপর। কিন্তু **কঠোর সংগতিবাদ** বলে যে একটি বিশ্বাসের যৌক্তিকতা নির্ভর করে কেবলমাত্র ঐ বিশ্বাসটি তার তন্ত্রের অন্যান্য বিশ্বাসগুলির সংগে সংগতিপূর্ণ কিনা তার উপর। সংগতি বাদ আবার **সদর্থক** এবং **নঞর্থক** হতে

পারে। **সদর্থক সংগতিবাদ** বলে, যে একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবে যদি সেই বিশ্বাসটি তার তন্ত্রের অন্যান্য বিশ্বাসগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অপরপক্ষে **নঞর্থক সংগতিবাদ** বলে যে কোন একটি বিশ্বাস যদি তার তন্ত্রের অন্যান্য বিশ্বাসগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হয় তাহলে ঐ বিশ্বাসটি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস হবে না। অর্থাৎ সদর্থক সংগতিবাদ একটি বিশ্বাস কখন যুক্তিযুক্ত হবে সে কথা বলে, আর নঞর্থক সংগতিবাদ একটি বিশ্বাস কখন যুক্তিযুক্ত হবে না সেই কথা বলে।

এছাড়াও সংগতিবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হল নিম্নলিখিতগুলি :

ক) সংগতিবাদ বিষয়ক অনুসৃতি তত্ত্ব (The entailment theory of coherence)

খ) সংগতিবাদ বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব (The explanatory theory of coherence)

গ) সংগতিবাদ বিষয়ক সম্ভাব্যতা সূচক তত্ত্ব (The probabilistic theory of coherence)

ক) সংগতিবাদ বিষয়ক অনুসৃতি তত্ত্ব ঃ এই মতবাদ অনুযায়ী S এর P বচনটি সম্বন্ধে বিশ্বাস K তন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য বিশ্বাসসমূহের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলতে বোঝায় হয় P থেকে K তন্ত্রের অন্যান্য বিশ্বাসসমূহ আবশ্যিক ভাবে নিঃসৃত (necessarily implied) হয় অথবা K তন্ত্রের অন্যান্য বিশ্বাসসমূহ থেকে P আবশ্যিক ভাবে নিঃসৃত (necessarily implied) হয়।

বর্তমান কালে কোন দার্শনিক অবশ্য সংগতিবাদের এই আকারটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। এই আকারের সংগতিবাদের প্রধান অসুবিধা এই যে K যদি এমন একটি তন্ত্র হয় যার অন্তর্গত সমস্ত বিশ্বাসসমূহ মিথ্যা বিশ্বাস এবং P বচনটিও একটি মিথ্যা বচন হয় তাহলে অনুসৃতি তত্ত্ব অনুযায়ী K তন্ত্রের সঙ্গে P সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটি সংগতিপূর্ণ হবে। সুতরাং এই তত্ত্ব সংগতির সঙ্গে সত্যতার কোন সম্পর্কের কথা বলে না। ফলে এই তত্ত্ব বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার, বা বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্ভাব্য জগতের পার্থক্য করতে পারে না।

খ) সংগতি বিষয়ক বিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব :

এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি বিশ্বাস P একটি তন্ত্র K-এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলতে বোঝায় যে ঐ বিশ্বাসটি K তন্ত্রটির অন্তর্গত কোন কোন বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করতে পারে অথবা K তন্ত্রটির অন্তর্গত কিছু বিশ্বাস P বিশ্বাসটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। অর্থাৎ এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়া নির্ধারিত হয় একটি তন্ত্রে তার বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা দ্বারা।

স্পষ্টতঃই এই তত্ত্ব অনুযায়ী একটি তন্ত্রে যে বিশ্বাসের যত বেশি বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা থাকবে সেই বিশ্বাস তত বেশি সংগতিপূর্ণ হবে।

এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যে 'ক' 'খ' কে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে- এর থেকে 'ক' সত্য অথবা 'খ' সত্য একথা নিঃসৃত হয় না। সংগতির সঙ্গে সত্যতার সম্পর্ক কেবলমাত্র 'বিশ্লেষণ' দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

এছাড়াও Lehrer উল্লেখ করেছেন যে একটি বিশ্বাস একটি তন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট বিশ্লেষণাত্মক হওয়ার জন্য সংগতিপূর্ণ (ও সেই কারণে যুক্তিযুক্ত) হতে পারে আবার এর বিরোধী বিশ্বাসটি অন্য একটি তন্ত্র এর

মধ্যে যথেষ্ট বিশ্লেষণাত্মক হওয়ার জন্য সংগতিপূর্ণ (এবং যুক্তিযুক্ত) হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে ও উভয় বিশ্বাসকেই সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলতে হবে, যা অসম্ভব।

গ) সংগতি বিষয়ক সম্ভাব্যতাসূচক তত্ত্ব :

এই তত্ত্বটিকে সংক্ষেপে এই ভাবে প্রকাশ করা যায় যে, যদি একটি বিশ্বাস P একটি তন্ত্র K এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তাহলে P বচনটির K তন্ত্রে সত্য হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আবার যদি P বচনটির K তন্ত্রে সত্য হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে তাহলে P বচনটি K তন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ একথা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই তত্ত্বের অসুবিধা এই যে এখানে স্পষ্টতঃই একটি বিশ্বাসের সত্যতার পরিবর্তে একটি বিশ্বাসের সত্য হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৪.৩.৩ সমালোচনা (Criticism) :

Coherence theory বা সংগতিবাদ আমাদের বিশ্বাস সমূহের তন্ত্র বা system এর কথা বলে। এই তন্ত্র বা system-গুলি সংখ্যায় বহু এমন কি অসীম সংখ্যকও হতে পারে। এখন কোন একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত কি না তা বিচার করার জন্য আমরা কোন তন্ত্রটির সঙ্গে তার সংগতির কথা বিবেচনা করব এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন হতে পারে যে কোন একটি তন্ত্রের অন্তর্গত বিশ্বাসগুলির সঙ্গে ঐ বিশ্বাসটি সংগতিপূর্ণ হলেও অন্য কোনো তন্ত্রের অন্তর্গত বিশ্বাসগুলির সঙ্গে ঐ বিশ্বাসটি সংগতিপূর্ণ নয়। এই তন্ত্রদুটির মধ্যে কোনটিকে আমরা গ্রহণ করবো সেই বিষয়ে আমাদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ব্যতীত সংগতিবাদ আর কোন পদ্ধতির কথা বলতে পারে না। এবং একটি তন্ত্রকে গ্রহণ করার বিষয়টি আমাদের ইচ্ছা বা পছন্দ (arbitrary choice) অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।

এই মতবাদে বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তন্ত্রের আভ্যন্তরীণ বিষয় হয়ে পড়ে যা বাস্তব বা বাহ্যিক ঘটনা আদৌ বিবেচনা করে না। এই কারণে এই মতবাদে একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ততার প্রসঙ্গে ঐ বিশ্বাসটির সত্যতা সংক্রান্ত প্রশ্নটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় না।

৪.৪ নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliabilism)

নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliabilism) অনুযায়ী একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবে তখনই যখন ঐ বিশ্বাসটি এমন কিছু যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যে যুক্তিটি অথবা যুক্তিগুলির উপর নির্ভর করা যায়। এই মতবাদটির একজন অন্যতম প্রবক্তা হলেন D.M. Armstrong। তাঁর মতে একটি বিশ্বাস জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে তখনই যখন বিশ্বাসটি সত্য এবং নিশ্চিত হয় ও নির্ভরযোগ্য (reliable process) উপায়ে লাভ করা যায়। D.M. Armstrong একটি থার্মোমিটারের সঙ্গে একটি সত্য বিশ্বাসের তুলনা করেছেন। একটি থার্মোমিটার নির্ভরযোগ্যভাবে তাপমাত্রা নির্দেশ করে, আর একটি সত্য বিশ্বাস নির্ভরযোগ্যভাবে সত্যতাকে নির্দেশ করে। আমষ্ট্রং এর মতে একটি অনুমান নিরপেক্ষ (non-inferential) বিশ্বাস জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত হয় যদি বিশ্বাসটির সত্যতা প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা নিশ্চিত বলে পরিগণিত হয়। একই ধরনের মত পোষণ

করেন যে সমস্ত দার্শনিক তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Fred Dretske, A. I. Goldman এবং R. Nozick। এদের মতে একজন ব্যক্তি Sএর P সম্বন্ধীয় বিশ্বাস জ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হওয়া বলতে বোঝায় যে S এর P বচনটি বিশ্বাস করার কোন কারণ থাকত না যদি না P বচনটি সত্য হত। উদাহরণ স্বরূপ S-এর এই বচনটি বিশ্বাস করার কোন কারণই থাকত না যে তার সামনে একটি টেলিফোন আছে যদি না তার সামনে সত্যিই একটি টেলিফোন থাকত। একটি সত্য বিশ্বাস জ্ঞান হিসাবে পরিগণিত হওয়ার আবশ্যিক শর্ত হল বিশ্বাসটি উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা। আমাদের পারিপার্শ্বিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আমরা সাধারণভাবে জ্ঞান লাভ করি ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে। সাধারণভাবে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে সত্য বিশ্বাসসমূহ পাই সেগুলি নির্ভর যোগ্য এবং সেই কারণে জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত। অনুরূপ নির্ভরযোগ্য সত্য বিশ্বাস যেগুলি আমরা পাই অন্তর্দর্শন, স্মৃতি অথবা বৌদ্ধিক সজ্ঞা প্রভৃতি নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির সাহায্যে, সেগুলিও জ্ঞান হিসাবে অবশ্যই স্বীকৃত হবে।

নির্ভরযোগ্যতাবাদকে প্রাথমিকভাবে জ্ঞান বিষয়ক একটি বর্হিমুখী তত্ত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। জ্ঞান বিষয়ক যে কোন তত্ত্বই অবশ্য জ্ঞানের একটি বাহ্যিক, বর্হিমুখী বা বস্তুগত উপাদান স্বীকার করে। এই উপাদানটি হল সত্যতা যা বিশ্বাসকারীর উপর নির্ভর করে না। কিন্তু নির্ভরযোগ্যতাবাদ সত্যতার অতিরিক্ত আরও একটি জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান স্বীকার করে নেয় এই উপাদানটি হল বিশ্বাস ও সত্যতার মধ্যে সমন্বয় যা এই মত অনুযায়ী বাহ্যিক।

৪.৪.১ নির্ভরযোগ্যতাবাদের প্রকার (Types of Reliabilism)

যৌক্তিকতা বিষয়ক নির্ভরযোগ্যতাবাদের দুটি প্রধান প্রকার (Varieties) আছে :

ক) সূচক নির্ভরযোগ্যতাবাদ (reliable indicator theory) এবং

খ) প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদ (reliable process theory)

৪.৪.১.১ সূচক নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Reliable Indicator Theory)

সূচক নির্ভরযোগ্যতাবাদ অনুযায়ী একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবে তখনই যখন বিশ্বাসটি এমন একটি যুক্তির বা যুক্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যা বা যেগুলি নির্ভরযোগ্য ভাবে সত্যের সূচক (indicators), অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী একটি যুক্তিযুক্ত বিশ্বাস নির্ভর করে কিছু যুক্তির উপর যে যুক্তিগুলি হল Reliable বা নির্ভরযোগ্য সূচক বা নির্দেশক। এই যুক্তিগুলি Truth বা সত্যের নির্ভরযোগ্য সূচক। উইলিয়াম আলষ্টন (William Alston) এবং মার্শাল সোয়েন (Marshall Swain) দুজনেই যৌক্তিকতা বিষয়ে সূচক নির্ভরতাবাদের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। এঁদের মূল বক্তব্য এই যে একটি বিশ্বাস P একটি যুক্তি R এর ভিত্তিতে যুক্তিযুক্ত হতে পারে যদি R নির্ভরযোগ্যভাবে 'P হয় সত্য' একথা নির্দেশ বা সূচিত (indicate) করে। Alston বিষয়টিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে P কে বিশ্বাস করার যুক্তি বা সাক্ষ্য প্রমাণ অবশ্যই

P এর সত্য হবার সম্ভাবনাকে অত্যন্ত দৃঢ় করবে। এক্ষেত্রে P কে বিশ্বাস করার যুক্তিটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে পারে, একটি নির্দিষ্ট স্মৃতি হতে পারে অথবা একটি (যুক্তিযুক্ত) বিশ্বাসও হতে পারে।

কিন্তু সূচক নির্ভরযোগ্যতাবাদ মতবাদটি যৌক্তিকতা সংক্রান্ত মতবাদ হিসাবে বিশেষ আলোচিত মতবাদ নয়।

৪.৪.১.২ প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Process Reliabilisim)

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বিষয়ে নির্ভরযোগ্যতাবাদের যে আকারটি অধিক অলোচিত, সেটি হল Alvin Goldman প্রণীত প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদ। এই মতবাদ বলে যে একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হবে, যদি এটি এমন একটি জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়, যে প্রক্রিয়া সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য।

এই মত প্রধানতঃ দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়। এগুলির মধ্যে প্রথম বিষয়টি হল এই যে প্রতিটি বিশ্বাসের পেছনেই একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychological process) থাকে। এই মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধিতিটি বিশ্বাসটির যৌক্তিক মর্যাদার অতিরিক্ত। এইরূপ একটি বচন যৌক্তিক মর্যাদার দিক থেকে একটি স্বতঃসিদ্ধ (tautology) সত্য হলেও ঐ বচনটি সম্বন্ধীয় বিশ্বাস যদি সঠিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন না হয় তাহলে ঐ বচনটি সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটি যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায় যে ঐ বচনটি সম্বন্ধীয় বিশ্বাসটির প্রেক্ষিতে যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিটি থাকে সেটি যদি যথোপযুক্ত না হয় তাহলে বিশ্বাসটিকে যুক্তিযুক্ত বলা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একজন গোয়েন্দার এই বাক্যটি বিশ্বাস করার কারণ হিসাবে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকতে পারে যে 'জেমস্ একজন দোষী ব্যক্তি'। কিন্তু ঐ গোয়েন্দা যদি ঐ সাক্ষ্যপ্রমাণগুলিকে যথোপযুক্ত ভাবে না সাজিয়ে তুলতে পারে এবং কেবলমাত্র জেমস্-এর চেহারা দেখে তাকে দোষী বলে মনে করেন তাহলে তার বিশ্বাসটি যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তার বিশ্বাসটি সঠিক জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন হয়নি যে প্রক্রিয়াটিকে নির্ভরযোগ্য বলা যায়। বিশ্বাস গঠনকারী অথবা বিশ্বাস ধরে রাখার যথোপযুক্ত পদ্ধতিগুলি, যেমন প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অনুমান, অন্তদর্শন, যুক্তি ইত্যাদি বিশ্বাসসমূহের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করার উপায়। এবং এই দিকে থেকে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্যতাবাদকে জ্ঞানবিদ্যায় কার্যকারণ বাদের (Causal theory) একটি শাখা বলা যেতে পারে। আরও উল্লেখযোগ্য এই যে প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্যতাবাদ বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়ার আভ্যন্তরীণ মানসিক (Internal) পর্যায়ের উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এই মতবাদকে আর বহির্মুখী (Externalism) মতবাদ বলা যাবে না। একথা অবশ্যই বলার অপেক্ষা রাখে না যে সব মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াই যৌক্তিকতা পরিবাহী এমন নয়। যৌক্তিকতা পরিবাহী মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াগুলির থেকে অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার পৃথকীকরণের মানদণ্ড হল তাদের সত্যতার আনুপাতিক হার। 'শুদ্ধ' পদ্ধতিগুলির থেকে পাওয়া বিশ্বাসসমূহের সত্যতার আনুপাতিক হার যথেষ্ট বেশী কিন্তু 'অশুদ্ধ' পদ্ধতি থেকে পাওয়া বিশ্বাসগুলির সত্যতার আনুপাতিক হার একেবারেই কম। একটি বিশ্বাসের যুক্তিযুক্ত হওয়া নির্ভর করে যে পদ্ধতি অথবা পদ্ধতিসমূহ থেকে বিশ্বাসটি পাওয়া তার বা তাদের নির্ভরযোগ্যতার আনুপাতিক হারের উপর। "The justificational status of a belief is a function of the reliability of the process or processes that cause it, where..... reliability consists in the tendency of a process to produce beliefs that are true rather than false"

আবার সমস্ত নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিগুলি একই রকম নির্ভরযোগ্য নয়। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বাস সমূহের যুক্তিযুক্ত হবার মাত্রা (Degree) ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পারে। Goldman প্রত্যক্ষকৃত নমুনার ভিত্তিতে অনুমানের দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করলেন, যে সমস্ত এলাকায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ থাকেন। স্পষ্টতঃই তাঁর সিদ্ধান্ত অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং যুক্তিযুক্ত হবে এ বিষয়ে অপর এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অপেক্ষা যিনি অপেক্ষাকৃত ছোট এলাকায় এবং কম সংখ্যক নমুনার ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

৪.৪.১.৩ আর্মস্ট্রং এর নির্ভরযোগ্যতাবাদ (Armstrong's Account of Reliabilism)

D. M. Armstrong তাঁর বই *Belief, Truth and Knowledge* এ এক ধরনের নির্ভরযোগ্যতাবাদের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান হল জ্ঞানীয় নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস (Epistemologically reliable belief)। তাঁর নির্ভরযোগ্যতা তত্ত্বকে তিনি 'থার্মোমিটার মতবাদ' (Thermometer View) আখ্যা দিয়েছেন। তিনি অনুমান লব্ধ জ্ঞান ও অ-অনুমানলব্ধ জ্ঞানের বা বিশ্বাসের মধ্যে (between inferential and non-inferential knowledge or belief) পার্থক্য করেছেন।

Armstrong মনে করেন যে একটি অ-অনুমানলব্ধ বিশ্বাসকে জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে 'S বিশ্বাস করে যে P' এই পরিস্থিতির সঙ্গে যে পরিস্থিতি (State of affair) P বচনটিকে সত্য করে তার একটি নিয়মানুগ (Law-like) সম্বন্ধ থাকতে হবে, যাতে S যদি P বচনটি বিশ্বাস করে তাহলে P অবশ্যই সত্য হবে। এইরূপ একটি জ্ঞানীয় পরিস্থিতি একটি থার্মোমিটারের পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনীয়।

একটি সঠিক তাপমাত্রা নির্দেশ করে এমন একটি নির্ভুল থার্মোমিটার এর সঙ্গে তুলনীয় একটি **অ-অনুমানলব্ধ সত্য বিশ্বাস**। দুটিই সমানভাবে নির্ভরযোগ্য। যেমন একটি অনির্ভরযোগ্য মিথ্যা বিশ্বাস একটি খারাপ থার্মোমিটারের সঙ্গে তুলনীয়।

অনুমানলব্ধ জ্ঞান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আর্মস্ট্রং দেখিয়েছেন যে ধরা যাক S এর P বচনটি সম্বন্ধে সত্য বিশ্বাস আছে এবং তার বিশ্বাসের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ হল Q। তাহলে S এর P বচনটি সম্বন্ধে জ্ঞান হতে হলে Q বচনটি সম্বন্ধেও জ্ঞান হতে হবে। কিন্তু এই ভাবে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করলে একটি অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। অ-অনুমানলব্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইরূপ কোন অনবস্থা দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই S এর অনুমানলব্ধ বিশ্বাস যে P যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ Q এর উপর নির্ভর করে, S এর Q সংক্রান্ত জ্ঞান যদি অ-অনুমানলব্ধ হয়, অর্থাৎ অন্য কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ এর উপর নির্ভর না করে তাহলে আর অনবস্থা দোষ ঘটে না। কিন্তু এখানেও অন্য একটি সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে **S এর P সম্বন্ধে বিশ্বাস** এবং **S এর Q সম্বন্ধে জ্ঞান** এই দুটি S এর কাছে পরস্পর সম্পর্কিত হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়ে আর্মস্ট্রং লিখেছেন যে, "the belief that *p* and the knowledge that *q* may lie alongside each other in A's mind without A making any connection between them. In order to exclude this possibility it must further be stilupated that A's belief that *q* (entailed by A's knowledge that *q*) actually functions in A's mind so that A takes *'q'* to be a conclusive reason for believing that *p*". (*Belief, Truth and knowledge*, P. 199)

অর্থাৎ এমন হতে পারে যে একজন ব্যক্তি A এর মনে p (বচনটি) সংক্রান্ত বিশ্বাস এবং q (বচনটি) সংক্রান্ত জ্ঞান দুটিই আছে অথচ A এই দুটিকে সম্পর্কিত করে না। এইরূপ সম্ভাবনা নাকচ করতে হলে, এরকম হওয়া প্রয়োজন যে A এর q সংক্রান্ত বিশ্বাস (যা q সংক্রান্ত জ্ঞান থেকে নিঃসৃত হয়) A এর মনে এমনভাবে কাজ করে যাতে A নিজে p কে বিশ্বাস করার নিশ্চিত কারণ (Conclusive reason) হিসাবে q কে গ্রহণ করে।

৪.৪.২ সমালোচনা (Criticism)

ক) Goldman এর প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদের একটি বিরুদ্ধ সমালোচনা নিম্নরূপ :

কোন একজন ব্যক্তি একটি বিশ্বাসে উপনীত হতে পারেন কোন একটি উপায়ে যার মধ্যে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া, উদাহরণ স্বরূপ প্রত্যক্ষ, স্মৃতি, অনুমান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই ভিন্ন ভিন্ন নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন সত্যতার আনুপাতিক হার আছে। এখানে প্রশ্ন উঠে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে কোন প্রক্রিয়াটির সত্যতার আনুপাতিক হার (truth ratio) দ্বারা বিশ্বাসটির যুক্তিযুক্ত হওয়া নির্ধারিত হবে?

খ) কোন একটি প্রক্রিয়া, ব্যাপকভাবে গ্রহণ করলে কোন কোন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হতে পারে আবার কোন কোন দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে। যেমন রঙের প্রত্যক্ষ বা স্বাদ অনুভব কোন কোন ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য হলেও সব ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং একটি প্রক্রিয়ার একটি truth ratio কিভাবে নির্ধারিত হবে তা স্পষ্ট নয়। আবার যদি একটি প্রক্রিয়াকে অতি সংকীর্ণভাবে দেখা হয় (অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটির একটিমাত্র দৃষ্টান্তও গৃহীত হতে পারে) তাহলে প্রক্রিয়াটির সত্যতার আনুপাতিক হার (truth ratio) হয় ১ অথবা ০ হতে পারে। বিশ্বাসটি সত্য হলে প্রক্রিয়াটির সত্যতার আনুপাতিক হার (truth-ratio) ১ হবে আর বিশ্বাসটি মিথ্যা হলে প্রক্রিয়াটির আনুপাতিক হার (truth-ratio) ০ হবে। এর থেকে নিঃসৃত হয় যে একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হওয়া এবং সত্য হওয়া একই কথা, যা কখনই ঠিক নয়।

গ) প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্যতাবাদের কিছু বিরোধী দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এর সর্বাপেক্ষা গ্রাহ্য এবং প্রভাবশালী বিরোধী দৃষ্টান্তগুলি হল প্রতারক দৈত্যের (demon) এবং অলোকদৃষ্টি (clairvoyance) এর দৃষ্টান্ত।

প্রতারক দৈত্য সংক্রান্ত বিরোধী দৃষ্টান্তটি নির্ভরযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাকে প্রশ্ন করে বা সংশয় করে। এমন একটি সম্ভাব্য জগৎ থাকতে পারে যেখানে এক প্রতারক শয়তান দৈত্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আমরা যা দেখি তা আসলে আমাদের ভ্রান্তি বা ভ্রম। সেরকম সম্ভাব্য ক্ষেত্রে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে আর নির্ভরযোগ্য বলা যাবে না। কিন্তু বাস্তব জগতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ একটি নির্ভরযোগ্য প্রক্রিয়া।

অলোকদৃষ্টি সংক্রান্ত বিরোধী দৃষ্টান্তটি নির্ভরযোগ্যতা একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হওয়ার যথোপযুক্ত মানদন্ড কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলে। ধরা যাক একজন ব্যক্তির নির্ভরযোগ্য অলোকদৃষ্টির অধিকারী। নির্ভরযোগ্যতাবাদ অনুযায়ী তার অলোকদৃষ্টির সাহায্যে প্রাপ্ত বিশ্বাস নির্ভরযোগ্য এবং সেই কারণে

যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এমন হতে পারে যে সেই ব্যক্তির নিজের কাছে তার ঐ শক্তি থাকার পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই। তাহলে তার অলোকদৃষ্টির শক্তি দ্বারা প্রাপ্ত বিশ্বাসসমূহ তার কাছে যুক্তিযুক্ত নয়, যদিও নির্ভরযোগ্যতাবাদ ঐ বিশ্বাসগুলিকে যুক্তিযুক্ত বলে।

৪.৫ সারসংক্ষেপ (Summary)

বাচনিক অর্থে জ্ঞান বলতে বোঝায় যুক্তিযুক্ত সত্য বিশ্বাস। কিন্তু একটি বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত বলতে কি বোঝায় এবং একটি সত্য বিশ্বাস কখন জ্ঞান বলে স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ কখন সেটি যুক্তিযুক্ত হয় এই প্রশ্নগুলি জ্ঞানবিদ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিভিন্ন দার্শনিক এই প্রশ্নগুলির উত্তর বিভিন্ন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন দার্শনিকদের এই প্রচেষ্টার ফলে একটি বিশ্বাস অথবা সত্য বিশ্বাস কিভাবে যুক্তিযুক্ত বলে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। সত্য বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হওয়া বলতে কি বোঝায় এই বিষয়ে তিনটি মতবাদ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। মতবাদগুলি হল যথাক্রমে ভিত্তিবাদ, সংগতিবাদ ও নির্ভরযোগ্যতাবাদ। এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই সংশয়বাদীদের উত্থাপিত বক্তব্য যে জ্ঞান সম্ভব নয়—এই সমস্যাটির মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে। এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটিই দেখাতে চেয়েছে যে জ্ঞান সম্ভব, কারণ আমাদের বিশ্বাসগুলি যুক্তিযুক্ত হতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন মতবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছে একটি সত্য বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হওয়া বলতে কি বোঝায়। অবশ্য প্রত্যেকটি মতবাদের কিছু সুবিধা এবং কিছু অসুবিধা আছে। কিন্তু এই মতবাদগুলির প্রত্যেকটিরই বিশেষত্ব এই যে এগুলি সংশয়বাদীদের বক্তব্যকে খণ্ডন করে।

৪.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী (Model Questions)

1. Critically explain foundationalism as a theory of epistemic justification.
2. Write a short note on coherentism as a theory of justification.
3. Explain and examine reliabilism as a theory of justification.
4. Explain the coherentist theory of justification. Can it provide a fool-proof justification of knowledge claims? Discuss.
5. Critically discuss process reliabilism as a theory of epistemic justification.
6. Write short note on the following :

   a) Basic beliefs, b) The regress argument (foundationalism), c) The thermometer view of reliabilism (Armstrong), d) Different forms of coherence theory of justification.

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

1. J. Pollock, *Knowledge and Justification*, Princeton University Press, Princeton, 1974.
2. R.M. Chisolm, *Theory of Knowledge* 2nd edn. Prentice Hall, 1977.
3. W.P.Alston, *Epistemic Justification,* Cornell University Press, Ethaca, 1989.
4. K. Lehrer, *Knowledge*, Oxford University Press, New York, 1974.
5. J. Pollock, *Contemporary Theories of Knowledge*, Rowman and Littlefield, Totowa, 1986.
6. N. Rescher, *The Coherence Theory of Truth*, Oxford University Press, Oxford, 1973.
7. A.I. Goldman, 'What is Justified belief?" in *Justification and Knowledge*, ed. G Pappas, 1979.
8. D.M. Armstrong, *Belief, Truth and Knowledge,* Cambridge University Press, Cambridge, 1973.

Philosophy 3rd Paper Part 1

ORIGINALITY REPORT

2%	1%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	archive.org Internet Source	<1%
2	dodl.klyuniv.ac.in Internet Source	<1%
3	bugs.freedesktop.org Internet Source	<1%
4	singhaniauniversity.co.in Internet Source	<1%
5	aleksander-lobanov.com Internet Source	<1%
6	sparindia.org Internet Source	<1%
7	www.slideshare.net Internet Source	<1%
8	fr.scribd.com Internet Source	<1%
9	sarahhoneychurchteaching.wikispaces.com Internet Source	<1%

10	www.pib.gov.bd Internet Source	<1 %
11	faculty.unlv.edu Internet Source	<1 %
12	Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden, 2015. Publication	<1 %
13	ebin.pub Internet Source	<1 %
14	repository.library.du.ac.bd:8080 Internet Source	<1 %
15	ia802907.us.archive.org Internet Source	<1 %
16	doc.rero.ch Internet Source	<1 %
17	www.utsamanush.com Internet Source	<1 %
18	Helmbrecht, Johannes. "Argument Structure of the Hocank (Winnebago) Clause", Lehmann, Christian, 2003. Publication	<1 %
19	M. Tanabashi, K. Hagiwara, K. Hikasa, K. Nakamura et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2018 Publication	<1 %

20	ia902606.us.archive.org Internet Source	<1 %
21	www.asiaticsociety.org.bd Internet Source	<1 %
22	Hürst, Wolfgang. "Multimediale Informationssuche in Vortrags- und Vorlesungsaufzeichnungen", Universität Freiburg, 2005. Publication	<1 %
23	wrap.warwick.ac.uk Internet Source	<1 %
24	www.aajkaal.net Internet Source	<1 %
25	www.wbsed.gov.in Internet Source	<1 %
26	J. Beringer, J. -F. Arguin, R. M. Barnett, K. Copic et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2012 Publication	<1 %
27	meditaciones.directorioc.net Internet Source	<1 %
28	"Heraklit im Kontext", Walter de Gruyter GmbH, 2017 Publication	<1 %
29	Submitted to University of Sheffield Student Paper	

<1 %

30 Königsberger. "Differenzierbare Abbildungen", Springer-Lehrbuch, 2004 <1 %
Publication

31 Schwarz, Thorsten. "Kritisches Verhalten dünner ferromagnetischer La0.7Sr0.3CoO3-Schichten", Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, 2007. <1 %
Publication

32 Walther, Dieter. "Elektronische Eigenschaften eindimensionaler aperiodischer Strukturen. Einführung der Ortsraum Pfad-Renormierung tridiagonaler Jacobi-Operatoren und orthogonaler Polynome.", Universität Karlsruhe, 2007. <1 %
Publication

33 "Tourenplanung mittelständischer Speditionsunternehmen", Tourenplanung mittelständischer Speditionsunternehmen, 2009 <1 %
Publication

34 Döring, Claudia. "Präprozessierungs-Algorithmen für Affymetrix Microarrays", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2010. <1 %
Publication

35	Julan Du. "FDI location choice: agglomeration vs institutions", International Journal of Finance & Economics, 01/2008 Publication	<1 %
36	P A Zyla, R M Barnett, J Beringer, O Dahl et al. "Review of Particle Physics", Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2020 Publication	<1 %
37	Banglapatrikausa.com Internet Source	<1 %
38	Lambrecht, Patric. "3D-Kurven-Skelett Approximation aus OberflÃ¤chendaten von Objekten", UniversitÃ¤t Koblenz-Landau, Campus Koblenz, 2012. Publication	<1 %
39	Lluch Lafuente, Alberto. "Directed search for the verification of communication protocols", Universität Freiburg, 2003. Publication	<1 %
40	dfp.portal.gov.bd Internet Source	<1 %
41	idoc.pub Internet Source	<1 %
42	ing.dk Internet Source	<1 %
43	mafiadoc.com	

	Internet Source	<1%
44	server1.quraneralo.com Internet Source	<1%
45	tbcokc.org Internet Source	<1%
46	www.ahsaniamission.org.bd Internet Source	<1%
47	www.informationphilosopher.com Internet Source	<1%
48	osms.wbsed.gov.in Internet Source	<1%
49	"Causal Theories of Mind", Walter de Gruyter GmbH, 1983 Publication	<1%
50	"Handbook of Epistemology", Springer Nature, 2004 Publication	<1%
51	Descartes, 1967. Publication	<1%
52	Sangook Jun. "Application of Collaborative Optimization Using Genetic Algorithm and Response Surface Method to an Aircraft Wing Design", Journal of Mechanical Science and Technology, 01/2006 Publication	<1%

53	Jae Young Lee. "Experimental investigation on onset criteria of liquid/gas entrainment in the header-feeder system of CANDU", Journal of Mechanical Science and Technology, 07/2006 Publication	<1 %
54	Yongtae Jun. "Automated feature-based registration for reverse engineering of human models", Journal of Mechanical Science and Technology, 12/2005 Publication	<1 %
55	ebookbou.edu.bd Internet Source	<1 %
56	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 18
Submission title:	Philosophy 4th Paper Part 1
File name:	Philosophy_4th_Paper_Total_Book_2013.pdf
File size:	1.28M
Page count:	152
Word count:	85,442
Character count:	312,537
Submission date:	29-Jul-2022 07:10AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876568166

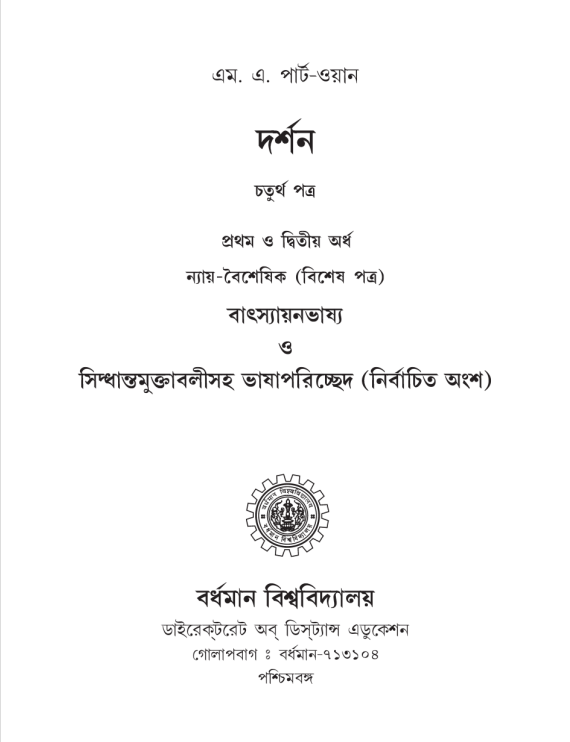

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

চতুর্থ পত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

ন্যায়-বৈশেষিক (বিশেষ পত্র)

বাৎস্যায়নভাষ্য

ও

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ (নির্বাচিত অংশ)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 4th Paper Part 1

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:10AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876568166
File name: Philosophy_4th_Paper_Total_Book_2013.pdf (1.28M)
Word count: 85442
Character count: 312537

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

চতুর্থ পত্র

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

ন্যায়-বৈশেষিক (বিশেষ পত্র)

বাৎস্যায়নভাষ্য

ও

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ (নির্বাচিত অংশ)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

I

সম্পাদক

চতুর্থ পত্র : দ্বিতীয় অর্ধ
সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ (নির্বাচিত অংশ)
অধ্যাপক সোমনাথ চক্রবর্তী
দর্শন বিভাগ, বিশ্বভারতী

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

20
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান-পুনর্মুদ্রন-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যেগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন চতুর্থ পত্রের (ন্যায়-বৈশেষিক বিশেষ পত্র) সংকলনে রয়েছে চতুর্থ পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে '' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

চতুর্থ পত্র (ন্যায়-বৈশিক) : দ্বিতীয় অর্ধ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ (দর্শন) চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধের পাঠক্রমে বিশেষ পত্র হিসাবে পাঠ্য *ভাষাপরিচ্ছেদ-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী* মহাগ্রন্থের যে পাঠ-সহায়িকাটি অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল প্রস্তুত করেছেন তা আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি।

বর্তমান পাঠক্রমে মুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদের প্রমাণাংশের নির্বাচিত অংশটুকু পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমাণাংশে ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক মণ্ডল সেইদিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর আলোচনা সীমিত রেখেছেন।

বৈশেষিক দর্শনের সারাংশ সহজবোধ্য ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরার অভিপ্রায়ে মূল গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, এ কথা সকলেরই জানা। স্বয়ং বিশ্বনাথ মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে এই কথা-ই জানিয়েছেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম শিক্ষার্থী আর একবিংশ শতাব্দীর প্রথম শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক তফাৎ। ফলে, সেইকালে যা 'সহজবোধ্য' বলে গণ্য হত আজ তা সহজবোধ্য বলে গণ্য না হওয়ারই কথা। তা ছাড়া, বিশ্বনাথ গ্রন্থটি লিখেছিলেন একজন রাজীবের জন্য। আজ আমাদের হাজার হাজার না হলেও শত শত রাজীবের কথা ভাবতে হয়। তারা গুরুগৃহে বসে একজন বিশ্বনাথের কাছে বছরের পর বছর পাঠ নেয় না। তারা পরম্পরার অন্তর্গত নয়। ভাষাপরিচ্ছেদ-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী পড়ার জন্য তাদের দিনে পঞ্চাশ মিনিট বরাদ্দ। রাজীবের সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল, ধরেই নেওয়া যায়। আজকের রাজীবরা সংস্কৃত ভাষাকে গ্রীক ভাষা মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত। ফলে, সেকালের রাজীবের কাছে যা ছিল সুকঠিন ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের চিত্তমনোহর উপস্থাপনা, আজকের রাজীবদের কাছে তা বিকটদর্শন বিভীষিকা। বলা যায়, পাঠ-সন্ত্রাস।

এহেন পরিস্থিতিতে অধ্যাপক মণ্ডল প্রায় অসাধ্য সাধন করেছেন। বিষয়ের গভীরতার সঙ্গে আপস না করেও যে আলোচনাকে সাধারণভাবে বোধগম্য করে তোলা যায়—বিশেষ করে, আজকের রাজীবদের জন্য—তা তিনি প্রমাণ করেছেন। শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে পাঠ-সহায়িকার শুরুতেই ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এটি প্রথম শিক্ষার্থীর কৌতূহল বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। প্রতিটি পাঠ্য বিষয়ের উপযুক্ত পটভূমি রচনা, সম্ভাব্য প্রশ্নাবলীর সংযোজন, প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা, সর্বোপরি সাবলীল বঙ্গভাষায় মূল গ্রন্থের প্রমাণখণ্ডের ব্যাখ্যা—এ সবই অধ্যাপক মণ্ডল রচিত পাঠ-সহায়িকার উজ্জ্বল অলঙ্কার। আমি অধ্যাপক মণ্ডলকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই এবং আশা করি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে হাজার হাজার রাজীবদের কল্যাণে এইরকম পাঠ-সহায়িকা আরও প্রস্তুত হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেছেন। যথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। দূরশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অধ্যাপক ড. মোহনপদ পালের সহায়তা, সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষ এবং দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টি শ্রী মলয় রায়ের প্রতি মুহূর্তের শ্রম এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুব্রত পাল এবং কর্মসচিব ড. ষোড়শীমোহন দাঁ-র নিরন্তন সতর্ক দৃষ্টি ও আগ্রহ ছাড়া এই কর্মকাণ্ড সাফল্যে পৌঁছতে পারত না। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। দূরশিক্ষা দপ্তরের কর্মীদের প্রসন্ন সহযোগিতা ও মুদ্রণ সংস্থার কর্মীদের নিষ্ঠার জন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন
১৮.০৩.০৯

সোমনাথ চক্রবর্তী
দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব বিভাগ

প্রথম অর্ধ

বাৎস্যায়নভাষ্য

পণ্ডিত হেমন্ত তর্কতীর্থ

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ

সিঃান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম অর্ধ

(বাৎস্যায়ন ভাষ্য)

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম পাঠ	৩
দ্বিতীয় পাঠ	১০
তৃতীয় পাঠ	১৭
চতুর্থ পাঠ	২৭
পঞ্চম পাঠ	৩৩
ষষ্ঠ পাঠ	৩৬
সপ্তম পাঠ	৪১
অষ্টম পাঠ	৪৬
নবম পাঠ	৫১
দশম পাঠ	৫৮
একাদশ পাঠ	৬১
দ্বাদশ পাঠ	৬৪

দ্বিতীয় অর্ধ

ন্যায়-বৈশেষিক (সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ)

একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পটভূমি	৭১
২	প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও অনুমিতির লক্ষণ	৮২
৩	বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ ও জ্ঞান সামান্যের কারণ	৯৬
৪	নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ	১০৭
৫	লৌকিক সন্নিকর্ষ	১২০
৬	অলৌকিক সন্নিকর্ষ, প্রমা লক্ষণ ও অন্যথাখ্যাতি	১৩১

ন্যায়-বৈশেষিক

প্রথম অর্ধ

বাৎস্যায়নভাষ্য

পণ্ডিত হেমন্ত তর্কতীর্থ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন

চতুর্থপত্র (বিশেষপত্র)

প্রথম অর্ধ

বাৎস্যায়নভাষ্য

প্রথম পাঠ

প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা

মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রটি হইল -- "প্রমাণ - প্রমেয় - সংশয় - প্রয়োজন - দৃষ্টান্ত - সিদ্ধান্তাবয়ব - তর্ক - নির্ণয় - বাদ - জল্প - বিতন্ডা - হেত্বাভাসছল জাতি নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ - শ্রেয়সাধিগমঃ"। এই সূত্রে মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, প্রমাণ প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের নি:শ্রেয়স বা মোক্ষলাভ হয়। যে কোন পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণ হইতেই হয়। কিন্তু প্রমাণের তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ঐ অনুপজাত তত্ত্বজ্ঞানক প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থেরই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয় এবং ঐ তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে জীবের মুক্তিলাভও সম্ভব নয়। সুতরাং মহর্ষি গৌতম প্রণীত গ্রন্থ ন্যায়দর্শন উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় অসঙ্গত এবং উপহসিত।

এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য ন্যায়দর্শনের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গ্রন্থারম্ভে প্রমাণের প্রামান্য প্রতিষ্ঠার জন্য - "প্রমাণতোহর্থ প্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্" এইরূপ অনুমানের অবতারণা করিয়াছেন। অনুমানটি হইল, প্রমাণং অর্থবৎ প্রবৃত্তি সামর্থ্যাৎ। এই অনুমানের পক্ষ প্রমাণ, সাধ্য অর্থবত্ত্ব, হেতু প্রবৃত্তিসামর্থ্য। অর্থবৎ এই পদে অর্থ শব্দের উত্তর নিত্যতা অর্থে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। নিত্যতা হইল অব্যভিচারিতা এবং প্রবৃত্তিসামর্থ্য পদের অর্থ সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব।

দার্শনিক সমাজে দুইটি মতবাদ প্রচলিত। প্রথমটি স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ, দ্বিতীয়টি পরতঃ প্রামাণ্যবাদ। মীমাংসক সম্প্রদায় স্বতঃ প্রামাণ্যবাদের সমর্থক, এই মতে যে প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান জ্ঞাত হয়, সেই জ্ঞানের প্রমাণত্ব বা যথার্থতা সেই প্রমানের দ্বারা উপলব্ধ হয়। আর পরত: প্রামান্যবাদের ক্ষেত্রে যে প্রমানের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান জ্ঞাত হয়, সেই জ্ঞানের প্রামান্য বা প্রমাত্ব সেই প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়না। পরন্তু অতিরিক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় পরতঃপ্রামাণ্যবাদের সমর্থক।

প্রমাণ শব্দটি প্রমা বা প্রমাণ এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রমীয়তে অনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমা করণ। আর প্রমীয়তে ইতি প্রমাণম্ এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন প্রমাণ শব্দের অর্থ প্রমাজ্ঞান। তদ্বতি তৎপ্রকারকজ্ঞানং প্রমা, অর্থাৎ সেই ধর্মবিশিষ্ট বস্তুতে সেই ধর্ম প্রকারে জ্ঞান প্রমা। যেমন ঘটঃ এই জ্ঞান প্রমা। কারণ ঐ জ্ঞান ঘটত্ববিশিষ্ট বস্তুতে ঘটত্ব প্রকারে উৎপন্ন জ্ঞান। সুতরাং বিশেষ্যের ধর্ম এবং জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম এক হইলে জ্ঞান প্রমা হয়। আর

তদভাববতি তৎ প্রকারক জ্ঞানং অপ্রমা, অর্থাৎ সেই ধর্মের অভাববিশিষ্ট বস্তুতে সেই ধর্ম প্রকারে উৎপন্ন জ্ঞান অপ্রমা। যেমন ইদং রজতম্ এই জ্ঞান অপ্রমা। কারণ ঐ জ্ঞান রজতত্বের অভাববিশিষ্ট বস্তু শুক্তিতে রজতত্ব প্রকারে উৎপন্ন জ্ঞান। সুতরাং বিশেষ্যের ধর্ম ও জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম এক না হইলে বা ভিন্ন হইলে জ্ঞান অপ্রমা হয়। ইদং রজতম্ এইস্থলে ইদং পদার্থভূত বিশেষ্য শুক্তির ধর্ম শুক্তিত্ব এবং জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম রজতত্ব এক না হওয়ায় অপ্রমা।

ন্যায়মতে প্রমা ও অপ্রমাজ্ঞানের যথাক্রমে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব উভয়ই পরত: অর্থাৎ অনুমানবেদ্য। অনুমানের আকার হইল প্রমাস্থলে ঘটঃ ইতি জ্ঞানং প্রমা সফল প্রবৃত্তিজনকত্বাৎ অর্থাৎ ঘটঃ এই জ্ঞান সফলপ্রবৃত্তির জনক বলিয়া প্রমা। আর অপ্রমাস্থলে ইদং রজতম্ ইতি জ্ঞানং অপ্রমা বিফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ অর্থাৎ কোন জ্ঞান বিফলপ্রবৃত্তির জনক হইলে সেই জ্ঞান অপ্রমা হয়। উক্তস্থলে শুক্তিতে রজত জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় রজতার্থীর রজত লাভে প্রবৃত্তি বিফল হওয়ায় ঐ জ্ঞান অপ্রমা।

এইভাবে প্রমাণের প্রমাত্ব এবং প্রমাণাভাসের অপ্রমাত্ব উভয়ই অনুমানবেদ্য। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমাণের প্রমাত্ব বা যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন, ''প্রমাণতোহর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্।'' অর্থাৎ প্রমাণ হইতে অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইলে এবং সেই জ্ঞান সফল প্রবৃত্তির জনক হইলে জ্ঞান এবং জ্ঞানের উৎপাদক প্রমাণ প্রমা হইবে।

অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, প্রমাণের প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব আছে এবং যথার্থ প্রমাণের দ্বারা প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের প্রমাজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের নিঃশ্রেয়সাধিগম হইবে। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের গ্রন্থে কোন প্রকার অসঙ্গতি নাই।

ভাষ্যকারোক্ত প্রমাণতঃ এই পদে প্রমাণ শব্দের উত্তর তসিল্ প্রয়োগ হইয়াছে। তসিল্ প্রয়োগ সকল বিভক্তিতে হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি অর্থে তসিল্ প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ তসিল্ প্রয়োগের দ্বারা বিভক্তি ব্যাপ্তি ও বচন ব্যাপ্তি সূচিত হইয়াছে। বিভক্তি ব্যাপ্তির দ্বারা তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তিপ্রাপ্ত এবং বচনব্যাপ্তির দ্বারা উক্ত উভয় বিভক্তির তিনটি বচন অর্থাৎ একবচন, দ্বিবচন এবং বহুবচন প্রাপ্ত। তাহা হইলে তৃতীয়া বিভক্তির এবং পঞ্চমী বিভক্তির সমস্ত বচন প্রাপ্ত হওয়ায় একটি প্রমাণের দ্বারা দুইটি প্রমাণের দ্বারা, এবং বহু প্রমাণের দ্বারা এবং একটি প্রমাণ হইতে দুইটি প্রমাণ হইতে এবং বহু প্রমাণ হইতে অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহা সূচিত। ইহার প্রমাণ ব্যবস্থা এবং প্রমাণ সংপ্লবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রতিপত্তি বা জ্ঞানস্থলে ঐ জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হয় না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন অর্থপ্রতিপত্তৌ, প্রমাণাভাসের দ্বারা ভ্রমাত্মক প্রতিপত্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞান হইতে সফল প্রবৃত্তি জন্মায় না, সেই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''প্রমাণতঃ ''। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা বা প্রমাণ হইতে অর্থের প্রতিপত্তি হইলে প্রবৃত্তি সফল হয়। অন্যথা সফল হয় না। পরন্তু প্রমাণভাসের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের বিষয় অর্থ সেইস্থলে না থাকায় ভাষ্যকারের মতে তাহা অর্থ প্রতিপত্তি নয়। ''অর্থ্যতে অসৌ'' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে গ্রহণ বা ত্যাগের বিষয় পদার্থই অর্থশব্দে গ্রাহ্য। প্রমাণের দ্বারাই সেই অর্থের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই অভিপ্রায়েই

ভাষ্যকার প্রমাণতঃ বলিয়াছেন। আবার বলিয়াছেন- প্রমাণমন্তরেণ প্রতিপত্তিঃ, অর্থাৎ প্রমাণ ব্যতীত অর্থের যথার্থবোধ হয় না।

পুনশ্চ বলিয়াছেন, ''নার্থপ্রতিপত্তিমন্তরেণ প্রবৃত্তিসামর্থ্যম্''। অর্থের যথার্থবোধ ব্যতীত প্রবৃত্তি সফল হয় না। কোন জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা জীব প্রমাণের দ্বারা অর্থের উপলব্ধি করিয়া সেই গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য পদার্থকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করে বা ত্যাগ করার নিমিত্ত ইচ্ছা করে। সেই ঈপ্সা এবং জিহাসাবশতঃ প্রযুক্ত বা কৃতযত্ন সেই জ্ঞাতা জীবের সমীহা অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক ব্যাপাররূপ প্রবৃত্তি হয়। ঐ প্রবৃত্তির সামর্থ্য হইল ফলের সহিত সম্বন্ধ। সুতরাং সমীহমান অর্থাৎ প্রমাণ দ্বারা কোন পদার্থের উপলব্ধি করিয়া প্রবর্ত্তমান জ্ঞাতা জীব সেই অর্থকে প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া অথবা ত্যাগের নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া সেই অর্থকে প্রাপ্ত হয় বা ত্যাগ করে। অর্থ হইল সুখ ও সুখের কারণ এবং দুঃখ এবং দুঃখের কারণ। সুতরাং ভাষ্যোক্ত অর্থ শব্দের অর্থ গ্রাহ্য ও ত্যাজ্য পদার্থ। প্রাণিবিশেষ অপরিসখ্যেয় বলিয়া প্রমাণ প্রতিপাদ্য অর্থ সুখ ও দুঃখ অপরিসংখেয়, অর্থাৎ অনিয়ম্য বা কোন নিয়ম নাই। যেহেতু কোন অর্থ সকলের সুখ বা সুখের কারণ বা দুঃখ বা দুঃখের কারণ হয় না। কোন পদার্থ কোন জীবের পক্ষে সুখ বা সুখের কারণ হইলেও অন্যকোন জীবের দুঃখ বা দুঃখের কারণ হইতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থের বোধ হইলেই সেইস্থলে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তি সফল হয়। সুতরাং উক্তরূপ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। যদি উহা অর্থের ব্যভিচারী হইত, তাহা হইলে সফল প্রবৃত্তি জন্মাইত না, যেমন প্রমাণাভাস, এইভাবে উক্ত ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তের সাহায্যে উক্ত ব্যতিরেকী হেতুর দ্বারা প্রমাণে অর্থবত্ত্ব সিদ্ধ হয়। অর্থবত্ত্ব হইল অর্থাব্যভিচারিত্ব বা অর্থের ব্যাপ্য। অর্থাৎ যেখানে প্রমাণ থাকে, সেখানে সেখানে অর্থ থাকে এবং অর্থ না থাকিলে প্রমাণ থাকে না।

''প্রমাতা প্রমেয় প্রমিতির প্রামাণ্যবিচার''

আদিভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রমাণকেই অর্থবৎ বা অর্থের অব্যভিচারী বলিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ সহচারী প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি ইহাদের অর্থবত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন নাই। তাই পরে তিনি বলিয়াছেন, 'অর্থবতি চ প্রমাণে'। প্রমাতা প্রমেয় প্রমিতি এইগুলিও অর্থবান্ বা অর্থের অব্যভিচারী হয়। কারণ ''অন্যতমাপায়ে অর্থম্যানুপপত্তেঃ'' অর্থাৎ অন্যতম প্রমাণের অপায়ে অর্থের অনুপপত্তি বা বোধ হয় না। তাহাদের মধ্যে ঈপ্সা ও জিহাসাবশতঃ যত্নশীল যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তিনি প্রমাতা। প্রমাতা যাহার দ্বারা অর্থ বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেন, তাহা প্রমাণ। যে অর্থ প্রমিত বা জ্ঞাত হয়, তাহা প্রমেয়। অর্থের যে বিজ্ঞান তাহা প্রমিতি। প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি এই চারিটিতেই তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রমাণ প্রমাতা প্রমেয় ও প্রমিতি পদার্থের অব্যভিচারী হওয়ায় ঐ চারিটিতেই তত্ত্ব পরিসমাপ্ত হয়। অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়া তাহা গ্রাহ্য মনে হইলে গ্রহণ করে, ত্যাজ্য মনে হইলে ত্যাগ করে এবং উপেক্ষণীয় মনে হইলে উপেক্ষা করে। গ্রহণ, ত্যাগ ও উপেক্ষার দ্বারাই তত্ত্বের পর্য্যবসান হয়। ভাষ্যোক্ত অন্যতম পদের অর্থ প্রমাণাদি চতুষ্টয় হইলেও এই স্থলে প্রধানভূত প্রমাণকেই বুঝিতে হইবে। ভেদকূটাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদ হইল অন্যতম পদার্থ। প্রধানভূত প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়ায় প্রধানের সহচারী প্রমাতা প্রভৃতিও অর্থের অব্যভিচারী হয়। প্রমাণ হইল যথার্থ অনুভূতির সাধন। সুতরাং প্রমিতি অর্থের অব্যভিচারী হয়। প্রমাণ হইল যথার্থ অনুভূতির সাধন। সুতরাং প্রমিতি অর্থের অব্যভিচারী

হয়, সেই যথার্থ জ্ঞানবান্ প্রমাতা অর্থের অব্যভিচারী হয় যথার্থ জ্ঞানের বিষয় প্রমেয়ও অর্থের অব্যভিচারী হয়। এইভাবে পদার্থের গ্রাহ্যত্ব, ত্যাজ্যত্ব ও উপেক্ষাণীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। তাই প্রমাণাদি চারিটিতেই তত্ত্বের পর্য্যবসান ঘটে।

তত্ত্বপদার্থের অর্থ নির্ণয়

আদিভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ প্রমান, প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতি এই চারিটিতেই তত্ত্বের পরিসমাপ্তির কথা বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইল ঐ তত্ত্ব কি? ইহার উত্তরে ভাষ্যকার নিজেই উত্তর প্রদান করিতে গিয়া বলিয়াছেন, সতশ্চ সদ্ভাবঃ অসচশ্চ অসদ্ভাবঃ অর্থাৎ সৎ পদার্থের সদ্ভাব এবং অসৎ পদার্থের অসদ্ভাব হইল তত্ত্ব। বক্তব্য হইল—সৎ বা ভাব পদার্থ সৎ বা ভাব অইরূপে যথাভূত বা অবিপরীত ভাবে গৃহ্যমাণ বা জ্ঞায়মান হইয়া তত্ত্ব হয়, আবার অসৎ বা অভাব পদার্থ অসৎ বা অভাব এইরূপে যথাভূত বা অবিপরীতভাবে জ্ঞায়মান হইলে তত্ত্ব হয়।

লক্ষণীয় এই যে, তত্ত্ব শব্দটি তস্যভাবঃ এই অর্থে তৎ + ত্ব = তত্ত্ব নিষ্পন্ন, সৎ হইল ভাব পদার্থ এবং অসৎ হইল অভাব পদার্থ অসৎ হইল সৎ বা ভাব ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং ভাবভিন্ন পদার্থকেই অভাব পদার্থ বলে। এইস্থলে অসৎ বলিতে অলীককে বুঝায় না। কারণ যাহার কোন সত্তা নাই, তাহাই অলীক, উহা পদার্থপদ বাচ্য নয়। প্রমাণসিদ্ধ বস্তুই পদার্থ। ঐরূপে পদার্থ হইল ভাব ও অভাব, তাহাদের মধ্যে প্রমাণ যাহাকে ভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করে, তাহাই ভাব পদার্থ, আর প্রমাণ যাহাকে অভাব পদার্থ বলিয়া প্রতিপাদন করে তাহাই অভাব পদার্থ। ন্যায়মতে পদার্থ ভাব ও অভাবভেদে দ্বিবিধ। ভাবপদার্থে যে ভাবসাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব থাকে, তাহাই সদ্ভাব বা ভাবত্ব, আর অভাব পদার্থে যে অভাব সাধক প্রমাণের বিষয়ত্ব আছে, তাহাই তাহার অসদ্ভাব বা অভাবত্ব। সদ্ভাব হইল ভাবপদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব আর অসদ্ভাব হইল অসৎ বা অভাব পদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব, যথাক্রমে উহাই ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব, কিন্তু বিপরীতভাবে গৃহীত হইলে তাহা ভাব ও অভাব পদার্থের স্বরূপ বা তত্ত্ব হইবে না। ভাষ্যে সৎ ইতি এবং অসৎ ইতি এই দুইস্থলে ইতি শব্দের অর্থ প্রকার, অর্থাৎ সৎ পদার্থকে সৎ এই প্রকারে এবং অসৎ পদার্থকে অসৎ এই প্রকারে গ্রহণ করিলে তত্ত্ব গৃহীত হয়।

প্রতিপাদ্য এই যে, যাহা যে পদার্থের প্রকৃত ধর্ম, তাহা সেই পদার্থের তত্ত্ব। আবার সেই পদার্থ সেইরূপে গৃহীত হইলে সেই পদার্থও তত্ত্ব হয়। সুতরাং ভাষ্যকারের মতে ভাবত্ব এবং অভাবত্ব যেমন তত্ত্ব, সেইরূপ ভাব এবং অভাব পদার্থও তত্ত্ব। যেমন ঘটত্বরূপে জ্ঞায়মান হইলে ঘট ও ঘটত্ব উভয়ই তত্ত্ব হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ ভাব ও অভাব পদার্থের প্রমাণসিদ্ধ ভাবত্ব ও অভাবত্বকে তত্ত্ব বলিয়া পরে ভাব ও অভাবকেও তত্ত্ব বলিয়াছেন। অর্থাৎ ভাবত্ব ও অভাবত্বরূপে জ্ঞায়মান হইলে ভাব ও অভাব উভয়ই তত্ত্ব হইবে। ভাষ্যকার সতশ্চ এবং অসতশ্চ এই দুইস্থলে দুইটি চ শব্দের দ্বারা পদার্থত্বরূপে ভাব ও অভাব এই দ্বিবিধ পদার্থই প্রধান ইহা সূচিত করিয়াছেন। ভাব ও অভাব উভয়ই তুল্যভাবে প্রধান, কোনটি অপ্রধান বা গৌণ নয়। ভাব যেমন ন্যায়মতে স্বতন্ত্র পদার্থ, সেইরূপ অভাবও স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং ধর্মী ও ধর্ম উভয়ই তত্ত্ব ইহা প্রতিপাদিত হইল।

অভাব পদার্থের প্রমাণবেদ্যত্ব বিচার

ভাষ্যকার ন্যায়মতে ভাব ও অভাব উভয়ই পৃথক্ তত্ত্ব ইহা আলোচনা করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ভাবের ন্যায় অভাবেরও প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি হয় ইহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার নিজেই

একটি প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। প্রশ্নটি হইল "কথম্ উত্তরস্য প্রমাণেন উপলব্ধি রিতি।" অর্থাৎ ভাব ও অভাবের মধ্যে ভাব পূর্ব পদার্থ এবং অভাব উত্তর পদার্থ বা পরবর্ত্তী পদার্থ। এই উত্তর অভাব পদার্থের প্রসমাণের দ্বারা কিভাবে উপলব্ধি হয়? অর্থাৎ অভাব অলীক না হইলেও অসৎ পদার্থ, তাহার সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কিভাবে সম্ভব হইবে। তদ্ ব্যতীত অভাবের উপলব্ধি হইতে পারে না। অথচ ভাষ্যকার ভাব ও অভাব উভয়কেই প্রমাণসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়াছেন।

উক্ত প্রশ্নের সমাধান পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "সত্যুপলভ্যমানে তদনুপলব্ধেঃ প্রদীপবৎ"। অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা সৎ বা ভাব পদার্থ উপলভ্যমান হইলে যে পদার্থটি যেখানে থাকে না, সেই পদার্থের উপলব্ধি হয় না। অভিপ্রায় এই যে, যেমন কোন দর্শক কর্ত্তৃক প্রদীপের দ্বারা কোন দৃশ্য পদার্থের উপলব্ধি হইলে তাহার ন্যায় যাহার উপলব্ধি হয় না, তাহা নাই। থাকিলে দৃশ্য পদার্থের ন্যায় তাহার, উপলব্ধি হইত। অথচ উপলব্ধি হয় না বা নাই বলিয়া উপলব্ধি হয়, এই উপলব্ধি অভাবের উপলব্ধি। এইভাবে অভাবেরও উপলব্ধি হয়, এইরূপে ভাব পদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকে প্রকাশ করে। ন্যায়মতে ভাবপদার্থের প্রকাশক প্রমাণ অভাব পদার্থকেও প্রকাশ করে। অর্থাৎ যে প্রমাণের দ্বারা প্রতিযোগী ভাব পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহার অভাব পদার্থেরও সেই প্রমাণের দ্বারা জ্ঞান হয়। তাই অভাব প্রতিযোগি-গ্রাহক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য। সুতরাং অভাব যথার্থবোধের বিষয়। তারা অবশ্যই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। নাই বলিয়া সে সমস্ত বোধ হয়, সবই ভ্রম বলা যায় না। অতএব ভাবের ন্যায় অভাবেরও যথার্থ বোধ হয়। পরন্তু অভাব ভাবপরতন্ত্র। ভাব ব্যতিরেকে স্বতন্ত্রভাবে অভাবের বোধ হয় না। যেমন জ্ঞান বলিলে তাহা বিষয়কে অপেক্ষা করে। প্রতিযোগীর নিরূপণের অধীন নিরূপণের বিষয় অভাব। অতএব অভাব প্রমাণসিদ্ধ। অভাব অবশ্যই স্বতন্ত্রপদার্থ এবং তত্ত্ব। যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ, অভাব প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া পদার্থ।

এখন শঙ্কা হইতে পারে, অভাব প্রমাণসিদ্ধ হইলে মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে অভাবের উল্লেখ করেন নাই কেন? এই শঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন "সচ্চ ফলু ষোড়শধা র‍্যঢ় মুপদেক্ষ্যতে" অর্থাৎ সৎ বা ভাব পদার্থকে সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকার বলা হইয়াছে।

নৈয়ায়িকগণ অনিয়ত পদার্থবাদী। তাঁহাদের মতে যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই পদার্থ। অভাব প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং অভাবও পদার্থ। ভাব পদার্থও ষোড়শ প্রকারই নয়। অনির্দিষ্ট কোন ভাব পদার্থ প্রমাণসিদ্ধ হইলে তাহাও পদার্থ বলিয়া বিবেচিত বা গৃহীত হইবে।

তথাপি মহর্ষি গৌতম নির্দিষ্ট করিয়া ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করিলেন কেন? উত্তরে বলা যায়, দর্শনশাস্ত্রসমূহ অধ্যাত্ম শাস্ত্র। অধ্যাত্মশাস্ত্রের লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ। মহর্ষি গৌতম যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় মোক্ষের কারণ, সেইরূপ ষোড়শ প্রকার ভাব পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। অনুল্লিখিত ভাব পদার্থের ন্যায় অভাব পদার্থও স্বীকার্য্য। আরও বলা যায়, "সচ্চ' এই পদে অনুক্ত সমুচ্চয়ার্থক চ কারের দ্বারা মহর্ষি অভাবেরও সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষি গ্রন্থমধ্যে বহু অভাব পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। মোক্ষই ন্যায়মতে অভাব পদার্থ, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মোক্ষ। অতএব অভাব স্বতন্ত্র পদার্থ। বিশেষ্য বিশেষণভাব বা বিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা অভাবের প্রত্যক্ষ হয়।

মহর্ষিকৃত প্রথমসূত্রের অবতাবণা

তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং

সূত্র—''প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্ক- নির্ণয় - বাদ - জল্প - বিতন্ডা - হেত্বাভাস - চছল - জাতি - নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃ শ্রেয়সাধিগমঃ" সেই অর্থাৎ মোক্ষোপযোগী এই ভাব পদার্থেরই প্রকার (১) প্রমাণ (২) প্রমেয় (৩) সংশয় (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত (৬) সিদ্ধান্ত (৭) অবয়ব (৮) তর্ক (৯) নির্ণয় (১০) বাদ (১১) জল্প (১২) বিতন্ডা (১৩) হেত্বাভাস (১৪) ছল (১৫) জাতি (১৬) নিগ্রহস্থানের অর্থাৎ এই ষোড়শপ্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত নিঃশ্রেয়স লাভ হয়।

যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের উপযোগী, ভাব পদার্থের সেই ষোড়শ প্রকার মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্বভাষ্যে এই ষোড়শপ্রকার ভাব পদার্থের কথাই বলিয়াছেন। এখন মহর্ষি সূত্রের উল্লেখপূর্বক তাহা দেখাইবার জন্য ''তাসাং খল্বাসাং সদ্বিধানাং" এই সন্দর্ভের দ্বারা প্রথম সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ সন্দর্ভের সহিত সূত্রস্থ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত বাক্যের অন্বয় ভাষ্যকারের অভিপ্রেত। স্ত্রীলিঙ্গ বিধা শব্দের অর্থ এখানে প্রকার। সূত্রস্থ প্রমানাদি নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত ষোড়শ পদার্থ ''সদ্বিধা" অর্থাৎ ভাব পদার্থের প্রকার। আর ঐ প্রকারগুলি প্রত্যেকেই সাক্ষাৎ এবং পরম্পরায় মোক্ষোপযোগী। ভাষ্যকার ''তাসাং খলু" এই কথার দ্বারা ইহাই সূচিত করিয়াছেন। ''তাসাং খলু"—তাসামেব, অর্থাৎ পূর্বে যে মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থ ষোড়শ প্রকারে সংক্ষেপে বলিবেন, ইহা বলা হইয়াছে। সেই মোক্ষোপযোগী ভাবপদার্থের প্রকারগুলিই এই। এখানেই সূত্রের উল্লেখপূর্বক সেইগুলিই দেখাইয়াছেন, তাই আবার বলিয়াছেন,— তাসাম্, তাসাং অর্থাৎ সদ্বিধানাম্।

প্রথম সূত্রস্থ বাক্যের সমাস পর্য্যালোচনা

ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''নির্দেশে যথাবচনং বিগ্রহ" নির্দেশ অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রমাণাদি পদার্থের লক্ষণসূত্রে ও বিভাগসূত্রে সেরূপ বচন একবচন বা বহুবচন গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে এই সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাসের বিগ্রহবাক্য বা ব্যাসবাক্য রচনা করিতে হইবে। দ্বন্দ্ব সমাস হইল সর্বপদার্থ প্রধান। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব সমাসে ঘটক প্রত্যেক পদের প্রাধান্য থাকে। বহুব্রীহি বা কর্মধারয় হইলে অর্থসিদ্ধ হইবে না। ষষ্ঠী তৎপুরুষস্থলেও অর্থসিদ্ধ হয় না। কারণ তাহাতে অন্তিম নিগ্রহস্থানেরই প্রাধান্য প্রকটিত হয়। সুতরাং সূত্রে দ্বন্দ্ব সমাসই গ্রহণীয়। দ্বন্দ্ব সমাস হইলে তাহার বিগ্রহবাক্য হইবে প্রমাণানি চ প্রমেয়ানি চ এইরূপ অথবা প্রমাণং চ প্রমেয়ং চ ইত্যাদি একবচনান্ত রূপই হইবে। কারণ নির্দেশে অর্থাৎ পদার্থের বিভাগসূত্রে ঐরূপ বচন গৃহীত হইয়াছে। অথবা সর্বত্র-একবচনান্তরূপেই গৃহীত হইবে।

প্রমাণ.....নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ-এই বাক্যে ষষ্ঠী বিভক্তি শৈষিকী, অর্থাৎ সম্বন্ধে ষষ্ঠী, শেষ হইল সম্বন্ধ। অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব কর্মত্বাদি ষট্ কারক ভিন্ন সম্বন্ধ মাত্রের নাম শেষ। সুতরাং প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধী যে তত্ত্ব তাহার জ্ঞানই প্রমাণাদি তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান এই পদের একদেশ তত্ত্বের সহিত ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ সম্বন্ধের অন্বয় হইবে। এই প্রকার একদেশান্বয় সর্বসম্মত। দেবদত্তস্য গুরুকুলং রামস্য নাম মহিমা প্রভৃতিস্থলে ষষ্ঠীর অর্থ সম্বন্ধের অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানাৎ এই পদে তত্ত্বশব্দটি প্রমাণাদি সাপেক্ষ হইলেও অর্থ

বাদ শব্দানুশাসনম্ প্রভৃতির ন্যায় তত্ত্বস্য জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং এইরূপ তৎপুরুষ সমাসে কোন বাধা নাই। মহাকাব্যের ব্যাখ্যাকার মল্লিনাথও বলিয়াছেন— সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ। এতগুলি অর্থাৎ ষোড়শপ্রকার সৎপদার্থ। ইহাদের যথার্থজ্ঞানের জন্য এই সূত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই এই তন্ত্রার্থ অর্থাৎ ন্যায় শাস্ত্র প্রতিপাদ্য পদার্থগুলি সম্পূর্ণরূপে উদ্দিষ্ট এবং নামোল্লেখে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হেয় প্রভৃতি চতুর্বিধ অর্থপদের আলোচনা

মহর্ষি গৌতম আত্মা হইতে অপবর্গ পর্যন্ত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় পদার্থের নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সমস্ত প্রমেয় পদার্থের তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই তদ্বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া তদ্বারা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়। ইহাও এই সূত্রের দ্বারা অনূদিত হইতেছে। (১) হেয় অর্থাৎ দুঃখ ও তাহার নির্বর্ত্তক বা উৎপাদক বা দুঃখ ও দুঃখের হেতু, (২) আত্যন্তিক হান অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান (৩) তাহার উপায় শাস্ত্র (৪) এবং অধিগন্তব্য অর্থাৎ লক্ষ্য মোক্ষ— এই চারিটি অর্থপদ বা পুরুষার্থ স্থানকে সম্যক্ অবগত হইয়া জীব মোক্ষলাভ করে।

অভিপ্রায় এই যে, মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে মোক্ষের কারণ বলিয়াছেন। তাহা কিভাবে সম্ভব? ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, উক্ত ষোড়শপদার্থের মধ্যে আত্মাদি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইল মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। ইহা প্রথম সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় না। এই কারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কিভাবে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তাহা দ্বিতীয় সূত্রে মহর্ষি বলিয়াছেন।

পুনরুক্তি দোষাবহ হইলেও সপ্রয়োজন পুনরুক্তি দোষাবহ নহে। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ ইহা ব্যক্ত করাই অনুবাদের প্রয়োজন।

মহর্ষি দ্বিতীয়সূত্রে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল মহর্ষির সম্মত নহে, পরন্তু মোক্ষবাদী সকল দার্শনিকের সম্মত। ইহা প্রকাশ করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, হেয়ম্ ইত্যাদি। হেয় হইল দুঃখ ও দুঃখের কারণ। অর্থাৎ দুঃখের কারণ অবিদ্যা তৃষ্ণা ধর্ম অধর্ম প্রভৃতিও হেয়। আত্যন্তিক হান হইল মোক্ষের কারণ তত্ত্বজ্ঞান। হীয়তে অনেন এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ত্যাগার্থক হা ধাতুর উত্তর কারণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন হান শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হয়। ইহা ব্যক্ত করিতে ভাষ্যকার হান মাত্যন্তিকং বলিয়াছেন। তাহার উপায় হইল তৃতীয় অর্থপদ। ইহা অর্থশাস্ত্র, যেহেতু শাস্ত্রের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব। চতুর্থ অর্থপদ হইল অধিগন্তব্য। ইহার অর্থ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা লভ্য মোক্ষ। হেয়, হান, উপায়, অধিগন্তব্য এই চারটি ভাষ্যকারের মতে অর্থপদ। অর্থপদ হইল পুরুষার্থ স্থান। অর্থ হইল পরম পুরুষার্থ অপবর্গ। পদ শব্দের অর্থ স্থান। এই চারটিতেই অপবর্গ অধিষ্ঠিত। কারণ ইহাদের সম্যক্ জ্ঞান অপবর্গের কারণ।

নিঃশ্রেয়স শব্দের অর্থ-নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ নিঃশ্রেয়সম্। মুক্তিই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ, এই কারণে মুক্তি অর্থে নিঃশ্রেয়স শব্দের বহুল প্রয়োগ হইলেও কল্যান অর্থেও নিঃশ্রেয়স শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু তাহা নিশ্চিত শ্রেয় নয়। এই নিঃশ্রেয়স দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। দৃষ্ট কৃষিবাণিজ্যাদি এবং অদৃষ্ট নির্বাণমুক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ

সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের পৃথক্ স্বীকারে যুক্তি

মহর্ষি গৌতম প্রথম সূত্রে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইল সংশয়, প্রয়োজন প্রভৃতি চতুর্দ্দশ সংখ্যক পদার্থ যথা সম্ভব প্রমাণ এবং প্রমেয় সমূহের মধ্যে অন্তর্ভূত হয়। তথাপি তাহাদের পৃথক্ স্বীকার বা উদ্দেশ করা হইয়াছে। অথচ তাহারা পৃথক্ হইতে পারে না।

এই প্রশ্নের উত্তর হইল, পৃথক প্রস্থান থাকিলে পদার্থ ভিন্ন বা অতিরিক্ত হয়, প্রকৃতস্থলে মনু যে বিদ্যার বিভাগ করিয়াছেন— তাহা হইল, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা এবং আন্বীক্ষিকী, যথা—

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।

আন্বীক্ষিকীং চাত্ম বিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।।

এই বিদ্যা সমূহের মধ্যে প্রত্যেক বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান আছে। অর্থাৎ পৃথক্ প্রস্থানবিশিষ্ট এই চারটি বিদ্যা। প্রাণভৃৎ মানবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য মনু উক্তরূপে বিদ্যার বিভাগ এবং উপদেশ করিয়াছেন। প্রস্থান হইল অসাধারণ প্রতিপাদ্য, প্রত্যেক্ বিদ্যারই অসাধারণ প্রতিপাদ্য আছে। তাই বিদ্যা চতুর্বিধ।

এই চতুর্বিধ বিদ্যার মধ্যে আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা চতুর্থী বিদ্যা। সূত্রোক্ত সংশয় হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পদার্থ এই ন্যায় বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান বা অসাধারণ প্রতিপাদ্য। সুতরাং এই বিদ্যায় ঐ সংশয় প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পদার্থের বিশেষরূপে প্রতিপাদন কর্ত্তব্য। এইজন্য সংশয় প্রভৃতির পৃথক্ উল্লেখ করা হইয়াছে। কারন পৃথক উল্লেখ ব্যতীত উহাদের বিশেষরূপে প্রতিপাদন করা যায় না। সংশয়াদির পৃথক্ স্বীকার না হইলে এই বিদ্যা চতুর্থী হইতে পারে না। পরন্তু ন্যায়বিদ্যা ত্রয়ী বিদ্যার মধ্যেই গণ্য হইত। তাহা হইলে ন্যায়বিদ্যা উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্মবিদ্যা হইবে। ইহা কিন্তু বলা যায় না।

প্রস্থান শব্দের অর্থ ব্যাপার। প্র পূর্বক স্থা ধাতুর অর্থ-প্রস্থান, তাহা ব্যাপার, তাই বলা যায়, ব্যাপারো ব্যুৎপাদনং তস্য ধাত্বর্থতা, তদ্বিষয়ত্বং প্রত্যয়ার্থঃ। তাহা হইলে প্রস্থান শব্দের অন্তর্গত ধাতু ও কর্মবাচ্য প্রত্যয়ের দ্বারা উহার অর্থ হয় প্রস্থান। যে সমস্ত পদার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের বিষয় অর্থবৎ বিদ্যা বা শাস্ত্রের অসাধারণ প্রতিপাদ্য, সেই প্রস্থানভেদবশতঃ বিদ্যার ভেদ হইয়াছে। উক্ত চতুর্বিধ বিদ্যার মধ্যে ত্রয়ী বিদ্যার প্রস্থান— অগ্নিহোত্রহোমাদি, কৃষ্যাদি শাস্ত্ররূপ বার্ত্তা বিদ্যার প্রস্থান হলশকটাদি। দন্ডনীতির প্রস্থান রাজা ও অমাত্য প্রভৃতি আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থ।

অতএব বলা যায়, ত্রয়ী, দণ্ডনীতি, বার্ত্তা এই ত্রিবিধ বিদ্যার প্রস্থান হইতে ন্যায়বিদ্যার প্রস্থান ভিন্ন। সুতরাং ন্যায়বিদ্যা ত্রয়ী নহে, উহা চতুর্থী বিদ্যা। ইহা জ্ঞাপনের জন্য এবং ঐ সংশয়াদি পৃথক্ প্রস্থানগুলির বিশেষরূপে বোধ সম্পাদনের জন্য মহর্ষি গৌতম উহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্ উল্লেখ না করিলে তাহাদের পৃথক্ভাবে ব্যুৎপাদন করা যায় না। ন্যায়াঙ্গ সংশয়াদি পদার্থের ব্যুৎপাদন ন্যায়বিদ্যারই ব্যাপার, ঐ ব্যাপার ভেদের জন্য ন্যায়বিদ্যা অন্যবিদ্যা হইতে ভিন্ন হইয়াছে এবং পরিস্ফুট হইয়াছে।

সুতরাং মহর্ষি সংশয়াদি পদার্থবর্গের দ্বারা ন্যায়বিদ্যাকে পৃথক্ প্রস্থানবিশিষ্ট করায় উহাদের পৃথক্ উল্লেখ সার্থক হইয়াছে, উহা অনর্থক নহে। অতএব সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থ ন্যায়বিদ্যার পৃথক্ প্রস্থান। এই কারণে ন্যায়বিদ্যা স্বতন্ত্রবিদ্যা, ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্গত নয়।

সংশয়ের পৃথক্ পদার্থত্ব প্রতিপাদন

সংশয় প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন— সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের মধ্যে ''তত্র নানুপলব্ধে নর্ন নির্ণীতে হ র্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে, কিং ত র্হি সংশয়িতে হ র্থেঃ''। অর্থাৎ অজ্ঞাত পদার্থে ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না, আবার নিশ্চিত পদার্থেও ন্যায় প্রবৃত্ত হয় না। তবে কি? সন্দিগ্ধ পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্ত হয়। অতএব বলা যায়, সংশয়াদি চতুর্দ্দশ পদার্থের মধ্যে সংশয়ের স্বরূপ, যে পদার্থ সামগ্রিকভাবে অজ্ঞাত, তাহাতে ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না, যাহা নির্ণীত, তাহাতেও ন্যায়প্রবৃত্তি হয় না। ইহার দ্বারা বুঝা যায়, যাহা সামান্যতঃ জ্ঞাত, বিশেষরূপে অনির্ণীত, তাহাতেই ন্যায় প্রবৃত্তি হয়। যেমন পর্বতকে জানি, কিন্তু তাহাতে বহ্নি আছে কিনা এইরূপ সংশয় হইতেছে, সুতরাং সামান্যতঃ নির্ণীত হইলেও বিশেষরূপে অনির্ণীত হইতে পারে। যেরূপে যাহা অনির্ণীত, সেইরূপেই তাহাতে সংশয় হয়, সেইরূপে সন্দিগ্ধ সেই পদার্থেই ন্যায় প্রবৃত্তি হয়। সংশয় ব্যতীত ন্যায় প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং সংশয় ন্যায়ের অঙ্গ। এই বিষয় মহির্ষি নিজেই বলিয়াছেন, তাহা দেখাইবার জন্য ভাষ্যকার পরে মহর্ষি নির্ণয় লক্ষণ সূত্রটি উদ্বৃত করিয়াছেন। সূত্রটি হইল— ''বিমৃশ্য পক্ষ— প্রতি পক্ষাভ্যামর্থাসধারণং নির্ণয়ঃ'' এই সূত্রে বিমৃশ্য এই পদের দ্বারা সংশয় কথিত। মহর্ষিও বলিয়াছেন— ''বিমর্শঃ সংশয়ঃ।'' আর সূত্রে পক্ষপ্রতিপক্ষ শব্দ ব্যবহৃত। তাহার দ্বারা ন্যায় প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ইহাই পক্ষপ্রতিপক্ষ শব্দের লাক্ষণিক অর্থ, আর অর্থাবধারণরূপ নির্ণয়, তত্ত্বজ্ঞান।

সুতরাং ইহা কি? অথবা ইহা নহে? এইরূপে পদার্থের বিমর্শ বা অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানরূপ ন্যায়াঙ্গ সংশয় প্রমেয়ে অর্থাৎ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত জ্ঞান পদার্থের অন্তর্ভূক্ত হইয়াও ন্যায় প্রবৃত্তির মূল বলিয়া পৃথক্ অভিহিত হইয়াছে।

এইভাবে প্রয়োজন পদার্থ হইতে নিগ্রহস্থান পর্য্যন্ত পদার্থগুলির কোন কোন পদার্থে অন্তর্ভাব এবং পৃথক্ স্বীকারে কারণ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে আলোচিত হইল না।

ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সেয় মা ন্বীক্ষিকী প্রমাণাদিভিঃ পদার্থৈ র্বিভজ্য—

মানা— প্রদীপঃ সর্ববিদ্যা নমুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।

আশ্রয় ঃ সর্বধর্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতা।।

তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃ শ্রেয়সধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্। ইহতু অধ্যাত্মবিদ্যায়াম্ আত্মাদিজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমো হ পবর্গ প্রাপ্তিরিতি।

অর্থাৎ প্রমাণাদি পদার্থ কর্ত্তৃক বিভজ্যমান বা পৃথক্‌ক্রিয়ামাণ অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থ যে বিদ্যাকে অন্য বিদ্যা হইতে বিশিষ্ট করিয়াছে, সেই এই ন্যায়বিদ্যা সর্ববিদ্যার প্রদীপ, সর্ব্ব কর্ম্মের উপায়, সকল ধর্ম্মের আশ্রয়, এই কারণে আন্বীক্ষিকী বিদ্যার উদ্দেশে বা শাস্ত্রে বিদ্যাসমূহের পরিগণনাস্থলে প্রকৃষ্টরূপে কীর্ত্তিত, তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সাধিগম বিদ্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইবে। ন্যায়বিদ্যা হইল অধ্যাত্মবিদ্যা, ইহাতে আত্মাদিজ্ঞান হইল তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়সলাভ অপবর্গ-প্রাপ্তি। অর্থাৎ এই বিদ্যার তত্ত্বজ্ঞান এবং নিঃশ্রেয়স অন্যান্য বিদ্যা সাধারণ নয়, পরন্তু বৈশিষ্ট্য আছে।

এইস্থলে ভাষ্যকার ন্যায়বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলিয়াছেন, প্রেক্ষাবান্ মানবের সকল প্রয়োজনে এই ন্যায়বিদ্যা সহায়ক। কারণ এই ন্যায়বিদ্যা ব্যুৎপাদিত প্রমাণাদির সাহায্যে অন্যান্যবিদ্যা স্বস্বপ্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রতিপাদন করে। সুতরাং ন্যায়বিদ্যা সর্ববিদ্যার প্রকাশক। এই কারণে ন্যায়বিদ্যা সর্ববিদ্যার প্রদীপস্বরূপ। এই বিদ্যা সর্ববিদ্যার উপায়, যেহেতু এই ন্যায়বিদ্যা পরিশোধিত প্রমাণাদির সাহায্যে সর্ববিদ্যা প্রতিপাদ্য কর্মগুলি প্রকাশিত। যেমন সামদানাদি, কৃষিবাণিজ্যাদি কর্ম্মের ক্ষেত্রে এই ন্যায়বিদ্যাই মূল। এই বিদ্যা সর্বধর্ম্মের রক্ষক। কারণ পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করা সর্ববিদ্যার ধর্ম। তাহাতেও এই ন্যায়বিদ্যা অপেক্ষিত। যেহেতু বিমৃশ্যকারী পুরুষগণ এই ন্যায়বিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই স্বীয় কর্ত্তব্য নির্ণয় করেন এবং ক্লেশসাধ্য কর্মে প্রবৃত্ত হন। অন্যান্য বিদ্যাও এই ন্যায়বিদ্যার সাহায্যে পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

এই স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রমাণাদি পদার্থ এই ন্যায়বিদ্যার প্রতিপাদ্য এবং সর্ববিদ্যার উপযোগী। তাহা হইলে নিঃ শ্রেয়স শব্দের দ্বারা মোক্ষকে এই বিদ্যার প্রয়োজন বলা যাইবে না। কারণ প্রমাণাদি পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়, প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অন্যান্য বিদ্যা সাধ্য সর্ববিধ নিঃশ্রেয়স সিদ্ধ হইবে। সুতরাং ন্যায়বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স অন্যান্য বিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স সাধারণই হইবে, কোন বৈশিষ্ট্য থাকিবে না।

এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ‘‘তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চ যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্’’। তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিদ্যাতেই তত্ত্বজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়স আছে। অন্যবিদ্যাসাধ্য সেই সকল নিঃশ্রেয়স হইতে ন্যায়বিদ্যার মুখ্যফল নিঃশ্রেয়স ভিন্ন। ইহা সেই সকলবিদ্যা ও তাহার ফল তত্ত্বজ্ঞানের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়।

যেমন মনূক্ত ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি এবং আন্বীক্ষিকী এই চতুর্বিধ বিদ্যার মধ্যে বেদবিদ্যা হইল ত্রয়ী, যাগাদি বিষয়ক যথার্থজ্ঞানই তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান, স্বর্গপ্রাপ্তিই সেখানে নিঃ শ্রেয়স।

কৃষ্যাদি জীবিকাশাস্ত্রের নাম বার্ত্তা, ভূম্যাদি বিষয়ক যথার্থ জ্ঞানই সেখানে তত্ত্বজ্ঞান, বানিজ্যাদিলাভ হইল নিঃ শ্রেয়স। দণ্ডনীতিশাস্ত্রে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সাম, দান, বেদ ও দন্ডাদি প্রয়োগ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, রাজ্যাদিলাভই সেখানে নিঃশ্রেয়স।

কিন্তু ন্যায়বিদ্যা হইল অধ্যাত্ম বিদ্যা, ইহাতে আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষ হইল নিঃ শ্রেয়স। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ইহ তু অধ্যাত্মবিদ্যায়াং ইত্যাদি। অর্থাৎ সর্ববিদ্যা সাধারণ প্রমাণাদি পদার্থের ব্যুৎপাদক, সর্ববিদ্যাসাধ্য নিঃশ্রেয়স লাভের সহায় এবং সংশয়াদি প্রস্থানভেদবশতঃ উপনিষদের ন্যায় কেবল অধ্যাত্ম বিদ্যা না হইলেও আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধন এবং আত্ম নিরূপণরূপ মুখ্য উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত, এই কারণে ন্যায়বিদ্যা যখন অধ্যাত্মবিদ্যা, তখন এই বিদ্যায় আত্মাদি বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং মোক্ষলাভই নিঃশ্রেয়স।

আন্বীক্ষিকী শব্দটি পঙ্কজ শব্দের ন্যায় যোগরূঢ়। পঙ্কজ শব্দ অবয়বার্থ এবং সমুদায়ার্থ সহযোগ ''পঙ্ক জনি কর্ত্তৃ পদ্ম'' এই রূপ অর্থ প্রতিপাদন করে। অনুরূপভাবে আন্বীক্ষিকী শব্দটিও অর্থপ্রতিপাদন করে। যেমন- অনু পশ্চাৎ ঈক্ষা অর্থাৎ শ্রবণের অনন্তর ঈক্ষা = মনন। এই মননের জন্য প্রবৃত্তবিদ্যা আন্বীক্ষিকী। আর আন্বীক্ষিকী সমুদায়ের অর্থ ন্যায়বিদ্যা। অতএব মননবোধক ন্যায়বিদ্যা ইহাই আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ।

প্রথম সূত্র প্রতিপাদ্য অপবর্গের পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত

মহর্ষি গৌতম প্রথমসূত্রের দ্বারা প্রতিপাদ্য দ্বারা প্রতিপাদ্য ষোড়শ পদার্থ এবং ন্যায়বিদ্যার প্রয়োজন এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধের সূচনা করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষা ব্যতিরেকে ঐ সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। সেই কারণে মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রে সেই পরীক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি স্বীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া ঐ সম্বন্ধ ও প্রয়োজন সমর্থন করিয়াছেন। দ্বিতীয় সূত্রটি মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্র। কিন্তু পূর্বপক্ষ ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমতঃ সেই পূর্বপক্ষের সূচনা করিয়া দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যোক্ত ''তত্ত্বজ্ঞানাৎ'' এই পদের সূত্রের সহিত যোগ বুঝিতে হইবে।

ভাষ্য। ''তচ্চ খুল বৈ নিঃশ্রেয়সং কিং তত্ত্বজ্ঞানানন্তরমেব ভবতি? নেত্যুচ্যতে, কিং তর্হি? তত্ত্বজ্ঞানাৎ''। সূত্র— ''দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরা-পায়ে তদনন্তরা পায়াদ পবর্গঃ''

অর্থাৎ সেই নিঃশ্রেয়স, যাহা ন্যায়বিদার মুখ্য প্রয়োজন, তাহা কি তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই হয়? ইহা কিন্তু বলা হয় নি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই নির্বাণ মুক্তি হয়, ইহা মহর্ষি গৌতম বলেন নাই। পরন্তু নিঃশ্রেয়স তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত হয়। যেমন-দুঃখ, জন্ম, ধর্ম, অধর্মরূপ প্রবৃত্তি, রাগদ্বেষরূপ দোষ, এবং মিথ্যাজ্ঞানের অর্থাৎ আত্মা শরীর প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থ-বিষয়ে নানাবিধ ভ্রমজ্ঞানের উত্তরোত্তরের অপায় বা পর পরটির নিবৃত্তি হইলে ''তদনন্তর'' পদার্থের অর্থাৎ ঐ মিথ্যাজ্ঞান প্রভৃতি পর পর পদার্থের অব্যবহিত পূর্বোক্ত দুঃখ পর্য্যন্ত পদার্থের নিবৃত্তি প্রযুক্ত অপবর্গ বা নির্ব্বাণমুক্তি হয়।

জ্ঞাতব্য এই যে, সর্বত্র অনন্তর পদে অব্যবহিত উত্তর গৃহীত হয়। কিন্তু সূত্রোক্ত অনন্তর পদে অব্যবহিত পূর্ব বুঝিতে হইবে। যেমন এই সূত্রে দুঃখ প্রভৃতি চারটি শব্দ যে ক্রমে কথিত তদনুসারে ঐ দুঃখ প্রভৃতি চারটি পদার্থের অব্যবহিত উত্তর জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান এই চারটি পদার্থকেই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন ''উত্তরোত্তরাপায়ে''। অর্থাৎ উত্তর পদার্থগুলির অপায় বা নিবৃত্তি প্রযুক্ত অব্যবহিত পূর্ব পূর্ব পদার্থের অর্থাৎ দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ইহাদের অপায় বা নিবৃত্তি হয়।

জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান এই চারটি হইল উত্তরবর্তী, আর দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি দোষ এইগুলি হইল পূর্ববর্ত্তী। উত্তরগুলি কারণ এবং পূর্বগুলি তাহার কার্য্য। কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় সিদ্ধ। কারণভূত মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে তাহার অব্যবহিত পূর্ব কার্য্যভূত দোষের অপায় হয়। সেইরূপ কারণভূত দোষের অপায়ে তাহার অব্যবহিত পূর্ব প্রবৃত্তির অপায় হয়। আবার কারণভূত প্রবৃত্তির অপায়ে তাহার কার্য্যভূত-অব্যবহিত-পূর্ব জন্মের অপায় বা নিবৃত্তি হয়। কারণভূত জন্মের অপায়ে তাহার কার্য্য দুঃখের অপায় হয়। জন্ম না হইলে দুঃখের কোনপ্রকার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ তখন আর দুঃখের কোন কারণ থাকে না।

বস্তুতঃ মহর্ষি প্রথমসূত্রে তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা অপবর্গের ক্রমপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুক্তি দ্বিবিধ— জীবন্মুক্তি ও নির্বানমুক্তি, সুতরাং জীবন্মুক্তি মহর্ষিসম্মত।

পরন্তু চরম তত্ত্বজ্ঞান স্বতঃই চরমমুক্তির কারণ নহে। তত্ত্বজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা মুক্তির কারণ হয়। দুঃখ, জন্ম প্রভৃতি অনাদি, অনাদিকাল হইতে ঐ দুঃখজন্মাদির কার্য্যকারণভাবই সংসার।

"অশুভা প্রবৃত্তি"

আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে সূত্রোক্ত মিথ্যাজ্ঞান অনেক প্রকার হয়। যেমন— আত্মা বিষয়ে নাই বা আত্মা নাই এইরূপ জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান। দুঃখ পদার্থ বিষয়ে সুখ এইরূপ জ্ঞান। অনিত্য পদার্থ বিষয়ে নিত্য এইরূপ জ্ঞান। অত্রাণে বা যাহা রক্ষক নহে, তাহাতে ঈদৃশ জ্ঞান।সভয় পদার্থে নির্ভয় এতাদৃশ জ্ঞান। জুগুপ্সিত বা নিন্দিত বিষয়ে অভিমত বা ইষ্ট এইরূপ জ্ঞান। হাতব্য বা ত্যাজ্যবিষয়ে অত্যাজ্য এইরূপ জ্ঞান। প্রবৃত্তি বিষয়ে বা শুভাশুভ কর্ম বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান হইল— কর্ম নাই, কর্মফল নাই এইরূপ জ্ঞান। দোষ বা রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান এই সংসার দোষ নিমিত্তক নয় এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব পুর্নজন্ম বিষয়ে যে মৃত হইবে এবং মরণের পরে জন্মিবে এমন জন্তু বা জীব, সত্ত্ব বা আত্মা নাই এইরূপ জ্ঞান। নিমিত্ত শূন্য জন্মের নিবৃত্তিও নিমিত্ত্য শূন্য। অর্থাৎ জীবের জন্ম-নিবৃত্তির কোন কারণ নাই। অতএব প্রেত্যবাব সাদি এবং অনন্ত এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব নিমিত্ত জন্য হইলেও কর্ম তাহার নিমিত্ত নয় এইরূপ জ্ঞান। দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি (জ্ঞান), বেদনা অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের সন্তানের উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান হওয়ায় অর্থাৎ কোন দেহাদি প্রবাহের উচ্ছেদের পরে অপর দেহাদিরই পুর্নজন্ম হওয়ায় প্রেত্যভাব নিরাত্মক অর্থাৎ উহাতে অতিরিক্ত কোন আত্মার সম্বন্ধ নাই এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান হইল, যাহাতে সর্বকার্য্যের উপরম বা নিবৃত্তি হয় এমন এই অপবর্গ ভয়ানকই। যাহাতে সমস্ত অভীষ্ট পদার্থের বিয়োগ হয়, এমন অপবর্গ হইলে বহু শুভ বিষয় নাশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে কোন বুদ্ধিমান্ মানব সর্বসুখের উচ্ছেদকারী চৈতন্যহীন এই অপবর্গকে ভাল মনে করিবে? অর্থাৎ ঐরূপ অপবর্গ বা মুক্তি কোন বুদ্ধিমান্ মানবেরই রুচিকর হইতে পারে না। এইরূপ জ্ঞান অপবর্গ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান।

আত্মাদি প্রমেয় পদার্থ বিষয়ে উক্ত উদ্ভূত নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞান হইতে অনুকূল বিষয়সমূহে অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয় সমূহে দ্বেষ জন্মে। রাগ ও দ্বেষের বশবর্তিতা হেতু অসত্য, ঈর্য্যা, কপটতা, লোভ প্রভৃতি নানা দোষের উদ্ভব হয়। দোষসমূহ কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বা জনিত-প্রযত্ন মানুষ শরীরের দ্বারা প্রবর্ত্তমান হইয়া হিংসা, চৌর্য্য এবং নিষিদ্ধ মৈথুন আচরণ করে। বাক্য দ্বারা মিথ্যা, পরুষ বা কর্কশ উক্তি, সূচনা বা পরদোষ প্রকাশ এবং অসম্বন্ধ বা অসংলগ্ন প্রলাপাদি আচরণ করে। মনের দ্বারা পরদ্রোহ, পরদ্রব্যের প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং নাস্তিকতা আচরণ করে। এই সকল পাপাত্মিকা প্রবৃত্তি বা অশুভ কর্ম অধর্মের জন্য হয়।

"শুভা প্রবৃত্তি"

এখন শুভ প্রবৃত্তি বা কর্ম হইল— শরীরের দ্বারা দান, পরিত্রাণ এবং পরিচর্য্যা বা পরিসেবা আচরণ করা। বাক্যের দ্বারা সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায় বা বেদ পাঠাদি আচরণ করে। মনের দ্বারা দয়া, নিস্পৃহতা এবং শ্রদ্ধা আচরণ করে। এই সকল শুভ প্রবৃত্তি বা শুভ কর্ম ধর্মের নিমিত্ত হয়।

এই সূত্রে প্রবৃত্তিসাধন ধর্ম ও অধর্ম প্রবৃত্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্মরূপ প্রবৃত্তি ধর্ম ও অধর্মের সাধন বা জনক। সেই ধর্ম ও অধর্ম প্রবৃত্তি শব্দের দ্বারা অভিহিত। যেমন প্রাণের সাধন অন্ন, অর্থাৎ অন্নসাধ্য প্রাণ। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "অন্নং বৈ প্রাণিনঃ প্রাণঃ" অর্থাৎ অন্নই প্রাণীর প্রাণ, অন্নসাধ্য প্রাণ, আর প্রাণ সাধক অন্ন। অথচ শ্রুতিতে অন্নকে প্রাণ বলা হইয়াছে। সেইরূপ প্রকৃতস্থলে প্রবৃত্তিসাধ্য ধর্ম ও অধর্মকে প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে।

প্রবৃত্তি পদবাচ্য ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে ধর্ম অভিপূজিত বা উৎকৃষ্ট জন্মের কারণ, আর অধর্ম কুৎসিত বা নিকৃষ্ট জন্মের কারণ। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন হইতে পারে, জন্ম কি? উত্তরে বলা যায়, শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও সুখদুঃখ রূপবেদনার নিকায় বিশিষ্ট প্রদুর্ভাব। অর্থাৎ দেব মনুষ্যাদি কোন জীবকূলে সংযাতবিশিষ্ট বা মিলিত অভিনব দেহাদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিশেষকেই সেই আস্মার জন্ম বলে। আর জন্ম হইলে দুঃখ হইবেই। দুঃখ হইল প্রতিকূল বেদনীয়, যাহাকে জীব প্রতিকূলভাবে অনুভব করে দুঃখ, যাহাকে বাধনা, পীড়া, তাপ নামে অবিহিত করা হয়। অনাদি কাল হইতে অভিছেদে প্রবর্ত্তমান বা কার্য্যকারণভাবে উৎপদ্যমান সেইসমস্ত মিথ্যাজ্ঞান হইতে দুঃখ পর্য্যন্ত ধর্মগুলি হইল সংসার।

কিন্তু যে সময় তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে তাহার কার্য্যদোষ সমূহের নিবৃত্তি হয়। দোষের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য জন্মের নিবৃত্তি হয়। যেহেতু কারণের অপায়ে কার্য্যের অপায় হয়। যেমন তন্তুর বিনাশ হইলে তাহার কার্য্য বস্ত্রের বিনাশ হয়। জন্মের নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য্য দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এইভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলে অপবর্গরূপ বা পরমমুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়স হয়।

"তত্ত্বজ্ঞান"

যে ক্রমে মিথ্যাজ্ঞান ব্যাখ্যাত। তত্ত্বজ্ঞান কিন্তু সেই ক্রমে ব্যাখ্যাত হয়নি। পরন্তু মিথ্যাজ্ঞানের বিপরীতভাবে ব্যাখ্যাত, যেমন—আত্মবিষয়ে আছে বা আত্মা আছে এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান বা যথার্থজ্ঞান। অনুরূপভাবে দুঃখে দুঃখবুদ্ধি, নিত্যে নিত্যজ্ঞান, ত্রাণে ত্রাণজ্ঞান, সভয়ে সভয়বুদ্ধি, নিন্দিতে নিন্দিত—বুদ্ধি এবং ত্যাজ্য বিষয়ে ত্যাজ্যবুদ্ধি হইল ঐ সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান।

প্রবৃত্তি বিষয়ে কর্ম আছে, কর্মফল আছে এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। দোষ বিষয়ে এই সংসার দোষ নিমিত্তক এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব বিষয়ে যিনি মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবেন, সেই জন্তু বা জীব আছেন, সত্ত্ব বা

আত্মা আছেন এইরূপ জ্ঞান, জন্ম এবং জন্মের নিবৃত্তি উভয়ই নৈমিত্তিক। সুতরাং প্রেত্যভাব অনাদি এবং অপবর্গান্ত। অর্থাৎ মোক্ষ হইলে প্রেত্যভাবের নিবৃত্তি হয় এইরূপ জ্ঞান হইল তত্ত্বজ্ঞান। প্রেত্যভাব নৈমিত্তিক বা কারণজন্য হইয়া প্রবৃত্তি নিমিত্ত জন্য অর্থাৎ প্রবৃত্তি জন্য বা ধর্মাধর্মজন্য, এইরূপ জ্ঞান। প্রেত্যভাব সাত্মক হইয়া অর্থাৎ প্রেত্যভাব দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্য আত্মযুক্ত হইয়াই দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ সমষ্টির উচ্ছেদ ও প্রতিসন্ধান (স্মৃতি) বশতঃ প্রবত্তি হয় এইরূপ জ্ঞান। অপবর্গ বিষয়ে যাহাতে সকল পদার্থের বিয়োগ হয়, যাহাতে সকল কার্য্যের নিবৃত্তি হয় এমন এই অববর্গ শান্ত অর্থাৎ ভয়ানক নহে এবং অপবর্গে বহু কষ্টকর ঘোর পাপ নষ্ট হয়, সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্বদুঃখের উচ্ছেদকর, সর্বদুঃখের জ্ঞানরহিত অপবর্গকে কেন ভালবাসিবেন না। অতএব যেমন মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন অনাদেয় বা ত্যাজ্য, সেইরূপ দুঃখানুষক্ত সুখ ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য নয় এইরূপ জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান।

দুঃখানুষক্ত সুখ হইল দুঃখের সহিত অনুষঙ্গ বা অবিনাভাব সম্বন্ধ বিশিষ্ট। যেখানে সুখ, সেখানে দুঃখ এবং সেখানে দুঃখ যেখানেই সুখ ইহাই সুখ দুঃখের অবিনাভাব সম্বন্ধ এইরূপ দুঃখের সহিত অবিনাভাব সমন্ধ বিশিষ্ট সুখ কদাচ গ্রাহ্য নহে।

তৃতীয় পাঠ

শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা কার্য্যরূপব্যাপার

মহর্ষি গৌতমকৃত তৃতীয়সূত্রের অবতারণার পূর্বে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ গৌতমকৃত ন্যায়দর্শনের প্রবৃত্তি বা কার্য্যরূপ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন—ত্রিবিধাচাস্যশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিঃ উদ্দেশো লক্ষণং, পরীক্ষা চেতি, অর্থাৎ এই ন্যায়দর্শন নামক শাস্ত্রের প্রবৃত্তি অর্থাৎ উপদেশ ব্যাপার ত্রিবিধ-উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা। তত্র ''নামধেয়েন পদার্থমাত্রস্যাভিধানম্ উদ্দেশঃ'', অর্থাৎ নামের দ্বারা, পদার্থমাত্রের অভিধান অর্থাৎ পদার্থগুলির নামমাত্র কথন হইল - ''উদ্দেশ''। দ্বিতীয় প্রকার উপদেশ ব্যাপার হইল লক্ষণ, ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'তত্রেস্দিষ্টস্য অতত্ত্বব্যবচ্ছেদকো ধর্মো লক্ষণম্'। লক্ষণমাত্রই ইতরব্যাবর্ত্তক বা ইতর ভেদানুমানকহেতু, তাহাই অতত্ত্বব্যবচ্ছেদক শব্দের অর্থ, অতৎ + ত্ব, অতৎ হইল তদ্ভিন্ন, তাহার ভাব অতত্ত্ব বা তদ্ভিন্নত্ব তাহার ব্যবচ্ছেদক বা ব্যবর্ত্তক ধর্মই লক্ষণ। যেমন — সাস্নাবত্ত্ব হইল গরুর লক্ষণ, ইহা গরু গবেতর মহিষাদি হইতে ব্যাবৃত্ত বা পৃথক্ করে। গৌঃ গবেতরভিন্না সাস্নাবত্ত্বাৎ এই অনুমানে লঞ্জণের লক্ষ্য গো পক্ষ, সাধ্য গবেতরভেদ এবং হেতু সাস্নাবত্ত্ব। লক্ষণ সমগ্র লক্ষ্যব্যাপী হইবে এবং অলক্ষ্যগামী হইবে না। সাস্নাবত্ত্ব হেতুটি (লক্ষণ) সমগ্র লক্ষ্য (গো) ব্যাপী, অলক্ষ্য মহিষাদিগামী নয়। কারণ সাস্নাবত্ত্ব সকল গরুতে আছে আর গবেতর অলক্ষ্য মহিষাদিতে নাই। তাই সাস্নাবত্ত্ব হেতুটি (লক্ষণ) অব্যাপ্তি ও অতি ব্যাপ্তিদোষরহিত নির্দোষ লক্ষণ। তাই বলা হয় লক্ষণমাত্রই ইতরব্যাবর্ত্তক বা ইতরভেদানুমাপক হেতু। সুতরাং লক্ষণের লক্ষ্যভূতবস্তুকে পক্ষ করিয়া এবং তদিতরভেদকে সাধ্য করিলে এবং লক্ষণকে হেতু করিলে ইতরভেদানুমাণ হয়। তাহতে হেতুটি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ।

পরীক্ষা হইল শাস্ত্রের তৃতীয় প্রবৃত্তি বা উপদেশ ব্যাপার। ভাষ্যকার বলিয়াছেন-''লক্ষিতস্য যথা লক্ষণমুপপদ্যতেনবেতি প্রমাণের বধারণং পরীক্ষা''। অর্থাৎ লক্ষিত পদার্থের সেই লক্ষণানুসারে সেই পদার্থ উপপন্ন হয় কিনা, এই কারণে তদ্বিষয়ে সংশয়নিরাসের জন্য প্রমাণ সমূহের দ্বারা অবধারণ অর্থাৎ বিচারপূর্বক সেই পদার্থের তত্ত্ব নিশ্চয় পরীক্ষা। তন্মধ্যে উদ্দিষ্ট হইয়া বিভক্ত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পরে সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই বিভক্ত বিশেষ পদার্থগুলির লক্ষণ বলা হইয়াছে-যেমন প্রমাণের ও প্রমেয়ের। প্রমাণ এবং প্রমেয় এই দুইটি পদার্থের উদ্দেশের পর সামান্য লক্ষণ বলা হয় নাই, অথচ তাহাদের বিভাগ করা হইয়াছে। আমার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত পদার্থের অর্থাৎ উদ্দেশের পর সামান্য লক্ষণ বলিয়া বিভাগ করা হইয়াছে। যেমন ছল পদার্থের ''বচনবিঘাতোহর্থ বিকল্পেপপত্ত্যা ছলম্'' এইভাবে ছলের সামান্য লক্ষণ উক্ত হওয়ার পর বিভাগ করা হইয়াছে ''তৎ ত্রিবিধম্''।

উদ্দেশ দুইপ্রকার সামান্য উদ্দেশ ও বিশেষ উদ্দেশ। যেমন প্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ করা হইয়াছে এবং পরে প্রমাণ পদার্থের বিভাগ করা হইয়াছে। বিভাগ বিশেষ উদ্দেশ।

মহর্ষি গৌতম প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা একই প্রকরণে ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয়, প্রয়োজন ও ঐ উভয়ের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই ন্যায়শাস্ত্রের অভিধেয় এবং প্রতিপাদ্য ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য মহর্ষি প্রথমসূত্রেই তাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কেবল নামোল্লেখের দ্বারা

ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব নয়। পরন্তু ঐ সমস্ত পদার্থের লক্ষণ বচন ও পরীক্ষা আবশ্যক। তাই মহর্ষি উদ্দেশের পর লক্ষণ ও পরীক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রমাণের বিভাগ

তৃতীয়সূত্র - ''প্রত্যক্ষা নুমানোপমান শব্দাঃ প্রমাণানি'' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি নামে প্রমাণ চতুর্বিধ। এই সূত্রে মহর্ষি প্রথম উদ্দিষ্ট প্রমাণ পদার্থের বিভাগ করিয়াছেন।

বিভাগ বিশেষ উদ্দেশ, বিশেষজ্ঞান, সামান্যজ্ঞানকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ সামান্যজ্ঞান ব্যতীত বিশেষজ্ঞান হইতে পারে না। অথচ মহর্ষি প্রমাণের সামান্যলক্ষণ না বলিয়াই প্রমাণের বিভাগ করিয়াছেন। ইহা আপাতদৃষ্টিতে দোষাবহ মনে হইলেও মহর্ষির গ্রন্থে কোন ত্রুটি নাই। কারণ তিনি যে তৃতীয়সূত্রে প্রমাণ শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই প্রমাণের সামান্যলক্ষণ সম্ভব। যেমন - প্রপূর্বক মা ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে ল্যুট প্রত্যয়সিদ্ধ প্রমাণ শব্দ। প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্। সুতরাং প্রমাকরণত্বই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ। এই কারণে গ্রন্থের কোন ন্যূনতা বা অনুপপত্তি থাকিল না।

সূত্রোক্ত চতুর্বিধ প্রমাণের মধ্যে প্রথম বা জ্যেষ্ঠ প্রমাণ হইল প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণপদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন অক্ষস্য অক্ষস্য প্রতিবিষয়ং বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং, বৃত্তিস্তু সন্নিকর্ষো জ্ঞানং বা, যদাসন্নিকর্ষস্তদা জ্ঞানং প্রমিতিঃ, যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদানোপেক্ষাযুদ্ধয়ঃ ফলম্। অক্ষস্য অক্ষস্য ইত্যাদি বাক্যে প্রযুক্ত ষষ্ঠী বিভক্তি স্থলে দ্বিতীয়াবিভক্তি হইবে। কারণ প্রতিশব্দ যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তিই হয়। তাহাতে অক্ষং অক্ষং প্রতিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং এইরূপ বিগ্রহ বাক্য হইবে। ইহা অব্যয়ীভাব সমাসের বিগ্রহ বাক্য। প্রত্যক্ষ শব্দের অন্তর্গত অক্ষশব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। তাহা হইলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে বৃত্তি অর্থাৎ ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বৃত্তি শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ ও জ্ঞান। উক্ত ভাষ্য সন্দর্ভে ''বা'' শব্দের অর্থ সমুচ্চয়, বিকল্প নয়। সুতরাং বৃত্তিশব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ এবং জ্ঞান, ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ শব্দ প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রত্যক্ষের বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ প্রমিতি বা প্রত্যক্ষ প্রমা জ্ঞানে ব্যবহৃত হয়।

সন্নিকর্ষ ব্যাপার হইলে জ্ঞান হইবে প্রমিতি। আর জ্ঞান ব্যাপার হইলে হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি হইবে জ্ঞানের ব্যাপারের ফল। অর্থাৎ কোন বিষয়ের যথার্থ প্রত্যক্ষের পরে যে বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয়ে হেরত্ববোধ জন্মে তাহা হানবুদ্ধি। অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয়ে উপাদেয়ত্ব বা গ্রাহ্যত্ব বোধ জন্মে তাহা উপাদান বুদ্ধি, অথবা যে বুদ্ধির দ্বারা সেই বিষয়ে উপেক্ষ্যত্ববোধ জন্মে তাহা উপেক্ষাবুদ্ধি। এই হানাদি বুদ্ধিরূপ প্রমিতিই সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ প্রমানের ফল। সুতরাং ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়র্থ সন্নিকর্ষ যেমন প্রত্যক্ষ প্রমান, সেইরূপ সেই প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য জ্ঞানও প্রমাণ।

নিজ বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হইল সন্নিকর্ষ এবং জ্ঞান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের যে সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ বিশেষ হইলে তজ্জন্য প্রথমে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সন্নিকর্ষই সেখানে সেই ইন্দ্রিয়ের প্রথম বৃত্তি বা ব্যাপার। সেই সন্নিকর্ষজন্য প্রথমে সেই বিষয়ের ''আলোচন'' অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে এবং উহার পরক্ষণে সেই বিষয়ের বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সবিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে। উক্ত

দ্বিবিধ প্রত্যক্ষই সেই সন্নিকর্ষরূপ প্রমাণের ফল। তন্মধ্যে প্রথমোৎপন্ন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে সেই সন্নিকর্ষ অন্যকোন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। কিন্তু পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করিতে তৎপূর্বে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষরূপ বিশেষণ জ্ঞানের অপেক্ষা করে। কারণ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যবিষয়ক প্রত্যক্ষই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। বিশেষণ জ্ঞান ব্যতীত বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মিতে পারে না। সুতরাং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের অব্যবহিত পূর্বে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জন্মে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন পদার্থ বিশেষণরূপে বিষয় হয় না, উহা বস্তুর স্বরূপমাত্র জ্ঞান, উহারই নাম আলোচন। উহা বিশেষণ জ্ঞানরূপে সেই সন্নিকর্ষের সহকারী হইয়া সবিকল্পক প্রত্যক্ষের কারণ হয়। সুতরাং ন্যায়মতে সন্নিকর্ষ যেমন প্রত্যক্ষ-প্রমাণ, সেইরূপ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষপ্রমাণ।

দ্বিতীয় অনুমান প্রমাণ

ভাষ্যকার অনুমান সম্পর্কে বলিয়াছেন- ''লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্।'' অর্থাৎ মিত বা যথার্থরূপে নিশ্চিত লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা লিঙ্গী বা সাধ্য পদার্থের পশ্চাৎমান হইল অনুমান। অর্থাৎ লিঙ্গ নিশ্চয়ের পশ্চাৎ যাহার দ্বারা লিঙ্গীর অনুমতিরূপ মান বা জ্ঞান জন্মে, তাহা অনুমান প্রমান।

ভাষ্যকার অনুমান শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করার জন্য বলিয়াছেন - মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্। অনুমানের প্রকৃত হেতু হইল লিঙ্গ। এইস্থলে সেই লিঙ্গবিশিষ্ট ধর্মীকেই লিঙ্গী অর্থ বলা হইয়াছে। পরন্তু লিঙ্গ বা হেতুর ব্যাপক অনুমেয় ধর্মই লিঙ্গী। অনু শব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অনুমানের ধর্মী পদার্থবিশেষে অনুমেয় ধর্মের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গ মিত অর্থাৎ যথার্থরূপে নিশ্চিত হইলে সেই লিঙ্গ পরামর্শের পশ্চাৎ সেই অনুমেয়ধর্মরূপে লিঙ্গীর যে ''মান'' অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান জন্মে, তাহার করণই অনুমান প্রমান। অনুমান শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে উহার অর্থ হইবে অনুমিতিরূপ জ্ঞান। আর অনুমান শব্দটি অনুমীয়তে অনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে করণবাচ্যে নিষ্পন্ন হইলে তাহার অর্থ হইবে অনুমতির করণ। সুতরাং লিঙ্গ পরামর্শের পর অনুমতিজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় লিঙ্গ পরামর্শই অনুমান প্রমান বা অনুমিতির করণ।

উপমানপ্রমাণ

ভাষ্যকার উপমানের আলোচনায় বলিয়াছেন, ''উপমানং সামীপ্যমানম্। যথা গৌরেবং গবয়'' ইতি। সামীপ্যস্তু সামান্যযোগঃ। অর্থাৎ সামীপ্যমান হইল উপমান প্রমান। উদাহরণ - যথা গো এবং গবয় এইরূপে সাদৃশ্যজ্ঞান হয়, ঐ সাদৃশ্যজ্ঞানই উপমান প্রমাণ। সামীপ্য হইল সামান্যযোগ অর্থাৎ সমানধর্মরূপে সাদৃশ্য সম্বন্ধ। এস্থলে উপ শব্দের অর্থ সাদৃশ্যরূপ সামীপ্য এবং জ্ঞানার্থক মা ধাতু নিষ্পন্ন মান শব্দের অর্থ জ্ঞান, সুতরাং উপমান শব্দের অর্থ সাদৃশ্যজ্ঞান।

শব্দ প্রমাণ

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, শব্দ্যতে অনেন অর্থ ইত্যভিধীয়তে জ্ঞাপ্যতে ইতি শব্দঃ। অর্থাৎ যাহার দ্বারা অর্থ শব্দিত বা অভিহিত বা জ্ঞাপিত হয় তাহা শব্দ। বস্তুতঃ যাহারা দ্বারা অর্থ জ্ঞাপিত বা বোধিত হয় এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে শব্দ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ শব্দের অর্থ অর্থবোধের সাধন শব্দ প্রমাণ।

প্রমাণসংপ্লব ও প্রমাণব্যবস্থা

ভাষ্যকার প্রমাণসংপ্লব ও প্রমাণব্যবস্থা বিষয়ে প্রথমে প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক সমাধান করিয়াছেন। প্রশ্নটি হইল ঃ ''কিং পুনঃ প্রমেয়ম্ অভিসংপ্লবন্তে অথ প্রতিপ্রমেয়ং ব্যবতিষ্ঠন্তে ইতি''। অর্থাৎ অনেক প্রমাণ কি এক প্রমেয়পদার্থকে অভিসংপ্লব করে অর্থাৎ ক্রমশঃ বিষয় করে? অথবা স্ব স্ব প্রমেয় বিষয়ে ব্যবস্থিতই হয়?

সমাধান প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উভয়থাদর্শনম্, অর্থাৎ উভয় প্রকারই পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ প্রমাণসংপ্লব এবং প্রমাণব্যবস্থা দুই-ই দেখা যায়। প্রমাণ সংপ্লবের উদাহরণ, যেমন আত্মা আছে, ইহা আপ্তোপদেশ অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ হইতে জানা যায়, সেই আত্মাকে অনুমান প্রমাণের দ্বারাও জানা যায়। অনুমাপক হেতু বা লিঙ্গ হইল - ''ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্ন সুখদুঃখ - জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্''। অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান এইগুলি আত্মার অনুমাপক হেতু। এই সকল হেতুর সাহায্যে আত্মা অনুমিত হয়। আবার আত্মার প্রত্যক্ষ হয়, অবশ্য অলৌকিক প্রত্যক্ষ, যুক্ত ও যুজ্ঞান যোগীর মধ্যে ধ্যানাদিপরায়ণ যুজ্ঞান নামক যোগিবিশেষের আত্মার যোগসমাধিজাত প্রত্যক্ষ হয়। ''আত্ম - মনসোঃ সংযোগবিশেষৎ আত্ম প্রত্যক্ষঃ'' অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ প্রযুক্ত আত্মায় প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং একই আত্মা ও শব্দ প্রমাণবেদ্য, অনুমান প্রমাণবেদ্য এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ গম্য হওয়ায় প্রমাণসংপ্লব পরিলক্ষিত হয়।

আবার এই স্থানে অগ্নি আছে এইরূপ আপ্তবাক্য বা শব্দপ্রমাণ হইতে অগ্নির প্রতীতি হয়। প্রত্যাসন্ন বা নিকটবর্ত্তী হইলে ধূমদর্শনের দ্বারা অগ্নি অনুমিত হয়। আরও প্রত্যাসন্ন বা সেই অগ্নির অতি নিকটস্থ হইলে সেই অগ্নির প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ তখন ঐ অগ্নিই প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়। সুতরাং অগ্নি শব্দ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয় হওয়ার জন্য প্রমাণসংপ্লব হইয়া থাকে।

অতএব প্রমাণসংপ্লবের একাধিক উদাহরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় প্রমাণসংপ্লব অবশ্যস্বীকার্য্য।

প্রমাণব্যবস্থা

কোন একটি প্রমাণের দ্বারা কোন একটি বিষয়ের জ্ঞানস্থলে প্রমাণ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। প্রমাণ ব্যবস্থা হইল প্রমাণের অসঙ্কর। প্রমাণ ব্যবস্থা স্থলে বহুপ্রমাণের সমাবেশ থাকে না, একটু মাত্র প্রমাণ বিদ্যমান থাকে।

প্রমাণব্যবস্থার উদাহরণ, অগ্নিহোত্রং জুহূয়াৎ স্বর্গকামঃ অর্থাৎ স্বর্গকামনায় অগ্নিহোত্র নামক যাগ করিবে, এইরূপ শ্রুতিবাক্যই স্বর্গবিষয়ে প্রমাণ। অর্থাৎ ঐরূপ শ্রুতিবাক্য বা শব্দপ্রমাণ ব্যতীত অন্যকোন প্রমাণ স্বর্গবিষয়ে সম্ভব নয়। লৌকিক ব্যক্তির স্বর্গবিষয়ে লিঙ্গদর্শন অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নাই, প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অর্থাৎ অলৌকিক স্বর্গাদি পদার্থ বিষয়ে শাস্ত্রভিন্ন কোন প্রমাণ সম্ভব না হওয়ায় প্রমাণ ব্যবস্থাই স্বীকার্য্য। আর স্তনয়িতু বা মেঘের শব্দ শ্রূয়মান হইলে শব্দহেতুর অর্থাৎ সেই শব্দের অপ্রত্যক্ষ কারণের অনুমান হয়, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, শব্দ প্রমাণ নাই, পাণি বা হস্ত প্রত্যক্ষতঃ উপলভ্যমান হইলে তখন সে বিষয়ে অনুমান প্রমাণ থাকে না, শব্দ প্রমানও থাকে না। অর্থাৎ উক্তরূপ লৌকিক বিষয়েও অনেকক্ষেত্রে প্রমাণ ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

প্রমাণসংপ্লবস্থলে অনেক প্রমাণের দ্বারা একটি বিষয়ের অনেক জ্ঞান হইলেও সেইস্থলে প্রত্যক্ষেরই প্রাধান্য থাকে। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''সাচেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা''। অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রমাণসংপ্লবস্থলে একই বিষয়ে ক্রমশ ঃ অনেক প্রমাণ দ্বারা যে সমস্ত প্রমিতি উৎপন্ন হয়; তাহা প্রত্যক্ষপরা, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষই পর বা প্রধান। কারণ জিজ্ঞাসিত বিষয়কে আপ্তবাক্য বা শব্দ প্রমাণ হইতে বুঝিলে তখন সেইব্যক্তি লিঙ্গদর্শন বা অনুমান প্রমাণের দ্বারা বুঝিতে ইচ্ছা করে। আবার লিঙ্গ-দর্শনের দ্বারা বা অনুমানের প্রমাণের দ্বারা অনুমিত সেই বিষয়কেও প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ বিষয়ে অর্থাৎ পরে সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইলে সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। এই বিষয়ে উদাহরণ হইল অগ্নি। অগ্নিকে শব্দপ্রমাণ ও অনুমানপ্রমাণের দ্বারা জানিলেও জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অগ্নির প্রত্যক্ষ হইলে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয়। তখন আর অন্য প্রমাণের দ্বারা অগ্নিকে জানিবার ইচ্ছা থাকে না। তাই বলা হয়, প্রমাণ সংপ্লবস্থলে জায়মান প্রমিতিসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রধান। সুতরাং একই প্রমেয় বিষয়ে অনেক প্রমাণের সংকরকে অভিসংপ্লব বলে এবং অসংকরকে ব্যবস্থা বলে।

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

সম্প্রতি বিভক্ত প্রমাণসমূহের লক্ষণবচন কর্ত্তব্য। এই কারণে ক্রমানুসারে প্রথমোক্ত এবং সর্বজ্যেষ্ঠ প্রত্যক্ষ প্রমাণের লক্ষণই বক্তব্য। তাই সূত্রকার মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষ লক্ষণের সূত্র নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন ''ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্''। লক্ষণার্থ - ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সেই ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বিশেষহেতুক উৎপন্ন 'অব্যপদেশ্য' বা অশাব্দ, অব্যভিচারি, বা যথার্থ ব্যবসায়াত্মক বা নিশ্চায়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ। এই লক্ষণে প্রত্যক্ষ হইল লক্ষণের লক্ষ্য এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন, অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারি, ব্যবসায়াত্মক এবং জ্ঞান এই পাঁচটি পদ লক্ষণের নির্দেশক। সূত্রস্থ জ্ঞান পদটির অর্থ প্রমাজ্ঞান। এইজন্য যতঃ পদের অধ্যাহার করিয়া প্রমাণের লক্ষণ নির্বাচন করিতে হইবে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নত্বাদি চতুর্বিধবিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞান যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তত্ত্বজ্ঞানের সহায়করূপে প্রথমে পদার্থের লক্ষণ বক্তব্য। প্রত্যক্ষ সর্ব জ্যেষ্ঠ এবং সর্বদর্শনসম্মত। এই কারণে সর্বগ্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ করা হইয়াছে। সমানাসমানব্যবচ্ছেদ হইল লক্ষণার্থ বা লক্ষণের প্রয়োজন। অসাধারণ ধর্ম লক্ষণ, প্রত্যক্ষের লক্ষণ তাহার সমানজাতীয় অনুমানাদি প্রমাণ হইতে এবং অসমানজাতীয় প্রমাণাভাস ও প্রমেয়াদি পদার্থ হইতে প্রত্যক্ষকে ভিন্ন করে। যে কোন লক্ষণরূপ হেতুর দ্বারা লক্ষ্যভূত বস্তুটি তদিতর পদার্থ হইতে ভিন্ন ইহা প্রতিপাদিত হয়। যেহেতু লক্ষণমাত্রই ইতরভেদানুমাপকহেতু।

প্রত্যক্ষ লক্ষণে জ্ঞান পদ প্রযুক্ত না হইলে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন সুখে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এজন্য জ্ঞানপদ লক্ষণে সন্নিবেশিত। সুখ ও জ্ঞান গুণ হইলেও ভিন্ন। শাব্দজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য লক্ষণে অব্যপদেশ্যপদ প্রযুক্ত। অব্যপদেশ্য পদের অর্থ অশাব্দ। অব্যভিচারি পদের দ্বারা ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়। ব্যবসায়াত্মক পদের দ্বারা সংশয়াত্মক জ্ঞানে অতিব্যাপ্তির নিরাস হয়। এবং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন এই পদের দ্বারা অনুমানে অতিব্যাপ্তি বিদূরিত হয়। ঐরূপ জ্ঞানের যাহা করণ, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব সূত্রোক্ত লক্ষণটি প্রত্যক্ষপ্রমাণেরই লক্ষণ।

সূত্রানুসারে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষমাত্রই প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইলে আত্মমনঃ সংযোগ, ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগ এই ইন্দ্রিয়ার্থসংযোগ প্রত্যক্ষের কারণ হইতে পারে না। এইরূপ শঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার কারণ বলিয়াছেন, প্রত্যক্ষের যাবৎ কারণের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু প্রত্যক্ষের যাহা বিশেষ বা অসাধারণ কারণ; সূত্রে তাহারই সূচনা করা হইয়াছে। অনুমানাদি প্রমাণ সাধারণ কারণের উল্লেখ সূত্রে করা হয় নাই। এবং সেই সাধারণ কারণের নিষেধ বা নিবর্ত্তন বা প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। আর আত্ম মনঃ সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষপ্রমাণ ইহা বলা যায় না। জন্য জ্ঞানমাত্রই আত্মমনঃ সংযোগজন্য হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মমনঃ সংযোগ প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ। সূত্রে প্রত্যক্ষের অসাধারণ কারণ নির্বাচ্য হওয়ায় সাধারণ কারণ বলিয়া আত্মমনঃ সংযোগের উল্লেখ করা হয় নাই। তথাপি তাহার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই।

এখন শঙ্কা হইতে পারে, প্রত্যক্ষের অসাধারণকারণ নির্বাচ্য হইলে ইন্দ্রিয়-মনঃ সংযোগও বলা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু তাহা একমাত্র প্রত্যক্ষের প্রতিই কারণ।

এইরূপ শঙ্কা নিবারণের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্য নায়ং ভিদ্যত ইতি সমানত্বাৎনোক্ত ইতি,'' অর্থাৎ আত্মমনঃ সংযোগের ন্যায় ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগও সাধারণ কারণ, অসাধারণ কারণ নহে, তাই ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগও উক্ত হয় নাই। ভিদ্যমানস্য ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা যায়, ভিদ্যমান অর্থাৎ রূপজ্ঞান অথবা চাক্ষুস জ্ঞান ইত্যাদি সংজ্ঞার দ্বারা অন্যান্য জ্ঞান হইতে ভিন্নত্বরূপে জ্ঞাপ্যমান প্রত্যক্ষজ্ঞানের সম্বন্ধে এই ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ বিশিষ্ট হয় না, অর্থাৎ ঐ সংযোগের আশ্রয় ইন্দ্রিয় অথবা মনের বাচক সংজ্ঞার দ্বারা বিভিন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভেদ বোধিত হয় না। এই কারণে সমানত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ উহাও আত্মমনঃ সংযোগের সমান বলিয়া উক্ত হয় নাই।

বস্তুতঃ বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যখন যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মে, তখন সে ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার মনের সংযোগও সেই প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। কিন্তু কেবল মনের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জন্মে, সেই মানস প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগ কারণ নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগজন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, এইরূপ লক্ষণ বলা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগ বাহ্যপ্রত্যক্ষে অসাধারণ কারণ, উহা অনুমানাদি জ্ঞানে কারণ নয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের কারণ বক্তব্য হইলে অসাধারণকারণভূত ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগ ও বলা আবশ্যক। ইহাই পূর্বপক্ষের তাৎপর্য্য। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার ''ভিদ্যমানস্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্য ন্যায়ং ভিদ্যতে'' এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন।

তাৎপর্য্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপের প্রত্যক্ষ হইলে সেই প্রত্যক্ষের ব্যপদেশ হয় রূপজ্ঞান বা চাক্ষুষজ্ঞান। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ও রূপ এদের বাচক শব্দের দ্বারাই জ্ঞানের ব্যপদেশ হয়। সংজ্ঞার দ্বারা পদার্থের প্রকাশও ব্যপদেশ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগের আধার ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের দ্বারা সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের ব্যপদেশ হইবে। যেমন রূপজ্ঞান ও চাক্ষুষজ্ঞান। কিন্তু সেই জ্ঞানে আত্মমনঃ সংযোগ ও ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ কারণ হইলেও সেই সংযোগের আশ্রয় আত্মা ও মনের দ্বারা সেই জ্ঞানের ব্যপদেশ হয় না। ঐ ব্যপদেশের অভাবই আত্মমনঃ সংযোগ ও ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগের সাম্য। এই কারণে ইন্দ্রিয়মনঃ সংযোগের উল্লেখ কররা হয় নাই।

মহর্ষি গৌতম মনের ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ লক্ষণস্থ ইন্দ্রিয় পদে মনও গৃহিত হইবে। সন্নিকর্ষ ষড়্‌বিধ, সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় এবং

বিশেষণবিশেষ্যভাব। দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সংযোগসন্নিকর্ষ। দ্রব্যগতগুনকর্ম ও জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ। গুণ ও কর্মগতজাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবেত সমবায় সন্নিকর্ষ। আর অভাব ও সমবায়ের প্রত্যক্ষে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ। আত্মগত সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষে আত্মমনঃ সংযোগ সন্নিকর্ষ।

''অব্যপদেশ্যপদের সার্থকতা''

মহর্ষি গৌতম প্রত্যক্ষ লক্ষণে পাঁচটি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানপদটি সুখদুঃখের বারক। কিন্তু বিশেষ্য ব্যতীত কোন বাক্য সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানপদটি বিশেষ্যরূপে ব্যবহার্য্য।

এখন সূত্রস্থ তৃতীয় পদ অব্যপদেশ্য পদের সার্থকতা বিচার্য্য। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতে বলিয়াছেন, ''যাবদর্থং বৈ নামধেয় শব্দাঃ'' ইত্যাদি। অর্থাৎ যতগুলি পদার্থ আছে, তাহদের প্রত্যেকেরই সংজ্ঞাশব্দ বা বাচকশব্দ আছে, সেই বাচক শব্দের সহিতই অর্ত বা বিষয়ের সম্যক্ প্রতীত হয়, অর্থের সম্যক্ প্রতীতিবশতঃই ব্যবহার হয়। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য উৎপন্ন অর্থজ্ঞানও ''ইহা রূপ'' অথবা ''ইহা রস'' এই প্রকারের হয়। রূপ ও রস এই শব্দগুলি বিষয়ের বা ঐ জ্ঞানের বিষয় রূপাদি অর্থের সংজ্ঞা বা বাচক শব্দ। সেই বাচক শব্দের দ্বারা রূপ ইহা জানিতেছে, রস ইহা জানিতেছে,এইরূপে জ্ঞানের ব্যপদেশ হয় অর্থাৎ অন্যান্য জ্ঞান হইতে বিশিষ্টরূপে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা ব্যপদিশ্যমান হওয়ায় ঐ জ্ঞানের শাব্দত্ব প্রসক্ত হয়। অর্থ্যৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য উক্ত রূপাদি জ্ঞান রূপাদি শব্দ বিষয়ক হওয়ায় শাব্দজন্য বা শব্দ এইরূপ আপত্তি হয়।

এই আপত্তি নিবারণের জন্য মহর্ষি প্রত্যক্ষ লক্ষণে অব্যপদেশ্য পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে শাব্দ বলিতে শব্দ প্রমাণজন্য নয়, পরন্তু শব্দে জাতং শাব্দম্, অর্থাৎ শব্দ বিষয়ক হওয়ায় শব্দজন্য। অব্যপদেশ্য পদের অর্থ— বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্য হইল ব্যপদেশ্য, যে প্রত্যক্ষে এই ব্যপদেশ্য নাই তাহা অব্যপদেশ্য।

ভাষ্যকার মহর্ষির সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য উক্ত মতের খন্ডনাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, ''যদিদমনুপযুক্তে শব্দার্থসম্বন্ধে অর্থজ্ঞানং তন্ন নামধেয় শব্দেন ব্যপদিশ্যতে''। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুপযুক্ত বা অজ্ঞাত হইলে অর্থাৎ যাহাদের শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞান নাই জ্ঞেয় অর্থের বাচক শব্দ যাহারা জানে না, তাহাদের অর্থজ্ঞান সংজ্ঞা শব্দ দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয় না। আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ গৃহীত হইলেও অর্থাৎ যাহাদের শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞান আছে, তাহাদের ক্ষেত্রেও এই শব্দটি এই অর্থের নাম, এইরূপ জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তাহাদিগেরও অর্থজ্ঞান শব্দবিষয়ক হয় না।

কিন্তু যে সময়ে সেই অর্থ বা বিষয় জ্ঞান হয়, তখন সেই অর্থজ্ঞান পূর্বোক্ত অর্থজ্ঞান হইতে অর্থাৎ শব্দার্থ সম্বন্ধ জ্ঞানশূন্য বালক প্রভৃতির জ্ঞান হইতে বিশিষ্ট হয় না। সেই অর্থজ্ঞান তাদৃশই হয়। কিন্তু সেই অর্থজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য কোন সংজ্ঞাশব্দ নাই, যাহার দ্বারা প্রতীয়মান হইয়া ব্যবহারের নিমিত্ত সমর্থ হইবে। অপ্রতীয়মান পদার্থের দ্বারা ব্যবহার সিদ্ধ হয় না। অত এব জ্ঞেয় বিষয়ের ''ইতি'' শব্দ যুক্ত সংজ্ঞা শব্দের দ্বারা সেই অর্থজ্ঞান কথিত হয়, যেমন রূপং ইতি জ্ঞানং রস ইতি জ্ঞানং, অর্থাৎ রূপ শব্দের দ্বারা রূপজ্ঞানকে এবং রস শব্দের দ্বারা রসজ্ঞানকে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং অর্থজ্ঞান কালে সেই সংজ্ঞা শব্দ ব্যাপারবিশিষ্ট হয় না পরন্তু ব্যবহারকালে অর্থাৎ অপরকে বুঝাইবার সময় ব্যাপারবিশিষ্ট হয়। অতএব অর্থজ্ঞানে সেই অর্থের বাচক শব্দ বিষয় হয় না।

কিন্তু অর্থজ্ঞান হইয়াছে, ইহা অপরকে বুঝাইবার সময় উহার অন্য কোন সংজ্ঞা শব্দ না থাকায় সেই অর্থবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়। অতএব বলা যায় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন অর্থজ্ঞান শাব্দ নয় বা শব্দ বিষয়ক না হওয়ায় শব্দজন্য নয়। সুতরাং অর্থজ্ঞানে শাব্দত্ব প্রসক্তি নিবারিত হইল। এই কারণে সূত্রে অব্যপদেশ্য পদের প্রয়োগ সার্থক। তাই পরিশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''অস্মাদশাব্দমর্থ জ্ঞান মিন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন মিতি,'' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্য্যেৎপন্ন যে রূপাদি জ্ঞান, তাহা শাব্দজ্ঞান নয়, কিন্তু প্রত্যক্ষ। ঐ সমস্তজ্ঞানে শব্দ বিষয় হয় না।

অব্যভিচারি পদের সার্থকতা

মহর্ষি প্রত্যক্ষলক্ষণসূত্রে যে চতুর্থ পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা হইল ''অব্যভিচারি''। ভাষ্যকার প্রত্যক্ষলক্ষণস্থিত চতুর্থ অব্যাভিচারি পদের সার্থকতা প্রদর্শন করিতে সর্বাগ্রে বলিয়াছেন যে, গ্রীষ্মকালে পার্থিব উষ্মার সহিত সংসৃষ্ট স্পন্দমান বা ক্রিয়াবিশিষ্ট সূর্য্যকিরণের সহিত দূরস্থ ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ হইলে, তজ্জন্য তাহাতে ''ইহা উদক বা জল'' এইরূপ ভ্রমপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ইহাকেই মরীচিকায় জলভ্রম বলে। উহা জল বা জলত্বরূপ বিশেষণ অংশে ভ্রম। অনুরূপভাবে রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি অসংখ্য ভ্রমপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশেষণাংশে ঐ সমস্ত ভ্রমের করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়। সুতরাং ঐ সমস্ত ভ্রম প্রত্যক্ষ উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষনের লক্ষ্য নয় অলক্ষ্য। তথাপি ঐ সমস্ত ভ্রম প্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন অশাব্দ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হওয়ার জন্য তাহাতে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। অলক্ষ্যে লক্ষণ গেলে অতিব্যাপ্তি হয়, যেমন প্রাণিত্ব গরুর লক্ষণ হইলে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ প্রাণত্ব গো মহিষাদি সাধারণ ধর্ম, গরুর অসাধারণ ধর্ম নয় অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ।

এই কারণে মহর্ষি প্রত্যক্ষ লক্ষণে ''অব্যাভিচারি'' এই চতুর্থপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''যদ্ অতস্মিন্ তদিতিতদ্ ব্যভিচারি'', ''যত্তু তস্মিন্ তদ্ ইতি তদ্ অব্যভিচারী'' এর্থাৎ যাহা যে পদার্থ নয়, সেই পদার্থরূপে তাহার যে প্রত্যক্ষ, তাহা ব্যভিচারী প্রত্যক্ষ। কিন্তু সেই পদার্থে ''তৎ'' এইরূপ যে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা বস্তুতঃ যে পদার্থ, তাহার সেই পদার্থরূপে যে প্রত্যক্ষ তাহা অব্যভিচারি প্রত্যক্ষ। যেমন জলে জলজ্ঞান, শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান ইত্যাদি। অতএব বলা যায়, বিশেষ্যের ধর্ম এবং জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম ভিন্ন হইলে তৎস্থলীয় জ্ঞান ব্যভিচারী বা ভ্রম হয়। এস্থলে বিশেষ্যের ধর্ম শুক্তিত্ব এবং জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম রজতত্ব পরস্পর ভিন্ন। এই কারণে শুক্তিতে রজতজ্ঞান ব্যভিচারি বা ভ্রম। আর শুক্তিতে শুক্তি জ্ঞান অব্যভিচারি বা প্রমা। কারণ ঐস্থলে বিশেষ্যের ধর্ম এবং জ্ঞানের প্রকারীভূত ধর্ম একই শুক্তিত্ব। এই কারণে ঐ জ্ঞান অব্যভিচারি বা প্রমা। অন্যভাবেও বলা যায়, তদ্বতি তৎপ্রকারজ্ঞানং প্রমা এবং তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞানং অপ্রমা। অতএব ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি নিবারণের জন্য প্রযুক্ত অব্যভিচারিপদ সর্বথা সার্থক।

ব্যবসায়াত্মক পদের সার্থকতা

এই বাক্তি বা কোন দ্রষ্টা দূর হইতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা চর্ক্ষুগ্রাহ্য কোন দ্রব্য পদার্থকে দর্শন করতঃ অনবধারণ করে, যেমন ইহা ধূম অথবা ধূলি। অর্থাৎ দৃশ্যমান সেই পদার্থে ধূম ও ধূলির সমান ধর্ম দেখিয়া ইহা কি ধূম? অথবা ধূলি? এইরূপ অনবধারণ বা সংশয় করে। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন সেই সংশয়াত্মক জ্ঞান বা অনবধারণরূপ জ্ঞান প্রত্যক্ষ এইরূপ প্রসক্তি হয়। অর্থাৎ সংশয়াত্মক জ্ঞানে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি নিরসনের জন্য মহর্ষি প্রত্যক্ষলক্ষণে ব্যবসায়াত্মক এই পঞ্চম পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। ব্যবসায় হইল নিশ্চয়।

এখন প্রশ্ন হইল, সংশয়াত্মক জ্ঞান অব্যভিচারি না হইলে তাহাতে প্রত্যলক্ষণের অতিব্যাপ্তি সুদূর পরাহত হইবে। কিন্তু ভাষ্যকারের মতে সংশয়াত্মক জ্ঞান অব্যভিচারি। কারণ দূর হইতে কোন দ্রব্য দর্শন করিয়া এবং তাহাতে ধূম ও ধূলির সমানধর্ম দর্শন করিলে ইহা কি ধূম? অথবা ধূলি? এইরূপ যে সংশয় উৎপন্ন হয়, তাহাও তৎপদার্থে তদ্‌বুদ্ধি। যেহেতু সেই দৃশ্যমান দ্রব্য ধূম বা ধূলি ইহার মধ্যে একতর হইবেই। উহা ধূম হইলে তাহাতে ধূমবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। আর ধূলি হইলেও তাহাতে ধূলিবুদ্ধি তৎপদার্থে তদ্বুদ্ধি। ঐ সংশয়ের বিশেষ্যপদার্থে বিশেষণ দ্বয়ের মধ্যে কোন একটি যখন অবশ্যই থাকে, তখন ঐ সংশয়াত্মক প্রত্যক্ষও সেই প্রকৃত বিষয়ের অব্যভিচারী। এই কারণে সংশয়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। সেই অতিব্যাপ্তি পরিহারের জন্য লক্ষণে ব্যবসায়াত্মক পদ সন্নিবেশিত। সংশয়াত্মক জ্ঞান কোন প্রমাণের ফল নয়। নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই প্রমাণের ফল। অতএব ব্যবসায়াত্মক পদ সার্থক।

মানসপ্রত্যক্ষের আলোচনা

ভাষ্যকার মহর্ষিকৃত প্রত্যক্ষলক্ষণের ব্যাখ্যা করিয়া একটি পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়াছেন যে, মহর্ষি ''ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্ শোত্রা নীন্দ্রিয়ানি ভূতেভ্যঃ'' এই সূত্রে ঘ্রাণাদি পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, মনের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে আপাততঃ মনে হয়, মহর্ষির মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই। সুতরাং আত্মা ও সুখ দুঃখাদি অনেক পদার্থের যে মানসপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণাক্রান্ত নয়। যেহেতু মানস প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ জন্য নয়। এজন্য মানসপ্রত্যক্ষের পৃথক্ লক্ষণ বক্তব্য।

এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''ইন্দ্রিয়স্য বৈ'' ইত্যাদি অর্থাৎ মহর্ষি গৌতমের মতে মন ইন্দ্রিয়ই তথাপি মহর্ষি যে ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথক উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ ধর্মভেদ। ধর্মভেদ হইল ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের বৈধর্ম্য। যেমন ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয় ভৌতিক এবং তাহাদের বিষয় নিয়ম আছে ও ঘ্রাণাদি গন্ধ প্রভৃতি যেসমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে সেই জাতীয় গুণবিশিষ্ট। অর্থাৎ ঘ্রাণাদি ও গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট।

কিন্তু মন অভৌতিক, সর্ববিষয়ক অর্থাৎ মনের গ্রাহ্য বিষয়ের কোন নিয়ম নাই। মনের দ্বারা যে কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। মনে গন্ধাদি কোন গুণ না থাকিলেও মন গন্ধাদিগুনের গ্রাহক হয়। মন সর্ব বিষয়ক, এ বিষয়ে ''মনঃ সর্ববিষয়ং স্মৃতি কারণ সংযোগাধারাত্বাৎ আত্মাবৎ'' এই অনুমান প্রমাণ। আর বিভিন্ন বিষয়ের সহিত একই সময়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও একই সময়ে অতি সূক্ষ্ম মনের অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিধি বা সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় যুগপৎ অনেক ইন্দ্রিয়জন্য অনেক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। কারণ তৎকালে কোন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সন্নিধি এবং অপর ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের অসন্নিধিবশতঃই যুগপৎ অনেক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব মনের ইন্দ্রিয়ত্ব-সিদ্ধ। কাজেই প্রত্যক্ষের লক্ষণান্তর বক্তব্য নয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''ন বাচ্যং লক্ষণান্তরম্''?

তাছাড়া তন্ত্রান্তর সমাচার অর্থাৎ শাস্ত্রান্তরের সহিত সমাচার বা অবিরোধ প্রযুক্ত ও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু অপ্রতিবিদ্ধ পরমত অনুমত ইহা তন্ত্রযুক্তি। এই সকল কারণে মহর্ষি মানস প্রত্যক্ষের পৃথক লক্ষণের উপন্যাস করেন নাই। মহর্ষি মতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব থাকায় মানসপ্রত্যক্ষও ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য।

চতুর্থ পাঠ

অনুমান প্রমাণ, অনুমান প্রমাণের লক্ষণ

প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিরূপণের অনন্তর মহর্ষি গৌতম অনুমান প্রমাণ নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ''অথ তৎ পূর্বকং ত্রিবিধ মনুমানং পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতো দৃষ্টঞ্চ''। এই সূত্রে মহর্ষি ''অথ'' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণ সঙ্গতি প্রদর্শন করা। যেহেতু নাসঙ্গতং শাস্ত্রে প্রযুঞ্জীত। অর্থাৎ শাস্ত্রে অসঙ্গত বা সঙ্গতিবিহীন বাখ্যের প্রয়োগ করিতে নাই। সঙ্গতি হইল অন্তরাভিধান প্রয়োজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়োহ্যর্থঃ সঙ্গতিঃ। অর্থাৎ অনন্তর অভিধানের প্রয়োজক জিজ্ঞাসার জ্ঞানের বিষয়ীভূত পদার্থই সঙ্গতি। প্রকৃতস্থলে বলা যায়, কোন বিষয় নিরূপণের পরে অন্যবিষয় নিরূপণে সেই নিরূপণীয় বিষয়ে সঙ্গতি আবশ্যক, অন্যথা তাহার নিরূপণ অসঙ্গত হইবে। তাই মহর্ষি সেই সঙ্গতি সূচনার জন্যই এই সূত্রের প্রথমে ''অথ'' প্রয়োগ করিয়াছেন। এই আনন্তর্য্য বোধক ''অথ'' শব্দ হেতু হেতুমদ্ভাবসঙ্গতি প্রদর্শনার্থ। অভিপ্রায় এই যে, সঙ্গতি ষড়্বিধ, প্রসঙ্গ, উপোদ্ঘাত, হেতুতা, অবসর, নির্বাহকত্ব এবং এককার্য্যত্ব। তন্মধ্যে হেতুতা নামক সঙ্গতিই হেতুহেতুমদ্ভাবসঙ্গতি। হেতু শব্দের অর্থ কারণ, আর হেতুমৎ শব্দের অর্থ কার্য্য। যে কার্য্যের যাহা পরম্পরায় আবশ্যক তাহা সেই কার্য্যে কারণ। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণকে তজ্জন্য জ্ঞানবিশেষরূপ অনুমান প্রমাণের হেতু। আর প্রত্যক্ষ নিরূপণের অনন্তরই তাহার কার্য্য অনুমান প্রমাণের নিরূপণ সঙ্গত। যেহেতু ঐ দুইটি প্রমাণের মধ্যে হেতুহেতুমদ্ভাব আছে। মহর্ষি ''অথ'' শব্দের দ্বারা এইরূপসঙ্গতি সূচনা করিয়াছেন।

সূত্রে অনুমানশব্দের দ্বারা লক্ষ্য নির্দেশ করা হইয়াছে এবং তৎপূর্বকং এই পদের লক্ষণ সূচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ অনুমান প্রমাণের লক্ষণই মহর্ষির বক্তব্য। সুতরাং অনুমীয়তে অনেন অর্থাৎ যাহার দ্বারা অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুমান শব্দটি করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ। সূত্রস্থ তৎপূর্বক এই পদান্তগর্ত তৎশব্দে প্রত্যক্ষের পরামর্শ। সুতরাং তৎপূর্বকত্বই অনুমান প্রমাণের লক্ষণ। কিন্তু প্রত্যক্ষজন্যসংস্কার অনুমান প্রমাণ নয়। এজন্য পূর্বসূত্র হইতে জ্ঞানপদের অনুবৃত্তি মহর্ষির অভিপ্রেত। সংস্কার প্রত্যক্ষজন্য হইলেও জ্ঞান নয়, তাই অতিব্যাপ্তির নিরসন হইল। সুতরাং তৎপূর্বকজ্ঞান বা প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

তৎপূর্বকং এই পদে মহর্ষির বিবক্ষিত কি তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''তৎ পূর্বকমিত্যনেন লিঙ্গ লিঙ্গি নোঃ সম্বন্ধ দর্শনং লিঙ্গ দর্শণঞ্চাভিসম্বধ্যতে। স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনের চ অপ্রত্যক্ষোহর্থোহনুময়ীতে'' অর্থাৎ সূত্রস্থিত ''তৎপূর্বকং'' এই পদান্তগর্ত ''তৎ'' পদে প্রত্যক্ষ গৃহীত হইলেও যেকোন প্রত্যক্ষ গ্রহণীয় নয়। আর যেকোন প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞানকে অনুমান প্রমাণ বলিলে শব্দ শ্রবণরূপ প্রত্যক্ষপূর্বক শাব্দ বোধও অনুমান লক্ষণাক্রান্ত হয়। সুতরাং তৎপদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বিশেষ গ্রহণীয়। সেই প্রত্যক্ষবিশেষ হইল ''লিঙ্গলিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং লিঙ্গ দর্শন।'' অর্থাৎ অনুমানের যাহা প্রকৃত হেতু, তাহা লিঙ্গ, এবং তাহা যে পদার্থের লিঙ্গ বা অনুমাপক, সেই অনুমেয় পদার্থকে লিঙ্গী বলে। যে যে স্থানে সেই লিঙ্গ পদার্থ থাকে, সেই সমস্ত স্থানেই সেই লিঙ্গী পদার্থ

অবশ্যই থাকে। সুতরাং লিঙ্গ পদার্থ ব্যাপ্য এবং লিঙ্গী পদার্থ তাহার ব্যাপক। অতএব লিঙ্গ পদার্থ ও লিঙ্গী পদার্থের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। পূর্বে কোন স্থানে সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, তাহা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন। যেমন ধূম লিঙ্গ এবং বহ্নি লিঙ্গী, সেখানে লিঙ্গী বহ্নির অভাব থাকে, ধূম থাকে না। সুতরাং ধূম ও বহ্নির কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধবশতঃ ধূমের সমস্ত উৎপত্তিস্থলে অবশ্যই বহ্নি থাকে। ধূম বহ্নি ব্যতীত থাকে না। ধূম যেখানে থাকে, সেইস্থানে বহ্নি অবশ্যই থাকে। ধূমত্বরূপে ধূম ব্যাপ্য এবং বহ্নিত্বরূপে বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই কারণে ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব সম্বন্ধ আছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থ ব্যাপ্য। ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্য। বহ্নিশূন্য কোন স্থানেই বিলক্ষণ সংযোগ সম্বন্ধে ধূম থাকে না। সুতরাং বহ্নিশূন্যস্থানে বিলক্ষণ সংযোগ সম্বন্ধে বর্ত্তমানত্বের অভাবই ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি। প্রথমে উক্ত ব্যাপ্যব্যাপকসম্বন্ধের নিশ্চয় ব্যতিরেকে কোন স্থানে ধূমদর্শন করিলেও সেই ধূমের দ্বারা সেই স্থলে বহ্নির অনুমিতি হয় না। তাই ভাষ্যকার প্রথমে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন বলিয়া সেই ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের নির্দেশ করিয়াছেন।

ফল কথা, এই সূত্রে তৎপূর্বকং এই পদস্থিত তৎ পদের দ্বারা প্রত্যক্ষ বিশেষ যে অভিধেয়, তাহা ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরে উৎপন্ন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ। যেমন পাকশালাদি কোন স্থানে প্রথমে যে ধূমদর্শন, তাহাই প্রথমলিঙ্গদর্শন। পরে পর্বতাদি কোন স্থানে ধূমদর্শন দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন। ভাষ্যকার পরে লিঙ্গ দর্শনককে এই বাক্যের দ্বারা দ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শন সূচিত করিয়াছেন। প্রথমে পাকশালাদি কোনস্থানে ধূমত্বরূপে ধূমে বহ্নিত্বরূপে বহ্নির ব্যাক্তিরূপ সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা হইল লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধদর্শন। সেই প্রত্যক্ষজন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়। পরে পর্বতাদি কোনস্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সদৃশ ধূমদর্শন করিলে তজ্জন্যপূর্বসংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। এই লিঙ্গ স্মৃতি না হইলে অনুমিতি হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন লিঙ্গস্মৃতি রভি সম্বধ্যতে ঐরূপ লিঙ্গস্মৃতি হইলেও পরক্ষণে অনুমিতি জন্মে না। পরন্তু সেই লিঙ্গস্মৃতির পরে সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমের স্মরণ হইলেই পরক্ষণে অনুমিতি জন্মায়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''স্মৃত্যা লিঙ্গদর্শনের চ অপ্রতক্ষোহর্থোহনুমীয়তে''। উহাই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং উহাই তৃতীয় লিঙ্গদর্শন। সুতরাং পাকশালাদিতে প্রথম ধূম ও বহ্নির মধ্যে সম্বন্ধ দর্শন, তাহার পর পর্বতাদিতে পূর্বজ্ঞাতধূমের সদৃশ ধূমদর্শন এবং উদ্বুদ্ধসংস্কার হইতে বহ্নিব্যাপ্য ধূম এইভাবে ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরে বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত পক্ষধর্মতাজ্ঞান হইবে। আর তাহার পরক্ষণে পর্বতো বহ্নিমান্ এইরূপ অনুমিতি হইবে।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের পূর্বে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং লিঙ্গদর্শন ও পূর্বদৃষ্ট সেই ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের স্মরণ উৎপন্ন হওয়ায় অনুমিতির চরম কারণ লিঙ্গপরামর্শরূপ জ্ঞান তৎপূর্বক জ্ঞান। ঐ জ্ঞানই অনুমান প্রমাণের লক্ষণাক্রান্ত বা লক্ষ্য।

অনুমানের অবান্তর ভেদ

অনুমানপ্রমাণ ত্রিবিধ। পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতো দৃষ্ট অর্থাৎ অনুমান কারণলিঙ্গক, কার্য্যলিঙ্গক এবং তদন্যলিঙ্গক। পূর্ববৎ হইল কারণ লিঙ্গক, শেষবৎ হইল কার্য্যলিঙ্গক এবং সামান্যতো দৃষ্ট হইল তদান্যলিঙ্গক।

পূর্ববৎ অনুমান

এখানে পূর্ব শব্দের অর্থ কারণ। সুতরাং যেস্থলে কারণের জ্ঞানের দ্বারা কার্যের অনুমিতি হয়, অর্থাৎ কারণবিশেষের দ্বারা তাহার ব্যাপক কার্য্যের অনুমিতি হয়, সেইস্থলে অনুমান পূর্ববৎ এই আখ্যাপ্রাপ্ত হয় যথা মেঘের উন্নতি বিশেষের প্রত্যক্ষদ্বারা বৃষ্টি হইবে এইরূপ যে অনুমান হয় তাহা পূর্ববৎ অনুমান।

শেষবৎ অনুমান

শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। সুতরাং কার্য্য বিশেষের জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্যাপক কারণের অনুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণ ''শেষবৎ'' যথা নদীর পূর্বস্থিত জলের বিপরীত জলরূপ পূর্ণত্ব এবং স্রোতের শীঘ্রত্ব বা প্রখরতাবিশেষ দর্শন করিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এইরূপ যে অনুমান হয়, তাহা শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান

এইস্থলে হেতুটি কার্য্যও নয়, আবার কারণও নয়। অন্যত্র দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন ব্রজ্যাপূর্বক অর্থাৎ সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত। সূর্য্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ দেখা যায়। যেমন প্রাতঃকালে একস্থলে দৃষ্ট সূর্য্যেরও কালান্তরে অন্যত্র দর্শন হয়। অতএব অপ্রত্যক্ষ হইলেও সূর্য্যের গতি আছে এইরূপ যে অনুমান তাহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

বিশদার্থ হইল, ভাষ্যকার পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট এই অনুমানত্রয়ের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব শব্দের অর্থ কারণ এবং শেষ শব্দের অর্থ কার্য্য। কার্য্য ও কারণের মধ্যে কারণটি পূর্ব এবং কার্য্যটি শেষ। এইজন্য কারণ অর্থে পূর্ব শব্দের এবং কার্য্য অর্থে শেষ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্বং বিদ্যতে যত্র, অর্থাৎ সে অনুমান প্রমাণে কারণ বিশেষ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয়, এবং শেষো বিদ্যতে যত্র অর্থাৎ যে অনুমান প্রমাণে কার্য্যবিশেষ হেতুরূপে প্রযুক্ত হয়, যথাক্রমে সেই অনুমান পূর্ববৎ ও শেষবৎ। তাহার অর্থ-কারণ লিঙ্গক ও কার্য্যলিঙ্গক অনুমান। কারণ বিশেষ তাহার ব্যাপক কার্য্য বিশেষের অনুমান হয়। আবার কার্য্যবিশেষ তাহার ব্যাপক কারণবিশেষের অনুমাপক হয়। যেমন মেঘের উন্নতিবিশেষরূপ কারণের দর্শনের দ্বারা তাহার কার্য্য ভাবিবৃষ্টির অনুমিতি হয় এবং নদীর পূর্ণতা ও স্রোতের প্রখরতাবিশেষরূপ কার্যের দর্শনের দ্বারা তাহার কারণ অতীত বৃষ্টির অনুমিতি হয়। এই দুই স্থলীয় অনুমান যথাক্রমে পূর্ববৎ ও শেষবৎ। সামান্যতোদৃষ্ট শব্দের অর্থ তদন্যলিঙ্গক। অর্থাৎ যে লিঙ্গ বা হেতু অনুমেয় পদার্থের কারণও নয় ক্যর্য্যও নয়, এইরূপ লিঙ্গের দ্বারা অনুমিতি হইলে সেইস্থলীয় অনুমান প্রমাণ সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন ''ইদং দ্রব্যং পৃথিবীত্বাৎ'' এইরূপ পৃথিবীত্ব হেতুর দ্বারা দ্রব্যত্বের অনুমানস্থলে পৃথিবীত্ব হেতু সাধ্য দ্রব্যত্বের কারণও নয় কার্য্যও নয়। এইমতে উদাহরণ ''বলাকয়া সলিলানুমানম্''। অর্থাৎ দূর হইতে বলাকা দেখিলে তাহার আধার জলের অনুমান হয়। এস্থলে হেতু বলাকা সাধ্য জলের কার্য্যও নয় এবং কারণও নয়। তাই উহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান।

ইহা ভাষ্যকারের অভিমত নয়। ভাষ্যকারের মতে যে স্থলে অনুমেয় পদার্থ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং কোন পদার্থে তাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়, সেইস্থলে অন্যকোন পদার্থে অপর কোন পদার্থের সামান্যতঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে সেই অপ্রত্যক্ষ পদার্থে অনুমিতি হইলে তৎস্থলীয় অনুমান প্রমাণ

সামান্যতোদৃষ্ট। যেমন সূর্য্যের গতিক্রিয়া লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং কোন পদার্থেই তাহার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু একস্থানে দৃষ্ট দ্রব্যের অন্যত্র দর্শন, সেই দ্রব্যের গতিক্রিয়া প্রযুক্ত, ইহা বহুদ্রব্যে পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং এইভাবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে সূর্য্যে গতিমান এইরূপে সূর্য্যে অপ্রত্যক্ষ গতিক্রিয়ায় অনুমিতি উৎপন্ন হয়। কারণ প্রাতঃকালেএকস্থলে দৃষ্ট সূর্য্যেরও মধ্যাহ্নাদি কালে অন্যত্র দর্শন হয়। তাই তাদৃশ দর্শন বিষয়ত্ব হেতুর দ্বারা সূর্যে গতিক্রিয়ার অনুমিতি হয়।

মহর্ষি গৌতম অনুমান প্রমাণের লক্ষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন, অনুমান তিনপ্রকার পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট। ভাষ্যকার এই ত্রিবিধ অনুমানের দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অথবা পক্ষে দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যার অবতারণা করিয়াছেন।

অথবা পূর্ববদিতি ''যথা যথাপূর্বং প্রত্যক্ষ ভূতয়োবন্যতর দর্শনেন অন্যতরস্যাপ্রতক্ষস্যানুমানম্, যথা ধূমেন অগ্নিরিতি''। অর্থাৎ অথবা যেস্থলে যথাপূর্ব প্রত্যক্ষভূত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষকালে পূর্বে কোনস্থানে যে পদার্থদ্বয় যেরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তন্মধ্যে একতরের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ব্যাপ্য পদার্থের সজাতীয় পদার্থের দর্শনের দ্বারা অপ্রত্যক্ষ অন্যতর পদার্থের অর্থাৎ পূর্বদৃষ্ট ব্যাপক পদার্থের সজাতীয় পদার্থের অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেই স্থলীয় অনুমান প্রমাণ 'পূর্ববৎ' নামে অভিহিত হয়। যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নির অনুমিতি হয়। অর্থাৎ কোন স্থানে পূর্বদৃষ্ট ধূমের সজাতীয় ধূমদর্শন করিলে সেখানে পূর্বদৃষ্ট বহ্নির সজাতীয় বহ্নির অনুমিতি হয়, সেই স্থলীয় অনুমাণপ্রমাণকে পূর্ববৎ বলা হয়।

বক্তব্য এই যে, মহানসে প্রথমে ধূম ও পরে বহ্নি এইরূপ ভূয়োদর্শনের ফলে ধূম যেখানে যেখানে থাকে, বহ্নিও সেই সেই স্থানে থাকে অর্থাৎ ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ বহ্নি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কালান্তরে পর্বতাদিতে ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবাপন্ন বহ্নি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্যভূত ধূমের দর্শন হইলে ব্যাপকভূত অপ্রত্যক্ষ বহ্নির অনুমিতি হয়। কারণ ব্যাপ্য, ব্যাপক ব্যতীত থাকে না, যেখানে ব্যাপ্য থাকে সেখানে ব্যাপক অবশ্যই থাকে। যেমন ব্যাপ্য ঘটত্ব থাকিলে ব্যাপক ক্ষিতিত্ব থাকিবেই। সেই অনুমিতির করণ অনুমান পূর্ববৎ, এই ব্যাখ্যায় পূর্ববৎ শব্দটি ক্রিয়াতুল্যতা অর্থে বতি প্রত্যয় নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ পূর্বতুল্য বা পূর্বের ন্যায়।

শেষবৎ অনুমান প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''শেষবন্নাম পরিশেষঃ, সক প্রসক্ত প্রতিযেধে অন্যত্র অপ্রসঙ্গাৎ শিষ্যমাণে সস্ত্রতায়'', ''যথা সদনিত্যমিতেব মাদিনা দ্রব্য গুণকর্মণাম বিশেষেণ সামান্য বিশেষ সমবায়েভ্যো নির্ভক্তস্য শব্দস্য তস্মিন দ্রব্যগুণ - কর্মসংশয়ে ন দ্রব্যসেক দ্রব্যত্বৎ ন কর্ম শব্দান্তর হেতুত্বাৎ, যস্তু শিষ্যতে - সোহয়মিতি শব্দস্য গুণত্ব প্রতিপ্রত্তি ঃ''।

অর্থাৎ শেষবৎ হইল পরিশেষানুমান, আর পরিশেষ হইল প্রসক্ত বা আপত্তির বিষয় পদার্থের প্রতিষেধ বা খন্ডন হইলে অন্য পদার্থে প্রসঙ্গের বা আপত্তির সম্ভাবনা না থাকিলে শিষ্যমাণ বা অবিশিষ্ট পদার্থ বিষয়ে ''সম্প্রত্যয়'' অর্থাৎ যথার্থ অনুমিতিরূপ সম্যক্ প্রতীতির করণ। এইভাবে শেষ পদার্থ বিষয়ক যথার্থ অনুমিতির করণই পরিশেষ অনুমান এবং উহাই শেষবৎ অনুমান আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। শিষ্যতে অবশিষ্যতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিষ্পন্ন শেষ শব্দের দ্বারা যাহা অবশিষ্ট থাকে ইহাই প্রতিপাদিত হয়। ''শেষোহস্তি যস্য প্রতিপাদ্যতয়া'',

অর্থাৎ শেষ পদার্থটি যে অনুমান প্রমাণের প্রতিপাদ্য, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে সিদ্ধ শেষবৎ শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সেই শেষ পদার্থের সাধক অনুমান প্রমাণ, ঐ শেষবৎ অনুমানের নাম পরিশেষ অনুমান। ''সদনিত্যং'' ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভাষ্যকার সেই অনুমানের প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। উদাহরণ, বৈশেষিক মহর্ষি কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ সমবায় এই ষট্ পদার্থের অবতারণা করিয়া পরে বলিয়াছেন, 'সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারনং সামান্য বিশেষ'' যদিতি দ্রবগন কর্মণামবিশেষঃ'' এই সূত্র দ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থের সাধর্ম্য। কিন্তু সামান্য, বিশেষ, সমবায় এই তিনটি পদার্থের সাধর্ম্য নয়। কারণ সেগুলি নিত্য ও সত্তাহীন। পরন্তু কণাদের মতে শব্দে ঐ সত্তা ও অনিত্যত্ব ধর্মগুলি থাকে এবং শব্দ সামান্য, বিশেষ সমবায় হইতে ভিন্ন। ভাষ্যকার এই অভিপ্রায়েই শব্দকে সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় হইতে নির্ভক্ত বলিয়াছেন। কিন্তু শব্দে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য সত্তা, অনিত্যত্ব প্রভৃতি থাকায় সেই সার্ধম্য জ্ঞাননিবন্ধন শব্দ কি দ্রব্য, অথবা গুণ, অথবা কর্ম? এইরূপ সংশয় হয়?

ভাষ্যকার ঐ সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলিয়াছেন, ''ন দ্রব্যমেকদ্রব্যত্বাৎ ন কর্ম, শব্দন্তর হেতুত্বাৎ''। অর্থাৎ শব্দ দ্রব্য নয়, কারণ একমাত্র দ্রব্য আকাশ শব্দের সমবায়িকরণ। কিন্তু কোন দ্রব্যের একটি দ্রব্য সমবায়িকরণ নয় যেমন বস্তুরূপ দ্রব্যের অনেক তন্তু সমবায়িককরণ। আবার শব্দ কর্মও নয়, যেহেতু শব্দ শব্দান্তরের হেতু। অর্থাৎ শব্দ হইতে অপর শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু কর্ম হইতে অপর কোন কর্ম উৎপন্ন হয় না। তাই শব্দ কর্মপদার্থ নয়, অবশিষ্ট গুণ, এইভাবে পরিশেষ অনুমানের দ্বারা শব্দের গুণত্ব সিদ্ধ হয়।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''সামান্যতো দৃষ্টং নাম যত্রাপ্রত্যক্ষে লিঙ্গ লিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধে কেনচিদর্থেন লিঙ্গস্য সাম্যন্যাদ প্রত্যক্ষোলিঙ্গী গম্যতে, যথা ইচ্ছাদিভিরাত্মা ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থান, তদ্যদেষাং স্থানং, স আত্মেতি''। অর্থাৎ তৃতীয় প্রকার অনুমান হইল সামান্যতোদৃষ্ট। উহা প্রথমোক্ত ''পূর্ববৎ'' অনুমানের বিপরীত। পূর্ববৎ অনুমানস্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য। কিন্তু যে স্থলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ব্যাপ্যব্যপকভাব সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য, সেস্থলে ''সামান্যতোদৃষ্ট'' অনুমানের দ্বারা সাধ্য পদার্থের সিদ্ধি হয়। যেমন আত্মা দেহাদিভিন্নত্বরূপে লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্যই নয়। সুতরাং আত্মাতে উৎপন্ন ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুন, ঐ ইচ্ছাদি বিশেষগুনের মানস প্রত্যক্ষ হয়। ঐ মানস প্রত্যক্ষের আধার আত্মাও বিষয় হয়, তথাপি ঐ সমস্ত গুণে আত্মার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ব্য ব্যাপ্য ব্যাপকভাবে সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ যাহাতে ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ জন্মায়, তাহা দেহাদিভিন্ন আত্মা, এইভাবে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের জন্য কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ উদাহরণ আবশ্যক, তাহা কিন্তু নাই। পরন্তু যাহা গুণ পদার্থ, সে সমস্তই দ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপাদিগুণ, এইরূপে সামান্যভাবে গুণপদার্থে বা গুণত্বে দ্রব্যাশ্রিতত্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কারণ বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপাদিগুণ যে দ্রব্যাশ্রিত ইহা কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং এইরূপে সাধারণ ভাবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের ফলে ইচ্ছা প্রভৃতি মনোগ্রাহ্য গুণ কোন দ্রব্যাশ্রিত অর্থাৎ কোন দ্রব্য পদার্থ ঐ গুনের আশ্রয় বা আধার ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই ফলতঃ আত্মা নামে অতিরিক্ত দ্রব্য সিদ্ধ হয়। এইভাবে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা আত্মার অনুমিতি হয়। ঐ অনুমিতির করণ অনুমান সামান্যতোদৃষ্ট নামক অনুমান।

অনুমান লক্ষণস্থিত ''ত্রিবিধ'' পদের পর্যলোচনা

মহর্ষিকৃত অনুমানের সূত্রটি ''তচ্চানুমানং ত্রিবিধং পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ'' এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই সূত্রে অভিহিত ''বিভাগবচন'' অর্থাৎ অনুমান প্রমাণের ত্রৈবিধ্য বোধক '' পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট'' এইবাক্যের দ্বারাই অনুমানপ্রমাণের ত্রৈবিধ্য স্পষ্ট বুঝা যায়, তথাপি সূত্রকার তৎপর্বে ''ত্রিবিধং'' এই পদের প্রয়োগ কেন করিয়াছেন? কারণ স্বল্পক্ষরত্বই সূত্রের প্রথম লক্ষণ, তথাপি সূত্রকার অনাবশ্যক ঐ অতিরিক্ত ''ত্রিবিধং'' পদ কেন ব্যবহার করিয়াছেন?

এইরূপ আশঙ্কার সমাধান পক্ষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ''মহতো মহদ্ বিষয়স্য ন্যায়স্য লঘীয়সা সূত্রেণোপদেশাৎ পরং বাক্য লাঘবং মন্যমানস্যান্যস্মিন্ বাক্যলাঘবে হ নাদরঃ,'' অর্থাৎ উহা সূত্রকারের অত্যাধিক বাক্যসংক্ষেপে অনাদর অর্থাৎ অনিচ্ছা প্রযুক্তি। কারণ অনুমানরূপ ন্যায় মহান্ অর্থাৎ ত্রিবিধ, উহার অবান্তর প্রকারভেদ ও বহু আছে, এবং অনুমান বহু বিষয় অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান পদার্থ অনুমানের বিষয়। সুতরাং ঐ প্রকার অনুমান প্রমাণের অতি লঘু একটি সূত্রের দ্বারা উপদেশ করায় সূত্রকার অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপ মনে করিয়া আরও বাক্য সংক্ষেপের ইচ্ছা করেন নাই। অভিপ্রায় এই যে, ''স্বল্পক্ষরম সন্দিগন্ধং'' ইত্যাদি সূত্র লক্ষণ স্বল্পাক্ষরত্বের ন্যায় অসন্দিগন্ধত্বত্ত সূত্রের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঐ সূত্রে শেযোক্ত ''পূর্ববৎ'' প্রভৃতি শব্দত্রয় যে, পূর্বোক্ত অনুমান প্রমাণের প্রকার ত্রয়েরই নাম, এ বিষয়ে যাহাতে শিষ্যগণের সন্দেহ না জন্মে, এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি তৎপূর্বে ''ত্রিবিধং'' এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পরে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্য বলিয়াছেন যে, সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের এই ন্যায়দর্শনশাস্ত্রে উক্তরূপ বাক্যবৈচিত্রের দ্বারা উক্তপ্রকার সমাচার বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন পরে ''সিদ্ধান্ত'' পদার্থের প্রকারভেদ বলিতে সেই সূত্রের প্রথমেই ''স চতুর্বিধঃ'' এই বাক্য এবং ছল পদার্থের প্রকার ভেদ বলিতে সেই সূত্রের প্রথমে ''তৎ ত্রিবিধ্ম'' এই বাক্য এবং শব্দ প্রমানের প্রকারভেদ বলিতে ''স দ্বিবিধঃ'' এই বাক্য বলিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেকস্থলে অত্যন্ত বাক্যসংক্ষেপে অনিচ্ছাবশতঃ তিনি কোন অতিরিক্ত বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। অনুরূপভাবে এই সূত্রেও মহর্ষি ''ত্রিবিধঃ'' এই পদ বলিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের বিষয়ভেদ প্রযুক্ত ভেদ আছে, ইহা প্রকাশ করার জন্য ভাষ্যকার সর্বশেষে বলিয়াছেন, ''সদ্বিষয়ঞ্চ প্রত্যক্ষং সদসদ্‌বিষয়ঞ্চানুমানম্,'' অভিপ্রায় হইল, লৌকিক সন্নিকর্ষজন্য যে সমস্ত লৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কেবল বর্ত্তমান বস্তুই বিষয় হয়। পরন্তু অনুমান প্রমাণ বর্ত্তমান ও অবর্ত্তমান পদার্থকে বিষয় করে। এইকারণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''ত্রৈকাল্য গ্রহণাৎ''। ''ত্রৈকাল্য'' অর্থাৎ ত্রিকালযুক্ত বা ত্রৈকালিক পদার্থই অনুমানের বিষয় হয়। বর্ত্তমান বিষয় (সন্নিহিত ও অসন্নিহিত) পদার্থ অনুমানের বিষয় হয়। আবার অতীত এবং অনাগত পদার্থও অনুমানের বিষয় হয়। অর্থাৎ ''ভবিষ্যতি'' এইভাবে এবং ''ভবতি'' এইভাবে ও ''অভূৎ'' এইভাবেও অনুমিতি হয়। ভাষ্যস্থ অসৎ পদে অতীত এবং অনাগত বস্তু সূচিত হইয়াছে। সুতরাং ত্রৈকালিক পদার্থ অনুমানের বিষয়। আর বর্ত্তমান পদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়।

পঞ্চম পাঠ

আত্মার নিরূপণ

প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ প্রমাণের নিরূপণের পর ঐ চতুর্বিধ প্রমাণের সাহায্যে যে সকল পদার্থকে জানিলে মোক্ষ হয়, সেই প্রমেয় পদার্থ নিরুপণাভিপ্রায়ে মহর্ষি প্রথমে সেই প্রমেয় পদার্থগুলির বিভাগ করিয়াছেন। যেমন, ''আত্মা-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মন-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম''। আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়। বিভাগসূত্রস্থ প্রমেয়শব্দের দ্বারাই প্রমেয় পদার্থের সামান্য লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। যেমন যাহা প্রকৃষ্টমেয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানের বিষয়, তাহা প্রমেয়। সুতরাং ''সাক্ষাৎ মোক্ষজনক জ্ঞানবিষয়ত্বৎ প্রমেয়ত্বম্'' ইহাই প্রমেয় পদার্থের সামান্য লক্ষণ, ঐ প্রমেয়বর্গের মধ্যে প্রথম প্রমেয় আত্মা (জীবাত্মা)। ঐ জীবাত্মা হইলেন, সর্বদ্রষ্টা, সর্বভোক্তো, সর্বজ্ঞ এবং সর্বানুভাবী। অত্রত্য সর্ব শব্দের দ্বারা সমস্ত সুখ-দুঃখ সাধন এবং সমস্ত সুখ ও দুঃখ গ্রহনীয়। কারণ জীবাত্মা অনাদিকাল হইতে সমস্ত সুখদুঃখের সাধন এবং সমস্ত সুখ-দুঃখের জ্ঞাতা এবং ভোক্তা। জীবাত্মা সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্ববিষয়েরই জ্ঞাতা। এই অভিপ্রায়েই আত্মাকে সর্বজ্ঞ বলা হয়। সুখ-দুঃখ এবং সাধনগুলি প্রাপ্ত না হইলে তাহাদের জ্ঞাতা হওয়া যায় না। এই কারণে আত্মাকে সর্বনুভাবী বলা হইয়াছে। সর্বানুভাবী অর্থাৎ সকল বিষয়ের প্রাপক। যেহেতু সমস্ত বিষয়ের প্রাপ্তি ব্যতীত জ্ঞাতা হইতে পারে না, তাই সর্বানুভাবী বলা হইয়াছে।

প্রমেয়বর্গের মধ্যে প্রথম প্রমেয় আত্মা, আত্মা প্রত্যক্ষপ্রমাণ গ্রাহ্য নয়। তবে কি আপ্তোপদেশ বা শব্দ প্রমাণের দ্বারা আত্মার জ্ঞান হয়? তাহা কিন্তু নয়। পরন্তু অনুমান প্রমানের দ্বারা আত্মার প্রতীতি হয়। হেতু বা অনুমাপক লিঙ্গ ব্যতীত অনুমান হইতে পারে না। এই কারণে মহর্ষি আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে অর্থাৎ আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ প্রদর্শনে জন্য বলিয়াছেন, ''ইচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-সুখ-দুঃখ-জ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গম্'' অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান এইগুলি আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ বা হেতু। প্রয়েমবর্গের মধ্যে পরম প্রয়োজন অপবর্গ জীবাত্মারই পরম-পুরুষার্থ। সুতরাং প্রমেয় পদার্থের মধ্যে জীবাত্মাই প্রধান। এই কারণে মহর্ষি জীবাত্মারই অস্তিত্বসাধক লিঙ্গের নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে জীবাত্মার লক্ষণও সূচিত হইয়াছে। ইচ্ছা প্রভৃতি জীবাত্মাতে উৎপন্ন হয় এবং জীবাত্মার বিশেষ গুণ, এইজন্য জীবাত্মার অনুমাপক লিঙ্গ। এই সূত্রে লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ। ইচ্ছাবত্ত্ব, দ্বেষবত্ত্ব প্রভৃতি আত্মার লক্ষণ। উহাদের মধ্যে ইচ্ছাবত্ত্ব, প্রযত্নবত্ত্ব ও জ্ঞানবত্ত্ব এই তিনটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের সামান্য লক্ষণ। যেহেতু পরমশ্বরের নিত্য ইচ্ছা, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য জ্ঞান আছে। কিন্তু দ্বেষবত্ত্ব, সুখবত্ত্ব ও দুঃখবত্ত্ব এইগুলি একমাত্র জীবাত্মরই লক্ষণ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতে প্রমেয়বর্গেস্থ আত্মশব্দে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই বোধ্য। সুতরাং মহর্ষি প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে প্রমেয় মধ্যে ঈশ্বরের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ নয়, কিন্তু আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ। তাই ভাষ্যকার যথাক্রমে সূত্রোক্ত ইচ্ছা, দ্বেষ প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানকে চিরস্থায়ী নিত্য আত্মার লিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে গিয়া প্রথমে বলিয়াছেন যে, যজ্জাতীয় পদার্থের সন্নিকর্ষজন্য অর্থাৎ চক্ষুঃ সন্নিকর্ষজন্য যজ্জাতীয় পদার্থের দর্শন

করিয়া যে আত্মা সুখের উপলব্ধি করিয়াছেন, পরে তজ্জাতীয় পদার্থের দর্শন করিলে সেই আত্মারই তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা, জন্মে। এই যে পরে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা তাহার দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই প্রথম দ্রষ্টা ও পরে ইচ্ছার কর্ত্তা একই আত্মা। কারণ পরে সেখানে অনেকার্থদর্শী এক আত্মারই সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান জন্মে। এস্থলে ''প্রতিসন্ধান'' শব্দের দ্বরা প্রত্যভিজ্ঞারূপ মানস প্রত্যক্ষই ভাষ্যকারের বিবক্ষিত। অর্থাৎ যে আমি পূর্বে এই জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া সুখের উপলব্ধি করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন ইহা দর্শন করিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছি, এইরূপ মানস প্রত্যক্ষরূপ প্রতিসন্ধান হওয়ায় তদ্বারা এই ইচ্ছা পূর্বাপর কালস্থায়ী আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক হেতু।

কিন্তু ক্ষণমাত্রস্থায়ী নিয়ত বিষয়ক বিজ্ঞানবিশেষ আত্মা হইলে, পরে সেই আত্মা না থাকায় উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে বিজ্ঞান আত্মা, তাহা ক্ষণস্থায়ী এবং বিষয় নিয়ত। কাজেই দর্শনকর্ত্তা এবং প্রতিসন্ধান এক নয় ভিন্ন। ''নান্য দৃষ্টং স্মরত্যন্যঃ'' অর্থাৎ একজনের দৃষ্ট বা অনুভূত বিষয়ে স্মরণ অপরব্যক্তি করিতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন নিয়ত বিষয়ে ''হি বুদ্ধিভেদমাত্রে ন সম্ভবতি, দেহান্তর বৎ''। বৌদ্ধমতে ক্ষণিক বিজ্ঞান আত্মা বলিয়া স্বীকৃত। সুতরাং যে বিজ্ঞান দর্শন করিয়াছে, সেই ক্ষণেই তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই প্রতিসন্ধানের সময় পর্যন্ত সেই বিজ্ঞান থাকে না। সুতরাং প্রতিসন্ধান বা প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব নয়। ''দেহান্তরবৎ'' অর্থাৎ একদেহে অনুভূত বিষয়ের স্মরণ সেই দেহ করিতে পারে। কিন্তু প্রতিসন্ধনক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দেহ থাকে না। পরন্তু পূর্বাপর কালস্থায়ী আত্মায় লিঙ্গ হইতে পারে না। তাই প্রতিসন্ধান সম্ভব নয়।

এইভাবে ইচ্ছারূপ লিঙ্গের দ্বারা পূর্বাপর কালস্থায়ী আত্মার সিদ্ধি হয়। এইরূপ অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকার উৎপন্ন দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে দ্বেষ, অনেকার্থদশী এক ব্যক্তির দর্শনের প্রতিসন্ধানবশতঃ আত্মার অনুমাপক লিঙ্গ অর্থাৎ পূর্বে যে আমি কোন পদার্থকে দর্শন করিয়া দুঃখ অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি সেই জাতীয় পদার্থ দর্শন করিয়া দ্বেষ করিতেছি। এইভাবে দ্বেষ পূর্বাপর কালস্থায়ী এক আত্মার অনুমাপক হয়।

পুনঃ যজ্জাতীয় পদার্থ এই আত্মার সুখজনক বলিয়া প্রসিদ্ধ বা নিশ্চিত, তজ্জাতীয় পদার্থকে দর্শন করিয়া সেই আত্মা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত প্রযত্ন করে, সেই এই প্রযত্ন অনেকার্থদর্শ একদর্শন প্রতিসন্ধাতা অর্থাৎ যে জাতীয় পদার্থ আত্মার সুখজনক, সেই আমি সেই জাতীয় পদার্থ দর্শনে গ্রহণের নিমিত্ত প্রযত্ন ও দর্শনের মানসপ্রত্যভিজ্ঞার কর্ত্তা এক ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। এইভাবে প্রযত্ন পূর্বাপরকালস্থায়ী এক আত্মার অনুমাপক হয়। কিন্তু নিয়ত বিষয় বিজ্ঞানবিশেষমাত্রে সেই দর্শনের প্রতিসন্ধান হইতে পারে না, যেমন অন্যদেহে সম্ভব হয় না।

দুঃখজনক পদার্থ বিষয়ে প্রযত্ন পূর্বাপর কালস্থায়ী এক আত্মার অনুমাপক হয়। উক্তরূপে সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, পূর্বাপর কালস্থায়ী এক আত্মার অনুমাপক হয়। যেমন যে আমি পূর্বে সুখ ও দুঃখের অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন সেই সুখ ও দুঃখের স্মরণ করিয়া তাহার সাধনকে গ্রহণ করায় তজ্জন্য সুখ ও দুঃখের উপলব্ধি করিতেছি, এইরূপে সুখ দুঃখানুভবের প্রতিসন্ধানই পূর্বাপর কালস্থায়ী এক আত্মায় সাধক হেতু। আবার বুভুৎসমান হইয়া অর্থাৎ কোন পদার্থকে বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া এই আত্মাই ''কিংদ্বিৎ''? অর্থাৎ এই পদার্থ ইহা কি? এইরূপ

সংশয় করে, সংশয়ের পর ''ইহা'' এইরূপ নিশ্চয়ও করে, সেই এই জ্ঞান অর্থাৎ পরে উৎপন্ন নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, বুঝিবার ইচ্ছা ও সংশয়ের সহিত অভিন্ন কর্ত্তৃকরূপে জ্ঞানমান হইয়া অর্থাৎ যে আমি পূর্বে বুঝিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া সংশয় করিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন নিশ্চয় করিতেছি, এইরূপ মানস প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইয়া আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে প্রতিসন্ধানই পূর্বাপর কালস্থায়ী এক আত্মার সাধক হেতু।

ভাষ্যোক্ত ''নিয়তবিষয়েহি বুদ্ধিভেদ মাত্রে ন সম্ভবতি দেহান্তরৎ'' এই বাক্যস্থিত ''দেহান্তরবৎ'' এই অংশের বিশ্লেষণ।

যেমন অনাত্মবাদী অর্থাৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে দেহান্তর সমূহে নিয়ত বিষয় বুদ্ধি বিশেষ সমূহ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণিক বিজ্ঞান, বিশেষত্ত প্রতিসংহিত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইতে পারে না। কারণ, ক্ষণিকবিজ্ঞান বিশেষকেই আত্মা বলিলে উহা পরদেহের ন্যায় নিজদেহে ও প্রতিক্ষনে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা হইবে, তাহা হইলে যে আমি পূর্বে সেই পদার্থকে দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই এখন সেই পদার্থ বা তজ্জাতীয় সেই পদার্থকে দেখিতেছি, ইত্যাদি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভবই হয় না, সেই এক এক আত্মার সমাচার, স্বয়ং দৃষ্ট পদার্থেরই স্মরণ হয়, অন্যদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ হয় না, অজ্ঞাত পদার্থেরও স্মরণ হয় না।

এই রূপেই নানা আত্মার সমাচার, অন্যকর্ত্তৃক দৃষ্ট পদার্থ অন্যব্যক্তিস্মরণ করে না। সেই এই অর্থাৎ স্বয়ং দৃষ্ট পদার্থের স্মরণ এবং অন্য দৃষ্ট পদার্থের অস্মরণ অনাত্মবাদী ব্যবস্থাপন করিতে পারেন না। এইরূপে চিরস্থায়ী অহং জ্ঞানের বিষয় পদার্থ আত্ম আছে, ইহা সিদ্ধ হইল।

ষষ্ঠ পাঠ

সংশয় এবং তাহার অবান্তরভেদ।

মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থের মধ্যে অন্যতম ক্রমপ্রাপ্ত সংশয়ের লক্ষণ বলিতে গিয়া প্রথমে সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল, ''সমানানেক ধর্মোপনাত্তে বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনূপলব্ধ্য ব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ''।

সূত্রার্থ (১) সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীয় জ্ঞান। (২) অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞান, (৩) বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ একপদার্থে বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক বাক্য, (৪) উপলব্ধির অব্যবস্থা, (৫) এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা, এই পঞ্চবিধ কারণ জন্য সংশয় পঞ্চবিধ। সংশয় বিশেষাপেক্ষ" অর্থাৎ যাহাতে পূর্বে বিশেষধর্মের উপলব্ধি হয় না, কিন্তু বিশেষ ধর্মের স্মৃতি আবশ্যক, আর ''বিমর্শ'', অর্থাৎ একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান ''সংশয়''।

সূত্রস্থ সংশয়পদের দ্বারা সংশয়ের লক্ষণ নির্দিষ্ট এবং ''বিমর্শ'' পদের দ্বারা সংশয়ের সামান্য সক্ষণ সূচিত হইয়াছে। ''বিশেষাপেক্ষ'' এই পদের দ্বারা বিশেষধর্মের উপলব্ধি সংশয়ের প্রতিবন্ধক, আর সংশয় বিষয়ী ভূত সেই বিশেষধর্মের স্মরণ সংশয়ের কারণ ইহা সূচিত হইয়াছে?

''সমানানেক ধর্মোপপত্তেঃ'' ইত্যাদি পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত পদত্রয়ের দ্বারা লক্ষবিধ বিশেষ কারণ জন্য সংশয় পঞ্চমীবিধ ইহা সূচিত হইয়াছে। বিশেষ কারনজন্য সংশয় বিশিষ্ট হওয়ায় সূত্রোক্ত'' বিমর্শ পদের দ্বারা বিশিষ্ট মর্শ বা বিশেষ সংশয় ইহা বোধ্য। ভাষ্যকার সংশয়াত্মক জ্ঞানকেই বিমর্শমাত্র বা অনবধারণরূপজ্ঞান বলিয়াছেন। সংশয় স্থলে ইদন্ত্বাদি কোন ধর্মরূপে সংশয়ের বিশেষ্য বা ধর্মীয়র অবধারণ বা নিশ্চয় হইলেও সেই সংশয়ের কোটিরূপ বিশেষ ধর্মের অবধারন না হওয়ায় সেই অংশেই উহা অনবধারণ বা সংশয় বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং সামান্যতঃ নিশচয়ভিন্ন জ্ঞানত্বই সংশয়ের সামান্যলক্ষণ বলা যায় না এবং সংশত্বকে জাতি বিশেষও বলা যায় না। যেহেতু ধর্মী-অংশে সেই জ্ঞানে সংশয়ত্ব থাকে না, আংশিক জাতি স্বীকার্য্য নয়। শঙ্কর মিশ্রের মতে সংশয়ের লক্ষণ ''একস্মিন্ ধর্মিনি বিরোধি নানা প্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ংয়ঃ''।

বস্তুতঃ ''মৃর্শ'' ধাতুর অর্থ জ্ঞান এবং ''বি'' শব্দের অর্থ বিরোধ, এই কারণে সূত্রস্থ ''বিমর্শ'' পদের অর্থ হয়, নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই ধর্মীতে বা আধারে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞানই সংশয়াত্মক হয়। সুতরাং সূত্রস্থ 'বিমর্শ' শব্দের দ্বারা মহর্ষির সেইরূপ জ্ঞান বিশেষই বিবক্ষিত। সুতরাং একধর্মিক নানা বিরুদ্ধ ধর্মপ্রকারক জ্ঞানত্বই সংশয়ের সামান্য লক্ষণ। কোন একধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ পদার্থের ''সমূহালম্বন'' জ্ঞান হইলে তাহা সংশয়ের অন্তঃ পাতী হইবে না বা অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ সমূহালম্বনস্থলে সেই সমস্ত বিশেষণভেদে ধর্মিগত বিশেষ্যতা ভিন্ন হয়। কিন্তু সংশয়স্থলে ধর্মিগত বিশেষ্যতা অভিন্ন বা এক। অতএব সেই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারতা নিরূপিত এক বিশেষ্যতাশালি জ্ঞানই সংশয়। সুতরাং প্রাচীনমতে ''একধর্মিক পরস্পর বিরুদ্ধ নানা ভাব প্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ" ইহাই সংশয়ের সামান্যলক্ষণ। যথা ''অয়ং স্থানুর্বা পুরুষো বা'' এইরূপ যে সংশয়, তাহাতে পুরোবর্ত্তী একই পদার্থ মুখ্য বিশেষ্য এবং সেই বিশেষ্য পদার্থে বিশেষ্যতারূপ একই বিষয়তা

থাকে। স্থাণুত্ব ও পুরুষত্বরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম সেই একই বিশেষ্যে মুখ্যবিশেষণ রূপে বিষয় হয়। সুতরাং তাহাতে প্রকারতা নামক দুইটি ভিন্ন বিষয়তা থাকায় উহাকে বলা হয় এক বিশেষ্যতানিরূপক নানাবিরুদ্ধ ধর্মপ্রকারতাশালি। জ্ঞান অতএব প্রাচীন মতে একধার্মিক পরস্পর বিরুদ্ধনানাভাব প্রকারকং জ্ঞানং সংশয়ঃ ইহা সিদ্ধ হইল।

নব্যমতে একধর্মিক পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাভাবোভয় প্রকারকং জ্ঞানং সংশয়। অর্থাৎ কোন একটি ধর্মীতে বা আধারে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব পদার্থের জ্ঞান হইল সংশয়। যেমন 'অয়ং স্থাণুর্নবা' অথবা 'অয়ং পুরুষো নবা', এই আকারে সংশয় হয়, অর্থাৎ স্থাণুত্ব ও তাহার অভাব অথবা পুরুষত্ব ও তাহার অভাবই উক্ত সংশয়ের কোটি বা বিষয় হয়। ইহা নব্যনৈয়ায়িকদের মতে সংশয়ের স্বরূপ।

সংশয়ের অবান্তরভেদ এবং তাহাদের স্বরূপ।

মহর্ষি সূত্রে তিনটি পঞ্চম্যন্তপদের দ্বারা পাঁচ প্রকার সংশয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম পঞ্চম্যন্ত পদ হইল ''সমানানেক ধর্মোপপত্তেঃ'' এই পদের দ্বারা দুই প্রকার সংশয় সূচিত, যেমন উক্ত পদে অভিহিত ধর্ম ও উপপত্তি এই দুইটি শব্দের সমান ও অনেক পদের সহিত অন্বয় হইবে, তাহা হইলে সমানধর্মোপপত্তেঃ, এবং অনেক ধর্মোপপত্তেঃ এই দুই প্রকার সংশয় প্রাপ্ত হয়। সমানপদের অর্থ সাধারণ ধর্ম এবং অনেক পদের অর্থ অসাধারণ ধর্মা সুতরাং সাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী জ্ঞানজন্য প্রথম প্রকার সংশয় এবং অসাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীজ্ঞান জন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয়।

প্রথম প্রকার সংশয়ের উদাহরণ, স্থাণু ও পুরুষের সমান ধর্ম আরোহ এবং পরিণাহ অর্থাৎ উভয়ের তুল্যরূপ দৈর্ঘ্য ও বিস্তৃতি দর্শন করতঃ এবং সেই স্থাণু ও পুরুষের পূর্বদৃষ্ট বিশেষধর্ম বুঝিবার ইচ্ছা করতঃ 'কিং স্বিৎ' এইরূপ অর্থাৎ ইহা এক স্থাণু? অথবা পুরুষ? এইরূপে অন্যতরের অবধারণ করে না অর্থাৎ উভয় কোটি বিষয় অনবধারণ করে। সেই অনবধারণাত্মক জ্ঞানই সংশয়। এই উভয় পদার্থের সাধারণ ধর্মের উপলব্ধি করিতেছি, একতর পদার্থের বিশেষধর্মের উপলব্ধি করিতেছি না। এই প্রকার বুদ্ধি হইল ''অপেক্ষা'' পদার্থ, এই অপেক্ষাই সংশয়ের প্রবর্ত্তন করে। সুতরাং সংশয়ের পূর্বে কারণরূপে ঐরূপ বুদ্ধির উপস্থিতি কাম্য। এই কারণে সংশয় বিশেষাপেক্ষ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সূত্রে বিশেষাপেক্ষ এই পদের দ্বারা সংশয়ের পূর্বে একপ্রকার পদার্থের বিশেষধর্মের উপলব্ধি থাকিবেনা, কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকিবে, ইহাই মহর্ষি 'বিশেষাপেক্ষ' পদের দ্বারা সূচিত করিয়াছেন। এই কারণে ভাষ্যকার ঐ সূত্রের ভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন, ''বিশেষ স্মৃত্য পেক্ষঃ'' অর্থাৎ সংশয়ের ক্ষেত্রে বিশেষধর্মের স্মৃতি অপেক্ষিত। অন্যথা সংশয় সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উপস্থাপনের জন্য সূত্রকার মহর্ষি বলিয়াছেন, '' অনেক ধর্মোপপত্তেঃ''। এই স্থলে 'অনেক' পদের অর্থ, সমানজাতীয় এবং অসমান জাতীয়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন 'সমান জাতীয় সমমান জাতীয় ঞানেকম''। তস্যানেকস্য ধর্মোপপত্তেঃ ''বিশেষস্য উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ''। অর্থাৎ সেই অনেকের ধর্মের অর্থাৎ উহার বিশেষক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্মের উপপত্তি বা জ্ঞান জন্য উক্তরূপ অসাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ধরীর জ্ঞানজন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় জন্মে। যে হেতু উভয় প্রকারেই বিশেষ ধর্মের দর্শন বা জ্ঞান হয়। সজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে এবং

বিজাতীয় পদার্থবর্গ হইতে পদার্থসমূহ বিশিষ্ট হয়, যেমন পৃথিবী গন্ধবত্ত্ব হেতুর দ্বারা সজাতীয় (দ্রব্যত্বরূপে) জলাদি পদার্থ হইতে এবং বিজাতীয় গুন ও কর্ম হইতে বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম। অসাধারণ ধর্মের কার্য্য হইল তাহার আশ্রয়ভূত পদার্থকে তাহার সমানজাতীয় এবং অসমানজাতীয় পদার্থ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত করা। প্রকৃত স্থলে গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম, যেহেতু গন্ধ পৃথিবীর বিশেষগুণ। এই গন্ধবত্ত্ব তাহার আশ্রয় পৃথিবীকে তাহার সমান জাতীয় জলাদি হইতে ব্যাবৃত্ত করে, সেইরূপ অসমানজাতীয় গুন ও কর্ম হইতে ব্যাবৃত্ত করে। এই ক্ষেত্রে অনুমান হইল— পৃথিবী পৃথিবীতর ভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ, গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীতেই থাকে, সেই পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদির এবং গুনও কর্মের ভেদ আছে। গন্ধবত্ত্ব উৎপত্তিকালীন পৃথিবীতে না থাকিলেও গন্ধ সমবায়িকারণ বৃত্তি অথবা গন্ধ সমানধিকরণ দ্রব্য বিভাজক জাতিমত্ত্ব উৎপত্তিকালীন দ্রব্য বা পৃথিবীতে আছে। তাই অব্যাপ্তি হইল না। কিন্তু পৃথিবীতে গন্ধবত্ত্বের অবস্থান বশতঃ পৃথিবীত্ব রূপ বিশেষ ধর্মের নিশ্চয় পূর্বেই হওয়ায় তাহাতে অসাধারণ ধর্মের জ্ঞানজন্য সংশয় হইতে পারে না।

এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার দ্বিতীয় প্রকার সংশয়ের উদাহরণ প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ''অস্তি শব্দে বিভাগজত্বং বিশেষঃ''। অর্থাৎ বিভাগজত্ব শব্দের বিশেষ বা অসাধারণ ধর্ম। অসাধারণ ধর্মের কাজ হইল সেই ধর্মের আশ্রয়ভূত পদার্থকে তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় পদার্থ হইতে বিশিষ্ট করা। তাহা হইলে বিভাগজন্যত্ব শব্দের অসাধারণ ধর্ম হইলে বিভাজন্যত্ব শব্দকে তাহার সজাতীয় শব্দভিন্নরূপাদিগুণ হইতে এবং বিজাতীয় দ্রব্য, কর্মাদি হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত করিবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইল বিভাগজন্যত্ব কিরূপ? উত্তরে বলা যায়, কোন বংশখন্ডের অগ্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া দুই হস্তের দ্বারা তাহাকে খুব জোরে আকর্ষণ করিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দ বংশখন্ডের দুই অংশের বিভাগ এবং দুই অংশের সহিত আকাশের যে বিভাগ, সেই দুই বিভাগ জন্য। প্রথম বিভাগ আকর্ষণ ক্রিয়াজন্য এবং দ্বিতীয় বিভাগ প্রথম বিভাগ জন্য। তন্মধ্যে দ্বিতীয় বিভাগজন্যত্ব শব্দের অসাধারণ ধর্ম। ঐ স্থলে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দের প্রতি আকাশের সহিত সেই বিভক্ত দুই বংশখন্ডের যে বিভাগ অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগ, ঐ বিভাগ শব্দের অসমবায়িকারণ। সুতরাং ঐ দ্বিতীয় বিভাগজন্যত্বই শব্দের অসাধারণ ধর্ম। এখন সংশয় হয়, শব্দ কি দ্রব্য, অথবা গুণ, অথবা কর্ম। অর্থাৎ দ্রব্যরূপ শব্দ অথবা গুণরূপশব্দ অথবা কর্মরূপশব্দ বিভাজন্যত্ব রূপ অসাধারণ ধর্মের দ্বারা তাহার সজাতীয় এবং বিজাতীয় পদার্থ হইতে বিশিষ্ট বা ব্যাবৃত্ত হয়? অথচ শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, এবং কর্মত্ব ইহাদের অন্যতমধর্মের উপলব্ধি হইতেছে না।কিন্তু উহাদের স্মৃতি আছে। এইভাবে উক্ত অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীয় জ্ঞান জন্য দ্বিতীয় প্রকার সংশয় উৎপন্ন হয়। এই স্থলে সংশয় প্রদর্শনই গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু শব্দের দ্রব্যত্ব গুণত্ব, এবং কর্মত্ব প্রতিপাদন নয়। তাহা পরিশেষানুমানস্থলে পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

মহর্ষি সূত্রে '' বিপ্রতিপত্তেঃ'' এই দ্বিতীয় পঞ্চম্যন্ত পদের দ্বারা তৃতীয় প্রকার সংশয়ের সূচনা করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বিপ্রতিপত্তিশব্দের অর্থ বলিয়াছেন, ''ব্যাহতম্ এককার্থ দর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ''। ব্যাহত হইল ব্যাঘাত বিশিষ্ট, আর ব্যাঘাত হইল বিরোধ অর্থাৎ অসহভাব বা সহানবস্থান। সুতরাং এই স্থলে বিরোধ শব্দের অর্থ সহানবস্থান। তাহা পদার্থ দ্বয়ের সহানবস্থানরূপ বিরোধ। ভাষ্যকারের মতানুসারে এক পদার্থে বিরুদ্ধদর্শন বা একই পদার্থে নানা বিরুদ্ধ ধর্মের নিশ্চয় বিপ্রতিপত্তি। ''বিরুদ্ধ প্রতিপত্তি নিশ্চয়'' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে

বিপ্রতিপতিশব্দের মুখ্য অর্থ বিরুদ্ধ নিশ্চয়, অর্থাৎ কোন একই পদার্থে ভিন্নবাদীর বিরুদ্ধে নানা পদার্থের নিশ্চয়। তাহা হইলে একই পদার্থে বা আধারে পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদকবাক্য বিপ্রতিপত্তি। উহা হইতে যে সংশয় জন্মায়, তাহা সূত্রোক্ত তৃতীয় প্রকার সংশয়।

যেমন ''অস্তি আত্মা'' ইহা একটি দর্শন, আবার ''নাস্তি আত্মা'' ইহার অপর দর্শন। দৃশ্যতে অনেন এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ল্যুট প্রত্যয় নিষ্পন্ন দর্শন শব্দের অর্থ বোধজনক বাক্য। আর বিরুদ্ধ নিশ্চয় হইল বিপ্রতিপত্তি। উক্ত দর্শন দ্বয়ে কোন এক বাদীয় নিশ্চয়, নিত্য আত্মা আছে এবং অপর কোন বাদীর নিশ্চয় নিত্য আত্মা নাই। এই অস্বিত্ব ও নাস্তিত্ব পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম। সুতরাং কোন একটি আধারে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব থাকিতে পারে না। তাহা হইলে আত্ম পদার্থেও পরস্পর বিরুদ্ধার্থবোধক অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব সহ অবস্থান করিতে পারে না। অর্থাৎ সদ্ভাব ও অসদ্ভাব একই আত্মপদার্থে সম্ভব নয়। অথচ আত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিত্ব এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষেরই অর্থাৎ অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোন ধর্মেরই আত্মাতে উপলব্ধি হইতেছেনা, বা কোন ধর্মেরই সাধকহেতু উপলব্ধ হইতেছে না। অর্থাৎ কোন তত্ত্বের অবধারণ হইতেছে না। কাজেই তত্ত্বের অনবধারণ রূপসংশয় হইতেছে। এই সংশয়ই বিপ্রতিপত্তিবাক্য জন্য তৃতীয় প্রকার সংশয়।

সূত্রস্থ তৃতীয় পঞ্চম্যন্ত পদ হইল ''উপলব্ধ্যনুপ লব্ধ্য ব্যবস্থাতঃ'' এই বাক্যে উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি এই উভয় পক্ষেই ''অব্যবস্থা'' পদের অন্বয় হইবে। তাহা হইলে উপলব্ধ্যব্যবস্থাতঃ এবং অনুকালব্ধ্যব্যবস্থাতঃ এই দ্বিবিধ বাক্যের প্রাপ্তি হয় এবং ঐ দুটিতেই চতুর্থ প্রকার সংশয় এবং পঞ্চম প্রকার সংশয়ের উপস্থাপক।

উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য চতুর্থ প্রকার সংশয়, এস্থলে উপলব্ধি শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষরূপউপলব্ধি এবং ব্যবস্থাশব্দের অর্থ নিয়ম, আর অব্যবস্থাশব্দের অর্থ অনিয়ম। অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের অথবা অবিদ্যমানপদার্থের উপলব্ধি হয় এমন কোন নিয়ম নাই।

উপলব্ধির অব্যবস্থা হইতে সংশয় জন্মে, এই স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, যেমন বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি, হয়। সেইরূপ কোন কোন স্থলে অবিদ্যমান পদার্থেরও ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ হয়। যেমন তড়াগ প্রভৃতি স্থানে সৎ বা বিদ্যমানজলের উপলব্ধি হয়, আবার মরীচিকায় অবিদ্যমান জলের প্রত্যক্ষ বা ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হয়, সুতরাং বিদ্যমান বিষয়েরই উপলব্ধি হইবে, আর অবিদ্যমান বিষয়ের উপলব্ধি হইবে না, এমন কোন নিয়ম নাই। অতএব কোনও বস্তু উপলভ্যমান হইলে তত্ত্বের ব্যবস্থাপক অর্থাৎ সেই বিষয়ের সত্ত্ব বা অসত্ত্বরূপ তত্ত্বের নিশ্চায়ক প্রমাণের অনুপলব্ধিজন্য কি সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বিষয় উপলব্ধ হইতেছে? অথবা অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বিষয় উপলব্ধ হইতেছে? এই সংশয় জন্মে। অর্থাৎ উপলভ্যমান বস্তু সৎ বা অসৎ এইরূপ যে সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থা বা অনিয়মের জন্য চতুর্থ প্রকার সংশয়।

অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য পঞ্চম প্রকার সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থার ন্যায় অনুপলব্ধি অব্যবস্থাও সংশয়ের কারণ। যেমন ভূগর্ভস্থ সৎ বা বিদ্যমান মূল, কীলক, উদক ইহাদের অনুপলব্ধি হয়, বা উপলব্ধি হয় না। আবার অসৎ বা অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হয়, অসৎ দুই প্রকার অনুৎপন্ন এবং নিরুদ্ধ অর্থাৎ চির বিনষ্ট যাহা অনুৎপন্ন তাহার উপলব্ধি সম্ভব নয়। সুতরাং কোন বস্তু অনুপলভ্যমান হইলে তাহা কি সৎ বা বিদ্যমান অবস্থায়

অনুপলব্ধ হইতেছে, অথবা অসৎ বা বিনষ্ট বা অবিদ্যমান অবস্থায় অনুপলব্ধ হইতেছে, এই প্রকার সংশয় উৎপন্ন হয়। এই সংশয় অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য পঞ্চম প্রকার সংশয়। অতএব উপলব্ধির এবং অনুপলব্ধির অনিয়মবশতঃ সংশয় হইয়া থাকে।

এই দুইস্থলে ও বিশেষাপেক্ষা আছে। অর্থাৎ বিশেষধর্মের নিশ্চয় থাকিবে না, এবং বিশেষ ধর্মের স্মৃতি থাকিতে হইবে। অর্থাৎ কোন পদার্থের উপলব্ধি হইলে, তখন তাহাতে যদি বিদ্যমানত্ব বা অবিদ্যমানত্ব রূপ একতর বিশেষধর্মের নিশ্চয় না হয়, তাহা হইলে তখন তাহার এইরূপ সংশয় জন্মে যে কি বিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে, অথবা অবিদ্যমান পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে?

এইরূপ কোন পদার্থের উপলব্ধি না হইলে তখন এইরূপ সংশয় জন্মে যে, কি বিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হইতেছে? অথবা অবিদ্যমান পদার্থের অনুপলব্ধি হইতেছে?

উপলব্ধির অব্যবস্থা এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়দ্বয় যথাক্রমে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মিজ্ঞানজন্যসংশয় এবং অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মিজ্ঞানজন্য সংশয়ের অন্তঃপাতী হইতে পারে, তাহা হইলে মহর্ষি কি কারণে উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থা জন্য সংশয় এই দুইপ্রকার সংশয়কে পৃথক স্বীকার করিয়াছেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যায়, সমানধর্ম ও অনেকধর্ম জ্ঞেয়বিষয়ের ধর্ম, আর উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি জ্ঞাতা আত্মার ধর্ম এইরূপ বিশেষ বা পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াই মহর্ষি চতুর্থ ও পঞ্চম সংশয় পৃথক স্বীকার করিয়াছেন। ভাষ্যকার পরিশেষে বলিয়াছেন, সমান ধর্মবিগমান্য" অর্থাৎ সমানধর্মের জ্ঞানজন্য বিশেষ স্মৃত্যপেক্ষ সংশয়, অর্থাৎ যাহার অব্যবহিত পূর্বে বিশেষ ধর্মের উপলব্ধি থাকে না, কিন্তু সংশয়বিষয়ীভূত সেই বিশেষ ধর্মের স্মরণ সংশয়ের পূর্বে অবশ্যই থাকিবে। এইরূপ বিমর্শকে সংশয় বলা হয়। তাই মহর্ষি সমান ধর্মের জ্ঞানুরূপ সমান ধর্মোপপত্তি জন্য যে সংশয় জন্মে, ইহাও স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি উক্ত বিশেষ বা পার্থক্য নিবন্ধন মহর্ষি উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকার সংশয় স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং সংশয় পঞ্চবিধই।

সপ্তম পাঠ

''অনাবর্গ'' স্বরূপ এবং পূর্বপক্ষের খন্ডন।

আত্মাদি দ্বাদশ অন্তিম প্রমেয়ের অন্যতম অন্তিম প্রমেয় হইল অপবর্গ। অপবর্গ শব্দের অর্থ নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি অর্থাৎ নির্বাণ মুক্তি। যাহা হইলে জন্ম মৃত্যু রূপ সংসারের নিষ্টা বা সমাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ সর্বতো ভাবে অবসান ঘটে, তাহাই অপবর্গ।

মহর্ষি গৌতম প্রণীত সূত্র ''তদত্যন্তবিমোক্ষোদৃপবর্গঃ'' অর্থাৎ তাহার সহিত বা সর্ববিধগৌণ মুখ্য দুঃখের সহিত আত্যন্তিকভাবে বিমুক্তি হইল অপবর্গ।

সূত্রার্থ— সেই জন্মরূপদুঃখের সহিত অর্থাৎ জায়মান সর্বদুঃখের সহিত অত্যন্ত বিমুক্তি অপবর্গ। যেমন পরিগৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং অপরজন্মের অগ্রহণ হইল জীবের অপবর্গ বা নির্বাণ মুক্তি। এই নিরবধিবা চিরস্থায়ী অবস্থাকে অর্থাৎ আত্মার শরীরাদি সর্ব দুঃখ শূণ্যাবস্থাকে অপবর্গ বিষয়ে অভিজ্ঞ পন্ডিতগণ অপবর্গ বলিয়া অভিহিত করেন। এই অপবর্গকে অজয়, অভর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে।

বক্তব্য এই যে, মহর্ষিগৌতম দুঃখের নিরূপণের অনন্তর অপবর্গের নিরূপণ এবং লক্ষণ করিয়াছেন। কারণ দুঃখের স্বরূপনা বুঝিলে অপবর্গের স্বরূপ বোঝা যায় না। যেহেতু আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হইল ন্যায়মতে মুক্তি বা অপবর্গ। তাই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন, যত্রতু নিষ্ঠা, যত্রতু পর্য্যবসানম্ অর্থাৎ যাহা হইলে পূর্বোক্ত দেহাদি ফলের ত্যাগ ও পুনঃ অগ্রহণের সমাপ্তি হয়। প্রলয়কালেও জীবকুলের দেহাদি পরিগ্রহ হয় না, কাজেই কোনো প্রকার দুঃখ ভোগও হয় না। তথাপি ঐ অবস্থা মুক্তি নয়। এই কারণে ভাষ্যকার পরে বিশদ ভাবে বলিয়াছে, যত্র তু পর্য্যবসানম্। অর্থাৎ যাহা হইলে জীবের সর্বতোভাবে দুঃখের অবসান হয়। প্রলয় কালে জীবের দুঃখের অবসান হইলেও সর্বতোভাবে অবসান নয়। পরন্তু সাময়িক অবসান। কারণ পুনঃসৃষ্টিতে পরে আবার জীবকুলকে দেহাদিপরিগ্রহ এবং দুঃখভোগ করিতে হয়। কিন্তু অপবর্গ হইলে জীবের জন্মনিবৃত্তি হয়, সুতরাং আর কখনো দুঃখভোগ করিতে হয় না। জীবের প্রলয় কালীন সর্বশূন্যাবস্থার পর্য্যবসান হয় না, পরন্তু তাহার পর্যন্ত বা সীমা আছে। এদিকে মোক্ষাবস্থার কোন সীমা নাই। মোক্ষ হইলে আর কদাচ জন্মলাভ ও দুঃখভোগের পুনরাবৃত্তি হয় না। এই বিষয়ে নচ পুনরাবর্ত্ততে'' এই শ্রুতিই প্রমাণ। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতে পরে বলিয়াছেন, ''এতামবস্থামপর্য্যন্তাং অপবর্গং বেদরন্তে অপবর্গবিদ্''ঃ।

ভাষ্যকার সূত্রস্থ ''তদ্'' শব্দের দ্বারা দুঃখানুষক্ত শরীরাদিগৌণ দুঃখ এবং প্রতিকূল বেদনীয় মুখ্যদুঃখ উভয়েরই গ্রহণ করিয়া সূত্রার্থ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। যেমন ''তেন দুঃখেন জন্মনা অত্যন্তং বিমুক্তি রপাবর্গঃ'', অর্থাৎ সকল প্রকার উৎপত্তিশীল দুঃখের সহিত জীবের মুক্তি হইল অপবর্গ।

ভাষ্যকার জীবকুলের এই নির্বাণ মুক্তিকে অভয় অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম, ক্ষেমপ্রাপ্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই মুক্তি ব্রহ্মতুল্য। অর্থাৎ ব্রহ্মার সংসার ভয় না থাকায় যেমন অভয়। সেইরূপ নির্বাণ মুক্তি হইলে

আর সংসার ভয় থাকেনা বলিয়া নির্বান মুক্তি অভয়। শ্রুতিতেও ব্রহ্মকে পুন পুনঃ অভয় বলা হইয়াছে। আর যাহাদের মতে ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''অজর''। অর্থাৎ নিত্য নির্বিকার ব্রহ্মের কোনরূপ জরা বা পরিণাম নাই। অনুরূপভাবে নির্বাণমুক্তিরও কখনও কোনরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। আর যাঁহাদের মতে প্রদীপের ন্যায় চিত্তের চিরনির্বাণই মুক্তি। তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন, ''অমৃত্যুপদ''। অর্থাৎ ব্রহ্ম অমৃত্যুপদ, এবং ব্রহ্মের ন্যায় মুক্তিও অমৃত্যুপদ। উহা প্রদীপের নির্বাণ সদৃশ নয়।

কারণ নিত্যজীবাত্মার নির্বাণ মুক্তি হইলেও তাহার মৃত্যু বা বিনাশ হয় না। তাহা হওয়া সম্ভবও নয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সহিত পূর্বোক্তরূপ নির্বান মুক্তির ঐ সমস্ত সাদৃশ্য প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েই শাস্ত্রে উক্তরূপ মুক্তি 'ব্রহ্ম' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে এবং উক্ত রূপ মুক্তি প্রাপ্তিই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ক্ষেম প্রাপ্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। ন্যায়মতে মুক্তআত্মা ব্রহ্মই হন না, পরন্তু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার পরম সাদৃশ্যলাভ হয়। এই সাদৃশ্য লাভের কথা উপনিষদে ও ভগবদ্গীতায় আছে। যেমন ''নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি'' এবং ভগবদ্ গীতায় আছে, ''ইদং জ্ঞান মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতা'' এই দুই বাক্যে সাম্য ও সাধর্ম্য শব্দের দ্বারা তাহাই বলা হইয়াছে। পরিশেষে বলা যায়, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই নির্বাণ মুক্তি এবং তাহা ব্রহ্মসদৃশ অর্থাৎ অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম এবং ক্ষোমপ্রাপ্তি। সেইরূপ নির্বান মুক্তি ও অভয়, অজয়, অমৃত্যুপদ এবং ক্ষেমপ্রাপ্তি। এইভাবে মুক্ত আত্মার ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ হয়। মুক্ত আত্মা ব্রহ্মই হন না।

অপবর্গ বিষয়ে পূর্বপক্ষের উপস্থাপন ও খন্ডন।

কেহ কেহ বলেন, আত্মাতে যেমন নিত্যমহৎ পরিমান আছে, সেই নিত্যসুখও আছে, সংসারদশায় ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, পরন্তু মোক্ষদশায় মপক্ত আত্মাতে ঐ নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়।

নৈয়ায়িক সম্প্রদায় ঐ মতের সমর্থন করেন না। ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্ মোক্ষেদৃভিব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্ত; সুখী ভববীতি কেচিন্ মন্যন্তে''।

এই মতের বিপক্ষে ভাষ্যকার বলেন, ''তেষাং প্রমানাভাবাদনুপপত্তিঃ। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো বা বিদ্যতে, নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্ববন্ মোক্ষেদ ভিব্যজ্যতে ইতি''।

অর্থাৎ মহত্ত্বের ন্যায় বা আত্মার পরমমহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মার নিত্য-সুখ মোক্ষ কালে অনুভূত হয়। সেই অভিব্যক্ত নিত্য সুখের দ্বারা বিমুক্ত আত্মা অত্যন্ত সুখী হন, ইহা কোন সম্প্রদায় স্বীকার করেন। প্রমাণাভাববশতঃ উক্ত মতের উপপত্তি হয় না। মহত্ত্বের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্যসুখ অভিব্যক্ত হয়, এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, অনুমান প্রথাই নাই, আগম প্রমানও নাই।

ভাষ্যকার মহর্ষির সূত্রানুসারে চরম প্রমেয় অপবর্গের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, পরে ঐ বিষয়ে মতান্তর ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সর্বব্যাপী জীবাত্মাতে নিত্য পরম মহৎ পরিমাণের ন্যায় যে নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, সংসার কালে তাহার অভিব্যক্তি বা অনুভূতি হয় না, কিন্তু মুক্তিকালে ঐ সুখের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং মুক্ত আত্মা সেই

অভিব্যক্ত নিত্যসুখে অত্যন্ত সুখী হন। অর্থাৎ তখন হইতে তিনি চিরকাল সেই নিত্যসুখের অনুভব করেন, ইহা কোন সম্প্রদায়ের মত। এই মত ন্যায় মতে স্বীকার্য্য নয়। ন্যায়মতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই মুক্তি। ঐ মুক্তিতে কোন প্রকার নিত্য সুখানুভবের সংশ্রব নাই।

উক্ত পূর্ব পক্ষের খন্ডন প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেন, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হইল সংবেদন বা জ্ঞান, তাহার কারণ নির্বাচ্য, যাহা হইতে ঐ সংবেদন উৎপন্ন হয়।

পূর্বপক্ষী বলেন সুখ যেমন নিত্য, সেইরূপ ঐ সুখের সংবেদনও নিত্য, ইহা বলিলে মুক্ত আত্মার সহিত সংসারী আত্মার অবিশেষ প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ মুক্ত আত্মার সহিত সংসারী আত্মার কোন পার্থক্য থাকিবে না। বস্তুতঃ যেমন মুক্ত আত্মা সৎ নিত্য বা উৎপত্তি বিনাশ শূন্য চিরবিদ্যমান সুখের দ্বারা এবং তাহার সৎ নিত্য সংবেদনের দ্বারা যুক্ত, সংসারী আত্মাও সেইরূপ প্রসক্ত হয়, যেহেতু সুখ ও তাহার সংবেদন উভয়ই যখন সৎনিত্য অর্থাৎ সতত সত্তাবিশিষ্ট নিত্য, তখন সমস্ত সংসারী আত্মাও সতত সেই সুখের অনুভব বিশিষ্ট ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা কিন্তু স্বীকার করা যায় না। কারণ উহা স্বীকার করিলে অর্থাৎ স্বম ঃ রক্ষার্থ সংসারী আত্মাও নিত্যসুখঅনুভব ককরে, ইহা স্বীকার করিলে ধর্ম ও অধর্মের ফলের সহিত অর্থাৎ সাংসারিক সুখ দুঃখের সহিত সহভাব বা যৌগপাদ্য আপতিত হইবে। বক্তব্য হইল—উৎপত্তিস্থানসমূহে বা চতুর্দশভুবনে ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে সংসারী আত্মা অনুভব করিয়া থাকেন। সেই সাংসারিক সুখ দুঃখানুভবের এবং নিত্যসুখ সংবেদনের অর্থাৎ নিত্যসুখের নিত্যানুভবের সহভাব বা যৌগপদ্য স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ সংসারী জীবগণ সুখ ও দুঃখভোগকালে সেই নিত্যসুখভোগও কেন অনুভব করেন না? যেহেতু সুখ ও তাহার অভিব্যক্তির নিত্যতাবশতঃ সুখেরও অভিব্যক্তির অভাব থাকে না।

আর মোক্ষে অভিব্যক্ত নিত্যসুখের অনুভব অনিত্য হইলে যাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হইবে সেই কারণ বলিতে হইবে। আত্মমনঃ সংযোগকে হেতু বলিলে তাহার সহকারী অপর কারণ বলিতে হইবে। যেহেতু আত্মমনঃ সংযোগ সহকারী নিমিত্তান্তর ব্যতীত কার্য্যোৎপাদনে অসমর্থ। ধর্মকে নিমিত্তান্তর বলিলে উৎপত্তিশীল সেই ধর্মের উৎপাদক কারণ বলিতে হইবে। যোগসমাধি সেই ধর্মের কারণ ইহা বলা হইলে সেই নিত্য সুখানুভব চিরস্থায়ী হইবে না, কারণ কার্যের "অবসায়" বা সমাপ্তির সহিত ধর্মের বিরোধবশতঃ ফলের সমাপ্তি হইলেই ধর্মের ক্ষয় হইবে। সুতরাং স্বর্গাদিজনক ধর্মের ক্ষয় হইলে যেমন স্বর্গাদিফলের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ যোগ সমাধিজাত ধর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলে সেই নিত্যসুখানুভবের ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হইবে। সংবেদন না হইলে প্রশ্ন হইবে, কি বিদ্যমানের অসংবেদন অথবা অবিদ্যমানের অসংবেদন, কোন পক্ষেই কোন যুক্তি বা কারণ নাই।

আর যদি বলা হয়, যোগসমাধিজাত ধর্মের বিনাশ হয় না, ইহা মানা যায় না, কারণ সেই বিষয়ে কোন অনুমান নাই। পরন্তু বিপরীত অমুমান আছে, যেমন উৎপত্তিশীল ভাব পদার্থ মাত্ররই বিনাশ আছে, এইরূপ যথার্থ ব্যাপ্তিনিশ্চয়বশতঃ যোগসমাধিজাত ধর্মের বিনাশিত্বই সিদ্ধ হয়।

কিন্তু যাহার মতে সংবেদনের উপয়ম বা নিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ যাহার মতে সেই নিত্যসুখের অনুভব উৎপত্তিশীল পদার্থ হইলেও কখনও তাহার নিবৃত্তি হয় না, যেহেতু ঐ সংবেদনের হেতু নিত্য, এইরূপ অনুমান করা যায়।

সংবেদন নিত্য হইলে মুক্ত আত্মা ও সংসারস্থ আত্মার মধ্যে অবিশেষ বা কোন পার্থক্য থাকে না এইরূপ আপত্তি হয়। ইহাতে ধর্ম ও অধর্মের সুখ ও দুঃখের সংবেদনের সহিত নিত্য সুখের সংবেদনের সাহাচার্য্য বা যৌগপদ্য প্রসক্ত হয়।

আর যদি বলা হয় যে, সংসারী আত্মা ধর্ম ও অধর্মের ফল সুখ ও দুঃখের অনুভব করিলেও নিত্যসুখের অনুভব করিতে পারিবেনা, যেহেতু শরীরাদি সম্বন্ধ নিত্যসুখানুভবে প্রতিবন্ধক, ইহাও বলা যায় না। কারণ শরীরাদি উপভোগের সাধন, তাহা কখনও উপভোগের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। সুতরাং শরীরাদি ভোগের সাধন, শরীরাদি ব্যতীত কোন প্রকার ভোগ হইতে পারে না। যেমন ঈশ্বরের শরীর না থাকায় তাহার কোন ভোগ হয় না। অতএব উপভোগের সাধন শরীরাদি ভোগের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।

মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদের প্রবৃত্তি ইষ্টলাভের জন্য। ইষ্ট হইল সুখ। সুতরাং মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদের প্রবৃত্তি এই উভয় নিরর্থক নয়, এই প্রকার অনুমান আছে। সুতরাং উপদেশমাত্র এবং প্রবৃত্তি মাত্রই সুখলাভার্থ, কাজেই মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদের প্রবৃত্তিও সুখ লাভার্থ, সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এই বিষয়ে পূর্বদর্শিত অনুমান প্রমাণ বর্ত্তমান, সুতরাং মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি নিষ্প্রমাণক নয়।

'এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে বলা যায়, মোক্ষের উপদেশ এবং মুমুক্ষুদিগের প্রবৃত্তি সুখলাভার্থ নয়, পরন্তু অনিষ্টনিবৃত্ত্যর্থ অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তির জন্য। অনিষ্টের সহিত বা দুঃখের সহিত সর্বথা অননুবিদ্ধ বা সম্পর্ক রহিত ইষ্ট বা সুখ সম্ভব নয়, এই কারণে মুমুক্ষুদের সকাশে সুখ ও দুঃখ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুতরাং মুমুক্ষু দুঃখ পরিহারের জন্য প্রবর্ত্তমান হইয়া সুখও পরিহার করেন। কারণ বিবেক হান সম্ভব নয়। অর্থাৎ দুঃখ মিশ্রিত সুখের সুখ গ্রহণ করিয়া দুঃখকে পরিহার করিতে হয়। একমাত্র হংসই পারে দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধ মাত্র পান করা।

পুনরায় সিদ্ধান্তী বলেন, যেমন দৃষ্ট অনিত্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া মুমুক্ষুনিত্য সুখ কামনা করেন, সেইরূপ দৃষ্টি অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্ত ব্যক্তির নিত্যদেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি কল্পনা করিতে হয়, অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তি যদি নিত্য সুখ ভোগ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিত্য দেহাদিও কল্পনা করতে হয়। কারণ দেহাদি ভোগের সাধন। এইরূপ কল্পনা করিলে মুক্ত আত্মার কৈবল্য বা একাত্মতাও কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং সমস্তই কাল্পনিক, বাস্তব বলিয়া কিছুই নাই।

পূর্বপক্ষী বলেন, দেহাদির নিত্যত্ব কল্পনা অযৌক্তক। কারণ ঐরূপ কল্পনা প্রমাণ বিরুদ্ধ।

এই পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্ত বলেন ''সমানম্'' অর্থাৎ দেহাদির নিত্যত্ব যেমন প্রমান বিরুদ্ধ, সেইরূপ সুখেরও নিত্যত্ব কল্পনা প্রমাণ বিরুদ্ধ অর্থাৎ সুখের নিত্যত্ব কল্পনা করা যায় না। অতএব সমান হইল। অর্থাৎ দেহাদির নিত্যত্ব কল্পনা সম্ভব না হইলে সুখেরও নিত্যত্ব কল্পনা করা যাইবে না। সুতরাং নিত্যসুখ বলিয়া কোন সুখ নাই, তাহা কল্পনার অতীত।

মুক্ত আত্মা অত্যন্তিক বা নিত্যসুখানুভব করে, এই বিষয়ে যদি কোন আগম বা শাস্ত্র বাক্য থাকে, তাহা হইলে সেই সকল আগমে প্রযুক্ত সুখশব্দ দুঃখাভাব অর্থে প্রযুক্ত, এই ভাবে শাস্ত্রবাক্যের উপলব্ধি হইবে। দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ লৌকিক বাক্যে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন সাময়িক জ্বরবিরামের পর

রোগী বলে, ''আমী সুখী হইলাম'' ''ভারবাহী গুরুতর ভার অবতরণ করিয়া বলে, ''আমি সুখী হইলাম''। এই দুই বাক্যে প্রযুক্ত সুখ শব্দ দুঃখাভাব অর্থেই প্রযুক্ত। সুতরাং দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। অতএব মুক্ত আত্মার সুখানুভব হয়, এই বিষয়ের বোধক আগমেও দুঃখাভাব অর্থে সুখ শব্দের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয়, এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষে রাগ বা কামনা থাকিলে তাহার মোক্ষই সুদূর পরাহত হইবে। অর্থাৎ মোক্ষলাভ হইবে না। কারণ রাগ হইল বন্ধন। বন্ধন থাকিলে কেহ মুক্ত হইতে পারে না।

আর যদি বলা হয় মুমুক্ষু ব্যক্তি নিত্যসুখের প্রতি রাগ পরিত্যাগ করে। নিত্য সুখের প্রতি রাগ পরিত্যক্ত হইলে তাহা মোক্ষলাভের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক হইবে না।

অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তির নিত্য সুখ পরিত্যক্ত হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির ''নিত্য সুখ হয় অথবা না হয়'' এই উভয় পক্ষেই মোক্ষলাভ সংশয়তীতই থাকিবে।

এইরূপ পর্য্যলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় মুক্ত আত্মা নিত্য-সুখানুভাব করেন না।

অষ্টম পাঠ

সিদ্ধান্ত পদার্থের আলোচনা— সিদ্ধান্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণ

মহর্ষি গৌতম দৃষ্টান্ত পদার্থের নিরূপণের পর ক্রমপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত পদার্থের নিরূপন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''অথসিদ্ধান্তঃ, ইদমিত্থম্ভূতমেত্যভ্যনুজ্ঞায়মানমর্থজাতং সিদ্ধং, সিদ্ধস্য সংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ''। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের নিরূপণের অনন্তর সিদ্ধান্ত পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। ইহা এবং এই প্রকার এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ পদার্থসমূহ ''সিদ্ধ'' সিদ্ধের সংস্থিতি হইল সিদ্ধান্ত। ''সংস্থিতিরিত্থম্ভাব ব্যবস্থা ধর্মনিয়মঃ''। অর্থাৎ সংস্থিতি হইল ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা বা ধর্মনিয়ম''। অর্থাৎ এই পদার্থ এই ধর্মবিশিষ্ট, অন্যধর্মবিশিষ্ট নহে এইরূপ প্রমাণসিদ্ধ নিয়ম। সিদ্ধান্ত প্রতিপাদক সূত্র হইল, ''তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংসস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ''। এই সূত্রের অর্থ এই সিদ্ধান্ত ''তন্ত্রসংস্থিতি'', ''অধিকরণসংস্থিতি'' ও ''অভ্যপগমসংস্থিতি''। অথবা তন্ত্রাধিকরণের অর্থাৎ প্রমানবোধিত পদার্থসমূহের স্বীকার সংস্থিতি হইল সিদ্ধান্ত। দ্বিতীয় সূত্রটি হইল— ''স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্র প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসং- স্থিত্যর্থান্তরভাবাৎ''। অর্থাৎ তন্ত্রভেদে সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার, যেমন—সর্বতন্ত্রসংস্থিতি, প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি, অধিকরণ-সংস্থিতি ও অভ্যুপগমসংস্থিতি। ইহারা পরস্পর ভিন্ন। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''তত্রৈতাশ্চতস্রঃ সংস্থিতয়োহর্থান্তরভূতাঃ অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে এই চারিটি সংস্থিতি পরস্পর ভিন্ন।

সামান্য লক্ষণের জ্ঞান ব্যতীত বিশেষ লক্ষণের জ্ঞান সম্ভব নয়। তাই মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণ সূচিত করিয়াছেন। আর দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত পদার্থের বিভাগ করিয়াছেন। সুতরাং মহর্ষির দুইটি সূত্রই স্বার্থক, কোনটি ব্যর্থ নহে। কাজেই উক্ত সূত্রদ্বয়ের প্রতিপাদ্য প্রায় এক হইলেও বিষয়ভেদ থাকায় ব্যর্থতার শঙ্কা হইতে পারে না।

প্রথম সূত্রটি সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণের সূচক। যেমন—''তন্ত্রাধিকরণানামর্থানামভ্যুগমঃ'' ইতি সূত্রার্থঃ। অর্থাৎ তন্ত্রম্ অধিকরণং যেষামর্থানং ভবতি, তে তন্ত্রাধিকারণাঃ, তেষামভ্যুগমসংস্থিতিঃ ইত্থম্ভাবব্যবস্থা ধর্মনিয়মঃ সিদ্ধান্তো ভবতি। বক্তব্য হইল— তন্ত্র যে সফল পদার্থের অধিকরণ বা আশ্রয় বা প্রতিপাদক, সেই সকল পদার্থসমূহের অভ্যুপগম বা স্বীকার সংস্থিতি সিদ্ধান্ত, আর ইত্থম্ভাব্যবস্থা হইল ধর্মনিয়ম। অর্থাৎ তন্ত্র বা শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থসমূহের বিশেষধর্মের ব্যবস্থা বা নিয়ম হইল সিদ্ধান্ত। সুতরাং শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থানাং ধর্মনিয়মকত্বং সিদ্ধান্তত্ব ং ইহাই সিদ্ধান্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণ। পরন্তু যে পদার্থ শাস্ত্রবোধিত নয়, তাহার স্বীকার সিদ্ধান্ত নয়। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন-ইদং এবং ইত্থম্ভূতং অর্থাৎ ইহা এবং এইপ্রকার এইরূপে স্বীক্রিয়মাণ যে সমস্ত পদার্থ, তাহাকে সিদ্ধ বলে, সেই সিদ্ধের যে সংস্থিতি তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। সংস্থিতি হইল ইত্থম্ভাবের ব্যবস্থা, ইত্থম্ভাব সেই পদার্থের বিশেষধর্ম, ব্যবস্থা শব্দের অর্থ নিয়ম। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন ধর্মনিয়মঃ। অভিপ্রায় হইল পদার্থমাত্রের সামান্যধর্ম এবং বিশেষধর্ম। যেমন শব্দের সামান্যধর্ম ইদম্ত্ব ও শব্দত্ব বিশেষধর্ম নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব (মতভেদে)। কাহারও ইদম্ত্বরূপে শব্দের নিশ্চয়ের পর, এই শব্দ ইত্থম্ভূত অর্থাৎ নিত্য বা অনিত্য। এইরূপে শব্দে কোন নিয়ত বিশেষধর্মের নিশ্চয় হইলে তাহার পক্ষে শব্দ তদ্রূপেই সিদ্ধ। যেমন শব্দ নিত্যতাবাদী মীমাংসক সম্প্রদায়ের মতে শব্দ নিত্যত্বরূপেই সিদ্ধ। সুতরাং বর্ণাত্মক শব্দের নিত্যত্বরূপ বিশেষধর্মের যে নিয়ম অর্থাৎ উক্তরূপে স্বীকৃত যে নিত্যত্বরূপ ধর্ম, তাহাই মীমাংসক সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত।

ভাষ্যকার সূত্রার্থব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, তন্ত্রার্থসংস্থিতি-স্তন্ত্রসংস্থিতিঃ। তন্ত্রমিতয়েতরাভিসম্বন্ধ য্যার্থসমূহস্য উপদেশঃ সাস্ত্রম্। অধিকরণানুযক্তার্থসংসস্থিতিঃ -অধিকরণসংস্থিতিঃ। অভ্যুপগমসংস্থিতির নবধারিতার্থপরিগ্রহঃ। তদ্বিশেষপরীক্ষণায় অভ্যুগমসিদ্ধান্তঃ।

অর্থাৎ তন্ত্র বা শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থের সংস্থিতি তন্ত্রসংস্থিতি। তন্ত্র হইল পরস্পরসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থসমূহের উপদেশরূপ শাস্ত্র। অধিকরণানুযক্ত অর্থের অর্থাৎ প্রমাণের দ্বারা কোন সিদ্ধান্তের সিদ্ধিতে তাহার আশ্রয়ের অনুষঙ্গবিশিষ্ট বা আনুষাঙ্গিক পদার্থের সংস্থিতি অধিকরণসিদ্ধান্ত। আর অনবধারিত পদার্থের পরিগ্রহ অর্থাৎ নিজের অনভিমত পরমতের বিনা বিচারে স্বীকার অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

ভাষ্যকার উক্ত তন্ত্রার্থসংস্থিতি, ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা প্রথমসূত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়া তন্ত্রসংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি এবং অভ্যুপগমসংস্থিতি ইহাদের অন্যতমত্বই সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

সিদ্ধান্ত পদার্থের অবান্তরভেদ এবং তাহাদের লক্ষণ।

মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত পদার্থের সামান্য লক্ষণ করিয়া দ্বিতীয়সূত্রে সিদ্ধান্তের বিভাগ করিয়াছেন, সূত্রটি হইল— ''স চতুর্বিধঃ সর্বতন্ত্র প্রতিতন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিত্যর্থান্ত্রভাবাৎ''। প্রথম সূত্রোক্ত তন্ত্রপদে সর্বতন্ত্র ও প্রতিতন্ত্রগ্রাহ্য। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল সর্বতন্ত্রসংস্থিতি, প্রতিতন্ত্রসংস্থিতি, অধিকরণসংস্থিতি এবং অভ্যুপগমসংস্থিতিভেদে সিদ্ধান্ত চতুর্বিধ। এই সংস্থিতিসমূহের অর্থান্তরভাব বা পারস্পরিকভেদ আছে। সিদ্ধান্ত বহু হইলেও অন্যান্য সকল সিদ্ধান্তই এই চতুর্বিধ সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। সুতরাং সিদ্ধান্তের ন্যূনাধিক্য সম্ভব নয়।

সংস্থিতি ও সিদ্ধান্ত সমানার্থক। তাই ''তাসাং'' এই পদের পূর্বোক্ত চতুর্বিধ সংস্থিতির সূচনা করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত চতুর্বিধ সংস্থিতি বা সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথমটি হইল— ''সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধস্তন্ত্রেহধিকৃতোহর্থঃ সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ''। অর্থাৎ যাহা সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং কোন শাস্ত্রে অধিকৃত বা কথিত তাহা প্রথমোক্ত সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন— ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ার্থ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতদ্রব্য, প্রমাণের দ্বারা পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হয়। এইগুলি সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কারণ এইগুলি সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ এবং ন্যায়শাস্ত্রে কথিত। যাহা সর্বশাস্ত্রে কথিত তাহাই সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত এইমাত্র বলিলে কেবল ন্যায়শাস্ত্রে কথিত ছিল ও জাতি নামক পদার্থের অসদুত্তরত্ব, তাহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত বলিয়া বাদী, প্রতিবাদী এবং মধ্যস্থ সকলের স্বীকার্য্য। এই কারণে মহর্ষি বলিয়াছেন, সর্বতন্ত্রাবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু উহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রে কথিত না হইলেও যাহা কোন শাস্ত্রেই কথিত হয় নাই এমন পদার্থ সর্বশাস্ত্রে অবিরুদ্ধ হলেও তাহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইবে না। এই কারণে মহর্ষি সূত্রে তন্ত্রে অধিকৃত বলিয়াছেন। তাই মনের ইন্দ্রিয়ত্ব, সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যেহেতু মনের ইন্দ্রিয়ত্ব শাস্ত্রে কথিত না হইলেও অন্যশাস্ত্রে কথিত।

দ্বিতীয় প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত প্রতিপাদক সূত্র—

''সমানতন্ত্রসিদ্ধঃ পরতন্ত্রাসিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ''- এই সূত্রে অভিহিত সমান শব্দের অর্থ এক। সুতরাং একশাস্ত্রসিদ্ধ বা স্বশাস্ত্রসিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে বা অন্যশাস্ত্রে অসিদ্ধ পদার্থ হইল প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকগণের মধ্যে সমানতন্ত্র ন্যায়শাস্ত্র, আর পরতন্ত্র সাংখ্যাদিশাস্ত্র। আবার সাংখ্যাদিসম্প্রদায়ের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র পরতন্ত্র,

আর সাংখ্যাদিশাস্ত্রা সমানতন্ত্র। তাহা এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় যে, যে সম্প্রদায়ের পক্ষে যাহা নিজতন্ত্রেসিদ্ধ, কিন্তু পরতন্ত্রে অসিদ্ধ তাহা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে অসতের উৎপত্তি হয় না, সতের অত্যন্তবিনাশ হয় না, চেতনসমূহ অর্থাৎ সমস্ত আত্মা নিরতিশয় অর্থাৎ অপরিণামী নির্গুণ। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে, বিষয়সমূহে এবং তত্তৎকারণে অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার এবং পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মভূতে বিশেষ বা পরিণাম বিশেষ আছে-ইহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

অসৎ কার্য্যবাদী ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ঐমতে পুরুষের বা জীবাত্মার স্বগত অদৃষ্ট এবং নিত্যপরমাণু প্রভৃতি কারণ জন্য ভূতসৃষ্টি হয় এবং জীবাত্মার রাগ, দ্বেষ মোহরূপ দোষ এবং শুভাশুভ কর্মরূপ প্রবৃত্তি ধর্মাধর্মরূপ অদৃষ্টের জনক এবং সমস্ত আত্মাই সগুণ এবং উৎপত্তির পূর্বে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় এবং সেই সমস্ত উৎপন্ন পদার্থ যথাকালে নিবৃত্তি অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

সর্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''যোগানাম্''। এই যোগপদে ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ই বোধ্য, পাতঞ্জলযোগদর্শনের প্রণেতা বোধ্য নয়। কারণ পাতঞ্জল যোগদর্শনে সাংখ্যের মতই মতবাদ গৃহীত হইয়াছে। উক্ত মতবাদ সাংখ্যসম্প্রদায়ের বিরোধী। সুতরাং পাতঞ্জল যোগ দর্শনেরও বিরোধী। ভাষ্যস্থ ''যোগনাং'' পদে যোগিনাং এইরূপ অর্থবোধ্য। যেহেতু ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় যথাক্রমে পাশুপত যোগী এবং শৈবযোগী নামে অভিধেয়। এই বিষয়ে বহুপ্রমাণ আছে। কাজেই যোগানাং এই ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়কেই বুঝিতে হইবে। সুতরাং উল্লিখিত বিষয়সমূহ ন্যায়বৈশেষিকেরই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

তৃতীয় অধিকরণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের স্বরূপ নিরূপণোদ্দেশ্যে সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, ''যৎসিদ্ধাবন্য প্রকরণসিদ্ধিঃ মোহধিকরণসিদ্ধান্তঃ''। অর্থাৎ যে পদার্থের সিদ্ধি বিষয়ে অন্য 'প্রকরণে''র অর্থাৎ অন্য আনুষঙ্গিক পদার্থের সিদ্ধি হয়, সেই পদার্থ অধিকরণ সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত। ভাষ্যকার এই সূত্রের ব্যাখায় বলিয়াছেন, যে পদার্থের অর্থাৎ সাধ্য অথবা হেতুভূত যে পদার্থের সিদ্ধি বিষয়ে অন্য পদার্থসমূহ অনুষক্ত হয়, সেই সমস্ত অন্য পদার্থ ব্যতীত সেই পূর্বোক্ত পদার্থসিদ্ধি হয় না, সেই সমস্ত পদার্থসমূহ ''যদাধিষ্ঠান'' অর্থাৎ যে পদার্থের আশ্রিত, সেই পদার্থ অর্থাৎ সেই সমস্ত আনুষঙ্গিক পদার্থের সহিত তাহার অধিকরণ বা আশ্রয়ভূত পদার্থ অধিকরণ সিদ্ধান্ত।

বস্তুতঃ যে পদার্থটি সিদ্ধ হইলে তাহার অনুষঙ্গী পদার্থগুলি তাহার অন্তর্গতরূপেই সিদ্ধ হয়, সাক্ষাৎ অধিক্রিয়মাণ সেই পদার্থ তাহার অনুষঙ্গী সেই সমস্ত পদার্থের অধিকার বা আশ্রয়। কারণ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই আশ্রয়ভূক্ত পদার্থ পক্ষ বা সাধ্যই হউক অথবা হেতুই হউক, সেইরূপে অধিকরণসিদ্ধান্ত হয়।

ভাষ্যকারের মতে ঐ অধিকরণসিদ্ধান্তের উদাহরণ, যেমন জ্ঞাতা বা আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা এক পদার্থের জ্ঞান হয়। এইস্থলে অর্থাৎ উক্তরূপ অনুমানস্থলে ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিয়তবিষয় অর্থাৎ ঘ্রাণাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয়ের নিয়ম আছে এবং স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গ অর্থাৎ যথাক্রমে গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষই ঘ্রাণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের লিঙ্গ বা অনুমাপক এবং জ্ঞাতা জীবাত্মার জ্ঞানের অর্থাৎ গন্ধাদি নিজ নিজ বিষয়ের প্রত্যক্ষের সাধন এবং দ্রব্যপদার্থ গন্ধাদি গুণ হইতে ভিন্ন ও গুণের আধার এবং চেতনাসমূহ অনিয়তবিষয় অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবাত্মার গ্রাহ্যবিষয়ের উক্তরূপ নিয়ম নাই, এই সমস্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব, নিয়তবিষয়ত্ব স্ববিষয়গ্রহণলিঙ্গত্ব, জ্ঞানসাধনত্ব, দ্রব্যের গন্ধাদি গুণাভিন্নত্ব

এবং গুণাধারত্ব ও জ্ঞাতা চেতন সমূহের অনিয়তবিষয়ত্ব অনুষঙ্গী পদার্থ। পূর্বার্থের সিদ্ধিবিষয়ে অর্থাৎ সাক্ষাত কথিত সেই পূর্বপদার্থের সিদ্ধিতে অর্ন্তগত এই সমস্ত পদার্থ সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত পদার্থ ব্যতীত সেই পূর্বার্থ সম্ভব হয় না।

''দর্শন স্পর্শনাভ্যামেকার্থগ্রহণাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য। চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা একই পদার্থের প্রত্যক্ষ হইলে পরে যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা এই পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সেই আমি ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা উহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, এইরূপে সেই একই জ্ঞাতার যে প্রতিসন্ধান হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সেই জ্ঞাতা হইতে ভিন্ন। কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় ভিন্ন বলিয়া তাহার পক্ষে উক্তরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। সুতরাং উক্তরূপে একার্থের প্রতিসন্ধানরূপ যেহেতু, তাহা সিদ্ধ হইলে উহা ইন্দ্রিয় নানাত্ব প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পদার্থের সহিতই সিদ্ধ হইবে। জীবদেহে একটিমাত্র ইন্দ্রিয় থাকিলে এবং তাহার বিষয় নিয়ম না থাকিলে উক্তপ্রকার প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় না। এইভাবে ভাষ্যকারোক্ত উদাহরণে ইন্দ্রিয়নানাত্বাদির সহিত উক্ত প্রতিসন্ধানরূপ হেতুই অধিকরণসিদ্ধান্ত ইহা তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মত।

বাচস্পতি মিশ্র সাধ্যরূপ অধিকরণসিদ্ধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন যে, সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যে চেতনকর্ত্তৃত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধ হইলে সর্বজ্ঞাত্বাদিবিশিষ্ট চেতনকর্ত্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। কারন সেই কর্ত্তা সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট না হইলে তিনি দ্ব্যণুকাদির কর্ত্তা হইতে পারে না। সুতরাং সেই কর্ত্তার সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি উক্ত সাধ্যসিদ্ধির অন্তর্গত হওয়ায় উহা ঐ সাধ্যের অনুষঙ্গী পদার্থ। সুতরাং সেই অনুষঙ্গী পদার্থের সহিতই সেই সাধ্যসিদ্ধ হওয়ায় তদ্রূপে উহা অধিকরণসিদ্ধান্ত।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত

মহর্ষি গৌতম চতুর্থ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের স্বরূপ নিরূপণের জন্য বলিয়াছেন, সূত্র, ''অপরীক্ষিতাভ্যুপগমাৎ তদ্বিশেষ পক্ষক্ষণ মভ্যুপগমসিদ্ধান্তঃ''।

অর্থাৎ যে স্থলে অপরীক্ষিত পদার্থের স্বীকারপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রমাণাদির দ্বারা বিচারপূর্বক অনির্ণীত কোন পরাসিদ্ধান্তের স্বীকার করিয়া, সেই ধর্মীর বিশেষধর্মের পরীক্ষা বা বিচার করা হয়, সেইস্থলে সেই স্বীকৃতপরসিদ্ধান্ত অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

সরলার্থ হইল, এই চতুর্থ অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের ব্যখ্যায় মতভেদ আছে। ভাষ্যকর বলিয়াছেন, যে স্থলে প্রতিবাদী নিজের কোন অসম্মত সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইয়াই কোন পদার্থের বিশেষ ধর্মের পরীক্ষা বা বিচার করেন, সেইস্থলে তাঁহার স্বীকৃত সেই পরসিদ্ধান্তই তাঁহার পক্ষে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

ভাষ্যকার সূত্রার্থবিশ্লেষণ করার জন্য এই সিদ্ধান্তের উদাহরণ বলিয়াছেন, কোন বাদী শব্দকে নিত্য ও দ্রব্য পদার্থ বলিলে, তখন প্রতিবাদী নৈয়ায়িক যদি বলেন যে, ভাল কথা, শব্দ দ্রব্যপদার্থই হউক, কিন্তু উহা নিত্য বা অনিত্য ইহা পরীক্ষণীয়। উক্তরূপে নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব অনুমোদন করিয়াই তাহার বিশেষধর্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিষয়ে বিচার করিলে সেইস্থলে তাঁহার স্বীকৃত ঐ পরসিদ্ধান্ত তাঁহার পক্ষে ''অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত''।

ভাষ্যকারের এই উদাহরণের দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহার সময়েও কোন মীমাংসক সম্প্রদায় শব্দকে দ্রব্যপদার্থই বলিতেন। পরে কুমারিল ভট্ট উক্ত মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্বোক্ত স্থলে প্রতিবাদী নৈয়ায়িকগণের অভিসন্ধি এই যে, শব্দের দ্রব্যত্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডনের জন্য বিচার করা আবশ্যক। কারন উহা স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্বসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলে বাদী মীমাংসক পরে আর শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্তের উপস্থাপন করিবেন না। কারণ, তখন তাহা করা তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল। উক্তরূপ গূঢ় উদ্দেশ্যে তৎকালে প্রতিবাদী নৈয়ায়িক বিনা বিচারে নিজের অসম্মত শব্দের দ্রব্যত্বসিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তের খণ্ডন করায় তাঁহার নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষ খ্যাপন হয় এবং বাদীর বুদ্ধির অবজ্ঞা অর্থাৎ অপকর্ষ প্রকাশিত হয়। সুতরাং নিজ বুদ্ধির উৎকর্ষখ্যাপনের ইচ্ছাবশতঃ এবং বাদিবুদ্ধির অবজ্ঞার নিমিত্তও উক্তরূপ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত প্রবৃত্ত হয়।

ভাষ্যকার উক্তপ্রকার মহর্ষিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সিদ্ধান্তের সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ প্রদর্শনপূর্বক সিদ্ধান্তের চতুর্বিধত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তই উক্ত চতুর্বিধ সিদ্ধান্তেরই অন্তর্গত হইবে। অতিরিক্ত নয়।

নবম পাঠ

অবয়ব (ন্যায় প্রকরণ)

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ণ ‘‘অথাবয়বাঃ’ অর্থাৎ অনন্তর অবয়বসমূহ এইরূপ বলার পর মহর্ষিকৃত সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল— ‘‘ প্রতিজ্ঞাবহতূদাহরণোপনয় নিগমনান্যবয়বাঃ’’ অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ; উপনয় ও নিগমন এই বাক্যে পঞ্চক অবয়ব।

মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত পদার্থের নিরূপণের পর ক্রমপ্রাপ্ত অবয়বের নিরূপণ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন অবঅবয়বা:। এই প্রকরণকে ন্যায় প্রকরণ বলে। যথাক্রমে উচ্চারিত প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পঞ্চাবয়বরূপে বাক্য সমষ্টিকে ন্যায় বলে। ‘‘ উচিতানুপূর্বীক প্রতিজ্ঞাদিবাক্যপঞ্চক সমুদায়ত্বং ন্যায়ত্বম্’’। ইহা ন্যয়ের সামান্য লক্ষণ। ইহাকেই ভাষ্যকর পরমন্যায় বলিয়াছেন। যথাক্রমে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্য প্রয়োগকে ন্যায় প্রয়োগ বলে। এই কারণে ন্যায়বিদ্যার প্রকাশক মহর্ষি গৌতম সেই ন্যায়নামক মহাকাব্যের প্রতিজ্ঞাদিনামক পঞ্চাবয়ব নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অনুমান প্রমাণ যে স্বার্থ ও পরার্থভেদে দ্বিবিধ ইহাও সূচিত হইয়াছে। নিজের তত্ত্বনিশ্চায়ার্থে যে অনুমান প্রমাণ, তাহাকে স্বার্থানুমান বলে, তাহাতে অপরের তত্ত্বনিশ্চয় আবশ্যক নয়। সুতরাং তাহাতে প্রতিজ্ঞাদিবাক্য প্রয়োগ করিতে হয় না। কিন্তু যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তিবশতঃ মধ্যস্থগণের সেই বিবাদ বিষয় পদার্থে সংশয় জন্মে, সেই স্থলে সেই বাদী ও প্রতিবাদী মধ্যস্থগণের একার পক্ষনিশ্চয়োদ্দেশ্যে তাঁহাদের নিকটে ন্যায় প্রয়োগ করিয়া নিজমতের সাধক অনুমান প্রমান প্রদশন করেন, সেই অনুমান প্রমানই পরার্থ। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি অবয়ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ন্যায়ান্তর্গতত্বে সতি প্রতিজ্ঞাদ্যন্যতমত্বং অবয়বত্বম ইহাই অবয়বের সামান্য লক্ষণ। সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ করা যায় না। সুতরাং বিশেষ লক্ষণের পূর্বে সামান্য লক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা ন্যায় নামক মহাবাক্যের অন্তর্গত যথাক্রমে প্রযুক্ত সেই প্রতিজ্ঞাদির অন্যতমকে অবয়ব বলে।

অবয়ব বলিতে দ্রব্যরূপকার্য্যের সমবায়িকারণকে বুঝায়। প্রকৃতস্থলে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি ন্যয়ের সমবায়িকারণ নয়।। পরন্তু সমবায়িককারণ সমূহ যেমন কার্য্যভূত অবয়বীর ধারক, সেইরূপ প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমূহ ন্যায়বাক্যের ধারক এই অর্থে প্রতিজ্ঞা প্রভৃতিকে অবয়ব বলা হয়। অবয়ব পঞ্চবিধ, নূন্যনয় অধিক নয়। এই ন্যূনাধিক্যসংখ্যা ব্যবচ্ছেদের জন্য মহর্ষি সূত্রে প্রতিজ্ঞাদিপ্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞা, হেতু উদাহরণ উপনয় ও নিগমন এই গুলির অন্যতম হইল অবয়ব। ভেদকুটাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকভেদ অন্যতম পদার্থ অর্থাৎ ভেদকূট বিশিষ্ট পদার্থের ভেদ। প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটির ভেদ ঐ পাঁচটি ছাড়া অন্যত্র আছে। তাহাদের ভেদ প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি পাঁচটিতেই আছে। তাই প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি প্রত্যেকে অবয়ব পদবাচ্য। কিন্তু ঐ পঞ্চভেদ প্রতিজ্ঞাদিতে নাই। কারণ প্রতিজ্ঞায় প্রতিজ্ঞার ভেদ নাই, হেতুতে হেতুর ভেদ নাই ইত্যাদি। কারণ নিজের ভেদ থাকে না।

প্রতিজ্ঞাবাক্য

পঞ্চ অবয়বের মধ্যে প্রথম অবয়ব প্রতিজ্ঞা। মহর্ষি গৌতম প্রতিজ্ঞানামক অবয়বের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ‘তত্র সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা”। অর্থাৎ তত্র পক্ষ অবয়বের মধ্যে প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশ। এই স্থলে

সাধ্যপদে সাধ্যবিশিষ্ট ধমী বুঝিতে বইবে। যেমন পর্বতো বহ্নিমান্ এই অনুমিতিস্থলে বহ্নিবিশিষ্ট পর্বত হইবে সাধ্য, কেবল বহ্নি সাধ্য নয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। '' প্রজ্ঞাপনীয়েন ধর্মেন ধর্ম্মিনো বিশিষ্ট্যস্য পরিগ্রহ বচনং প্রতিজ্ঞা সাধ্যনির্দ্দেশঃ"। অর্থাৎ প্রজ্ঞাপনীয় বা সাধনীয় ধর্মবিশিষ্টি ধর্মীর পরিগ্রহ বচন বা বোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা সাধ্যনিদ্দেশ। ভাষ্যকারোক্ত পরিগ্রহ বচন সূত্রোক্ত নির্দ্দেশ পদের সার্থ এবং সাধ্য পদের অর্থ প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট। সুতরাং প্রজ্ঞাপনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মিবোধক বাক্যেই প্রতিজ্ঞা। পরিগ্রহ বচন পদের অর্থ পরিগৃহ্যতে অনেন ইতি পরিগ্রহ ঃ, সচ বচনক্ষেতি পরিগ্রহ বচনং। ইহার অর্থ বোধজনক বাক্য। সুতরাং নির্দ্দেশ পদের অর্থ পরিগ্রহ বচন। সূত্রোক্ত সাধ্যপদে সাধ্য এবং সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে সাধ্যস্য নির্দ্দেশঃ সাধ্য নির্দ্দেশ এই স্থলে সাধ্যপদেয় অর্থাৎ সাধ্যে ধর্ম এবং সাধ্য ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী ; আর নির্দ্দেশ পদের অর্থ পরিগ্রহণ বচন বা বোধ জনক বাক্য। যেহেতু উত্ত্যতে অনেনেতি বচনং। ইহার অর্থ বাক্য। তাহা হইলে সাধ্যধর্ম এবং সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীবোধক বাক্য প্রতিজ্ঞা ইহাই প্রতিজ্ঞার সামান্য লক্ষণ। যথা 'অনিত্যঃ শব্দঃ' এই অনুমিতি স্থলে শব্দ পক্ষ বা ধর্মী এবং অনিত্যত্ব হইল সাধ্যধর্ম। তাহা হইলে উক্ত অনুমিতিস্থলে অনিত্যত্ব ধর্ম এবং অনিত্যত্ত্যত্ব ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মী শব্দ হইল সাধ্য পদার্থ। 'অনিত্য: শব্দ:' এই বাক্যের দ্বারা অনিত্যত্বরূপ ধর্মবিশিষ্ট শব্দরূপ ধর্মীর বোধ হয় বলিয়া উহা সূত্রোক্ত লক্ষণানুসারে প্রতিজ্ঞা বাক্য।

দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য

প্রথমত অবয়ব প্রতিজ্ঞা বাক্যের আলোচনার পর মহর্ষি দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্যের আলোচনা করিয়াছেন। হেতুদ্বিবিধ সাধর্ম্য হেতু এবং বৈধর্ম্য হেতু। মহর্ষি প্রথমে সাধর্ম্য হেতুর লক্ষণ বলিয়াছেন। তাহা হইল ''উদাহরণ সাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনং হেতু'' অর্থাৎ উদাহরণ বাক্যের সহিত সম্মান ধর্মপ্রযুক্ত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সাধ্যধর্মীয় যাহা সমানধর্ম, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যের সাধন অর্থাৎ সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ব বোধক বাক্যবিশেষ হইল হেতুনামক দ্বিতীয় অবয়ব। সাধর্ম্যপদের অর্থ সমান ধর্ম। উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত সমানার্থক। উদাহরণ বাক্যে হেতুরূপে যে ধর্ম গৃহীত সেই ধর্মই যদি হেতুরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ হেতু হইবে সাধর্ম্যহেতু। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''উদাহরণের সামান্যাৎ সাধ্যস্য ধর্মস্য সাধনং প্রজ্ঞাপনং হেতু:। সাধ্যে প্রতিসন্ধায় ধর্মমুদাহরণে চ প্রতিসন্ধায় তস্য সাধনতাবচনং হেতু:"। উৎপত্তিধর্মকত্বাদিতি উৎপত্তিধর্মকম্ অনিত্যং দৃষ্ট। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থের সহিত সমানধর্মপ্রযুক্ত সাধ্যধর্মের সাধন বা প্রজ্ঞাপন অর্থাৎ সাধ্যধর্মের সাধনতা বোধক বাক্যবিশেষ হেতু। বক্তব্য এই যে সাধনীয় ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীতে হেতুপদার্থরূপ ধর্মবিশেষকে প্রতিসন্ধান করিয়া এবং দৃষ্টান্ত পদার্থেও সেই ধর্মকে প্রতিসন্ধান করিয়া সেই ধর্মের সাধনতাবচন অর্থাৎ সাধনত্ব বা জ্ঞাপকত্ব বোধক বাক্যবিশেষ হেতু।

যেমন উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ এই বাক্যই হেতুবাক্য। বস্তুত: অনিত্য: শব্দ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ এই অনুমিতিস্থলে পক্ষ শব্দ, সাধ্যঅনিত্যত্ব এবং হেতুউৎপত্তি ধর্মকত্ব। উৎপত্তিধর্মক ঘটাদিবস্তু অনিত্য দৃষ্ট হয়। এইভাবে ঘটাদিবস্তুকে দৃষ্টান্ত রূপে গ্রহণ করিয়া পরে উদাহরণ বাক্য প্রয়োগ করিলে উৎপত্তিধর্মকত্ব এই হেতু বাক্যটি সাধর্ম্যহেতু বাক্য হইবে।

হেতু সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় হেতুবাক্যের উভয় সাধারণ সামান্য লক্ষণ অবশ্যই বক্তব্য।

তবে সাধর্ম্য লক্ষণ বাচ্য হইলেও সামান্য লক্ষণআর্থ। অর্থপর্য্যালোচনার দ্বারা যে লক্ষণ সূচিত হয় তাহা আর্থ। প্রকৃতস্থলে মহর্ষি কথিতঃ সূত্রস্থসাধ্যসাধন পদের দ্বারা সেই সামান্য লক্ষণ বুঝা যায় যে, ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত হইয়া সাধ্যসাধনত্ব বোধক যে বাক্য তাহাই দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য। আর উদাহরণ সাধর্ম্যাৎ এই পদের দ্বারা হেতু বাক্যের বিশেষ লক্ষণ বুঝা যায়। যেমন দৃষ্টান্ত পদার্থের সাধর্ম্যপ্রযুক্ত সাদ্যসাধনত্ব বোধক যে বাক্য তাহা সাধর্ম্য হেতু। এই পক্ষে সূত্রস্থ ''হেতুপদের অর্থ সাধর্ম্যহেতু এবং ''সাধ্য'' পদের অর্থ সাধ্যধর্ম। দৃষ্টান্ত পদার্থে উৎপত্তি ধর্মকম্ অনিত্যম্ এই ভাবে উৎপত্তিধর্মকত্ব ধর্ম গৃহীত হইয়াছে এবং ঐ ধর্মই হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই কারণে উৎপত্তি ধর্মকত্ব হেতুটি সাধর্ম্য হেতুবাক্য।

বৈধর্ম্যহেতু

বৈধর্ম্য হেতু নিরূপণ প্রসঙ্গে মহর্ষি বলিয়াছেন ''তথা বৈধর্ম্যাৎ''। অর্থাৎ ''উদাহরণ বৈধর্ম্যৎসাধ্যসাধনংহেতু:'' ইহাই সম্পূর্ণ সূত্র তথা শব্দের দ্বারা সূচিত। উদাহরণ বাক্যে হেতুরূপে যে ধর্ম প্রযুক্ত হয়, হেতু পদার্থ তাহার বিপরীত বা বিরুদ্ধ হইলে সেই হেতুকে বৈধর্ম্যহেতু বলে। সূত্রে বৈধর্ম্য শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় ঐ বৈধর্ম্য শব্দের যোগ বশত: উদাহরণ শব্দের অর্থ হয় বৈধর্ম্য দৃষ্টান্ত। ইহাতে সূত্রার্থ হয়। বৈধর্ম্যদৃষ্টান্ত পদার্থের যাহা কেবল বৈধর্ম্য অর্থাৎ যাহা বৈধর্ম্য হেতুপদার্থ, তৎপ্রযুক্ত সাধ্যধর্মের সাধনত্ববোধক যে বাক্য তাহা হেতু। ঐ দ্বিতীয়প্রকার হেতুর পদার্থনামক বৈধর্ম্যহেতু বাক্য।

উদাহরণ, অনিত্য: শব্দ: এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ এই রূপ হেতুবাক্যের প্রযোগ করিয়া ভাষ্যকার অনুৎপত্তিকর্মকংনিত্যংদৃষ্টং যথা আত্মাদি দ্রব্য: এই রূপ বৈধর্ম্য উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি নাই, যেই সমস্ত পদার্থ অনুৎপত্তিধর্মক। সেই সমস্ত পদার্থনিত্য যেমন আত্মাদি পদার্থ। অনিত্য: শব্দঃ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ এই অনুমানে বাদী যদি উক্তরূপে আত্মা প্রভৃতি বৈধর্ম্য গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ করেন তাহা হইলে প্রযুক্ত উৎপত্তি কর্মকত্বাৎ এই হেতু বাক্যই বৈধর্ম্য উদাহরণ বাক্য হইবে। সুতরাং উক্ত অনুমানের ক্ষেত্রে বৈধর্ম্যোদাহরণ বাক্যপ্রযুক্ত হওয়ায় উৎপত্তি ধর্মকত্বাৎ এই হেতুবাক্যই বৈধর্ম্যহেতুবাক্য।

তৃতীয় অবয়ব ''উদারহণ''

উদাহরণ দ্বিবিধ, সাধর্ম্যোদাহরণ এবং বৈধর্ম্যোদাহরণ। মহর্ষি প্রথমত: সাধর্ম্যোদাহরণ বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন। সুতরাং সূত্রস্থ উদাহরণ শব্দের দ্বারা সাধর্ম্যোদাহরণ বুঝিতে হইবে। সূত্রটি হইল—

'' সাধ্যসাধর্ম্যাৎ তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্''

সূত্রার্থ- সূত্রস্ত সাধ্যপদে সাধ্যধর্মী বোধ। সুতরাং সাধ্যধর্মীর সহিত সমানধর্মবত্তা প্রযুক্ত সেই সাধ্যধর্মীর

ধর্মের অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ভাববিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্টান্ত, সেই দৃষ্টান্তের বোধক বাক্যে উদাহরণ অর্থাৎ তৃতীয় অবয়ব ''সাধর্ম্যোদাহরণ''।

সামান্য লক্ষণ ব্যতীত বিশেষ লক্ষণ করা যায় না। এই সামান্য লক্ষণ সূত্রস্থ উদাহরণ পদের দ্বারা সূচিত। যেমন উদাহরণপদের সমাখ্যা-নির্বাচনের মাধ্যমে উদাহরণ বাক্যের সামান্য লক্ষণ সংঘটিত হয়। উদাহরণ পদের সমাখ্যা নির্বাচন হইল।'' উদাহ্রিয়তে ধর্ময়ো: সাধ্যসাধনভাবো যেন বাক্যেন'' এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশত: উদাহরণ শব্দের দ্বারা সামান্যলক্ষণ বুঝা যায়। যেমন ন্যায়বাক্যে ''ধর্মদ্বয়ের সাধ্য সাধনভাব বা ব্যাপ্যব্যাপক ভাব প্রদর্শক বাক্যত্বই উদাহরণত্ব'' ইহাই উদাহরণবাক্যের সামান্যলক্ষণ। সমানোধর্মো যস্য স সধর্মা, তাহার ভাব সাধর্ম্য, অর্থাৎ সমান ধর্মবত্তা। সুতরাং উদাহরণ বাক্যে যে ধর্ম সাধ্যরূপে গৃহীত সেই ধর্ম যদি দৃষ্টান্ত পদার্থে গৃহীত হয় এবং তদ্ধর্মভাবী হয়, তাহা হইলে সেই দৃষ্টান্ত পদার্থকে উদাহরণ বলে।

তদ্ধর্মভাবীপদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''তস্যধর্ম তদ্ধর্ম: তস্য সাধ্যস্য''। অর্থাৎ সাধ্য দুই প্রকার (১) ধর্মবিশিষ্ট সাধ্য, যেমন শব্দস্য অনিত্যত্বম্। এই স্থলে পক্ষীভূত শব্দ ধর্মী বা বিশ্লেষণ, আর সাধ্যভূত অনিত্যত্ব বিশেষ্য। (২) সাধ্য বিশিষ্ট ধর্মী এই পক্ষে সাধ্য বিশ্লেষণ বা বিধেয় আর পক্ষ বিশেষ্য বা উদ্দেশ্য যেমন অনিত্য:শব্দ : এই বাক্যে পক্ষীভূত শব্দ বিশেষ্য আর সাধ্যভূত অনিত্যত্ব বিশেষণ। তদ্ধর্মভাবী এই পদস্থ তৎ পদে প্রকৃত স্থলে পরবর্ত্তী পক্ষ গ্রহণীয়। অর্থাৎ তৎপদে ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী এই পক্ষই গ্রহণীয়। কারণ যেহেতু ধর্মের পৃথক্ প্রয়োগ হইয়াছে। অর্থাৎ তদ্ শব্দের দ্বারা ধর্মরূপসাধ্য গৃহীত হইলে দ্বিতীয় ধর্মশব্দের প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। কাজেই তদ্ শব্দে সাধ্যবিশিষ্ট ধর্মীয় গ্রহণীয়। তদ্ধর্মভাবী পদের অর্থ, বদ্ধর্মস্য ভাব:তদ্ধর্মভাব: স যসিসন্ দৃষ্টান্ত বর্ত্ততে স সাধ্যসাধর্ম্যাৎ তদ্ধর্মভাবী ভবতি সচ উদাহরণমিষ্যতে অর্থাৎ তদ্ধর্মের ভাব হইল বিদ্যমানতা তদ্ধর্মভাব। তাহা যে দৃষ্টান্ত পদার্থে থাকে তাহা তদ্ধর্মভাবী এবং সাধর্ম্যোদাহরণ নামক তৃতীয় অবয়ব। যেমন স্থাল্যাদিদ্রব্যম্ উৎপত্তধর্মকম্ অনিত্যংদৃষ্টান্ত।

বক্তব্য হইল, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তিধর্মক, তাহা কখনও উৎপত্তির পূর্বে থাকিয়া উৎপন্ন হয় না যেহেতু নৈয়ায়িক সম্প্রদায় আরম্ভবাদী। পরে তাহা সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই কারণে তাহা অনিত্য। অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল পদার্থ অনিত্য। তাহাদের মধ্যে উৎপত্তিধর্মকত্ব হইল সাধন বা হেতু। আর আনিত্যত্ব হইল সাধ্য। সেই সাধ্যসাধনভাবের বা ব্যাপ্যব্যাপকভাবের উপলব্ধি হয়। দৃষ্টান্ত পদার্থে উক্ত সাধ্যসাধনভাবের উপলব্ধি করিয়া শব্দে অনুমিতি করিয়া থাকে। যেমন শব্দ উৎপত্তি ধর্মকত্বাং অনিত্য: স্থাল্যাদিদ্রব্যবৎ। ইহা সাধর্ম্যোদাহরণের ক্ষেত্রে অনুমিতির আকার।

''বৈধর্ম্যোদাহরণ''

মহর্ষি গৌতমোকক্তত্র— তদ্ধিপর্যায়াদ বা বিপরীতম্''

সম্পূর্ণ সূত্র হইল— ''সাধ্য ধৈর্ম্যাদ অতদ্ধর্যভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্''।

অর্থাৎ তদ্ বিপর্য্য প্রযুক্ত অর্থাৎ সূত্রোক্ত সাধ্যসাধর্ম্যের বিপর্য্যয় বা অভাবরূপসাধ্যধর্মপ্রযুক্ত বিপরীত

অর্থাৎ পূর্বত্রোক্ত তদ্ধর্মভাবীর বিপরীত অতর্দ্ধভাবী দৃষ্টান্ত বোধক বাক্যে উদাহরণ বা বৈধর্ম্য উদাহরণ। যথা অনিত্য: শব্দ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ, অনুৎপত্তিধর্মকং নিত্যমাত্মদিদ্রব্য। এই আত্মাদিদ্রদ্যরূপদৃষ্টান্ত সাধ্যধর্মীর অর্থাৎ অনিত্ববিশিষ্ট— শব্দের বৈধর্ম্য অনুৎপত্তিধর্মকত্বপ্রযুক্ত অর্দ্ধমভাবী। কারণ সাধ্যধর্মীর যে অনিত্যত্বরূপ ধর্ম, তাহা ঐ আত্মাদি দৃষ্টান্তে থাকে না। সুতরাং আত্মাদি দৃষ্টান্তে উৎপত্তি ধর্মত্বের অভাবপ্রযুক্ত অনিত্যত্বের অভাব নিত্যত্ব থাকে, এইরূপ উপলব্ধি করিয়া শব্দরূপ পক্ষে বিপর্য্যয়কে অর্থাৎ নিত্যত্বের অভাব অনিত্যত্বকে অনুমান করে। যেমন ''অনিত্য: শব্দ: উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ'' অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বের সদ্ভাববশত = শব্দে অনিত্যত্বের অনুমান হয়।

বস্তুত: সাধ্যর্মপ্রযুক্ত উক্ত হেতুবাক্যের সাধ্যধর্মীর সহিত সাধর্ম্যনিবন্ধন তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত হইল সাধর্ম্যোদাহরণ, আর বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত উক্তবাক্যের সাধ্যবিশিষ্ট ধর্মীর সহিত বৈধর্ম্যনিবন্ধন অতদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত হইল বৈধর্ম্যোদাহরণ। সাধম্যোদাহরণ পক্ষে দৃষ্টান্ত পদার্থে যে দুইটি ধর্ম সাধ্যসাধনভাবাপন্ন হয়, সাধ্যবিশিষ্টধর্মীতে সেই দুইটি ধর্ম্যের (সাধ্য এবং হেতুর) সাধ্য সাধনভাবের অনুমিতি হয়। আর বৈধর্ম্যোদাহরণপক্ষে দৃষ্টান্ত পদার্থে যে দুইটি ধর্মের মধ্যে একটি ধর্মের অভাব নিবন্ধন অপরধর্মের অভাবের অনুমিতি হয়। যেমন অনিত্য: শব্দ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ এই অনুমিতি স্থলে সাধ্য অনিত্যত্ব হেতু উৎপত্তি ধর্মকত্ব। যেখানে উৎপত্তিধর্মকত্ব থাকে, সেখানে সাধ্য অনিত্যত্ব থাকে, যেমন স্থাল্যাদিদ্রব্য। উহা উৎপত্তিধর্মক, তাই অনিত্য। এই অন্বয়ব্যাপ্তি স্থলে সাধ্য অনিত্যত্ব সেখানে সেখানে সাধ্য অনিত্যত্ব নাই এবং হেতু উৎপত্তিধর্মকত্ব। এই সাধ্য এবং হেতুর মধ্যে দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্য সাধনভাব পরিজ্ঞাত হওয়ায় ব্যাপ্য হেতু উৎপত্তি ধর্মকত্বের দ্বারা সাধ্যভূত অনিত্যত্বের অনুমিতি হয়। আর যেখানে হেতু উৎপত্তি ধর্মকত্ব নাই যেমন আত্মা। এইরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্থলে দৃষ্টান্ত পদার্থ আত্মায় হেতু উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব থাকায় সাধ্য অনিত্যত্বের অভাব আছে। সুতরাং সাধ্যবিশিষ্ট ধর্মী শব্দে হেতু উৎপত্তিধর্মকত্বের সত্তা থাকায় সাধ্য অনিত্যত্বের সত্তার অনুমিতি হয়। ব্যতিরেকব্যাপ্তি স্থলে সাধ্যভাব ব্যাপ্য হয় এবং হেতুভাব ব্যাপক হয়। ব্যাপক না থাকিলে ব্যাপ্য থাকে না। যেমন ধূমাভাব না থাকিলে বহ্ন্যভাব থাকে না। সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগিত্বং ব্যতিরেক ব্যপ্তিতম্। ব্যাপক হইল তদ্বন্নিষ্ঠত্যন্তভাবাপ্রতিযোগিত্বং ব্যাপকত্বম্। যেমন ধূম ব্যাপ্য, বহ্নিব্যাপক। এই স্থলে ধূমের অধিকরণেবহ্নির ধূমাভাব ব্যাপক বহ্নভাবব্যাপ্য।

উদাহরণ বাক্যে প্রতিপাদিত সাধ্যসাধনভাব হেত্বাভাসে থাকে না। এই কারণে হেত্বাভাস অহেতু।

''চতুর্থ অবয়ব উপনয়''

মহর্ষি গৌতমক্তো সূত্র, '' উদাহরণাপেক্ষাস্তযোত্যুপসংহারো ন তথেতি বা সাধ্যস্যোপনয়'' অর্থাৎ সাধ্য ধর্মীর স্রোতে উদাহরণ অনুসারে ''তথা এইরূপে অথবা ন তথা'' এইরূপে উপসংহার অর্থাৎ হেতু পদার্থের উপন্যাস বা তাদৃশ্য হেতুবোধক বাক্য উপনয়। যেমন শব্দ' অনিত্য: ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য, উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ ইহা হেতুবাক্য, যেখানে উৎপত্তিধর্মকত্ব সেইখানে অনিত্যত্ব ব্যাপ্য উৎপত্তিধর্মকত্ববান্ স্থাল্যাদি। এই ক্ষেত্রে উদাহরণ অনুসারে তথা অর্থাৎ অনিত্যত্বব্যাপ্য উৎপত্তিধর্মকত্ববান্ শব্দ: এই ভাবে যে হেতু পদার্থের উপন্যাস তাহা প্রথম প্রকার উপনয়। দ্বিতীয় প্রকার উপনয় হইল ''নবথা'' অর্থাৎ আত্মা অনিত্যত্বব্যাপ্য উৎপত্তিধর্মকত্ববান্ নয়, আত্মা নিত্যত্বব্যাপ্য অনুৎপত্তিধর্মকত্ববান্।

ভাষ্যকার উদাহরণপেক্ষ পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ''উদাহরণাপেক্ষাং উদাহরণতন্ত্র উদাহরণবশ:। এবং বশ্যতা হইল সামর্থ্য। সামর্থ্যপদের ফলের সহিত সম্বন্ধ। অর্থাৎ হেতুপদার্থ যে পদার্থের ব্যাপ্য বলিয়া উদাহরণ বাক্যে গৃহীত সেই স্থলে ''তথা'' এইরূপে হেতুপদার্থের উপসংহার উপনয়। আবার হেতু পদার্থ যে পদার্থের ব্যাপ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই, সেই স্থলে 'নবথা' এইরূপে হেতুপদার্থের উপন্যাস উপনয় হইবে।

উদাহরণ দুই প্রকার, সাধ্যসাধর্ম্যপ্রযুক্ত, ও সাধ্যবৈধর্ম্যপ্রযুক্ত, তাহার মধ্যে প্রথমস্থলে ''স্থাল্যাদিদ্রব্যম্ উৎপত্তিধর্মকম্ অনিত্যং দৃষ্টম্'' সেইরূপ শব্দ উৎপত্তিধর্মক, এই কারণে সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার হয়। অর্থাৎ অনিত্যত্ব ও উৎপত্তিধর্মকত্ব এই ধর্মদ্বয়ের মধ্যে সাধ্য-সাধনভাব বা ব্যাপ্যব্যাপকভাবে সম্বন্ধ আছে-ইহা উদাহরণ বাক্যে পরিজ্ঞাত। আর উপনয় হইল উদাহরণাপেক্ষা বা উদাহরণের অধীন। তাই অনিত্যত্বব্যাপ্য উৎপত্তিধর্মকত্ব সাধ্যধর্মীবাপক্ষীভূত শব্দে আছে; এইভাবে সাধ্যধর্মী শব্দে ব্যাপ্যত্বরূপে হেতু উৎপত্তিকর্মকত্বের উপসংহার হয়।

আর সাধ্যবৈধর্ম্যযুক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে আত্মাদিদ্রব্য অনুৎপত্তি ধর্মক নিত্য, এই বৈধর্ম্য উদাহরণ প্রযুক্ত হইলে নচতথা অনুৎপত্তিধর্মক: শব্দ: এইরূপ অনুৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার প্রতিবিদ্ধ হওয়ায় শব্দে অনুৎপত্তিধর্মকত্বের নিষেধক উক্ত উপনয় বাক্যের দ্বারা সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার হয়। অনুৎপত্তিধর্মকত্ব হইল হেতুউৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব, আর নিত্যত্ব হইল সাধ্য অনিত্যত্বের অভাব। সাধ্যধর্মী শব্দে উৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার হয়। যে হেতু শব্দ উৎপত্তিধর্মক এবং অনিত্য। যেখানে যেখানে সাধ্য অনিত্যত্বের অভাব থাকে, সেখানেই হেতু উৎপত্তিধর্মকত্বের অভাব থাকে। অথচ সাধ্য বিশিষ্টধর্মী শব্দে তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। এই কারণে সাধ্যব্যাপ্যহেতুসত্তারূপে শব্দে হেতু উৎপত্তিধর্মকত্বের উপসংহার হয়। ইহা দ্বিতীয় প্রকার উপনয়।

উদাহরণবাক্য সাধর্ম্যোদাহরণ এবং বৈধম্যোদাহরণ ভেদে দ্বিবিধ বলিয়া উপনয় বাক্যও দ্বিবিধ।

উপসংহার শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল, ''উপসংহ্রিয়তে অনেন ইতি উপসংহার''। অর্থাৎ সাধ্যধর্মের ব্যপ্তিবিশিষ্ট হেতু মত্বরূপে সাধ্য ধর্মী নিশ্চিত হয়, ইহাই উপসংহার পদের অর্থ।

''পঞ্চম অবয়ব নিগমন''

প্রথমেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, সাধ্যর্ম্য ও বৈধর্ম্যভেদে হেতুবাক্য দ্বিবিধ, উদাহরণ বাক্য দ্বিবিধ এবং উপনয় বাক্য দ্বিবিধ, তথাপি নিগমন বাক্য সমান বা এক। অর্থাৎ সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্য থাকিলেও নিগমন বাক্যের কোন ভেদ নাই। উহা একপ্রকারই।

'মহর্ষির সূত্র'

''হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়া: পুনর্বচনং নিগমনম্'' অর্থাৎ পঞ্চম নিগমন বাক্য হইল হেতুবাক্যের অভিধান পূর্বক প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুন:কথন। সাধর্ম্যপ্রযুক্তহেতু এবং বৈধর্ম্য প্রযুক্তহেতু উভয়ক্ষেত্রে উদাহরণ অনুসারে

সমানাকার নিগমন বাক্যের প্রয়োগ হয়। যেমন ''উৎপত্তিধর্মকত্বাদ্ অনিত্য: শব্দে:'' ইহাই নিগমন বাক্য। সুতরাং নিগমন বাক্য এক প্রকারই হয়। ইহার কোন প্রকারভেদ বা পার্থক্য নাই।

নিগমন শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''নিগম্যন্তে অনেন ইতি প্রতিজ্ঞাহেতূদারহরণোপনয়া একত্রেতি নিগমনম্'' অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ ও উপনয় এই চারিটি বাক্য একটি অর্থে নিগমিত হয় তাহাই ''নিগমন'' নিগমিত হয় ইহার অর্থ, সামর্থ্যযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত হয়। অর্থাৎ পঞ্চম অবয়ব নিগমন বাক্যের সামর্থ্য বা সম্বন্ধ জ্ঞান জন্মায়। এই কারণে উক্তব্যুৎপত্তি অনুসারে এই পঞ্চম অবয়বকে নিগমন বলা হয়।

যেমন সাধর্ম্যপ্রযুক্ত হেতুস্থলে ''অনিত্য: শব্দ:'' ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য। ''উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ'' ইহা হেতুবাক্য। ''উৎপত্তিধর্মকং স্থাল্যাদিদ্রব্যমনিত্যম্'' ইহা উদাহরণবাক্য। ''তথাচ উৎপত্তিধর্মক: শব্দ:'' ইহা উপনয় বাক্য। ''তস্মাৎ উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ অনিত্য: শব্দ:'' ইহা নিগমন বাক্য। সেইরূপ বৈধর্ম্য প্রযুক্ত হেতুস্থলে যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব বাক্য যেমন ''অনিত্য: শব্দ'': ইহা প্রতিজ্ঞাবাক্য। ''উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ'' ইহা হেতুবাক্য। '' অনুৎপত্তি ধর্মকং আত্মাদিদ্রব্যং নিত্যং দৃষ্টম্'' ইহা উদাহরণবাক্য। ''নচতথা অনুৎপত্তিধর্মক: শব্দ'' ইহা উপনয় বাক্য। ''তস্মাদি উৎপত্তিধর্মকত্বাদ্ অনিত্য: শব্দ:'' ইহা নিগমন বাক্য।

বক্তব্য হইল, নিগমন বাক্যে হেতুবাক্যের উপপাদন পূর্বক প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুন: কথন অবশ্যই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই হেতুবাক্যবোধহেতু পদার্থ যে, সাধ্যধর্মের ব্যপ্তিবিশিষ্ট এবং সেই সাধ্যধর্মীতে বর্ত্তমান, ইহা প্রকাশ করিতে প্রথমে ''তস্মাৎ'' এই পঞ্চম্যন্ত তৎশব্দের প্রয়োগ হয়। কারণ নিগমন বাক্যের দ্বারা উক্ত বাক্যচতুষ্টয়ের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহাই এককথায় বলা হয়। পূর্বোক্ত উদাহরণ বাক্যের দ্বারা পূর্বোক্ত হেতুপদার্থ যে, সেই সাধ্যধর্মের ব্যাপ্য ইহা প্রতিপাদিত হয় এবং তাদৃশ্যহেতুপদার্থ যে পক্ষধর্ম, ইহা উপনয় বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। নিগমন বাক্যে ''তস্মাৎ'' এই পদের দ্বারা তাহাই প্রকাশিত হয় এবং হেতুবাক্যের দ্বারা এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা যথাক্রমে পূর্বোক্ত হেতুবাক্যার্থ প্রকাশিত হয়। সুতরাং নিগমন বাক্যদ্বারা যে, পূর্বোক্তবাক্যচতুষ্টয়ের প্রতিপাদ্যই বুঝা যায়, এবং ইহা বুঝা আবশ্যক যে, নিগমন বাক্যের শেষে উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনই কত্তর্ব্য হইলে প্রতিজ্ঞাবাক্যের ন্যায় নিগমন বাক্যও একপ্রকারই হইবে। সুতরাং হেতুবাক্য প্রভৃতির ন্যায় সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যভেদে নিগমন বাক্যও দ্বিবিধ হইবে না। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতে প্রথমে নিগমন বাক্যের উপস্থাপক এই সূত্রের অবতার নয়ে ''সমানম্'' এইরূপ বলিয়াছেন।

অতএব হেত্বপদেশ পূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনই 'নিগমন'' নামে অভিহিত হয়।

দশম পাঠ

ন্যায় বাক্যপ্রতিপাদিত পদার্থের প্রমাণচতুষ্টয় সাধ্যতা বিচার।

ভাষ্যকার যথাক্রমে পঞ্চাবয়ব প্রদর্শন করিয়া পঞ্চাবয়ব ন্যায়বাক্যের প্রতিপাদ্য চরম ফল প্রকাশ যোগ্য, কারণ ন্যায় বাক্যে প্রমাণ চতুষ্টয় মিলিত হইয়াই সাধনীয় পদার্থ সাধন করে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্র ভাষ্যেরও ইহার সূচনা করিয়াছেন, যেমন ''তেষু প্রমাণ সমবায়''। অর্থাৎ ন্যায় বাক্যের অন্তর্গত প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব পঞ্চকে প্রত্যাক্ষাদি প্রমাণের সমবায় বা মিলন আছে। এখন ভাষ্যকার ঐ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''অবয়বসমুদায়ে চ বাক্যে সম্ভূয় ইতরেতরা-ভিসম্বন্ধাৎ প্রমাণদি অর্থং সাধয়ন্তীতি এবং সম্ভবস্তাবৎ''। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাদি অবয়বরূপ ন্যায় বাক্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ মিলিত ভাবে পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ পদার্থের সাধন করে এবং ইহা সম্ভব। প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব সমূহ যখন কোন পদার্থে সাধন করে, তখন ঐ অবয়ব সমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ প্রবিষ্ট থাকে। সুতরাং অবয়বসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ সুতরাং প্রমাণসমূহের দ্বারাও প্রতিপাদিত।

পঞ্চাবয়বসমূহ কিভাবে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত মিলিত হইয়া পদার্থ প্রতিপাদন করে, তাহা ভাষ্যকার আলোচনা করিয়া দেখাইতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দপ্রমাণের হেতুবাক্যে অনুমান প্রমাণের উদাহরণ বাক্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের এবং উপনয় বাক্যে উপমান প্রমাণের মিলন আছে। আর অবয়বসমূহের একার্থপ্রতিপাদনে সামর্থ্যপ্রদর্শক হইলে নিগমন।

ভাষ্যকার প্রথম বলিয়াছেন ''শব্দবিষয়া প্রতিজ্ঞা'' অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হইল শব্দপ্রমাণের বিষয় আগমরূপশব্দ প্রমাণমূলক যেহেতু প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের দ্বারা আপ্তবাক্যের প্রতিসন্ধান হয়, অর্থাৎ সেই আপ্তবাক্য পতিপাদিত সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর জ্ঞান হয় এবং ঋষিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য উপপন্ন হয়। অর্থাৎ অলৌকিক বিষয় ঋষিভিন্ন ব্যক্তির আপ্তত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহার অভিহিত প্রতিজ্ঞাবাক্য শব্দপ্রমাণ হয় না। সুতরাং ঋষিভিন্নব্যক্তির আপ্তত্বসিদ্ধ না হওয়ায় তাঁহার কথিত বাক্য আপ্তবাক্য নয়। কাজেই তাহা শব্দপ্রমাণ হইতে পারে না। তথাপি প্রতিজ্ঞাবাক্য আগমমূলক বা আগমসদৃশ। এই অভিপ্রায়েই ভাষ্যকার ''আগমঃ প্রতিজ্ঞা'' এইরূপ বলিয়াছেন।

''অনুমানং হেতুং'' অর্থাৎ হেতুবাক্যে অনুমান প্রমাণের প্রবেশ আছে। দ্বিতীয় অবয়ব হেতু বাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত বিষয় ফলক অনুমান প্রমাণের দ্বারাও প্রতিপাদিত। ভষ্যকার বলিয়াছেন, ''উদাহরণে সংদৃশ্য প্রতিপত্তেঃ। বক্তব্য হইল, প্রথম কোন উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত পদার্থে সাধ্যধর্মের ব্যাপ্তিবিষ্টিরূপ যে লিঙ্গজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা প্রথমলিঙ্গদর্শন। পরে পক্ষভূত কোন পদার্থে যে লিঙ্গজ্ঞান উযপন্ন হয়। তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শন। সেই দ্বিতীয়লিঙ্গদর্শন পূর্বনিশ্চিত সেই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্মারক। সুতরাং পরস্পরায় তাহাও অনুমান প্রমাণ হয়। ন্যায় প্রয়োগস্থলে দ্বিতীয় অবয়ব হেতুবাক্য সেই দ্বিতীয় লিঙ্গদর্শনরূপ অনুমান প্রমাণমূলক। কারণ সেই লিঙ্গ দর্শন হইলেই হেতু বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং হেতুবাক্য উক্তদ্বিতীয় লিঙ্গ দর্শনরূপে অনুমান প্রমাণ মূলক হওয়ায় ঐ অভিপ্রায় হেতুবাক্যকেও অনুমান প্রমাণ বলা হয় অর্থাৎ হেতুবাক্যেও অনুমানশব্দের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''প্রত্যক্ষ বিষয় সুদাহরণং দৃষ্টনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষং বিষেয়ো যস্য এইরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে প্রত্যক্ষ বিষয় শব্দের অর্থ হয়, যাহার প্রতিপাদ্য বিষয় পূর্বে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। প্রকৃত হেতু

পদার্থে সাধ্যধর্মের যে ব্যাপ্তি সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাই উদাহরণ বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। পূর্বে কোন দৃষ্টান্ত পদার্থে তাহার প্রত্যক্ষ হইলে উদাহরণ বাক্যকে প্রত্যক্ষ বিষয় বলা হয়। সুতরাং উদাহরণ বাক্যটি প্রত্যক্ষমূলক। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''দৃষ্টেনাদৃষ্টসিদ্ধেঃ''।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উপমানযুপনয়ঃ তথ্যেভ্যপসংহারাৎ নচতথেতি চোপমান ধর্ম প্রতিষেধে বিপরীত ধর্মোপসংহার সিদ্ধেঃ'' অর্থাৎ তথ্য এই ভাবে উপসংহার হয় এবং ন তথা এই ভাবে উপমানের ধর্ম প্রতিসিদ্ধ হওয়ায় বিপরীত ধর্মের উপসংহারসিদ্ধ হয়। যেমন পূর্বোক্ত স্থলে আত্মাদিব্যতিবেক দৃষ্টান্ত গত ধর্ম অনুৎপত্তিধর্মকত্বমুচ তথা ইত্যাদি উপনয় বাক্যের দ্বারা শব্দে সেই ধর্মের প্রতিষেধ হলে অর্থাৎ অভাব প্রতিপাদিত হইলে তাহাতে সেই ধর্মের বিপরীত ধর্ম উৎপত্তিধর্মকত্বের যে অভাব, তাহা বস্তুতঃ উৎপত্তি ধর্মকত্বই। এই ভাব উপনয় বাক্য উপমান প্রমাণের বিষয়।

আর পঞ্চাঅবয়ব নিগমন হইল প্রতিজ্ঞাদি বাক্য চতুষ্টয়ের একার্থবোধে সার্ম্যপ্রদর্শক, অর্থাৎ পরস্পরা কাঙ্খারূপ সামর্থ্যের বোধক হইল নিগান।

প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চবাক্যের পরস্পরাপেক্ষারূপ আকাঙ্খা হইল নিম্নোক্তরূপ। যেমন প্রতিজ্ঞা ব্যতীত অর্থাৎ প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যে প্রযুক্ত না হইলে আশ্রয় থাকিবে না। আর আশ্রয় না থাকায় হেতুবাক্য প্রভৃতি প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

হেতুবাক্য না থাকিলে কাহার সাধন সিদ্ধ হইবে এবং দৃষ্টান্ত পদার্থ ও সাধ্যর্ধীতে কাহার উপসংহার সিদ্ধ হইবে? কাহার উল্লেখপূর্বক প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনর্বচনরূপ নিগমন হইবে? অর্থাৎ হেতুবাক্য কথিত না হইলে সাধ্য ধর্মের সাধন বলা হইবে না। সুতরাং উপনয় বাক্য ও নিগমন বাক্যও বলা যাইতে পারেনা। উদাহরণ বাক্য ব্যবহৃত না হইলে কাহার সহিত সাধর্ম্য এবং বৈধর্ম্যকে সাধ্য সাধন বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। কাহারই বা সাধর্ম্যবশতঃ উপসংহারে বাক্য প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ উদাহরণ বাক্য বলা না হইলে দৃষ্টান্ত পর্দার্থের বোধ না হওয়ায় হেতুপদার্থকে সাধ্য সাধন বলিয়া অবগত হওয়া যায় না এবং উপনয় বাক্যও প্রযুক্ত হইতে পারে না। উপনয় বাক্য ব্যতীত সাধ্যধর্মীতে অনুপংহৃত বা অনিশ্চিত সাধক ধর্ম অর্থাৎ হেতুপদার্থ সাধ্যধর্মকে সিদ্ধ করিতে পারে না। আর পঞ্চাবয়বের মধ্যে নিগমন বাক্য প্রযুক্ত না হইলে অনভিব্যক্ত সম্বন্ধ অর্থাৎ যাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অনভিব্যক্ত বা অজ্ঞাত। এমন প্রতিজ্ঞাদিবাক্যচতুষ্টয়ের একার্থবিশিষ্ট রূপে প্রবর্ত্তন বা তথা এইরূপে প্রতিজ্ঞাদি প্রতিপাদন কিভাবে হইবে। কারণ নিগমন বাক্যই পরিতিজাদি বাক্য চতুষ্টয়ের পরস্পর সম্বন্ধে প্রতিপাদন করে, যাহা অন্য কোন বাক্যের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সর্বশেষে নিগমন বাক্য অবশ্য বক্তব্য। এইভাবে ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদিবাক্যপক্ষকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণচতুষ্টয়ের সমাবেশে বিবৃত করিয়াছেন।

''প্রতিজ্ঞাদি অবয়বপঞ্চকের প্রয়োজন''

সম্প্রতি প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়বের প্রত্যেকের যথাক্রমে প্রয়োজন কথিত হইতেছে। প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রয়োজন হইলে, ধর্মীর সহিত সাধ্যধর্মের সম্বন্ধের উপাদান অর্থাৎ যে ধর্মীতে যাহা সাধ্যধর্ম, সাধ্যধর্মবিশিষ্টরূপ সেই সাধ্যধর্মীর কথন।

হেতুবাক্যের প্রয়োজনে, দৃষ্টান্তপদার্থের সহিত বা বিপরীত পদার্থের অর্থাৎ সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যরূপ কোন পদার্থে বা দৃষ্টান্তভূত কোন পদার্থে ধর্মদ্বয়ের সাধ্য-সাধনভাব প্রদর্শন।

উদাহরণ বাক্যের প্রয়োজন, সাধনভূত ধর্মের বা হেতুপদার্থের সাধ্যধর্মের সহিত সমানাধিকরণ্যের অর্থাৎ একই আধার বর্ত্তমানতার উপপাদন।

উপনয় বাক্যের প্রয়োজন, উদাহরণস্থিত অর্থাৎ দৃষ্টান্ত পদার্থেস্থিত ধর্মদ্বয়ের সাধ্যসাধনভাবের জ্ঞান হইলে সাধ্যধর্মীতে বিপরীতপ্রসঙ্গের অর্থাৎ সেই সাধ্যধর্মের বিপরীত অভাবের আপত্তির প্রতিষেধ।

এইভাবে নিগমন বাক্যের প্রয়োজন, সাধ্যধর্মীতে সাধ্যধর্মের প্রভাবে আপত্তির নিরাকরণ। ভাষ্যকার প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়বের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। ইহাতে অবয়বের পঞ্চবিধত্ব সিদ্ধ হইল।

কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক দশসংখ্যক অবয়ব স্বীকার করেন। এই স্থলে নৈয়ায়িক বলিতে সাংখ্যসম্প্রদায়কে বুঝিতে হইবে। কারণ প্রাচীন কালে সাংখ্যসম্প্রদায়কে নৈয়ায়িক বলা হইত। দশাবয়ব হইল, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন পর্য্যন্ত পাঁচটি এবং জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন ও সংসায়ব্যুদাম। ন্যায়তন্ত্রে এই দশাবয়ব বাদ স্বীকৃত নয়। ভাষ্যকার জিজ্ঞাসা প্রভৃতি অতিরিক্ত অবয়ব পঞ্চকের ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

যেমন, জিজ্ঞাসা অপ্রতীয়মান পদার্থ অর্থাৎ সামান্যতঃ জ্ঞায়মান কিন্তু ধর্মরূপ অজ্ঞায়মান পদার্থবিষয়ে প্রত্যয়ার্থের অর্থাৎ সেই পদার্থের অত্ত্বাবধারণরূপে প্রত্যয় বা জ্ঞানের অর্থের বা প্রয়োজনের অর্থাৎ পূর্বোক্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলে প্রবর্ত্তিকা বা উৎপাদিকা হইল জিজ্ঞাসা। অপ্রতীয়মান পদার্থকে জিজ্ঞাসা করার কারণ হইল, যথার্থরূপে জ্ঞাত সেই পদার্থকে ত্যাগ করিব অর্থাৎ গ্রহণ করিব অথবা উপেক্ষা করিব।

ঐ সকল হানবুদ্ধি, উপাদানবুদ্ধি এবং উপেক্ষাবুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন। এই সমস্ত হানাদিবুদ্ধিরূপ ফললাভের জন্য জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা করে। সেই জিজ্ঞাসা পদার্থের সাধক নয় অর্থাৎ কোন পদার্থের প্রতিপাদক বাক্য নহে। তাই জিজ্ঞাসা ন্যায়বাক্যের অবয়ব নয়।

দ্বিতীয় সংশয়, ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''জিজ্ঞাসাসাধিষ্ঠনংসংশয়শ্চ ব্যাহত ধর্মোপসংঘাতাৎ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্নঃ'' অর্থাৎ জিজ্ঞাসায় অধিষ্ঠান বা কারণরূপ আশ্রয় হইল সংশয়। কিন্তু বিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের উপসংঘাতবশতঃ অর্থাৎ তাহার সহিত বিষয়—বিষয়িভাব সম্বন্ধবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানে প্রত্যাসন্ন বা সন্নিহিত। যেহেতু বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়েরমধ্যে একতর তত্ত্ব হইবার যোগ্য। এই সংশয় প্রথমসূত্রে পৃথক্ উপদিষ্ট হইলেও সংশয় কোন পদার্থের প্রতিপাদক নয় বলিয়া অবয়ব হইবার যোগ্য নহে।

তৃতীয় বাক্যপ্রাপ্তি, প্রমাণসমূহ প্রমেয় অধিগমের সাধক, সেই শক্যপ্রাপ্তি অর্থাৎ প্রমাণ সমূহের প্রমেয়াধিগমে সামর্থ্য প্রতিজ্ঞাদিবাক্যের ন্যায় সাধক বাক্যের অর্থাৎ ন্যায়নামক মহাবাক্যের ভাগ বা অংশের সহিত যুক্ত হয়না। অর্থাৎ শক্যপ্রপ্তি পরপ্রতিপাদক বাক্য নয়। এই কারণে শক্যপ্রাপ্তি কোন অবয়ব নয়।

চতুর্থ প্রয়োজন, তত্ত্বের অবধারণরূপ প্রয়োজন অর্থ প্রতিপাদক বাক্যের বা ন্যায়বাক্যের ফল। একদেশ বা অংশ নয়। তাই প্রয়োজন পরপ্রতিপাদক বাক্য না হওয়ায় অবয়ব পদবাচ্য হইতে পারে না।

পঞ্চম সংশয় ব্যুদাস, সংশয়ব্যুদাস হইল প্রতিপক্ষোপবর্ণন অর্থাৎ প্রতিপক্ষরূপ সাধ্যধর্মে হেতুর অভাবের বর্ণন। এই প্রতিপক্ষোপবর্ণন, প্রতিষেধে অর্থাৎ প্রমাণদ্বারা প্রতিপক্ষের খণ্ডনে তত্ত্বজ্ঞানের বা প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞানার্থ, অর্থাৎ তত্ত্বসাধক প্রমাণের অনুগ্রহই উহার প্রয়োজন এবং সংশয় নিরাস উহার ফল। কিন্তু সংশয়ব্যুদাস বা তর্ক সাধক বাক্যের বা ন্যায়বাক্যের অংশ নয়। এই কারণে সংশয় ব্যুদাস ন্যায়নামকমহাবাক্যের অবয়ব হইতে পারে না।

একাদশ পাঠ

বাৎস্যায়ন ভাষ্য ''তর্ক''

প্রমানাদিষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত অন্যতম অষ্টম পদার্থ তর্ক। অবয়ব নিরূপণের পর মহর্ষি ক্রমানুসারে তর্কের নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ তর্ক পদার্থের স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে মহর্ষি সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সূত্রটি হইল, ''অবিজ্ঞাত তত্ত্বেদৃর্থে কারণোপপত্তিত স্তত্ব জ্ঞানার্থমূহস্তর্কা''।

সূত্রার্থ— অবিজ্ঞাত তত্ত্বক পদার্থে অর্থাৎ সামান্যত: জ্ঞাত যে পদার্থের তত্ত্বঅবিজ্ঞাত, এমন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে কারণের উপপত্তি অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত ঊহনামক জ্ঞান বিশেষ হইলে তর্ক। তর্ক ন্যায়ের উত্তরাঙ্গ। কেহ কেহ তর্ককে অনুমান প্রমাণ অর্থে এবং মনন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। উপনিষদে তর্ককে ষড়ঙ্গ যোগের পঞ্চম অঙ্গরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। ঐরূপ বিভিন্ন অর্থে তর্ক শব্দের প্রয়োগ বা ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। পরন্তু মহর্ষি গৌতমের মতে ন্যায় দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত তর্কপদার্থ কোন প্রমাণ নয়, কিন্তু প্রমাণের সহকারী ঊহরূপ জ্ঞানবিশেষ। এই অভিপ্রায়ে মহর্ষি সূত্রে বলিয়াছেন- ''ঊহস্তর্ক ঃ''। তর্কের প্রয়োজন প্রকাশ করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন ''তত্ত্বজ্ঞানার্যম্'' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত। আর তর্কের প্রয়োজক ব্যক্ত করিতে মহর্ষি বলিয়াছেন ''কারণোপপত্তিত''। এই বাক্যে কারণ শব্দের অর্থ প্রমাণ এবং উপপত্তি শব্দের অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ প্রমাণের সম্ভব প্রযুক্ত যে ঊহ, তাহাই তর্ক। মহর্ষি ঐ ঊহনামক তর্কের বিষয় নিরূপণের জন্য বলিয়াছেন ''অবিজ্ঞাত তত্ত্বেদৃর্থে'' অর্থাৎ যে পদার্থেব তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞাত নয় বা সামান্যত : জ্ঞাত হইলেও বিশেষত: জ্ঞাত নয়,তাহাই ঊহরূপতর্কের বিষয়। সুতরাং যে কোন প্রকার ঊহকে তর্ক বলা যায়না। পরন্তু যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত, কিন্তু তাহার তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, সেই পদার্থবিষয়ে উক্তরূপ উহই তর্ক। আবার অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যেন পুরুষেণ'' এইরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে অবিজ্ঞাতাত্ত্ব শব্দের দ্বারা পুরুষের অবগতি হইলেও অর্থসঙ্গতি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাহা গ্রহণ করা যাইবে না। তাই মহর্ষি ''অর্থে'' এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাতে অবিজ্ঞাততত্ত্ব শব্দের দ্বারা পুরুষ বিবক্ষিত হইতে পারে না। কিন্তু 'অবিজ্ঞাতং তত্ত্বং যস্য অর্থস্য'' এইরূপ বিগ্রহ বাক্যানুসারে উক্তপ্রকার অর্থই বিবক্ষিত। সেই প্রকার পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানার্থ ঊহউ তর্ক। সুতরাং সূত্রে অবিজ্ঞাতত্ত্বস্য অর্থস্য এইরূপ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অনেকে বলিয়াছেন সূত্রে মহর্ষি ষষ্ঠী অর্থেই সপ্তমীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

তর্কের স্বরূপ বিষয় নানামত প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন ''তর্ক'' সংশয় এবং নির্ণয়ের অন্তর্গত। আবার কোন সম্প্রাদায়ের মতে ''তর্ক'' অনুমানেরই নামান্তর। হেতু, তর্ক, ন্যায় ও অন্বীক্ষাশব্দ অনুমান বোধক পর্য্যায়শব্দ। কোন মতে যুক্তি সাপেক্ষ অনুমানকে তর্ক বলে। জৈন মতে অনুমান হইতে ভিন্ন পরোক্ষ প্রমাণ বিশেষ ঊহ বা তর্ক। বৌদ্ধদার্শনিক— গণের মতে প্রসঙ্গানুমান হইলে তর্ক। শ্রীধর ভট্টের মতে এবং বৈশেষিক মতে অনুমান হইলে তর্ক। সপ্তপদার্থ গ্রন্থে বিবাদিত্য তর্ককে সংশয় বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোত করের মতে সংশয় ও নির্ণয় হইতে ভিন্ন সম্ভাবনারূপ জ্ঞানই তর্ক। উদয়নাচার্যের মতে তর্ক অনিষ্টপ্রসঙ্গ। উহা আপত্তিরীপ মানসজ্ঞান।

ভাষ্যকার মহর্ষিকৃত ও তর্ক সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে যে রূপে তর্কের প্রবৃত্তি হয়, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিয়াছেন, অবিজ্ঞায়মানতত্ত্ব কোন পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, পরে এজন্য সেই পদার্থ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের বিষয়ে সংশয় হয়। বলা বাহুল্য, অন্যত্র সংশয়ের পরেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা উৎপন্ন

হইলেও কোন কোন স্থলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরেও সংশয় হইয়া থাকে। সেই সংশয়ই তর্কপ্রবৃত্তির অঙ্গ। এই কারণে ভাষ্যকার প্রকৃত স্থলে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরেই সংশয়ের কথা বলিয়াছেন । অর্থাৎ বিরুদ্ধদ্বয়কে পৃথক্‌ভাবে ইহা কি এইরূপ, অথবা এইরূপ নয়, এইভাবে সংশয় জন্মে। পরে বিমৃশ্যমান বা সন্দিহ্যমান ধর্মদ্বয়ের মধ্যে একতর ধর্মকে কারণের উপপত্তি প্রযুক্ত অনুজ্ঞা করে। এই অনুজ্ঞারূপে জ্ঞান বিশেষই সূত্রোক্ত তর্ক পদার্থ। সূত্রস্থ কারণোপপত্তি পদার্থ হইতে উক্ত অনুজ্ঞায়মান পদার্থবিষয়ে সম্ভবভ্যস্মিন্ কারণং প্রমাণং হেতুরিতি'' অর্থাৎ কারণ কিংবা প্রমাণ বা হেতু সম্ভব এইরূপ জ্ঞান সুতরাং সূত্রোক্ত কারণ শব্দের অর্থ প্রমাণ এবং উপপত্তি শব্দের অর্থ সম্ভব। কারণের উপপত্তি প্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ প্রমাণ সম্ভব প্রযুক্ত এই পদার্থ এইরূপ হইবে অন্যরূপ অর্থাৎ ইহার বিপরীত হইতে পারে না, এইরূপ জ্ঞানই সেই একতর ধর্মের অনুজ্ঞা এবং উহাই তর্কপদার্থ।

তাৎপর্য্য এই যে, এই পদার্থেই প্রমাণের সম্ভব হয়, এই কারণে উহা এইরূপ হইতে পারে, অন্যরূপ হইতে পারে না, এইরূপ সম্ভাবনাত্মক যে জ্ঞান, তাহাই প্রমাণের উপপত্তি প্রযুক্ত সেই প্রমাণবিষয়ীভূত তত্ত্বের অনুজ্ঞা এবং উহাই সূত্রোক্ত ঊহরূপ তর্কপদার্থ। কিন্তু সংশয় ও নির্ণয় তর্কপদার্থ নয়। পরন্তু তদ্ভিন্ন উক্তরূপ বিশেষ জ্ঞান তর্কপদার্থ। ইহাই তর্কের স্বরূপ।

ভাষ্যকার ঐ তর্ক বিষয়ে উদাহরণ বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞাতব্যবিষয়ের জ্ঞাতা অর্থাৎ আত্মা, তাঁহার তত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসার উদ্ভব হইলে কোন বিশেষ কারণে সেই জ্ঞাতা উৎপত্তিধর্মক অথবা অনুৎপত্তিধর্মক এইরূপ সংশয় উদ্ভূত হইতে পারে। পরে সন্দিহ্যমান অবিজ্ঞাততত্ত্ব জ্ঞাতৃপদার্থে বা আত্মপদার্থের যে ধর্মটির অনুজ্ঞার কারণ বা প্রমাণ উপপন্ন হয়, সেই ধর্মকে অনুজ্ঞা করে। আত্মবিষয়ে সেই অনুজ্ঞা হইল, যদি জ্ঞাতা বা জ্ঞানকর্ত্তা আত্মা অনুৎপত্তিধর্মকে হন বা নিত্যপদার্থ হন, তাহা হইলে স্বকৃত কর্মের ফল অনুভব করেন অর্থাৎ পূর্বজন্মকৃত কর্মানুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে পারেন। আর দুঃখ, জন্ম প্রবৃত্তি, দোষ এবং মিথ্যাজ্ঞানের পরটি পূর্বটির কারণ। ''কারণাপায়ে কার্য্যাপায়ঃ'' এই নিয়ম অনুসারে পর পরটি অপায় বা নিবৃত্তি হইলে অর্থাৎ কারণের নিবৃত্তি হইলে তাহাদের অনন্তরের অর্থাৎ অব্যবহিত পূর্বপূর্বটির অর্থাৎ কার্য্যের নিবৃত্তি প্রযুক্ত অপবর্গ বা মুক্তি হয়, এই কারণে সংসার এবং অপবর্গ হইতে পারে। অর্থাৎ আত্মা অনুৎপত্তিধর্মক হইলে সংসার ও অপবর্গ দুইই হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞাতা বা জ্ঞান কর্ত্তা আত্মা উৎপত্তিধর্মক হইলে সংসার ও অপবর্গ হইতে পারে না। কারণ জ্ঞাতা উৎপন্ন হইয়াই দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও বেদনায় বা সুখদুঃখের সহিত সম্বন্ধ হয়, এই কারণে সেই দেহাদি সম্বন্ধ আত্মার স্বকৃত কর্মের ফল হইতে পারে না। কারণ উৎপন্ন জ্ঞাতা বা জ্ঞান কর্ত্তা আত্মা পূর্বে বিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন হন না। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে তাঁহার কোনরূপ সত্তা থাকে না। অতএব পূর্বে অবিদ্যমান অথবা নিরুদ্ধ অর্থাৎ দেহাদির নাশকালে অত্যন্তবিনাশপ্রাপ্ত সেই জ্ঞাতা বা আত্মার স্বকৃত কর্মের ফলভোগ হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এইরূপ হইলে এক জ্ঞাতার বা আত্মার অনেক শরীরের সহিত সম্বন্ধ এবং আত্যন্তিক ভাবে শরীরাদির সহিত বিয়োগ অর্থাৎ চিরকালের জন্য সর্বথা জন্মের উচ্ছেদ হইতে পারে না। এই রূপে সংশয়—কারী ব্যক্তি যে বিষয়ে ''কারণ'' অর্থাৎ প্রমাণকে অনুপপদ্যমান বলিয়া বোঝেন, সেই বিষয়কে অর্থাৎ উক্তস্থলে আত্মাতে সংশয়বিষয়ীভূত উৎপত্তিধর্মকত্বকে অনুজ্ঞা করেন না। পরিশেষে বলা যায় অনুৎপত্তিধর্মকত্বই আত্মার ধর্ম হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু উৎপত্তিধর্মকত্ব নয়। এইভাবে উক্তলক্ষণবিশিষ্ট ঊহই তর্কনামে অভিহিত হয়।

এইস্থলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, কি কারণে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, যে হেতু তর্ক পদার্থের অবধারণ করে না, কেবলমাত্র সংশয়ের নিবর্ত্তন করে।

বক্তব্য হইল, তর্ক প্রমাণের উপপত্তিপ্রযুক্ত একতর ধর্মকে অনুজ্ঞা করে, কিন্তু এই পদার্থ এইরূপই হইবে অন্যরূপ হইবে না এইভাবে তর্ক কোন পদার্থের অবধারণ করে না, ব্যবসায় করেনা বা নিশ্চয় করে না। এই কারণে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নয়।

তথাপি প্রশ্ন হইতে পরে, তর্ক কিভাবে তত্ত্বজ্ঞানার্থ অর্থাৎ তর্কপদার্থ তত্ত্বনিশ্চয়ক না হইলে উহা তত্ত্বজ্ঞানার্থ ইহা কিরূপে বলা হইতেছে।

এই প্রশ্নের উত্তর বলা যায়, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ের অর্থাৎ প্রমাণ— জন্য জ্ঞানের বিষয় সেই তত্ত্বের অভ্যনুজ্ঞারূপ ভাবিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ অতএব প্রসন্ন বা নির্দোষ ঊহরূপতর্কের অনন্তর প্রমাণের সামর্থ্য প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় এই কারণে তর্ক তত্ত্বজ্ঞানার্থ: সুতরাং তর্ক প্রমাণের অভ্যনুজ্ঞাবশতঃ প্রমাণকে প্রতিসন্ধান করে অর্থাৎ সংশয় নিবৃত্ত করিয়া প্রমাণকে নিজবিষয়ে প্রবৃত্ত করে।

বস্তুতঃ তর্ক স্বতন্ত্রভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উৎপাদক না হইলেও প্রকৃততর্কের অনন্তর সেই তর্কনুগৃহীত প্রমাণই তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং তর্করূপ জ্ঞান প্রমাণের অনুগ্রাহক হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সহায় হয়।

এইভাবে তর্ক পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিপাদন করা হইল যে, তর্কতত্ত্বজ্ঞানার্থ। তত্ত্বজ্ঞান নয় এবং প্রমাণের সহায়তা করে। যাহাতে প্রমাণ সন্দিগ্ধ বিষয়ে একতর ধর্মের অনুমোদন লাভ করিয়া একতর ধর্মের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। প্রাচীনমতে সংশয় ভাব কোটিক। একধর্মীতে দুইটি ভাব পদার্থের সংশয় উপস্থিত হইলে সেই স্থলে তর্ক একতর ভাব পদার্থের অনুজ্ঞা করে বা নির্দেশ করে, এইভাবে প্রমাণ তর্কানুগৃহীত হইয়া পদার্থ প্রতিপাদন করে। সুতরাং তর্কের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য।

দ্বাদশপাঠ

''উপমান প্রমাণ''

ন্যায়দর্শনে মোট চারটি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। ''প্রত্যক্ষানুমান্যেপমাণশব্দাঃ প্রমাণানি'' প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ।

সুতরাং উপমান হইল তৃতীয় প্রমাণ। ভাষ্যকার বলিয়াছেন ''অথোপমানম্'' অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ নিরূপণের অনন্তর মহর্ষি উপমান প্রমাণের নিরূপণ করিয়াছেন। সূত্র ''প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্'' অর্থাৎ কোন সাধ্যপদার্থের যথার্থ নিশ্চয়ের করণ হইল উপমান প্রমাণ। ন্যায়মতে প্রমাজ্ঞান চারপ্রকার, সুতরাং প্রমাজ্ঞানের স্মরণ প্রমাণও চারপ্রকার। অন্যতম হইল 'উপমান'। উপমান শব্দটি প্রমাণ ও প্রমিতি উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যখন উপমীয়তে অনেন ইতি উপমানম্ এইরূপ ব্যুৎপুত্তি অনুসারে করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন উপমানশব্দ। তখন তাহার অর্থ উপমিতি করণ। আর ''উপমীয়তে ইতি উপমানম্'' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে ভাব বাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় নিষ্পন্ন উপমান শব্দের অর্থ উপমিতিরূপ প্রমাজ্ঞান। প্রাচীনমতে করণ হইল ''ফলাযোগব্যববিচ্ছন্নাসাধারণং করণং করণম্''। অর্থাৎ ফল বা কার্য্যের সহিত যে কারণের অযোগ থাকেনা বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে, সেই কারণ বিশেষই প্রাচীনমতে করণ। বস্তুতঃ যে কারণের অব্যহিত পরক্ষণে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণই করণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয় ও সন্নিকর্ষ উভয় থাকিলেও সন্নিকর্ষের অব্যবহিত পরক্ষণে প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় বলিয়া সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ প্রমাণপদবাচ্য। আর ইন্দ্রিয় গৌণ করণ। যেহেতু ইন্দ্রিয় না থাকিলে সন্নিকর্ষ ও প্রত্যক্ষ কিছুই হইতে পারে না। উপমিতি স্থলে অতিদেশ বাকার্থ্য স্মরণ এবং সাদৃশ্যজ্ঞান উভয় থাকিলেও সাদৃশ্যজ্ঞানের অনন্তর উপমিতি উৎপন্ন হয়, এই কারণে সাদৃশ্যজ্ঞান উপমিতিরূপ প্রমাজ্ঞানের করণ। অর্থাৎ নব্যমতো যাহা প্রমাজ্ঞানের ব্যাপার, প্রাচীন মতে ঐ ব্যাপারই করণরূপে গৃহীত হয়।

মহর্ষি উদ্দেশক্রমানুসারে ''প্রসিদ্ধ সাধ্যর্ম্যাৎ সাধ্যসাধন মুপমানম্'' এই সূত্রের দ্বারা উপমান প্রমাণের লক্ষণ বলিয়াছেন। ''প্রসিদ্ধসাধর্ম্য মুপমানম্'' এই ভাবে উপমান প্রমাণের লক্ষণ করা হইলে যাহার প্রকৃত উপমান প্রমাণ নয়, উপমানাভাস বা অলক্ষ্য, তাহাও উপমান লক্ষণাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই কারণে লক্ষণে সাধ্যসাধনম্ এই অংশ প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার ''সাধ্যসাধনমুপমানম্'' এইরূপ লক্ষণ হইলে প্রত্যক্ষাদির সাধন ও সুখাদির সাধন ও উপমান হইয়া পড়ে। এই কারণে ''প্রসিদ্ধ সার্ধম্যাৎ'' এই অংশ উক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য পদে বহুব্রীহিসমাস স্বীকার করিয়াছেন। আবার কোন সম্প্রদায় কর্মধারায় ও তৃতীয়া তৎ পুরুষ। কিন্তু ভাষ্যকার ঐ পদে তৃতীয়া তৎপুরুষসমাস স্বীকার করিয়াছেন। তাই তিনি প্রজ্ঞাতেন সামান্যাৎ এইরূপ সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূত্রস্থ প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য পদের অর্থ হইল, যে পদার্থ পূর্বে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত, তাহার সহিত সামান্য অর্থাৎ সমানত্ববা সাদৃশ্য প্রসিদ্ধ সাধর্ম্য। পরন্তু অপ্রসিদ্ধ সাধর্ম্য কোন সাধ্যসিদ্ধির প্রয়োজক হয় না। সুতরাং সাধর্ম্যও প্রসিদ্ধ বা প্রজ্ঞাত হওয়া কাম্য। ইহাও ঐ পদের দ্বারা বুঝা যায়।

অতএব প্রসিদ্ধ সার্ধম্য প্রযুক্ত অর্থাৎ অদৃষ্টপূর্ব কোন পদার্থে সেই সাদৃশ্যের দর্শন হইলে তাহাতে যাহা অজ্ঞাত সাধ্যবিশেষের সাধন অর্থাৎ সেই সাধ্য সিদ্ধির করণ, তাহাই উপমান প্রমাণ। ভাষ্যকার সূত্রব্যাখ্যায়

বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপনীয়সম্ প্রজ্ঞাপনম। ''গৌরেবংগবয়ঃ'' অর্থাৎ গবয় নামক পশু গোসদৃশ। যে গবয়নামে একপ্রকার পশু আছে, উহাকে দেশ বিশেষ নীল গাই বলা হয়। উহার গলদেশে গলকম্বল নাই, সুতরাং ঐ প্রাণী গো নয়, কিন্তু গোসদৃশ্য। যে ব্যক্তি কোন দিন গবয়পশু দর্শন করেন নাই, তিনি গবয় শব্দের অর্থ জানেন না, কিন্তু গো তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহাকে দৃষ্ট গবয় কোন বনবাসী বলিলেন, যেমন গো এইরূপ গবয়, অর্থাৎ গবয় পশু গোসদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি কোন সময় কোন স্থানে গবয় পশু দেখিয়া এবং তাহাতে গোর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া পরক্ষণে তাঁহার সেই পূর্ব শ্রুত বনেচর বাক্যের অর্থস্মরণ করে। পরক্ষণে দৃশ্যমান গবয়ত্বজাতিবিশিষ্ট পশু গবয়শব্দের বাচ্য এইরূপ যথার্থ বোধ উৎপন্ন হয়। উহাই উপমিতি এবং উপমিতির করণ উপমান প্রমাণ।

ভাষ্যকার একটি পূর্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইল গোসদৃশ গবয় এই স্থলে উপমান প্রমাণ কি প্রয়োজন সাধন করে। অর্থাৎ উক্তস্থলে উপমান প্রমাণের কোন প্রয়োজনই পরিলক্ষিত হয় না। উহা নিরর্থক। কারণ যেসময় পূর্ববাক্যশ্রোতা গবয় পশুতে গোর সহিত সমান ধর্ম বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সেই সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই সেই পদার্থকে বা সেই সাদৃশ্যবিশিষ্ট গবয়পশুকে জানিয়া থাকে। সুতরাং উপমান প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, '' সমাখ্যা সম্বন্ধ প্রতিপত্তিরূপমানার্থ ঃ অর্থাৎ সমাখ্যার বা সংজ্ঞাশব্দের সম্বন্ধ প্রতিপত্তি অর্থাৎ অর্থ বিশেষ বাচ্যত্ব সম্বন্ধের যথার্থ জ্ঞান উপমান প্রমাণের অর্থ বা প্রয়োজন। ইহা মহর্ষি গৌতমের বক্তব্য, যেমন যথা গৌঃ এবং গবয়ঃ এইরূপ উপমান বাক্য প্রযুক্ত হইলে গোর সহিত সমানধর্ম বিশিষ্ট গবয় পশুকে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ করতঃ অর্থাৎ পরে সেই সাদৃশ্য বিশিষ্ট গবয় পশুর প্রত্যক্ষ হওয়ায় তজ্জন্য গবয় শব্দ ইহার সংজ্ঞা অর্থাৎ বাচক শব্দ, এই রূপে সংজ্ঞা সংজ্ঞিসম্বন্ধ জ্ঞান হয়। সুতরাং মহর্ষি গৌতমের মতে সংজ্ঞাসংজ্ঞি সম্বন্ধ নির্ণয়ই উপমান প্রমাণের ফল।

ভাষ্যকার সর্বশেষে উপমান প্রমাণের আরও উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, ''যথা মুদ্গস্তথা মুদ্গপর্ণী'' এবং ''যথা মাষস্তথা মাষগর্ণী'' এইরূপ উপমান বাক্যের প্রয়োগ করিলে এই উপমান দ্বারা ওষধিবিশেষে মূদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী শব্দের বাচ্যত্ব সম্বন্ধ নির্ণয় হওয়ায় সেই ওষধিবিশেষকে ঔষধের জন্য আহরণ করে। বক্তব্য হইল, কোন ঔষধের মূদ্গপর্ণী আবশ্যক হইলে উহা যাহার অজ্ঞাত, কিন্তু তাঁহার মুদ্গ ও মাষ পরিজ্ঞাত, তিনি কোন অভিজ্ঞ কোন উপদেষ্টার নিকটে প্রশ্ন করিলে তিনি বললেন, যথা মূদ্গস্তথা মুদগপর্ণী এবং যথা মাষস্তথা মাষপর্ণী , অর্থাৎ মুদ্গপর্ণী ওষধি মূদগের সদৃশ এবং মাষপর্ণী ওষধিবিশেষ মাষের সদৃশ। পরে সেই ব্যক্তি স্থান বিশেষ মূদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী দেখিয়া তাহাতে যথাক্রমে মূদ্গ ও মাষের সাদৃশ্য দর্শন করিলে তাহার সেই পূর্বশ্রুত বাক্যার্থের স্মরণ হওয়ায় পরে তজ্জাতীয় ওষধিবিশেষ যথাক্রমে মূদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণীশব্দের বাচ্য এইরূপ উপলব্ধি হয়। তাহাও উপমান প্রমাণের ফল উপমিতি।

উপমান যেমন সার্ধম্য প্রযুক্ত হয়,সেই রূপ বৈধর্ম্যপ্রযুক্ত হয় ইহা লোক মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। যেমন,

''অতিদীর্ঘ গ্রীবশ্চপলতরোষ্ঠঃ কঠোর কন্টকাশী ক্রমেলকপদবাদ্যঃ'' অর্থাৎ ক্রমেলক শব্দের অর্থ উদ্ভাবনের জন্য এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতিদীর্ঘ গ্রীবত্ব, চপলত্ররোষ্ঠধ এবং কঠোর কন্টকাশিত্ব ধর্মগুলি একমাত্র উটেরই আছে। অন্য কোন প্রাণীর নাই সুতরাং ঐ ধর্মগুলি অন্য সকল

প্রাণীর বৈধর্ম্য এই বৈধর্ম্যপুরস্কারে ক্রমেলক শব্দের অর্থ উট এইরূপ অর্থ উপমান প্রমাণের দ্বারা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ ক্রমেলক শব্দের বাচ্য উট এবং ক্রমেলকশব্দ তাহার বাচক। এইভাবে ক্রমেলকশব্দ এবং উট উভয়ের মধ্যে বাচ্য বাচক ভাবরূপ সম্বন্ধ জ্ঞান উপমান প্রমাণের ফল এবং উপমিতি।

''শব্দ প্রমাণ''

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''অথশব্দেঃ'' অর্থাৎ উপমান প্রমাণ নিরূপনের অনন্তর শব্দপ্রমাণের নিরূপন করা হইয়াছে।

মহর্ষিকৃত সূত্র ''আপ্তোপদেশ: শব্দ, সূত্রার্থ আপ্তের অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থজ্ঞান সম্পন্ন অপ্রতারক উপদেষ্টার উপদেশ বাক্য হইল শব্দ প্রমাণ। সূত্রস্থ ''আপ্তোপদেশঃ' এই পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস বিবক্ষিত। আপ্তস্য উপদেশঃ আপ্তোপদেশঃ অর্থাৎ আপ্তব্যক্তির উপদেশ বাক্যই শব্দ প্রমাণ। আপ্তের লক্ষণ নিরূপণ উদ্দেশ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ''আপ্তঃ খলু সাক্ষাৎ কৃত ধর্মা যথাদৃষ্ট স্যার্থস্য চিখ্যা পরিষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা''। আর আপ্তি হইল '' সাক্ষ্যাৎকরণর্থেস্য আপ্তি ঃ'' ''তয়া প্রবর্ত্ততে'' ইত্যাপ্ত সাক্ষাৎকৃত ধর্মা অর্থাৎ যিনি ধর্ম বা উহার বক্তব্য পদার্থকে সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন তিনি, যথাদৃষ্ট পদার্থের খ্যাপনেচ্ছা বশতঃ প্রযুক্ত বা বাক্যপ্রয়োগ কৃতয়ত্ন, উপদেষ্টা অর্থাৎ উপদেশ প্রদানে দক্ষ ব্যক্তিই আপ্ত। আপ্তশব্দের ব্যুৎপত্তি হইল, অর্থের বা পদার্থের সাক্ষাৎকার বা সুদৃঢ় প্রমাণের দ্বারা অবধারণ হইল আপ্তি, সেই আপ্তি বশতঃ বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হন, এই কারণে আপ্ত।

ঋষিগণ, আর্য্যগণ এবং ম্লেচ্ছগণের সম্বন্ধে আপ্তলক্ষণ সমান। সুতরাং ঋষি, আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের ব্যবহার প্রবৃত্ত হইতেছে।

এইরূপ এই সমস্ত প্রত্যক্ষাদিচতুর্বিধপ্রমাণের দ্বারা দেবতা, মনুষ্য পশু প্রভৃতির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। অন্যথা অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণব্যতীত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে না।

শব্দ প্রমাণের প্রকার ভেদ।

শব্দ প্রমাণ দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক ভেদে দ্বিবিধ। ভাষ্যকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ''যস্যেহ দৃশ্য তেদৃর্থঃ সদৃষ্টাঠো যস্যামুত্র প্রতীয়তে সোদদৃষ্টার্থঃ''। এবং ঋষি-লৌকিক বাক্যানাং বিভাগ ইতি''। অর্থাৎ ইহলোকে যাহার অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিপন্ন হয়, তাহা দৃষ্টার্থক শব্দপ্রমাণ। আর যাহার অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় পরলোকে প্রতীত হয় ইহলোকে প্রতীত হয় না তাহা অদৃষ্টার্থক শব্দ প্রমাণ। এইভাবে ঋষিবাক্য এবং লৌকিক বাক্যসমূহের বিভাগ করা হইয়াছে।

বাক্য প্রতিপাদ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা অবধারণ হওয়ায় দৃষ্টার্থক আপ্ত বাক্যই একমাত্র শব্দপ্রমাণ এইরূপ অভিনিবেশ নিবারণের জন্যই এই সূত্রের দ্বারা শব্দ প্রমাণের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন দৃষ্টার্থক আপ্তবাক্য শব্দ প্রমাণ, সেইরূপ অদৃষ্টার্থ আপ্ত বাক্য ও শব্দ প্রমাণ ইহা প্রতিপাদনের জন্য এই সূত্রের অবতারণা। যে হেতু অদৃষ্টার্থক আপ্তবাক্যের অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদ্য পদার্থের নিশ্চয় হইয়া থাকে।

সুতরাং কেবল দৃষ্টার্থক আপ্তবাক্যই শব্দ প্রমাণ তাহানহে। পরন্তু অদৃষ্টার্থক আপ্তবাক্যও শব্দ প্রমাণ ইহা সূচিত। কারণ দৃষ্টার্থক প্রমাণের আপ্তবাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রমানের দ্বারা যেমন জ্ঞান হয়, সেইরূপ অদৃষ্টার্থকআপ্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। তাই বলা যায় বেদাদিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য স্বর্গাদি অলৌকিক পদার্থ ইহলোকে আমাদের দৃষ্ট না হইলেও উহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ।

লক্ষণীয় এই যে, ভাষ্যকার মহর্ষি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্ত ও অদৃষ্টার্থ, এই দ্বিবিধ আপ্তবাক্যকে ঋষিবাক্য ও লৌকিক বাক্যের প্রকারভেদ বলিয়াছেন। ঋষিবাক্যভিন্ন সমস্ত বাক্যই ভাষ্যকারের মতে লৌকিক বাক্য। কিন্তু ঋষিগণও দৃষ্টার্থক বহুবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। যে বাক্যের অর্থ বা প্রতিপাদ্য পদার্থ ইহলোকে দৃষ্ট হয় না, পরন্তু অনুমানাদিকোন প্রমাণসিদ্ধ। তাহা অদৃষ্টার্থক বাক্য এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহাতে ইহলোকে অনুমানাদিপ্রমাণের দ্বারা জ্ঞাত পদার্থের প্রতিপাদক যে সমস্ত লৌকিক বাক্য, তাহাও ঐ অর্থে অদৃষ্টার্থক বাক্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

কিন্তু ভাষ্যকারের মতে স্বর্গাদিপদার্থের প্রতিপাদক বেদাদিবাক্যই অদৃষ্টার্থক আপ্তবাক্য।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ

(ন্যায়-বৈশেষিক)

দ্বিতীয় অর্ধ

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

একক-১

বিষয়-সূচী

১.০০.০০ প্রেক্ষাপট

১.০১.০০ গ্রন্থ পরিচয়

১.০২.০০ গ্রন্থকার পরিচিতি

১.০৩.০০ গ্রন্থের উদ্দেশ্য

১.০৪.০০ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

১.০৫.০০ পাঠ্য অংশ

১.০৬.০০ আলোচ্য বিষয়

১.০৭.০০ ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

১.০৭.০১ ন্যায় মতে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া

১.০৭.০২ ন্যায় মতে জ্ঞানের বিভাগ

১.০৭.০৩ প্রত্যক্ষ প্রমাণ

১.০৭.০৪ অনুমান প্রমাণ

১.০৭.০৫ উপমান প্রমাণ

১.০৭.০৬ শব্দ প্রমাণ

১.০৮.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

১.০৯.০০ সারাংশ

১.১০.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১.১১.০০ গ্রন্থপঞ্জী

১.০০.০০ ■ প্রেক্ষাপট

বর্তমান নিবন্ধটি আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ ও তৎটীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ভিত্তিক রচনা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এম. এ. পাঠক্রমে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটি ন্যায়-বৈশেষিক ঐচ্ছিক পত্রের অন্তর্গত অন্যতম গ্রন্থ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এম. এ. পাঠক্রম অনুসারে যে কোন ঐচ্ছিক পত্রের জন্য দুটি পত্র নির্দিষ্ট আছে। প্রতিটি ঐচ্ছিক পত্রের পূর্ণমান ১০০ নম্বর। প্রতিটি পত্রের আবার দুটি করে অর্ধ আছে। প্রতিটি অর্ধের মান ৫০ নম্বর। আলোচ্য নিবন্ধটি একটি অর্ধমাত্র। পুরনো পাঠক্রম অনুযায়ী অর্থাৎ এম. এ. পার্ট-১ এবং পার্ট-২ রীতি অনুযায়ী এই গ্রন্থটি এম. এ. পার্ট-১ স্তরের

জন্য নির্দিষ্ট আছে। এম. এ. পার্ট-১এর চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয় অর্ধরূপে এই গ্রন্থটির পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। বর্তমান নিবন্ধটি দর্শনে এম. এ. পাঠরত/ পাঠরতা ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায়-বৈশেষিক ঐচ্ছিক পত্রের পাঠ-উপকরণ হিসেবে রচিত।

১.০১.০০ ■ গ্রন্থপরিচয়

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটির পরিচয় পূর্ণাঙ্গরূপে জানতে হলে প্রথমে গ্রন্থটির পটভূমি জানা প্রয়োজন। এই গ্রন্থটি ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দর্শন চিন্তাধারার মিশ্রিত পটভূমিতে রচিত। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গৌতমের ন্যায়সূত্র ও কণাদের বৈশেষিক সূত্র প্রথম স্তরে দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। কিন্তু সেই স্তরেও ন্যায়সূত্রে বৈশেষিকসম্মত সপ্তপদার্থের উল্লেখ দেখা যায়। আবার, বৈশেষিক সূত্রে যে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের আলোচনা পাওয়া যায় তা ন্যায়সূত্রের আলোচনার ভাষান্তর বলেই বোধিত হয়। ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনীর যুগে এই সাদৃশ্য আরো প্রকট হয়েছে।

দশম শতাব্দীতে আচার্য উদয়ন ন্যায় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটান। এই ধারা ন্যায়দর্শনের ইতিহাসে 'নব্যন্যায়' নামে পরিচিত। এই নতুন ধারাকে একটি পূর্ণ প্রস্থানের রূপ দিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর ক্ষুরধার নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়। এর ফলে প্রথম অবস্থায় ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুটি সম্প্রদায় যে সমান্তরাল রেখায় চলছিল তা ব্যাহত হল। প্রচলিত ধারা বিবর্তিত হয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংমিশ্রণের ধারা প্রবাহিত হল। এই প্রবাহে প্রথম স্তরের ন্যায় ও বৈশেষিক এই দুই দর্শন চারটি ভিন্ন ধারায় চর্চিত হতে শুরু করে। এই চারটি ধারাকে প্রাচীন ন্যায়, নব্যন্যায়, প্রাচীন বৈশেষিক ও ন্যায়-বৈশেষিক— এইভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

দশম শতাব্দীতে উদয়নাচার্যের কিরণাবলী ও লক্ষণাবলীতে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের যে সংমিশ্রণ শুরু হয়েছিল তার অনিবার্য পরিণতি ঘটে সপ্তদশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রন্থে। ভাষাপরিচ্ছেদের শুরু হয় বৈশেষিক দর্শনের পদার্থতত্ত্ব দিয়ে। প্রথম পদার্থ দ্রব্য। দ্রব্য নয়টি। আত্মা হল অষ্টম দ্রব্য। নয়টি দ্রব্যের মধ্যে অষ্টমদ্রব্য আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মার অন্যতম গুণরূপে তিনি জ্ঞানের আলোচনায় প্রবেশ করেন। এখান থেকে গ্রন্থকার বৈশেষিক ধারা ত্যাগ করে ন্যায়ের ধারা অনুসরণ করেন। ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্ব আলোচনান্তে তিনি আবার ফিরে যান বৈশেষিকসম্মত নবম দ্রব্য মনের আলোচনায়। সুতরাং একই গ্রন্থে তিনি বৈশেষিকসম্মত সপ্তপদার্থ ও ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটান। কিরণাবলী ও ভাষাপরিচ্ছেদ এই দুই গ্রন্থের মাঝখানে শিবাদিত্যের সপ্তপদার্থী, ভাসর্বজ্ঞের ন্যায়সার, বরদরাজের তার্কিকরক্ষা, বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতী, কেশব মিশ্রের তর্কভাষা, জগদীশ তর্কালংকারের তর্কামৃত, অন্নংভট্টের তর্কসংগ্রহ, এবং লৌগাক্ষি ভাস্করের তর্ককৌমুদী গ্রন্থে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সংমিশ্রণের নানারূপ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে সপ্তপদার্থীতে গ্রন্থকার ভাষাপরিচ্ছেদের ন্যায়, বৈশেষিক সম্মত পদার্থতত্ত্ব দিয়ে গ্রন্থ শুরু করলেও দ্রব্য পদার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধির আলোচনা করেননি। দ্রব্যপদার্থ আলোচনান্তে গুণপদার্থের আলোচনায় চতুর্বিংশত গুণের অন্যতম গুণরূপে বুদ্ধি বা জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

বল্লভাচার্যের ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। অপরদিকে বরদরাজের তার্কিকরক্ষা এবং কেশব মিশ্রের তর্কভাষা শুরু হয়েছে ন্যায়সম্মত পদার্থতত্ত্ব দিয়ে। প্রমাণপদার্থের আলোচনান্তে প্রমেয়পদার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বৈশেষিকসম্মত পদার্থতত্ত্বের। যাই হোক, এই সমস্ত তথ্য যে ইঙ্গিত বহন করে তা হল ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মধ্যে পরবর্তী স্তরে যে ধারা প্রচলিত হয়েছে তা এককথায় সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারা। এই সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারায় একই সঙ্গে গুরুত্ব পেয়েছে নব্যন্যায়, প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্তসমূহ। ভাষাপরিচ্ছেদের বিভিন্ন স্থলে গ্রন্থকার প্রাচীন ন্যায়মতের সঙ্গে নব্য ন্যায়মতকেও উপস্থাপন করেছেন।

১.০২.০০ ■ গ্রন্থকার পরিচিতি

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ছিলেন নবদ্বীপ নিবাসী নব্যন্যায়ধারার একজন স্বনামধন্য নৈয়ায়িক। নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম সর্বজন পরিচিত। রত্নাকর বাচস্পতি ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি বাচস্পতি নামেও পরিচিত। বিদ্যাবাচস্পতির কনিষ্ঠ পুত্র হলেন কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। তাঁকে বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যও বলা হয়। এই বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্য হলেন বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননের পিতা এবং রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি হলেন তাঁর অগ্রজ। এই তথ্য বিশ্বনাথ পিঙ্গলাপ্রকাশিকাতে নিজেই ব্যক্ত করেছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে, পিঙ্গলাপ্রকাশিকা প্রকাশিত হয় ১৬৪৬ খ্রীস্টাব্দে। এথেকে অনুমান করা যায় যে বিশ্বনাথ সপ্তদশ শতাব্দীর মানুষ ছিলেন। তিনি 'ন্যায়সূত্রবৃত্তি' (১৬৩৪), 'ন্যায়লোক', সূক্তিমুক্তাবলী, পদার্থতত্ত্বালোক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ভাষাপরিচ্ছেদ ও তৎটীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্ব ও ন্যায়-প্রমাণতত্ত্বের উপর রচিত নির্ভরযোগ্য ও সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত।

'বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চ্চা' গ্রন্থে শ্রী দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী পঞ্চবিধ যুক্তির সাহায্যে কৃষ্ণদাস সার্বভৌমকে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদের রচয়িতা বলে দাবী করেছেন। তাঁর মতে ভুলক্রমেই এতদিন ধরে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকে এই গ্রন্থের রচয়িতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণদাস বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পূর্ববর্তী। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে এই গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন বলে অনুমান করা যায়।

পঞ্চানন তর্কবাগীশ অবশ্য তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত পঞ্চবিধ যুক্তি খণ্ডন করে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকেই সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের রচয়িতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এই বিতর্কিত প্রশ্নে প্রবেশ না করে পাঠক্রমকে অনুসরণ করে বর্তমান নিবন্ধে আমরা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকেই মুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদের রচয়িতা হিসাবে উল্লেখ করব।

১.০৩.০০ ■ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ভাষাপরিচ্ছেদ তথা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে বলেছেন :

''নিজ নির্মিত কারিকাবলীমতিসংক্ষিপ্তচিরন্তোক্তিভিঃ।

বিশদীকরবানি কৌতুকান্ননু রাজীবদয়াবশংবদঃ।।''

অথাৎ শিষ্য (মতান্তরে পৌত্র) রাজীবের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পূর্ববর্তী বৈশেষিকাচার্যগণের সারাংশীভূত ও সংক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ সংগ্রহ করে তা সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থাপন করার অভিপ্রায়ে ভাষাপরিচ্ছেদ নামক কারিকাসমূহ এবং কারিকাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা তিনি রচনা করেছেন। ভাষাপরিচ্ছেদ মোট ১৬৮ টি কারিকার সংকলন। মুক্তাবলী এই ১৬৮টি করিকার বিশদ ব্যাখ্যা। ন্যায়বৈশেষিক সিদ্ধান্তসমূহকে সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত করাই এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের সরলতা, বিষয়-বিন্যাস, রচনা-কৌশল ও প্রকাশভঙ্গী এত আকর্ষণীয় যে পণ্ডিত মহলে এই গ্রন্থ অতিরিক্ত সমীহ ও সমাদর আদায় করেছে। গ্রন্থকার নিজেই তাঁর রচিত এই উত্তম যুক্তিপূর্ণ টীকাকে শ্রীবিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভিত মুক্তাহারের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং পাঠার্থীগণের চিত্তে চিরকাল জ্ঞান বিতরণের দ্বারা সন্তোষ বিধান করবে বলে আশা করেছেন।

১.০৪.০০ ■ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন :

''সদ্রব্যা গুণগুম্ফিতা সুকৃতিনাং সৎকর্মানাং জ্ঞাপিকা

সৎ সামান্য-বিশেষ-নিত্যমিলিতা অভাব প্রকর্ষোজ্জ্বলা।''

অর্থাৎ ভাষাপরিচ্ছেদ তথা মুক্তাবলী গ্রন্থে পৃথিব্যাদি নব দ্রব্য প্রতিপাদত হয়েছে, রূপ, রসাদি চতুর্বিংশতি গুণ সবিশেষ ব্যাখ্যাত হয়েছে, উৎক্ষেপণাদি পঞ্চকর্ম জ্ঞাপিত হয়েছে, সামান্য বিশেষ ও নিত্যমিলিতারূপ সমবায় সম্বন্ধ বিবৃত হয়েছে এবং ভাবপদার্থ সমূহের ন্যায় অভাব পদার্থও প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। মোট কথা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননকৃত ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী গ্রন্থে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ ও ন্যায় সম্প্রদায়ের অবিরুদ্ধ সপ্তপদার্থ উত্তম যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যাত ও বিবৃত হয়েছে। বলাই বাহুল্য যে, উক্ত সপ্ত পদার্থ ছাড়াও ন্যায় সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণও এই গ্রন্থে অতি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বর্তমান পাঠক্রমে মুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদের প্রমাণ অংশই (বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ) পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। আমরা তাই এখন অতি সংক্ষেপে ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনান্তে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ভাষাপরিচ্ছেদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করব।

১.০৫.০০ ■ পাঠ্য অংশ

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটিকে দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা; প্রমেয়খণ্ড ও প্রমাণখণ্ড। প্রমেয়খণ্ডে গ্রন্থকার বৈশেষিক সম্মত সপ্তপদার্থের আলোচনা করেছেন। এই অংশ পাঠ্যাংশের অন্তর্গত নয়। প্রমাণখণ্ডে গ্রন্থকার ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণের আলোচনা করেছেন। ৫১ কারিকা থেকে এই আলোচনার সূত্রপাত। ৫১ কারিকা থেকে ৬৫ কারিকা পর্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষপ্রমাণের আলোচনা করেছেন। এই খণ্ডটি

প্রত্যক্ষখণ্ড নামে পরিচিত। সম্পূর্ণ অংশটিই পাঠ্যাংশের অন্তর্গত। এ ছাড়াও অন্যথাখ্যাতি ও প্রমার লক্ষণ পাঠ্যাংশে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। ১৩৪ কারিকা থেকে ১৩৬ কারিকায় গ্রন্থকার এসব বিষয়ের আলোচনা করেছেন। এই অংশ পাঠ্যাংশের অন্তর্গত। বর্তমান নিবন্ধে ক্রমান্বয়ে এই বিষয়গুলি আলোচনা করা হবে।

১.০৬.০০ ■ আলোচ্য বিষয়

পাঠ্যাংশের অন্তর্গত বিষয়গুলিই এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বুদ্ধির বিভাগ, প্রত্যক্ষের লক্ষণ, অনুমিতির লক্ষণ, প্রত্যক্ষের বিভাগ, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ, জ্ঞানসামান্যের কারণ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, লৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ, অলৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ, অনুপলব্ধি, প্রমার লক্ষণ, অন্যথাখ্যাতি প্রভৃতি বিষয় এই নিবন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে।

১.০৭.০০ ■ ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ন্যায়মতে জ্ঞান গুণপদার্থ। এই গুণ হল আত্মার গুণ। জ্ঞান ও বুদ্ধি এই দর্শনে সমার্থক। জ্ঞানের কাজ বস্তুকে প্রকাশ করা। প্রদীপ যেমন স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল বস্তুকে প্রকাশ করে, জ্ঞানও তেমনি স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল পদার্থকে প্রকাশ করে। পদার্থরূপে জগতের সকল বস্তুই জ্ঞাননিরপেক্ষ। জ্ঞাতা যখন পদার্থকে জানে তখন সেই পদার্থ জ্ঞাতার জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং জ্ঞনের বিষয় ও পদার্থ একই জিনিস হলেও কেবলমাত্র জ্ঞানের প্রসঙ্গেই পদার্থ বিষয়রূপে, মন ও ইন্দ্রিয়াদি করণ রূপে পরিচিত হয়। পদার্থের উপস্থিতিতে পদার্থের জ্ঞানকে বলে অনুভব। অন্যান্য প্রকার জ্ঞানের ন্যায় অনুভব-ও উৎপত্তির পর আত্মার গুণরূপে আত্মায় আশ্রিত থাকে। অনুভবের ধ্বংসের পর বিষয়ের সংস্কার আত্মার আশ্রিত হয়। পরবর্তীকালে বস্তুর অ-সাক্ষাতে এই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে এক প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপে জ্ঞানকে বলা হয় স্মৃতি। এইজন্য স্মৃতিকে কেবলমাত্র সংস্কার থেকে উৎপন্ন জ্ঞান বলা হয়। ন্যায়মতে সমস্ত প্রকার জ্ঞান (তা আনুভবই হোক্ আর স্মৃতিই হোক্) যেমন সত্য হতে পারে, তেমনি আবার মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যাজ্ঞানকে বলা হয় ভ্রমজ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত 'knowledge' শব্দটি কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান বা সঠিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। পদার্থের অনুভব যখন যথার্থ হয় কেবলমাত্র তখনই তাকে প্রমা বলা হয়। তাই যথার্থ স্মৃতিও ন্যায়মতে প্রমা নয়। অনুভবই কেবল প্রমা হতে পারে। সংশয়, ভ্রম, তর্ক প্রভৃতি ন্যায়মতে অপ্রমা। যথার্থ অনুভবকে বলা হয় প্রমা এবং প্রমার উৎস বা করণকে বলা হয় প্রমাণ।

১.০৭.০১ ■ ন্যায় মতে জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া

প্রত্যক্ষ : জ্ঞাতা (আত্মা)-মন-ইন্দ্রিয়-বিষয়-(পদার্থ)-(ফল) প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

অনুমান : জ্ঞাতা (আত্মা)-মন-ইন্দ্রিয়-ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিষয়-(ফল) অনুমিতি।

উপমান : জ্ঞাতা (আত্মা)-মন-ইন্দ্রিয়-সাদৃশ্যজ্ঞান-বিষয়-(ফল) উপমিতি।

শব্দ : জ্ঞাতা (আত্মা)-মন-ইন্দ্রিয়- পদজ্ঞান-বিষয়-(ফল) শাব্দ।

ন্যায়সম্মত জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জন্যজ্ঞানের জ্ঞাতা সর্বদা জীবাত্মাই হয়। আবার মন দ্রব্যরূপে সর্বজ্ঞানেরই কারণ হয়। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ ছাড়া কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। প্রমাণের বিভাগ করণ-নির্ভর, করণের ভেদেই প্রমাণের ভেদ। ন্যায়মতে একই বিষয়কে একাধিক প্রমাণের দ্বারা জানা যেতে পারে। এই মতবাদ প্রমাণসংপ্লববাদ নামে পরিচিত। অপরদিকে যে মতবাদ ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয় স্বীকার করে তা প্রমাণব্যবস্থা নামে পরিচিত। ন্যায়সম্প্রদায় প্রমাণসংপ্লববাদী কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রমাণ ব্যবস্থাবাদী।

১.০৭.০২ ■ ন্যায়মতে জ্ঞানের বিভাগ

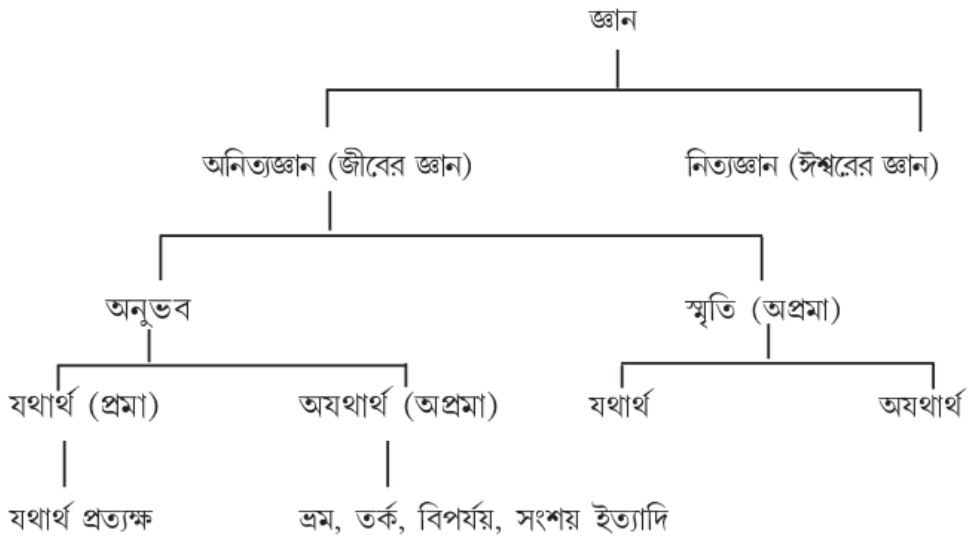

যথার্থ অনুমিতি এবং অযথার্থ প্রত্যক্ষ
যথার্থ উপমিতি অযথার্থ অনুমিতি, অযথার্থ উপমিতি ও
যথার্থ শাব্দবোধ অযথার্থ শাব্দবোধ

১.০৭.০৩ ■ প্রত্যক্ষ প্রমাণ

প্রত্যক্ষ প্রমার করণের নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ হল ইন্দ্রিয়। আমাদের সামনে যদি একটি ঘট স্থাপন করা হয় তাহলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ঘটটির ও তার রূপের জ্ঞান পেতে পারি। যে ইন্দ্রিয় যে বিষয়ের জ্ঞান দেয় সে ইন্দ্রিয় হ'ল সেই বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়। গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ হলে ইন্দ্রিয় বিষয়টিকে গ্রহণ করে। বিষয়ের এরূপ গ্রহণ বা জ্ঞান সরাসরি বা সাক্ষাৎভাবে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে উৎপন্ন হয় বলেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে বলা হয় সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রথম স্তরে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধের জ্ঞান আমাদের হয় না। বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের পরক্ষণে আমাদের নিছক বিশেষ্যের কিংবা নিছক বিশেষণের কিংবা বিশেষ্য ও বিশেষণের অভিন্নভাবে বা বিশেষণ-

বিশেষ্য সম্বন্ধ শূন্যভাবে (সম্বন্ধ অনবগাহি) জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এরূপ জ্ঞানকে বলে নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ। এরপর বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধযুক্তভাবে বা সংবদ্ধভাবে যে জ্ঞান হয় (সম্বন্ধ অবগাহি) তাকে বলে সবিকল্প প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন হয় এবং তা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না বলে প্রত্যক্ষকে জ্যেষ্ঠ বা পরাপ্রমাণ বলে। প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে স্থলে সম্ভব সে স্থলে বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানই প্রথম উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞান। সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞানের তুলনায় বলবত্তর। প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাই বলবত্তম প্রমাণ।

১.০৭.০৪ ■ অনুমান প্রমাণ

অনুমান কোন জ্ঞাত পদার্থ থেকে কোন অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞানের প্রমাণ। 'অনুমান' শব্দের অর্থ হল পশ্চাৎ জ্ঞান (আনু=পশ্চাৎ, মান=জ্ঞান)। অনুমানের পূর্বে কোন না কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় বলে অনুমানকে পশ্চাৎ জ্ঞান বলা হয়। বস্তুতঃ এই প্রকার জ্ঞানের নাম অনুমিতি এবং অনুমিতির করণ হল অনুমান। কিভাবে অনুমান হয় তা একটি প্রচলিত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।

একাধিকবার কোন না কোন স্থানে ধুম ও বহ্নিকে আমরা একসঙ্গে দেখে থাকি। নিজ বাড়ির উনুনে, অন্যদের বাড়ির উনুনে, আতসবাজির প্রদর্শনীতে, রাস্তা-চত্বরে, আমরা দেখি ধূম আছে এবং তার সঙ্গে বহ্নি আছে, এইভাবে 'ধূম থাকলে বহ্নি থাকে' —এরূপ একটি সার্বিক জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয়। এই সার্বিক জ্ঞানটি সরাসরি প্রত্যক্ষের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা প্রত্যক্ষ করেছে এমন কোন লোকের কাছ থেকে আমরা পেতে পারি। এই জ্ঞানকে বলা হয় ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমান প্রমাণ। এরপর পর্বতে যদি আমরা ধূম দেখি তাহলে পর্বতে যে বহ্নি আছে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। পর্বতে ধূম দর্শনকে বলা হয় পক্ষধর্মতাজ্ঞান। পর্বতে বহ্নি আছে এই জ্ঞানটির নাম অনুমিতি। সুতরাং দেখা যায় যে, পর্বতে বহ্নি আছে এই জ্ঞানটি হওয়ার জন্য প্রথমতঃ পর্বতে ধূম দর্শন করতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ধূম থাকলে বহ্নি থাকে এ জ্ঞানটি থাকতে হয়। শুধু তাই নয়, পর্বতে যে ধূম আমরা প্রত্যক্ষ করি সে ধূম বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূম তাও আমাদের জানতে হয়। এ জ্ঞানটিকে বলা হয় পরামর্শজ্ঞান। তাই দেখা যায় যে, একটি অনুমিতি উৎপন্ন হবার পূর্বে একাধিক জ্ঞান প্রয়োজন হয়। এই জ্ঞানগুলি হল : (১) পক্ষধর্মতা জ্ঞান (২) ব্যাপ্তিজ্ঞান ও (৩) পরামর্শ জ্ঞান। স্বাভাবিকভাবেই অনুমানের ক্ষেত্রে পদার্থের সাক্ষাৎ জ্ঞান হয় না। বিভিন্ন জ্ঞানের মাধ্যমে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে অনুমিতিকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়। অনুমিতির কারণ জ্ঞানগুলির মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানই প্রধান বা চরম। ব্যাপ্তিজ্ঞান 'পরামর্শ' নামক ব্যাপারের দ্বারা অনুমিতি উৎপন্ন করে। এই কারণে নব্যনৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলেছেন। উদয়নাচার্যের মতে আবার জ্ঞায়মান লিঙ্গ অনুমিতির করণ। তবে বিশ্বনাথ এ মত সমর্থন করেননি। তাঁর মতে ব্যাপ্তি জ্ঞান-ই অনুমিতির করণ এবং পরামর্শ জ্ঞান অনুমিতির ব্যাপার। প্রাচীন মতে পরামর্শ-ই অনুমিতির করণ। আনুমিতির বিভিন্ন স্তরগুলিকে নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে :

১। ব্যাপ্তিজ্ঞান : বিভিন্ন স্থানে ধূম ও বহ্নির সহবস্থান দর্শন।

২। পক্ষধর্মতা জ্ঞান : পর্বতে ধূম দর্শন।

৩। ব্যাপ্তিস্মরণ : 'যেখানে ধূম থাকে সেখানে বহ্নি থাকে' এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মরণ।

৪। পরামর্শজ্ঞান : যেরূপ ধূম থাকলে বহ্নি থাকে পর্বতে সেরূপ (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট) ধূম আছে—এরূপ জ্ঞান।

৫। অনুমিতি : অতএব পর্বতে বহ্নি আছে—এরূপ জ্ঞান।

১.০৭.০৫ ■ উপমান প্রমাণ

'উপ=সাদৃশ্য, মান=জ্ঞান' —এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে উপমান হল সাদৃশ্যজ্ঞান। 'করণ' অর্থে উপমান 'উপমিতি' নামক জ্ঞানের করণ। প্রসিদ্ধ পদার্থের সঙ্গে সাদৃশ্যের মাধ্যমে কোন সাধ্যপদার্থের যথার্থ নিশ্চয়ের উপায় হ'ল উপমান প্রমাণ। উপমিতি হ'ল একপ্রকারের সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান, এই সম্বন্ধজ্ঞান প্রসিদ্ধ পদার্থের সাদৃশ্যের দ্বারা উৎপন্ন হয় বলে সাদৃশ্যজ্ঞানকে উপমিতির করণ বলা হয়। সংজ্ঞা-সংজ্ঞীর সম্বন্ধজ্ঞান হ'ল নাম-নামীর সম্বন্ধজ্ঞান। কোন একটি পদার্থের সঙ্গে ঐ পদার্থের নামের যে সম্বন্ধজ্ঞান, তাকে বলে 'নাম-নামীর সম্বন্ধজ্ঞান'। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 'গবয়' পদবাচ্য পদার্থকে জানে না এমন কোন নগরবাসী যখন কোন অরণ্যবাসীর কাছ থেকে জানতে পারে যে, 'গবয়' হল অরণ্যে বসবাসকারী গোসদৃশ একপ্রকার প্রাণীর নাম, তখন বা তারপর ঐ ব্যক্তি যদি কখনো বনে যায় এবং গোসদৃশ কোন অ-পূর্বদৃষ্ট প্রাণীকে দেখতে পায়, তাহলে অরণ্যবাসীর কথা তার স্মরণ হয় এবং সে বুঝতে পরে যে, এই জাতীয় প্রাণীই 'গবয়' পদবাচ্য। এই প্রকার সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর বা নাম ও নামীর সম্বন্ধজ্ঞানই উপমিতি।

১.০৭.০৬ ■ শব্দ প্রমাণ

শব্দ শুনে বা লিপি দেখে যে জ্ঞান হয় তাকে বলে শাব্দজ্ঞান। শাব্দজ্ঞানের করণকে বলা হয় শব্দ বা শব্দপ্রমাণ। আপ্তব্যক্তির উপদেশবাক্যই শব্দ প্রমাণ। এইরূপ উপদেশ থেকে পাওয়া জ্ঞান হল শাব্দজ্ঞান। যিনি পদার্থের যথাযথ ধর্ম-সাক্ষাৎ (তত্ত্বসাক্ষাৎ) করেছেন এবং যিনি নিজে যেরূপ সাক্ষাৎ করেছেন, অপরকে জানানোর অভিপ্রায়ে ঠিক সেইরূপ উপদেশই দেন, তাঁকে বলা হয় আপ্তব্যক্তি। এইরূপ আপ্তব্যক্তির উপদেশ থেকে যথার্থ শাব্দজ্ঞানই হয়। শব্দ থেকে উৎপন্ন যে কোন জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান নয়। এইজন্য অনাপ্ত ব্যক্তির শব্দকে শব্দপ্রমাণ বলা হয় না। শাব্দজ্ঞানের করণ হল পদজ্ঞান। পদজ্ঞানের দ্বারা পদার্থের যে বোধ তাই শাব্দবোধ। আচার্য উদয়ন জ্ঞায়মান শব্দকেই শাব্দজ্ঞানের করণ বলেন। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ জ্ঞায়মান শব্দ নয়, শব্দের জ্ঞানকেই শব্দবোধের করণ বলেন। পদ শুনে পদার্থের স্মরণ হয়। এইরূপ পদার্থের স্মরণকে বলা হয় পদার্থের উপস্থিতি। পদ বৃত্তির দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি ঘটায়। শক্তি ও লক্ষণাকে পদের বৃত্তি বলা হয়। শক্তি ও লক্ষণার মধ্যে যে কোন একটির দ্বারা পদার্থের উপস্থিতি ঘটে। এই কারণে বৃত্তিরূপ সম্বন্ধের দ্বারা পদার্থের উপস্থিতিকেই শাব্দবুদ্ধির ব্যাপার বলা হয়। পদ থেকে পদার্থের জ্ঞান যেমন শাব্দবুদ্ধির করণ তেমনি পদসমুদয় থেকে বাক্যার্থের জ্ঞান হল শাব্দবুদ্ধি। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকগণ কেবল বাক্যার্থবোধকেই শাব্দবুদ্ধি বলে থাকেন। নৈয়ায়িকগণ নানা যুক্তির সাহায্যে বাক্যার্থজ্ঞান যে স্বতন্ত্র প্রমা এবং তার করণ যে স্বতন্ত্র প্রমাণ তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১.০৮.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

জ্ঞান

ন্যায়মতে জ্ঞান হল গুণপদার্থ। এই গুণ হল আত্মার বিশেষ গুণ, ন্যায়দর্শনে 'জ্ঞান', 'বুদ্ধি', 'উপলব্ধি', 'প্রতীতি' প্রভৃতি শব্দ হল পর্যায় শব্দ। ভারতীয় দর্শনে 'জ্ঞান' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, ভ্রম, সংশয়, স্মৃতি প্রভৃতিও এই দর্শনে জ্ঞানের অন্তর্গত।

প্রমা

'প্রমা' একটি পারিভাষিক শব্দ। আক্ষরিক অর্থে 'প্রমা' হল প্রকৃষ্টজ্ঞান (প্র = প্রকৃষ্ট, মা = জ্ঞান)। আক্ষরিক অর্থে 'প্রমা' শব্দটি ব্যবহার করা হ'লে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রকৃষ্টজ্ঞান হ'ল যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রমা নয়। যথার্থ স্মৃতিজ্ঞানকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বলা যায় কিন্তু তাকে প্রমা বলা যায় না। পারিভাষিক অর্থে 'প্রমা' হল যথার্থ অনুভব। বিষয়ের উপস্থিতিতে বিষয়ের যে জ্ঞান হয় তাকে ব'লে অনুভব। এই অনুভব যখন যথার্থ হয় তখন তাকে বলা হয় প্রমা। প্রমার লক্ষণ হল 'তদ্‌বতিতৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ'।

অপ্রমা

প্রমা ভিন্ন যাবতীয় জ্ঞানকেই 'অপ্রমা' বলা হয়। যেমন, স্মৃতি, ভ্রম, সংশয়, বিপর্যয় প্রভৃতি। এই জ্ঞানগুলি ছাড়াও অনুভবও কোন কোন সময় অপ্রমা হয়। অনুভব যখন যথার্থ হয় তখন তাকে যেমন প্রমা বলা হয় তেমনি অনুভব যখন অযথার্থ হয় তখন তাকে অপ্রমা বলা হয়। একমাত্র স্মৃতির ক্ষেত্রেই যথার্থ ও অযথার্থ উভয় প্রকার জ্ঞানকেই অপ্রমা বলা হয়। অপ্রমার লক্ষণ হ'ল 'তদ্ অভাববতিতৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ'।

প্রমাণ

প্রমার করণকে বলে প্রমাণ (প্রমাকরণং প্রমাণং)। প্রমা যেহেতু যথার্থ অনুভব সেহেতু যথার্থ অনুভবের করণের নাম প্রমাণ। যথার্থ অনুভব চার প্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। এই চার প্রকার যথার্থ অনুভবের চার প্রকার করণ হল : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। যে কোন প্রকার জ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলা হয় না। ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন সংখ্যক প্রমাণ স্বীকার করেন।

করণ

করণ হ'ল অসাধারণ কারণ। কোন কার্যের দ্বিবিধ কারণ থাকে : (১) সাধারণ কারণ ও (২) অসাধারণ কারণ।

সাধারণ কারণগুলি একাধিক কার্যের কারণ হয়। অসাধারণ কারণগুলি কার্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ কারণ হ'ল আত্ম-মন-সংযোগ। অসাধারণ কারণ কিভাবে নির্ধারণ করা হবে সে বিষয়ে দুটি ভিন্ন মত আছে :

(১) ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্।

(২) ব্যাপারবৎ কারণং করণম্।

(১) প্রথম মতে করণ হ'ল কার্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। যে কারণটির পরক্ষণেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণটিই হবে জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা করণ। বৃক্ষচ্ছেদনের অব্যবহিত পূর্বে ঘটে কুঠারের উত্থান-পতনরূপ ক্রিয়া। উত্থানপতনের পরেই ছেদন কার্য ঘটে। তাই এই মতে বৃক্ষচ্ছেদনের করণ হল কুঠারের উত্থানপতন। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষের অব্যবহিত পরেই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ হ'ল 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ'।

(২) দ্বিতীয় মতে করণ হ'ল ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ। কোন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে, সেই কারণের দ্বারা উৎপন্ন কার্যের যে জনক হয় তাকে বলে ব্যাপার (তজ্জন্যত্বেসতিতজ্জন্য জনকত্বম্।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে কুঠারের উত্থান-পতন কুঠারের দ্বারা উৎপন্ন হয়ে কুঠারজন্য বৃক্ষচ্ছেদন কার্যের কারণ হয়। তাই কুঠারের উত্থান-পতনকে বৃক্ষচ্ছেদনের ব্যাপার বলা হয়। যে কারণ এরূপ ব্যাপারবান বা ব্যাপার বিশিষ্ট তাই হ'ল করণ। এক্ষেত্রে কুঠার ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ বা করণ। প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হ'ল ব্যাপার, ইন্দ্রিয় হ'ল এরূপ ব্যাপার বিশিষ্ট কারণ বা করণ।

১.০৯.০০ ■ সারাংশ

বর্তমান নিবন্ধটি আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ ও তৎটীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ভিত্তিক রচনা। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থটি ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশের পক্ষে একটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ। ভাষাপরিচ্ছেদের শুরু হয় বৈশেষিক দর্শনের পদার্থতত্ত্ব দিয়ে। প্রথম পদার্থ দ্রব্য। দ্রব্য নয়টি। আত্মা হল অষ্টম দ্রব্য। নয়টি দ্রব্যের মধ্যে অষ্টমদ্রব্য আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে আত্মার অন্যতম গুণরূপে তিনি জ্ঞানের আলোচনায় প্রবেশ করেন। এখান থেকে গ্রন্থকার বৈশেষিক ধারা ত্যাগ করে ন্যায়ের ধারা অনুসরণ করেন। ন্যায়সম্মত প্রমাণতত্ত্ব আলোচনান্তে তিনি অবার ফিরে যান বৈশেষিকসম্মত নবম দ্রব্য মনের আলোচনায়। সুতরাং একই গ্রন্থে তিনি বৈশেষিকসম্মত সপ্তপদার্থ ও ন্যায়সম্মত চতুর্বিধ প্রমাণতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটান। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বর্তমান পাঠক্রমে মুক্তাবলীসহ ভাষাপরিচ্ছেদের প্রমাণ অংশ-ই (বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণ) পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। বুদ্ধির বিভাগ, প্রত্যক্ষের লক্ষণ, অনুমিতির লক্ষণ, প্রত্যক্ষের বিভাগ, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ, জ্ঞানসামান্যের কারণ, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, লৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ, অলৌকিক সন্নিকর্ষের বিভাগ, অনুপলব্ধি, প্রমার লক্ষণ, অন্যথাখ্যাতি প্রভৃতি বিষয় এই নিবন্ধে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হবে। ন্যায়মতে সমস্ত প্রকার জ্ঞান (তা আনুভবই হোক্ আর স্মৃতিই হোক্) যেমন সত্য হতে পারে, তেমনি আবার মিথ্যাও হতে পারে। মিথ্যাজ্ঞানকে বলা হয় ভ্রমজ্ঞান। পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যবহৃত 'knowledge' শব্দটি কেবলমাত্র সত্যজ্ঞান বা সঠিক জ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। পদার্থের অনুভব যখন যথার্থ হয় কেলবমাত্র তখনই তাকে প্রমা বলা হয়। তাই যথার্থ স্মৃতিও ন্যায়মতে প্রমা নয়। অনুভবই কেবল প্রমা হতে পারে। সংশয়, ভ্রম, তর্ক প্রভৃতি ন্যায়মতে অপ্রমা। যথার্থ অনুভবকে বলা হয় প্রমা এবং প্রমার উৎস বা করণকে বলা হয় প্রমাণ।

১.১০.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1. What is *jñāna*?
2. What is *pramā*?
3. What are the pramāṇas admitted by the Naiy*ā*yikas?
4. Who is the cogniser according to the Naiy*ā*yikas?
5. What is *apramā*?
6. What conjuction / conjuctions is / are necessary for cognition of any type?
7. What is *vyāpāra*?
8. Who is the author of Bhāṣāpariccheda?
9. What is the name of the commentary on Bha¯ s a¯ pariccheda written by Vis´vana¯ tha?

১.১১.০০ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বানুবাদ সহ।

৬। ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭। Bhāṣāpariccheda, Swami Mādhabānanda.

৮। Perception, B. K. Matilal.

একক-২

বিষয়-সূচী

২.০০.০০ ভূমিকা
২.০১.০০ প্রত্যক্ষের লক্ষণ
২.০২.০০ প্রত্যক্ষের করণ
২.০৩.০০ অনুমিতির লক্ষণ
২.০৪.০০ অনুমিতির করণ
২.০৫.০০ প্রত্যক্ষের বিভাগ
২.০৫.০১ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ
২.০৫.০২ রাসন প্রত্যক্ষ
২.০৫.০৩ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ
২.০৫.০৪ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ
২.০৫.০৫ স্পার্শন প্রত্যক্ষ
২.০৫.০৬ মানস প্রত্যক্ষ
২.০৬.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ
২.০৭.০০ সারাংশ
২.০৮.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী
২.০৯.০০ গ্রন্থপঞ্জী

প্রত্যক্ষ প্রমাণ

২.০০.০০ ■ ভূমিকা

আচার্য বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ৫১ কারিকায় বুদ্ধির আলোচনার সূত্রপাত করে বুদ্ধির বিভাগ ও বুদ্ধির-আশ্রয় দ্রব্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কারিকাটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

''বিভূবুদ্ধ্যাদি-গুণবাণ বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা।

অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্বিধা।''

অর্থাৎ (আত্মা) বিভূ ও বুদ্ধ্যাদি গুণবান। বুদ্ধি দুই প্রকার : অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি আবার চার প্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ।

গ্রন্থকার আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বুদ্ধির বিভাগ নির্দেশ করেছেন। এখানে তিনি বুদ্ধি বা জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করেননি। বুদ্ধি ছাড়া আত্মার ইচ্ছাদি গুণ আছে। সেই সব গুণের আলোচনাও তিনি এখানে করেননি। বুদ্ধি নিরূপণের পর তিনি নবম দ্রব্য মনের আলোচনা করেছেন। তিনি কেন দ্রব্যের

আলোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধির আলোচনা করেছেন তা বোঝা যায় না। তবে আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গেই যে তিনি বুদ্ধির আলোচনা করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবার বুদ্ধির লক্ষণ নির্দেশও এখানে তাঁর উদ্দেশ্য নয়, বুদ্ধির বিভাগ নির্দেশই তাঁর উদ্দেশ্য। কারিকায় উক্ত 'বিভূ' পদ আত্মাবোধক। ন্যায় মতে আত্মা বিভূদ্রব্য। ন্যায় মতে আত্মা দুই প্রকার— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। সাধারণ জীবের আত্মা হলো জীবাত্মা। অপরদিকে ঈশ্বর হলেন পরমাত্মা। পরমাত্মা বা ঈশ্বর হলেন আটটি গুণসম্পন্ন। এই আটটি গুণ হলো— জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। এই গুণগুলি সর্বত্র নিত্য নয়। ঈশ্বর যখন এই গুণগুলির আশ্রয় হন তখনই এগুলি নিত্য হয়। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, অনাদি, অনন্ত, বিভূ, নিত্য, এক ও সর্বময় কর্তা। ঈশ্বরের সর্ব গুণই নিত্য। ঈশ্বর জগৎ তথা সকল পদার্থের নিমিত্ত কারণ। পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও নিত্য তবে শরীরভেদে জীবাত্মা অনেক। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম ও অধর্ম ও ভাবনাখ্য ও সংস্কার এই নয়টি হলো জীবাত্মার বিশেষ গুণ। তাছাড়াও সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি গুণও জীবাত্মার সাধারণ গুণ। তাই দেখা যায় যে, জীবাত্মা চতুর্দশ গুণের আধার। পরিমাণ ভিন্ন জীবাত্মার গুণ অনিত্য গুণ। বিভূ বা পরমহৎ পরিমাণ নিত্যগুণ। বিভূ পরিমাণের আশ্রয় দ্রব্য সর্বদা নিরবয়ব বলে বিভূপরিমাণ জন্য বা অনিত্য গুণ হতে পারে না এবং বিভূপরিমাণের আশ্রয় দ্রব্যও অনিত্য হতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, আত্মা ও আত্মার পরিমাণ (বিভূপরিমাণ) উভয়ই নিত্য।

অতঃপর গ্রন্থকার বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধি দুই প্রকার : অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি আবার চার প্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ বা শব্দজ। এই চার প্রকার অনুভূতির চতুর্বিধ করণ বর্তমান। এই চতুর্বিধ করণ হলো : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। বর্তমান নিবন্ধ কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

২.০১.০০ ■ প্রত্যক্ষের লক্ষণ

আচার্য্য বিশ্বনাথ তাঁর সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকায় তাঁর নিজের দেওয়া প্রত্যক্ষের লক্ষণ ছাড়াও মহর্ষি গৌতম ও গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দেওয়া লক্ষণগুলি আলোচনা করেছেন। মুক্তাবলীতে উল্লিখিত প্রত্যক্ষের লক্ষণগুলি হলো—

১। ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।

২। জ্ঞানাকরণং জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।

৩। ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্নম্ জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।

৪। যৎ কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষব্যক্তিমাদায় তদ্ ব্যক্তিবৃত্ত্যনুমিত্যাদ্যবৃত্তি জাতিমত্ত্বং প্রত্যক্ষত্বম্।

উক্ত লক্ষণগুলির মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ লক্ষণ বিশ্বনাথের স্বকীয়। দ্বিতীয় লক্ষণটি নির্দেশ করেছেন গঙ্গেশ এবং তৃতীয় লক্ষণটি নির্দেশ করেছেন মহর্ষি গৌতম। প্রত্যক্ষ বলবত্তম বলে অন্য সকলের ন্যায় বিশ্বনাথ প্রথমে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করতে মুক্তাবলীতে বলেছেন—''ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।'' অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে বলা হয় প্রত্যক্ষজ্ঞান। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়জন্যত্বকে প্রত্যক্ষের লক্ষণ বললে

ইন্দ্রিয়ের রূপাদিগুণে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। ইন্দ্রিয়ের রূপাদিগুণ ইন্দ্রিয়জন্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের রূপাদিগুণে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের রূপাদি গুণ জ্ঞান নয়। তাই তাতে জ্ঞানত্ব নাই। লক্ষণোক্ত 'জ্ঞান' শব্দের দ্বারা তাই রূপাদিগুণে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারিত হয়েছে। আবার যদি জ্ঞানত্বমাত্রকেই প্রত্যক্ষের লক্ষণ বলা হত তাহলে ঐ লক্ষণের অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হত। অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান হওয়ায় তাতে জ্ঞানত্ব আছে। কিন্তু অনুমিতি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জন্য না হওয়ায় তাতে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নাই। লক্ষণোক্ত 'ইন্দ্রিয়জন্য' পদের দ্বারা তাই অনুমিত্যাদিতে প্রত্যক্ষলক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষের লক্ষণ হল—''ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্।''

বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে প্রত্যক্ষের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ আশঙ্কা করে তা নিরাস করেছেন। ন্যায়মতে মন অন্তরিন্দ্রিয়। এই অন্তরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান লাভ করি। আবার ন্যায়মতে আত্মমনসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ। তাই যে কোনো প্রকার জ্ঞানকারণতাই মনের আছে। মন অণুপরিমাণ বলে এক ক্ষণে আমাদের একাধিক জ্ঞান হতে পারে না। সুতরাং দেখা যায় যে, মন ইন্দ্রিয় হলেও তজ্জন্য কেবলমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয় না, সর্বপ্রকার জ্ঞানই উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা হলে স্বাভাবিকভাবেই এই লক্ষণ অনুমিত্যাদিতে অতিব্যাপ্ত হয়।

উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি দোষ আশঙ্কা করে তা নিরসনার্থে বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলেছেন, ''যদ্যপি মনোরূপেন্দ্রিয়জন্যং সর্বমেব জ্ঞানম্ তথাপি ইন্দ্রিয়ত্বেন রূপেণ ইন্দ্রিয়াণাং যত্র জ্ঞানে করণত্বং, তৎ প্রত্যক্ষমিতি বিবক্ষিতম্।'' অর্থাৎ যদিও মনোরূপ ইন্দ্রিয় সর্ববিধ জ্ঞানেরই কারণ তথাপি যে জ্ঞানে মন ইন্দ্রিয়রূপে কারণ হয়, সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। মনের জ্ঞানকারণতা দ্বিবিধ—ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন জ্ঞানকারণতা এবং মনস্তাবচ্ছিন্ন জ্ঞানকারণতা। মনস্তাবচ্ছিন্ন জ্ঞানকারণতার দ্বারা মন (দ্রব্যরূপ মন) যে কোনো প্রকার জ্ঞানেরই কারণ হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন জ্ঞানকারণতার দ্বারা মন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই কারণ হয়, প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমিত্যাদির কারণ হয় না। এই কারণে ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা হলে প্রত্যক্ষের লক্ষণ আর অনুমিত্যাদিতে অতিব্যাপ্ত হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষের প্রকৃষ্ট লক্ষণ হল 'ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যম্ জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।'

প্রত্যক্ষের উপরিউক্ত লক্ষণ জন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ। ঈশ্বরের নিত্যপ্রত্যক্ষ এই লক্ষণের লক্ষ্য নয়। ন্যায়মতে ঈশ্বর সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা। কিন্তু ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় স্বীকৃত নয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকে তাই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা যায় না। নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গেশ উপাধ্যায় এই কারণে মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ আশঙ্কাপূর্বক জ্ঞানাকরণক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেছেন (জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানমিতি তু বয়ম্)। অর্থাৎ যে জ্ঞানে অন্য কোনো জ্ঞান (পূর্বলব্ধ জ্ঞান) করণ হয় না তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান উপমিতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধের ক্ষেত্রে পদজ্ঞান করণরূপে বিবেচিত। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াদিই করণ, কোনো জ্ঞান করণ হয় না। ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের করণমাত্র, নিজে জ্ঞান নয়। সবিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞানে যদিও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত হয় তবুও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের করণ হয় না। সুতরাং নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক উভয় প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞানই জ্ঞানাকরণক জ্ঞান। লৌকিক বা জন্যপ্রত্যক্ষ যেমন জ্ঞানাকরণক তেমনি নিত্য ঈশ্বর

প্রত্যক্ষও জ্ঞানাকরণক। সুতরাং জ্ঞানাকরণক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বললে জন্যপ্রত্যক্ষ ও নিত্য ঈশ্বর প্রত্যক্ষ সকল প্রকার প্রত্যক্ষেই উক্ত লক্ষণ প্রযোজ্য হয়। তবে প্রত্যক্ষের এই লক্ষণ নঞর্থক। এই লক্ষণে প্রত্যক্ষের কোনো সদর্থক পরিচয় পাওয়া যায় না।

বিশ্বনাথ গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের লক্ষণকে বিকল্প লক্ষণরূপে উপস্থাপন করলেও মহর্ষি গৌতমের সূত্র উদ্ধৃতি-পূর্বক ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানত্বকে যে নির্দোষ ভাবেই জন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে সে অভিমতও তিনি প্রকাশ করেছেন। মহর্ষি বলেছেন, ''ইন্দ্রয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং অব্যপদেশ্যং অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্''। অর্থাৎ তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্ন, অশাব্দ, অভ্রান্ত ও সুনিশ্চিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

ন্যায়সম্প্রদায় প্রত্যক্ষের একটি জাতি ঘটিত লক্ষণও নির্দেশ করেছেন। জাতিঘটিত লক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যক্ষত্বজাতিমত্বই প্রত্যক্ষের লক্ষণ। অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব জাতি বর্তমান তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। কোনো একটি প্রত্যক্ষজ্ঞানে যে প্রত্যক্ষত্বজাতি বর্তমান এবং অনুমিত্যাদিতে অবর্তমান, সেই প্রত্যক্ষত্বজাতিমান অনুভব মাত্রই প্রত্যক্ষ।

উপরিউক্ত প্রত্যক্ষের যে সকল লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্ এই লক্ষণটি কেবলমাত্র জন্যপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ায় এই লক্ষণটিকে প্রত্যক্ষসাধারণের সন্তোষজনক লক্ষণ বলা যায় না। সেই তুলনায় 'জ্ঞানাকরণং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্'' এই লক্ষণটি সন্তোষজনক। এই লক্ষণটি একাধারে জন্যপ্রত্যক্ষ ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষের লক্ষণ হওয়ায় কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা নেই। বিকল্প লক্ষণ হিসাবে, ''প্রত্যক্ষত্বজাতিমত্ত্বং প্রত্যক্ষত্বং'' এই লক্ষণটিকেও প্রত্যক্ষের সন্তোষজনক লক্ষণ বলা যায়। তবে জন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ হিসাবে, 'ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এই লক্ষণটিও প্রত্যক্ষের একটি সদর্থক নির্দোষ লক্ষণ।

২.০২.০০ ■ প্রত্যক্ষের করণ

প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ কি তা জানতে হলে করণ ও ব্যাপার কাকে বলে তা জনা প্রয়োজন। ব্যাপার হল ''তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনকত্বং'' অর্থাৎ যা কোনো কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে ঐ কারণ হতে উৎপন্ন অন্য কোনো কার্যের জনক হয় তাই ব্যাপার। 'করণ' হল অসাধারণ কারণ। এক মতে অসাধারণকারণ হল ''ফলাযোগব্যবচ্ছিন্নং কারণং''। অর্থাৎ যে কারণ কার্য বা ফল উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী হয়ে কার্যের জনক হয় তাই অসাধারণ কারণ বা 'করণ'। এই মতে কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণই 'করণ' পদবাচ্য। কিন্তু অন্যমতে ব্যাপারবৎ কারণকে করণ বলা হয় (ব্যাপারবৎ কারণত্বং করণত্বং)। এই মতে যে কারণ ব্যাপারের পূর্ববর্তী হয়ে ব্যাপারবিশিষ্ট হয় তাই করণ। এখন দেখা যাক্ প্রত্যক্ষের করণ কোনটি?

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের পরক্ষণেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্তী হওয়ায় সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের (ফল) অব্যবহিত পূর্ববর্তী। একমতে তাই সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের করণ। কিন্তু অন্যমতে ব্যাপারবৎ কারণ করণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হল প্রত্যক্ষের প্রতি

ব্যাপার এবং এই ব্যাপারবান ইন্দ্রিয়ই হল প্রত্যক্ষের করণ। বিশ্বনাথ এই মত অনুসরণ করে প্রত্যক্ষের করণঘটিত লক্ষণ নির্দেশ করেই বলেছেন ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্। অতএব তাঁর মতে ইন্দ্রিয়ই হল প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ।

২.০৩.০০ ■ অনুমিতির লক্ষণ

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন তাঁর সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকায় জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ অনুভূতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে তিনি প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশান্তর অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে অনুমিতির একাধিক লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। এই লক্ষণগুলি হল—

১। পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ।

২। পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কং যজ্জ্ঞানম্ তদেবানুমিতিঃ।

৩। পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কংযজ্জ্ঞানম্ তাদৃশ জ্ঞান বৃত্ত্যনুভবত্বব্যাপা জাতিমত্ত্বম্ অনুমিতিত্বম,

৪। ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ,

৫। বস্তুতো যাং কাঞ্চিৎ অনুমিতিব্যক্তিমাদায় তদ্ব্যক্তিবৃত্তিপ্রত্যক্ষাবৃত্তিজাতিমত্ত্বম্ অনুমিতিত্বং।

আমরা এখন এই লক্ষণগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব। অনুমিতির প্রথম লক্ষণ উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ'। অর্থাৎ পরামর্শ জন্য জ্ঞান হল অনুমিতি। গ্রন্থকার এস্থলে ''পরামর্শজন্য জ্ঞান বলতে 'পরামর্শব্যাপারক' জ্ঞানকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে অনুমান খণ্ডে তিনি পরামর্শ পরীক্ষায় বলেছেন—''ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ'' অর্থাৎ অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং পরামর্শ হল তার ব্যাপার। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, পরামর্শকে ব্যাপার করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অনুমিতি। পরামর্শজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই যেহেতু অনুমিতি উৎপন্ন হয় এবং প্রাচীনমতে যেহেতু যে কারণ ফলের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তাই করণ, সেহেতু এই মতে পরামর্শই অনুমিতির করণ বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু নব্যমতে যেহেতু ব্যাপারবৎ করণই করণ সেহেতু পরামর্শ অনুমিতির ব্যাপার, করণ নয়। গ্রন্থকার এস্থলে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের অনুগামী হয়ে উক্ত নব্যমতকে সমর্থন করেছেন।

পরামর্শের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদের অনুমানখণ্ডে বলেছেন—''ব্যাপ্যস্য পক্ষবৃত্তিত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে''। ব্যাপ্যের পক্ষবৃত্তিত্বের জ্ঞানকে বলা হয় পরামর্শ। 'ব্যাপ্যের পক্ষবৃত্তিত্ব' বলতে ব্যাপাবিশিষ্ট বা ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর সঙ্গে পক্ষের সমন্ধান্ধবগাহি জ্ঞানকে বোঝান হয়েছে। এইরূপ জ্ঞানের আকার দ্বিবিধ : 'পক্ষে ব্যাপ্য' (ব্যাপ্য বিশেষ্যক) এবং 'পক্ষ ব্যাপ্যবান' (পক্ষ বিশেষ্যক)। এই উভয় প্রকার পরামর্শ হতেই 'পক্ষসাধ্যবান' রূপ অনুমিতি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

অনুমিতির উপরিউক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ আশঙ্কা করে বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে তা নিরাস করেছেন। পরামর্শের প্রত্যক্ষে পরামর্শ বিষয় হয়ে থাকে। সুতরাং পরামর্শের প্রত্যক্ষ পরামর্শজন্য।

পরামর্শজন্যত্বকে অনুমিতির লক্ষণ বলা হলে ঐলক্ষণ পরামর্শের প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য তিনি বলেছেন 'পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কং যজ্‌জ্ঞানম্ তদেবানুমিতিঃ' এইরূপে অনুমিতির লক্ষণ নির্দেশ করতে হবে। অর্থাৎ পরামর্শজন্য এবং হেতুকে বিষয় না করে (হেতু অবিষয়ক) যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অনুমিতি। পরামর্শের প্রত্যক্ষজ্ঞান পরামর্শজন্য হলেও তা হেতু পরামর্শকে বিষয় করেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু ''পর্বতঃ বহ্নিমান্'' রূপ অনুমিতি পরামর্শজন্য হলেও পরামর্শকে বা অন্য কোনো কারণকে বিষয় করে উৎপন্ন হয় না, তাই অনুমিতি হল হেতু অবিষয়ক পরামর্শজন্য জ্ঞান। অনুমিতির এই লক্ষণ আর পরামর্শের প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্ত হয় না।

অনুমিতির উপরিউক্ত লক্ষণও নির্দোষ নয়। ''পর্বতঃ বহ্নিমান্'' এইরূপ যেমন অনুমিতি হয় তেমনি ''ধূমবান পর্বতঃ বহ্নিমান্'' এইরূপ অনুমিতিও হয়। প্রথম প্রকার অনুমিতিতে কোনো হেতু বিষয় হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অনুমিতিতে হেতু ধূম পক্ষ পর্বতের বিশেষণরূপে বিষয় হয়। অথচ উভয় প্রকার অনুমিতিই যথার্থ। 'হেতু অবিষয়ক পরামর্শজন্যত্ব'কে অনুমিতির লক্ষণ বলা হলে তাই পুনরায় অব্যাপ্তি দোষ হয়। এই অব্যাপ্তি দোষ বারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ অনুমিতির এই লক্ষণটিকে অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন অনুমিতি হল ''পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কং যজ্‌জ্ঞানম্ তাদৃশ জ্ঞানবৃত্ত্যনুভবত্বব্যাপ্য জাতিমত্বম্''। অর্থাৎ পরামর্শজন্য হেতু অবিষয়কে যে অনুমিতি জ্ঞান সেই অনুমিতি জ্ঞানে বৃত্তি যে অনুভবত্বের ব্যাপ্য অনুমিতিত্ব জাতি বর্তমান। ঐ অনুমিতিত্ব জাতি 'ধূমবান পর্বতঃ বহ্নিমান'—এইরূপ অনুমিতিতে বর্তমান থাকায় অনুমিতির উক্ত লক্ষণে আর অব্যাপ্তি দোষ হয় না। সুতরাং 'হেতু অবিষয়ক পরামর্শজন্যত্ব' বলতে 'হেতু অবিষয়ক পরামর্শজন্য জ্ঞানবৃত্তি অনুভবত্ব-ব্যাপ্য জাতিমত্ত্বকে'ই বুঝতে হবে।

বিশ্বনাথ পরিশেষে অনুমিতির বিকল্প লক্ষণ নির্দেশ করতে বলেছেন—'অথবা ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ'। অর্থাৎ অনুমিতিকে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণক জ্ঞানও বলা যেতে পারে। যে জ্ঞানের করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই জ্ঞানই অনুমিতি। নব্যমতে অনুমিতিতে যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ জ্ঞানকে ব্যাপার করে করণ হয় সেই হেতু সকল অনুমিতিই ব্যাপ্তি জ্ঞানকরণকজ্ঞান। সুতরাং অনুমিতির এই লক্ষণকে এক অর্থে নির্দোষ লক্ষণ বলা যেতে পারে। উক্ত করণ ঘটিত লক্ষণগুলি ছাড়াও বিশ্বনাথ অনুমিতির একটি জাতিঘটিত লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। এই লক্ষণটি হল—

''যাং কাঞ্চিদনুমিতিব্যক্তিমাদায় তদব্যক্তিবৃত্তি

প্রত্যক্ষাবৃত্তিজাতিমত্ত্বমনুমিতিত্বম্।''

অর্থাৎ যে কোনো একটি অনুমিতি ব্যক্তিকে গ্রহণ করে সেই অনুমিতি ব্যক্তিতে বৃত্তি অথচ প্রত্যক্ষাদিতে অবৃত্তি যে অনুমিতিত্ব জাতি সেই জাতিমত্ত্বই হল অনুমিতির লক্ষণ। অনুমিতির এই লক্ষণটিকে সন্তোষজনক লক্ষণ বলে মনে হয়।

বস্তুতঃ অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষত্রয় রহিত লক্ষ্যের অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ। লক্ষণের প্রয়োজন হল লক্ষ্যে অলক্ষ্যের ভেদজ্ঞান ও লক্ষ্যে ব্যবহার।

২.০৪.০০ ■ অনুমিতির করণ

অনুমিতির করণ কি এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। এ বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যেও মত পার্থক্য আছে। প্রাচীন নৈয়ায়িক উদ্দ্যোৎকর লিঙ্গপরামর্শকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়ন তাঁর কিরণাবলীতে জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায় জ্ঞায়মান লিঙ্গ ও লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ হল করণ। ব্যাপারবৎ অসাধারণ করণরূপে তিনি ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। অর্থাৎ অনুমিতির করণ নব্য নৈয়ায়িকদের মতে ব্যাপ্তি জ্ঞান। বিশ্বনাথও মুক্তাবলীতে সেই মতকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং বিশ্বনাথের মতে অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান।

২.০৫.০০ ■ প্রত্যক্ষের বিভাগ

প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণান্তে গ্রন্থকার জন্যপ্রত্যক্ষের বিভাগ নির্দেশ করেছেন। জন্যপ্রত্যক্ষের এই বিভাগ ইন্দ্রিয়ের বিভাগ অনুসারী। ন্যায়মতে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ বহিরিন্দ্রিয় ও মন অন্তরিন্দ্রিয়। এই ছয়প্রকার ইন্দ্রিয় থেকে ছয়প্রকার জন্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এগুলি হল যথাক্রমে : চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, স্পার্শন ও মানস। বলাবাহুল্য, প্রত্যক্ষের এই বিভাগ ইন্দ্রিয় অনুসারেই করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ এই ছয়প্রকার প্রত্যক্ষ বহির্ভূত। এই বিভাগ জীবাত্মার অনিত্য প্রত্যক্ষের বিভাগ।

অতঃপর গ্রন্থকার কোন্ কোন্ বিষয় কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য তার বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমে তিনি কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই তিন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, শব্দ ও শব্দত্বাদিজাতি শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। শব্দ ও শব্দত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। অনুরূপভাবে গন্ধ ও গন্ধত্বাদিজাতি হল নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। গন্ধ ও গন্ধত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ। সেইরূপ রস ও রসত্বাদিজাতি রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। রস ও রসত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল রাসন প্রত্যক্ষ। দেখা যায় যে, উক্ত তিন প্রকার প্রত্যক্ষ (ঘ্রাণজ, রাসন ও শ্রাবণ) হল কেবলমাত্র তিনপ্রকার বিশেষ গুণ ও তাদের জাতির প্রত্যক্ষ। এখন দেখা যাক্, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন ছয় প্রকার প্রত্যক্ষের স্বরূপ কি।

২.০৫.০১ ■ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ

ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষের বিষয় হল গন্ধ ও গন্ধত্বাদিজাতি। গন্ধ পৃথিবীর বিশেষ গুণ। গন্ধ দুইপ্রকার, সুরভি ও অসুরভি। গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে অন্য কোন দ্রব্যে থাকে না। শুধু তাই নয়, গন্ধ ব্যাপ্যবৃত্তি গুণপদার্থ। গুণমাত্রই আশ্রিত পদার্থ। আশ্রয়-নিরপেক্ষভাবে কোন গুণই থাকতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গুণ যে দ্রব্যে আশ্রিত হয় সেই দ্রব্যের সর্বাংশেই সেই গুণ আশ্রিত হয়। কোন কোন গুণ আশ্রয়-দ্রব্যের

সর্বাংশেই বর্তমান থাকে। এই গুণগুলিকে ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ বলে। ব্যাপ্যবৃত্তি গুণ যে দ্রব্যে থাকে সেই দ্রব্যের কোন অংশেই তার অভাব থাকে না। রূপ-রসাদি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-দ্রব্যেকে ব্যাপ্ত করে থাকে। অপর দিকে সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, শব্দ প্রভৃতি হল অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। একটি বৃক্ষের সঙ্গে বানরের সংযোগ বৃক্ষের কোন এক অবচ্ছেদেই থাকে অন্যত্র থাকে না। তাই সংযোগের আশ্রয়-দ্রব্যে সংযোগ যেমন বর্তমান থাকে তেমনি সংযোগাভাবও ভিন্ন অবচ্ছেদে বর্তমান থাকে।

২.০৫.০২ ■ রাসন প্রত্যক্ষ

রাসন প্রত্যক্ষের বিষয় হল রস ও রসত্ব জাতি। রস ছয়প্রকার—মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত। রস পৃথিবী ও জলে থাকে। তবে জলেই রসের উৎকর্ষ। পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্‌ভিন্ন রস অনিত্য। রসনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে রসের সম্বন্ধের ফলে রসের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন রসের সাধারণ ধর্ম হল রসত্ব জাতি। রসের সঙ্গে রসত্ব জাতিও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য। তবে রসবান দ্রব্য রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

২.০৫.০৩ ■ শ্রাবণ প্রত্যক্ষ

শ্রাবণ প্রত্যক্ষের বিষয় হল শব্দ ও শব্দত্বজাতি। শব্দ ত্রিবিধ—সংযোগজ, বিভাগজ ও শব্দজ। শব্দ যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তখনই শব্দের প্রত্যক্ষ হয়। শব্দের প্রত্যক্ষে নৈয়ায়িকগণ দ্বিবিধ প্রণালীর কথা বলেন। এই দুটি প্রণালীর একটি হল কদম্বকোরকন্যায় এবং অপরটি হল বীচিতরঙ্গন্যায়। কদম্বকোরক যেমন একটি থেকে অপর একটি উৎপন্ন হয় বা বীচিতরঙ্গ যেমন একটি থেকে অপর একটি উৎপন্ন হয় তেমনি শব্দ উৎপত্তিক্রমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে।

২.০৫.০৪ ■ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হল উদ্ভূত রূপ, রূপত্বজাতি ও রূপবান দ্রব্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গ্রন্থকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে রূপের বিশেষণরূপে 'উদ্ভূত' শব্দটি উল্লেখ করলেও ঘ্রাণজ, রাসন বা শ্রাবণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যথাক্রমে গন্ধ,রস বা শব্দগুণের বিশেষণরূপে উদ্ভূত শব্দটি ব্যবহার করেননি। তৎসত্ত্বেও উক্ত গুণাদির বিশেষণরূপে 'উদ্ভূত' শব্দটিকে ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়রূপে গন্ধাদি গুণ উদ্ভূতই হয়। উদ্ভূত গন্ধ ও উদ্ভূত রসই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

অনুদ্ভূত রূপ যে প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না তা প্রতিপাদনের জন্যে গ্রন্থকার গ্রীষ্ম ও উষ্মার উদাহরণ দিয়েছেন। গ্রীষ্ম ও উষ্মাতেও রূপ থাকে তবে ঐ রূপ উদ্ভূত রূপ নয়, অনুদ্ভূত রূপ। এই কারণে গ্রীষ্ম বা উষ্মার রূপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হয় না। এরপর গ্রন্থকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করতে বলেছেন যোগ্যবৃত্তিঃ। তাৎপর্য এই যে, প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান পৃথক্ত্ব প্রভৃতি গুণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। 'পৃথক্ত্ব প্রভৃতি' বলতে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই নয়টি গুণকে বোঝানো হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বহুবিধ। প্রথমত: রূপ, রূপত্বজাতি ও রূপবান দ্রব্য চাক্ষুষ

প্রত্যক্ষের বিষয়। দ্বিতীয়ত: সংখ্যাদি নববিধ গুণ যখন প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে আশ্রিত হয় তখন এই গুণগুলিও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তৃতীয়ত: ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে আশ্রিত হয় তখন এগুলিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয়।

অতঃপর গ্রন্থকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দুটি কারণ উল্লেখ করেছেন। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের দুটি সাধারণ কারণ হল আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ। উদ্ভূতরূপ যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ তা তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে তার সঙ্গে আলোকসংযোগও যে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ তা তিনি উল্লেখ করলেন। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ কারণ বলেই অন্ধকারে আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। আবার উদ্ভূত রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ বলেই পিশাচাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূত রূপ ও আলোকসংযোগ কিভাবে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যে থাকে। তাই দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপ ও আলোকসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। দ্রব্যে সমবেত রূপাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের আলোকসংযোগ ও উদ্ভূত রূপ স্বাশ্রয়সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। দ্রব্যে রূপাদি সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং দ্রব্যে উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাই উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগের সঙ্গে রূপাদির সম্পর্ক হল স্বাশ্রয়সমবায়।

দ্রব্যে সমবেত রূপাদিতে সমবেত রূপত্বাদি জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। রূপত্বাদি জাতি রূপত্বাদিতে সমবায় সম্বন্ধে, রূপাদিগুণ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে এবং উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগ দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই উদ্ভূতরূপ ও আলোকসংযোগের সঙ্গে রূপত্বাদির সম্বন্ধ হল স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়।

২.০৫.০৫ ■ স্পার্শন প্রত্যক্ষ

উদ্ভূতস্পর্শ স্পর্শত্বজাতি ও স্পর্শবান দ্রব্য স্পার্শন প্রত্যক্ষের বিষয় অতঃপর গ্রন্থকার বলেছেন রূপ ও রূপত্বাদি ভিন্ন যে সকল পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য তার সবগুলিই স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয়। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রূপ ও রূপত্বাদি জাতি ছাড়া সব কিছুই ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় কেবল রূপ ও রূপত্বজাতিকে গ্রহণ করতে পারে না।

সংখ্যাদি চতুর্দশগুণ এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় যেমন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় তেমনি আবার স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয়। সুতরাং দেখা যায় যে, ন্যায়মতে কেবলমাত্র দুটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। এই দুটি ইন্দ্রিয়ের একটি হল চক্ষু এবং অপরটি হল ত্বক্। বিশ্বনাথ অবশ্য অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা আত্মদ্রব্যের প্রত্যক্ষও স্বীকার করেন।

২.০৫.০৬ ■ মানসপ্রত্যক্ষ

জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, প্রযত্নাদি গুণসমূহ এবং তদাশ্রিত জাতিসমূহ মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। আত্মায় আশ্রিত যাবতীয় পদার্থ হল আন্তরবস্তু। মন একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়। আন্তরবস্তু কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য।

বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আন্তরবস্তুর প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। বিশ্বনাথের মতে সুখাদির আশ্রয়দ্রব্যরূপে আত্মারও মানসপ্রত্যক্ষ হয়। কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বলে আত্মাকে মনমাত্রের গোচর বলা হয়।

২.০৬.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

অব্যবহিত পূর্বক্ষণ

যে ক্ষণ কোন ক্ষণের দ্বারা ব্যবহিত নয় তাকেই অব্যবহিত পূর্বক্ষণ বলে। কোন কার্যের উৎপত্তির পূর্ববর্তী প্রথম ক্ষণকে ঐ কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণ বলা হয়।

অব্যাপ্যবৃত্তি

যা নিজের অধিকরণের সর্বাংশে ব্যাপ্ত থাকে না, তাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা হয়। শব্দ আকাশের গুণ, আকাশ শব্দের অধিকরণ। কিন্তু এই অধিকরণের সর্বাংশেই শব্দ থাকে না, কোন এক অংশেই শব্দ থাকে। এই কারণেই শব্দকে আকাশের অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ বলা হয়। ন্যায় বৈশেষিক মতে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ। ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, অদৃষ্ট, ভাবনা, শব্দ, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুলি হল অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। কোন বৃক্ষের সঙ্গে যখন একটি বাঁদরের সংযোগ হয়, তখন বৃক্ষের কোন একটি অবচ্ছেদেই সংযোগ হয়, বৃক্ষের সর্বাংশেই সংযোগ হয় না। বৃক্ষ তাই একই সঙ্গে সংযোগ ও সংযোগাভাবের অধিকরণ হয়।

অব্যাপ্তি দোষ

ব্যাপ্তির অভাব হল অব্যাপ্তি। যার লক্ষণ নিরুপণ করা হয় তাকে বলা হয় লক্ষ্য। লক্ষণ হল লক্ষ্যের সেই অসাধারণ ধর্ম যা সমস্ত লক্ষ্যে ব্যাপ্ত থাকে। কিন্তু যা লক্ষ্যের কোন কোন অংশে থাকে, আবার কোন কোন অংশে থাকে না, তাকে যথার্থ লক্ষণ বলা যায় না। যখন কোন অসাধারণ ধর্ম কোন কোন লক্ষ্যে থাকে আবার কোন কোন লক্ষ্যে থাকে না তখন লক্ষ্যে লক্ষণের সমন্বয় হয় না। লক্ষণের এই ধরনের দোষকে অব্যাপ্তি বলা হয়। কবিত্বকে মানুষের লক্ষণ বলা হলে এই ধরনের দোষ দেখা দেয়।

অতিব্যাপ্তি

লক্ষ্যকে অতিক্রম করে যে ব্যাপ্তি তাকে বলে অতিব্যাপ্তি। যা লক্ষণের লক্ষ্য নয় তাতে যদি লক্ষণের সমন্বয় হয় তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। লক্ষণের নিয়ম হল লক্ষ্যে সমন্বয় এবং অলক্ষ্যে অসমন্বয়। লক্ষ্যের সর্বাংশে সমন্বয়ের অভাব যেমন দোষাবহ তেমনি অলক্ষ্যে সমন্বয়ও দোষাবহ। শৃঙ্গত্বকে যদি গরুর লক্ষণ বলা হয় তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ শৃঙ্গত্ব যেমন গরুর আছে তেমনি গরু ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীতেও আছে।

অসম্ভব দোষ

লক্ষ্যের কোন অংশেই লক্ষণের সম্ভাবনা না থাকলে লক্ষণের যে দোষ হয় তাকে অসম্ভব দোষ বলে। একক্ষুরত্বকে যদি গরুর লক্ষণ বলা হয় তাহলে ঐ লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। অশ্বেরই একক্ষুরত্ব আছে। কোন গরুরই একক্ষুরত্ব নেই।

উদ্ভূতরূপ

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্যরূপ। প্রদীপরশ্মির রূপ উদ্ভূতরূপ। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ অনুদ্ভূত। আবার উষ্ণ জলে স্পর্শ উদ্ভূতগুণ কিন্তু রূপ অনুদ্ভূত।

পরিমাণ

মান পরিমিতি ব্যবহারের কারণই হল পরিমাণ। পরিমাণ চতুর্বিধ অনুপরিমাণ, হ্রস্ব পরিমাণ, মহৎ পরিমাণ এবং দীর্ঘ বা পরমহৎ পরিমাণ। পরমাণুর পরিমাণ অনুপরিমাণ। প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর পরিমাণ হল মহৎপরিমাণ। ত্রসরেণু থেকে পরিমাণ শুরু হয়। সর্বব্যাপী পরিমাণ হল পরমমহৎ পরিমাণ বা বিভূপরিমাণ। আত্মা আকাশ প্রভৃতির পরিমাণ হল বিভূপরিমাণ।

২.০৭.০০ ■ সারাংশ

গ্রন্থকার আত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বুদ্ধির বিভাগ নির্দেশ করেছেন। বুদ্ধি দুই প্রকার : অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি আবার চার প্রকার : প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ বা শব্দজ। এই চার প্রকার অনুভূতির চতুর্বিধ করণ বর্তমান। এই চতুর্বিধ করণ হলো : প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

বিশ্বনাথ প্রথমে প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করতে মুক্তাবলীতে বলেছেন—'ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানম্ প্রত্যক্ষম্।" অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানকে বলা হয় প্রত্যক্ষজ্ঞান। যদিও মনোরূপ ইন্দ্রিয় সর্ববিধ জ্ঞানেরই কারণ তথাপি যে জ্ঞানে মন ইন্দ্রিয়রূপে কারণ হয়, সেই জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষের উপরিউক্ত লক্ষণ জন্যপ্রত্যক্ষের লক্ষণ। ঈশ্বরের নিত্যপ্রত্যক্ষ এই লক্ষণের লক্ষ্য নয়। ন্যায়মতে ঈশ্বর সর্ববিষয়ের দ্রষ্টা। কিন্তু ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় স্বীকৃত নয়। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকে তাই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা যায় না। প্রদত্ত লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ আশঙ্কাপূর্বক গঙ্গেশ উপাধ্যায় জ্ঞানাকরণক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেছেন (জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানমিতি তু বয়ম্)। অর্থাৎ যে জ্ঞানে অন্য কোন জ্ঞান (পূর্বলব্ধ জ্ঞান) করণ হয় না তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান, উপমিতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাব্দবোধের ক্ষেত্রে পদজ্ঞান করণরূপে বিবেচিত। কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াদিই করণ, কোন জ্ঞান করণ হয় না। ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের করণমাত্র, নিজে জ্ঞান নয়। ন্যায়সম্প্রদায় প্রত্যক্ষের একটি জাতি ঘটিত লক্ষণও নির্দেশ করেছেন। জাতিঘটিত লক্ষণ অনুযায়ী প্রত্যক্ষত্বজাতিমত্বই প্রত্যক্ষের লক্ষণ। অর্থাৎ যে জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব জাতি বর্তমান তাই প্রত্যক্ষজ্ঞান। উপরিউক্ত প্রত্যক্ষের যে সকল লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে 'ইন্দ্রিয়জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এই লক্ষণটি কেবলমাত্র জন্যপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়ায় এই লক্ষণটিকে প্রত্যক্ষসাধারণের সন্তোষজনক লক্ষণ বলা যায় না। সেই তুলনায় 'জ্ঞানাকরণং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্' এই লক্ষণটি সন্তোষজনক। এই লক্ষণটি একাধারে জন্যপ্রত্যক্ষ ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষের লক্ষণ হওয়ায় কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা নেই। বিকল্প লক্ষণ হিসাবে, ''প্রত্যক্ষত্বজাতিমত্ত্বং প্রত্যক্ষত্বং'' এই লক্ষণটিকেও প্রত্যক্ষের সন্তোষজনক লক্ষণ বলা যায়।

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্তী ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের পরক্ষণেই বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যবর্তী হওয়ায় সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের (ফল) অব্যবহিত পূর্ববর্তী। একমতে তাই সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের করণ। কিন্তু অন্যমতে ব্যাপারবৎ কারণ করণ হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ হল প্রত্যক্ষের প্রতি ব্যাপার এবং এই ব্যাপারবান ইন্দ্রিয়ই হল প্রত্যক্ষের করণ।

বিশ্বনাথ অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে অনুমিতির একাধিক লক্ষণ উল্লেখ করেছেন। এই লক্ষণগুলি হল—

১। পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ।

২। পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কং যজ্‌জ্ঞানম্‌ তদেবানুমিতিঃ।

৩। পরামর্শজন্যং হেত্ববিষয়কংযজ্‌জ্ঞানম্‌ তাদৃশ জ্ঞান বৃত্ত্যনুভবত্বব্যাপ্য জাতিমত্ত্বম্‌ অনুমিতিত্বম,

৪। ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ,

৫। বস্তুতো যাং কাঞ্চিৎ অনুমিতিব্যক্তিমাদায় তদ্‌ব্যক্তিবৃত্তিপ্রত্যক্ষাবৃত্তিজাতিমত্ত্বম্‌ অনুমিতিত্বং।

অনুমিতিকে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণক জ্ঞানও বলা যেতে পারে। যে জ্ঞানের করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান সেই জ্ঞানই অনুমিতি। নব্যমতে অনুমিতিতে যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শ জ্ঞানকে ব্যাপার করে করণ হয় সেই হেতু সকল অনুমিতিই ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকজ্ঞান। সুতরাং অনুমিতির এই লক্ষণকে এক অর্থে নির্দোষ লক্ষণ বলা যেতে পারে। যে কোনো একটি অনুমিতি ব্যক্তিকে গ্রহণ করে সেই অনুমিতি ব্যক্তিতে বৃত্তি অথচ প্রত্যক্ষাদিতে অবৃত্তি যে অনুমিতিত্ব জাতি সেই জাতিমত্ত্বই হল অনুমিতির লক্ষণ। অনুমিতির এই লক্ষণটিকেও সন্তোষজনক লক্ষণ বলে মনে হয়। নব্য নৈয়ায়িকদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায় জ্ঞায়মান লিঙ্গ ও লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলে স্বীকার করেননি। তিনি বলেন ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণ হল করণ। ব্যাপারবৎ অসাধারণ কারণরূপে তিনি ব্যাপ্তিজ্ঞানকেই অনুমিতির করণ বলেছেন। অর্থাৎ অনুমিতির করণ নব্য নৈয়ায়িকদের মতে ব্যাপ্তি জ্ঞান। বিশ্বনাথও মুক্তাবলীতে সেই মতকে সমর্থন করেছেন। সুতরাং বিশ্বনাথের মতে অনুমিতির করণ হল ব্যাপ্তিজ্ঞান।

প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির লক্ষণ নিরূপণান্তে গ্রন্থকার জন্যপ্রত্যক্ষের বিভাগ নির্দেশ করেছেন। জন্যপ্রত্যক্ষের এই বিভাগ ইন্দ্রিয়ের বিভাগ অনুসারী। ন্যায়মতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ ও মন এই ছয়টি ইন্দ্রিয়। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্‌ বহিরিন্দ্রিয় ও মন অন্তরিন্দ্রিয়। এই ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় থেকে ছয় প্রকার জন্যপ্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এগুলি হল যথাক্রমে; চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, রাসন, স্পার্শন ও মানস। বলাবাহুল্য, প্রত্যক্ষের এই বিভাগ ইন্দ্রিয় অনুসারেই করা হয়েছে। কোন্‌ কোন্‌ বিষয় কোন্‌ কোন্‌ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য তার বিবরণ দিয়েছেন। প্রথমে তিনি কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই তিন প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন, শব্দ ও শব্দত্বাদিজাতি শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। শব্দ ও শব্দত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল শ্রাবণ প্রত্যক্ষ। অনুরূপভাবে গন্ধ ও গন্ধত্বাদিজাতি

হল নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। গন্ধ ও গন্ধত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ। সেইরূপ রস ও রসত্বাদিজাতি রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বিষয়। রস ও রসত্বাদিজাতির প্রত্যক্ষ হল রাসন প্রত্যক্ষ। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বহুবিধ। প্রথমত : রূপ, রূপত্বজাতি ও রূপবান দ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয়। দ্বিতীয়ত : সংখ্যাদি নববিধ গুণ যখন প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে আশ্রিত হয় তখন এই গুণগুলিও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। তৃতীয়ত : ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে আশ্রিত হয় তখন এগুলিও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। উদ্ভূতস্পর্শ স্পর্শত্বজাতি ও স্পর্শবান দ্রব্য স্পার্শন প্রত্যক্ষের বিষয় অতঃপর গ্রন্থকার বলেছেন রূপ ও রূপত্বাদি ভিন্ন যে সকল পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য তার সবগুলিই স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয়। অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে রূপ ও রূপত্বাদি জাতি ছাড়া সব কিছুই ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয়ের মধ্যে ত্বগিন্দ্রিয় কেবল রূপ ও রূপত্বজাতিকে গ্রহণ করতে পারে না। জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, প্রযত্নাদি গুণসমূহ এবং তদাশ্রিত জাতিসমূহ মানস প্রত্যক্ষের বিষয়। আত্মায় আশ্রিত যাবতীয় পদার্থ হল আন্তরবস্তু। মন একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়। আন্তরবস্তু কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য।

২.০৮.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

a) What is *artha*?

b) Which are the *indriya-s*?

c) What is the meaning of the term *indriya*?

d) What is the *karaṇa* of *pratyakṣa* according to Viśvanātha?

e) State the definition of *pratyakṣa* given by Gautama?

f) What is the meaning of the term *anumāna*?

g) What are the different type of *anumiti* ?

h) What is the *karana* of *anumiti* according to Viśvanātha?

i) What is the *vyāpāra* of *anumiti* according to Viśvanātha?

j) What is the *vyāpāra* of *pratyakṣa* according to Viśvanātha?

k) What are the *indriya-s* by Which we can perceive *dravya?*

l) What are the objects that we perceive by visual sense-organ?

m) What are the objects of tactual perception?

n) What do we perceive by *manas*?

o) Can self be perceived according to Viśvanātha?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

1. Define perception after Siddhāntamuktāvali.
2. (a) State the different definition of perception discussed by Viśvanātha in Siddhāntamuktāvali.

   (b) What definition do you think satisfactory? Explain.
3. State and explain the definitions of *pratyakṣa* given by Viśvanātha.
4. State and explain different definitions of *anumiti* discussed in Siddhāntamuktāvali.
5. Define *anumiti* after Viśvanātha. What is the *karaṇa* of *anumiti* according to Viśvanātha? Explain.
6. Explain different types of *laukika pratyakṣa* after Viśvanātha.

২.০৯.০০ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন,
রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন,
পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন,
গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন
নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন,
আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৬। ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭। Bhāṣāpariccheda, Swami Mādhabānanda.

৮। Perception, B. K. Matilal.

একক - ৩

বিষয়-সূচী

৩.০০.০০ ভূমিকা

৩.০১.০০ বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ

৩.০২.০০ ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ

৩.০৩.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

৩.০৪.০০ সারাংশ

৩.০৫.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৩.০৬.০০ গ্রন্থপঞ্জী

৩.০০.০০ ■ ভূমিকা

পূর্ববর্তী এককে বলা হয়েছে যে, রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ— এই চারটি গুণ যখন উদ্ভূত হয় তখনই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। তবে এই উদ্ভূত গুণ চতুষ্টয় যখন মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবেত থাকে তখনই তারা প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতিও মহৎ পরিমাণ কারণ। ত্রসরেণু পরিমাণের সদৃশ বা ততোধিক পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্যকে বলা হয় মহৎ দ্রব্য। জন্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি মহৎপরিমাণ অন্যতম সাধারণ কারণ। বস্তুতঃ কোন গুণ নিরাশ্রয় অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। কোন না কোন দ্রব্যে আশ্রিত হয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এর জন্য গুণকে যেমন উদ্ভূত হতে হয় তেমনি তার আশ্রয়দ্রব্যকে মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হতে হয়। জ্ঞানাদি আন্তর গুণের ক্ষেত্রে আত্মার পরম মহৎপরিমাণ কারণ। এখন প্রশ্ন হল, বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দ্রব্যের মহৎ পরিমাণ ছাড়াও অন্য কোন কারণের অপেক্ষা থাকে কি? ন্যায়মতে বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দ্রব্যের মহৎপরিমাণ ছাড়াও গুণের উদ্ভূতত্ব কারণ হয়। এখন প্রশ্ন হল, বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের কোন গুণের উদ্ভূতত্ব প্রয়োজন হয়? এখানে উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র চক্ষু ও ত্বক্ এই দুটি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কোন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষু দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নিয়ামক এবং ত্বক্ দ্রব্যের স্পার্শন প্রত্যক্ষের নিয়ামক। সুতরাং বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতস্পর্শ। মতান্তরে আত্মায় অবৃত্তি শব্দভিন্ন বিশেষগুণবত্বই বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ। এ বিষয়ে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সঙ্গে নব্যনৈয়ায়িকদের মতান্তর ঘটেছে। এই মতান্তর ও তার পর্যালোচনাই এই এককের আলোচ্য বিষয়।

৩.০১.০০ ■ বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ

ন্যায় মতে দুটি মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এই দুটি

ইন্দ্রিয়ের একটি হল চক্ষুরিন্দ্রিয় এবং অন্যটি হল ত্বগিন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপবান দ্রব্য, দ্রব্যত্ব জাতি, দ্রব্যের রূপ ও রূপত্বের প্রত্যক্ষ হয়। আর ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শবান দ্রব্য, দ্রব্যত্ব জাতি, স্পর্শ ও স্পর্শত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয়। নৈয়ায়িকগণ বলেন কেবল এই দুটি ইন্দ্রিয়ই বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষে সক্ষম। অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। এখন স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে কোন সাধারণ কারণ আছে কি?

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপকে সাধারণ কারণ বলেন। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূত রূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়ে থাকে। যে সমস্ত পদার্থে অনদ্ভূতরূপ থাকে তাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। আলোকসংযোগকেও প্রাচীনগণ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণ রূপে স্বীকার করেছেন। উদ্ভূতরূপের ন্যায় আলোকসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যে বর্তমান থাকে। ন্যায়মতে যে সকল দ্রব্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়, সেই সকল দ্রব্যে আলোকসংযোগও উদ্ভূত রূপের সমানাধিকরণ হয়ে থাকে। এই সমানাধিকরণের ফলে আলোকসংযোগ ও উদ্ভূতরূপকে দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

অন্যদিকে উদ্ভূত স্পর্শ ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের কারণ। উদ্ভূত স্পর্শবান দ্রব্য ও উদ্ভূত স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। ন্যায়মতে রূপ ও রূপত্বাদি ভিন্ন যা কিছু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় তা ত্বগিন্দ্রিয়েরও বিষয় হয়ে থাকে। তাই সংখ্যাদি একদিকে যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য তেমনি অপরদিকে ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু প্রাচীনগণ মনে করেন যে কেবল উদ্ভূত স্পর্শ ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের কারণ নয়, উদ্ভূতরূপও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের কারণ। অর্থাৎ উদ্ভূতরূপ বহিরিন্দ্রিয়জন্য রূপবান ও স্পর্শবান দ্রব্যের প্রত্যক্ষে সাধারণ কারণ। রূপবান দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যেমন উদ্ভূতরূপ কারণ হয় তেমনি স্পর্শবান দ্রব্যের প্রত্যক্ষেও উদ্ভূতরূপ কারণ হয়। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ মনে করেন যে, চক্ষুরিন্দ্রিয় বা ত্বগিন্দ্রিয় যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বাহ্য দ্রব্য প্রত্যক্ষ করা হোক না কেন উদ্ভূতরূপ তার কারণ হয়।

প্রাচীন ন্যায়মতে উদ্ভূতরূপ তৈজসদ্রব্যের বিশেষ গুণ। এই গুণ তৈজসদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন একটি ঘটকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন ঐ প্রত্যক্ষের প্রতি অন্যতম কারণ হল ঘটনিষ্ঠ উদ্ভূতরূপ। অনুরূপভাবে ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে যখন কোন ঘটকে আমরা প্রত্যক্ষ করি তখনও তার কারণ হল ঘটনিষ্ঠ উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতস্পর্শ। উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ্-প্রত্যক্ষ উভয় প্রকার দ্রব্যপ্রত্যক্ষের কারণ হওয়ায় উদ্ভূতরূপকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণরূপে বিবেচনা করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপকে কারণ বলা হয় কেন? ত্বাচ্-প্রত্যক্ষে উদ্ভূতরূপের কারণতা কোনভাবেই পরিলক্ষিত হয় না। ত্বাচ্-প্রত্যক্ষে যদি উদ্ভূতরূপের কারণতা থাকত তাহলে অন্ধব্যক্তির পক্ষে ত্বাচ্প্রত্যক্ষ কোনভাবেই সম্ভব হত না। অন্ধ ব্যক্তি তো রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কিন্তু অন্ধব্যক্তি তো ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে দ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। নব্য-নৈয়ায়িকগণ অবশ্য ভিন্ন যুক্তিতে উক্ত প্রাচীন মতের বিরোধিতা করেছেন।

নব্য-নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, যে কোন বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই উদ্ভূতরূপকে কারণ বলা হলে

অনুভব-বিরোধ দেখা দেয়। তাই যে কোন বাহ্যদ্রব্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতরূপকে কারণ বলা যাবে না। বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতরূপের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অন্বয় ও ব্যতিরেক থাকায় উদ্ভূতরূপ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়। আবার বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতস্পর্শের সঙ্গে ত্বাচ্প্রত্যক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেকে থাকায় উদ্ভূতস্পর্শকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের কারণ বলতে হয়। দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ হতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ হতে পারেনা। যদি তা হতো, তাহলে বায়ুতে রূপ না থাকায় বায়ুতে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হতে পারত না। তাই ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতরূপকে কারণ না বলে, উদ্ভূতস্পর্শকে কারণ বলতে হবে। তাহলে ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষও উপপন্ন হবে, আবার বায়ুর ত্বাচ্ প্রত্যক্ষও উপপন্ন হবে। তাই নব্যমতে বাহ্যদ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ এবং বাহ্যদ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতস্পর্শ কারণ। বাহ্যদ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতস্পর্শ কারণ নয় এবং বাহ্যদ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ নয়।

প্রাচীন মতে বায়ু প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। সুতরাং তাদের নিকটে কোন অনুভব-বিরোধের প্রশ্ন নেই। প্রাচীনপন্থীগণ আবার নব্যমতের বিরুদ্ধে গৌরব দোষের আপত্তি তুলেছেন। নব্যমতে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপকে কারণ বলায় এবং ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত স্পর্শকে কারণ বলায় বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রতক্ষের দুটি ভিন্ন কার্য-কারণভাব স্বীকৃত হয়েছে এবং তার ফলে নব্যমত গৌরব দোষে দুষ্ট হয়েছে। কাজেই প্রাচীনমতে দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের প্রতিই উদ্ভূতরূপকে কারণ বলে মানতে হবে। এইভাবে প্রাচীনগণ গৌরব পরিহার করে লাঘবনীতিকে সমর্থন করেছেন।

নব্যনৈয়ায়িকগণ এর উত্তরে বলেছেন যে, লাঘবনীতি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য; তবে তা অনুভবের বিরোধিতা করে নয়। উদ্ভূতরূপকে দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ উভয়ের প্রতিই কারণ বললে বায়ুর ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না, কেননা বায়ুতে রূপ নেই। অথচ 'বায়ুকে স্পর্শ করছি'--এই প্রকার অনুভব আমাদের হয়। কাজেই উদ্ভূতরূপকে ত্বাচ্প্রত্যক্ষের কারণ বললে অনুভব বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ পরিহার করার জন্য কেবল উদ্ভূতস্পর্শকে দ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের কারণ বলে মানতে হবে এবং উদ্ভূতরূপকে কেবল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ বলে মানতে হবে। এইভাবে দুটি ভিন্ন কার্যকারণভাব স্বীকার করতে হয়। এতে যদি গৌরব হয়, তবে সেই গৌরব দোষনীয় নয়, কারণ তা অনুভবানুসারী। অনুভবানুসারী গৌরব দোষাবহ হতে পারে না। বরং অনুভববিরোধী লাঘবই দোষনীয়। অতএব বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষে দুটি ভিন্ন কার্য-কারণ ভাব স্বীকার করাই শ্রেয়।

নব্যনৈয়ায়িকগণ আরো বলেন যে, যদি লাঘবযুক্তিতে রূপকে বা উদ্ভূতরূপকে যে কোন বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বলা হয় তাহলে ঐ একই যুক্তিতে উদ্ভূত স্পর্শকেই বা বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ) সাধারণ কারণ বলা হবে না কেন?

এর বিরুদ্ধে প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উদ্ভূতস্পর্শকে চাক্ষুষ ও ত্বাচ্ এই উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের কারণ বললে প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ উপপন্ন হবে না। কেননা প্রভায় উদ্ভূতস্পর্শ থাকে না। অথচ প্রভাকে দেখছি, এই প্রকার অনুভব আমাদের হয়ে থাকে। প্রভায় উদ্ভূতরূপ আছে, কিন্তু উদ্ভূতস্পর্শ নেই। কাজেই উদ্ভূতস্পর্শকে

উভয় প্রকার বাহ্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ বললে প্রভার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না। তাই বলতে হবে উদ্ভূতরূপই বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ।

নব্য নৈয়ায়িকগণ অবশ্য এ কথা অস্বীকার করেন না যে, কেবল উদ্ভূতস্পর্শকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ বলা হলে প্রভার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে উদ্ভূতরূপ ভিন্ন যেমন প্রভার প্রত্যক্ষ হয় না তেমনি উদ্ভূতস্পর্শ ব্যতীত বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না। তাই বলতে হবে যে দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ, এবং ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতস্পর্শ কারণ। কোনটিই এককভাবে কারণ নয়। তাই উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের একটি মাত্র কারণ স্বীকার করা যায় না।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তই নিঃসৃত হয় যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কোন সাধারণ কারণ নাই। বাহ্যদ্রব্যের চাক্ষুষ ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন রকমের কারণ স্বীকার করতে হবে। বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষমাত্রের কারণ বলা যায় না। ন্যায়মতে আকাশ, কাল, দিক্, মন, পরমাণুসমূহ ও দ্ব্যণুকসমূহ আদৌ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। আত্মা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য হলেও তা বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়; অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হতে পারে। সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য বলতে কেবল মাত্র মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি দ্রব্যকেই বোঝায়। এর মধ্যে প্রাচীন ন্যায়মতে বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, কিন্তু নব্যমতে বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। এখন বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের যদি কোন সাধারণ কারণ স্বীকার করা না হয় তাহলে উল্লিখিত কিছু দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ কেন হয় আবার কিছু দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ কেন হয় না তা ব্যাখ্যাত হয় না। বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে যে কারণকূটের উপস্থিতি প্রয়োজন সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সেইসব কারণকূট যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের অপ্রত্যক্ষের হেতু বোঝা যায় না। মূল কথা এই যে, কারণাভাবেই কার্যাভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ায় একটি সাধারণ কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন। ঐ দ্রব্যগুলির কোনটিরই যদি উদ্ভূতরূপ না থাকে তবে উদ্ভূতরূপকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ বললে কার্য-কারণভাবের কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু বায়ুর ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ অনুপপন্ন হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, প্রাচীন নৈয়ায়িক ও নব্যনৈয়ায়িকদের মধ্যে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ বিষয়ে যে মত পার্থক্য ঘটেছে তা নিম্নরূপ :

প্রাচীন মত

(ক) বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ হল উদ্ভূতরূপ।

(খ) বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়।

(গ) উদ্ভূতস্পর্শকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ বলা যায় না।

(ঘ) উদ্ভূতস্পর্শকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ বলা হলে প্রভার প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না।

নব্যমত

(ক) বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য।

(খ) বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের দুটি ভিন্ন কারণ স্বীকার্য।

(গ) বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ।

(ঘ) বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষে উদ্ভূতস্পর্শ কারণ।

(ঙ) উদ্ভূতরূপকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ বলা হলে বায়ুর প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না।

এখন প্রশ্ন হল, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কি তাহলে কোন সাধারণ কারণ নেই? নব্যনৈয়ায়িকগণ অবশ্য বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের একটি বিকল্প সাধারণ কারণ অনুসন্ধান করেছেন। বিশ্বনাথ ঐ বিকল্প সাধারণ কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষমাত্রের কারণ হল আত্মার অবৃত্তি শব্দভিন্ন বিশেষগুণবত্ত্ব। অর্থাৎ, যে দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হবে, সেই দ্রব্যে একটি বিশেষ গুণ থাকবে। যেমন, চক্ষুর দ্বারা ঘটের প্রত্যক্ষ হয় এর কারণ ঐ ঘটে 'রূপ' নামক একটি বিশেষ গুণ আছে। ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের দ্বারা বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় তার কারণ বায়ুতে 'স্পর্শ' নামক একটি বিশেষ গুণ আছে।

কিন্তু বিশেষ গুণ থাকলেই যদি ঐ দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় তাহলে আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? আকাশে 'শব্দ' নামক বিশেষ গুণ আছে, কিন্তু তবুও আকাশকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। এই কারণে বিশ্বনাথ বলেছেন যে, ঐ বিশেষ গুণটি শব্দ ভিন্ন হবে।

অবার শব্দভিন্ন বিশেষ গুণ থাকলেই যদি ঐ দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় তাহলে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না কেন? আত্মায় জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা ইত্যাদি বিশেষ গুণ আছে এবং ঐ গুণগুলি শব্দভিন্নও বটে। কিন্তু তবুও আত্মাকে বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না।

এর উত্তরে বিশ্বনাথ বলেছেন যে, ঐ শব্দভিন্ন বিশেষ গুণটি আত্মায় অবৃত্তি হবে অর্থাৎ আত্মবৃত্তি হবে না। কিন্তু জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি গুণগুলি আত্মবৃত্তি হওয়ায় অর্থাৎ আত্মায় অবৃত্তি না হওয়ায় বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কাজেই বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষমাত্রের সাধারণ কারণ হল আত্মায় অবৃত্তি শব্দ ভিন্ন বিশেষগুণবত্ত্ব।

৩.০২.০০ ■ ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ

ন্যায়মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ। এই জ্ঞান অবশ্য অনিত্য জীবের জ্ঞান। ঈশ্বরের জ্ঞান ন্যায়মতে নিত্য ও অকারণ। এই ন্যায়মত প্রকাশ করতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন

মুক্তাবলীতে বলেছেন, ''ত্বংমনঃসংযোগোজ্ঞানসামান্যকারণমিত্যর্থঃ।'' সুষুপ্তি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রমাণ। ত্বংমনঃসংযোগ ব্যতীত যে জীবের কোন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না তা গ্রন্থকার ত্বংমনঃসংযোগ ও জ্ঞানের মধ্যে অন্বয়-ব্যতিরেক প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকে এবং আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এটি হল ত্বংমনঃসংযোগ ও জ্ঞানের অন্বয় দৃষ্টান্ত। সুষুপ্তিকালে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের কোন সংযোগ থাকে না এবং জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এটি হল ত্বংমনঃযোগ ও জ্ঞানের ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত। ন্যায়মতে সুষুপ্তিকালে মন পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থান করে। তাই তখন মনের সঙ্গে ত্বগিন্দ্রিয়ের আর সংযোগ হয় না। এইরূপে অন্বয়ব্যতিরেকের সাহায্যে বলা যেতে পারে যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ। একথা ঠিক যে, ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞানের একমাত্র কারণ হতে পারে না। ত্বংমনঃসংযোগ ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ বর্তমান। কিন্তু ঐ সকল সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ যেমন জাগ্রত অবস্থায় বর্তমান থাকে তেমনি সুষুপ্তিকালেও বর্তমান থাকে। একমাত্র ত্বংমনঃসংযোগই জ্ঞান ও জ্ঞানাভাব এই দুই অবস্থার জ্ঞানের কারণ-সামগ্রীর ব্যাবর্ত্তক। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ। উক্ত ন্যায়-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে, সুষুপ্তিতে শুধু ত্বংমনঃসংযোগ থাকে না, তাই নয় সুষুপ্তিতে ত্বংমনঃসংযোগ ব্যতীত জ্ঞানের অন্য কারণ সামগ্রীও থাকে না। ঐ সকল কারণ সামগ্রীর অভাবও জ্ঞানের অনুৎপত্তির কারণ হতে পারে।

জীবের বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞান হয়ে থাকে ঐ সব জ্ঞানের কারণ-সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন। ন্যায়মতে জ্ঞান দ্বিবিধ—অনুভব ও স্মৃতি। অনুভব যথার্থ ও অযথার্থ ভেদে দ্বিবিধ। যথার্থ অনুভব আবার চার প্রকার, প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। ত্বংমনঃসংযোগ ছাড়াও এসব বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানের জন্য বিভিন্ন কারণ অপেক্ষিত হয় যেমন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ প্রত্যক্ষের হেতু। এইরূপ সংযোগ সুষুপ্তিকালে থাকে না বলেই চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন করতে পারে না। আবার জ্ঞানাদির অভাবহেতু জ্ঞানের ও আত্মমনোসংযোগের অভাবহেতু আত্মার মানসপ্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। অনুরূপভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ অনুমিতি, সাদৃশ্যজ্ঞানের অভাববশতঃ উপমিতি পদজ্ঞানের অভাববশতঃ শাব্দবোধ হয় না। সংস্কারের উদ্‌বোধক না থাকায় স্মৃতিজ্ঞানও উৎপন্ন হতে পারে না। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের কারণসামগ্রীর অভাববশতই সুষুপ্তিতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন কারণকূটের অভাবই সুষুপ্তিতে জ্ঞানাভাবের কারণ, ত্বংমনোসংযোগের অভাব কারণ নয়। সুতরাং ত্বংমনঃসংযোগকে জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ বলার কোন যুক্তি নেই।

বিশ্বনাথ উক্ত আপত্তি খণ্ডনে বলেছেন, ''সুষুপ্তিপ্রাক্‌কালোৎপন্নমিচ্ছাদি ব্যক্তেস্তৎ সম্বন্ধেনাত্মনশ্চ প্রত্যক্ষত্ব প্রসঙ্গাৎ।'' অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সুষুপ্তির অব্যবহিত প্রাক্কালে উৎপন্ন ইচ্ছা বা জ্ঞানের এবং তৎসঙ্গে জ্ঞাতা বা আত্মার প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। বক্তব্য এই যে, ন্যায়মতে বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর ঐ জ্ঞান অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় হয়। জ্ঞানের জ্ঞানকে বলা হয় অনুব্যবসায়। ন্যায়মতে একমাত্র নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় হয় না। অন্যান্য জ্ঞান উৎপত্তির পর অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। সুষুপ্তির প্রাক্কালে

উৎপন্ন জ্ঞান যে নির্বিকল্পক জ্ঞান হবে এমন কোন কথা নেই। ঐ জ্ঞান যদি নির্বিকল্পক না হয় তাহলে তার অনুব্যবসায় হতে বাধা থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তির প্রাক্কালে উৎপন্ন জ্ঞানাদির বা আত্মার প্রত্যক্ষ কখনোই সুষুপ্তিকালে হয় না। সুতরাং আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন কারণ-সামগ্রীর অভাব নয়, ত্বংমনঃসংযোগের অভাবই সুষুপ্তিতে উক্ত জ্ঞানাদির ও আত্মার প্রত্যক্ষাভাবের হেতু।

পুনরায় আপত্তি উঠতে পারে যে, যদি ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ হয় তাহলে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হয় না কেন। ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের কারণ হওয়ায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে ত্বংমনঃসংযোগ থাকে এবং বিষয়ের সঙ্গে ত্বকের সংযোগও থাকে। বস্তুতঃ পৃথিব্যাদির সঙ্গে দেহস্থ ত্বকের সংযোগের কখনোই অভাব হয় না। সুতরাং যে কোনো বিষয়ের প্রত্যক্ষকালে ত্বংমনঃসংযোগ এবং ত্বক-বিষয়সংযোগ উপস্থিত থাকায় যে কোনো বিষয়ের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের আপত্তি দেখা দেয়।

ন্যায়-সম্প্রদায়ের দিক্ থেকে উক্ত আপত্তি দুভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে। বিশ্বনাথ এই দুটি বিকল্প উপায়েরই উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত : ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের কারণ হলেও চাক্ষুষদি প্রত্যক্ষকালে ঐ সকল প্রত্যক্ষের কারণ-সামগ্রী ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের কারণ সামগ্রীর থেকে বলবত্তর হওয়ায় সেই ক্ষণে ত্বাচ্-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না। ন্যায় মতে একক্ষণে একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না। যেক্ষেত্রে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় সেক্ষেত্রে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করে। ফলে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে আর ত্বাচ্-প্রত্যক্ষ হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত : পৃথিব্যাদি বিষয়ের সঙ্গে চর্মের সর্বদা সংযোগ থাকলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্বদা সংযোগ থাকে না। তাই ত্বংমনঃসংযোগ সর্বদা থাকলেও এবং চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে চর্মের সঙ্গে বিষয়ের যোগ থাকলেও, ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সর্বদা বিষয়ের সংযোগ থাকে না। ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হলে তবেই ত্বাচ্-প্রত্যক্ষ হতে পারে। ফলতঃ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের আপত্তি অর্থহীন। অতএব আমাদের স্বীকার করতে হয় যে সুষুপ্তিকালে ত্বংমনঃসংযোগের অভাবের ফলেই জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না।

উপরিউক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের প্রতি কারণ।

৩.০৩.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

বহিরিন্দ্রিয় :

ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় ছয়টি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি হল বহিরিন্দ্রিয়। মন অন্তরিন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়গুলি সবই জ্ঞানেন্দ্রিয় বা জ্ঞানের অনুমাপক। এর মধ্যে চক্ষু ও ত্বক্ এই দুটি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন দ্রব্যের গ্রাহক ইন্দ্রিয়।

দ্রব্য :

ন্যায়মতে যে পদার্থ গুণ ও কর্মের সমবায়িকারণ তাই দ্রব্য। দ্রব্য নয় প্রকার। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, কাল, দিক্, আত্মা ও মন হল নয় প্রকার দ্রব্য। এর মধ্যে ব্যোম্ বা আকাশ, কাল, দিক্ ও মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। আত্মা অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ—এই চার প্রকার দ্রব্যের পরমাণুসমূহ ও দ্ব্যণুকসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তদ্‌ভিন্ন ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চার প্রকার দ্রব্যের ত্রসরেণু প্রভৃতি অবয়বিদ্রব্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রাচীন ন্যায়মতে অবশ্য মরুৎ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। এই দ্রব্যগুলি বাহ্যদ্রব্য। বহিরিন্দ্রিয় চক্ষু ও ত্বক্ এই দুই প্রকার ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই এই দ্রব্যগুলি গ্রাহ্য হয়।

ত্বংমনঃসংযোগ :

ত্বংমনঃসংযোগ বলতে বোঝায় ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ। ন্যায়মতে যে কোনো প্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ। কেবল মাত্র সুষুপ্তি অবস্থায় ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের এই সংযোগ থাকে না। ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

বিশেষগুণ :

ন্যায়মতে দ্রব্য নয় প্রকার। প্রতিটি দ্রব্যই গুণের আশ্রয়। এই গুণগুলির কতকগুলি গুণ বিশেষ গুণ। বাকিগুলি সাধারণ গুণ। যে গুণগুলি একাধিক দ্রব্য থাকে তাকে সাধারণ গুণ বলে, যেমন, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি। অপরদিকে যে গুণগুলি কোন একটি মাত্র দ্রব্যে থাকে, অন্য দ্রব্যে থাকে না তাকে বলে বিশেষগুণ। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে কাল, দিক্ ও মন এই তিনটি দ্রব্যের কোন বিশেষগুণ থাকে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ ও আত্মা—এই ছয়টি দ্রব্যেরই বিশেষগুণ থাকে। এর মধ্যে পৃথিবীর বিশেষগুণ গন্ধ, জলের বিশেষগুণ রস, তেজের বিশেষগুণ রূপ, মরুতের বিশেষগুণ স্পর্শ, ব্যোমের বিশেষগুণ শব্দ এবং আত্মার বিশেষগুণ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি।

জ্ঞানসামান্য :

'জ্ঞানসামান্য' বলতে বোঝায় সর্বপ্রকার জ্ঞান। 'গো-সামান্য' বলতে যেমন বোঝায় যাবৎ গরু তেমনি 'জ্ঞানসামান্য' বলতে বোঝায় যাবৎ জ্ঞান। ন্যায়মতে যাবৎ জ্ঞানের সাধারণ কারণ হল ত্বংমনঃসংযোগ।

উদ্ভূতরূপ :

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য রূপকে বলা হয় উদ্ভূতরূপ। সব রূপই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। চক্ষুরিন্দ্রিয় নিজে তৈজস দ্রব্য। রূপ তৈজস দ্রব্যের বিশেষ গুণ। তৈজস দ্রব্যের বিশেষগুণ হিসাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ও রূপবান। কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ঐ রূপকে উদ্ভূতরূপ বলা যায় না। কিন্তু প্রদীপরশ্মির রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই ঐ রূপ হল উদ্ভূতরূপ।

৩.০৪.০০. ■ সারাংশ

ন্যায়মতে বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দ্রব্যের মহৎপরিমাণ ছাড়াও গুণের উদ্ভূতত্ব কারণ হয়। এখন প্রশ্ন হল, বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষে দ্রব্যের কোন গুণের উদ্ভূতত্ব প্রয়োজন হয়? এখানে উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র চক্ষু ও ত্বক্ এই দুটি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, অন্য কোন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় না। চক্ষু দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নিয়ামক এবং ত্বক্ দ্রব্যের স্পার্শন প্রত্যক্ষের নিয়ামক। সুতরাং বাহ্যদ্রব্য প্রত্যেক্ষের জন্য প্রয়োজন হয় উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতস্পর্শ। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উদ্ভূতরূপ হল বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতরূপের সঙ্গে চাক্ষুষ প্রত্যের অন্বয় ও ব্যতিরেক থাকায় উদ্ভূতরূপ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ হয়। আবার বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতস্পর্শের সঙ্গে ত্বাচ্প্রত্যক্ষের অন্বয়-ব্যতিরেক থাকায় উদ্ভূতস্পর্শকে বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের কারণ বলতে হয়। দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ হতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ হতে পারে না। যদি তা হতো, তাহলে বায়ুতে রূপ না থাকায় বায়ুতে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হতে পারত না। তাই ত্বাচ্ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে উদ্ভূতরূপকে কারণ না বলে, উদ্ভূতস্পর্শকে কারণ বলতে হবে। তাহলে ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষও উপপন্ন হবে, আবার বায়ুর ত্বাচ্ প্রত্যক্ষও উপপন্ন হবে। তাই নব্যমতে বাহ্যদ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ কারণ এবং বাহ্যদ্রব্যের ত্বাচ্প্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতস্পর্শ কারণ। প্রাচীন মতে বায়ু প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। সুতরাং তাদের নিকটে বায়ুর প্রত্যক্ষের কোন প্রশ্ন নেই।

উপরি উক্ত বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তই নিঃসৃত হয় যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের কোন সাধারণ কারণ নাই। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য বলতে কেবলমাত্র মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি দ্রব্যকেই বোঝায়। এর মধ্যে প্রাচীন ন্যায়মতে বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, কিন্তু নব্যমতে বায়ু প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। এখন বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষের যদি কোন সাধারণ কারণ স্বীকার করা না হয় তাহলে উল্লিখিত কিছু দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ কেন হয় আবার কিছু দ্রব্যের বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ কেন হয় না তা ব্যাখ্যাত হয় না। বহিরিন্দ্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষে যে কারণকূটের উপস্থিতি প্রয়োজন সেই সমস্ত দ্রব্যের ক্ষেত্রে সেইসব কারণকূট যদি উপস্থিত থাকে তাহলে তাদের অপ্রত্যক্ষ অহেতুক হয়ে পড়ে। মূলকথা এই যে, কারণাভাবেই কার্যাভাব সিদ্ধ হয়। সুতরাং উক্ত দ্রব্যগুলি প্রত্যক্ষগ্রাহ্য না হওয়ায় একটি সাধারণ কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন। বিশ্বনাথ বলেছেন আত্মায় অবৃত্তি শব্দভিন্ন বিশেষগুণবত্ত্বই সেই কারণ।

ন্যায়মতে ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীতে বলেছেন, ''ত্বংমনঃসংযোগোজ্ঞানসামান্যকারণমিত্যর্থঃ''। সুষুপ্তি এই সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রমাণ। ত্বংমনঃসংযোগ ব্যতীত যে জীবের কোন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না তা গ্রন্থকার ত্বংমনঃসংযোগ ও জ্ঞানের মধ্যে অন্বয়-ব্যতিরেক প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ থাকে এবং আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এটি হল ত্বংমনঃসংযোগ ও জ্ঞানের অন্বয় দৃষ্টান্ত। সুষুপ্তিকালে আমাদের ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের কোন সংযোগ থাকে না এবং জ্ঞানও উৎপন্ন হয় না। এটি

হল ত্বংমনঃসংযোগ ও জ্ঞানের ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত। ন্যায়মতে সুষুপ্তিকালে মন পুরীতৎ নাড়ীতে অবস্থান করে। তাই তখন মনের সঙ্গে ত্বগিন্দ্রিয়ের আর সংযোগ হয় না। এইরূপে অন্বয়-ব্যতিরেকের সাহায্যে বলা যেতে পারে যে, ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ। উক্ত ন্যায়-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে পারে যে, সুষুপ্তিতে শুধু ত্বংমনঃসংযোগ থাকে না, তাই নয় সুষুপ্তিতে ত্বংমনঃসংযোগ ব্যতীত জ্ঞানের অন্য কারণ সামগ্রীও থাকে না। ঐ সকল কারণ সামগ্রীর অভাবও জ্ঞানের অনুৎপত্তির কারণ হতে পারে। বিশ্বনাথ উক্ত আপত্তি খণ্ডনে বলেছেন, সেক্ষেত্রে সুষুপ্তির অব্যবহিত প্রাক্কালে উৎপন্ন ইচ্ছা বা জ্ঞানের এবং তৎসঙ্গে জ্ঞাতা বা আত্মার প্রত্যক্ষের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। পুনরায় আপত্তি উঠতে পারে যে, যদি ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের প্রতি কারণ হয় তাহলে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ হয় না কেন। ন্যায়-সম্প্রদায়ের দিক্ থেকে উক্ত আপত্তি দুভাবে খণ্ডন করা যেতে পারে। বিশ্বনাথ এই দুটি বিকল্প উপায়েরই উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত : ত্বংমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের কারণ হলেও চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে ঐ সকল প্রত্যক্ষের কারণ-সামগ্রী ত্বাচ্-প্রত্যক্ষের কারণ সামগ্রীর থেকে বলবত্তর হওয়ায় সেই ক্ষণে ত্বাচ্-প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয় : পৃথিব্যাদি বিষয়ের সঙ্গে চর্মের সর্বদা সংযোগ থাকলেও ত্বগিন্দ্রিয়ের সর্বদা সংযোগ থাকে না। তাই ত্বংমনঃসংযোগ সর্বদা থাকলেও এবং চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষকালে চর্মের সঙ্গে বিষয়ের যোগ থাকলেও, ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সর্বদা বিষয়ের সংযোগ থাকে না।

৩.০৫.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. What is the meaning of the term *'indriya'*?
2. By what sense-organs do we perceive substances?
3. By what sense-organs do we perceive external substances?
4. What are the objects of visual sense-organ?
5. What are the objects of tactual sense-organ?
6. What is the cause of cognition in general?
7. What is meant by *'tvaṁmanaḥsmyoga'*?
8. What is *susupti*?

9. What is *puritat nādi* ?

10. What is meant by *'jñānasāmāanya'*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

1. What are the sense-organs by which we perceive external substances? What is the cause of perception of substances by external sense-organs? Discuss.

2. Discuss the debate between Old-Nyāya and Navya-Nyāya regarding the perception of external substances.

3. How is self perceived? What is the cause of cognition in general? Discuss.

4. What is meant by *'jñānasāmāanya'*? What is *tvaṁmanaḥsmyoga*? What is the reason for holding that *tvaṁmanaḥsmyoga is the cause of jñānasāmāanya* ?

৩.০৬.০০ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

৪। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫। ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৬। ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭। Bhāṣāapariccheda, Swami Mādhabānanda.

৮। Perception, B. K. Matilal.

একক - ৪

বিষয়-সূচী

৪.০০.০০ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান

৪.০০.০১ ভূমিকা

৪.০০.০২ অবিশিষ্ট, বিশিষ্ট ও বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান

৪.০০.০৩ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয়

৪.০০.০৪ নির্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

৪.০১.০০ ইন্দ্রিয়

৪.০১.০১ ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ

৪.০২.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

৪.০৩.০০ সারাংশ

৪.০৪.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.০৫.০০ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০০.০০ ■ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ জ্ঞান

৪.০০.০১ ভূমিকা

ভাষা পরিচ্ছেদের ৫৭ কারিকায় গ্রন্থকার ষড়্‌বিধ প্রত্যক্ষের অন্তিম প্রকার মানস প্রত্যক্ষের সূচনা করতে বলেছেন, ''মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ''। অর্থাৎ মন নামক ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার যে বিশেষ গুণগুলির প্রত্যক্ষ হয় সেগুলি হল সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, মতি বা জ্ঞান এবং কৃতি বা যত্ন। তাছাড়া আত্মাও যে গ্রন্থকারের মতে মনোগ্রাহ্য তা তিনি পূর্ববর্তী কারিকাতেই বলেছেন। যদিও গ্রন্থকার এই কারিকায় সুখ-দুঃখাদির ন্যায় মতি বা জ্ঞানকেও অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারা গ্রাহ্য বলেছেন তথাপি পরের কারিকাতেই তিনি এক প্রকার জ্ঞানের কথা বলেছেন না মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় নয়। অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানকে মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় বলা হলেও সব জ্ঞান কিন্তু মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় নয়। যে জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয় না তার পারিভাষিক নাম 'নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ'। বলাই বাহুল্য, এর দ্বারা গ্রন্থকার সুপ্রচলিত ন্যায়সম্মত নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিভাগেরই সূচনা করেছেন।

ন্যায় সম্প্রদায় জ্ঞানকে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যদিও নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদ প্রত্যক্ষজ্ঞানের ভেদ, তথাপি এই প্রকার প্রত্যক্ষের ভেদকে জ্ঞানের ভেদও বলা যেতে পারে। অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দজ্ঞান সব সময় সবিকল্পক জ্ঞান। তাই নির্বিকল্পক জ্ঞান ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। একমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানই নির্বিকল্পক হতে পারে। শুধু তাই নয়, ভ্রম, সংশয়, তর্ক ও স্মৃতিরূপ অপ্রমা ও সবিকল্পক জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের এই বিশেষ ধরনের শ্রেণীকরণের দ্বারা সর্বপ্রকার জ্ঞানকে উক্ত দ্বিবিধ প্রকারের অন্তর্গত করা যায়। নির্বিকল্পক জ্ঞান বলতে আমরা সর্বদা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষজ্ঞানকেই বুঝব।

ন্যায়মতে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তবে এই মতে ইন্দ্রয়ার্থসন্নিকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ই যে একটি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা নয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের পরক্ষণেই আমাদের একটি বস্তুমাত্রের অপ্রকাশযোগ্য জ্ঞান হয়। প্রথম জ্ঞানটির ন্যায়সম্মত পারিভাষিক নাম হল নির্বিকল্পক এবং দ্বিতীয় জ্ঞানটির ন্যায়সম্মত পারিভাষিক নাম হল সবিকল্পক। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বা মুক্তাবলী টীকায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিশেষ আলোচনা করেন নি। তবে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেন অতীন্দ্রিয় তা তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা অনুধাবনের জন্য আমাদের প্রথমে অবিশিষ্ট, বিশিষ্ট এবং বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান সম্বন্ধে পরিচিতি দরকার।

৪.০০.০২ ■ অবিশিষ্ট, বিশিষ্ট ও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান

ন্যায়মতে জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক। বিষয়হীন কোন জ্ঞান হতে পারে না। জ্ঞানের এই বিষয় কখনো অবিশিষ্ট, কখনো বিশিষ্ট, আবার কখনো বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য প্রকারের হয়ে থাকে। যে বিষয়ের বিশেষণ থাকে তা জ্ঞানের বিশেষ্য, বিশেষ্য যে বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত থাকে তা বিশেষ্যর বিশেষণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব আপেক্ষিক। একটি জ্ঞানে যা বিশেষ্য, অপর জ্ঞানে তা বিশেষণ হতে পারে। দণ্ডত্ব বিশিষ্ট দণ্ডের জ্ঞানে দণ্ড বিশেষ্য, দণ্ডত্ব বিশেষণ আবার দণ্ডীপুরুষের জ্ঞানে পুরুষ বিশেষ্য দণ্ড বিশেষণ। যে জ্ঞানে বিষয় বিশেষণবিশিষ্ট বা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব রূপে প্রতিভাত হয় না তা অবিশিষ্ট। বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যকে বিশিষ্ট বলে, যেমন দণ্ডত্ব বিশিষ্ট দণ্ড। বিশেষণ যুক্ত বিশিষ্ট বা বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যকে বলে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য যেমন, দণ্ডীপুরুষ। ন্যায়মতে অবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান হল নির্বিকল্পক এবং বিশিষ্ট ও বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান হল সবিকল্পক জ্ঞান।

আক্ষরিক অর্থে 'নির্বিকল্পক' শব্দের অর্থ বিকল্প বর্জিত (বিকল্পকেভ্যঃ নির্মুক্তম্)। 'বিকল্প' পদটি এক অর্থে বিশেষণ বোধক এবং অপর অর্থে প্রকারবোধক। যদিও বিশ্বনাথ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ প্রকারকেই বিশেষণ বলেছেন (যঃ প্রকারঃ, স এব বিশেষণমিত্যুচ্যতে) তথাপি গঙ্গেশ প্রকারকে বিশেষণ ও উপলক্ষণ ভেদে দ্বিবিধ বলেছেন। বিশেষণ অর্থে দ্রব্য, নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি বিকল্পের সর্বপ্রকার সংসর্গ মুক্ত বা বর্জিত বিষয়ের জ্ঞানকেই নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয় (নিস্প্রকারকম্ জ্ঞানম্ নির্বিকল্পম্)। নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় যেহেতু সর্বপ্রকার বিশেষণের সংসর্গ মুক্ত সেহেতু এরূপ জ্ঞানকে সংসর্গানবগাহি বা বিশেষণ-

বিশেষ্য সম্বন্ধানবগাহি জ্ঞান বলা হয়। ন্যায়মতে পদার্থ যদিও উৎপত্তিক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন ক্ষণেই সর্বধর্ম বর্জিত হয় না তথাপি সর্বজ্ঞানেই যে ওই সকল ধর্মের কোনটি না কোনটি ভাসমান হয় তা নয়। সম্বন্ধ, অব্যক্ত জাতি ও অখণ্ডোপাধি সর্বদা ধর্মানবচ্ছিন্নরূপেই জ্ঞানে ভাসমান হয়। আবার নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন বিষয়ই ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে ভাসমান হয় না। ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে ভাসমান না হলে কোন বিষয়ের জ্ঞানকেই ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্যভাবে বলা যায়, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয় অবিশিষ্ট। বিষয়ের স্বরূপমাত্রই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়। শব্দের দ্বারা অবিশিষ্ট বস্তুর স্বরূপমাত্রের অভিলাপ কখনো সম্ভব নয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ তাই অনভিলাপ্য।

অপরদিকে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহি বা বিকল্পযুক্ত বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি বা বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য বিষয়ক জ্ঞানও যেহেতু বিকল্পযুক্ত বিষয়ের সংসর্গাবগাহি জ্ঞান সেহেতু এরূপ জ্ঞানকেও সবিকল্পক বলা হয়। বিষয় অনুযায়ী সবিকল্পক প্রত্যক্ষকে বিশিষ্টজ্ঞান, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যজ্ঞান, বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞান, সংসর্গাবগাহিজ্ঞান, বিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান প্রভৃতি রূপে বর্ণনা করা হয়। বস্তুর স্বরূপমাত্রাবগাহি নির্বিকল্পক জ্ঞানের পরক্ষণে যে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় তাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়, যথা, বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ। তাই সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয়তা হল বিশেষ্যতা, বিশেষণতা ও সংসর্গতা। ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের সবিকল্পক জ্ঞানকে ন্যায়ের পরিভাষায় বলা হয় ঘট বিশেষ্যক, ঘটত্ব প্রকারক এবং সমবায় সংসর্গক জ্ঞান। ঘটের বিষয়তা হল বিশেষ্যতা, ঘটত্বের বিষয়তা হল বিশেষণতা বা প্রকারতা এবং সমবায় সম্বন্ধের বিষয়তা হল সংসর্গতা। এরূপ জ্ঞান ভাষায় প্রকাশ করা যায় বা শব্দের দ্বারা অভিলাপ্য এবং এরূপ জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় হয়।

৪.০০.০৩ ■ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয়

ন্যায়মতে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয়। 'অতীন্দ্রিয়' বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ যা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। এখন দেখা যাক্, নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় কেন? নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলতে নির্বিকল্পক জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাই বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান যেমন বিষয়কে প্রকাশ করে তেমনি আবার অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়। ন্যায়মতে জ্ঞানের জ্ঞান হল মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলতে বোঝায় নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। মন হল মানসপ্রত্যক্ষের গ্রাহক ইন্দ্রিয়। যে জ্ঞান মনের দ্বারা গ্রাহ্য নয় সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। জ্ঞানের জ্ঞানকে বলে অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায় সব সময় প্রত্যক্ষাত্মক। কিভাবে জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিশ্বনাথ বলেছেন অনুব্যবসায় হল এক প্রকার বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান। কোন বিষয়ের যখন প্রথম জ্ঞান হয় তখন ওই জ্ঞানকে বলা হয় ব্যবসায়, যেমন একটি ঘটের জ্ঞান। ব্যবসায়ের অনন্তর ওই ব্যবসায়-বিষয়ক যে মানসপ্রত্যক্ষ হয় তাকে বলে অনুব্যবসায়, যেমন ঘটজ্ঞানের জ্ঞান (ঘটম্ অহম্ জানামি)। ঘটের ব্যবসায় জ্ঞানে ঘটটি বিশেষ্যরূপে, ঘটত্বটি ওই ঘটের বিশেষণরূপে এবং ঘট ও ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধটি সংসর্গরূপে ভাসমান হয়। ব্যবসায় জ্ঞানে যে যে পদার্থ জ্ঞানের বিষয় রূপে ভাসমান হয় অনুব্যবসায় জ্ঞানেও সেই সেই পদার্থ জ্ঞানের বিষয় হয়। ফলে, 'ঘটমহংজানামি' এইরূপ ঘটজ্ঞানের অনুব্যবসায়ে আত্মা বিশেষ্যরূপে, আত্মায় জ্ঞানটি, জ্ঞানে ঘটটি এবং ঘটে

ঘটত্বটি প্রকাররূপে ভাসমান হয়। আবার আত্মায় জ্ঞানের, জ্ঞানে ঘটের এবং ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধসমূহ সংসর্গরূপে ভাসমান হয়। তাই অনুব্যবসায় সব সময় বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে ধর্মপুরস্কারে বা প্রকারে একটি বিশেষ্যের জ্ঞান হয় তা ওই বিশেষ্যের বিশেষণ। বিশেষণের ধর্ম বা বিশেষণের বিশেষণকে বলে বিশেষণতাবচ্ছেদক। দণ্ডীপুরুষের ক্ষেত্রে দণ্ডত্ব এবং ঘটজ্ঞানের অনুব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঘট ও ঘটত্ব হল বিশেষণতাবচ্ছেদক। অনুব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বা যে কোন বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য বিষয়ক জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক জ্ঞান কারণ হয়। ঘটত্ব প্রকারক, ঘট বিশেষ্যক জ্ঞান পূর্বে না হলে 'আমি ঘটজ্ঞানবান' এইরূপ অনুব্যবসায় সম্ভব নয়। বিশেষণশূন্য নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন কিছুই বিশেষ্যরূপে বা বিশেষণরূপে ভাসমান হয় না। তাই নির্বিকল্পকের অনুব্যবসায়ে কোন বিশেষণতাবচ্ছেদক কারণ হয় না। কারণ ব্যতীত কার্য সম্ভব নয়। মোট কথা, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে যেহেতু ঘটত্বকে প্রকার ও ঘটকে বিশেষ্য করে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান হয় না, সেহেতু নির্বিকল্পক জ্ঞানের অনুব্যবসায় সম্ভব নয়। একমাত্র জাতি ও অখণ্ডোপাধিরই বিশেষণশূন্য জ্ঞান হয়। ঘট যখন জাতি বা অখণ্ডোপাধি নয় তখন আত্মাতে ঘটজ্ঞানের অনুব্যবসায়কালে তার বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটত্বকে অবশ্যই প্রকাররূপে ভাসমান হতে হয়। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে তা যখন হয় না তখন নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় স্বীকার করা যায় না।

৪.০০.০৪ ■ নির্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ

ন্যায়মতে প্রমাণ চতুর্বিধ, কোন বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। এখন প্রশ্ন হল, নির্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ কি? আমরা জানি যে, নির্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না। যে জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষ হয় না সে জ্ঞান স্বীকার করার পক্ষে আমাদের অন্য কোন প্রমাণ অনুসন্ধান করতে হয়। বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন চক্ষুসংযোগাদির অব্যবহিত পরে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট— এইরূপ বিশিষ্টজ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ ইতিপূর্বে ঘটত্ব বিশেষণের জ্ঞান থাকে না। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ। বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে থাকলে তবেই বিশেষণ বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে।

ন্যায়মতে বিষয়ের বিশিষ্টজ্ঞান হতে হলে তাই তার আগে বিশেষণের জ্ঞান অবশ্যই হতে হবে। বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত বিশেষ্যকে বিশিষ্ট বলে। এই বিশিষ্টের জ্ঞান হল বিশিষ্টজ্ঞান। যে ব্যক্তির পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান হয়নি তার বিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না। পূর্বে দণ্ডের জ্ঞান হয়নি এমন ব্যক্তির দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ বা দণ্ডীপুরুষের জ্ঞান হয় কি করে? রক্তপুষ্পের জ্ঞান হতে গেলে অবশ্যই তৎপূর্বে রক্তত্বের জ্ঞান থাকতে হয়। অনুরূপভাবে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞানের জন্য ঘটত্বের জ্ঞান তৎপূর্বে প্রয়োজন। ঘটের সঙ্গে চক্ষুসংযোগের অব্যবহিত পরেই আমাদের প্রথমে ঘটত্বের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান নিছক বিশেষণের জ্ঞান বা বিশেষ্যের বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনন্তর ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান হতে পারে। সুতরাং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের জন্যই বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান স্বীকার করা প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়। তাই বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের উপপত্তির জন্যই নির্বিকল্পক জ্ঞান বা বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান বা নিছক বিশেষণের জ্ঞান স্বীকার করা প্রয়োজন।

আপত্তি উঠতে পারে যে, বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে যে জ্ঞান হয় সে জ্ঞানও যদি বিশিষ্ট জ্ঞান হয় তাহলে ক্ষতি কি? দণ্ডীপুরুষ রূপে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের পূর্বে যে দণ্ডের জ্ঞানের প্রয়োজন সে জ্ঞানও দণ্ডত্ব বিশিষ্ট দণ্ডের জ্ঞান। অনুরূপভাবে বিশিষ্ট জ্ঞানের পূর্বে যে জ্ঞান হয় তাও বিশিষ্ট জ্ঞান হতে পারে।

এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, প্রতিটি বিশিষ্টজ্ঞানের পূর্বে যদি অপর একটি বিশিষ্টজ্ঞান স্বীকার করা হয় তাহলে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়। প্রতিটি বিশিষ্টজ্ঞানের বিশেষণটি যদি বিশিষ্ট হয় তাহলে বিশেষণের জ্ঞান অবিশ্রান্ত ধারায় চলতে থাকে। এই অবিশ্রান্ত ধারার অনবস্থা পরিহারের জন্য চক্ষুসংযোগাদির অনন্তর ঘটাদির প্রথম বিশেষণের জ্ঞানটিকে অবিশিষ্টই বলতে হবে। অবিশিষ্ট বিশেষণের জ্ঞান স্বীকার করা হলে তবেই অনবস্থা দোষ পরিহার করে বিশিষ্ট জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এইরূপ অবশিষ্ট বিশেষণের জ্ঞানই হল নির্বিকল্পক জ্ঞান। এই জ্ঞান স্বীকার না করলে সবিকল্পক জ্ঞান উপপন্ন হয় না। কিন্তু সবিকল্পকজ্ঞান মানসপ্রত্যক্ষ বা অনুব্যবসায় সিদ্ধ। অতএব নির্বিকল্পক জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য।

৪.০১.০০ ■ ইন্দ্রিয়

'ইন্দ্রিয়' বলতে বোঝায় ইন্দ্রের লিঙ্গ, ইন্দ্রের সৃষ্ট, ইন্দ্রের দৃষ্ট ইত্যাদি। 'ইন্দ্র' পদের অর্থ আত্মা। এখানে জীবাত্মাই আত্মা। ঈশ্বর বা পরমাত্মার কোন ইন্দ্রিয় নাই। তাই বলা যায়, যা জীবাত্মার জ্ঞানের অনুমাপক তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি হল জীবাত্মার ভোগসাধন (ইন্দ্রিয়ানি ভোগসাধনানি) এবং শরীর হল জীবের ভোগস্থান। ইন্দ্রিয় ষড়বিধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ হল বহিরিন্দ্রিয় এবং মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। বহিরিন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক। পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয় পঞ্চভূতপ্রকৃতির হলেও তাদের বিষয় গ্রহণ ব্যবস্থিত। ইন্দ্রিয়গুলির উপাদান দ্রব্য অনুযায়ীই তাদের বিষয় গ্রহণ ব্যবস্থিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস এবং তা কেবল রূপাদি গ্রহণে সমর্থ। শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ দ্রব্যান্তর্গত এবং তা কেবল শব্দাদি গ্রহণে সমর্থ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব এবং তা কেবল গন্ধাদি গ্রহণেই সমর্থ, রসনেন্দ্রিয় জলীয় এবং তা কেবল রসাদি গ্রহণেই সমর্থ এবং ত্বগিন্দ্রিয় বায়বীয় এবং তা কেবল স্পর্শাদি গ্রহণেই সমর্থ। অন্তরিন্দ্রিয় মন সুখ-দুঃখাদি গুণ গ্রাহক। অন্তরিন্দ্রিয় অভৌতিক। নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ বা প্রত্যক্ষ করতে সামর্থ্য যাদের লক্ষণ অর্থাৎ অনুমাপক এই অর্থে ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ববিষয়গ্রহণলক্ষণ বলা হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের এই নিয়মকেই বিষয়নিয়ম বলে এবং তা সর্বাদিসম্মত। ইন্দ্রিয়সমূহ অতীন্দ্রিয়। এই বিষয-নিয়ম থেকেই তাদের অনুমান করা হয়। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয় দ্বাদশ প্রমেয়ের অন্যতম প্রমেয়পদার্থ।

ইন্দ্রিয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুটি ভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এই দুটি বিষয়ের একটি হল (ক) ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয় এবং অপরটি হল (খ) উদ্ভূতত্ব জাতি নয়।

(ক) ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয় :

ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয়। পৃথিবীত্বাদির সঙ্গে সাংকর্যবশতঃ ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি নয়। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র আবস্থিতির নাম সাংকর্য। পার্থিব ঘটে পৃথিবীত্ব ইন্দ্রিয়ত্বের

অভাবের সমানাধিকরণ হয়। আবার নাসিকা ভিন্ন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ত্ব পৃথিবীত্বাভাবের সমানাধিকরণ হয়। অথচ নাসিকা বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ত্ব ও পৃথিবীত্ব একত্র অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থানকেই সাংকর্য বলে। সাংকর্য জাতিবোধক হওয়ায় ইন্দ্রিয়ত্ব জাতি হতে পারে না।

(খ) উদ্ভূতত্ব জাতি নয় :

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন উদ্ভূতত্ব ধর্মটিকে জাতি বলেননি। অনুদ্ভূতত্বটি জাতি এবং অনুদ্ভূতত্বের অভাবই উদ্ভূতত্ব। এখন প্রশ্ন হল উদ্ভূতত্বটি জাতি নয় কেন? বিশ্বনাথের মতে শুক্লত্বাদির সঙ্গে সাংকর্যবশতঃ উদ্ভূতত্ব জাতি হতে পারে না। পরস্পরের অত্যন্তাভাবের সমানাধিকরণ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতির নাম সাংকর্য। উদ্ভূতনীলরূপে উদ্ভূতত্ব ধর্মটির শুক্লত্বাভাবের সমানাধিকরণ হয়। আবার অনুদ্ভূত শুক্লরূপে শুক্লত্ব ধর্মটি উদ্ভূতত্বাভাবের সমানাধিকরণ হয়। অথচ উদ্ভূত শুক্লরূপে উদ্ভূতত্ব ও শুক্লত্ব একত্র অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থানকেই সাংকর্য বলে। সাংকর্য জাতির অন্যতম বাধক হওয়ায় উদ্ভূতত্ব জাতি হতে পারে না।

৪.০১.০১ ■ ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে বলেছেন, "শব্দেতরোদ্‌ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রমত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্।" অর্থাৎ শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় হয়েও যা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় তাই ইন্দ্রিয়। প্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের এই লক্ষণটির দুটি প্রধান স্তম্ভ হল, (১) শব্দেতরোদ্‌ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব এবং (২) জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব। লক্ষণের প্রথম অংশটি বিশেষণ এবং দ্বিতীয় অংশটি বিশেষ্য। এই বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবাকারের লক্ষণটিতে প্রথমে বিশেষণ অংশের এবং তারপর বিশেষ্য অংশের প্রতি পদের বিবৃতি ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে দেখা যাক্, বিশেষণ ও বিশেষ্য এই দুই স্তম্ভেরই লক্ষণে প্রয়োজন হল কেন।

যদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি কেবলমাত্র প্রথম স্তম্ভটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রত্বকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা হয় তাহলে কালাদিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। কালাদি কোন প্রকার বিশেষগুণের আশ্রয় নয়। এজন্য কালাদিতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব আছে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণটিতে দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রয়োজন। দ্বিতীয় স্তম্ভটিতে বলা হয়েছে যে, ইন্দ্রিয় হল জ্ঞানকরণ মনঃসংযোগের আশ্রয়। জ্ঞানের কারণ স্বরূপ মনঃসংযোগের আশ্রয় কালাদি হতে পারে না। কালাদিতে জ্ঞানকরণমনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব না থাকায় 'শব্দভিন্নউদ্ভূতবিশষগুণ অনাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্'— ইন্দ্রিয়ের এই লক্ষণের কালাদিতে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে দ্বিতীয় স্তম্ভটির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আবার ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি যদি কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তম্ভটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা হয়, তাহলে আত্মায় এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। আত্মা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়। মন যে কোন জ্ঞানোৎপত্তিতেই আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ন্যায়মতে আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের অন্যতম কারণ। আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ না

হলে কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হতে পারে না। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণটিতে প্রথম স্তম্ভটির সংযোজন প্রয়োজন। আত্মা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় হলেও আত্মা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় নয়। সুখ-দুঃখাদি আত্মার উদ্ভূত বিশেষগুণ এবং এই গুণগুলি শব্দভিন্ন গুণ। তাই আত্মায় শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের আশ্রয়ত্ব আছে, অনাশ্রয়ত্ব নাই। ইন্দ্রিয়ের লক্ষণের দ্বিতীয় স্তম্ভটির সঙ্গে প্রথম স্তম্ভটির সংযোজন করা হলে এই অতিব্যাপ্তি আর হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে দ্বিতীয় স্তম্ভটির সঙ্গে প্রথম স্তম্ভটিরও প্রয়োজন আছে।

এখন দেখা যাক, প্রথম ও দ্বিতীয় স্তম্ভের অন্তর্গত অন্যান্য পদগুলির প্রয়োজন কি ? প্রথম স্তম্ভের অন্তর্গত পদগুলি হল : (ক) শব্দেতর (শব্দভিন্ন), (খ) 'উদ্ভূত' ও (গ) 'বিশেষগুণানাশ্রয়ত্ব'। দ্বিতীয় স্তম্ভের অন্তর্গত পদগুলি হল : (ঘ) 'জ্ঞানকারণ' ও (ঙ) 'মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব'। প্রথমে প্রথম স্তম্ভের অর্থাৎ বিশেষণাংশের প্রতি পদের প্রয়োজন পরীক্ষা করা যাক্।

(ক) ইন্দ্রিয় লক্ষণের প্রথম পদটি হল 'শব্দেতর'। 'শব্দেতর' পদটির অর্থ হল শব্দভিন্ন। লক্ষণে যদি 'শব্দেতর' শব্দটি প্রযুক্ত না হত তাহলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি হত 'উদ্ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্।'' ইন্দ্রিয়ের এই লক্ষণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে অব্যাপ্ত হবে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দনামক উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় এবং জ্ঞানকারণমনঃসংযোগেরও আশ্রয়। শ্রোত্রেন্দ্রিয় উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় না হওয়ায় শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়লক্ষণের সংগতি হয় না। এই অব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য লক্ষণে 'শব্দেতর' বা 'শব্দভিন্ন' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় শব্দভিন্ন অন্য কোন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় হয় না বলে তাতে শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয়ত্ব থাকে না, অনাশ্রয়ত্বই থাকে। অতএব 'শব্দেতর' পদটি প্রযুক্ত হলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে আর অব্যাপ্তি দোষ ঘটে না।

(খ) ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে প্রদত্ত দ্বিতীয় পদটি হল 'উদ্ভূত'। 'উদ্ভূত' শব্দের অর্থ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ন্যায়-বৈশেষিক মতে বহিরিন্দ্রিয়গুলি ভৌত দ্রব্যান্তর্গত হওয়ায় সেগুলিও শব্দভিন্ন বিশেষগুণের আশ্রয় হয়, অনাশ্রয় হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিশেষগুণই হল রূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিশেষগুণ হল গন্ধ ইত্যাদি। এখন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে যদি বিশেষগুণের অনাশ্রয় বলা হয় তাহলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। এই অব্যাপ্তি দূর করার জন্য লক্ষণে বিশেষগুণের বিশেষণরূপে 'উদ্ভূত' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'উদ্ভূত' পদটি সন্নিবিষ্ট হলে এই অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়। কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শব্দভিন্ন বিশেষগুণের আশ্রয় হলেও সেই বিশেষগুণ উদ্ভূত বিশেষগুণ নয়, অনুদ্ভূত বিশেষগুণ। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যে রূপ থাকে তা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অতএব ইন্দ্রিয়কে যদি শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়, জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় বলা হয় তাহলে আর কোন দোষ থাকে না।

(গ) পুনরায় ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে যদি গুণের বিশেষণরূপে 'বিশেষ' পদটি সন্নিবিষ্ট না হত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে যদি বলা হয় 'শব্দেতরোদ্ভূত গুণাশ্রয়ত্বেসতি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব' তাহলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি ঘটে। দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষকালে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দ্রব্যাদি পদার্থের সংযোগ ঘটে। সংযোগ একটি উদ্ভূত গুণ হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় না হয়ে

আশ্রয় হয়ে পড়ে। এই অব্যাপ্তি দোষ নিবারণ করার জন্য ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে গুণের বিশেষণরূপে 'বিশেষ' পদটি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সংযোগ উদ্ভূতগুণ হলেও তা বিশেষ গুণ নয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাই উদ্ভূতগুণের আশ্রয় হলেও উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়-লক্ষণের বিশেষণ স্তম্ভটিকে শব্দেতর উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্বই বলতে হবে।

(ঘ) এখন দেখা যাক, ইন্দ্রিয়ের লক্ষণের দ্বিতীয় স্তম্ভের অন্তর্গত 'জ্ঞানকারণ' পদটির প্রয়োজন কি? যদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে 'জ্ঞানকারণ' পদটি প্রযুক্ত না হত তাহলে এই লক্ষণটির আকাশে অতিব্যাপ্তি ঘটত। আকাশ শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় আবার মনঃসংযোগের আশ্রয়। সুতরাং 'জ্ঞানকারণ' বিশেষণহীন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ আকাশে অতিব্যাপ্ত হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'জ্ঞানকারণ' পদের প্রয়োজন। আকাশ মনঃসংযোগের আশ্রয় হলেও জ্ঞানকারণমনঃসংযোগের আশ্রয় নয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানকারণমনঃসংযোগের আশ্রয় বলা হলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণের আকাশে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

(ঙ) সর্বশেষে, ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে যদি 'মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব' এই পদটি না থাকত, তবে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটিতে পুনরায় অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা দেখা দিত। এই অতিব্যাপ্তি দুইভাবে হতে পারে — প্রাচীন মতে, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যেমন জ্ঞানের কারণ, তেমনি ইন্দ্রিয়ের অবয়ব সংযোগও জ্ঞানের কারণ। আবার ইন্দ্রিয়াবয়ব শব্দভিন্ন উদ্ভূত কোনো বিশেষগুণের আশ্রয় নয়। অতএব, শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ সংযোগাশ্রয়ত্ব ইন্দ্রিয়াবয়বেও আছে। এইভাবে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণের ইন্দ্রিয়াবয়বে অতিব্যাপ্তি দেখা দেয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে জ্ঞানকারণ সংযোগাশ্রয়ত্ব না বলে জ্ঞান-কারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলতে হবে। তাহলে আর ইন্দ্রিয়াবয়বে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে না। কারণ, ইন্দ্রিয়াবয়বে কোনোভাবেই জ্ঞান-কারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব থাকতে পারে না।

নব্য-নৈয়ায়িকগণ অপর এক ভাবে এই অতিব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করেছেন। নব্যমতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে 'মনঃসংযোগাশ্রয়ত্ব' পদটি যদি না থাকত তাহলে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণের কালে অতিব্যাপ্তি ঘটত। নব্যমতে কালে রূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল অনুযোগী, রূপাভাব প্রতিযোগী এবং চক্ষুসংযুক্ত বিশেষণতা প্রত্যক্ষের হেতু বলে বিবেচিত হয়। রূপাভাব কালের বিশেষণ হয়, কালে রূপাভাবের প্রত্যক্ষে চক্ষু-সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ সিদ্ধ। কাল ওই চক্ষুসংযোগের আশ্রয় হওয়ায়, তাতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলতে হবে। কাল জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় না হওয়ায় কালে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি হবে না। অতএব, ইন্দ্রিয়ের নির্দোষ লক্ষণ হল ''শব্দেতরোদ্‌ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্।''

৪.০২.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

বিকল্প :

'বিকল্প' শব্দটি বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যোগদর্শনে বিকল্প একপ্রকার চিত্তবৃত্তি। ব্যাকরণ দর্শনে চিন্তা, চেতনা, ভাবনা প্রভৃতিই হল বিকল্প। চেতনা ছাড়া কোন জ্ঞানই সম্ভব নয়।

তাই এই মতে সব জ্ঞানই বিকল্পাত্মক। ন্যায়দর্শনে 'বিকল্প' বলতে বিশেষণকেই বোঝানো হয়। বিকল্পগুলিই জ্ঞানের প্রকার। নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য হল পঞ্চ বিকল্প। বৌদ্ধগণ এগুলিকেই পঞ্চকল্পনা বলেছেন। বৌদ্ধমতে কল্পনা মিথ্যা প্রতিভাস মাত্র। কিন্তু ন্যায়মতে বিকল্পগুলি বাস্তব সত্য।

অতীন্দ্রিয় :

'অতীন্দ্রিয়' বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়ের অতীত। ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করতে পারে না বা যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই ইন্দ্রিয়াতীত, যেমন আকাশ। শব্দের সমবায়িকারণরূপ আকাশের অস্তিত্ব অনুমানসিদ্ধ। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আকাশের প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। নির্বিকল্প প্রত্যক্ষ ন্যায়মতে অতীন্দ্রিয়। তাই তাকে অনুমানের দ্বারা সাধন করা হয়।

অনুব্যবসায় :

অনুব্যবসায় একপ্রকার মানস প্রত্যক্ষ জ্ঞান। জ্ঞান যেমন বিষয়কে প্রকাশ করে, তেমনি আবার অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যে সে নিজেও প্রকাশিত হয়। জ্ঞান যখন বিষয়কে প্রকাশ করে তখন তাকে বলা হয় ব্যবসায়। আর জ্ঞান যখন নিজে অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুব্যবসায়। ব্যবসায়জ্ঞানের অনন্তর হয় বলেই এই জ্ঞানকে অনুব্যবসায় বলা হয়।

বিশষণতাবচ্ছেদক :

বিশেষণের যা বিশেষণ তাকে বলা হয় বিশেষণতাবচ্ছেদক। দণ্ডীপুরুষের জ্ঞানে দণ্ড পুরুষের বিশেষণ। আবার দণ্ডত্ব দণ্ডের বিশেষণ। অতএব দণ্ডত্ব হল এক্ষেত্রে বিশেষণতাবচ্ছেদক।

অখণ্ডোপাধি :

যে সকল ধর্ম জাতিবাধক বশতঃ জাতি হতে পারে না সেইসব ধর্মকে বলা হয় উপাধি। অনবস্থা দোষবশতঃ জাতিভিন্ন অন্যান্য যে সকল বিশেষণের আর অবচ্ছেদক থাকে না সে সকলধর্মকে বলা হয় অখণ্ডোপাধি, যেমন, অভাবত্ব, আকাশত্ব প্রভৃতি। ন্যায়মতে জাতি ও অখণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান হয়। অর্থাৎ জাতি ও অখণ্ডোপাধির প্রকাররূপে কোন ধর্ম স্বীকার করা যায় না। ঘটত্ব বা অভাবত্বের প্রকার স্বীকার করা হলে সেই প্রকারের প্রকার তার আবার প্রকার স্বীকারে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়।

বিশেষ্য :

যে পদার্থ কোন প্রকারবিশিষ্ট হয়ে জ্ঞান ভাসমান হয় তাকে সেই জ্ঞানস্থলে বিশেষ্য বলে। কোন একটি জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেই একটি পদার্থ বিশেষ্য বা প্রকার আখ্যা পায়। বিশেষ্য-প্রকারভাব জ্ঞানাপেক্ষ। তাই একটি জ্ঞানে যে পদার্থ বিশেষ্য হয় তা অন্য কোন জ্ঞানে প্রকার হতে পারে। দণ্ডীপুরুষের জ্ঞানে পুরুষ বিশেষ্য, দণ্ড প্রকার। আবার দণ্ডত্ববিশিষ্ট দণ্ডের জ্ঞানে দণ্ড বিশেষ্য দণ্ডত্ব প্রকার। বিশেষ্য সাধারণত প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদ হয়ে থাকে।

উদ্ভূতত্ব :

রূপ উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। এই দুই প্রকার রূপের মধ্যে যে রূপ উদ্ভূত তারই প্রত্যক্ষ হয়, অনুদ্ভূত রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতরূপবান দ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কারণ। ঘটের রক্তরূপ উদ্ভূত বলে তা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু চক্ষুরশ্মির রূপ অনুদ্ভূত বলে তার প্রত্যক্ষ হয় না। যে রূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ গোচর হয় তা সব সময়ই উদ্ভূতরূপ। ন্যায়মতে সাংকর্যবশতঃ উদ্ভূতত্ব ধর্মটি জাতি হয় না কিন্তু অনুদ্ভূতত্ব ধর্মটি জাতি হয়।

ইন্দ্রিয় :

ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে দ্বিবিধ। ন্যায়মতে কর্মেন্দ্রিয় স্বীকৃত না হওয়ায় পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টিকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়— ভৌতিক। যা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের আনাশ্রয় অথচ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের করণ। ইন্দ্রের অনুমাপককে বলে ইন্দ্রিয়। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ আত্মা। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নাই। তাই বলা যায়, যা জীবাত্মার অনুমাপক তাই ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ। ইন্দ্রের অনুমাপক বল ইন্দ্রিয়। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ আত্মা। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নেই। তাই বলা যায়, যা জীবাত্মার অনুমাপক তাই ইন্দ্রিয়।

৪.০৩.০০ ■ সারাংশ

ন্যায় সম্প্রদায় জ্ঞানকে নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দুভাগে ভাগ করেছেন। ন্যায়মতে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। তবে এই মতে ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই যে একটি বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা নয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষের পরক্ষণেই আমাদের একটি বস্তুমাত্রের অপ্রকাশযোগ্য জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানটির ন্যায়সম্মত পারিভাষিক নাম হল নির্বিকল্পক এবং বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহি বা বিকল্পযুক্ত বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানটির ন্যায়সম্মত পারিভাষিক নাম হল সবিকল্পক। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে বা মুক্তাবলী টীকায় সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিশেষ আলোচনা করেন নি। তবে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকারের পক্ষে যুক্তি এবং নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ কেন অতীন্দ্রিয় তা তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। ন্যায়মতে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান তা হল প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রথমে নিছক বিশেষণের জ্ঞান বা সংসর্গানবগাহি জ্ঞান। এই জ্ঞানকেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ বলা হয়। অপরদিকে, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধাবগাহি বা বিকল্পযুক্ত বিশিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান। বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহি বা বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য বিষয়ক জ্ঞানও যেহেতু বিকল্পযুক্ত বিষয়ের সংসর্গাবগাহি জ্ঞান সেহেতু এরূপ জ্ঞানকেও সবিকল্পক বলা হয়।

নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলতে নির্বিকল্পক জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাই বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান যেমন বিষয়কে প্রকাশ করে তেমনি আবার অন্য জ্ঞানের

দ্বারা প্রকাশিত হয়। ন্যায়মতে জ্ঞানের জ্ঞান হল মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞান। নির্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্দ্রিয় বলতে বোঝায় নির্বিকল্পক জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয় না। মন হল মানসপ্রত্যক্ষের গ্রাহক ইন্দ্রিয়। যে জ্ঞান মনের দ্বারা গ্রাহ্য নয় সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না।

জ্ঞানের জ্ঞানকে বলে অনুব্যবসায়। অনুব্যবসায় সব সময় প্রত্যক্ষাত্মক। কোন বিষয়ের যখন প্রথম জ্ঞান হয় তখন ওই জ্ঞানকে বলা হয় ব্যবসায়, যেমন একটি ঘটের জ্ঞান। ব্যবসায়ের অনন্তর ওই ব্যবসায়-বিষয়ক যে মানসপ্রত্যক্ষ হয় তাকে বলে অনুব্যবসায়, যেমন ঘটজ্ঞানের জ্ঞান (ঘটম্ অহম্ জানামি)।

এখন প্রশ্ন হল নির্বিকল্পক জ্ঞানের অস্তিত্বে প্রমাণ কি? নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, বিশিষ্টজ্ঞান হতে হলে তার আগে বিশেষণের জ্ঞান অবশ্যই হতে হবে। বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত বিশেষ্যকে বিশিষ্ট বলে। এই বিশিষ্টের জ্ঞান হল বিশিষ্টজ্ঞান। যে ব্যক্তির পূর্বে বিশেষণের জ্ঞান হয়নি তার বিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না। পূর্বে দণ্ডের জ্ঞান হয়নি এমন ব্যক্তির দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ বা দণ্ডীপুরুষের জ্ঞান হয় কি করে? রক্তপুষ্পের জ্ঞান হতে গেলে অবশ্যই পূর্বে রক্তত্বের জ্ঞান থাকতে হয়। অনুরূপভাবে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের জ্ঞানের জন্য ঘটত্বের জ্ঞান তৎপূর্বে প্রয়োজন। ঘটের সঙ্গে চক্ষুসংযোগের অব্যবহিত পরেই আমাদের প্রথমে ঘটত্বের জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান নিছক বিশেষণের জ্ঞান বা বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান। এই জ্ঞানের অনন্তর ঘটত্ববিশিষ্ট ঘটের বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞান হতে পারে। সুতরাং বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানের জন্যই বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞান স্বীকার করা প্রয়োজন। এইরূপ জ্ঞানকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলা হয়।

যা জীবাত্মার জ্ঞানের অনুমাপক তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি হল জীবাত্মার ভোগসাধন (ইন্দ্রিয়ানি ভোগসাধনানি) এবং শরীর হল জীবের ভোগস্থান। ইন্দ্রিয় ষড়বিধ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ হল বহিরিন্দ্রিয় এবং মন হল অন্তরিন্দ্রিয়।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ইন্দ্রিয়ের লক্ষণে বলেছেন, "শব্দেতরোদ্‌ভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্।" অর্থাৎ শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় হয়েও যা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় তাই ইন্দ্রিয়। প্রদত্ত ইন্দ্রিয়ের এই লক্ষণটির দুটি প্রধান স্তম্ভ হল, (১) শব্দেতরোদ্‌ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্ব এবং (২) জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়ত্ব।

যদি ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি কেবলমাত্র প্রথম স্তম্ভটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয়ত্বকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা হয় তাহলে কালাদিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়।

আবার ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি যদি কেবলমাত্র দ্বিতীয় স্তম্ভটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত অর্থাৎ যদি কেবলমাত্র জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বকেই ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ বলা হয়, তাহলে আত্মায় এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। আত্মা জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়। মন যে কোন জ্ঞানোৎপত্তিতেই আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। ন্যায়মতে আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্যের অন্যতম কারণ।

৪.০৪.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

1. What is meant by *'nirvikalpaka"*?
2. What is meant by *'vikalpa"*?
3. What is *viśeṣana*?
4. What is *prakāra*?
5. What is *anuvyavasāya*?
6. What is meant by *'atī ndriya"*?
7. What is meant by *'anavilāpya"*?
8. What is *anavasthā* ?
9. What is *viśiṣṭajñāna*?
10. What is *viśeṣaṇatāvacchedaka*?
11. What is *viśistavaiśistya jñāna*?
12. What is *indriya*?
13. Is *indriyatva* a *jāti*?
14. Why is *indriya* not a *jāti*?
15. Why is *udbhutatva* not a *jāti*?
16. What is the definition of *indriya* given by *Visvanātha*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

1. Distinguish between *nirvikalpaka* and *savikalpaka pratyakṣa*. What is the proof of *nirvikalpaka pratyakṣa*?
2. Give an account of Nyāya-view *of nirvikalpaka pratyakṣa*. Why is *nirvikalpaka pratyakṣa* called *atī ndriya*?

3. What is *anuvyavasāya*? What is meant by *'anavilāpya'*? Why is *nirvikalpaka pratyakṣ.a* not perceived? Discuss.

4. State the definition of *indriya* formulated by Viśvanātha. Explain fully the definition.

5. Fully explain the definition of *indriya* given by Viśvanātha indicating the necessity of each term occurred in the definition.

৪.০৫.০০ ■ গ্রন্থপঞ্জী

১. ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২. ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩. ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫. ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৬. ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭. Bhāṣāapariccheda, Swami Mādhabānanda.

৮. Perception, B. K. Matilal.

একক - ৫

বিষয়-সূচী

৫.০০.০০ লৌকিক সন্নিকর্ষ

৫.০০.০১ সংযোগ সন্নিকর্ষ

৫.০০.০২ সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ

৫.০০.০৩ সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ

৫.০০.০৪ সমবায় সন্নিকর্ষ

৫.০০.০৫ সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ

৫.০০.০৬ বিশেষণতা সন্নিকর্ষ

৫.০০.০৭ যোগ্যানুপলব্ধি

৫.০০.০৮ সমবায়ের প্রত্যক্ষ

৫.০১.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

৫.০২.০০ সারাংশ

৫.০৩.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.০৪.০০ সহায়ক পুস্তক

৫.০০.০০ ■ লৌকিক সন্নিকর্ষ

ন্যায়মতে নিত্য ও অনিত্য ভেদে প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বিবিধ। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হল নিত্য প্রত্যক্ষ। জীবের প্রত্যক্ষ হল অনিত্য প্রত্যক্ষ। জীবের প্রত্যক্ষকে জন্য প্রত্যক্ষও বলা হয়। ন্যায়মতে জন্যপ্রত্যক্ষজ্ঞান হল ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধ ব্যতীত জন্য প্রত্যক্ষ হতে পারে না। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে এই সম্বন্ধ প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বরের কোনও ইন্দ্রিয় নেই। তৎসত্ত্বেও ঈশ্বর সবকিছুই প্রত্যক্ষকরেন। তবে জীবের জন্যপ্রত্যক্ষ সর্বদাই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের কোনও না কোনও সম্বন্ধের অপেক্ষা থাকে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের এই সম্বন্ধকেই ন্যায়ের পরিভাষায় সন্নিকর্ষ বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল : সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ, না করণ, না ব্যাপার? বিশ্বনাথ ৫৯ সংখ্যক কারিকায় স্পষ্টতঃ বলেছেন ''বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধো ব্যাপারঃ'' বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেই তিনি সন্নিকর্ষ বলেছেন। আবার এই সন্নিকর্ষই হল

প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপার (ব্যাপারঃ সন্নিকর্ষঃ)। ব্যাপারের লক্ষণে ন্যায়দর্শনে বলা হয় ''তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনকো ব্যাপারঃ।'' অর্থাৎ যা স্বয়ং কোনও কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে ওই কারণ থেকে উৎপন্ন অন্য কোনও কার্যের প্রতিও কারণ হয় তাকে ওই কার্যের প্রতি ব্যাপার বলা হয়। যেমন, ইন্দ্রয়ার্থ সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার ওই কারণের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক হয় বলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি ব্যাপার বলা হয়। আবার যা ব্যাপারবৎ তাই করণ। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবান বলে তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যা শ্রাবণ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের (কর্ণের) সঙ্গে শব্দের সন্নিকর্ষের ফলে শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয়। এক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হল সমবায়। কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ হওয়ায় এবং শব্দ আকাশের গুণ হওয়ায় উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল গুণ-গুণীর সম্বন্ধ। গুণ-গুণীর সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু এই সম্বন্ধ (সন্নিকর্ষ) শব্দের প্রত্যক্ষে ব্যাপার হতে পারে না। সমবায় নিত্য হওয়ায় তা শ্রাবণপ্রত্যক্ষের করণ যে কর্ণেন্দ্রিয় তা থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। অথচ তা কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক (ব্যাপার)। মোটকথা, সমবায়সন্নিকর্ষ তজ্জন্য না হয়েও তজ্জন্যজনক হয়। এই কারণে এক্ষেত্রে ব্যাপারকে তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনক (ব্যাপারের লক্ষণ) না বলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ বা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধকেই পারিভাষিক অর্থে ব্যাপার বলা উচিত।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষকে তিনি পুনরায় ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ হল : (১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায়, (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত সমবায় ও (৬) বিশেষণতা সন্নিকর্ষ।

৫.০০.০১ ■ সংযোগ সন্নিকর্ষ

দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষের প্রয়োজন হয় তাকে সংযোগ সন্নিকর্ষ বলা হয় যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্রব্য পদার্থ। যে যে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে ভূতদ্রব্যের বিশেষগুণ গ্রাহ্য, সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই সেই ভূতদ্রব্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে। এই কারণে চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস দ্রব্য। তেজঃদ্রব্যের বিশেষগুণ রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আবার পৃথিবীর বিশেষগুণ গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাই ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব দ্রব্য। অবয়ব-অবয়বী ভিন্ন দুটি দ্রব্যের মধ্যে সম্বন্ধ সর্বদা সংযোগই হয়। সংযোগ কেবল দুটি দ্রব্যেরই মধ্যস্থিত সম্বন্ধ। অবয়ব-অবয়বীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তা ন্যায়মতে সমবায় সম্বন্ধ। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদিদ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ তা হল সংযোগ সন্নিকর্ষ। ন্যায়মতে মাত্র তিনটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। এই তিনটি ইন্দ্রিয় হল, চক্ষু, ত্বক্ ও মন। রূপ ও রূপত্বভিন্ন চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সর্বপদার্থই ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রব্যের প্রত্যক্ষেও সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়। আবার বিশ্বনাথের মতে মন নামক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। মনের দ্বারা আত্মার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হল সংযোগ সন্নিকর্ষ। বিশ্বনাথ বলেছেন, ''দ্রব্যপ্রত্যক্ষম্ ইন্দ্রিয়সংযোগজন্যম্।''

৫.০০.০২ ■ সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ

ন্যায়মতে দ্বিতীয় প্রকার বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের নাম হল সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সমবেত বা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান হল রূপরসাদিগুণ, গমনাদি ক্রিয়া ও গোত্বাদি জাতি। এর মধ্যে শব্দভিন্ন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য যাবৎ গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যগত জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা। শব্দ আকাশ দ্রব্যে সমবেত গুণ হলেও সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা তা গ্রাহ্য নয়। শব্দের প্রত্যক্ষ নৈয়ায়িকগণ ভিন্ন একপ্রকার সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আমরা শীঘ্রই আলোচনায় আসব। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যেমন ঘটের প্রত্যক্ষ হয় তেমনি ঘটরূপেরও প্রত্যক্ষ হয়। ঘটরূপের প্রত্যক্ষে অপেক্ষিত সন্নিকর্ষের নাম হল সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ। ঘটদ্রব্যের রূপ ঘটদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান। ঘটদ্রব্যের সঙ্গে চক্ষুর সম্বন্ধ সংযোগ। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটরূপের প্রত্যক্ষে হয় সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষ। ঘটদ্রব্যগত ঘটত্ব জাতির প্রত্যক্ষেও সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। কর্ণেন্দ্রিয় ছাড়া নাসিকাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুণের প্রত্যক্ষেও সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়ে থাকে। নাসিকার দ্বারা গন্ধের, জিহ্বার দ্বারা রসের, ত্বকের দ্বারা স্পর্শের এবং মনের দ্বারা সুখ-দুঃখাদি ও আত্মত্ব জাতির মানস প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ স্বীকৃত। বিশ্বনাথ বলেছেন, ''দ্রব্যসমবেত প্রত্যক্ষম্ ইন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়জন্যম্।''

৫.০০.০৩ ■ সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ

দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষে তিনটি সম্বন্ধ অপেক্ষিত; (১) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ, (২) দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির সমবায়, এবং (৩) গুণাদির সঙ্গে গুণাদিগত গুণত্বাদি জাতির সমবায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটরূপের রূপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। এই সন্নিকর্ষে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ, ঘটের সঙ্গে ঘটরূপের সমবায় এবং ঘটরূপের সঙ্গে রূপত্বজাতির সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষিত। শব্দভিন্ন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সকল গুণ ও সকল কর্মে সমবেত গুণত্ব ও কর্মত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম— এই তিন পদার্থেই জাতি থাকে। এর মধ্যে দ্রব্যত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। সুতরাং গুণত্ব ও কর্মত্ব জাতির প্রত্যক্ষেই কেবল সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ হয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা গুণ ও কর্মের জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধত্ব জাতির, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রসত্ব জাতির এবং ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শত্ব জাতির প্রত্যক্ষ এই প্রকার সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আবার আত্মার সমবেত জ্ঞানাদিগত জ্ঞানত্বাদিজাতির মানস প্রত্যক্ষেও মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন, ''দ্রব্যসমবেতসমবেতচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত সমবায়ঃ। এবম্ অন্যত্রাপি বিশিষ্যৈব কার্যকারণভাবঃ।''

৫.০০.০৪ ■ সমবায় সন্নিকর্ষ

শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কর্ণবিবরবর্তী যে আকাশ তাই শ্রবণেন্দ্রিয়। আবার শব্দ একটি গুণ পদার্থ। শব্দ হল আকাশদ্রব্যের বিশেষগুণ। আকাশের সঙ্গে শব্দের

সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। ফলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল সমবায় সন্নিকর্ষ। বিশ্বনাথ বলেছেন, ''শব্দপ্রত্যক্ষে শ্রোতাবচ্ছিন্নসমবায়।''

৫.০০.০৫ ■ সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ

শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। আমরা বলেছি যে, ন্যায় বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব জাতি স্বীকৃত। শব্দ একটি গুণ। অতএব শব্দেও জাতি থাকে। শব্দের জাতি হল শব্দত্ব। জাতি ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকে। অতএব শব্দের সঙ্গে শব্দত্বের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। আবার কর্ণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধও হল সমবায় সম্বন্ধ। অতএব শব্দত্বের গ্রহণে যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ। বিশ্বনাথ বলেছেন, ''শব্দসমবেত শ্রাবণপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবেতসমবায়ঃ কারণম্।''

৫.০০.০৬ ■ বিশেষণতা সন্নিকর্ষ

ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের অন্তিম সন্নিকর্ষ হল বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল বিশেষণতা সন্নিকর্ষ (সমবায়ে অভাবে চ বিশেষণতয়া ভবেৎ)। বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। সমবায়কে অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়। কিন্তু ন্যায়মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়। অভাব ও সমবায়ের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষই কারণ।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে অভাব সর্বদাই কোন না কোন অধিকরণে থাকে। অভাবের প্রত্যক্ষও তাই কোন না কোন অধিকরণে হয়ে থাকে। অধিকরণহীন কেবল অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না। যে অধিকরণে অভাবের প্রত্যক্ষ হয় প্রথমে সেই অধিকরণের সঙ্গে ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের কোন একটি সন্নিকর্ষ হয়, অধিকরণের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সেই সন্নিকর্ষকে দ্বার করেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভাবের সন্নিকর্ষ হয়। অভাব এক্ষেত্রে অধিকরণের বিশেষণ হয় বলেই সন্নিকর্ষটি 'বিশেষণতা সন্নিকর্ষ' আখ্যা পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল'— এরূপ জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্য এবং ঘটাভাব বিশেষণ (প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদই বিশেষ্য হয়)। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন এই অভাব প্রত্যক্ষ করা হয় তখন চক্ষুর সঙ্গে ভূতলের সংযোগ সম্বন্ধ হয় এবং ভূতলের সঙ্গে ঘটাভাবের বিশেষণতা (স্বরূপ) সম্বন্ধ হয়। এই কারণে সন্নিকর্ষটিকে চক্ষুসংযুক্তবিশেষণতা বা সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ বলা হয়। কিন্তু যদি ঘটাভাবেব জ্ঞানটি 'ভূতলে ঘটাভাব'— এইরূপে হয় তাহলে ঘটাভাব হয় বিশেষ্য এবং ভূতল হয় বিশেষণ। তাই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ঘটাভাবের এই সন্নিকর্ষটিকে বলা হয় সংযুক্তবিশেষ্যতা। অর্থাৎ অভাবীয় প্রত্যক্ষে অভাবটি যদি বিশেষণ হয় তাহলে সন্নিকর্ষটি হবে বিশেষণতা এবং অভাবটি যদি বিশেষ্য হয় তাহলে সন্নিকর্ষটি হবে বিশেষ্যতা। যেহেতু অভাব অধিকরণের বিশেষণ ও বিশেষ্য দুইই হতে পারে সেজন্য তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে এই সন্নিকর্ষটিকে বলা হয়েছে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ। মোটকথা, বিশেষণতা, বিশেষ্যতা ও বিশেষণ-বিশেষ্যভাব, অভাব ও সমবায় প্রত্যক্ষে প্রয়োজনীয় সন্নিকর্ষেরই বিভিন্ন নাম। এখানে উল্লেখ্য যে উক্ত বিশেষণতাদি সম্বন্ধ কোন অতিরিক্ত সম্বন্ধ নয়, স্বরূপ সম্বন্ধেরই প্রকারভেদমাত্র। বিশেষণতা সন্নিকর্ষ

বিশেষণের স্বরূপ এবং বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ বিশেষ্যের স্বরূপ। কোনটিই বিশেষণ ও বিশেষ্যের স্বরূপের অতিরিক্ত কিছু নয়।

বিশেষণতা সন্নিকর্ষ আবার নানাবিধ। ষড়বিধ সন্নিকর্ষের দ্বারা যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় সেই সব বিষয়ের অভাব প্রত্যক্ষস্থলে ওই ওই সন্নিকর্ষের সঙ্গে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ কারণ হয় বলে ভূতলে ঘটাভাব প্রত্যক্ষে কারণ হয় সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ। আবার, কোন বিষয় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই গ্রাহ্য। চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য বহিরিন্দ্রয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারাও সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভাব প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। ত্বগিন্দ্রিয় সংযুক্ত বায়ুতে শীতস্পর্শের অভাবে ত্বক্‌সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ। অনুরূপভাবে রসনেন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা মোদকে রসাভাবের এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষের দ্বারা পুষ্পে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। মনঃসংযুক্ত আত্মায় সুখদুঃখাদির অভাব প্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ। আমরা আগেই বলেছি যে, যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে বিষয়গ্রাহ্য, তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য।

দ্রব্যের রূপাদি প্রত্যক্ষে কারণ হয় সংযুক্তসমবায়। অতএব দ্রব্যের রূপাদির অভাব প্রত্যক্ষে কারণ হল সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষ। গ্রন্থকার সংযুক্তসমবেতবিশেষণতার দৃষ্টান্তে বলেছেন, দ্রব্যগত সংখ্যায় রূপাভাবের প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ। চক্ষুর সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ, দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের অন্যতম গুণ সংখ্যার সমবায় এবং সংখ্যার সঙ্গে রূপাভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ বর্তমান। তাই দ্রব্যগত সংখ্যায় রূপাভাবের প্রত্যক্ষে কারণ হয় সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা।

সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষের দৃষ্টান্তে গ্রন্থকার বলেছেন, দ্রব্যগত সংখ্যার সংখ্যাত্ব জাতিতে রূপাভাবের প্রত্যক্ষে এইরূপ সন্নিকর্ষ কারণ হয়। চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ, ঘটের সঙ্গে সংখ্যার সমবায়, সংখ্যার সঙ্গে সংখ্যাত্ব জাতির সমবায় এবং সংখ্যাত্ব জাতির সঙ্গে রূপভাবের বিশেষণতা সম্বন্ধ বর্তমান। তাই সংখ্যাত্বে রূপাভাবের প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ।

শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন যে আকাশ তাতে শব্দাভাবের প্রত্যক্ষের স্থলে সমবেতবিশেষণতা কারণ। শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন আকাশের সঙ্গে শব্দাভাবের সম্বন্ধ হল বিশেষণতা। অভাবের জ্ঞান প্রতিযোগীর জ্ঞানাধীন। শব্দের সঙ্গে শ্রোত্রাবচ্ছিন্ন আকাশের সম্বন্ধ হল সমবায়। তাই শব্দাভাবের প্রত্যক্ষে কারণ হল সমবেত বিশেষণতা সন্নিকর্ষ।

'ক', 'খ' প্রভৃতি শব্দে যথাক্রমে ক'ত্ব, খ'ত্ব প্রভৃতি জাতি বর্তমান। 'ক' শব্দের সঙ্গে ক'ত্ব জাতির সম্বন্ধ হল সমবায়। আবার 'ক' শব্দের সঙ্গে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হল সমবায়। 'খ' শব্দে ক'ত্ব জাতির অভাবের সম্বন্ধ হল বিশেষণতা। অতএব 'খ' প্রভৃতি শব্দে ক'ত্বাদি জাতির অভাব প্রত্যক্ষে কারণ হল সমবেতসমবেতবিশেষণতা।

ঘটাভাবে পটাভাবের প্রত্যক্ষে কারণ হল সংযুক্তবিশেষণবিশেষণতা সন্নিকর্ষ। ভূতলে ঘটাভাবের

প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তবিশেষণতার দ্বারা। আর ওই ঘটাভাবে বিশেষণতা সম্বন্ধে থাকে পটাভাব। তাই ঘটাভাবে পটাভাবের প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তবিশেষণবিশেষণতার দ্বারা। অনুরূপভাবে ক'ত্বাভাবের অধিকরণে গ'ত্বাভাবের প্রত্যক্ষেও বিশেষণবিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ হয়।

৫.০০.০৭ ■ যোগ্যানুপলব্ধি

ন্যায়মতে অভাবপ্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি কারণ। যোগ্য অনুপলব্ধি অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির যোগ্যতা আছে সেইরূপ অনুপলব্ধিই অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ হয়। এখন প্রশ্ন হল, উপলব্ধির যোগ্যতা বলতে কি বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে অভাব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

যে পদার্থের অভাব বোধিত হয় সেই পদার্থ হল ওই অভাবের প্রতিযোগী। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য তার অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল প্রতিযোগী এবং ভূতল হল অনুযোগী। ঘট চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য এবং ঘটের অভাবও চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যে পদার্থের উপলব্ধি যোগ্যতা আছে তার অনুপলব্ধিই হল যোগ্যানুপলব্ধি। এইরূপ যোগ্যানুপলব্ধি অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ যোগ্যতার ব্যাখ্যায় বিশ্বনাথ বলেছেন, 'প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসঞ্জনপ্রসজিত প্রতিযোগিকত্ব'। অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগীর উপলব্ধির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি তার উপলব্ধি না হয় তাহলে তার সেই অনুপলব্ধি হযে যোগ্যানুপলব্ধি এবং এই অনুপলব্ধিই তার অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। আলোকাদির উপস্থিতিতে ঘটের প্রত্যক্ষ হয়। আলোকাদির উপস্থিতিতে যদি ঘটের প্রত্যক্ষ না হয় তাহলে সেই অনুপলব্ধি হবে এক্ষেত্রে যোগ্যানুপলব্ধি এবং সেইরূপ অনুপলব্ধিই ঘটাভাবের সাধক। কিন্তু অন্ধকারে বা আলোকাদির অভাবে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই আলোকাদির অভাবস্থলে ঘটের চাক্ষুষ অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নয় এবং এইরূপ অনুপলব্ধি ঘটাভাবের সাধক হতে পারে না। কিন্তু আলোকাদির অভাবে ঘটের যেহেতু স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হতে পারে সেইহেতু আলোকাদির অবভাবেও ঘটের স্পার্শন অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধিই হয় এবং তার দ্বারা ঘটের অভাবও সিদ্ধ হয়। গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয় কিন্তু প্রত্যক্ষযোগ্য নয় তাই তাদের অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নয়। বায়ুতে উদ্ভূতরূপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, গুড়ে তিক্ততার অভাব, বহ্নিতে শীতলতার অভাব, শ্রেণীকক্ষে শব্দের অভাব, আত্মাতে সুখাদির অভাব নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তাদের প্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি কারণ হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, যে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে যে অভাবের প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ হয় সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই সেই প্রতিযোগীর অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সংসর্গাভাবের ক্ষেত্রে অভাবের প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যতা কারণ হলেও অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে অধিকরণের প্রত্যক্ষযোগ্যতা কারণ হয়।

৫.০০.০৮ ■ সমবায়ের প্রত্যক্ষ

অভাবের ন্যায় সমবায়ের প্রত্যক্ষেও বিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ। পুষ্পে গন্ধ সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এখানে পুষ্প সমবায়ের অনুযোগী এবং গন্ধ সমবায়ের প্রতিযোগী। সমবায় সম্বন্ধ নিজে তার অনুযোগীতে ও প্রতিযোগীতে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে। এই স্বরূপ সম্বন্ধ কখনো বিশেষণ স্বরূপ কখনো বিশেষ্য স্বরূপ।

'গন্ধসমবায়বিশিষ্ট পুষ্প' স্থলে পুষ্প বিশেষ্য এবং গন্ধ সমবায় হল বিশেষণ। এইরূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হল বিশেষণতা। কিন্তু 'পুষ্পে গন্ধসমবায়' এইরূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষে গন্ধসমবায় বিশেষ্য, পুষ্প বিশেষণ। এখানে সন্নিকর্ষটি হল বিশেষ্যতা। বিশেষণতা ও বিশেষ্যতা সন্নিকর্ষ বিশেষণতা সন্নিকর্ষেরই অন্তর্গত।

উপরিউক্ত নানাবিধ বিশেষণতা সন্নিকর্ষ কিন্তু এক বলে পরিগণিত। তা নইলে 'লৌকিক সন্নিকর্ষ ষড়বিধ'— এই প্রচলিত উক্তি ব্যাহত হয়।

৫.০১.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

উদ্ভূতত্ব

রূপ উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে দুই প্রকার। এই দুই প্রকার রূপের মধ্যে যে রূপ উদ্ভূত তারই প্রত্যক্ষ হয়, অনুদ্ভূত রূপের প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূতরূপ ও উদ্ভূতরূপবান দ্রব্য চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের কারণ। ঘটের রক্তরূপ উদ্ভূত বলে তা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। কিন্তু চক্ষুরশ্মির রূপ অনুদ্ভূত বলে তার প্রত্যক্ষ হয় না। যে রূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষগোচর হয় তা সব সময়ই উদ্ভূতরূপ। ন্যায়মতে সাংকর্যবশতঃ উদ্ভূতত্ব ধর্মটি জাতি হয় না কিন্তু অনুদ্ভূতত্ব ধর্মটি জাতি হয়।

ইন্দ্রিয়

ইন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় ভেদে দ্বিবিধ। ন্যায়মতে কর্মেন্দ্রিয় স্বীকৃত না হওয়ায় পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও মন এই ছয়টিকেই ইন্দ্রিয় বলা হয়। পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ভৌতিক। যা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের অনাশ্রয় অথচ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় তাই ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ। ইন্দ্রের অনুমাপককে বলে ইন্দ্রিয়। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ আত্মা। ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় নেই। তাই বলা যয়া, যা জীবাত্মার অনুমাপক তাই ইন্দ্রিয়।

সাংকর্য

সাংকর্য অন্যতম জাতিবোধক। 'সাংকর্য' বলতে বোঝায় এমন দুটি পদার্থের একত্র অবস্থিতি যারা পরস্পর পরস্পরের অভাবের সঙ্গে সহবস্থান করে। দুটি ধর্ম জাতি এরূপ হয় তাহলে ওই ধর্মের কোনটিকেই জাতি বলা যায় না। ভূতত্ব ও মূর্তত্ব ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারটি দ্রব্যে একত্র অবস্থান করে। আবার ভূতত্ব মূর্তত্বাভাবের সঙ্গে আকাশের এবং মূর্তত্ব ভূতত্বাভাবের সঙ্গে মনে অবস্থান করায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব সাংকর্যদোষে দুষ্ট হয়।

সমবায়

সমবায় হল নিত্য সম্বন্ধ। যে দুটি অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে আধার-আধেয় ভাব থাকে তাদের সম্বন্ধকে বলা হয় সমবায়। সমবায় যে দুটি পদার্থের মধ্যে থাকে তাদের একটিকে অপরটি থেকে কোনভাবেই পৃথক করা যায় না। অর্থাৎ সমবায় যাদের মধ্যে থাকে তারা কখনোই পৃথকভাবে অবস্থান করে না। ন্যায়মতে পাঁচটি ক্ষেত্রে সমবায় থাকে। এই পাঁচটি ক্ষেত্র হল, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, জাতি-ব্যক্তি, অবয়ব-অবয়বী এবং নিত্যদ্রব্য ও বিশেষ।

সংযোগ

সংযোগ দুটি দ্রব্যের মধ্যস্থিত অনিত্য সম্বন্ধ। যে দুটি দ্রব্যের মধ্যে সংযোগ থাকে তারা পূর্বে পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে আবার পরবর্তীকালেও পৃথকভাবে অবস্থান করতে পারে, যেমন হাতের সঙ্গে কলমের সম্বন্ধ।

অনুপলব্ধি

উপলব্ধির অভাবকে বলে অনুপলব্ধি। মীমাংসা মতে অনুপলব্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। এই প্রমাণের দ্বারা অভাবের উপলব্ধি হয় বলে একে অভাবপ্রমাণ বলা হয়। ন্যায়মতে অনুপলব্ধি অভাবপ্রত্যক্ষের অন্যতম কারণমাত্র, স্বতন্ত্র প্রমাণ নয়। যে কোন প্রকার অনুপলব্ধিই অবশ্য অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ হয় না। যে অবস্থায় কোন পদার্থের উপলব্ধি হয় সেই অবস্থায় পদার্থের অনুপলব্ধিই হল অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। এইরূপ অনুপলব্ধিকে বলে যোগ্যানুপলব্ধি।

অনুযোগী

অভাব ও সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অনুযোগী-প্রতিযোগী ভাব থাকে। যেখানে বা যে অধিকরণে অভাব থাকে তাকে তার অনুযোগী বলে। ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ভূতল হল অনুযোগী। ন্যায়মতে অভাব অনুযোগীর বিশেষণ বিশেষ। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যেখানে সম্বন্ধ থাকে সেটি হল সম্বন্ধের অনুযোগী। রক্তঘটের ক্ষেত্রে ঘট ও রক্তবর্ণের যে সম্বন্ধ তাতে ঘট অনুযোগী। বৃক্ষে বানর সংযোগের ক্ষেত্রে বৃক্ষ অনুযোগী।

প্রতিযোগী

কোন অধিকরণে যার অভাব থাকে তাকে ওই অভাবের প্রতিযোগী বলে। ভূতলে ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল অভাবের প্রতিযোগী। সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যার সম্বন্ধ সেটি তার প্রতিযোগী। রক্তঘটের ক্ষেত্রে রক্তবর্ণ হল প্রতিযোগী। বৃক্ষে বানরসংযোগের ক্ষেত্রে বানরসংযোগ হল প্রতিযোগী।

অভাবাভাব

ন্যায়-বৈশেষিক মতে ভাব পদার্থের যেমন অভাব হয় তেমনি অভাবেরও অভাব হয়। প্রাগ্‌ভাবের ধ্বংস হলে প্রাগ্‌ভাবের অভাব হয়। আবার ধ্বংসাভাবের উৎপত্তির পূর্বে ধ্বংসাভাবের অভাব থাকে। অনুরূপভাবে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব, অন্যোন্যাভাবের অন্যোন্যভাব প্রভৃতি অভাবের অভাব ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত। উদয়নাচার্য প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ অভাবের অভাবকে ভাব পদার্থ বলেন। নব্য ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ অবশ্য অভাবের অভাবকে ভাব পদার্থ বলে স্বীকার করেন না। ঘটের অভাব যেমন একটি অভাব পদার্থ, তেমনি ঘটাভাবের অভাবও একটি অভাব পদার্থ।

৫.০২.০০. ■ সারাংশ

এখন প্রশ্ন হল, সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ, না করণ, না ব্যাপার? বিশ্বনাথ ৫৯ সংখ্যক কারিকায় স্পষ্টতঃ বলেছেন ''বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধো ব্যাপারঃ'' বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকেই তিনি সন্নিকর্ষ বলেছেন। আবার এই সন্নিকর্ষই হল প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপার (ব্যাপারঃ সন্নিকর্ষঃ)। ব্যাপারের লক্ষণে

ন্যায়দর্শনে বলা হয় ''তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্যজনকো ব্যাপারঃ।'' অর্থাৎ যা স্বয়ং কোনও কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে ওই কারণ থেকে উৎপন্ন অন্য কোনও কার্যের প্রতিও কারণ হয় তাকে ওই কার্যের প্রতি ব্যাপার বলা হয়। যেমন; ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয় থেকে উৎপন্ন হয়ে আবার ওই কারণের দ্বারা উৎপন্ন প্রত্যক্ষজ্ঞানের জনক হয় বলে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি ব্যাপার বলা হয়। আবার যা ব্যাপারবৎ তাই করণ। ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষবান বলে তা প্রত্যক্ষজ্ঞানের করণ।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষকে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— লৌকিক ও অলৌকিক। লৌকিক সন্নিকর্ষকে তিনি পুনরায় ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ হল : (১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত-সমবায় (৩) সংযুক্ত সমবেত সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত সমবায়, ও (৬) বিশেষণতা সন্নিকর্ষ।

দ্রব্যের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষের প্রয়োজন হয় তাকে সংযোগ সন্নিকর্ষ বলা হয় যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদির প্রত্যক্ষ। ন্যায়মতে দ্বিতীয় প্রকার বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের নাম হল সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে সমবেত বা সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমান হল রূপ-রসাদিগুণ, গমনাদি ক্রিয়া ও গোত্বাদি জাতি। এর মধ্যে শব্দভিন্ন প্রত্যক্ষগ্রাহ্য যাবৎ গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যগত জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা। দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষে তিনটি সম্বন্ধ অপেক্ষিত; (১) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে দ্রব্যের সংযোগ, (২) দ্রব্যের সঙ্গে গুণাদির সমবায়, এবং (৩) গুণাদির সঙ্গে গুণাদিগত গুণত্বাদি জাতির সমবায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটরূপের রূপত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় সংযুক্তসমবেতসমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে। এই সন্নিকর্ষে চক্ষুর সঙ্গে ঘটের সংযোগ, ঘটের সঙ্গে ঘটরূপের সমবায় এবং ঘটরূপের সঙ্গে রূপত্বজাতির সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষিত।

শব্দের প্রত্যক্ষে সমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কর্ণবিবরবর্তী যে আকাশ তাই শ্রবণেন্দ্রিয়। আবার শব্দ একটি গুণ পদার্থ। শব্দ হল আকাশদ্রব্যের বিশেষগুণ। আকাশের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। ফলতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। অতএব শব্দ প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল সমবায় সন্নিকর্ষ। শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষে সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ কারণ। জাতি ব্যক্তিতে সমবায় সম্বন্ধ থাকে। অতএব শব্দের সঙ্গে শব্দত্বের সম্বন্ধ হল সমবায় সম্বন্ধ। আবার কর্ণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধও হল সমবায় সম্বন্ধ। অতএব শব্দত্বের গ্রহণের যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল সমবেতসমবায় সন্নিকর্ষ।

ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের অন্তিম সন্নিকর্ষ হল বিশেষণতা সন্নিকর্ষ। সমবায় ও অভাবের প্রত্যক্ষে যে সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত তা হল বিশেষণতা সন্নিকর্ষ (সমবায়ে অভাবে চ বিশেষণতয়া ভবেৎ)। বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। সমবায়কে অনুমানের সাহায্যে জানতে হয়। কিন্তু ন্যায়মতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয়। অভাব ও সমবায়ের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষই কারণ। বিশেষণতা সনিকর্ষ আবার নানাবিধ। ষড়বিধ সন্নিকর্ষের দ্বারা যে সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় সেই সব বিষয়ের অভাব প্রত্যক্ষস্থলে ওই ওই সন্নিকর্ষের সঙ্গে বিশেষণতা সন্নিকর্ষ কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ ভূতলে ঘটের প্রত্যক্ষে সংযোগ সন্নিকর্ষ কারণ হয় বলে ভূতলে ঘটাভাব প্রত্যক্ষে কারণ হয় সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষ। আবার, কোন বিষয় যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য

তার অভাবও সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ্য। চক্ষুর ন্যায় অন্যান্য বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনের দ্বারাও সংযুক্তবিশেষণতা সন্নিকর্ষের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অভাব প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে।

ন্যায়মতে অভাবপ্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধি কারণ। যোগ্য অনুপলব্ধি অর্থাৎ যে অনুপলব্ধির যোগ্যতা আছে সেইরূপ অনুপলব্ধিই অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ হয়। যে পদার্থের উপলব্ধি যোগ্যতা আছে তার অনুপলব্ধিই হল যোগ্যানুপলব্ধি।

৫.০৩.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

1. What is *indriya*?
2. Is *indriyatva* a *jāti*?
3. Why is *indriyatva* not a *jāti*?
4. Why is *udbhutatva* not a *jāti*?
5. What is the definition of *indriya* given by Viś́vanātha?
6. What is *sannikarṣa*?
7. How do we perceive *śabda*?
8. By what *sannikarṣa* do we perceive the absence of a pot on the ground?
9. How do we perceive *rupatva*?
10. Which *sannikarṣa* is needed to perceive the colour of a jar?
11. What are the different types of *laukika sannikarṣa*?
12. What are the different types of veśeṣaṇatā sannikarṣa?

রচনাধর্মী প্রশ্নাবলী :

1. State the definition of *indriya* formulated by Viś́vanātha and explain it.
2. Fully explain the definition of *indriya* given by Viś́vanātha indicating the necessity of each term occurred in the definition.
3. What are the different type of *laukika sannikarṣa*? Explain with examples different types of *laukika sannikarṣa*.

4. What are the different types of *viśeṣaṇatā sannikarṣa*. How are *samavāya* and *abhāva* perceived? discuss.

5. What is *yogyānupalabdhi* ? Why is it necessary for perceiving the absence of a thing?

৫.০৪.০০ ■ সহায়ক পুস্তক

১) ভাষাপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৬) ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭) Bhāṣāapariccheda, Swami Mādhabānanda.

৮) Perception, B. K. Matilal.

একক - ৬

বিষয়-সূচী

৬.০০.০০ অলৌকিক সন্নিকর্ষ

৬.০১.০০ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ

৬.০১.০১ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি

৬.০২.০০ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ

৬.০২.০১ সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের পার্থক্য

৬.০৩.০০ যোগজপ্রত্যক্ষ

৬.০৪.০০ প্রমা

৬.০৪.০১ প্রমার লক্ষণ

৬.০৫.০০ অন্যথাখ্যাতিবাদ

৬.০৬.০০ কতিপয় শব্দের অর্থ

৬.০৭.০০ সারাংশ

৬.০৮.০০ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.০৯.০০ সহায়ক পুস্তক

৬.০০.০০ ■ অলৌকিক সন্নিকর্ষ

ভূমিকা : ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষ আলোচনা করার পর গ্রন্থকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের আলোচনার সূচনা করতে বলেছেন, ''অলৌকিকঃ সনিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ''। 'অলৌকিক' পদের অর্থ হল যা লৌকিক নয় বা লৌকিক-অতিবর্তী। অর্থাৎ ষড়বিধ সন্নিকর্ষের অতিরিক্ত সন্নিকর্ষকেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্বে এই ষড়বিধ সন্নিকর্ষ ব্যতীতও তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ ছাড়াও আমাদের নানাপ্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। সেইসব প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য এই ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের অতিরিক্ত সন্নিকর্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন। ন্যায়মতে জন্যপ্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ কারণ। যেসব সন্নিকর্ষের দ্বারা ষড়বিধ লৌকিক প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত জন্যপ্রত্যক্ষ হয় সেগুলিকেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে এবং অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাদের আলৌকিক প্রত্যক্ষ বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, এমন কি বিষয় আছে যাদের প্রত্যক্ষ ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা হতে পারে না। বিশ্বনাথ বলেছেন যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযোগাদি বিনাই হতে পারে। অর্থাৎ আমাদের এমন

সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় যেগুলির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগাদি সম্ভব নয়। এর কারণ এই সব বিষয় ইন্দ্রিয়ের সমীবর্তী নয় বা নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের অভিমুখে অবস্থিত নয়। ন্যায়মতে অতীত, অনাগত বা নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রহণযোগ্য বিষয়েও প্রত্যক্ষ হয়। এই সব বিষয়ের প্রত্যক্ষের প্রতিও নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষকেই কারণ বলেছেন। এই বিষয়গুলির প্রত্যক্ষের জন্যই ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। এই তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ হল সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। এখন আমরা এই ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষের স্বরূপ আলোচনা করব। গ্রন্থকার 'সন্নিকর্ষ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রত্যাসত্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'প্রত্যাসত্তি' শব্দটি সন্নিকর্ষবোধক। তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা তিন প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়।

৬.০১.০০ ■ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ

লৌকিক বা সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জ্ঞান লাভ করি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন এক ক্ষণে আমরা কোন একটি বিশেষ মানুষের বা বিশেষ গরুর জ্ঞান লাভ করি। সকল মানুষ বা সকল গরুর সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাধারণ বা লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব হয় না। তাহলে প্রশ্ন হ'ল সকল মানুষের ও সকল গরুর জ্ঞান আমরা কিভাবে লাভ করি? ন্যায়মতে কোন একটি বস্তুর প্রত্যক্ষকালে বস্তুটির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যেমন একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় তেমনি ওই বস্তুর সামান্যধর্মের মাধ্যমে ওই জাতীয় সকল বস্তুর সঙ্গে একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। আমরা যখন 'রাম' নামক কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি তখন ওই 'রাম' নামক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যেমন একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় তেমনি ওই রামের সামান্যধর্ম মনুষ্যত্বের সঙ্গেও আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। দ্রব্যের সামান্যধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ বলেছেন। এই সামান্যধর্ম প্রত্যক্ষের পর ওই সামান্যধর্মকে দ্বার করে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

সামান্যলক্ষণ সনিকর্ষ স্থলে 'লক্ষণ' পদের অর্থ দ্বিবিধ— স্বরূপ ও জ্ঞান (জ্ঞানের বিষয়) সুতরাং সামান্যস্বরূপসন্নিকর্ষ বা সামান্যবিষয়ক সন্নিকর্ষই হল সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ। সামান্যজ্ঞান আবার সামান্যবিশেষ্যকে জ্ঞান ও সামান্যপ্রকারক জ্ঞান হতে পারে। এই কারণে নব্যনৈয়ায়িকগণ সামান্যবিষয়ক জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলেছেন। এর দ্বারা সামান্যপ্রকারকজ্ঞান ও সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞান উভয়প্রকার জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। কিন্তু প্রাচীনগণ কেবল সামান্যপ্রকার জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলেন।

আবার সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্থলে 'সামান্য' পদের দ্বারা 'সামানানাং ভাব' এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রাহ্য, পারিভাষিক জাতি অর্থ গ্রাহ্য নয়। সামান্যধর্ম যেমন নিত্য জাতি হতে পারে তেমনি আবার অনিত্য কোন দ্রব্য বা গুণও হতে পারে। অর্থাৎ একাধিক আশ্রয়ে বর্তমান যে কোন জ্ঞানমান সাধারণধর্মই হল সামান্য। এই ধর্ম যেমন ক্ষেত্র বিশেষে ঘটত্বাদি জাতি হয় তেমনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে অনিত্য ঘটাদিও

হয়। যেখানে যাবৎ ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় সেখানে সন্নিকর্ষ হয় ঘটত্ব সামান্য। কিন্তু যেখানে যাবৎ ঘটবৎ ভূতলের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হবে সেখানে ঘটই হবে সন্নিকর্ষ। যেখানে একটি ঘট সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে জ্ঞান হয় তখন ঘটবিশিষ্ট যাবৎ ভূতলের অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য একপ্রকার সামান্যজ্ঞান হয়। এই জ্ঞানের প্রতি অনিত্য ঘটই সন্নিকর্ষ হয়। এইভাবে নিত্য ঘটত্বাদির ন্যায় অনিত্য ঘটাদিও সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে বিবেচিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, অনিত্য ঘটাদি বিষয় কিভাবে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ হতে পারে। গ্রন্থকার বলেছেন, যে স্থলে একটি ঘট সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে বা সমবায় সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হয়, তখন বা তারপরে তদ্‌ঘটবিশিষ্ট সকল ভূতলের বা তদ্‌ঘটবিশিষ্ট সকল কপালের জ্ঞান হয়। শেষোক্ত দুটি জ্ঞানের ক্ষেত্রেই ঘটত্ব সন্নিকর্ষ না হয়ে অনিত্য ঘটই সন্নিকর্ষ হয়। সুতরাং গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত হল নিত্য ঘটত্বাদি যেমন সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ হয় তেমনি অনিত্য ঘটাদিও সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ হয়।

যদি সামান্যমাত্রকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হত তাহলে সামান্য নিত্য হওয়ায় সকলেরই সর্বদা যাবৎ ধূম বা যাবৎ ঘটের প্রত্যক্ষ হতে পারত। কিন্তু বস্তুতঃ তা হয় না। এজন্য সামান্যমাত্রকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ না বলে লৌকিকভাবে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধবিশেষ্যে প্রকারীভূত সামান্যকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলতে হবে। যেক্ষেত্রে কোন ধূমের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নামক লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় সেক্ষেত্রে ধূমজ্ঞানে ধূম বিশেষ্য এবং ধূমত্ব প্রকার হয়। এইরূপ ধূমত্বকে ইন্দ্রিসংবদ্ধ ধূমবিশেষ্যকজ্ঞানের প্রকারীভূত সামান্য বলা হয়। এই জ্ঞানে সন্নিকর্ষ হল সংযুক্তসমবায়। এটি লৌকিক সন্নিকর্ষ। এই লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা কোন একটি বিশেষ ধূমে ধূমত্বের প্রত্যক্ষই হয়। কিন্তু যাবৎ ধূমের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে এই বিশেষ ধূমে জ্ঞাত ধূমত্বকে দ্বার করে আমাদের দেশান্তরস্থিত ও কালান্তরস্থিত যাবৎ ধূমের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। যাবৎ ধূমের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ না হয়েও তাদের প্রত্যক্ষ ওই প্রকারীভূত সামান্যের দ্বারাই হয়ে থাকে বলে একে সামান্যলক্ষণ নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়। এক্ষেত্রে পর পর দুটি প্রত্যজ্ঞানের প্রথমটি লৌকিক এবং দ্বিতীয়টি অলৌকিক। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ধূমের লৌকিক সন্নিকর্ষ ব্যতীত যেহেতু এই জ্ঞান হয় না সেহেতু সর্বদা এই জ্ঞানের উৎপত্তির আশঙ্কা আর থাকে না।

পুনরায় ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ বিশেষ্যের প্রকারীভূত সামান্যকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ না বলে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ বিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্যকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলতে হবে। তা না হলে ভ্রমজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা যাবে না। আমাদের যখন ধূলিসমূহে ধূম্র ভ্রম হয় তখন ধূলিসমূহই ওই জ্ঞানের বিশেষ্যরূপে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ হয় অথচ প্রকারীভূত সামান্য হয় ধূমত্ব। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ধূমত্ব প্রকারীভূত সামান্যরূপে ভাসমান হলেও বিষয়রূপে তা ধূলিসমুহে থাকতে পারে না। এইজন্য ওই ধূমত্বকে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ বিশেষ্যকজ্ঞানের প্রকারীভূত সামান্য বলা গেলেও ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ বিশেষ্যের প্রকারীভূত সামান্য বলা যায় না। জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য ধূমত্বের দ্বারাই যাবৎ ধূমের সামান্যলক্ষণপ্রত্যক্ষ হতে পারে, অন্য কোনভাবে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ ধূলিপটলে কোনভাবে ধূমত্ব থাকতে পারে না এবং তার দ্বারা যাবৎ ধূমের সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষও হতে পারে না। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ জ্ঞায়মান সামান্য বা সামান্যজ্ঞান বা সামান্যপ্রকারক জ্ঞানকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বললেও এই কারণে নব্যনৈয়ায়িকগণ সামান্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলেন।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের পক্ষে বিশ্বনাথ দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত : সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তা অসিদ্ধ হতে পারে। যেখানেই ধূম সেখানে বহ্নি— এইরূপ ব্যাপ্তি কেবল অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্নির অন্বয় এবং জল হ্রদাদি কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্নির ব্যতিরেক দর্শনের মাধ্যমে নিখিল ধূম ও নিখিল বহ্নির মধ্যে নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর জন্য ধূমত্বরূপে সকল ধূম ও বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির অলৌকিক সামান্যলক্ষণপ্রত্যক্ষ দরকার। এইরূপ সামান্যলক্ষণপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংবদ্ধ ধুম ও বহ্নির সঙ্গে ধূমত্ব ও বহ্নিত্ব প্রকারীভূত জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব অনুমান প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার্য।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়া ব্যাপ্তিসম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। ধূম ও বহ্নির অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনের পর তাদের সাহচর্য নিয়ত কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় স্বভাবতই দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হল এইরূপ সংশয়ের ভিত্তি কি। যে সব স্থলে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য দর্শন করা হয়েছে সে সব স্থলে উভয়ের সাহচর্য বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। আবার যে সকল স্থলে ধূম দর্শন হয়নি সে সব স্থলে সংশয় হতে পারে না। কোন ধর্মীতেই কোন ধর্মের সংশয় হয়। কোন ধর্মী যদি লৌকিকভাবে জ্ঞাত নাও হয়ে থাকে তবু সেই ধর্মীতে ধর্মের সংশয় হতে পারে যদি ধর্মী সামান্যতঃ জ্ঞাত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বিশ্বের সর্বত্র ধূমের স্থল প্রত্যক্ষ না হলেও যদি ধূমত্বজ্ঞানের মাধ্যমে সকল ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয় তাহলে যাবৎ ধূমের স্থলেই বহ্নির সাহচর্য বিষয়ে সংশয়ের উপপত্তি হতে পারে। আর এইরূপ সংশয় উপপন্ন হলে তবেই ধূম ও বহ্নির মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং অনুমিতির জন্য যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রয়োজন তেমনি ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য ব্যাপ্তিসম্বন্ধে সংশয় স্বীকার করা প্রয়োজন। আর এরূপ সংশয়ের উপপত্তির জন্যই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্য স্বীকার্য।

৬.০১.০১ ■ সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের বিরুদ্ধে আপত্তি

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের বিরুদ্ধে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন যে, সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের সাহায্যে যদি একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে সেই জাতীয় সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের জ্ঞাতাকে সর্বজ্ঞ বলতে হয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেছেন যে, সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা কোন একটি জাতির অন্তর্গত যাবতীয় ব্যক্তির সামান্য জ্ঞানই লাভ করি, বিশেষজ্ঞান লাভ করি না। যাবতীয় ঘটের সামান্যজ্ঞান, যাবতীয় ঘটের বিশেষজ্ঞান থেকে ভিন্ন। তাই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের বিরুদ্ধে সর্বজ্ঞতার আপত্তি নিরর্থক। কোন বিষয়ের সামান্যজ্ঞান লাভ হলেই জ্ঞাতাকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বস্তুর সামান্যজ্ঞানের অধিকারী তেমনি বিশেষজ্ঞানেরও অধিকারী। নৈয়ায়িকগণ সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের সাহায্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তমঃ প্রাগ্‌ভাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসায়, অভাব, ভ্রম প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করেন। নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অবশ্য স্বকীয় যুক্তিতে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেছেন।

৬.০২.০০ ■ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ

দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ হল জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এখানে 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ স্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ যে সন্নিকর্ষ তাই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এখানে জ্ঞান বলতে স্মৃতিজ্ঞানকেই বুঝতে হবে। পূর্বজ্ঞান কোন পদার্থ স্মৃতিরূপে বর্তমান কালে জ্ঞানের বিষয়ে প্রকার রূপে যখন ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয় তখন ওই স্মৃতি জ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে অভিহিত হয়। যে পদার্থটি স্মৃত হয় তা বর্তমানে লৌকিকভাবে ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হতে পারে না। এই জন্য এই সন্নিকর্ষ হল আলৌকিক সন্নিকর্ষ। যেহেতু বিষয়ের পূর্বলব্ধ জ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষের কারণ হয় সেই হেতু এই সন্নিকর্ষকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা নৈয়ায়িকগণ প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসায়, অভাব, ভ্রম প্রভৃতির প্রত্যক্ষ প্রতিপাদন করেন।

এক খণ্ড চন্দনের সঙ্গে যখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় তখন ওই চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তৎকালে চন্দনের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় না। এই সন্নিকর্ষ ব্যতীতই আমাদের চন্দনে সৌরভের জ্ঞান হয়ে থাকে। প্রশ্ন হল ওই জ্ঞান কিভাবে হয়? পূর্বে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন চন্দন সৌরভের লৌকিকভাবে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ ঘটেছিল তখন সেই সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের চন্দনের সৌরভের জ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে চন্দনের সৌরভের সন্নিকর্ষ না হলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি চন্দনের সন্নিকর্ষ হয় তাহলে পূর্বলব্ধ সেই চন্দন-সৌরভের স্মৃতি জ্ঞান সৌরভের জ্ঞান উৎপন্ন করে। এইরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৌরভের স্মৃতি জ্ঞান কারণ হয় বলে এইরূপ জ্ঞানের সন্নিকর্ষ হল জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। মোট কথা, চন্দনের সৌরভ যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় তাহলে এই প্রত্যক্ষের সন্নিকর্ষ হবে লৌকিক সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষ আর যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে চন্দন সৌরভের সন্নিকর্ষ না হওয়া সত্ত্বেও চন্দনের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বশতঃ সৌরভের জ্ঞান হয় তাহলে ওই জ্ঞানের সন্নিকর্ষ হবে জ্ঞানলক্ষণ নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ। এক্ষেত্রে চন্দনের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে লৌকিক এবং সৌরভের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হবে অলৌকিক। এই জন্য বলা হয় যে, সুরভি চন্দনের প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হবে চন্দনাংশে লৌকিক কিন্তু সৌরভাংশে অলৌকিক।

সুরভি চন্দনের ন্যায় 'সঃ অয়ং দেবদত্তঃ' এরূপ প্রত্যভিজ্ঞার ক্ষেত্রেও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ কারণ হয়। এরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে 'সঃ' পদের দ্বারা পূর্বকালীন দেবদত্তকে বোঝানো হয় এবং 'অয়ং' পদের দ্বারা বর্তমানকালীন দেবদত্তকে বোঝানো হয়। পূর্বে দেখা দেবদত্তের সঙ্গে বর্তমান কালে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হতে পারে না। পূর্বে দেখা দেবদত্তের স্মৃতিজ্ঞানই এখানে সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ এই কারণে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ নামে পরিচিত।

অনুরূপভাবে অনুব্যবসায়, অভাব ও ভ্রম প্রত্যক্ষেও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হয়।

৬.০২.০১ ■ সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের পার্থক্য

সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেই সন্নিকর্ষ, কোন না কোন জ্ঞানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। তবে উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের ফলের প্রভেদ আছে এবং এই জ্ঞানদ্বয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘটত্বজ্ঞান

যখন জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের সহায়ক হয় তখন ঘটত্ব বা ওই ঘটত্ববিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ ঘটই জ্ঞানের বিষয় হয়। বিষয়ের পূর্বানুভব স্মৃত্যাকারে ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্তী জ্ঞায়মান বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু ঘটত্বজ্ঞান যখন সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের সহায়ক হয় তখন ঘটত্ব বা সমীপবর্তী ঘট জ্ঞানের বিষয় না হয়ে বিশ্বের যাবতীয় ঘটই জ্ঞানের বিষয় হয়। তাই সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়, জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষের দ্বারা সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায় না।

৬.০৩.০০ ■ যোগজপ্রত্যক্ষ

তৃতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের নাম হল যোগজ সন্নিকর্ষ। নৈয়ায়িকগণ যোগীদের একপ্রকার আলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা লব্ধশক্তির মাধ্যমে ভূত, ভবিষ্যত, প্রচ্ছন্ন ও অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রত্যক্ষই হল যোগজ প্রত্যক্ষ। যোগী সাধারণত দুই প্রকার—যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী। যুক্তযোগী সিদ্ধপুরুষ, তাই তাঁর প্রত্যক্ষ নিত্য ও স্বতঃস্ফূর্ত। যুঞ্জানযোগী পূর্ণসিদ্ধিপ্রাপ্ত নন। তাই তাঁর প্রত্যক্ষ সাময়িক ও অনিত্য। সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন যোগজ প্রত্যক্ষে বিশ্বাসী। কিন্তু মীমাংসা দর্শন ও মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকার করেননি।

৬.০৪.০০ ■ প্রমা

ভারতীয় দর্শনে প্রমার আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় প্রমার বিভিন্ন লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। জৈন সম্প্রদায় ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ই স্মৃতিকে প্রমা জ্ঞানের বহির্ভূত করেছেন। যথার্থ স্মৃতি যথার্থজ্ঞান হলেও তা প্রমা নয়। কেন স্মৃতি প্রমা হতে পারে না তার কারণ হিসাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন যুক্তি দিয়েছেন। মোটকথা, স্মৃতি যথার্থই হোক আর অযথার্থই হোক তা কোনভাবেই প্রমা হতে পারে না। এই কারণে প্রমাকে কেবল যথার্থজ্ঞান বলা যায় না। যথার্থ স্মৃতি যথার্থ জ্ঞান হলেও তা প্রমা নয়। কেবল যথার্থ অনুভূতিই হল প্রমা। এই কারণে ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞানকে অনুভব ও স্মৃতি— এই দুই ভাগে বিভক্ত করে যথার্থ অনুভবকে প্রমা বলা হয়েছে। প্রমাকে তাই জ্ঞানের বিভাগ না বলে অনুভবের বিভাগ বলাই শ্রেয়। এই তথ্যগুলি স্মরণে রেখে আমরা এখন বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলীতে আলোচিত প্রমার লক্ষণে প্রবেশ করতে পারি।

৬.০৪.০১ ■ প্রমার লক্ষণ

বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদের ১২৬ কারিকায় বলেছেন ''অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানমিষ্যতে''। সরলার্থ এই যে, প্রমা ও অপ্রমা ভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ। ৫১ কারিকায় তিনি বলেছেন ''বুদ্ধিস্তু দ্বিবিধা মতা/অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ''। অর্থাৎ, বুদ্ধি বা জ্ঞান দ্বিবিধ অনুভূতি ও স্মৃতি। অনুভূতি আবার চার প্রকার— প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দ। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি এই চার প্রকার অনুভূতির চার প্রকার করণ নির্দেশ করেছেন। এই চার প্রকার করণ হল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। প্রত্যক্ষাদি এই চতুর্বিধ করণ যদি প্রমাণ হয়, তাহলে কারিকায় উক্ত প্রত্যক্ষাদি চতুর্বিধ অনুভূতি যে প্রমা হবে তা সহজেই বলা যায়। আবার ১৩৪

কারিকায় তিনি বলেছেন ''গুণঃ স্যাদ্ ভ্রমভিন্নস্তু জ্ঞানমাত্রোচ্যতে প্রমা''। অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন যে গুণপদার্থ জ্ঞান বলে পরিচিত, তাই প্রমা।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বিশ্বনাথ 'জ্ঞান' শব্দটিকে এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'জ্ঞান' বলতে তিনি এখানে অনুভবকেই বুঝিয়েছেন। আবার, 'ভ্রম' শব্দটিকে তিনি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'ভ্রম' বলতে তিনি এখানে সংশয়, তর্ক, এমনকি স্মৃতিকেও বুঝিয়েছেন। প্রমা যথার্থ অনুভব হওয়ায় তা যেমন ভ্রম, সংশয়াদি থেকে ভিন্ন তেমনি স্মৃতি থেকেও ভিন্ন। ৫১ কারিকায় যেহেতু যথার্থ অনুভূতিকেই গ্রন্থকার প্রমা বলেছেন সেহেতু ১৩৪ কারিকায় প্রমার লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যে জ্ঞানের কথা বলেছেন সেই জ্ঞান অনুভূতি অর্থেই গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি সেসব কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীটীকায় প্রমালক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''তৎবদ্‌বিশেষ্যকত্বে সতি তৎপ্রকারং জ্ঞানং প্রমা।'' একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় বিশেষ্য এবং এই বিশেষ্যের যে প্রকারে জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় প্রকার বা বিশেষণ। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘট হল বিশেষ্য এবং ঘটত্ব হল প্রকার। বিশেষ্যকে বোঝানোর জন্য 'তৎবদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'তৎবদ্' বলতে তৎপ্রকারবৎ বুঝতে হবে। অর্থাৎ যে প্রকারে বিশেষ্যের জ্ঞান হয় বিশেষ্য যদি সেই প্রকারবান হয় তাহলে অনুভবাত্মক জ্ঞানটি হবে প্রমা। 'এটি ঘট' এরূপ জ্ঞানকে ঘটবিশেষ্যক বা ঘটত্ববদ্ বিশেষ্যক (ঘটই ঘটত্ববদ্) এবং ঘটত্বপ্রকারক জ্ঞান বলা হয়। বস্তুতঃ এরূপ জ্ঞানে দুটি ধর্ম আছে; (ক) ঘটবিশেষকত্ব এবং (খ) ঘটত্বপ্রকারকত্ব। এই দুটি ধর্ম অবচ্ছেদ্য-অবচ্ছেদকভাবে উপস্থিত হয়। 'ঘট' শব্দ এখানে বিশেষ্যবোধক এবং 'তৎ' শব্দ এখানে প্রকারবোধক। সুতরাং যে বিশেষ্য যে প্রকারবান সেই বিশেষ্যের সেই প্রকারবিশিষ্ট রূপে যে অনুভূতি সেই অনুভূতিকেই বলা হয় প্রমা। ঘট ঘটত্বপ্রকারক হওয়ায় ঘটত্ববান রূপে ঘটের অনুভব হল প্রমা। এথেকে বোঝা যায় যে, প্রমা সর্বদা বিশিষ্ট জ্ঞান। অবিশিষ্ট জ্ঞানে এই প্রমালক্ষণের সঙ্গতি হয় না।

৬.০৫.০০. ■ অন্যথাখ্যাতিবাদ

ভূমিকা

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানমাত্রই প্রমা নয়। যে সকল জ্ঞান প্রমা নয়, তাদের বলা হয় অপ্রমা। অপ্রমা ন্যায়মতে ত্রিবিধ : বিপর্যয়, সংশয় ও তর্ক। বিপর্যয় হল ভ্রমজ্ঞান। ভারতীয় দর্শনে এরূপ জ্ঞানের অতি সুপিরিচিত নাম হল খ্যাতি। ভ্রমজ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য ভারতীয় দর্শনে যে সমস্ত মতবাদ গড়ে উঠেছে সেগুলি 'খ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন খ্যাতিবাদের প্রবর্ত্তক। প্রভাকর সম্প্রদায় ভ্রমজ্ঞান বলে কোন কিছু স্বীকার করেন না। এই কারণে প্রভাকর সম্প্রদায় প্রবর্তিত মতবাদ 'অখ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। কুমারিল সম্প্রদায়ের মতবাদ 'বিপরীত খ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। তাছাড়া মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 'অসৎখ্যাতিবাদ'; যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায়ের 'আত্মখ্যাতিবাদ'; অদ্বৈতবেদান্ত সম্প্রদায়ের 'অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদ' এবং ন্যায় সম্প্রদায়ের

'অন্যথাখ্যাতিবাদ' ভ্রমজ্ঞান সংক্রান্ত কয়েকটি সুপ্রচলিত মতবাদ। বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল ন্যায় সম্প্রদায় সমর্থিত অন্যথাখ্যাতিবাদ।

অন্যথাখ্যাতি

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক ভেদে দ্বিবিধ। ভ্রমজ্ঞান এক প্রকার সবিকল্পক জ্ঞান। সকল সবিকল্পক জ্ঞানেই তিনটি বিষয় থাকে। বিপর্যয় বা ভ্রমজ্ঞানটি নির্বিকল্পক জ্ঞান নয় বলে এই জ্ঞানেরও তিনটি বিষয় আছে। 'ইদং রজতম' এইরূপ বিপর্যয়জ্ঞানে ইদংপদবাচ্য শুক্তি বিশেষ্য, রজতত্ব প্রকার এবং সমবায় সংসর্গরূপে বিষয় হয়। শুক্তিতে রজতত্ব প্রকার না থাকায় এই জ্ঞান হল তৎ অভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞান। 'তদ্‌ভাববতি' এই পদস্থ 'তৎ' শব্দের দ্বারা প্রকার রূপ রজতত্বকে বুঝতে হবে। রজতত্বের অভাবের অধিকরণে (শুক্তিতে) রজতত্ব প্রকার হওয়ায় 'ইদং রজতম্' অর্থাৎ রজতত্বাভাববৎ শুক্তিবিশেষ্যক রজতত্বপ্রকারক এই জ্ঞান বিপর্যয়নামক অযথার্থ অনুভব। এই জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়ি-কারণ, আত্মমনঃসংযোগ অসমবায়িকারণ এবং চক্ষুঃ, দোষ, বিশেষ-অদর্শন, উদ্বুদ্ধসংস্কার, অদৃষ্ট, ঈশ্বরাদি নিমিত্ত কারণ। যাঁরা আত্মা স্বীকার করেন তাঁদের মধ্যে সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ বিষয়ে বিশেষ কোন মতপার্থক্য না থাকলেও নিমিত্তকারণ বিষয়ে মতপার্থক্য বর্তমান। দোষকে ভ্রম জ্ঞানের প্রতি অন্যতম নিমিত্ত কারণ বলতেই হয়। যেখানে বিপর্যয়জ্ঞান হয়, সেখানে কারণরূপে অবশ্যই কোন না কোন দোষ থাকে। যেমন, অন্ধকাররূপদোষে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। প্রতিফলিত সূর্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ থাকলেই শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। এইভাবে পিত্ত, দূরত্বাদি নানাবিধ দোষ বিপর্যয়জ্ঞানের কারণ হয়ে থাকে। দোষকে বিশেষ-অদর্শনেরও কারণ বলা যায়। এ বিষয়ে প্রভাকর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ন্যায়-বৈশেষিকদের তীব্র মতভেদ বর্তমান। প্রভাকর সম্প্রদায় দোষকে স্বাভাবিক কার্যোৎপাদক-সামর্থ্যের প্রতিবন্ধক বলেন। অপরদিকে, ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় দোষকে বিপরীতকার্যজনক বলেন।

ভ্রমজ্ঞানের কারণ বোঝা গেল। এখন প্রশ্ন হল, ভ্রমজ্ঞানের উৎপত্তি কিভাবে হয়? প্রথমেই বলা দরকার যে, ন্যায়মতে ভ্রমজ্ঞানের অন্যতম কারণ হল বিশেষজ্ঞানের অভাবে পূর্বলব্ধ জ্ঞানের উদ্বুদ্ধ সংস্কার বা স্মৃতি। যে ব্যক্তি পূর্বে কখনো কোনস্থানে সর্প দেখেনি তার কখনো রজ্জুতে সর্পভ্রম হতে পারে না। যে ব্যক্তি পূর্বে সর্প দেখেছে সে ব্যক্তিরই কবল সর্পের সংস্কার তার আত্মায় আশ্রিত থাকে। পরবর্তীকালে অল্পান্ধকারে কোন স্থানে কোন রজ্জুখণ্ডের সঙ্গে যদি তার চক্ষুর সংযোগ ঘটে তাহলে সাদৃশ্যবশত রজ্জুতে সর্পের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই রজ্জুখণ্ডে সর্পের প্রতিভাস ঘটায়। ফলে ওই ব্যক্তি রজুখণ্ডে সর্প দর্শন করে। এই জ্ঞানকে আমরা বলি ভ্রম। এইরূপ জ্ঞানে পূর্বলব্ধ সর্পের স্মৃতিজ্ঞান বা উদ্বুদ্ধ সংস্কার সন্নিকর্ষ হয়। এই প্রকার সন্নিকর্ষকে বলা হয় জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এটি একপ্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ। এইপ্রকার সন্নিকর্ষের অনন্তর আমরা রজ্জুতে সর্প বা শুক্তিতে রজত প্রত্যক্ষ করি। এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞানের অভাব, সাদৃশ্যজ্ঞান প্রভৃতি নিমিত্ততকারণ থাকে।

ন্যায়সম্মত ভ্রমজ্ঞান সংক্রান্ত এই মতবাদই অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত।

৬.০৬.০০ ■ কতিপয় শব্দের অর্থ

অলৌকিক

'অলৌকিক' শব্দের অর্থ হল ন-লৌকিক বা অতিলৌকিক। নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়-নিয়ম অনুযায়ী ছয় প্রকার সন্নিকর্ষকে যেহেতু লৌকিক বলেছেন সেহেতু তৎঅতিরিক্ত সন্নিকর্ষকে বলা হয়েছে অলৌকিক সন্নিকর্ষ। 'অলৌকিক' বলতে অবাস্তব বা অবান্তর কোনকিছুকে বোঝানো হয়নি। অলৌকিক সন্নিকর্ষগুলিও লৌকিক সন্নিকর্ষের ন্যায় বাস্তবিক জ্ঞানের কারণ হয়।

সামান্য

সামান্য ন্যায়-বৈশেষিক সম্মত চতুর্থ পদার্থ। সামান্য হল সমানধর্ম। একটি শ্রেণীর অন্তর্গত যাবৎ ব্যক্তির সাধারণধর্মকে বলা হয় সামান্য। ন্যায়মতে সামান্য নিত্য, এক এবং অনেকসমবেত। ন্যায়মতে সামান্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিতে সামান্যের প্রত্যক্ষ হয়। ঘটত্ব, পটত্ব, গোত্ব প্রভৃতি হল সামান্যধর্ম।

সামান্যজ্ঞান

ন্যায়মতে একটি বিষয়ের জ্ঞান দুইভাবে হতে পারে : সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ। আমরা যখন একটি গরু দেখি তখন সম্মুখস্থ গরুটির যেমন আমাদের বিশেষভাবে জ্ঞান হয়, তেমনি ওই গরুটির সাধারণধর্মের মাধ্যমে যাবৎ গরুর একটি সামান্যতঃ জ্ঞান হয়। একটি ব্যক্তিকে দেখে ওই শ্রেণীর সকল ব্যক্তির এইরূপ জ্ঞানকেই সামান্যজ্ঞান বলা হয়। যে ব্যক্তিটি ইন্দ্রিয়-সম্মুখে উপস্থিত হয় সেই ব্যক্তিটিরই কেবল বিশেষভাবে জ্ঞান হয়।

প্রত্যভিজ্ঞা

প্রত্যভিজ্ঞা হল ইন্দ্রিয় এবং পূর্বানুভবের স্মৃতি সহযোগে একপ্রকার বিশিষ্টজ্ঞান। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যভিজ্ঞাকে একপ্রকার সবিকল্পক প্রত্যক্ষ বলেন। এই প্রকার প্রত্যক্ষে একটি বিষয়ের পূর্বানুভব স্মৃত্যাকারে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষানুভবে কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে দেখা দেবদত্তকে যখন পুনরায় আমরা প্রত্যক্ষ করি তখন পূর্বানুভবের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে যে স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তা সম্মুখবর্তী দেবদত্তের বিশেষণরূপে বিষয় হয়ে ''এই সেই দেবদত্ত''—এইরূপ একটি প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন করে। এইরূপ প্রত্যক্ষই প্রত্যভিজ্ঞা।

বিষয়নিয়ম

বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার নিয়মকেই বলা হয় বিষয়নিয়ম। প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপবান দ্রব্য, দ্রব্যত্ব জাতি, দ্রব্যের রূপ ও রূপত্বের প্রত্যক্ষ হয়। আর ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্পর্শবান দ্রব্যের, দ্রব্যত্ব জাতির, স্পর্শের ও স্পর্শত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধ ও গন্ধত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয়। কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ ও শব্দত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রস ও রসত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয়। এগুলিই হল ইন্দ্রিয়ের বিষয়নিয়ম।

৬.০৭.০০ ■ সারাংশ

ন্যায়সম্মত জ্ঞানতত্ত্বে ষড়বিধ লৌকিক সন্নিকর্ষ ব্যতীতও তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকৃত হয়েছে। তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ হল সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা তিন প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। গ্রন্থকার 'সন্নিকর্ষ' শব্দের পরিবর্তে 'প্রত্যাসত্তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'প্রত্যাসত্তি' শব্দটি সন্নিকর্ষবোধক। আমরা এখন এই ত্রিবিধ অলৌকিক সন্নিকর্ষের স্বরূপ আলোচনা করব।

ন্যায়মতে কোন একটি বস্তুর প্রত্যক্ষকালে বস্তুটির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যেমন একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় তেমনি ওই বস্তুর সামান্যধর্মের মাধ্যমে ওই জাতীয় সকল বস্তুর সঙ্গে একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। আমারা যখন 'রাম' নামক কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করি তখন ওই 'রাম' নামক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যেমন একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় তেমনি ওই রামের সামান্যধর্ম মনুষ্যত্বের সঙ্গেও আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একটি লৌকিক সন্নিকর্ষ হয়। দ্রব্যের সামান্যধর্মের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষকে নৈয়ায়িকগণ সংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ বলেছেন। এই সামান্যধর্ম প্রত্যক্ষের পর ওই সামান্যধর্মকে দ্বার করে মনুষ্যত্ববিশিষ্ট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের একটি অলৌকিক সন্নিকর্ষ হয়।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্থলে 'লক্ষণ' পদের অর্থ দ্বিবিধ—স্বরূপ ও জ্ঞান (জ্ঞানের বিষয়)। সুতরাং সামান্যস্বরূপসন্নিকর্ষ বা সামান্যবিষয়ক সন্নিকর্ষই হল সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ। সামান্যজ্ঞান আবার সামান্যবিশেষ্যকে জ্ঞান ও সামান্যপ্রকারক জ্ঞান হতে পারে। এই কারণে নব্যনৈয়ায়িকগণ সামান্যবিষয়ক জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলেছেন। এর দ্বারা সামান্যপ্রকারজ্ঞান ও সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞান উভয়প্রকার জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলা হয়। সামান্যমাত্রকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ না বলে লৌকিকভাবে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধবিশেষ্যে প্রকারীভূত সামান্যকে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলতে হবে। যেক্ষেত্রে কোন ধূমের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নামক লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় সেক্ষেত্রে ধূমজ্ঞানে ধূম বিশেষ্য এবং ধূমত্ব প্রকার হয়। এইরূপ ধূমত্বকে ইন্দ্রিয়সংবদ্ধ ধূমবিশেষ্যকজ্ঞানের প্রকারীভূত সামান্য বলা হয়। এই জ্ঞানে সন্নিকর্ষ হল সংযুক্তসমবায়। এটি লৌকিক সন্নিকর্ষ। বিশেষ ধূমে জ্ঞাত ধূমত্বকে দ্বার করে আমাদের দেশান্তরস্থিত ও কালান্তরস্থিত যাবৎ ধূমের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। যাবৎ ধূমের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ না হয়েও তাদের প্রত্যক্ষ ওই প্রকারীভূত সামান্যের দ্বারাই হয়ে থাকে বলে একে সামান্যলক্ষণ নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলা হয়।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের পক্ষে বিশ্বনাথ দুটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত : সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার না করলে অনুমিতির করণ যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তা অসিদ্ধ হতে পারে। যেখানেই ধূম সেখানেই বহ্নি— এইরূপ ব্যাপ্তি কেবল অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্নির অন্বয় এবং জল হ্রদাদি কয়েকটি স্থানে ধূম ও বহ্নির ব্যতিরেক দর্শনের মাধ্যমে নিখিল ধূম ও নিখিল বহ্নির মধ্যে নিশ্চিত ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এর জন্য ধূমত্বরূপে সকল ধূম ও বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির অলৌকিক সামান্যলক্ষণপ্রত্যক্ষ দরকার।

সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকারের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এই প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়া ব্যাপ্তিসম্বন্ধে কোনরূপ সংশয়ের উপপত্তি হয় না। ধূম ও বহ্নির অন্বয় ও ব্যতিরেক দর্শনের পর তাদের সাহচর্য নিয়ত কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় স্বভাবতই দেখা দেয়। এখন প্রশ্ন হল এইরূপ সংশয়ের ভিত্তি কি। যে সব স্থলে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য দর্শন করা হয়েছে সে সব স্থলে উভয়ের সাহচর্য বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না। আবার যে সকল স্থলে ধূম দর্শন হয়নি সে সব স্থলে সংশয় হতে পারে না। কোন ধর্মী যদি লৌকিকভাবে জ্ঞাত নাও হয়ে থাকে তবু সেই ধর্মীতে ধর্মের সংশয় হতে পারে যদি ধর্মী সামান্যতঃ জ্ঞাত হয়ে থাকে।

সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধে কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন যে, সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের সাহায্যে যদি একটি বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করে সেই জাতীয় সকল বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ করা যায় তাহলে সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের জ্ঞাতাকে সর্বজ্ঞ বলতে হয়। এইরূপ আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেছেন যে, সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা কোন একটি জাতির অন্তর্গত যাবতীয় ব্যক্তির সামান্য জ্ঞানই লাভ করি, বিশেষজ্ঞান লাভ করি না। সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষের বিরুদ্ধে সর্বজ্ঞতার আপত্তি তাই নিরর্থক। কোন বিষয়ের সামান্যজ্ঞান লাভ হলেই জ্ঞাতাকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বস্তুর সামান্যজ্ঞানের অধিকারী তেমনি বিশেষজ্ঞানের অধিকারী।

দ্বিতীয় প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ হল জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এখানে 'লক্ষণ' শব্দের অর্থ স্বরূপ। সুতরাং জ্ঞান স্বরূপ যে সন্নিকর্ষ তাই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এখানে জ্ঞান বলতে স্মৃতিজ্ঞানকেই বুঝতে হবে। পূর্বজ্ঞাত কোন পদার্থ স্মৃতিরূপে বর্তমান কালে জ্ঞানের বিষয়ে প্রকার রূপে যখন ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হয় তখন ওই স্মৃতি জ্ঞানই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে অভিহিত হয়।

চন্দনের সঙ্গে যখন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয় তখন ওই চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তৎকালে চন্দনের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ হয় না। এই সন্নিকর্ষ ব্যতীত আমাদের চন্দনে সৌরভের জ্ঞান হয়ে থাকে। প্রশ্ন হল এই জ্ঞান কিভাবে হয়? পূর্বে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে যখন চন্দন-সৌরভের লৌকিকভাবে সংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষে ঘটেছিল তখন সেই সন্নিকর্ষের দ্বারা আমাদের চন্দনের সৌরভের জ্ঞান হয়েছিল। পরবর্তীকালে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে চন্দনের সৌরভের সন্নিকর্ষ না হলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি চন্দনের সন্নিকর্ষ হয় তাহলে পূর্বলব্ধ সেই চন্দন-সৌরভের স্মৃতি জ্ঞান সৌরভের জ্ঞান উৎপন্ন করে। এইরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৌরভের স্মৃতি জ্ঞান কারণ হয় বলে এইরূপ জ্ঞানেরর সন্নিকর্ষ হল জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এক্ষেত্রে চন্দনের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে লৌকিক এবং সৌরভের সঙ্গে সন্নিকর্ষ হবে অলৌকিক।

তৃতীয় প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষের নাম হল যোগজ প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িকগণ যোগীদের একপ্রকার আলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। যোগাভ্যাসের দ্বারা লব্ধশক্তির মাধ্যমে ভূত, ভবিষ্যত, প্রচ্ছন্ন ও অতি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রত্যক্ষই হল যোগজ প্রত্যক্ষ। যোগী সাধারণত দুই প্রকার— যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী।

প্রমার লক্ষণ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ 'জ্ঞান' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'জ্ঞান' বলতে তিনি এখানে অনুভবকেই বুঝিয়েছেন। আবার, 'ভ্রম' শব্দটিকে তিনি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 'ভ্রম' বলতে তিনি এখানে সংশয়, তর্ক, এমনকি স্মৃতিকেও বুঝিয়েছেন। প্রমা যথার্থ অনুভব হওয়ায় তা যেমন ভ্রম, সংশয়াদি থেকে ভিন্ন তেমনি স্মৃতি থেকেও ভিন্ন। ৫১ কারিকায় যেহেতু যথার্থ অনুভূতিকেই গ্রন্থকার প্রমা বলেছেন সেহেতু ১৩৪ কারিকায় প্রমার লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যে জ্ঞানের কথা বলেছেন সেই জ্ঞানকে অনুভূতি অর্থেই গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি সেসব কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মুক্তাবলীটীকায় প্রমালক্ষণের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''তৎবদ্‌বিশেষ্যকত্বে সতি তৎপ্রকারং জ্ঞানং প্রমা।'' একটি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিষয়ের জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় বিশেষ্য এবং এই বিশেষ্যের যে প্রকারে জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় প্রকার ও বিশেষণ। ঘটজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘট হল বিশেষ্য এবং ঘটত্ব হল প্রকার। বিশেষ্যকে বোঝানোর জন্য 'তৎবদ্' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'তৎবদ্' বলতে তৎপ্রকারবৎ বুঝতে হবে। অর্থাৎ যে প্রকারে বিশেষ্যের জ্ঞান হয় বিশেষ্য যদি সেই প্রকারবান হয় তাহলে অনুভবাত্মক জ্ঞানটি হবে প্রমা।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানমাত্রই প্রমা নয়। যে সকল জ্ঞান প্রমা নয়, তাদের বলা হয় অপ্রমা। অপ্রমা ন্যায়মতে ত্রিবিধ : বিপর্যয়, সংশয় ও তর্ক। বিপর্যয় হল ভ্রমজ্ঞান। ভারতীয় দর্শনে এরূপ জ্ঞানের অতি সুপরিচিত নাম হল খ্যাতি। ভ্রমজ্ঞান ব্যাখ্যার জন্য ভারতীয় দর্শনে যে সমস্ত মতবাদ গড়ে উঠেছে সেগুলি 'খ্যাতিবাদ' নামে পরিচিত। বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন খ্যাতিবাদের প্রবর্ত্তক। ন্যায়সম্মত ভ্রমজ্ঞান সংক্রান্ত মতবাদ অন্যথাখ্যাতিবাদ নামে পরিচিত। ন্যায়মতে ভ্রমজ্ঞানের অন্যতম কারণ হল উদ্বুদ্ধ সংস্কার বা স্মৃতি। যে ব্যক্তি পূর্বে কখনো কোন স্থানে সর্প দেখেনি তার কখনো রজ্জুতে সর্পভ্রম হতে পারে না। যে ব্যক্তি পূর্বে সর্প দেখেছে সে ব্যক্তিরই কেবল সর্পের সংস্কার তার আত্মায় আশ্রিত থাকে। পরবর্তীকালে অল্পান্ধকারে কোন স্থানে কোন রজ্জুখণ্ডের সঙ্গে যদি তার চক্ষুর সংযোগ ঘটে তাহলে সাদৃশ্যবশত এবং রজ্জুতে সর্পের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে ওই রজ্জুখণ্ডে সর্পের প্রতিভাস ঘটায়। ফলে ওই ব্যক্তি রজুখণ্ডে সর্প দর্শন করে। ওই জ্ঞানকে আমরা বলি ভ্রম। এইরূপ জ্ঞানে পূর্বলব্ধ সর্পের স্মৃতিজ্ঞান বা উদ্বুদ্ধ সংস্কার সন্নিকর্ষ হয়। এই প্রকার সন্নিকর্ষকে বলা হয় জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ।

৬.০৮.০০ ■ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

1. What is meant by *'alaukika'*?
2. What are the objects of *sāmānylakṣaṇa pratyakṣa*?
3. What are the two types of yogin?
4. By which *snnikarṣa* do we perceive all the members of a class?

5. What are the different types of *alaukika sannikarṣa*?
6. How do we perceive a snake in case of a rope?
7. What is *bhrama*?
8. What is the name of the *khyātivāda* upheld by the *Naiyāyikas*?
9. What is *pramā*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

1. (a) Clearly explain the nature of *sāmānyalakṣaṇa sannikarṣa*?
   (b) Whay is it called *alaukika*?
2. (a) What is *jñānalakṣaṇa snnikarṣa*?
   (b) What are the reasons for admitting such a *sannikarṣa*?
   (c) Why is it called *alaukika*?
3. Explain different versions of the definition of *pramā* after Viśvanātha.
4. What is *bhrama*? Explain the *anyathākhyātivāda* of the Naiyāyikas.
5. (a) What are the reasons for admitting *alaukika sannikarṣa*?
   (b) What are the reasons for admitting *sāmānyalakṣaṇa sannikarṣa*? Discuss.

৬.০৯.০০ ■ সহায়ক পুস্তক

১) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

২) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন শাস্ত্রীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৩) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল মুখোপাধ্যায়কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

৪) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, নিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারীকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৫) ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, আশুতোষ ভট্টাচার্যকৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

৬) ভাষাপরিচ্ছেদ সমীক্ষা, দীপক ঘোষ।

৭) Bhāṣāapariccheda, Swmi Mādhabānanda.

৮) Perception, B. K. Matilal.

Philosophy 4th Paper Part 1

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mallstuffs.com Internet Source	<1%
2	Lautemann, Sven-Eric. "Schemaevolution in objektorientierten Datenbanksystemen auf der Basis von Versionierungskonzepten", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	<1%
3	hdl.handle.net Internet Source	<1%
4	allrefs.net Internet Source	<1%
5	dpsmegacity.in Internet Source	<1%
6	Helmbrecht, Johannes. "Argument Structure of the Hocank (Winnebago) Clause", Lehmann, Christian, 2003. Publication	<1%
7	www.aajkaal.net Internet Source	<1%

8	www.aarezoha.blogfa.com Internet Source	<1%
9	www.bristol.ac.uk Internet Source	<1%
10	F.-X. Madec, W. Akakpo, L. Ferretti, D. Carnicelli et al. "Courbures congénitales du pénis : recommandations du Comité d'andrologie et de médecine sexuelle de l'Association française d'urologie", Progrès en Urologie, 2022 Publication	<1%
11	Haksoon Kim. "Experimental study of acoustic damping induced by gas-liquid scheme injectors in a combustion chamber", Journal of Mechanical Science and Technology, 01/2007 Publication	<1%
12	"Umwandlung von Primärenergie in Kraftwerken", Elektroenergiesysteme, 2006 Publication	<1%
13	156.17.94.1 Internet Source	<1%
14	Jong-Bok Lee. "Model tracking dual stochastic controller design under irregular internal noises", Journal of Mechanical Science and Technology, 05/2006 Publication	<1%

15	M. Tanabashi, K. Hagiwara, K. Hikasa, K. Nakamura et al. "Review of Particle Physics", Physical Review D, 2018 Publication	<1 %
16	Mehmet Itik. "Active vibration suppression of a flexible structure using sliding mode control", Journal of Mechanical Science and Technology, 08/2006 Publication	<1 %
17	Taek S. Jang. "Nonlinear wave interaction of three Stokes' waves in deep water: Banach fixed point method", Journal of Mechanical Science and Technology, 11/2006 Publication	<1 %
18	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
19	Ki-Jung Park. "Enhancement of pool boiling heat transfer coefficients using carbon nanotubes", Journal of Mechanical Science and Technology, 02/2007 Publication	<1 %
20	osms.wbsed.gov.in Internet Source	<1 %
21	"Theoretische Physik 2", Springer Science and Business Media LLC, 2005 Publication	<1 %

22	Hyung-Jo Choi. "Time discretization of nonlinear systems with variable time-delayed inputs using a Taylor series expansion", Journal of Mechanical Science and Technology, 06/2006 Publication	<1 %
23	Jeongbae Kim. "Experimental study on single bubble growth under subcooled, saturated, and superheated nucleate pool boiling", Journal of Mechanical Science and Technology, 05/2006 Publication	<1 %
24	Kyoung Kwan AHN. "Force control of hybrid actuator using learning vector quantization neural network", Journal of Mechanical Science and Technology, 04/2006 Publication	<1 %
25	Yong-Yook Kim. "Dynamic analysis and structural optimization of a fiber optic sensor using neural networks", Journal of Mechanical Science and Technology, 02/2006 Publication	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 19
Submission title:	Philosophy 5th Paper spl Part 1
File name:	Philosophy_5th_Paper_Total_Book_2013.pdf
File size:	1.75M
Page count:	166
Word count:	99,875
Character count:	366,756
Submission date:	29-Jul-2022 07:12AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876568630

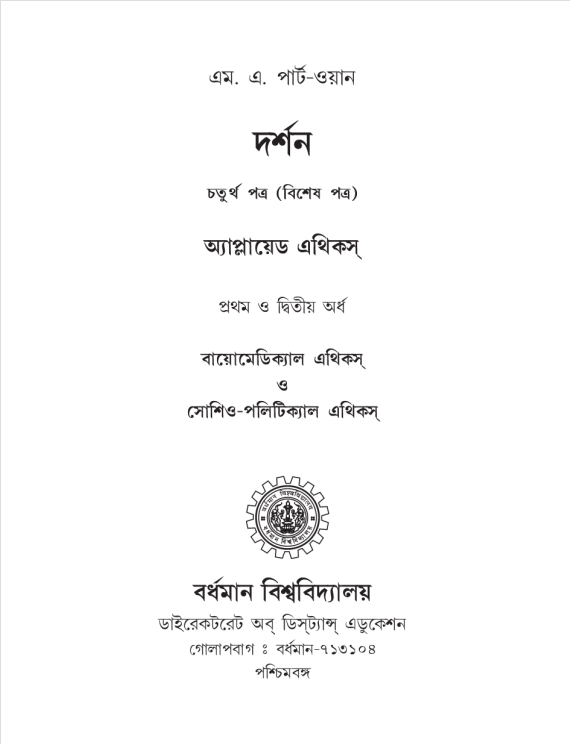

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

চতুর্থ পত্র (বিশেষ পত্র)

অ্যাপ্লায়েড এথিকস্

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্
ও
সোশিও-পলিটিক্যাল এথিকস্

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন
গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 5th Paper spl Part 1

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:12AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876568630
File name: Philosophy_5th_Paper_Total_Book_2013.pdf (1.75M)
Word count: 99875
Character count: 366756

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

চতুর্থ পত্র (বিশেষ পত্র)

অ্যাপ্লায়েড এথিকস্

প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্
ও
সোশিও-পলিটিক্যাল এথিকস্

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেকটরেট অব্ ডিস্ট্যান্স্ এডুকেশন
গোলাপবাগ ঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

১। অধ্যাপিকা মঞ্জুলিকা ঘোষ
প্রাক্তন অধ্যাপিকা
দর্শন বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
২। ড: সন্তোষ কুমার পাল, সহযোগী অধ্যাপক
দর্শনবিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১০

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
পুনর্মুদ্রণ : ২০০৯
পুনর্মুদ্রণ : ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ২০১৩

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত হওয়ায় ডিসেম্বর, ২০১২ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ. প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সব কিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ-প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বতমার্ন উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন চতুর্থ পত্রের (অ্যাপ্লায়েড এথিকস্ বিশেষ পত্র) সংকলনে রয়েছে চতুর্থ পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে '' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

প্রথম অর্ধ ঃ বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা অধিকরণ দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর স্তরে বিভিন্ন নূতন বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। স্নাতকোত্তর প্রথম পর্বের, চতুর্থ পত্রের প্রথমার্ধের বিষয় হল বায়ো-মেডিক্যাল এথিকস্। এটি ফলিত নীতিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এটির চর্চা পাশ্চাত্যে বেশ কিছুদিন ধরে শুরু হলেও আমাদের দেশে এর আলোচনা এখনও প্রাথমিক স্তরে। বায়ো-মেডিক্যাল এথিকস্ এমন কিছু সমস্যা তুলে ধরে যা তত্ত্বের গণ্ডিকে অতিক্রম করে আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে ও প্রায়শই বিতর্কের সৃষ্টি করে।

বর্তমান পুস্তিকাটিতে ড: সন্তোষকুমার পাল এই বিষয়টির বিভিন্ন দিক, এটির প্রধান প্রধান বক্তব্য, সমস্যা ও তার সমাধান সহজ ও সাবলীল ভাষায় প্রস্তুত করেছেন এবং মাতৃভাষায় এধরনের পুস্তকের অভাব পূরণে করেছেন। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ।

পাঠ্যাংশটির চারটি পর্ব। প্রথম পর্বে বায়ো-মেডিক্যাল এথিকস্-এর সূচনা ও বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে। এর মূলসূত্র ও প্রত্যয়গুলি ব্যাখ্যাত হয়েছে। রোগী বা স্বাস্থ্য-পরিষেবাভোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের ও চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে প্রজননগত অধিকার ও প্রযুক্তি, ভ্রূণনাশ, ভ্রূণাবস্থায় লিঙ্গনির্ধারণ, ক্লোনিং ইত্যাদির আলোচনা ও তৎ-সংলগ্ন নৈতিক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্বে জীনতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্রে এর ব্যবহারের নৈতিক ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ ও শেষ পর্বে দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসাসামগ্রীর বণ্টন কোন্ নৈতিক নীতিতে হবে তা যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আলোচনার প্রতিটি বিষয়ই বিতর্কিত এবং সমকালীন। এমন একটি বিষয়কে ড: পাল তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী সাজিয়ে, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে কি নৈতিক সঙ্কট তৈরী হয়, কিভাবেই বা তার মোকাবিলা করা যায়, তা -বাস্তব ও প্রাকল্পিক-উদাহরণের সাহায্যে উপস্থাপন করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সুলিখিত পুস্তিকাটি থেকে পাঠ্যবিষয়কে অনুসরণ ও অনুধাবন করতে দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের কোন অসুবিধা হবে না। তারা নিজেরাই, অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারবে—যা দূরশিক্ষা কার্যক্রমের অভীষ্ট।

পুস্তিকাটির আরেকটি গুণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজী শব্দগুলির উপযুক্ত প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থের স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি পাঠ-এককের শেষে সারাংশ, প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে। সব মিলিয়ে পুস্তিকাটি থেকে দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

এই পুস্তিকাটিকে সম্পাদনা করার যে দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে দিয়েছেন, আমি সাধ্যমত সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা অধ্যাপক ড: মোহনপদ পাল, সহ-অধিকর্তা শ্রীনবকুমার ঘোষ এবং দর্শনের কোর-ফ্যাকাল্টি ড: মলয় রায়কে তাদের সুচিন্তিত ও পরিশ্রমী উদ্যোগের জন্য অভিনন্দন ও সাধুবাদ জানাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য সুব্রত পাল এবং সহ-উপাচার্য্য ও কর্মসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব) ড: ষোড়শীমোহন দাঁ-কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, অনুপ্রেরণা ও সর্বস্তরে সতর্ক দৃষ্টি ছাড়া এই কর্মোদ্যোগ সাফল্য পেত না। এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দূরশিক্ষা বিভাগের সকল কর্মীকে তাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মঞ্জুলিকা ঘোষ

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং- ৭৩৪০১৩

সম্পাদকের নিবেদন

দ্বিতীয় অর্ধ ঃ সোশিও পলিটিক্যাল এথিকস্

(সামাজিক রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র)

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দূরশিক্ষা পাঠক্রমের শুরুর কাল সেই ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকেই দর্শনশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু আছে। পাঠক্রমের পরিবর্তনের কারণে এবং একইসঙ্গে দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে তোলার জন্য পাঠ-উপকরণের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ চলছে। এরই মধ্যে বহুদিন পর দর্শনের পাঠক্রমে আরেকটি বিশেষ পত্র 'ফলিত নীতিশাস্ত্র' (Applied Ethics) চলতি ২০১১-১৩ সেশন থেকেই সংযোজিত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন থেকে 'ন্যায়-বৈশিষক' - এর বিকল্প হিসাবে 'ফলিত নীতিশাস্ত্র' বিশেষ পত্র হিসাবে নির্বাচন করতে পারবে। ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী করে এই বিশেষ পত্রের পাঠ-উপকরণের প্রস্তুতির কাজও প্রায় শেষের দিকে। এই বিশেষ পত্রের চারটি অর্ধের মধ্যে চতুর্থ পত্রের দ্বিতীয়ার্ধ 'সামাজিক-রাজনৈতিক-নীতিশাস্ত্র' অংশটি সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমার উপর। দূরশিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই কাজে আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা করার জন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্পাদনার মূল কাজে প্রবেশ করার আগে 'ফলিত নীতিশাস্ত্র' (কেউ কেউ 'ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র'ও বলেন)-এর প্রকৃতি তথা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা খুবই জরুরী বলে আমার মনে হয়েছে। প্রথম যে সংশয়াত্মক প্রশ্নটি ফলিত নীতিশাস্ত্রকারদের মুখোমুখি হতে হয় তাহলে নীতিবিদ্যা স্বরূপগতভাবেই ফলদায়ী তথা ব্যবহারিক। কেননা সমাজবদ্ধ মানুষের নানাবিধ আচরণে ভালত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য নিরূপণ করাই তো নীতিশাস্ত্রের কাজ! সেক্ষেত্রে আলাদা করে ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র বা ফলিত নীতিশাস্ত্রের কথা বলার যৌক্তিকতা কি? ফলিত নীতিশাস্ত্রচর্চাকারীদের পক্ষ থেকে এর উত্তরে বলা যায়, হাঁ, আমাদের বাস্তব আচরণের নৈতিকমূল্য নিরূপণের তাগিদেই আদর্শনিষ্ঠ নীতিতত্ত্ব (normative ethics)-এর সূচনা হয়েছে। কিন্তু নীতিতত্ত্বের এই ঐতিহ্য ক্রমশঃ বিশুদ্ধ তাত্ত্বিকীকরণের দিকে মোড় নিয়েছে। একই রকমভাবে অধিনীতিবিদ্যা (metaetics) নামে যে নীতিশাস্ত্রের ধারা তা প্রত্যয়গত তথা অর্থগত বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেশি, ঠিক যে সময় মানুষের জীবন বিভিন্ন কারণে জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করেছে। বিংশ শতাব্দী থেকেই যুদ্ধ-সন্ত্রাস, মানবাধিকার, দারিদ্র প্রভৃতি বিষয় মানুষকে আরো আরো করে নৈতিক দ্বন্দ্বের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নতুন নতুন আবিষ্কার এমন অনেক নৈতিক প্রশ্নকে সামনে উপস্থিত করেছে যা অভূতপূর্ব। কিন্তু মহান বিশুদ্ধ তত্ত্বরচনা তথা সার্বজনীনতার মোহ সাবেকী নীতিদার্শনিকদের জীবনমুখী হওয়ায় পরিবর্তে বিমূর্ততা তথা অনৈতিহাসিকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরূপ এক সন্ধিক্ষণেই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন নীতিশাস্ত্রকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নীতিশাস্ত্রের আরেকটি নূতন ধারা (এই ধারার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক পিটার সিঙ্গারের ভাষায় 'আন্দোলন')বিকশিত হয়েছে, যাকে 'ফলিত নীতিশাস্ত্র' বা 'ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্র' বলা হয়েছে। নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবনের সামনে পড়ে নীতিনির্ধারণের প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত মানবতাকে উপযুক্ত নৈতিক দিশার সন্ধান দেওয়ার জন্য নীতিশাস্ত্রের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তা স্বীকার করেই বিগত প্রায় বছরে নীতিশাস্ত্রের যে পুনর্জাগরণ ঘটেছে তাই ফলিত নীতিশাস্ত্র।

জৈবপ্রযুক্তি তথা চিকিৎসাশাস্ত্রের অভাবনীয় উন্নতি, চিকিৎসাপ্রযুক্তির নতুন নতুন ব্যবহার একদিকে যেমন কঠিন দুরারোগ্য রোগ-নিরাময়ের সুযোগ এনে দিয়েছে, অন্যদিকে বিকল্প মাতৃত্ব, স্টেমসেল গবেষণার জন্য

ভ্রূণ তৈরী ইত্যাদি বিষয়গুলি নানাবিধ নৈতিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এসব নৈতিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ফলিত নীতিশাস্ত্রের উপবিভাগ হিসাবে জৈব-চিকাৎসা নীতিশাস্ত্র (Biomedical Ethics)-এর জন্ম হয়েছে। অনুরূপ, নীতিভাবনাকে অতিক্রম করে সমগ্র পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি নীতিদায়কে সম্প্রসারিত করা শুধু নৈতিকতারই দাবী নয়, পরিবেশ সমস্যা সমাধানের জন্যও তা জরুরীও। তাই গভীর বাস্তবাদী নীতিশাস্ত্রের চর্চা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, ব্যবসাবাণিজ্য তথা অন্যান্য বিভিন্ন পেশা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। সাবেকী নীতিভাবনা এরূপ পরিস্থিতির সামনে একান্ত অসহায় ঠেকেছে। দু-দশক আগে ঘটে যাওয়া ভূপাল গ্যাস ট্রাজেডি তার প্রমাণ। শুধুমাত্র শেয়ার-হোল্ডারদের প্রতিই নীতিদায় যে যথেষ্ট নয়, স্টেক-হোল্ডার আপামর জনসাধারণের প্রতি কর্পোরেট সেক্টারের দায়দায়িত্ব আছে — তা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। একইসঙ্গে নতুন নতুন পরিস্থিতির সামনে বিভিন্ন পেশার আচরণবিধি নির্দিষ্ট করার প্রয়োজনেই পেশাগত নীতিশাস্ত্রের জন্ম হয়েছে। ব্যবসায় এবং পেশাসমূহকে একসঙ্গে রেখে আমরা ব্যবসায় তথা পেশাগত নীতিশাস্ত্র (Business and Professional Ethics)-এর কথা বলতে পারি। আবার দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শনকে সামনে রেখে ফলিত নীতিশাস্ত্রে নতুন নতুন অধ্যয়ন শুরু হয়েছে। আমরা দেশীয় 'ফলিত ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে' (Practical Indian Ethics)-এর কথা বলতে পারি। (অবশ্য অনেকে মনে করেন বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যেই দেশীয় প্রেক্ষাপটকে ধরার চেষ্টা করাই শ্রেয়, নতুন এক উপবিভাগের সূচনা না করে)। একইরকমভাবে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে সন্ত্রাসবাদ, বর্ণ-বৈষম্যবাদ, লিঙ্গবৈষম্যবাদ, নতুন নতুন মোড়কে সংরক্ষণ, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ফলিত নীতিশাস্ত্রে আরেক উপবিভাগের জন্ম দিয়েছে যাকে আমরা 'সামাজিক-রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র' (Socio-political Ethics) বলতে পারি।

ফলিত নীতিশাস্ত্রে পদ্ধতি প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। সাবেকী নীতিশাস্ত্র 'উচ্চ-নীচ' অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method)-র অনুসরণ করে নৈতিক বিচার করার চেষ্টা করে। কিন্তু নীতির সঙ্গে নৈতিকতার বিষয়গুলির সম্পর্ক কৌটার সঙ্গে ঢাকনার সম্পর্কের মতো নয়। তাই সামান্য নীতি থেকে বিশেষ পরিস্থিতি বিচার করা সব সময় সম্ভব হয় না। পরিস্থিতির বিশেষত্ব অনেক সময় সংশ্লিষ্ট সার্বিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। তাই কোনো কোনো নীতিশাস্ত্রকার সার্বিক নীতির প্রাধান্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ বিষয়কে বিচার করার পদ্ধতিতত্ত্ব নীতিপ্রাধান্যবাদ (Principlism)-কে বাতিল করে ক্ষেত্রবিচার পদ্ধতি (Casuistry)-র প্রস্তাব করেছেন। আমাদের মনে হয়, নৈতিক নিয়মকে বাদ দিয়ে নীতি বিচার সম্ভব নয়। আমাদের বরং নীতি এবং পরিস্থিতি এই দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। এরূপ এক পদ্ধতির নাম 'চিন্তার ভারসাম্য পদ্ধতি' (reflective equilibrium method)। আবার নীতিবিচারের ক্ষেত্রে পেশাদার নীতিদার্শনিকদের একচেটিয়া অধিকার বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কর্তব্য-অকর্তব্য নিরূপণ বা কোন কর্মপন্থা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের মানুষজনের অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে ফলিত নীতিশাস্ত্রকারেরা। সকলের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন কেউ কেউ। কেউ কেউ আন্তর্ব্যক্তি সমন্বয় (intersubjective corroboration) এর কথা বলেছেন। যাই হোক, নীতিতত্ত্বের কোন আলোচনা ফলিত নীতিশাস্ত্রের অংশ কিনা তা নির্ধারণ করার একটি মানদন্ড হল কিরূপ পদ্ধতি সেখানে অনুসৃত হয়েছে তার নিরীক্ষণ।

যাই হোক, ফলিত নীতিশাস্ত্রে 'সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র' নামে এই অর্ধটি প্রস্তুত করেছেন আমার দুই সহকর্মী। অধ্যাপক সুনীল রায় প্রথম দুটি পাঠ একক — 'সমতা ও তার তাৎপর্য' (Equality and its implication) এবং 'যুদ্ধ-সন্ত্রসের নীতিকথা' (Ethics of Terror and War) —প্রস্তুত করেছেন। আর তৃতীয় ও চতুর্থ পাঠ-একক দুটি — 'নারীবাদী নীতিশাস্ত্র' ও 'গণমাধ্যম নীতিশাস্ত্র' — লিখেছেন সহকারী অধ্যাপক প্রশান্ত

সরকার। দূরশিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিয়মবিধি ও বাঞ্ছিত মান বজায় রেখে গঠনগত ও বিষয়গত উভয়দিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এই পাঠ এককগুলি প্রস্তুত করা হয়েছে। অধ্যাপক রায় এবং সহ-অধ্যাপক সরকার উভয়েই নির্দেশিত বিভাজন-রীতি মেনে যৌক্তিক পরম্পরা অনুসারে পাঠ-এককগুলি তৈরী করেছেন। প্রত্যেকটির সঙ্গে মূল বিষয় ছাড়া ভূমিকা, সংক্ষিপ্তসার, অনুশীলনের উপযোগী প্রশ্নাবলী এবং গ্রন্থপঞ্জী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এখানে যে সব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি নির্দিষ্ট স্থানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাই আলাদা করে 'গ্লোসারি' সংযোজনের প্রয়োজন হয় নাই। দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে সাবলীল ভাষায় এই পাঠক-এককগুলি রচনা করার জন্য পাঠ প্রস্তুতকর্তাদ্বয়কে অভিনন্দন জানাই।

'সমতা ও তার তাৎপর্য্য' নামক প্রথম পাঠ-এককটিতে পিটার সিঙ্গরকে অনুসরণ করে তথ্য ও যুক্তি সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন অধ্যাপক রায়। সমতা মানেই সকলেই সর্ববস্থায় সমান এরকম নয়। এর মধ্যে অনেক খুঁটিনাটি প্রকরণ সংশ্লিষ্ট আছে। এই সূত্র ধরেই বর্ণবৈষম্য, সংরক্ষণ বা সদর্থক কর্মসূচীর যুক্তি ও নৈতিকতা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন অধ্যাপক রায়। একইসঙ্গে তিনি এই ব্যবস্থা যে বিপরীত বৈষম্যের জন্ম দেয় তা মনে করিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পাঠ এককটির দুটি অংশ। প্রথমটি 'সন্ত্রাসবাদ ও নৈতিকতা' এবং দ্বিতীয় অংশটি 'যুদ্ধবিষয়ক আচরণ বিধি'। প্রথম অংশে যে তথ্য ও যুক্তির মধ্য দিয়ে আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অধ্যাপক রায় তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। দ্বিতীয় অংশ যুদ্ধবিষয়ক আলোচনা সুলিখিত ও যুক্তিসমৃদ্ধ। অ্যকুইনাসের ন্যায়যুদ্ধের শর্তগুলি কিভাবে পরবর্তীকালে পবিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়েছে তার আলোচনা সুলিখিত ও যুক্তিসমৃদ্ধ। অ্যকুইনাসের ন্যায়যুদ্ধের শর্তগুলি কিভাবে পরবর্তীকালে পরিবর্তিত ও বিস্তৃত হয়েছে তার আলোচনা ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। ন্যায়যুদ্ধ বলে কিছু হয় না — এই প্রত্যয়ী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি আলোচনা শেষ করেছেন।

দ্বিতীয় পাঠ-একক 'নারীবাদী নীতিশাস্ত্র' প্রস্তুত করেছেন সহকারী অধ্যাপক প্রশান্ত সরকার। নীতিশাস্ত্র কিভাবে নারীবাদী হতে পারে — এ প্রশ্ন অনেকেরই। শ্রীমান সরকারের এই পাঠ-এককটি অনুসরণ করলে এই প্রশ্নের উত্তর মেলে। সাবেকী নীতিশাস্ত্র কিভাবে নারীর স্বতন্ত্র নীতিবোধের অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে তার বিবরণ আছে এখানে। একইসঙ্গে প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের একই সঙ্গে প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের এক যুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ শ্রীমান সরকারের এখানে দিয়েছেন। নারীবাদী নীতিশাস্ত্র যে মুলতঃ সমালোচনাধর্মী সেকথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে। আশা করি, এই পাঠএককটি শুধু দূরশিক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের, সাধারণ পাঠকদেরও আকৃষ্ট করবে। শ্রীমান সরকারের প্রস্তুত করা অপর পাঠ-এককটি হল 'গণমাধ্যম নীতিশাস্ত্র'। আজকের গণমাধ্যম যেভাবে নিজের পেশাগত সম্মান বিসর্জন দিয়ে, গণতন্ত্রের চতুর্থ মাধ্যম হিসাবে নিজের ভূমিকা ভুলে গিয়ে, কয়েকজন ব্যক্তি বা পুঁজির দাসত্ব করছে-তা সত্যিই ভাবার বিষয়। আর্ন্তজাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিকে সামনে রেখে গণমাধ্যমের যে আলোচনা যা ছাত্র-ছাত্রীদের আকর্ষণ করবে।

সবশেষে, শিক্ষাকে শ্রেণিকক্ষকে চারদেওয়ালের মধ্যে বন্দী না রেখে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় কর্মযজ্ঞে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সন্তোষ কুমার পাল
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিদ্যালয়

প্রথম অর্ধ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

ডঃ সন্তোষ কুমার পাল
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ

সোশিও পলিটিক্যাল এথিকস্

অধ্যাপক সুনীল রায়, দর্শন বিভাগ,বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডঃ প্রশান্ত সরকার , সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

প্রথম অর্ধ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

পাঠ একক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১: প্রথম অংশ	বায়োমেডিক্যাল এথিকস্ : অবতরণিকা	৩-৭
দ্বিতীয় অংশ	রোগী - চিকিৎসকের সম্পর্ক	৮-২০
২	প্রজননগত অধিকার ও প্রযুক্তি	২১-৪১
৩	জিনতত্ত্ব ও নৈতিকতা	৪২-৫৫
৪	দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা-সামগ্রী বন্টন	৫৬-৭১
গ্লোসারি		৭২-৭৫
পরিভাষা পরিচয়		৭৬-৮১

দ্বিতীয় অর্ধ

সামাজিক রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্র

১	যুদ্ধ সন্ত্রাসের নীতিকথা প্রথম অংশ ঃ সন্ত্রাসবাদ ও নৈতিকতা দ্বিতীয় অংশ ঃ যুদ্ধবিষয়ক আচরনবিধি	৮৩-১০৬
২	সমতা ও তার তাৎপর্য	১০৭-১২২
৩	নারীবাদী নীতিশাস্ত্র	১২৩-১৪১
৪	গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র	১৪২-১৫৪

এম. এ. পার্ট-ওয়ান

দর্শন

চতুর্থ পত্র (বিশেষ পত্র)
অ্যাপ্লায়েড এথিকস্

প্রথম অর্ধ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ-একক - ১

প্রথম অংশ

বায়োমেডিক্যাল এথিকস : অবতরণিকা

বিষয় সংকেত

১.১.০ : উদ্দেশ্য

১.১.১ : অ্যাপপ্লায়েড এথিকস্ ও বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

১.১.২ : হিপোক্রাতীয় শপথ ও বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মৌলিক নীতিসমূহের বিবর্তন

১.২.১.১ : বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মূল নীতিসমূহ

দ্বিতীয় অংশ

বিষয় সংকেত

১.২.০ : উদ্দেশ্য

১.২.১ : প্রাক্‌কথন

১.২.৩ : চিকিৎসাগত বিশেষ অধিকার

১.২.৪ : গোপনীয়তা রক্ষা

১.২.৫ : আন্তঃসাংস্কৃতিক সম্পর্ক

১.২.৬ : কি ধরনের চিকিৎসক আমাদের প্রয়োজন

১.২.৭ : সারসংক্ষেপ

১.২.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

১.২.৯ : গ্রন্থ নির্দেশ

১.১.০ উদ্দেশ্য

পাঠ এককের এই প্রথম অংশে আমরা বায়োমেডিক্যাল এথিকস্‌ের প্রাথমিক পরিচয় দেব যাতে করে পাঠকেরা পরবর্ত্তী পাঠগুলিকে অনুসরণ করতে পারেন।

১.১.১ অ্যাপ্লায়েড এথিকস্ ও বায়োমেডিক্যাল এথিকস্

বায়োমেডিক্যাল এথিকস্ ফলিত নীতিশাস্ত্র (applied ethics) -এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিণত শাখা। ফলিত নীতিশাস্ত্র হল নীতিচর্চার সেই ধারা যা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যেসব নৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলি বুঝতে ও তার সমাধান খুঁজতে সাহায্য করে। সাধারণ আদর্শনিষ্ঠ নীতিশাস্ত্র এমন সব নিয়ম-নীতির সন্ধান করে যা পরিস্থিতি-নিরপেক্ষভাবে সর্বদা প্রযোজ্য হবে, যেখানে ফলিত নীতিশাস্ত্র নির্দিষ্ট পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নিয়ম-নীতি সূত্রবদ্ধ করার কথা বলে। সাধারণ আদর্শনিষ্ঠ নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রশ্নটি এরকম : 'কোন্ সাধারণ নৈতিক আদর্শ আমরা গ্রহণ করব যা আমাদের পরিচালনা করবে এবং একই সঙ্গে আচরণের মূল্যায়ন করবে? নীতিতত্ত্বগুলি এই ধরনের সাধারণ নীতি -আদর্শগুলিকে নির্দিষ্ট করতে এবং তাদের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট থাকে। অপর পক্ষে, ফলিত নীতিশাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্র তথা বাস্তব পরিস্থিতি অনুসারে আমাদের নীতি-ভাবনাকে কিভাবে সার্থক করে তোলা যায় তা বোঝার চেষ্টা করে। বায়োমেডিক্যাল এথিকস্ ফলিত নীতিশাস্ত্রের সেই শাখা যা জৈব- প্রযুক্তিগত গবেষণা ও চিকিৎসা থেকে উদ্ভূত নৈতিক ইস্যুগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং তার ভিত্তিতে আমাদের কি করা উচিত তার দিক্ নির্দেশ করে। বলা যেতে পারে : "Biomedical ethics is that branch of applied ethics which studies the ethical implications of both biomedical research and technology and their applications in medicine and health care."

যদিও চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় নৈতিক প্রশ্ন বহু প্রাচীনকাল থেকেই উঠেছে (আমরা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হিপোক্রাতিসের অঙ্গীকার (the Hippocratic Oath) - এর কথা পাই) তথাপি বিংশ শতাব্দীতে (বিশেষ করে এর দ্বিতীয়ার্ধে) চিকিৎসা ও জৈব-প্রযুক্তিতে ব্যাপক উন্নতি তথা যুগান্তকারী আবিষ্কারের সাথে সাথে মৃত্যুর সংজ্ঞা, জীবনদায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা তুলে নেওয়া, ভ্রূণনাশ, গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ-নির্ধারণ, জিন-থেরাপি, ক্লোনিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। একই সাথে নানা ধরনের নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। সাথে সাথে হিমায়িত ভ্রূণের সংরক্ষণ, মানুষ, প্রাণী তথা পরিণত ভ্রূণের কলা (টিস্যু) বৈজ্ঞানিক গবেষণা তথা চিকিৎসার কাজে ব্যবহার করা, মানুষের চিকিৎসার কাজে জিনতাত্ত্বিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, দুষ্প্রাপ্য স্বাস্থ্যসম্পদের ন্যায্য বন্টন ইত্যাদি জটিল নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। একই সঙ্গে জীবনের অলঙ্ঘনীয়তা বা পবিত্রতার সাবেকী ধারণা তথা প্রচলিত নিয়মনীতির অপর্যাপ্ততা প্রকট হয়েছে।

১.১.২ হিপোক্রাতীয় শপথ

বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মূল নীতিসমূহের বিবর্তনের সম্যক্ তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে আমাদের প্রথমে হিপোক্রাতীয় অঙ্গীকার-পত্রটি অনুসরণ করতে হবে। এটি নিম্নরূপ :

"সর্বশক্তিমান (ঈশ্বর)-কে সাক্ষী রেখে আমার পরিবার পরিজন, আমার শিক্ষককুল ও সতীর্থদের সামনে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি যে আমি আমার সাধ্য ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে এই শপথ ও নির্দেশ পালন করব।

যাঁরা আমাকে এই চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদের আমার পিতামাতার মতোই প্রিয় জ্ঞান করি এবং একই রকম ভাবনায় উদ্বুদ্ধ থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে আমার চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান অপরকে প্রদান করতে থাকব। আমি ধৈর্য্যের সঙ্গে চিকিৎসা-শাস্ত্রের অগ্রগতির সঙ্গে নিজেকে পরিচিত রাখব। যারাই আমার অধীনে চিকিৎসা প্রার্থনা করবে আমি ব্যতিক্রমহীনভাবে তাদের চিকিৎসা করব, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্যের চিকিৎসা তার দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে। আমি রোগীর মঙ্গলের কথা মাথায় রেখে যখনই প্রয়োজন বুঝব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেব।

আমি আমার সামর্থ্য ও বিচার অনুযায়ী রোগীর কল্যাণের জন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা উপযুক্ত বিবেচনা করব আমি সেই পদ্ধতিই অনুসরণ করব, এবং যা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর বা অমঙ্গলজনক তা থেকে বিরত থাকব। আমি কোনো রোগীকে এমন মাত্রার ঔষধ লিখব না বা প্রয়োগ করবো না, যা মারাত্মক বা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে, এমন কি যদি অনুরুদ্ধও হই। একই রকমভাবে এমন কোনো উপদেশ দেব না বা কাজ করব না যা নিষেক-কাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোনো মানুষের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়, এবং ভ্রূণনাশ, যা স্বেচ্ছায় একটি অনুপম মানবজীবনকে ধ্বংস করে তা প্রত্যাখান করব।

বিশুদ্ধ-চিত্ততা, পবিত্রতা ও মঙ্গলময়তার আদর্শে আমি আমার জীবন অতিবাহিত করব। আসন্ন কোনো বিপদের দূরদর্শী সংশোধন ব্যতিরেকে আমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা তার যথোপযুক্ত আইনি সংরক্ষকের বৈধ অনুমতি ছাড়া কোনো রোগীর চিকিৎসা করব না বা কোনো মানুষের উপর কোনোরূপ গবেষণা কার্য, যার লক্ষ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যোদ্ধার, তাতে লিপ্ত হব না। যেকোনো ধরনের রোগীর কাছে আমি যাই না কেন, আমি অসুস্থ ব্যক্তির উপকারের জন্য যাব এবং সেখানে যেকোনো ধরনের স্বেচ্ছাকৃত ক্ষতি বা দুর্নীতি থেকে বা রোগীকে মোহাচ্ছন্ন করে বিপথে চালিত করা থেকে বিরত থাকব।

আমার পেশাগত জীবনের মধ্যে বা বাইরে আমার রোগীর জীবন সম্বন্ধে আমি যাই দেখি বা শুনি না কেন, যা বাইরে প্রকাশ করা উচিত নয় তা আমি প্রকাশ করব না এই বুঝে যে সেগুলি গোপন রাখা উচিত।

যতক্ষণ আমি এই অঙ্গীকার মেনে চলব ততক্ষণ আমাকে সর্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদ সহ জীবন উপভোগ করতে এবং আমার সতীর্থ ও সমাজের মধ্যে সম্মানের সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুশীলন করতে অনুমতি দেওয়া হোক। তবে আমি যদি আমার (অধিকারের) সীমা ছাড়িয়ে যাই বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি তাহলে আমার ভাগ্য বিপরীতমুখী হতে পারে।"

১.১.২.১ বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মূল নীতিসমূহ

হিপোক্রাতিসের সময় থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতিসূত্রগুলিকে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। হিপোক্রাতীয় অঙ্গীকারের মধ্যে পরহিত-সাধন, রোগীর স্বাতন্ত্র্য, রোগীর ক্ষতিসাধন থেকে বিরত থাকা, গোপনীয়তা রক্ষা করা, ইত্যাদি কয়েকটি নিয়ম নীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে এসব নিয়ম নীতি সংযুক্তি-বিযুক্তির মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে চারটি মৌলিক নীতিতে সংহত হয়েছে। এগুলি নিম্নরূপ :

১) **রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি** (the principle of Patient Autonomy), যা কোনো চিকিৎসকের কাছে রোগীর চিকিৎসা গ্রহণ করা বা অস্বীকার করার ব্যাপারে রোগীর স্বাধীন বিচার-বিবেচনাকে গুরুত্ব দেয়। এই নীতি রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীর সম্পর্ককে নিরূপণ করে। সাবেকী অভিভাবকগিরি (paternalism)-র স্থানে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে রোগীর বিচার ও পছন্দকে গুরুত্ব দেয় এই নীতি।

২) **পরহিত-সাধনের নীতি** (the principle of Beneficence), যা অপরকে, এখানে বিশেষ করে চিকিৎসকের রোগীকে, সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, রোগীর মঙ্গল-বিধানের কথা বলে।

৩) **ক্ষতিসাধন থেকে বিরতির নীতি** (the principle of Non-Maleficence), যা কারোর, বিশেষ করে রোগীর, কোনোরূপ ক্ষতিসাধন থেকে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়।

তবে কেহ কেহ পরহিত-সাধনের নীতি এবং ক্ষতিসাধন থেকে বিরতির নীতিকে একত্রে বোঝার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উইলিয়াম কে. ফ্রাঙ্কেনার কথা বলতে পারি, যিনি পরহিতসাধনের নীতিকে নিম্নোক্ত চারটি সাধারণ বাধ্যবাধকতা (general obligation) -র মাধ্যমে বুঝতে চেয়েছেন, যার প্রথমটিকে আমরা ক্ষতি করা থেকে বিরতির বাধ্যবাধকতা হিসাবে এবং পরের বিষয়টিকে আমরা পরহিত সাধনের বাধ্যবাধকতা হিসাবে উল্লেখ করি:

ক) কারোর ক্ষতি বা মন্দ করা উচিত নয়। (One ought not to inflict evil or harm.)

খ) আমাদের অমঙ্গল বা ক্ষতিকে আটকানো উচিত। (One ought to prevent evil or harm.)

গ) আমাদের অমঙ্গল বা ক্ষতিকে দূর করা উচিত। (One ought to remove evil or harm.)

ঘ) আমাদের ভাল করা বা ভাল কাজকে এগিয়ে দেওয়া উচিত। (One ought to do or promote good.)

তবে আমাদের মনে চিকিৎসা-নীতিশাস্ত্রে এ দুটি নীতিকে আলাদা করে দেখাই যুক্তিযুক্ত, যেহেতু অপরের ক্ষতিসাধন না করার নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিহিত সাধনের নীতিকে ছাপিয়ে যায়।

৪) **ন্যায়পরতার নীতি** (the principle of Justice), যা প্রত্যেক রোগীকে সমান চোখে দেখা, সকলকে সম্মান দেওয়া, এবং বিশেষ করে, দুষ্প্রাপ্য স্বাস্থ্য-সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের ব্যাপারে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

এই চারটি মৌলিক নীতিকে সামনে রেখে আমরা বায়োমেডিক্যাল এথিকসের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। তবে কোনো কোনো নীতিবিদ্ নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ের কথা বলেছেন, যদিও সেগুলি মৌলিক বা স্বতন্ত্র নৈতিক নীতি বলে মনে হয় না। যেমন,

(ক) **নৈতিক সদ্‌গুণ সমৃদ্ধ চরিত্র** (Moral / Virtuous character), যা ইঙ্গিত করে যে চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকর্মী নৈতিক সদ্‌গুণে সমৃদ্ধ তথা চরিত্রবান হবেন। নীতিতাত্ত্বিকেরা স্বাস্থ্যকর্মী তথা চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ করে পাঁচটি প্রধান সদ্‌গুণের কথা বলেন এবং এগুলি হল দয়ার্দ্রচিত্ততা (compassion), বিচক্ষণতা (discernment), বিশ্বাসযোগ্যতা (trustworthiness), (চারিত্রিক) সংহতি (integrity) এবং বিবেকবত্তা (conscientiousness)। (আমাদের মনে হয় অন্যান্য নীতিগুলির মাধ্যমে সদ্‌গুণের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। অধিকন্তু, নৈতিক সদ্‌গুণ হল এক একটি বিশেষ প্রবণতা যা নৈতিক নীতি মেনে কাজ করার অভ্যাসকে বোঝায়। এগুলি নিজে নিজেই কোন নৈতিক নীতি নয়।)

(খ) **চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক** (Doctor-Patient Relation), যা চিকিৎসক তথা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ককে প্রতিপাদন করে। এখানে সত্যবাদিতা (veracity), প্রাইভেসি (privacy), গোপনীয়তা (confidentiality), বিশ্বস্ততা (fidelity) প্রভৃতি নৈতিক গুণ তথা বিধির কথা বলা হয়। চিকিৎসক সত্য কথা বলবেন, রোগীর প্রাইভেসিকে গুরুত্ব দেবেন, তার আস্থাভাজন হবেন, এবং একই সঙ্গে অনিবার্য ক্ষেত্র ছাড়া রোগীর সম্পর্কে কোন তথ্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করবেন না। রোগীও এই ধরনের কিছু কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলবেন। (যদিও এই বিধিনিষেধগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথাপি এই সম্পর্কের বিধিটিকে মৌলিক নৈতিক নিয়ম বলা যায় না। তাছাড়া, অন্যান্য মৌলিক নীতিগুলি থেকে এই বিধি লব্ধ হয় বলে মনে হয়।)

(গ) **চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত সকলের জন্য আচরণবিধি** (codes of conduct) এর কথা বলা হয়ে থাকে। (এই আচরণবিধি জরুরী, তবে এই আচরণবিধি নিজে কোন নৈতিক নীতি নয়, বরং আমরা বলতে পারি এই আচরণবিধি তৈরী হয় উপরে উল্লিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে।)

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, হিপোক্রাতীয় শপথের মধ্যেই আমরা বায়োমেডিক্যাল এথিকসের প্রথম পরিচয় পাই। এই হিপোক্রাতীয় ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে চিকিৎসাশাস্ত্রের চর্চাকে প্রভাবিত করেছে। অবশ্য ইংরেজ চিকিৎসক টমাস পার্সিভ্যাল (Thomas Percival) -ই প্রথম 'মেডিক্যাল এথিকস্' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লেখা একটা বই এর শিরোনামে। পার্সিভ্যাল চিকিৎসক-রোগীর সম্পর্ক বিষয়ে হিপোক্রাতীয় ভাবনার বিস্তার ঘটান, চিকিৎসকদের পেশাগত দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই ধারণাটি 'অ্যামেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোশিয়েশন' ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যে প্রথম 'কোড অফ্ মেডিক্যাল এথিক্স' সূত্রবদ্ধ করেন তাতে স্থান পায়। পরবর্ত্তী পর্যায়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি সংশোধিত হয় 'প্রিন্সিপ্যল্স অফ মেডিক্যাল এথিক্স' নামে। তারপর অনেক সংশোধনের পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই এথিকসের মধ্যে রোগীর 'ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা' (non-maleficence) এবং 'উপকার করা' (beneficence) ধারণার উপর জোর দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, চিকিৎসা-পেশার প্রতি চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা এবং বৃহত্তর সমাজের প্রতি চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা গুরুত্ব পায়।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিটি বায়োমেডিক্যাল এথিকসে যথোচিত গুরুত্ব পায়। এর আগেকার মেডিক্যাল এথিকসের নিয়মনীতিগুলিকে অভিভাবকগিরি (paternalism)-এর ভাষায় ব্যাখ্যা করা হত। সব ক্ষেত্রে ডাক্তারই ঠিক করতেন কিসে রোগীর মঙ্গল হবে। কিন্তু নাৎসী জার্মানি এবং বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অভিভাবকত্বের কর্তৃত্ববাদকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। ব্যক্তির কোনোরূপ সম্মতি না নিয়ে এবং পরীক্ষণের ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যক্তিকে কিছুই না জানিয়ে তাদের পরীক্ষাগারে নিয়ে আসা শুরু হয়। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে অপব্যবহারের ঘটনা ঘটে তার প্রতিক্রিয়ায়, এবং রোগীই তার নিজের স্বার্থের সর্বোত্তম বিচারক - এই স্বীকৃতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্বকে ডাক্তারের কাছ থেকে সরিয়ে রোগীর উপর প্রদান করা হয় এবং রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি (the principle of autonomy) অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সাথে সাথে রোগীর প্রতি সম্মান এবং ন্যায়পরতার বিষয়টি সামনে আসে। ফলতঃ ১) রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি ২) পরহিত-সাধনের নীতি ৩) ক্ষতিসাধন থেকে বিরতি এবং ৪) ন্যায়পরতার নীতি — এই চারটি নীতি বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মূল নীতি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

পাঠ একক - ১

দ্বিতীয় অংশ

রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্ক (The Patient-Doctor Relationship)

১.২.০ উদ্দেশ্য :

পাঠ এককের এই অংশে রোগী ও চিকিৎসকের সম্পর্ক ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ধারণা ও নিয়ম-নীতির আলোচনা করা হবে।

১.২.১ প্রাক্‌কথন :

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রে হিপোক্রাতীয় মডেলের মধ্যে বড় বেশি অভিভাবকগিরি (paternalism) সংশ্লিষ্ট রয়েছে। একজন ভাল চিকিৎসকই ঠিক করেন তাঁর রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থ কি, এবং একজন ভাল রোগী হল সেই ব্যক্তি যিনি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসরণ করেন। তবে বর্তমানে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণ (autonomy) এক প্রতিষ্ঠিত সত্য। চিকিৎসককে রোগীর প্রতি কেবল আস্থাভাজন হলেই চলবে না, চিকিৎসকের আরো অনেক দায়িত্ব আছে, যা তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থার উপর নির্ভর করে। যাই হোক, এটা ধরে নেওয়া হয় যে রোগীর চিকিৎসা তখনই করা হয় যখন তা রোগীর রোগ উপশমে সহায়ক হয়। তবে রোগীর স্বার্থ কেবল শরীর-সম্বন্ধীয়ই নয়, বিশেষ ধরনের কিছু চিকিৎসা রোগীর ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নাও হতে পারে। কোনো চিকিৎসা রোগীর উপকারের তুলনায় অনেক বেশি বেদনাদায়ক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হিসাবে রোগ উপশমে যথেষ্ট উপকারী হওয়া সত্ত্বেও যেকোনো চিকিৎসা অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রোগীর উপর বর্তায়, চিকিৎসকের উপর নয়।

এখন যে ব্যাপারটি সমস্যা সৃষ্টি করে সেটি হল, রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে এবং রোগীর জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদান (informed consent) -এর শর্ত মেনে চিকিৎসার ব্যবস্থার এমন কিছু ক্ষেত্র বা সুযোগ আছে কিনা যেখানে রোগীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে চিকিৎসক তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চিকিৎসা করতে পারেন। রোগীর সবকিছু জানার অধিকারের কথা মাথায় রেখে ডাক্তারবাবু কি চিকিৎসাগত বিশেষ সুবিধা (therapeutic privilege) -র আশ্রয় নিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষতিকারক হতে পারে এমন কোনো চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখতে পারেন? এমন কিছু পরিস্থিতি আছে কি যেখানে রোগীর সম্বন্ধে গোপনীয় কোনো তথ্য ডাক্তারবাবু তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রকাশ করতে পারেন? এইসব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত আছে রোগী-চিকিৎসক সম্পর্ক।

১.২.২ জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদান (Informed Consent) :

জ্ঞাতসারে সম্মতিদান রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নীতির বাস্তব প্রয়োগ। জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের ধারণাটি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম উত্থাপন করেন 'শোলেনডোর্ফ বনাম সোসাইটি অফ্ নিউইয়র্ক

হসপিটালস্' কেসের বিচারক জাস্টিস কার্ডোজ। কার্ডোজ সুস্পষ্ট রায় দেন যে একজন রোগী চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানবে যার ভিত্তিতে রোগী সিদ্ধান্ত নেবে সে চিকিৎসা করাবে, নাকি তার থেকে বিরত থাকবে। স্বাধীনভাবে সম্মতি জানাতে গেলে রোগীকে অবশ্যই সুস্থ মনে থাকতে হবে এবং তার উপর কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত প্রভাব বা চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। ১৯৬০ সালে 'নাটানসন বনাম ক্লাইন' কেসের মধ্যে দিয়ে জ্ঞাতসারে সম্মতিপ্রদানের বিষয়টি আইনশাস্ত্রে যথার্থ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞাতসারে সম্মতি প্রদানের ধারণাটির দুটি দিক আছে। প্রথমটি হল চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য চিকিৎসক রোগীর কাছে খুলে বলবেন (doctor's disclosure)। এর মধ্যে থাকবে রোগ নির্ধারণ, রোগের চিকিৎসা কিভাবে করাতে হবে, লভ্য এবং বিকল্প চিকিৎসা, চিকিৎসার ঝুঁকি, চিকিৎসার উপকার এবং চিকিৎসা গ্রহণ করলে কি ফল লাভ হবে, আর চিকিৎসা অস্বীকার করলে তার কি পরিণাম হবে ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি হল সক্ষম রোগী (competent patient), যে এই তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে চিকিৎসা করাবে, না কি করাবে না। একজন সক্ষম রোগী হল সেই যে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বোঝে এবং চিকিৎসা গ্রহণ করলে বা অস্বীকার করলে কি পরিণতি ঘটবে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। আদর্শগতভাবে, জ্ঞাতসারে সম্মতিদান চিকিৎসক ও রোগীর সম্পর্কের নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে, যে সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর ভিত্তিশীল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা একজন ক্যান্সার রোগীর কথা ভাবতে পারি যে কেমোথেরাপি নিতে অস্বীকার করছে। ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ওই রোগীকে কেমোথেরাপি নিতে রাজি করাতে চেষ্টা করছেন এই কথা বলে যে এই কেমোথেরাপির মাধ্যমে তার ক্যান্সারের নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা সম্ভব। এখন, সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম রোগী যখন সব কিছু জানার পরেও কেমোথেরাপি নিতে অস্বীকার করে তখন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে রোগীর এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়। রোগী যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাইছে তা হল তার প্রাপ্তব্য উপকারের তুলনায় এই চিকিৎসার যে খরচ এবং কষ্ট তা অনেক বেশী। রোগী মনে করতে পারে, কেমোথেরাপির কষ্ট সহ্য করে তার জীবনকে কয়েক বছরের জন্য দীর্ঘায়িত করার কোনো মানে হয় না। রোগীর এই সিদ্ধান্তকে সম্মান দিয়ে চিকিৎসক এখানে রোগীর স্বাতন্ত্র্য ও কেমোথেরাপির মাধ্যমে শরীরের উপর হস্তক্ষেপকে অস্বীকার করার অধিকারকে সম্মান জানাচ্ছে। এখানে সম্ভাব্য বিরোধের মীমাংসা হচ্ছে এই বিচারের মাধ্যমে যে রোগীর মঙ্গলসাধনে ডাক্তারের কর্তব্যকে রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নিষ্প্রভ করে দিতে পারে। রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে সম্মান করা ডাক্তারের পক্ষে রোগীর উপকার সাধনের কর্তব্যের তুলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণরূপে দেখা দিচ্ছে।

অতঃপর, আমরা অপেক্ষাকৃত জটিল একটা দৃষ্টান্তের বিবেচনা করব। একজন সিজোফ্রেনিক রোগী যে ফুটপাথে বাস করে এবং মাঝে মধ্যেই যাকে মানসিক রোগের ঔষুধ খেতে হয়। এরকম একজন রোগী বুকে এবং হাতে ব্যথা নিয়ে হসপিটালে ভর্তি হল। করোনারি ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনে বাধার সমস্যা ধরা পড়লে তার এ্যাঞ্জিওগ্রাম করার কথা উঠে। এই এ্যাঞ্জিওগ্রাম পদ্ধতিতে ধমনীর মধ্যে এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ (dye) প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর ধমনীর এক্স-রে নেওয়া হয়। ধমনীর রক্তসঞ্চালনের বাধা যেখানে রোগ সেখানে পরবর্তী সম্ভাব্য ধাপ হবে এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি। এই প্রক্রিয়ায় পায়ে ফিমরাল ধমনীতে বড় সুঁচ দিয়ে ফুটো করা হয়। এই ফুটো দিয়ে অগ্রে-বেলুন-যুক্ত একটি ক্যাথিটার সমস্যাযুক্ত করোনারি আর্টারিতে প্রবেশ করানো হয়। ক্যাথিটারটা এমনভাবে সংস্থাপন করা হয় যাতে করে বেলুনটি বাধার কাছাকাছি থাকে। বেলুনটিকে কয়েক

সেকেন্ড ধরে ফোলানো হয় যা ধমনীর ভিতরের দেওয়ালে জমে থাকা পদার্থকে সরিয়ে দেয়। এর মধ্যে দিয়ে ধমনীর বাধাজনিত সমস্যা দূরীভূত হয়। এখন যে রোগীর কথা বলছি সে যদি শরীরের উপর আক্রমণকর (invasive) পদ্ধতি বলে এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টিতে সম্মতি দিতে অস্বীকার করে তাহলে ডাক্তারবাবু কি করবেন? রোগী এ্যাঞ্জিওগ্রামে সম্মতি দিয়েছিল, কিন্তু এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অস্বীকার করছে। এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির সঙ্গে হার্টএ্যাটাক এবং মৃত্যুর সামান্য ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু এই বাধা দূর করার চিকিৎসা না করানোর ঝুঁকি তার থেকে বেশি। রোগীর বর্তমান অবস্থা ও এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টির উপকারিতা এই ঝুঁকিকে গুরুত্বহীন প্রতিপন্ন করে।

কেউ দাবী করতে পারেন, রোগী মানসিকভাবে অসুস্থ, তাই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্মতি জানানোর মতো সক্ষম অবস্থাতে সে নাই। সুতরাং চিকিৎসক এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি চিকিৎসার ব্যাপারে রোগীর যে আপত্তি তা অস্বীকার করলে দোষের কিছু নাই। এই রোগী এ্যাঞ্জিওগ্রামকে মেনে নিয়েছে, কিন্তু এ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি অস্বীকার করছে। এটা নির্দেশ করে যে তার ব্যবহারের মধ্যে সংগতি নাই এবং তার ভাবনা-চিন্তা যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ নয়। তথাপি যখন সে ভর্তি হয়েছিল তখন সে মনোরোগী ছিল না এবং এই পদ্ধতিটা যে আক্রমণাত্মক ও বেদনাদায়ক প্রকৃতির তা বোঝার মতো সামর্থ্য তার আছে। কোনো ব্যক্তি দুটি পরস্পর-সম্পর্কিত চিকিৎসার মূল্যায়নে যুক্তিহীন-এর থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য তার নেই। এখানে উপকার এবং স্বাতন্ত্র্যের একটা বিরোধ যথার্থই রয়েছে। এই ধরনের সমস্যা সমাধান কল্পে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে কোনো চিকিৎসা অস্বীকার করার জন্য যে স্তরের সক্ষমতা প্রয়োজন তা কম ঝুঁকি থেকে বেশী ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যাবে। চিকিৎসা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা যত বেশী হবে রোগীর সক্ষমতার মাত্রা তত বেশী হওয়া উচিত। যখন একজন রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত রোগীকে তাৎপর্যপূর্ণ ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয় তখন রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সামর্থ্যের মাত্রাও উচ্চস্তরের হবে। এরকম ক্ষেত্রে রোগী যদি সেই মাত্রায় পৌঁছাতে না পারে তাহলে চিকিৎসকের অভিভাবকগিরি রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের গুরুত্বকে অর্থহীন করে দেয় এবং সেক্ষেত্রে চিকিৎসার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করা যৌক্তিকতা পেয়ে যায়। সাধারণভাবে রোগীর সক্ষমতার মাত্রা যত কম হবে এবং চিকিৎসার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ না করলে ঝুঁকি যত বাড়বে ডাক্তারের পক্ষে রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করা তত বেশী যুক্তিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে। বিপরীতভাবে, রোগীর সক্ষমতার মাত্রা যত বেশী হবে, এবং চিকিৎসা না করানো জনিত ঝুঁকি যত কম হবে, রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত বেশী যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হবে। তবে অনেকে সক্ষমতার মাত্রার উপর স্বাতন্ত্র্য ও সম্মতিকে ভিত্তিশীল করার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের যুক্তি, ন্যূনতম সক্ষমতাই রোগীর কোনো চিকিৎসা গ্রহণ বা বর্জন করার ব্যাপারে যথেষ্ট। যদি কোনো রোগী চিকিৎসা গ্রহণে যথেষ্ট সক্ষম হয় তাহলে সে তার প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারেও যথেষ্ট সক্ষম হবে।

তথাপি সামর্থ্য এবং ঝুঁকির অতিরিক্ত তৃতীয় আর একটি মাত্রা রয়েছে এবং সেটি হল চিকিৎসা-পদ্ধতির আক্রমণাত্মক দিক (invasiveness)। সিজোফ্রেনিক রোগী জানে তার শরীরের উপর কিরূপ বহিরাক্রমণ সংগঠিত হতে যাচ্ছে — এবং এই ভেবেই সে আপত্তি জানায়। এখানে সে তার দেহের উপর অনাক্রমণের অধিকার প্রয়োগ করছে। ধরে নেওয়া যাক যে এই চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে কি কি সুবিধা-অসুবিধা সেগুলি সম্পর্কে রোগীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। যদি সে দেহের প্রতি আক্রমণাত্মক ভেবে চিকিৎসা

নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানায় তাহলে তার স্বাতন্ত্র্যের নীতিকেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যাই হোক, এটা স্বীকৃত যে সক্ষমতার ন্যূনতম মাত্রা পরিলক্ষিত হলে চিকিৎসক রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের রক্ষাকে সম্মান জানাতে বাধ্য। কিন্তু যখন রোগী চিকিৎসা নিতে চাইবে তখন কি এই একই যুক্তি প্রযোজ্য হবে?

স্বাস্থ্যের উপকারী এমন চিকিৎসা অস্বীকার করার অধিকারের অর্থ এই নয় যে যেকোনো ধরনের চিকিৎসা রোগী চাইতে পারে। সাধারণভাবে রোগীর কোনো অধিকারকে চিকিৎসক সম্মান করতে বাধ্য। তবে রোগীর চিকিৎসা দিতে চিকিৎসক তখনই এবং চিকিৎসা পেতে রোগীর অধিকার তখনই স্বীকৃত হয় যখন চিকিৎসাজাত কিছু উপকারের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবে তা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। ব্যথা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়া এবং রোগীকে সাধারণ-কর্মক্ষমতায় ফিরিয়ে দেওয়া চিকিৎসার লক্ষ্য। যে রোগীর লাং-ক্যান্সার শেষ স্তরে পৌঁছেছে সে কার্ডিওপালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR) অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু রোগীর অবস্থা খুবই সংকটময় সেহেতু CPR-এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা বা জীবনকে দীর্ঘায়িত করা সম্ভব নয়। তাই এই ব্যবস্থা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। এই যুক্তিতে চিকিৎসক রোগীকে CPR দিতে বাধ্য নয়। একই রকমভাবে ডাক্তারবাবু সেইরকম রোগীর জীবনদায়ক যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালিয়ে যেতে বাধ্য নয়, যা তার পেশাগত বিচারে রোগীর কোনো মঙ্গল করবে না। একজন ব্রেন-ডেড্ রোগীকে রেস্পেরিটারের মধ্যে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দৃষ্টান্তটি এখানে বিবেচ্য হতে পারে।

অধিকন্তু, যখন কোনো রোগী তার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয় তখন তার হয়ে উপযুক্ত কোনো প্রতিনিধি (surrogate) সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোগীর হয়ে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি এই দু'রকম উপায়ের মধ্যে যেকোনো একরকম ভাবে কাজ করতে পারে : (১) সে চিকিৎসা সম্বন্ধে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা রোগী সমর্থ থাকলে নিত। এক্ষেত্রে রোগীর বিচারেরই প্রতিফলন ঘটে। (২) প্রতিনিধি এমন ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা সে বিশ্বাস করে যে রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূল। এই ব্যবস্থার আরেকটি বিকল্প হল বাঁচার ইচ্ছা জাতীয় কোনো পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশের (advance directive) মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতে পারে। এইভাবে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী রোগী, যে সময়ের জন্য সে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম নয়, সেই সময় পর্যন্ত তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে বর্ধিত করতে পারে। এই প্রদত্ত নির্দেশনা দুটো উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে : ১) রোগী চিকিৎসককে দিয়ে কি করাতে চায় তা প্রকাশ পায়। ২) রোগী চিকিৎসা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে কোনো ব্যক্তিকে অধিকার দিতে পারে। অবশ্য এই নির্দেশনার বিষয় ও শর্তাদি নিয়মিতভাবে আপডেট করা বাঞ্ছনীয়। তবে কোনো পূর্বপ্রদত্ত নির্দেশনা যদি না থাকে তখন রোগীর কোনো প্রতিনিধিকে আদালত নিযুক্ত অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব কিছুর মাধ্যমে এটাই বেরিয়ে আসে যে রোগীর পক্ষে সর্বোত্তম স্বার্থ কি তা চিকিৎসকের নির্ধারণ করার বিষয় নয়। তবে এমন কিছু আপদকালীন পরিস্থিতি আছে যেখানে রোগীর সম্মতির প্রশ্ন ওঠে না। যেমন, যখন সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ কোনো রোগীকে ইমার্জেন্সি রুমে আনা হয় তখন পরিস্থিতির আপদকালীনতাই নির্দেশ করে যে রোগীকে চিকিৎসা করাতে হবে। এই জরুরী পরিস্থিতিতে ডাক্তার, রোগী বা তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বিচার-বিমর্শ করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। এখন, আমরা শিশুদের প্রসঙ্গে আসব। পিতামাতাই শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থের সব থেকে ভাল বিচারক এবং পিতামাতা তার চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও শিশুর অপব্যবহার বা অবহেলার সম্ভাবনা যেখানে আছে সেখানে

পিতামাতার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হতে পারে। অন্য দিকে, ধর্মীয় ভিত্তিতে চিকিৎসা অস্বীকার করা একটি নতুন সমস্যাকে তুলে ধরে। যেমন লিউকোমিয়া চিকিৎসার জন্য ব্লাড-ট্রান্সফিউশন ছাড়া রোগী মারা যাবে ভেবে ডাক্তারবাবু আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং আদালত যদি প্রয়োজনীয় অনুমতি দেয় তাহলে তখন ডাক্তারবাবু রোগীর পিতামাতার ব্লাড-ট্রান্সফিউশন অস্বীকার করার ঘটনাকে অগ্রাহ্য করতে পারে। সাধারণভাবে শিশুদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে পিতামাতার সিদ্ধান্ত গুরুত্ব পায়। কিন্তু নিছক ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে পিতামাতা যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে রোগীর স্বাস্থ্য ও জীবনের কথা মাথায় রেখে রাষ্ট্র বা স্থানীয় আদালত হস্তক্ষেপ করতে পারে। পিতামাতা কোনো বিশেষ ধরনের বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেদের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু তাদের শিশুদের মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়ার অধিকার তাদের নেই।

অবশ্য আরো কিছু জটিল ক্ষেত্র আছে যেখানে চিকিৎসা শুরু করা বা বন্ধ রাখা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তকে অভিভাবকগিরি এবং রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব হিসেবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। একজন রোগী চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য জানার পরেই কি করা উচিত সে সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তে পারে। তখন তার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিকিৎসককে অনুরোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাকৃত অনুরোধকে স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ বলেই মনে করা হবে।

কোনো কোনো চিন্তাবিদ তথা চিকিৎসক রোগীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করেন। তাঁদের যুক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি কখনও কখনও এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, এতটাই যুক্তিহীন ব্যবহার করে যে তারা ঠিক ঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো অবস্থায় থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে আবার রোগী তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা চিকিৎসকের উপরেই সঁপে দিতে চায়। এক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রতি রোগীর আস্থা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। অধিকন্তু, চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রোগীর উপর ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারটি চিকিৎসককে একজন নিরাসক্ত পেশাদার হিসেবে চিত্রিত করে, যা মোটেই কাম্য নয়। বরং রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের যৌথ আলোচনার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়।

আমরা যদি সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিবেচনা করি তাহলে দেখব জ্ঞাতসারে সম্মতির পাঁচটি উপাদান রয়েছে : (রোগীর) সামর্থ্য (competence), (রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসকের) সব কিছু খুলে বলা (disclosure), (বাস্তব অবস্থাকে) ঠিকমতো বুঝতে পারা (understanding), ঐচ্ছিকতা (voluntariness) এবং সম্মতি (consent)। নীচের উদ্ধৃতি দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব : "An informed consent is an individual's autonomous authorization of a medical intervention or of participation in research." (বোশাম্প অ্যান্ড চিলড্রেস, পৃঃ ৭৮)

১.২.৩ চিকিৎসাগত বিশেষ অধিকার (Therapeutic Privilege) :

চিকিৎসকের একটা নৈতিক দায় আছে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য রোগীকে জানানো, যার উপর ভিত্তি করে রোগী তার চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই দায়বদ্ধতা কর্তব্যবাদী এবং পরিণামবাদী এই উভয় ধরনের যুক্তির উপর নির্ভরশীল। চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তথ্য রোগীর কাছে

প্রকাশ করার অর্থ রোগীর স্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে সম্মান জানানো এবং এর মধ্য দিয়েই রোগী তার পক্ষে উপকারী চিকিৎসার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এখানে যে রোগীর কাছে যে তথ্য প্রকাশের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে রোগীর বর্তমান অবস্থা, উপযুক্ত চিকিৎসা নিলে কি উন্নতি হবে, সম্ভাব্য আর কি ধরনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হবে, এবং এই ধরনের হস্তক্ষেপের ঝুঁকি এবং সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য থাকবে। জ্ঞাতসারে সম্মতির জন্য এই তথ্যের প্রকাশ আবশ্যিক।

কিন্তু এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যের প্রকাশ উপকারের তুলনায় বেশী ক্ষতি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা মঙ্গলজনক প্রতারণা (beneficent deception) -র সাহায্য নিলে তা কি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য হবে? রোগীর পক্ষে সম্ভাব্য ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন তথ্য চিকিৎসকের গোপন করার বিষয়টিকে পেশাগত বা চিকিৎসা সম্বন্ধীয় অগ্রাধিকার (therapeutic priviledge) বলে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে যে সত্য যতই কঠিন হোক না কেন, অধিকাংশ রোগীর কাছে তা প্রকাশ করা উচিত। অভিভাবকসুলভ যুক্তি ব্যবহার করে রোগীকে প্রতারণা করা উচিত নয়। ডাক্তারের সাথে আস্থার সম্পর্ক রোগীর অনেক উপকার করতে পারে এবং তথ্য প্রকাশে সততা রোগীর আস্থা-অর্জনকে উৎসাহিত করবে। তবে রবার্ট ভীচ (Robert Veatch) চিকিৎসক-সুলভ বিশেষ সুবিধার বিরুদ্ধে প্রধান দুটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। প্রথমতঃ, তথ্যের প্রকাশ রোগীর কতটা ক্ষতি করবে বা তথ্য গোপন করার ফলে রোগীর কতটাই বা সুবিধা হবে - এ ব্যাপারে মূল্যায়ন করতে চিকিৎসক ভুল করতে পারেন, বা চিকিৎসক বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য গোপন রাখলে রোগীর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করা হয় না এবং এতে সততা ও বিশ্বস্ততার যে কর্তব্য চিকিৎকের আছে তা পূর্ণতা পায় না। এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একজন সক্ষম রোগী চিকিৎসা সম্পর্কে সব কিছু জেনেশুনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সামনে থাকলে তবেই রোগী এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হবে। রোগীর যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য জানার অধিকার এবং একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে যাতে করে তারা চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথার্থ অংশগ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসকের পেশাগত বিশেষ সুবিধা রোগীর এই অধিকারকে লঙঘন করে। তাই চিকিৎসকের এই বিশেষ সুবিধার ধারণার পেছনে কোনো নৈতিক যৌক্তিকতা নেই। আমাদের মনে হয় রোগীর স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টিকে সামনে রেখে এমন এক সিদ্ধান্তকারী যুক্তি এখানে প্রয়োজন হয় যা বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সব তথ্য জানতে চায় না -এই দাবীকে প্রতিপন্ন করে। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় তথ্য গোপন রাখার ধারণাটি পরিণামবাদী যুক্তিতেও প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রতারণার চেয়ে সততা ভাল। কোনো চিকিৎসক তথ্য গোপন করে রোগীকে প্রতারণা করছে প্রমাণিত হলে তা চিকিৎসকের ওপর রোগীর আস্থাকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ঘটনা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নেওয়ার ব্যাপারে রোগীকে নিরুৎসাহিত করতে পারে, অথবা চিকিৎসায় রোগী কিভাবে সাড়া দিচ্ছে তার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। যেভাবেই হোক না কেন, প্রতারণা উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ভাবলে যেসব চিকিৎসক ক্রমাগতভাবে রোগীদের প্রতারণা করেন তাঁদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট হতে পারে। একই সঙ্গে চিকিৎসা পেশার ক্ষতি হতে পারে। সেরূপ হলে অনেক রোগীই চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং এর ফলে রোগীর আরও ক্ষতি হবে।

এতৎসত্ত্বেও, একজন চিকিৎসক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য একেবারেই সব রোগীর কাছে জানিয়ে দিতে কি দায়বদ্ধ? দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা এমন এক রোগীর কথা ভাবতে পারি যার মানসিক রোগের পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে এবং বর্তমানে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হয়েছে। এরকম রোগীকে ডাক্তার কি জানাবে, কিভাবে জানাবে না তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। আমাদের মনে হয়, এরূপ ক্ষেত্রে এমন এক উপায় বের করতে হবে যা একদিকে চিকিৎসকের পেশাগত বিশেষ অধিকার এবং রবার্ট ভীচের সব কিছু প্রকাশ করার যুক্তি উভয় দিককে সমানভাবে গুরুত্ব দেবে। চিকিৎসক রোগীকে ধাপে ধাপে মেপে-বুঝে তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করবেন, যাতে রোগী সেগুলি যথার্থ অনুধাবন করতে সময় পায় এবং বিকল্প চিকিৎসার সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ হয়। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য প্রকাশ করবে। অবশ্য মনে রাখতে হবে তা যেন বিভ্রান্তিকর না হয়। আরও বিশেষভাবে বললে, কেমোথেরাপির কোনো একটি কোর্স রোগীর জীবনকে যদি তিন থেকে পাঁচ বছর দীর্ঘায়িত করার ৬০ শতাংশ সম্ভাবনা থাকে, তাহলে রোগীকে বলা যেতে পারে তার ক্যান্সার হয়েছে, তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় (রোগ একেবারে সেরে যাবে-একথা না বলে)। বেশ কয়েক দিন পর দ্বিতীয়বার রোগী চেম্বারে এলে চিকিৎসক তার চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আরও স্পষ্টভাষায় আলোচনা করতে পারেন। রোগ-নির্ণয় এবং চিকিৎসার গতিপ্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা রোগীকে এই বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিতে সাহায্য করে। এখানে সাধারণ সমস্যাটি হল, কি পরিমাণ তথ্য রোগীর কাছে কিভাবে প্রকাশ করা হবে তা সব তথ্যকে প্রকাশ করতে হবে -এই নীতির মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন রোগ নির্ণয় করা গেছে তখন যাবতীয় তথ্যের প্রকাশ না করাটা অমঙ্গলজনক প্রতারণা হিসাবেই বিবেচিত হবে। চিকিৎসার উন্নতি সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে এটি গুরুত্বপূর্ণ। ধরা যাক, একজন রোগী মাথাব্যথার সমস্যা, স্মৃতিভ্রংশ, দ্বিধাগ্রস্ততা এবং বমিবমিভাব নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এসেছে। সি.টি. স্ক্যান (C T Scan) করে জানা গেল যে রোগীর ব্রেন টিউমার হয়েছে। নিউরো সার্জেন রোগীকে এই সম্পর্কে জানায় এবং উপদেশ দেয় যে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে টিউমারটিকে বের করতে হবে। রোগী তখন শল্য-চিকিৎসার সম্মতি দেয়। শল্যচিকিৎসার পরবর্ত্তী পর্যায়ে ঐ নিউরোসার্জেন রোগীকে জানাতে পারে না যে কি ধরনের টিউমার তার ছিল। টিউমারটা ক্ষতিকারক, না কি ক্ষতিকারক নয় এবং টিউমারের সবটুকুই সার্জারির মাধ্যমে বের করা গেছে, না কি আংশিকভাবে বের করা গেছে - এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর চিকিৎসার অগ্রগতি নির্ভর করবে। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রোগী চিকিৎসার অগ্রগতির নিরিখে কি সিদ্ধান্ত নেবে তা স্থির করা খুবই কঠিন। যখন রোগ নিরাময়ের জন্য বেশী সময় আর অবশিষ্ট নেই, তখন তাড়াতাড়ি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য চিকিৎসক সব কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য খুলে বলতে দায়বদ্ধ।

সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই নীতিতত্ত্বে এমন কোনো নীতি নেই যার ভিত্তিতে সততা (honesty) এবং দয়ামায়া (compassion) - এ দুই আপাত-বিরুদ্ধ সদ্‌গুণের মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেওয়া যাবে। কিন্তু চিকিৎসক কিভাবে রোগীর কাছে তথ্যগুলি প্রকাশ করছে তার গুরুত্ব এটা দেখিয়ে দেয় এই দুটি সদ্‌গুণ আবশ্যিকভাবে বিরোধী নয়, বরং পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ। অনেক ক্ষেত্রেই একেবারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নিখুঁতভাবে রোগীর রোগ সম্বন্ধে সব কিছু জানিয়ে দেওয়াই চিকিৎসকের উচিত কাজ - এরকম নয়। রোগীর আবেগ-অনুভূতির কথা মাথায় রেখে যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে

তথ্য প্রকাশ করতে পারে। সততা এবং দয়ামায়া দুয়ের মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি করতে গেলে সততাকে ব্যাপক অর্থে বোঝা দরকার। অল্প অল্প করে ধারাবাহিকভাবে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় তথ্য প্রকাশ করা অসততা নয়। এই দিক থেকে রোগীর চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যের ধারণা যত্নবান চিকিৎসকের গুরুত্বকে ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে পারে না। চিকিৎসকও একজন রক্তমাংসের ব্যক্তি, যার মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি, আবেগ-অনুভূতি সব কিছুই আছে। তাই, শুধুমাত্র তথ্য জানানোর দায়বদ্ধতা থেকে হঠাৎ করে প্রথম ভিজিটেই সব কিছু এক সাথে জানিয়ে দেওয়া যথোচিত নাও হতে পারে। চিকিৎসকের মধ্যে জ্ঞান, সততা এবং দয়ার্দ্রচিত্ততার মেলবন্ধন আবশ্যিক।

১.২.৪ গোপনীয়তা রক্ষা (Confidentiality) :

চিকিৎসকের রোগীর কাছে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করার যেমন কর্তব্য আছে, ঠিক তেমনি তৃতীয় পক্ষের কাছে এসব তথ্যকে প্রকাশ না করার ব্যাপারেও তিনি দায়বদ্ধ। এই ধরনের তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তথ্য প্রকাশ করা চিকিৎসকের বিশ্বস্ততা তথা গোপনীয়তা রক্ষা করার নীতিকে লঙঘন করে, যা রোগী চিকিৎসকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অভিপ্রেত নয়। চিকিৎসক যখন কোনো একজন বিশেষ রোগী সম্পর্কে তথ্য কেবল সংশ্লিষ্ট রোগীর কাছেই প্রকাশ করে তখন বলা হবে বিশ্বস্ততা তথা গোপনীয়তা রক্ষিত হচ্ছে। রোগীর অনুমতি ভিন্ন রোগ সম্পর্কিত তথ্যাদি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ না করতে চিকিৎসক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রোগীদের সঙ্গে গোপনীয়তা রক্ষা করা চিকিৎসকের দায়িত্ব -এই অভিমতের পক্ষে দু'ধরনের যুক্তি আছে। প্রথমটি হল কর্তব্যবাদী যুক্তি, যার মধ্যে রোগীর স্বাতন্ত্র্য ও গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা সংশ্লিষ্ট আছে। গোপনীয়তা আসলে রোগীর ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র। রোগীর অনুমতি ব্যতিরেকে তথ্য প্রকাশ করা এই অধিকারকে লঙঘন করে এবং একই সঙ্গে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অসম্মান করে। দ্বিতীয় ধরনের যুক্তিটি পরিণামবাদী। যদি চিকিৎসক রোগী সম্পর্কে তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য প্রকাশ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের প্রতি রোগীদের আস্থা ক্রমশ কমে যাবে। রোগী তখন চিকিৎসাগত যত্ন নেওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে গোপনীয়তার আশ্বাস না পেলে রোগী তার নিজের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্য চিকিৎসককে খুলে বলতে দ্বিধা করবে এবং এর ফলে চিকিৎসকের পক্ষে রোগ নিরূপণ করা এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

কিন্তু যেখানে রোগীর নিজের বা অপর কোনো ব্যক্তির প্রাণহানি রূপ বড় ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে পরিণামবাদী যুক্তিতে গোপনীয়তা রক্ষার বিধি লঙঘন করা যেতে পারে। ক্যালিফোর্ণিয়া সুপ্রীম কোর্ট 'তারাসফ বনাম ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ' (Tarasoff vs. Regents of the University of California) কেসে গোপনীয়তা রক্ষার বিধিকে বৃহত্তর পরিস্থিতিতে লঙঘন করা যেতে পারে বলে রায় দেয়, যদিও রায় দেওয়ার আগে দু'দল বিচারকের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা গিয়েছিল। ঘটনাটি এরকম : ১৯৬৯ সালের ২৭ শে অক্টোবর মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া শহরে তাতিয়ানা তারাসফ নামে এক যুবতী খুন হয়। খুনীর নাম প্রসেনজিৎ পোদ্দার, মানসিক ভারসাম্যহীন এক ভারতীয় তরুণ যে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লরেন্স ম্যূরের চিকিৎসাধীন ছিল। তারাসফের পরিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা ডঃ

ম্যূরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। তাদের অভিযোগ ছিল : খুনের ঘটনার মাস দু'য়েক আগে প্রসেনজিৎ যখন ম্যূরের চিকিৎসাধীন ছিল তখনই সে তাতিয়ানাকে খুন করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। অথচ ডঃ ম্যূর এর বিন্দুবিসর্গ তাতিয়ানার বাড়ির লোকজনকে জানান নি, স্থানীয় পুলিশকেও না। তাতিয়ানার পরিবারের বক্তব্য ছিল, ম্যূর যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতেন তাহলে তাতিয়ানাকে বেঘোরে প্রাণ দিতে হত না। এই মামলা প্রায় সাত বছর ধরে চলেছিল। এই যে লম্বা আইনি বিতর্ক তার মূলে ছিল দুটি ভিন্ন বিধির মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে তা নিয়ে। একটি ছিল গোপনীয়তা রক্ষা (confidentiality)-র বিধি, যার মূল কথা রোগীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে চিকিৎসক যা কিছু জানবেন তা গোপন রাখবেন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে জানাবেন না। দ্বিতীয়টিকে বলা যায় হিংস্র আক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার সাধারণ (protecting persons from violent assault) বিধি, যদনুসারে, যেকোনো পরিস্থিতিতে যখন কারোর প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দেবে তখন অন্য যেকোনো বিধির তুলনায় জীবনরক্ষার বিধি বেশি গুরুত্ব পাবে। আদালত এই দুই বিধি সম্পর্কে রায় দিতে গিয়ে তাতিয়ানার পরিবারের পক্ষ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানান, "The protective privilege of confidentiality ends where public peril begins." প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা রোগীর তথ্যের গোপনীয়তা বিধি এবং যে কর্তব্যবাদী যুক্তির উপর এই বিধি নির্ভরশীল তাকে লঙঘন করাই বাঞ্ছনীয়। পরিণামবাদী যুক্তিতে, যুবতীর উপর সরাসরি প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে তা ডাক্তারের উপর বিশ্বাস হারানোর সাধারণ পরোক্ষ ক্ষতিকে ছাপিয়ে যায়। এখানে সরাসরি বড় ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধ করার পক্ষে যে কর্ম-পরিণামবাদী যুক্তি তা পরোক্ষ ঝুঁকির নিয়ম-পরিণামবাদী যুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

আরো একটা দৃষ্টান্ত বিচার করা যেতে পারে : একজন HIV-Positive রোগী, যার AIDS -এর সম্ভাবনা আছে। রোগ-নির্ণয়ের পর ডাক্তারবাবু রোগীকে সব কিছু বুঝিয়ে বলার পর অনুরোধ করলেন যে তার যৌনসঙ্গীকে বিষয়টি জানাতে। কিন্তু রোগী তা করতে অস্বীকার করে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে ডাক্তারবাবুকেও বারবার অনুরোধ করে তার সঙ্গীকে ঘটনাটি না জানাতে। ডাক্তারবাবু বুঝতে পারছেন যে তার সঙ্গী তাকে ছেড়ে যাবে — এই আশঙ্কায় রোগী তার জীবন-সঙ্গীকে একথা বলতে পারছে না। ডাক্তারবাবু রোগীকে বুঝিয়ে বলেন যে এতে দু'জনের ভাল হবে। কিন্তু কাজ হয় না, রোগী অবুঝের মতো আচরণ করতে থাকে। এক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু কি গোপনীয়তা রক্ষার বিধি লঙঘন করে ঐ রোগীর সঙ্গীকে সরাসরি জানিয়ে দিতে পারেন, এবং জানিয়ে দিলে তা কি নৈতিক দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে?

একজন HIV- পজিটিভ রোগী সম্বন্ধে কোনো তথ্য তার অনুমতি ছাড়া কোনো তৃতীয় ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা তখনই নৈতিকভাবে যুক্তিযুক্ত হবে যখন কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে যৌন-সঙ্গীকে রোগটির কথা না জানালে তার ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ ডাক্তারবাবু এখানে রোগীর সঙ্গীকে ঐ তথ্য জানাতে পারেন এবং কর্ম-পরিণামবাদের দৃষ্টিতে তা যুক্তিযুক্ত হবে। সামগ্রিক বিচারে এখানে যে মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার আছে তা গোপনীয়তা রক্ষার বিধিকে অতিক্রম করে যায়। তাছাড়া, পরিত্যক্ত হওয়ার আশঙ্কায় যে রোগী তার HIV- স্টাটাস সম্পর্কে সঙ্গীকে জানাতে অস্বীকার করছে সে একই সঙ্গে সঙ্গীর কল্যাণের ব্যাপারটি অস্বীকার করছে। এই বিষয়টি গোপনীয়তা ভঙ্গ করার পক্ষে বাড়তি সমর্থন যোগায়।

পরিশেষে বলা যায়, যদিও ডাক্তারবাবুর প্রাথমিক দায়িত্ব তার রোগীর প্রতি, তথাপি যদি তাঁর রোগীর কোনো আচরণ সমাজের অন্য কারোর গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরী করে তখন ডাক্তারবাবুর দায়িত্ব ব্যক্তি রোগীকে অতিক্রম করে সমাজের কাছে পৌঁছে যাওয়া। অন্য মানুষজনকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাতে রোগীর তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিধিতে ব্যতিক্রম স্বীকার করা উচিত। ওয়াল্টার গ্লাননের ভাষায়' "The deontological constraint on breaching confidentiality may be overridden by this consequentialist line of reasoning."

১.২.৫ আন্তঃ সাংস্কৃতিক সম্পর্ক (Cross-cultural relations) :

ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ও ঐতিহ্যের কারণে চিকিৎসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মতবিরোধ তৈরি হয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজে মানুষের মধ্যে জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্য, উপকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ধরা যাক, একজন ক্যান্সার-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কোনো রোগীকে কেমোথেরাপি নিতে পরামর্শ দিলেন। ডাক্তারবাবু এই ভেবে কেমোথেরাপি সুপারিশ করেছেন যে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্ততঃ আরো কয়েক বছরের জন্য জীবনটা দীর্ঘায়িত করা। ক্যান্সারের রোগীর বিশ্বাস, অবশিষ্ট জীবনের গুণগত মানই লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এজন্য সে কেমোথেরাপি প্রত্যাখ্যান করছে। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত চিকিৎসকদের জীবনের লক্ষ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে বিশ্বাস তা অন্য সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা রোগীদের চিন্তাভাবনা ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র। জীবন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা হওয়ার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত চিকিৎসকের সঙ্গে অন্য কোনো সমাজের রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে ভুলবোঝাবুঝি ঘটতে পারে। ডাক্তারবাবু তাঁর পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে রোগীর চিকিৎসার জন্য যা যা করা উচিত তা করতে বলেন। কিন্তু রোগী অনেক সময় ডাক্তারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন না শুধু একারণে যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা।

চিকিৎসা-নীতিবিদদের মতে এই ধরনের বিরোধের মীমাংসা নির্ভর করছে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারণার বিস্তৃত ব্যাখ্যার উপর। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে এটা হামেশাই লক্ষ্য করা যায় যে রোগী নিজে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও রোগের চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন পরিবারের অন্য কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। যদিও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদারনৈতিক ভাবনার সঙ্গে এটা মেলে না, তথাপি আমাদের এই আচরণকে স্বাতন্ত্র্য এবং সম্মতির ভিন্ন প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারি। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পরিবারতন্ত্রে আমরা এরকম লক্ষ্য করি যে সমগ্র পরিবারের হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন পরিবারের এক সর্বময় কর্তা। যাই হোক, এক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধারণাকে ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে।

বিশ্লেষণকল্পে আমরা এমন একজন পাশ্চাত্যে প্রশিক্ষিত ডাক্তারের কথা ভাবতে পারি যিনি নোভাজো সম্প্রদায় (Novajo community) -এর মধ্যে কাজ করেন। তাঁর একজন রোগী নোভাজো সম্প্রদায়ের মানুষ যে উচ্চরক্তচাপের জন্য কোনো রকম ঔষধ খেতে অস্বীকার করছে। ডাক্তারবাবু এর ফলে স্ট্রোক হওয়া, কিডনি ফেলিওর ইত্যাদি ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করান এই ভেবে যে এতে রোগী চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে আগ্রহী হবে। কিন্তু ঝুঁকির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ডাক্তারবাবু রোগীর মধ্যে চিকিৎসার নঞর্থক ধারণা তৈরী করে দিতে পারেন যা রোগীকে ডাক্তার দেখাতে নিরুৎসাহিত করতে পারে। নোভাজো সংস্কৃতিতে চিকিৎসার

অর্থ বৈষম্যের নঞর্থক অবস্থা থেকে সুষম সদর্থক অবস্থার দিকে যাত্রা। এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গকে অগ্রাহ্য করে ডাক্তারবাবু রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করার লক্ষ্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ডাক্তারবাবু তাঁর পেশাকে সংস্কৃতি-ভিত্তিক করতে প্রয়াসী হবেন। এক একটা সংস্কৃতির বা ঐতিহ্যের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবে না। এখানে যেটুকু ইপ্সিত তা হল চিকিৎসক বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকবেন।

রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি অনুসারে একজন রোগীর অধিকার আছে যেকোনো চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যেকোনো ধরনের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার রোগীর আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো রোগী যদি এসে বলেন তার শরীর থেকে দুষ্ট আত্মা বা ভূত তাড়ানোর জন্য তার একটি অঙ্গচ্ছেদ করা হোক। ডাক্তারবাবু কখনোই একাজ করতে পারেন না, কারণ তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রীয় শিক্ষা তাকে শিখিয়েছে যে এতে রোগীর ক্ষতি হবে। কারোর ক্ষতি না করা চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান নীতি, যা চিকিৎসককে মেনে চলা বাধ্য। তাই, চিকিৎসার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বাইরে কোনো রোগী যদি কোনো কিছু করতে বলেন তাহলে তা করার কোনো দায় চিকিৎসকের নেই। ডাক্তারবাবু ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক কারণে কোনো রোগীর চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করাকে সম্মান জানাতে পারে, যদিও তার ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকছে। কিন্তু রোগীর ক্ষতি হতে পারে এমন কোনো অনুরোধ কার্যকরী করা থেকে বিরত থাকবেন, তা সে অনুরোধের পিছনে যাই যুক্তি থাকুক না কেন।

১.২.৬ কি ধরনের চিকিৎসক আমাদের প্রয়োজন? (What sort of doctors do we need?) :

যখন আমরা কোনো রোগ নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাই তখন আমরা তার চিকিৎসা-সামর্থ্য, সহানুভূতি এবং দয়ার্দ্রচিত্ততা আশা করি। তবে যখন জীবন-সংশয়ের অবস্থা তখন আমরা ডাক্তারের রোগ সারানোর উপর বেশী গুরুত্ব দিই। রোগীর অবস্থা যত বেশী সংকটাপন্ন হবে চিকিৎসকের সক্ষমতা তত বেশী গুরুত্ব পাবে। জীবনসংশয়কারী কোনো আঘাত নিয়ে যদি আমাকে জরুরী বিভাগে আনা হয় তখন চিকিৎসকের সামর্থ্যটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, দয়ামায়া কম গুরুত্ব পায়। কিন্তু আমি যদি কোনো দীর্ঘস্থায়ী অথচ নিয়ন্ত্রিত কোনো রোগ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাই তখন তাঁর সহানুভূতি ও দয়ামায়া সামর্থ্যের থেকে অধিক গুরুত্ব পাবে। সাধারণভাবে, সামর্থ্য এবং দয়ার্দ্রচিত্ততা উভয় গুণই চিকিৎসকের থাকা উচিত। কিন্তু ডায়াবেটিসের মতো কোনো রোগ বা বার্ধক্যজনিত কোনো স্থায়ী রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে সহানুভূতির সঙ্গে চিকিৎসা প্রত্যাশা করি। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও রোগ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের বিশেষ সামর্থ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

এর থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে কি ধরনের চিকিৎসা আমরা চাই বা চিকিৎসকের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ আমরা দেখতে চাই তা নির্ভর করে আমাদের প্রয়োজনের প্রকৃতির উপর। আবার চিকিৎসকরা সর্বাবস্থায় পরার্থবাদী হবেন এই ভাবনা যথার্থ নয়। পরার্থবাদের মধ্যে স্বতন্ত্র কর্তব্য বা দায়িত্বের বোধ থাকে না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর রোগীর প্রতি পেশাগত কর্তব্য থাকে এবং সেই কর্তব্য পালন করা নিছক পছন্দের ব্যাপার নয়। ডাক্তারবাবু ইচ্ছা করলে রোগীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু তা ডাক্তারবাবুর ইচ্ছা-নির্ভর। কিন্তু রোগী হিসেবে রোগীর সঙ্গে পেশাগত সম্পর্কে চিকিৎসক যখন সম্পর্কিত হন তখন পেশাগত বাধ্যবাধকতা, দায়িত্ব

কর্তব্য থাকে। যখনই কেউ ডাক্তার হন তখনই তিনি রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থ দেখার জন্যই অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই এটি পেশাগত বাধ্যবাধকতা। আবার কেউ মনে করতে পারেন, অসুস্থ বা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর কিছু আবদার অনুরোধে চিকিৎসকদের মুক্ত মনে সাড়া দেওয়া উচিত। চিকিৎসানীতিশাস্ত্র অনুসারে রোগীর সঙ্গে অতিরিক্ত সময় কাটানো বা রোগীর পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হওয়া মহত্ত্বের কাজ হতে পারে যা রোগীর ভয়-বেদনা কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু, ডাক্তারবাবুর এই কাজ ঐচ্ছিক, যেকোনো চিকিৎসক তা করতে পারেন। কিন্তু এরূপ করতে কোনো চিকিৎসক দায়বদ্ধ নয়। অধিকন্তু, কোনো একজন রোগীর সঙ্গে বেশী সময় অতিবাহিত করলে যদি অন্য রোগীর প্রতি মৌলিক কর্তব্যে গাফিলতি হয় তাহলে চিকিৎসকের এরকম আচরণ অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে।

১.২.৭ সারসংক্ষেপ

এই পাঠ-এককে আমরা বায়োমেডিক্যাল এথিকসের সংজ্ঞা নিরূপণ করেছি এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি এবং একই সঙ্গে হিপোক্রাতীয় শপথ ও বায়োমেডিক্যাল এথিকসের মৌলিক নীতিসমূহের উদ্ভবের একটা ধারণা দিয়েছি। আমরা দেখেছি রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতি, পরহিত-সাধনের নীতি, ক্ষতিসাধন থেকে বিরতির নীতি এবং ন্যায়পরতার নীতি — এই চারটেই চিকিৎসার নীতিশাস্ত্রের ভিত্তিমূলক নীতি হিসেবে কাজ করে।

রোগী-চিকিৎসকের সম্পর্কের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি কিভাবে চিকিৎসকের অভিভাবকগিরির স্থানে রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ক্রমশ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। একই সঙ্গে রোগীর দেওয়া যাবতীয় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং কোনো চিকিৎসা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির মধ্যেই পড়ে। চিকিৎসক রোগীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করতে দায়বদ্ধ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় রোগীর স্বাতন্ত্র্য চূড়ান্ত। যখন রোগীর কোনো কাজ বা অবস্থা অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতির ঝুঁকি হিসেবে সামনে আসে, তখন চিকিৎসক রোগীর স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেন।

আন্তঃসাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে রোগী এবং চিকিৎসকের সম্পর্ক কিরূপ হবে তার ইঙ্গিত আলোচনায় আছে। এখানে যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল চিকিৎসক রোগীর বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। কিন্তু রোগীর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য কাজ করা এবং কোনো অবস্থাতেই রোগীর ক্ষতি না করা — এই দুই নীতি মেনেই চিকিৎসককে চলতে হবে।

আলোচনার শেষাংশে আমরা কেমন ধরনের চিকিৎসক চাই তার একটা বিচার করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে চিকিৎসক নির্দিষ্ট চিকিৎসা করার ব্যাপারে সমর্থ হবেন, চিকিৎসার সমকালীন অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত থাকবেন ও একই সঙ্গে সহানুভূতির সংগে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোগীর সঙ্গে ব্যবহার করবেন। তবে পরিস্থিতিভেদে কোনো একটি গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিভাত হতে পারে।

পরিশেষে, অতি সম্প্রতি একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনপক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছে। চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট যত্নের চিকিৎসক এবং রোগীর মধ্যে এই তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাব রোগীর স্বাতন্ত্র্য এবং জ্ঞাতসারে সম্মতির ধারণাকে একেবারে পাল্টে দিতে পারে। এক্ষেত্রে সামাজিক কর্মনীতির পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হতে পারে।

১.২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. What is biomedical ethics ? State and explain the basic principles of biomedical ethics.
2. State the Hippocratic Oath. Explain in this context how the principles of biomedical ethics have evolved from it.
3. What is informed consent? What are its components? Consider in this connection whether there is any instance in which a physician can justifiably override a patient's refusal and treat the person against his/her will?
4. Explain the notion of informed consent. Discuss in this connection whether paternalistic interventions on the part of the physicians be morally justified at the expense of a patient's individual autonomy.
5. What is therapeutic privilege? Can a physician use a therapeutic privilege and not disclose potentially harmful medical information to a patient? Discuss.
6. State the medical rule of confidentiality. When can such a rule be violated? Discuss.
7. Explain the rule of confidentiality. When is a physician justified in disclosing medical information to a third party, breaching the confidentiality norm?
8 How can cross-cultural settings influence doctor-patient relations? Discuss.
9. What sort of doctors do we require? Discuss.

10. Write short notes :

a) Arguments supporting confidentiatity

b) Benficent deception

c) Paternalism in medicine

d) The principle of non-maleficence.

১.২.৯ গ্রন্থ নির্দেশ

মূল গ্রন্থ (Recommended Text) : Walter Glannon : Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2005 পড়তে হবে (Chapters I & II)।

এছাড়া, T. Beauchamp & J. Childress : Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2001 বইটি পাঠ্য (Part-II)।

আরেকটি পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে : সন্তোষ কুমার পাল : ফলিতনীতিশাস্ত্র প্রথম খণ্ড, লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০১২। দেখতে পারেন এর প্রথম অংশ।

পাঠ-একক - ২

প্রজননগত অধিকার ও প্রযুক্তি

বিষয় সংকেত

২.০ : উদ্দেশ্য

২.১ : প্রাক্‌কথন

২.২ : ভ্রূণনাশ

২.৩ : ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা

২.৪ : বিকল্প মাতৃত্ব

২.৫ : ভ্রূণের লিঙ্গ - নির্বাচন

২.৬ : ক্লোনিং

২.৭ : সিদ্ধান্ত

২.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৯ : গ্রন্থনির্দেশ

পাঠ-একক - ২

প্রজননগত অধিকার ও প্রযুক্তি (Reproductive Rights and Technologies)

২.০ উদ্দেশ্য :

জৈব-প্রযুক্তি তথা প্রজনন-সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নতি ও তার ব্যবহারের সাথে সাথে নতুন নতুন নৈতিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। ভ্রূণনাশ, বিকল্প মাতৃত্ব, ক্লোনিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় এমন কিছু নতুন ধরনের নৈতিক প্রশ্ন সামনে এনেছে যার উত্তর খোঁজা আমাদের কাছে জরুরী হয়ে পড়েছে। এই পাঠ-এককে আমরা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জন্মদানকে কেন্দ্র করে যেসব নৈতিক সমস্যা উদ্ভব হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করব।

২.১ প্রাক্‌কথন :

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রো বনাম ওয়েড' (Roe Vs. Wade) কেসে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট নারীর গর্ভপাতের অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৩ সাল থেকে ফিটাল ভায়াবিলিটি (অর্থাৎ মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকার সামর্থ্যযুক্ত ভ্রূণ) -এই আগের অবস্থার মধ্যে ভ্রূণনাশকে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। আদালত এই ভাবনাকে তুলে ধরে যে মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকতে অসমর্থ এমন ধরনের ভ্রূণ ব্যক্তি নয়, তাই ব্যক্তি হিসাবে জীবনের অধিকারের প্রশ্ন এখানে ওঠে না। বিপরীতে, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও কানাডার আইনি ব্যবস্থায় যেসব প্রাণবান শিশু জন্মলাভ করে তাদেরই আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। দ্বিতীয়োক্ত এই মতে, এমন কি নয় মাসের ভ্রূণকেও শিশুর সমান অধিকার দেওয়া হয় না।

প্রজনন-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির আবিষ্কার ও বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সাথে সাথে একগুচ্ছ চিকিৎসাগত, আইনি ও নৈতিক সমস্যার জন্ম হয়েছে। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লুইস্ নামে এক কন্যার জন্ম দেন এক ব্রিটিশ মহিলা লেসলি ব্রাউন। এই কন্যার ভ্রূণ বেশ কিছুদিন ধরে মাতৃগর্ভের বাইরে ছিল। মাতৃগর্ভের বাইরে মানব শিশুর জন্ম এই প্রথম। লেসলির ফ্যালোপিয়ান টিউবে সমস্যা থাকায় স্বাভাবিকভাবে শিশুর জন্ম দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তাঁর ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তার স্বামীর শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করে গবেষণাগারে টেস্টটিউব বা কাঁচের পাত্রে (এই ব্যবস্থাকে ইন ভিট্রো নিষেক (in vitro fertilization) বলা হয়) স্থাপন করা হয়। এর থেকে যে ভ্রূণের সৃষ্টি হয় তা লেসলির জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয়। এর থেকে কালক্রমে লুইসের জন্ম হয়। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই 'ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন' (IVF) র মাধ্যমে অনেক দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে সমর্থ হয়েছে যা স্বাভাবিক জীবতাত্ত্বিক উপায়ে সম্ভব ছিল না। ১৯৮৫ সালে হাই-প্রোফাইল কেস 'Baby M' বিকল্প মাতৃত্ব (surrogate pregnancy) এই ধারণাকে সার্থকভাবে সামনে আনে এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্ন সামনে আনে। কোন নারীর সঙ্গে যখন চুক্তি করে কোন দম্পতির শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে জাত জাইগোট ঐ নারীর গর্ভে স্থাপন করা হয় এবং কালক্রমে তার থেকে সন্তানলাভের ব্যবস্থা করা হয় তখন সেই মাতৃত্বকে বিকল্প মাতৃত্ব বলে। চুক্তিবদ্ধ নারী কেবল গর্ভধারণের কাজটি অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোন বিবেচনায় করে দেয়। এই নিছক গর্ভধারণগত মাতৃত্বের বিষয়টি সামাজিক

মা-র (social mother) ধারণা থেকে স্বতন্ত্র হয়। আর এক ধরনের ক্ষেত্র আছে যেখানে চুক্তিবদ্ধ মায়ের ডিম্বাণু ব্যবহার করা হয়। এর থেকে আমরা তিন ধরনের মা-এর ধারণা পাই : জীনদাত্রী মা (genetic mother) , গর্ভধাত্রী মা (gestational mother) এবং সামাজিক মা (social mother)। বস্তুতঃ যে মা ডিম্বাণু সরবরাহ করে সেই মা যে মা গর্ভধারণ করে তার থেকে যেমন আলাদা, তেমনি যে মা এতজ্জাত শিশুকে লালন-পালন করে বড় করে তোলে গর্ভধারিণী মা থেকে সেই মা আলাদা। একই রকমভাবে যে পিতা শুক্রাণু দান করে সেই পিতা যে শিশুটিকে বড় করে তোলে তার থেকে আলাদা হতে পারে। অন্য দিকে, অ্যামনিওসেন্‌টেসিস (amniocentesis), স্পার্ম সর্টিং (sperm sorting), প্রি-ইমপ্লান্‌টেস্‌ন জেনেটিক ডায়গ্‌নোসিস্‌ (preimplantation genetic diagnosis) ইত্যাদি পদ্ধতিতে ভ্রূণ বা ফিটাসের যৌনপরিচয় বা লিঙ্গ আগে থেকেই আমাদের জানিয়ে দিতে পারে। এইসব পদ্ধতি ভাবী পিতা-মাতাকে তার পছন্দ মতো পুত্র বা কন্যা সন্তান পেতে সাহায্য করতে পারে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কিত বিষয় হল চিকিৎসাগত ক্লোনিং (therapeutic cloning)। এই পদ্ধতিতে ভ্রূণের হুবহু কপি (clone) তৈরী করে তার থেকে স্টেমসেল (stem cell) সংগ্রহ করা হয় যা প্রচ্ছন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত ট্যিসুকে নতুন প্রাণদান করতে পারে এবং ক্ষয়িষ্ণু দেহের কোন অঙ্গকে সারিয়ে তুলতে পারে।

এই পাঠ এককে আমরা আলোচনা করব কোন ফিটাসকে গর্ভ থেকে বের করে দেওয়া, অর্থাৎ পরিণত ভ্রূণনাশ (abortion) নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে অনুমোদনযোগ্য কিনা। অধিকন্তু, আমরা আলোচনা করব ভ্রূণের কোনরূপ নৈতিক মর্যদা আছে কিনা এবং এই আলোচনাই আমাদের ইঙ্গিত দেবে, আমরা IVF গবেষণা চালু রাখব কি না। অন্য দিকে বিকল্প মাতৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা দেখার চেষ্টা করব জীন-দাত্রী মা, গর্ভধাত্রী মা এবং সামাজিক মায়ের মধ্যে শিশুর প্রতি অধিকারের দাবী কার বেশি জোরালো! বিকল্প মাতৃত্ব কি নারীকে শোষণ করে, বা শিশুর পণ্যায়নে উৎসাহিত করে? একই সঙ্গে লিঙ্গ-নির্ধারণের বিষয়টি নৈতিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য কি না তাও আলোচনা করব। শিশুর রোগের চিকিৎসার জন্য লিঙ্গ নির্ধারণও কি সমানভাবে নীতিগর্হিত হবে? সবশেষে আমরা চিকিৎসাগত ও জন্মদানগত ক্লোনিং-এ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক প্রশ্নগুলির বিচার করব।

২.২ ভ্রূণনাশ (Abortion) :

ভ্রূণ বা ফিটাস (যার থেকে মানব শিশুর জন্ম হয়) নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনাটিকে ভ্রূণনাশ বলা হয়। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে তীব্র বির্তক লক্ষ্য করা যায়। ভ্রূণনাশের বিরোধী রক্ষণশীলদের মূল যুক্তি হল নিষেকের পরমুহূর্ত থেকেই মানব জীবন শুরু হয় এবং তাই যে কোন মানুষের মতোই নিষিক্ত ভ্রূণের জীবনের অধিকার আছে। তুলনায় একটু নরমপন্থী অবস্থান অনুসারে একটি ফিটাস যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকতে সমর্থ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জীবনের অধিকার সাধারণ ব্যক্তি মানুষের অধিকারের সমতুল্য নয়। অর্থাৎ 'নন-ভায়াবেল' ফিটাসেরও জীবনের অধিকার আছে, তবে তা পূর্ণবয়স্ক কোনো মানুষের সমতুল্য নয়। একই ধরনের আর একটি অবস্থান হল জীবনের অধিকার নির্ভর করে সংবেদিতা-সামর্থ্য (sentience)-এর উপর। অন্যদিকে, ভ্রূণনাশ সম্বন্ধে সব থেকে উদারনৈতিক

অবস্থান এই যে জন্মের সময় ও তার পর থেকেই কেবল একজন ব্যক্তির অধিকার আছে বলা যায়। শেষোক্ত এই মতে গর্ভাবস্থার শেষের দিকেও ভ্রূণনাশ নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য। এখানে যে বিভিন্ন মতের কথা বলা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু এই মতের প্রত্যেকটিই ফিটাসের নৈতিক মর্যাদার উপর ভিত্তি করেই তার দাবি এবং তার সমর্থনে যুক্তি সরবরাহ করে। নৈতিক মর্যাদা এমন একটা বৈশিষ্ট্য যা ব্যক্তিদের অন্যের উপর এই দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে যে এইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে এক বিশেষ ভাবে আচরণ করতে তারা দায়বদ্ধ। সংরক্ষণপন্থীদের বক্তব্য, একটি ফিটাসের নৈতিক মর্যাদা আছে যেহেতু এটি একটি মানবজীবন। নরমপন্থীরা নৈতিক মর্যাদাকে মাতৃগর্ভের বাইরে বেঁচে থাকার সামর্থ্য (viability) বা সংবেদিতা (sentience) অর্থাৎ সুখ-দুঃখ অনুভব করার সামর্থ্যের ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। অন্য দিকে, উদারনৈতিক চিন্তাবিদেরা আত্ম-সচেতনতা সামর্থ্য (the capacity for self-conciousness awarness) -এর ভাষায় নৈতিক মর্যাদাকে সংজ্ঞায়িত করেন।

ভ্রূণনাশ সম্বন্ধে সব থেকে প্রভাবশালী মতগুলি এটাই দেখাতে চায় যে ভ্রূণনাশের পক্ষে বা বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় তার সিদ্ধান্ত যুক্তিবাক্য থেকে নিঃসৃত হয় না। জুডিথ জারভিস্ টমসন্ (Judith Jarvis Thomson) যুক্তি দিয়েছেন যে ফিটাস যদি জীবনের অধিকারযুক্ত একজন ব্যক্তিও হয় তথাপি এর থেকে নিঃসৃত হয় না যে ভ্রূণনাশ অননুমোদনযোগ্য। বিপরীতে, ডন মারকুইস (Don Marquis) যুক্তি দিয়েছেন যে এমন কি যদি ফিটাসের আত্মসচেতনতার সামর্থ্য নাও থাকে, তার থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে ভ্রূণনাশ অনুমোদনযোগ্য। টমসনের যুক্তি ভ্রূণনাশ সম্পর্কে রক্ষণশীল অবস্থানের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ, ঠিক তেমনি মারক্যুইসের যুক্তি উদারনৈতিক অবস্থানের বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। মায়ের জীবনরক্ষার প্রয়োজনেও ভ্রূণনাশ অনুমোদনযোগ্য নয় — এই অভিমতকে 'চরম মত' (extreme view) বলেছেন টমসন এবং এর বিরুদ্ধে তিনি যুক্তি সাজিয়েছেন। এই অভিমত ধরে নেয় যে ফিটাস এক ব্যক্তি যার জীবনের অধিকার রয়েছে, যার থেকে ফিটাসের এই অধিকার নিঃসৃত হয় যে সে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকবে। কিন্তু টমসন বলেন, একটি অধিকার থেকে অন্য অধিকার নিঃসৃত হয় না, এবং এটা এই কারণে যে অন্য ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে আমরা কেউ নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ নই। কোনো ফিটাসের বেড়ে ওঠার জন্য কোনো স্ত্রীলোকের দেহ ব্যবহার করতে অনুমোদন দেওয়ার অর্থ একটি বড় ধরনের ত্যাগ স্বীকার করা, যা মহত্ত্বের পরিচায়ক হলেও আমরা তা করতে বাধ্য নই। তাই কোনো স্ত্রীলোকের নৈতিক দায় নেই কোনো ফিটাসকে বেড়ে ওঠার জন্য তার শরীরে সংশ্লিষ্ট রাখা বা অন্য ভাষায়, গর্ভে ধারণ করা। এর থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে একটি ভ্রূণকে নষ্ট করা বা কোনো দেহ থেকে সেটাকে আলাদা করে দেওয়া নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য।

ভ্রূণনাশ সম্পর্কে আমাদের এই 'নৈতিক অনুভব' (moral intuition) -কে যাচাই করে নেওয়ার জন্য টমসন আমাদের এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেছেন। একদিন সকালে জেগে উঠে দেখলাম আমি এক হসপিটালের বেডে রয়েছি এবং আমার ঠিক পাশে একজন সংজ্ঞাহীন ভায়োলিন-বাদক শুয়ে রয়েছেন। এই ভায়োলিন-বাদকের মারাত্মক কিডনির রোগ হয়েছে এবং আমার ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে তার ব্লাডগ্রুপের সাযুজ্য রয়েছে। আমি জানতে পারি 'দ্য সোসাইটি অফ মিউজিক্ লাভার্স' আমাকে অপহরণ করেছে এবং হসপিটালে

নিয়ে এসে ভায়োলিন বাদকের সংবহনতন্ত্রকে আমার সংবহনতন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেছে, যাতে আমার কিডনি ভায়োলিন-বাদকের ডায়ালিসিস মেশিন হিসেবে কাজ করে। হাস্‌পাতাল্‌ কর্তৃপক্ষের কাছে এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। আর ব্যাপারটা যখন হয়েই গেছে তখন পরবর্তী নয় মাস কারোর কিছু করার নেই। যদি ভায়োলিন-বাদককে আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তাহলে তিনি মারা যাবেন। হস্‌পিটাল্‌ কর্তৃপক্ষ এই যুক্তি দেখায় যে সব ব্যক্তিরই জীবনের অধিকার আছে এবং এই ভায়োলিন-বাদক একজন ব্যক্তি! আমার দেহের মধ্যে কি ঘটবে তা স্থির করার অধিকার আমার আছে। কিন্তু ভায়োলিন-বাদকের জীবনের অধিকার আমার দেহ-মনে কি ঘটছে তার তুলনায় নীতিগতভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তার থেকে নিজেকে আলাদা করে নেওয়া নীতিগতভাবে ভুল হবে, মন্দ কাজ হবে।

টমসন বলেন যে আমাদের অধিকাংশেরই এই যুক্তিকে 'ঘোর দৌরাত্ম্য' বলে মনে হয়। তিনি এই যুক্তিকে উপমার ছলে ফিটাসের জীবনের অধিকার এবং ভ্রূণনাশের অননুমোদনযোগ্যতার দাবি পর্যন্ত প্রসারিত করছেন এটা দেখাতে যে এই দাবিগুলি সমর্থনযোগ্য নয়। আমার বিরুদ্ধে ভায়োলিন-বাদকের এমন কোনো অধিকার নাই যা আমাকে আমার দেহকে নয় মাস কালব্যাপি ব্যবহার করতে দিতে আমাকে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ করে। আমি দয়াপরবশ হয়ে বা মহানুভবতার খাতিরে তাঁকে সাহায্য করবার স্বেচ্ছাব্রত নিতে পারি এবং আমার 'গুড্‌ সামারিটান' হওয়ার দৌলতে তিনি উপকৃত হতে পারেন। একই রকম ভাবে কোনো ফিটাসের এমন কোনো অধিকার নেই যা আমাকে বাধ্য করবে তাকে আমার দেহ ব্যবহার করতে দিতে। কেউ তা অনুমোদন করতে পারেন। কিন্তু ফিটাসের প্রতি কারোর কোনো দায় নেই, যেহেতু 'গুড সামারিটান্‌' হওয়ার কোনো নৈতিক দায় আমাদের নাই। এখন যদি গর্ভবতী কোনো স্ত্রীলোক ফিটাসকে তার শরীরে সংশ্লিষ্ট রাখতে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ না হন এবং যদি ফিটাসটি সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের জীবন বিপন্ন করতে উদ্যত হয় তখন গর্ভপাতের মাধ্যমে তাকে দেহ থেকে আলাদা করে দেওয়া নীতিগতভাবে অনুমোদনের যোগ্য হবে।

ভায়োলিন-বাদকের দৃষ্টান্তটি বলাৎকার জনিত গর্ভধারণের সমতুল্য। যদি কোনো স্ত্রীলোক স্বাভাবিক যৌনসম্পর্কের মাধ্যমে স্বেচ্ছায় গর্ভধারণ করেন তখন তাঁর গর্ভস্থ ফিটাসের জন্য দায়িত্ব থাকতে পারে। অন্যদিকে বলাৎকার বা অনাচারের ফলশ্রুতিতে গর্ভবতী হওয়া স্বতন্ত্র ব্যাপার। কিন্তু স্বেচ্ছায় যিনি মাতৃত্বকে আহ্বান করেছেন তিনি কি ফিটাসের জীবনের অধিকার মেনে নিতে দায়বদ্ধ? টমসনের প্রতিক্রিয়া হল, বলাৎকার জনিত মাতৃত্ব এবং দায়িত্বশীল মাতৃত্বের পার্থক্যটি ফিটাসের জীবনের অধিকারের উপর আলোকপাত করা থেকে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের তাঁর গর্ভস্থ ফিটাসের প্রতি দায়িত্বের দিকে আমাদের মনোযোগ স্থানান্তরিত করে। কিন্তু কোনো ফিটাসের জীবনের অধিকার যে ঘটনার মাধ্যমে মাতৃত্ব এসেছে তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। যদি এই অধিকার স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটেছে কিনা তার উপর নির্ভর করে তাহলে বলাৎকারের মাধ্যমে সংঘটিত অ-জাত ফিটাসের মায়ের শরীর ব্যবহার করার কোনো অধিকারই থাকতে পারে না। অন্য দিকে, দায়িত্বশীল মাতৃত্বের ক্ষেত্রে এই অধিকার আছে স্বীকার করা হবে। কিন্তু সমস্যা হল, ফিটাসের মধ্যে এমন কোনো স্বস্থিত বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই যা এই পৃথকীকরণকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে পারে। যেহেতু কোনো ব্যক্তির জীবনের অধিকার কিভাবে তার জন্ম হয়েছে তার উপর নির্ভর করে না, তাই দায়িত্ববত্তা-ভিত্তিক যুক্তিটি ভ্রূণনাশের সমর্থনে টমসনের যুক্তির বিরুদ্ধে ফলদায়ী হয় না।

টমসন এখানে তাঁর অবস্থানের পক্ষে দুটি বিশেষ বিষয় যোগ করতে চান। প্রথমত, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন যে

ভ্রূণনাশ সাধারণভাবে অনুমোদনযোগ্য, কিন্তু সর্বদা অনুমোদনযোগ্য নয়। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সী বালিকার বলাৎকারজনিত ভ্রূণের বিনাশ এবং সাতমাস গর্ভবতী কোনো স্ত্রীলোকের বিদেশ-গমন যাতে আটকে না যায় তার জন্য ভ্রূণনাশ — এই দুই এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে গর্ভনাশের অনুমতি খুবই যুক্তিযুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, টমসন যুক্তি সহকারে এটা বলতে চান যে গর্ভপাতের মাধ্যমে কারোর দেহ থেকে ফিটাসকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সমর্থনযোগ্য হলেও জন্মের পরে কোনো শিশুকে হত্যা করা সমর্থনযোগ্য নয়। তাই ভ্রূণনাশের অধিকার শিশুহত্যার অধিকার দেয় না।

টমসনের যুক্তি এখানে নঞর্থক অধিকার এবং সদর্থক অধিকারের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। কোনো ব্যক্তির নঞর্থক অধিকার ইঙ্গিত করে যে অপরাপর ব্যক্তিরা ঐ অধিকার প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করবে না। অন্য দিকে, সদর্থক অধিকার এই ইঙ্গিত করে যে অপর ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট অধিকারের বাস্তবায়নে সাহায্য করতে দায়বদ্ধ। নঞর্থক অধিকার সদর্থক অধিকারকে গুরুত্বহীন করে দেয় এবং তা এই কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অধিকার উপকৃত হওয়ার অধিকারের তুলনায় অনেক বেশি নৈতিক ভার বহন করে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নঞর্থক অধিকার আছে ভারাক্রান্ত না হওয়া বা ঝুঁকি না নেওয়াতে। তাই তার অধিকার আছে ফিটাসকে তার দেহ ব্যবহার করতে অনুমতি না দিতে। অন্য দিকে, এখানে ফিটাসের কথিত জীবনের অধিকার এবং স্ত্রীলোকের দেহ ব্যবহার করার যে অধিকার তা সদর্থক অধিকার। যেহেতু ফিটাসের সদর্থক অধিকার সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকের দেহে হস্তক্ষেপ না করার নঞর্থক অধিকারকে লঙঘন করে এবং যেহেতু নঞর্থক অধিকার সদর্থক অধিকারকে ছাপিয়ে যায়, সেহেতু স্ত্রীলোকের অধিকার আছে কোন ফিটাসকে শরীরের বাইরে বের করে দেওয়ার।

দায়িত্বঘটিত উপরের যুক্তিটি একটু অদল-বদল করে টমসনের বিরুদ্ধে যে যুক্তি সাজানো হয় তা ফিটাসের অধিকার ও মায়ের অধিকারকে পাশ কাটিয়ে যায়। যদি স্বেচ্ছাকৃত মিলনের ফলশ্রুতি হিসাবে গর্ভধারণের ঘটনা ঘটে তাহলে সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোক এবং তার সঙ্গী উভয়ই ফিটাসের কল্যাণের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে, এবং সংশ্লিষ্ট ফিটাসটিকে দেহে ধারণ করতে ঐ স্ত্রীলোক নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। এটি এজন্য নয় যে ফিটাসের জীবনের অধিকারের স্বীকৃতি আছে। বরং তা এই কারণে যে ঐচ্ছিক কর্মের পরিণাম স্বীকার করে নিতে আমরা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। অন্যদিকে, যদি ঐচ্ছিক যৌন মিলনের পরিণাম হিসেবে এমন ফিটাসের আবির্ভাব ঘটে যার গুরুত্বপূর্ণ অস্বাভাবিকতা জানা গেছে (যে অস্বাভাবিকতা ভবিষ্যৎ জীবনে সাংঘাতিক রোগের সূচনা করবে), তখন পিতামাতা ভবিষ্যৎ শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে প্রতিরোধ কল্পে ভ্রূণনাশ করতে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ হতে পারে। এখানে যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হল, কোনো একটি ফিটাসকে গর্ভে ধারণ করার ব্যাপারে বা সেটিকে গর্ভপাতের মাধ্যমে বিনষ্ট করার ব্যাপারে একজন দায়ী হোক বা না হোক এর কোনোটিই ফিটাসের জীবনের অধিকার আছে কিনা তার উপর নির্ভর করে না।

মারক্যুইস তাঁর যুক্তি শুরু করছেন এটা ধরে নিয়ে যে ভ্রূণনাশ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হবে কিনা তা নির্ভর করে ফিটাসের নৈতিক মর্যাদার উপর, অর্থাৎ ফিটাস এমন ধরনের সত্তা কি না যার জীবন নষ্ট করে দেওয়া নৈতিকভাবে মন্দ কাজ। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মনুষ্য-ব্যক্তিকে হত্যা করা মন্দ কাজ এই কারণে যে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাবতীয় অভিজ্ঞতা, ক্রিয়া-কর্ম, পরিকল্পনা এবং জীবনকে উপভোগ করা থেকে বঞ্চিত করে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কথা বললে, একটি ফিটাসও এই ধরনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই যে যুক্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক

ব্যক্তিমানুষকে খুন করা অন্যায় সেই একই যুক্তিতে ফিটাসকে নষ্ট করা মন্দ কাজ। এর থেকে নিঃসৃত হয় আপাত বিচারে ভ্রূণনাশ নীতিগতভাবে মন্দ কাজ। তবে মারক্যুইসের মতে ভ্রূণনাশ চূড়ান্তভাবে মন্দ নয়। বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভ্রূণনাশ না করতে পারা জনিত ক্ষতি এর বিকল্পের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। সাংঘাতিকভাবে বিকলাঙ্গ একটি ফিটাসকে গর্ভে ধারণ করা এখানে দৃষ্টান্ত হতে পারে।

মারক্যুইসের যুক্তির নির্ণায়ক অংশটি হল এই দাবী যে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে খুন করার যে অনৌচিত্য বা মন্দত্ব তা ফিটাসকে নষ্ট করা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু এটা ঘটনা যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি এবং ফিটাসের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা এই যুক্তিকে দ্বিতীয়ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করার প্রচেষ্টায় সন্দেহের উদ্রেক করে। হত্যা করা মন্দ কাজ এই কারণে যে যে হত্যার শিকার হয় যে সে মূল্যবান ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিজে নিজেই মূল্যবান হয় না। ভবিষ্যৎ সেই ব্যক্তির জন্যই মূল্যবান হয় যার তা ভোগ করার সামর্থ্য আছে এবং যে ভবিষ্যতের জন্য কর্মসূচী বা কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। অভিজ্ঞতাকে মূল্য দেওয়া বা ভোগ করা তখনই সম্ভব যখন কোনো সত্তার পূর্ণ আত্মসচেতনতা রয়েছে। এই সামর্থ্য শৈশবের প্রথম দিক থেকেই আবির্ভূত হয়। কিন্তু মাতৃগর্ভের ফিটাসের সেরূপ কোনো মানসিক ক্ষমতা নেই, যা কোনো বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ নিতে পারে বা ভবিষ্যৎকে মূল্য দিতে পারে। একটি ফিটাসকে নষ্ট করলে তার কোনো মূল্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় না, বা আমাদের মতো ভবিষ্যতের কোনো ক্ষতির মুখোমুখি হয় না। সুতরাং গর্ভনাশকে নীতিগতভাবে মন্দ বলা যায় না। মারক্যুইস জোর দিয়ে যা বলতে চান তা হল আমাদের মতো মূল্যবান ভবিষ্যৎ থাকার ধারণা ব্যক্তিত্বরূপ ক্যাটিগরি থেকে স্বতন্ত্র। তথাপি কোনো কিছু সম্পর্কে আগ্রহ থাকা এবং ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতার মূল্যাবধারণ করার সামর্থ্য আত্মসচেতনতার সামর্থ্যকে আগে থেকে ধরে নেয় এবং ইহাই ব্যক্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে। মারকুইসের মতে, ভ্রূণনাশের নৈতিক অনুমোদনযোগ্যতা ফিটাসের নৈতিক মর্যাদার উপর নির্ভর করে। ফিটাসের এই মর্যাদা আছে তখনই বলা হবে যখন এটি মূল্যবান ভবিষ্যৎ থাকার বৈশিষ্ট্যটি বহন করে। কিন্তু ফিটাসের যেহেতু ভবিষ্যতে আগ্রাহান্বিত হওয়ার মানসিক সামর্থ্য থাকে না, সেহেতু ফিটাসের মর্যাদা আছে কিনা সে বিষয়ে সঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে।

মারক্যুইসের ভ্রূণনাশ-বিরোধী যুক্তিকে সম্ভাবনা নির্ভর যুক্তি হিসেবে বর্ণনা করা যায়। একটি ফিটাসের নৈতিক মর্যাদা আছে বলা হয় এই ভেবে যে তার মধ্যে ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখানে আমাদের দুই ধরনের সম্ভাবনার মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। জেফ ম্যকমাহান (Jeff McMahan) পরিচয়-রক্ষাকারী সম্ভাবনা (identity preserving potential) এবং অ-পরিচয় রক্ষাকারী সম্ভাবনা (non-identity preserving potential) -এদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রথম ধরনের যে সম্ভাবনা, অর্থাৎ পরিচয়-রক্ষাকারী সম্ভাবনা, এই অর্থে পরিচয়-রক্ষাকারী যে ফিটাস এবং নবজাতক একই ব্যক্তির দুটি বিভিন্ন পর্যায় যা কিছু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ব অবস্থা থেকে পরের অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধরনের সম্ভাবনা এই অর্থে অ-পরিচয়-রক্ষাকারী যে ফিটাস এবং নবজাতক দুটি স্বতন্ত্র সত্তা। প্রথম ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা ফিটাসের স্বস্থিত, যেহেতু সেটি ভিতর থেকেই সিদ্ধ হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা পরস্থিত (extrinsic) এবং তা এই জন্য যে সেটি কিছু বাহ্যিক শর্তের উপর নির্ভর করে। একমাত্র স্বস্থিত পরিচয়-রক্ষাকারী সম্ভাবনাই ফিটাসকে বেঁচে থাকতে আগ্রহ প্রদান করে এবং একই সঙ্গে নৈতিক মর্যাদা গড়ে তোলে, যা একে হত্যা করা অন্যায় প্রতিপন্ন

করে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ের ফিটাসের মধ্যে চেতনার সম্ভাবনা জন্য ব্রেনের গঠন ও কার্য-সামর্থ্যের প্রকাশ ঘটে, তথাপি প্রথম পর্যায়ে ফিটাসে এই ধরনের কোনো ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট হয় না। আমরা যদি এই পার্থক্যটা অনুসরণ করি তাহলে বুঝতে পারবো মারক্যুইসের ভ্রূণনাশ-বিরোধী যুক্তি শেষ পর্যায়ের ফিটাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, প্রথম পর্যায়ের ভ্রূণের ক্ষেত্রে নয়।

সামগ্রিক বিচারে টমসনের ভ্রূণনাশের অনুমোদনযোগ্যতার যুক্তি মারকুইসের ভ্রূণনাশের অননুমোদনযোগ্যতা যুক্তির তুলনায় অনেক বেশি প্রত্যয়-উৎপাদকারী। তথাপি এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে টমসন বা মারক্যুইসের অবস্থানই শেষ কথা। আরো অনেক চিন্তাবিদ আছেন যাঁরা নৈতিক মর্যাদাকে বুঝে করা স্বীকার্য হলেও শেষ পর্যায়ের ফিটাসকে নষ্ট করা সমর্থনযোগ্য নয়।

উপর্যুক্ত ধরনের যুক্তির বিরুদ্ধে ম্যারি অ্যান (Mary Anne Warren) যুক্তি দেন যে ভ্রূণনাশ এবং শিশু-নিধন প্রাথমিক দৃষ্টিতে সমর্থনযোগ্য হতে পারে, যেহেতু ফিটাস বা নবজাতক কেউই ব্যক্তি নয়। এরা কেউই সেই ধরনের সামর্থ্যের অধিকারী নয়, যা ব্যক্তিত্বের সংগঠক। তবে শিশু-নিধনের বিরুদ্ধে দুটি নীতিনিষ্ঠ যুক্তি আছে। প্রথমত, এক নবজাতকের পূর্ণ সচেতন ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা পরিচয়-রক্ষাকারী সম্ভাবনা। তাই শিশু-নিধন নীতিগতভাবে মন্দ কাজ। দ্বিতীয়ত, জন্মের ঠিক কত দিন পরে শিশু পূর্ণ আত্ম-সচেতনতা লাভ করে তা স্পষ্ট নয়। সুতরাং 'বেনিফিট্ অব্ ডাউট'-র যুক্তিতে শিশুর কোনো ক্ষতি হবে ভেবে ভ্রূণনাশের অনুমোদনযোগ্যতা এবং শিশু-নিধনের অনুমোদনযোগ্যতা-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত।

পরিশেষে, আমরা রোনাল্ড ডোরকিন (Ronald Dworkin)-এর বক্তব্য অনুসরণ করব। ডোরকিন দাবী করেন ভ্রূণনাশের বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগগুলি মানব-জীবনের অলঙঘনীয়তা বা পবিত্রতায় বিশ্বাস (sanctity of human life)-এর উপর নির্ভর করে। তিনি মানব জীবনের অলঙঘনীয়তা বা পবিত্রতার একটি ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, জীবনের অলঙঘনীয়তা নীতি এটাই বলে মানব জীবনের স্বস্থিত মূল্য আছে, অন্য কেউ তার মূল্য দিক বা না দিক। ফিটাস স্বস্থিত মূল্যযুক্ত একটি মানবজীবন, তাই এমন কি প্রথম দিককার ফিটাসের বিনাশসাধনও এই পবিত্রতা নীতিকে লঙঘন করে এবং তাই তা অন্যায়। তথাপি, আমাদের মনে হয়, কোনো সত্তার যদি নিজের স্বার্থ বা অধিকারের বোধ-সামর্থ্য না থাকে তাহলে তার ক্ষতি করা বা তার প্রতি অন্যায় করা অর্থপূর্ণ হয় না। জীবনের মূল্য আছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছেই, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে জীবনের মূল্যের কথা বলা যথার্থ নয়। যদিও জীবনের অলঙঘনীয়তার নীতি পিটার সিঙ্গার প্রভৃতি নীতিবিদ্দের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে, তথাপি আমরা বলতে পারি অলঙঘনীয়তার যুক্তি পরবর্ত্তী-পর্যায়ের ফিটাসের গর্ভনাশের বিরোধীতা করতে পারে, কিন্তু প্রথম-দিককার ভ্রূণের বিনাশের বিরোধীতা করে না, যেহেতু প্রথম দিককার ভ্রূণের এই মর্যাদা নেই।

২.৩ ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা (The Moral Status of Embryos)

গর্ভপাত বা ভ্রূণনাশের বিরোধীরা যে মূল যুক্তি ব্যবহার করেন তা হল ভ্রূণের মধ্যেই ব্যক্তি মানুষের সম্ভাবনা নিহিত আছে। এই সম্ভাবনাই ভ্রূণকে এক বিশেষ নৈতিক মর্যাদা দান করে, যার ফলে ভ্রূণনাশ বা স্টেমসেল গবেষণার জন্য ভ্রূণ তৈরী করা নীতিগতভাবে অনুমোদনযোগ্য হয় না। একটি মনুষ্য-ব্যক্তি হিসাবে

বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা ভ্রূণের আছে এই দাবী ধরে নেয় যে ভ্রূণ নিজে নিজেই এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। এই সম্ভাবনা একটি স্বগত বৈশিষ্ট্য যা কোন নারীর জরায়ুতে অবস্থান করা রূপ বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষভাবেই যেন বিকশিত হতে পারে। কিন্তু ভ্রূণের বিকাশের জন্য জরায়ু এবং প্লাসেন্টা-র মতো জীবতাত্ত্বিক গঠন প্রয়োজন হয়, এবং এই জন্য ভ্রূণের বিকাশ শুধুমাত্র এর স্বগত অর্থাৎ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপরই নয়, কিছু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বা শর্তের উপর নির্ভর করে। IVF-ভ্রূণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার বিষয়টি আরো সমস্যাকীর্ণ। গবেষণাগারে যথেষ্ট ব্যবস্থা তথা সহযোগিতার উপস্থিতিতেও এই ধরনের কোন একটি ভ্রূণ প্রাণবান শিশুতে বিকশিত হবার সম্ভাবনা কম-বেশি ২০ শতাংশ। এখন, যেহেতু ভ্রূণের আত্ম-পরিচয়-রক্ষাকারী সম্ভাবনা এবং তজ্জাত নৈতিক মর্যাদা নেই, সেহেতু এই ভ্রূণকে ফিটাস বা মনুষ্য-ব্যক্তিতে বিকশিত করতে বাধা দেওয়া অন্যায় হয় না।

আমরা ধরে নিই যে ভ্রূণের সম্ভাবনার মধ্যে স্বস্থিত এবং বহিঃস্থ বা বাহ্যিক উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের উপরই ভ্রূণের সম্ভাবনা নিহিত থাকে, এবং এই দুই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলি একত্রে ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা প্রদান করে। এই মর্যাদা ভ্রূণকে মনুষ্য-ব্যক্তি হিসাবে বেড়ে ওঠার অধিকার দেয়। ভ্রূণ-নাশের অন্যায্যতা বা মন্দত্ব ব্যাখ্যা করতে যাঁরা এই সম্ভাবনার ধারণার উপর নির্ভর করেন, তাঁদের জন্য আরো সমস্যা রয়েছে। অনিষিক্ত একটি ডিম্বাণুর মধ্যেও একটি ব্যক্তি মানুষ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে; উপযুক্ত জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ পেলে এই ডিম্বাণু মনুষ্য-বক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। শুক্রাণু থেকে জীনগত উপাদনের সংযোজন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ঘটনা তথা প্রক্রিয়ার একটি অংশ। তাই এরকম মনে করার কোন কারণ নেই যে নিষিক্ত ডিম্বাণুর আরো বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং অনিষিক্ত ডিম্বাণুর তা নেই। সংগতির স্বার্থে তখন আমরা বলতে পারি, যদি ভ্রূণ এবং পুরুষ বা স্ত্রী গ্যামেটের মানুষ-সত্তায় বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যদি ভ্রূণের পরবর্তী বিকাশে বাধার সৃষ্টি করা নীতিগতভাবে মন্দ হয়, তাহলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণও নৈতিকভাবে অন্যায় বা নীতিগর্হিত হয়। সম্ভাবনা-ভিত্তিক যুক্তিতে এমন কিছু নেই যা আমাদের জন্মদান বা প্রজনন-প্রক্রিয়াকে একেবারে গ্যামেটের স্তরে পিছিয়ে আসা থেকে নিরস্ত করতে পারে।

এতৎসত্ত্বেও কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে গ্যামেট পর্যন্ত না গিয়ে আমরা ভ্রূণের স্তরেই থামতে পারি। তাদের যুক্তি, ভ্রূণের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা গ্যামেটের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনার তুলনায় অনেক বেশী জোরালো। কিন্তু এই সম্ভাবনা আত্ম-পরিচয় রক্ষাকারী -এই দাবী সমর্থন করা যথেষ্ট কঠিন। কারণ সময়কালের মধ্যে একই ভ্রূণের আত্মপরিচয় নিষিক্ত ডিম্বাণুর প্রথম কোষ-বিভাজনের আগে থেকে থাকতে পারে না, এবং এই একই যুক্তিতে যত দিন পর্যন্ত না মনোজাইগোটিক যমজের সম্ভাবনা নিঃশেষিত হচ্ছে তার আগে থেকে শুরু হতে পারে না। মনোজাইগোটিক যমজ তখনই ঘটে যখন একটি জাইগোট নিষেকের ১৪ দিনের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে সংখ্যাগতভাবে স্বতন্ত্র দুটি জাইগোটে বিশ্লিষ্ট হয়। এ রকম হলে মূল জাইগোটটি এই সময়কালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্পষ্টতই এরকম ক্ষেত্রে মূল জাইগোটটি আত্ম-পরিচয় রক্ষাকারী হতে পারে না। আবার ভ্রূণের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে উপাদানগত পার্থক্য আছে তার কথা মাথায় রাখলে ১৪ দিনের পরে ভ্রূণের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আত্ম-পরিচয়-রক্ষাকারী হয় না। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই নিঃসৃত হয় যে ভ্রূণের বিকাশের কোন পর্যায়ই তার নৈতিক মর্যাদাকে নিশ্চিত করতে পারে না।

IVF-ভ্রূণের ক্ষেত্রে 'সম্ভাবনা'-র অর্থ আলাদা, এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক সমস্যাজনিত স্বতন্ত্র ধরনের। গবেষণাগারের পাত্রে শুক্রাণুর সাহায্যে ডিম্বাণুর নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়ায় জিনগত উপাদান স্থানান্তরের ফলশ্রুতিতে জিনগত বিভাজন বা অন্য ধরণের জীবতাত্ত্বিক অস্বাভাবিকতার ঘটনা ঘটতে পারে। অথবা ভ্রূণের ক্রায়োজেনিক সংরক্ষণকালের মধ্যেই কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই এইসব অস্বাভাবিকতা তাদের থেকে বিকশিত হওয়া ব্যক্তির মধ্যে রোগ বা বিকলাঙ্গতার সূচনা করতে পারে। একই রকমভাবে এর থেকে একাধিক মানব-শিশুর জন্মও হতে পারে। অধিকন্তু, এগুলি পূর্ণ সময়ের আগেই জন্মায় বলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার ঝুঁকিও থেকে যেতে পারে। এইসব দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় IVF-ভ্রূণের মধ্যে ব্যক্তির ক্ষতি করার সম্ভাবনা থাকে। এখানে বিষয়টি এরকম নয় যে IVF ভ্রূণের জিনগত কোষ-বিভাজনের মধ্য দিয়ে না যাওয়ার স্বার্থ আছে। বরং বিষয়টি হল, কোনো ভ্রূণ যখনই সৃষ্টি হয় তখনই তার থেকে যেসব ব্যক্তির জন্ম হবে তাদের স্বার্থ আছে রোগ-ব্যাধি বা অঙ্গহানির মধ্যে না পড়া। এই অর্থে কোনো ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা নির্ভর করে বাহ্যিক শর্তের ওপর। গবেষণাগারের কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়ায় অথবা তরল নাইট্রোজেন পাত্রের মধ্যে ভ্রূণের ক্ষতি ঘটে যেতে পারে এবং তা ভবিষ্যৎ ব্যক্তি-মানুষের সাংঘাতিক ধরনের ক্ষতি সাধন করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জীবনের অধিকারের স্বস্থিত অর্থে নয়, একটি ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা নির্ভর করে ভ্রূণ-অবস্থায় ঘটে যাওয়া কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অধিকারের বাহ্যিক অর্থে।

বাইরের থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত বা হস্তক্ষেপ করা IVF- এর এই জন্মদানপ্রক্রিয়া অনেক বন্ধ্যা নারী তথা যুগলকে সন্তান পেতে সাহায্য করেছে। তবে IVF ভ্রূণকে গবেষণাগারের পাত্র থেকে জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছু ঝুঁকি থাকে। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট ব্যয়বহুলও। সত্যি কথা বলতে কি, এই প্রক্রিয়া যে খরচ তা বেশিরভাগ স্ত্রী বা যুগলের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তবে যাদের সামর্থ্য আছে তারাই এই সাহায্য নিয়ে থাকে। যাই হোক, ভ্রূণের মনুষ্য-সত্তা হিসাবে বিকশিত হওয়ার সম্ভাবনা এমন কোনো নৈতিক মর্যাদা সরবরাহ করে না যা জীবনের অধিকারকে নিশ্চিত করতে পারে। যদি এই ধরনের কোনো অধিকার না থাকে তাহলে ভ্রূণটি শেষ পর্যন্ত বিকশিত হওয়াকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে না। কিন্তু এর থেকে কি এটা নিঃসৃত হয় যে ভ্রূণের প্রকৃতই কোনো নৈতিক মর্যাদা নেই? এবং আমরা এগুলিকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি? স্পেয়ার এমব্রায়ো (spare embryo) যেগুলি গর্ভধারণের জন্য জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করা হয় না, সেগুলিকে শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট করে ফেলা হয়। এই ঘটনাই নির্দেশ করে যে এদের প্রতি আমাদের কোনো নৈতিক দায় নেই। এতৎসত্ত্বেও তাদের নৈতিক মর্যাদা যদি নাও থাকে, তথাপি ভ্রূণের নৈতিক মূল্য (moral value) আছে। তারা যার প্রতিনিধিত্ব করে তার মূল্যকে সাংকেতিকভাবে তুলে ধরে। এই মূল্য এগুলিকে নিয়ে আমরা কি করব, আর কি করব না - তা ঠিক করে দিতে পারে। আমরা চিকিৎসার প্রয়োজনের যেসব IVF ভ্রূণগুলি রয়েছে তাদের উপর গবেষণা চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু গবেষণার জন্য নতুন করে ভ্রূণ সৃষ্টি করা নিষিদ্ধ হতে পারে। তবে একথা সত্যি যে ভ্রূণের নৈতিক মূল্য ভ্রূণের কোনো স্বগত বৈশিষ্ট্য (intrinsic property) নয়, বরং একটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য যা এর জিনগত পিতা-মাতার জন্মদান সংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারের মধ্যে পড়ে। জন্মদান সংক্রান্ত এই স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ হিসাবে সংশ্লিষ্ট পিতা-মাতারা ভ্রূণগুলিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ব্যবহার করতে দিতে অনুমতি দিতে পারে। যখন ভ্রূণের জিনগত পিতা-মাতার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন জন্মদানের জন্য ঐ ভ্রূণ ব্যবহার না করার অধিকার সেগুলিকে ব্যবহার করার

অধিকারকে ছাপিয়ে যায়।

১৯৯২ খ্রীঃ 'ডেভিস বনাম ডেভিস' কেসে টেনেসির সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ম্যারি সিউ এবং জুনিয়ার নিউইস্ ডেভিস সাতটি IVF ভ্রূণ তৈরী করে পরস্পর বিবাহ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ভ্রূণগুলি তখন গবেষণাগারে নির্দিষ্ট ক্রায়োজেনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। ম্যারি সিউ এই হিমাহিত ভ্রূণের অধিকার দাবী করে এই উদ্দেশ্যে যে সেগুলি তার জরায়ূতে প্রতিস্থাপিত হবে বিবাহবিচ্ছিন্ন অবস্থাতেই মাতৃত্ব লাভের জন্য। জুনিয়ার লিউহস ডেভিস এতে আপত্তি জানান এবং এই দাবী করেন যে এই ভ্রূণগুলি যেমনভাবে সংরক্ষিত আছে সেভাবেই সংরক্ষিত থাকুক। বিবাহ-বন্ধনের বাইরে সে পিতা হতে চায় কি না -এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত এই স্থিতাবস্থা বজায় থাকুক। যে কোর্টে এই বিচার চলছিল সেই আদালত ম্যারি সিউকে ভ্রূণগুলির আইনি-রক্ষক হিসাবে মেনে নেয় এবং সেই ভ্রূণ ব্যবহার করে মা হওয়ার অনুমতি দেয়। কিন্তু 'কোর্ট অফ অ্যাপিল্স' এই সিদ্ধান্তকে পাল্টে দেয় এই যুক্তিতে যে যখন বাস্তবিক কোনো গর্ভধারণের ঘটনা ঘটেনি, তখন জুনিয়ার ডেভিসের সংবিধান-সম্মত অধিকার আছে সন্তান না চাওয়ার। জন্মদানসংক্রান্ত স্বাতন্ত্র্য দুটি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের কথা বলে : জন্ম দেওয়ার অধিকার এবং জন্মদান এড়িয়ে চলার অধিকার। যখন এই অধিকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখন জন্মদান এড়িয়ে চলার অধিকার জন্মদানের অধিকারকে অভিভূত করে। এতে জুনিয়ার ডেভিসের সন্তান না চাওয়ার অধিকার তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীর জন্মদানের সদর্থক অধিকারের তুলনায় অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

পরিশেষে, যেহেতু প্রত্যেক জিনগত পিতা কোনো ভ্রূণের জন্য কারণ হিসাবে দায়ী, তাই প্রত্যেকের অধিকার আছে কোনো একটা ভ্রূণকে কিভাবে ব্যবহার করা হবে তা স্থির করার। যদি ভ্রূণগুলিকে গবেষণার জন্য ব্যবহার করার প্রসঙ্গ ওঠে তখন জিনগত পিতামাতার সম্মতি অবশ্যই প্রয়োজন হবে। আবার সেগুলিকে বহুদিন ধরে সংরক্ষণ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেগুলিকে বিনষ্ট করে দেওয়া উচিত। পিতা-মাতার প্রজননগত অধিকার থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যৎ মানুষ, যারা এইসব ভ্রূণ থেকে বিকশিত হবে, তাদের ক্ষতি হতে পারে এই আশঙ্কায় সেগুলি নষ্ট করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

২.৪ বিকল্প মাতৃত্ব (Surrogate Pregnancy) :

প্রযুক্তির সাহায্যে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করা প্রজননের অন্য একটি প্রকার হল বিকল্প মাতৃত্ব। এই ধরনের মাতৃত্বে পরস্পর বিবাহ বন্ধনহীন কোনো পুরুষের শুক্রাণুর সাহায্যে কোনো স্ত্রীলোককে কৃত্রিমভাবে গর্ভবতী করা হয় এবং ঐ স্ত্রীলোকের সঙ্গে চুক্তি থাকে যে সে এর থেকে যে ভ্রূণের সঞ্চার হবে সেটিকে জন্মকাল অবধি গর্ভে ধারণ করবে। যখন শিশুর জন্ম হবে তখন চুক্তির শর্ত অনুসারে শিশুর প্রতি তার সব দাবী ত্যাগ করে যে দম্পতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ঐ শিশু সন্তান তাদের হাতে তুলে দেবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এই চুক্তি-মাতৃত্ব প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অন্য কোনো বিবেচনায় কেউ অর্থ না নিয়েও এইভাবে শিশুর জন্ম দিতে নিঃসন্তান দম্পতিকে সাহায্য করতে পারে। এখানে অবশ্য যে স্ত্রীলোক ডিম্বাণু দান করে সেই ব্যক্তিকে আমরা বলব জিনগত মাতা (genetic mother)। অন্য স্ত্রীলোক যে গর্ভধারণ করে তাকে আমরা বলব গর্ভধাত্রী মা (gestational mother। যখন বিকল্প মা-ই ডিম্বাণু দান করে যার থেকে ফিটাস তথা সন্তানের

জন্ম হয়, তখন ঐ বিকল্প মা একইসঙ্গে শিশুটির জিনগত মা এবং গর্ভধাত্রী মা।

যে দুটি প্রধান কারণে কোনো এক স্ত্রীলোক বা কোনো দম্পতি বিকল্প মাতার খোঁজ করে বন্ধ্যাত্ব (infertility) এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মাতৃত্ব (high risk pregnancy) তাদের অন্যতম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনো স্ত্রীলোক স্বাভাবিক উপায়ে সন্তান ধারণ করতে সমর্থ, কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা এমনই যে তার গর্ভধারণের গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি আছে, যা তার জীবনকে বিপন্ন করতে পারে। এরকম অবস্থায় IVF পদ্ধতিতেও ঐ স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ সম্ভব নয়। অনেক সময় এমন আশঙ্কা থাকে যে গবেষণাগারে টেস্ট-টিউবে নিষিক্ত কোনো ভ্রূণকে কোন স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রতিস্থাপন করলে ঐ স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যের বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। Baby M - এর ক্ষেত্রে এলিজাবেথ স্টার্ণের মাল্‌টিপেল্ স্কেলোরোসিস (multiple sclerosis) -এর সমস্যা ছিল। তাই স্টার্ণ-দম্পতি বিকল্প মাতৃত্বের জন্য অর্থের বিনিময়ে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেড (Mary Beth Whitehead) এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

বিকল্প গর্ভধারণকে কেন্দ্র করে তিন ধরনের মূল নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় : ১) বিকল্প মা কি শিশুর আইনি মা এবং সে কি সন্তানের তত্ত্বাবধানের আইনি অধিকার (custody) পেতে পারে? ২) বিকল্প মাতৃত্ব কি শেষ পর্যন্ত শিশুর পণ্যায়নকে উৎসাহিত করে? ৩) বিকল্প মাতৃত্ব কি নারীকে শোষণ করে? বিকল্প মাতৃত্ব সম্পর্কে এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে আমাদের জিনগত মা (genetic mother) এবং গর্ভধাত্রী মা (gestational mother) এবং সামাজিক মা (social mother) -এদের মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। জেনেটিক মা এবং সামাজিক মায়ের মধ্যেও পার্থক্য করা দরকার। আবার জিনগত মাতা এবং গর্ভধাত্রী মায়ের মধ্যেকার পার্থক্য শিশুর যথার্থ মা -কে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। প্রশ্নটি তখনই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা তার পূর্বের সিদ্ধান্ত বদল করে এবং স্থির করে যে সে চুক্তিমতো শিশুটিকে ত্যাগ করবে না। Baby M - এর ক্ষেত্রে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেড একই সঙ্গে জিনগত মা এবং গর্ভধাত্রী মা ছিলেন। তাই এটা মনে হতে পারে যে সেই শিশুটির উপর তার দাবি উইলিয়াম স্টার্ণ (যে কেবল জিনগতভাবে শিশুটির সঙ্গে সম্পর্কিত) এবং এলিজাবেথ স্টার্ণ (যে শিশুটির সঙ্গে জিনগতভাবে বা গর্ভধাত্রী হিসাবে কোনোভাবেই যুক্ত নয়) - এর দাবী থেকে বেশি জোরালো। তবে জিনগত মা বা গর্ভদাত্রী মায়ের তুলনায় সামাজিক মায়ের দায়-দায়িত্ব অনেক বেশি, কেননা জন্মের পরমুহূর্ত থেকেই ঐ শিশুর ভাল-মন্দের জন্য সামাজিক মা-ই দায়ী থাকে। যদিও যখন চুক্তি যথার্থ পরিণতি লাভ করে তখন এটা সামনে আসে না, তথাপি গর্ভাবস্থার কোনো একটি পর্যায়ে বিকল্প মা এই অভিপ্রায় জানাতে পারে যে সে শিশুটির সামাজিক মা হিসাবেও স্বীকৃতি চায়। যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে সন্তানের আইনি দায়িত্ব পাওয়া এবং শিশুটিকে বড় করে তোলার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর তুলনায় বিকল্প মায়ের দাবি অনেক বেশী গুরুত্ব পায়।

Baby M - এর ক্ষেত্রে ১০,০০০ পাউণ্ডের চুক্তি হয়েছিল স্টার্ণ-দম্পতির সঙ্গে ম্যারি বেথ হোয়াইটহেডের। জন্মের পরে সে শিশুটিকে স্টার্ণ-দম্পতির হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করে এবং দাবী করে যে সে শিশুটির স্বাভাবিক মা। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে শ্রীমতী হোয়াইটহেড তাঁর চুক্তিভঙ্গ করছেন। চুক্তি অনুসারে শিশুটিকে স্টার্ণদের হাতে তুলে দিতে তিনি দায়বদ্ধ। বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তির আইনগত স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও জিনগতভাবে গর্ভধাত্রী হিসাবে এবং শিশুটির সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকতে চাওয়ার অভিপ্রায় হোয়াইটহেড

যথার্থ মা হিসাবে প্রতিপন্ন করতে যথেষ্ট। যদিও নিউ জার্সির সুপ্রিম কোর্ট স্টার্ণ-দম্পতিকে শিশুর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়, তথাপি রাজ্যের স্টেট সুপ্রীম কোর্ট এই রায়কে বদলে দেয়।

নিম্ন আদালত জানিয়েছিল যে বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তির মধ্যে হোয়াইটহেড শিশুটির প্রকৃত (আইনি) মা হওয়ার দাবী ছিল না। এখানে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, শ্রীমতি হোয়াইটহেড চুক্তিতে যে অর্থের প্রতিশ্রুতি আছে তা নিতে অস্বীকার করেন। যদি শ্রীমতী হোয়াইটহেড চুক্তি অনুসারে অর্থ গ্রহণ করতেন এবং কার্যকরীভাবে চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা হিসাবে কার্য-সমাধা করতেন তাহলে শিশুটির মা হওয়ার দাবি তিনি করতে পারতেন না। যদিও স্টেট সুপ্রিম কোর্ট ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিকল্প মাতৃত্বকে শিশু-বিক্রির সমতুল এবং তাই নীতি-গর্হিত বিবেচনা করে, তথাপি তা শ্রীমতি হোয়াইটহেডের দাবীকে সম্যক্ প্রতিপন্ন করতে পারে না। তবে তাঁর শিশুটির স্বাভাবিক মা হওয়ার দাবী জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক শর্তের দ্বারা সমর্থিত হয়।

কেউ জোরের সাথে বলতে পারেন, চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মাতৃত্ব শেষমেশ শিশু-বিক্রির নামান্তর। আলোচ্য ক্ষেত্রে স্টার্ণ দম্পতি এবং শ্রীমতি হোয়াইটহেডের মধ্যে কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই। যদি ফিটাসটি অস্বাভাবিক হতো তাহলে স্টার্ণ দম্পতি স্যারোগ্যাসি কনট্রাক্ট থেকে হয়তো সরে যেতেন এবং ভ্রূণটি নষ্ট করে ফেলতে বলতেন। তথাপি এর থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে শ্রীমতি হোয়াইটহেড নিছক শিশু-বিক্রি করছেন। বরং কেউ বলতে পারেন, অন্যেরা যাতে শিশু-সন্তান লাভ করতে পারে, তিনি তার জন্য জীবতাত্ত্বিক পরিষেবা দিচ্ছেন। সারোগ্যাসি চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে বিকল্প মা শিশুটিকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার বিক্রি করছে না, অথবা শিশুটিকে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করছে না, যাকে সে খুশিমতো ব্যবহার করতে পারে। যখন বিকল্প মা চুক্তিতে উল্লেখিত অর্থমূল্য গ্রহণ করে চুক্তিবদ্ধ দম্পতিকে শিশুটি হস্তান্তর করে, তখন সে ঐ শিশুটির সঙ্গে তার গড়ে ওঠা মাতৃত্বের অধিকার হস্তান্তর করে। যদি চুক্তিকারী সামাজিক পিতা-মাতা শিশুটির স্বার্থে কাজ করে তাহলে ঐ শিশু নিছক সম্পত্তিরূপে ব্যবহৃত হবে না। শিশুর অপব্যবহার এবং অবহেলা সংক্রান্ত আইন-কানুন এটি নিশ্চিত করে থাকে। এইভাবে বুঝলে অর্থের বিনিময়ে বিকল্প মাতৃত্বের মধ্যে নীতি-গর্হিত কিছু নেই।

নীতির দিক থেকে যে বিষয়টি এখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল শিশুটির কল্যাণ; বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি এখানে মূল বিষয় নয়। আর শিশুর মঙ্গল বা কল্যাণ আইনগত ঘটনা বা জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার ওপরে নির্ভর করে না, জন্মের পরে তার সঙ্গে কে কিরূপ ব্যবহার করছে তার ওপরে নির্ভর করে। এই বিষয়টি জিনগত মা ও গর্ভধাত্রী মায়ের তুলনায় সামাজিক মায়ের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। জন্মের আগে গর্ভাবস্থায় জরায়ুর জীবতাত্ত্বিক পরিবেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি জন্মের পরে যে সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে শিশুটি বড় হয়ে উঠবে সেই পরিবেশও খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর কল্যাণের এই ব্যাপারটি বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি বা তদ্রুপ কিছুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাই বিকল্প মাতৃত্ব শিশুর পণ্যায়ন এই যুক্তি প্রত্যয়-উৎপাদনকারী নয়।

এখন, আমাদের যে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে হবে তা হল বিকল্প মাতৃত্বের ব্যবস্থা নারীকে শোষণ করে কি না। কিছু কিছু নারীবাদী এই প্রশ্নটিকে আপত্তিকর মনে করেন, তাঁরা চুক্তিবদ্ধ গর্ভধারণকে প্রজননগত স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিবেচনা করে একে সমর্থন করেন। ভ্রূণ-নাশের অধিকারের বিস্তার হিসাবে বিকল্প মাতৃত্ব নারীর দেহের ওপর কর্তৃত্বের আর একটি দৃষ্টান্তস্থল। অপরাপর নারীবাদী অবশ্য যুক্তি দেন যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে

এই ধরনের ব্যবস্থা শোষণের কারণ হতে পারে। হতদরিদ্র কোনো স্ত্রীলোক যখন বিকল্প মাতৃত্বের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন সেটি তার প্রকৃত পছন্দ নয়, আর্থিক বাধ্যবাধকতাই তাকে এরূপ চুক্তির মধ্যে নিয়ে আসে। অধিকন্তু, নারীবাদীদের অনেকেই মনে করেন, বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি নারীকে জন্মদানের নিছক পাত্র (reproductive vessel) হিসাবে প্রতিপন্ন করে। এইসব যুক্তিতে বিকল্প মাতৃত্বের চুক্তি ব্যবস্থাকে বন্ধ করা উচিত বলে দাবী করা হয়। কিন্তু ওয়াল্টার গ্লানন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বিকল্প মাতৃত্বের নারীকে শোষণ করে, তার অবমূল্যায়ন ঘটায় - এই দাবীর পিছনে যেসব যুক্তি হাজির করা হয় সেগুলি প্রত্যয়-উৎপাদনকারী নয়। যেসব মহিলারা এ পর্যন্ত বিকল্প মা হিসাবে কাজ করছেন, তাদের বড় অংশ আর্থিক বাধ্যবাধকতা থেকে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এরকম নয়। আমাদের দৃষ্টান্তে শ্রীমতী হোয়াইটহেড তাঁর শিশু-পুত্রের শিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, যা মূল্যবান, কিন্তু আবশ্যিক নয়। এর বিপক্ষে কেউ তর্ক করতে পারেন, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল নয় তাদের কাছে বিকল্প মাতৃত্বের ব্যবস্থা শোষণের নামান্তর। তাদের আর্থিক অবস্থা এমনই যে তাদের পক্ষে যে অর্থের প্রস্তাব আসে তাকে অস্বীকার করার কোনো বিকল্প থাকে না। এসব ক্ষেত্রে জোর জুলুম করা বা চুক্তিভঙ্গের ঘটনা ঘটলে তারা অসহায়। কিন্তু অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ বিকল্প মা-ই জোরের সাথে জানিয়েছেন যে তাদের সিদ্ধান্ত সব জেনেশুনে নেওয়া, তাদের পছন্দ স্বাধীন। তাই এরকম বলা অপমানকর যে তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভিন্ন শর্তের দ্বারা তারা অন্যায়ভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

পরিশেষে, সম্ভাব্য শোষণের আশঙ্কায় যদি বিকল্প মাতৃত্বকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে ডিম্বাণুদান (egg donation) -এর মতো প্রজননগত পছন্দও নিয়ন্ত্রিত হবে, যার ফলে বিগত ৩০-৩৫ বছর ধরে নারীর প্রজননগত স্বাতন্ত্র্যের যেসব সুফল পাওয়া গেছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা দেখানো যাচ্ছে যে বিকল্প মাতৃত্বের কোনো চুক্তি স্বেচ্ছায় ঘটে নি, ততক্ষণ পর্যন্ত এরকম ভাবার পিছনে কোনো সুযুক্তি নেই যে বিকল্প মাতৃত্ব নারীকে শোষণ করে। বিপরীতে, আমরা বরং নারীর দেহের স্বাতন্ত্র্যের এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রকাশ হিসাবে বিকল্প মাতৃত্বকে দেখতে পারি।

২.৫ ভ্রূণের লিঙ্গ-নির্বাচন (Sex selection) :

চিকিৎসা-প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে বেশ কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে যার মাধ্যমে ভ্রূণ বা ফিটাসের লিঙ্গ জানা যায়। স্পার্ম সর্টিং (sperm sorting), অ্যামনিওসেন্‌টোসিস্, প্রি-ইম্‌প্লানটেশন জেনেটিক ডায়াগ্‌নেসিস (PIGD) এবং আলট্রা-সাউন্ড ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কোনো ভ্রূণ বা ফিটাস ভবিষ্যতে ছেলে হবে, না মেয়ে হবে। ভবিষ্যতে একটি শিশু ছেলে হবে, না মেয়ে হবে তা জানা এক জিনিস, আর এই জ্ঞানের ভিত্তিতে একটি ভ্রূণ বা ফিটাসকে বিনষ্ট করে দেওয়া আর এক জিনিস। অনেকেই ইঙ্গিত করেছেন যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কন্যা-ফিটাসের তুলনায় বেশি পুত্র-ফিটাস নির্বাচন করা হয়, যা নারীর প্রতি বৈষম্যকে উৎসাহিত করে। শিশুর লিঙ্গ-নির্বাচন এক বিষম লিঙ্গ-অনুপাতের সূচনা করে, যা বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, জন-বিন্যাসগত সমস্যা তৈরী করে।

সম্ভবতঃ সব থেকে উদ্বেগজনক লিঙ্গ-নির্বাচনের ঘটনা ঘটে চিনে। চিনের এত বেশী দম্পতি কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট

করে এবং এতবেশি পুরুষ-ভ্রূণকে বাড়তে দেয় যে সেখানে নারী-পুরুষের মাত্রা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে। চিনের যে পরিবার পরিকল্পনা নিয়ম-নীতি আছে তদনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় কোনো দম্পতি দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের অনুমতি পায়, যদি তাদের প্রথম সন্তান কন্যা হয়। কিন্তু দুয়ের বেশী সন্তান সেখানে বৈধ নয়। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে যেখানে দম্পতির প্রথম সন্তান কন্যা সেখানে ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে যেখানে প্রি-নাটাল আলট্রাসাউণ্ডের সাহায্যে জানা গেছে পরের সন্তানটি কন্যা হতে চলেছে, সেখানে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটেছে। শিশুর লিঙ্গ-নির্বাচন তখনই নৈতিক দিক থেকে অস্বস্তিকর যখন অবাঞ্ছিত কন্যা-সন্তানকে বর্জন করা হয়। কন্যার তুলনায় পুরুষ-সন্তান বেশী মূল্যবান -এই ভাবনার কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে চিকিৎসাগত কারণে লিঙ্গ-নির্ধারণ নীতিগতভাবে অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে। ডুচেন মাসকুলার ডিসট্রোফি (Duchenne Muscular Dystrophy) এবং হেমোফিলিয়া-এই দুটি জিনগত রোগ সব পুরুষ-শিশুদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই দুই রোগের কারণ হিসাবে X -ক্রোমোজোমের এক বিশেষ পরিবর্তন দায়ী করা হয়ে থাকে। একজন স্ত্রীলোক এই দুই ধরনের পরিবর্তনের কোনো একটি বহন করে। তিনি কোষের এই পরিবর্তন বংশ-পরম্পরায় অর্ধেক পুরুষের মধ্যে এটি সংক্রামিত হয়। এই ধরনের রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, এবং এই ধরনের সমস্যা যেসব মানুষজনের রয়েছে তাদের অত্যন্ত সাবধানতা ও নিয়ম মেনে বেঁচে থাকতে হয়। এখন, যদি অ্যামনিওসেন্টেসিস বা PIGD এর মাধ্যমে জানা যায় যে একটি পুরুষ ভ্রূণ বা ফিটাসের মধ্যে এই ধরনের রোগসৃষ্টিকারী জিনগত পরিবর্তনের ব্যাপার আছে তাহলে সেই পিতা-মাতাকে ঐ পুরুষ-ভ্রূণ বা ফিটাসটিকে গর্ভপাতের মাধ্যমে নষ্ট করে দিতে অনুমতি দেওয়া হয়। এখানে যে যুক্তিটি কাজ করছে তা হল যদি এই ভ্রূণ থেকে শিশু-পুত্রের জন্ম হয় তাকে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে আটকানো। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দম্পতিকে শুধু কন্যা-ভ্রূণ এবং কথিত কোষ-পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেনি এমন পুরুষ-ভ্রূণ নির্বাচন করতে দেওয়া হয়।

পরিবারের ভারসাম্য রক্ষার জন্য লিঙ্গ-নির্ধারণ করাকেও যুক্তিযুক্ত প্রতিপন্ন করা খুবই কঠিন। যে দম্পতির একটি পুরুষ-সন্তান আছে সে একটি কন্যা-সন্তান পাওয়ার জন্য অনেক সময় পুরুষ ভ্রূণ বা ফিটাসকে নষ্ট করতে উদ্যত হয়। বিপরীতভাবে যে দম্পতির একটি কন্যা-সন্তান আছে সে একটি পুরুষ সন্তান পাওয়ার আশায় কন্যা-ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে। একটি মেয়েকে বড় করে তোলার অভিজ্ঞতা এবং ছেলেকে বড় করে তোলার অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা হতে পারে। আবার একসঙ্গে ছেলে মেয়ে উভয়কেই বড় করে তোলা আরো এক সুখকর অভিজ্ঞতা হতে পারে। যেহেতু বাবা-মা বিভিন্ন কারণে সন্তান চায়, সেহেতু পরিবারের ভারসাম্য রাখার অভিপ্রায়ে লিঙ্গ-নির্বাচন করা নীতিগতভাবে আপত্তিকর বলা অবশ্য এক ধরনের খামখেয়ালিপনা বলে মনে হয়। প্রশ্ন হল এই ধরনের আচরণকে নীতিগর্হিত বলার পিছনে সিদ্ধান্তকারী যুক্তি আছে কি? অন্য দিকে, পরিবারগুলি এক একটি স্বতন্ত্র একক ধরে নেওয়া হয় তাহলে সেখানে পিতা-মাতার অধিকার কাছে পরিবারের গঠন কেমন হবে তা ঠিক করা। এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল শিশু জন্মালে তার মঙ্গলের কথা ভাবতে আমরা নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ, এবং এটি নির্ভর করে সন্তান ছেলে বা মেয়ে তার উপর নয়, বরং আমরা কিভাবে তাদেরকে মানুষ করছি তার উপর। কিছু পিতা-মাতা লিঙ্গ নির্বাচনে আগ্রহ দেখান যেহেতু তারা বিশ্বাস করে যে এক লিঙ্গের শিশু অন্য লিঙ্গের শিশুর তুলনায় জীবৎকালে বেশি সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করবে। পরিবার যদি

স্বতন্ত্র একক হয় এবং পিতা-মাতা বিশ্বাস করে যে এক বিশেষ লিঙ্গের শিশুর কল্যাণকে সুনিশ্চিত করবে, তা হলে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুরুষ সন্তান নির্বাচন করার মধ্যে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে, লিঙ্গ-নির্ধারণকে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে পাওয়ার জন্য ব্যবহার করেন। কেউ পছন্দ করেন, দুটি পুত্র হোক্। পরিবার-ভারসাম্যে যে সাধারণ ইচ্ছা আমরা পাশ্চাত্যে লক্ষ করি তার মধ্যে নারী-পুরুষের অনুপাতে খুব বেশি হেরফের ঘটে না, কিন্তু অনেক দেশে এটি বড় ধরনের জন-বিন্যাসগত সমস্যার সৃষ্টি করে।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে কন্যা সন্তানের তুলনায় পুরুষ সন্তান চাওয়ার বিরুদ্ধে সব থেকে জোরালো অভিযোগ এই যে এটি নারীর প্রতি বৈষম্য এবং অবদমনকে উৎসাহিত করে। কিন্তু যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয় যে, লিঙ্গ -নির্বাচনের সঙ্গে নারীর অবদমনের একটি সম্পর্ক আছে, তথাপি লিঙ্গ-নির্বাচনকে নারীর অবদমনের কারণ বলা যায় না। সম্পর্কিত হওয়া আর কারণ হওয়া এক জিনিস নয়। আরও অনেক শর্ত বা বাস্তব অবস্থা থাকে যা নারীর অবদমনকে ব্যাখ্যা করে। লিঙ্গ-নির্বাচন নিজে নিজে এই অবদমনকে ঘটাতে পারে না। যাই হোক, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবারের ভারসাম্যের অছিলায় দুই লিঙ্গের মধ্যে যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে তা একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বেশি বেশি করে পুরুষ সন্তানের নির্বাচন এবং নারীর ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া - এই দুয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে লিঙ্গ-নির্বাচনের উপর নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ রাখার নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে।

২.৬ ক্লোনিং (Cloning) :

নতুন প্রজনন প্রযুক্তির মধ্যে নৈতিক দিক থেকে সব থেকে বেশী বিতর্কিত বিষয় হল ক্লোনিং। এটা এই কারণে যে কিছু সংরক্ষণপন্থী চিন্তাবিদ তথা কর্মসূচি-প্রণেতা ক্লোনিংকে ভ্রূণনাশের নৈতিকতা ও রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে বিচার করেন। জন্মদান-সংক্রান্ত ক্লোনিং-এর নৈতিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক সংঘটিত হয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে বিতর্কগুলি চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিং-এর উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রথমে আমরা চিকিৎসাসংক্রান্ত ক্লোনিং-এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিবেচনা করব এবং তারপর জন্মদান-সংক্রান্ত ক্লোনিং-এর নিষিদ্ধকরণের পক্ষে যুক্তিগুলি বিচার করব। চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিংকে অনুমোদন দেওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে বেশীরভাগ মানুষ মনে করেন, জন্মদান-সংক্রান্ত ক্লোনিং নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

ক্লোনিং প্রযুক্তিতে এক পূর্ণবয়স্ক মানুষের সোমাটিক সেল বা দেহকোষের নিউক্লিয়াস মানুষের ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করানো হয়, যে ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসটি বহিষ্কার করা হয়েছে। তাই এই প্রক্রিয়াকে 'সোমাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার' বলা হয়ে থাকে। এই নিউক্লিয়ার ট্রান্সফারের মধ্য দিয়ে পূর্ণবয়স্ক সোমাটিক সেলের নিউক্লিয়াসে ডিম্বাণুটি জিনগতভাবে নতুন ব্যবস্থা তথা কার্যক্রম (reprogramme) সূচনা করে, যা নিউক্লিয়াসটিকে টোটিপোটেন্ট স্তরে উন্নীত করে। এর অর্থ সৃষ্ট কোষটি বিভিন্ন সেল-টাইপে বিকশিত হতে পারে এবং একই সঙ্গে একটি ভ্রূণ তৈরী করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে হার্ট, কিডনি, অথবা চামড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোষ তৈরী হতে পারে। ডিম্বাণুটি যখন পাঁচ দিন বয়সী হয় এবং তা ব্লাস্টোসিস্ট দশায় পৌঁছায়, তখন সেই ভ্রূণ থেকে স্টেমসেল সংগ্রহ করা যায়। বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে এই কোষগুলিকে বড় করে তোলা হয় এবং তা ভ্রূণগত

স্টেমসেল লাইনে সম্প্রসারিত হয়। কোরিয়ার গবেষকরা ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা একটি মানব ভ্রূণ-এর হুবহু নকল, অর্থাৎ ক্লোন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার থেকে স্টেমসেল লাইন সংগ্রহ করেছেন। টোটিপোটেন্সের অতিরিক্ত ভ্রূণগত স্টেমসেলের আরো একটি সামর্থ্য থাকে এবং তা হল এগুলি আবার নতুন কোষগুচ্ছ বা কোষক লার জন্ম দিতে পারে। এই ধরনের ক্লোনিংকে চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিং বলা হয়। কেননা এর মাধ্যমে পার্কিনসন্স, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত অঙ্গকে পুনঃস্থাপন করা বা কোন টিস্যুকে নতুন জীবন দান করা যায়। এই এমব্রায়োনিক স্টেমসেল এই ধরনের রোগের নিরাময় করতে পারে, অন্ততঃপক্ষে এই উপমাগুলি দেখাতে পারে, যা অনেক মানুষের জীবনের গুণগত মান ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই থেরাপেটিক ক্লোনিং-এর বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তি জানান তাঁদের যুক্তি হল কেবল চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার জন্য এই ধরনের ভ্রূণ তৈরী করা নীতিগর্হিত, খারাপ কাজ। তাঁদের অভিযোগের মূল জায়গাটি হল, ক্লোন ভ্রূণ থেকে স্টেমসেল সংগ্রহ করে পরই সংশ্লিষ্ট ভ্রূণটিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। আর এরকমভাবে সম্ভাব্য একটি মানব-জীবনকে বিনষ্ট করা কখনোই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। ভ্রূণের মানবসত্তা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা যদি এটিকে জীবনের অধিকার দেয় বলে স্বীকার করা হয় তাহলে চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিং এই অধিকারকে লঙঘন করে, এবং তাই এই প্রযুক্তি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। অন্য একটি আপত্তি হল, গবেষণার জন্য ভ্রূণ তৈরী করা মানব জীবনের অলঙঘনীয়তা (sanctity of human life), যা নিষেকের পর থেকে শুরু হয়, তাকে লঙঘন করে। অনেকে অবশ্য এই নৈতিক বিষয়গুলিকে পাশ কাটানোর জন্য পূর্ণ বয়স্ক স্টেমসেলের উপর গবেষণাকে উৎসাহিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এই স্টেমসেলগুলি ভ্রূণ থেকে সংগৃহীত নয়। যদিও কোন কোন ধরনের অ্যাডাল্ট স্টেমসেল নমনীয় (প্লাসটিক), যা অনেক ভিন্ন ভিন্ন সেল-টাইপের জন্ম দিতে পারে। তথাপি, এমব্রায়োনিক স্টেমসেল যে বিভিন্ন ধরনের সেল-টাইপের জন্ম দিতে সক্ষম, এই সেল সেইভাবে সক্ষম নয়। উপরন্তু, এমব্রায়োনিক স্টেমসেলগুলি অ্যাডাল্ট স্টেমসেলের তুলনায় অনেক বেশি সম্ভাবনাময় এবং নিরাপদ। ঘটনা যাই হোক, অনেক বৈজ্ঞানিক দাবি করেছেন যে প্রাপ্তবয়স্ক এবং এমব্রায়োনিক স্টেমসেলের উপর গবেষণা জরুরী এটা নির্ধারণ করার জন্য যে এমব্রায়োনিক স্টেমসেল বিভিন্ন দিক থেকেই অ্যাডাল্ট স্টেমসেলের থেকে উন্নত।

ধরা যাক, ভ্রূণের ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা জীবনের অধিকার দান করে। তাই যদি হয় তাহলে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ক্লোনিং বন্ধ করার পক্ষে এটি কি একটি যুক্তি হতে পারে? কেউ কেউ যুক্তি দেন যে চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় ক্লোনিং সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত। কেননা এই ধরনের ক্লোনিং ভ্রূণের বাস্তবিক ব্যক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে বাধা দেয়। এমন কি যেখানে এই ধরনের ক্লোনিং বাস্তব মানুষের নানা রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত করছে তখনও এই উদ্দেশ্যে ভ্রূণ সৃষ্টি করা অন্যায় বলেই তারা মনে করেন। তবে অন্যেরা যুক্তি দিয়েছেন যে ভ্রূণগুলি অসংহত কোষের একটি একটি গুচ্ছ ছাড়া কিছু নয়, যার স্বার্থ বা অধিকারের কথা বলা নিরর্থক। এখন, যদি ভ্রূণের স্বার্থ বা অধিকার না থাকে তাহলে তাদের ব্যক্তিতে বিকশিত হতে না দেওয়াতে তাদের প্রতি কোন অন্যায় বা ক্ষতিকারক হয় না। চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিং-এর বিরুদ্ধে যুক্তিটি এমন একটি চূড়ান্ত দাবির উপর ভিত্তিশীল যে ভ্রূণের জীবনের অধিকার বাস্তব মানুষের সম্ভাব্য উপকারকে ছাপিয়ে যায়। কিন্তু ভ্রূণগুলি তাদের সম্ভাবনা বাস্তবায়িত না হওয়াতে কষ্ট পায় না বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সেখানে বাস্তবে অস্তিত্বশীল রক্তমাংসের মানুষ বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি

থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কষ্টভোগ করে। এই সব রোগী চিকিৎসাসংক্রান্ত ক্লোনিং-এর গবেষণার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। এই গবেষণার জন্য ভ্রূণ তৈরী করলে কোন ভ্রূণের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না।

যুক্তির খাতিরে ধরে নেওয়া যাক যে ভ্রূণের জীবনের অলঙঘনীয়তা (sanctity of life) আছে। তখন ভ্রূণ তৈরী করা এবং গবেষণা এবং চিকিৎসার জন্য সেগুলি ব্যবহার করা নীতিগতভাবে মন্দ, কারণ এই পদ্ধতি জীবনের অলঙঘনীয়তার নীতি লঙঘন করে। এই যুক্তিতে কি থেরাপেটিক ক্লোনিং বন্ধ করা যায়? ভ্রূণের মতো বাস্তবে অস্তিত্বশীল মানুষজনেরও জীবনের পবিত্রতা বা অলঙঘনীয়তা আছে। এই দিক থেকে ভ্রূণ এবং বাস্তব মানুষের নৈতিক মর্যাদা একই। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হল ভ্রূণ দুঃখভোগ করে না বা কষ্ট পায় না, বাস্তব মানুষ দুঃখ পায়, কষ্ট ভোগ করে। জীবনের অলঙঘনীয়তা এবং কষ্ট ভোগ এই দুয়ের সংযুক্তি কেবল অলঙঘনীয়তার তুলনায় বেশি নৈতিক ভার বহন করে। যদি বাস্তব মানুষজনের দুঃখভোগ ভ্রূণ তৈরী করা বা তা নষ্ট করার তুলনায় নৈতিকভাবে আরো খারাপ হয়, তাহলে আমরা বর্তমান মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করার ব্যাপারে বেশি যত্ন নেব। ভ্রূণের প্রতি ক্ষতি করার ব্যাপারটি যদি অর্থপূর্ণ না হয় এবং চিকিৎসা-সংক্রান্ত ক্লোনিং আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সাহায্য করতে পারে তাহলে চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্লোনিং অনুমোদনযোগ্য হবে। এই যুক্তিটি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে বাস্তব মানুষের বাস্তব সমস্যা মেটাবার জন্য বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত, ভ্রূণের মতো সম্ভাব্য মানুষের নিছক ধরে নেওয়া প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার চেয়ে।

জন্মদান-সংক্রান্ত বা প্রজননগত ক্লোনিং-এর ক্ষেত্রেও থেরাপেটিক ক্লোনিং-এর মতোই সোমাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফারের পদ্ধতি অনুসৃত হয়। কিন্তু এই ধরনের ক্লোনিং-এ শুধু ভ্রূণ থেকে স্টেমসেল সংগ্রহ করাই লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য থাকে এই সব ভ্রূণ থেকে পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করা। থেরাপেটিক ক্লোনিং-এর নৈতিকতার তুলনায় জন্মদানসংক্রান্ত ক্লোনিং-এর নৈতিকতা বিষয়ে মতানৈক্য অনেক বেশি। জন্মদানসংক্রান্ত ক্লোনিং-এর বিরুদ্ধে অধিকাংশ মানুষ মনে করেন এই ধরনের ক্লোনিং অনেক কারণে নীতিগতভাবে আপত্তিকর। আমরা এখানে কয়েকটি কারণ সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করব।

জন্মদানসংক্রান্ত ক্লোনিং নিষিদ্ধ করার পক্ষে সব থেকে জোরালো যুক্তি হল, এর মাধ্যমে বিকশিত হওয়া ক্লোনড্ শিশুর বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে। এই ভাবনা আরোও বেশী দৃঢ় হয়েছে ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ডলি' নামে যে মেষটি ক্লোন করা হয় তার বাস্তব পরিণতি দেখে। ডলি কিছুদিনের মধ্যেই সাংঘাতিক আর্থারাইটিস এবং ফুসফুসের রোগে ভুগতে শুরু করে, যার জন্য তাকে ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্বস্তিমৃত্যু দেওয়া হয়। এখানে জেনেটিক মেটেরিয়্যাল ট্রান্সফারকে কেন্দ্র করে যে রিপ্রোগ্রামিং করা হয় তা ডিম্বাণুর মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে, যার পরিণতিতে অল্প সময়ের মধ্যে বার্ধক্যপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য রোগ হতে পারে। যদিও জিনের এই ধরনের পরিবর্তনের জীবতাত্ত্বিক কারণ সম্পূর্ণ জানা যায় না, তথাপি এই ধরনের জেনেটিক পরিবর্তন অযৌন-জননের তুলনায় যৌন-জননে অনেক কম ঘটে। অধিকন্তু, ডোনার-সেল নিউক্লিয়াসে DNA-এর মধ্যে আগে থেকেই পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে এবং তা ঘটতে পারে ডিম্বাণু স্থানান্তরিত হওয়ার আগেই। এর কারণেও তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাওয়া ও অন্যান্য রোগের প্রকোপের মাত্রা বাড়তে পারে। ক্লোনড্ ভ্রূণ বা ফিটাসের মধ্যে এত বেশী কোষ বিভাজন ঘটে যে অনেক সময় তা আপনি-আপনিই বিনষ্ট হয়ে যায়, অথবা সাংঘাতিক ধরনের বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দেয়। এইসব জীবতাত্ত্বিক কারণ প্রজননসংক্রান্ত ক্লোনিং বন্ধ

করার দাবীকে নৈতিকভাবে সমর্থন করে। ক্লোনড্ শিশুর শারীরিক সমস্যা হবার সম্ভাবনা এত বেশি থাকে যে এর কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। তবে আমরা যদি জিনগত জটিলতার এইসব ঘটনাগুলির সম্ভাবনা কমাতে পারি এবং ক্লোনড্ শিশুর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি ন্যূনতম করতে পারি তাহলে প্রজননগত ক্লোনিং নৈতিকভাবে সমর্থিত হতে পারে।

প্রজননগত ক্লোনিং-এর বিপক্ষে অন্যান্য যুক্তিগুলি এরকম —

ক) ইহা জিনগত রূপান্তরবাদ (genetic reductonism) তথা জিনগত নিয়ন্ত্রণবাদে (genetic determinism) পর্যবসিত হয়, এবং (খ) এতে আমাদের মর্যাদা ও মানবিকতার নীতি লঙিঘত হয়। ক্লোনড্ শিশু যে জিন জন্মসূত্রে পায় তা তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে যে বৈশিষ্ট্যগুলি শিশুর আত্ম-পরিচয় গঠন করে, কিন্তু কেবল জিন একজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিশ্বাস এবং আবেগ-অনুভূতির প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এই মানসিক অবস্থাগুলি অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ শিশুর সামাজিক এবং বাহ্যিক পরিবেশের উপর। জীববিজ্ঞানীদের অনেকে মনে করেন, এসব ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব অন্ততঃ ত্রিশ শতাংশ। অধিকন্তু, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে জেনেটিক পেনিট্রেনস (penetrance) -এর সম্ভাবনাও বিভিন্ন হয়। এমন কি, একই পরিবারের মধ্যে কোন একটি জিনগত বৈশিষ্ট্য তার পরবর্তী প্রজন্মে সবসময় অনুসৃত হয় না। অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বংশ-পরম্পরায় তা প্রছন্ন থাকে। একই রকমভাবে যে দাতার কাছ থেকে সেল সংগ্রহিত হয়েছে তার সব বৈশিষ্ট্য ক্লোনড্ শিশুর মধ্যে প্রকাশিত হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যে ব্যক্তির কোষ থেকে ক্লোনড্ শিশুর জন্ম হয়েছে তার সব জেনেটিক বৈশিষ্ট্য হুবহুভাবে ক্লোনড্ শিশুর মধ্যে বিকশিত হবে এমন নয়। অন্য দিকে, ক্লোন পদ্ধতি একজনের স্বাতন্ত্র্যকে সীমায়িত করে এই ধারণাও ঠিক নয়। বরং একজনের স্বাতন্ত্র্য তখনই সীমিত হয় যখন পিতামাতা শিশুর নিজের মতো করে বেড়ে ওঠাকে অস্বীকার করে এবং পরিবর্তে শিশুর জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে নিজেদের পরিকল্পনা এবং মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়। এই ধরনের ঘটনা অনেক পরিবারের মধ্যেই ঘটে। শুধুমাত্র ক্লোনড্ শিশুর ক্ষেত্রেই ইহা সীমাবদ্ধ নয়। এইসব বিষয় থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে জিনগত নিয়ন্ত্রণবাদ বা রূপান্তরবাদের অভিযোগ যথার্থ নয়।

ক্লোনিং-এর বিরুদ্ধে গুরুতর একটি অভিযোগ এই যে এই ব্যবস্থা মানবিকতা তথা মানবসভ্যতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবমূল্যায়ন ঘটায়। ক্লোনিং এক প্রকারের অযৌন জনন এবং তাই ইহা মানুষ হওয়া বলতে যা বোঝায় তাকে লঙঘন করে। তবে অ-যৌন জননে কিভাবে এই অবমূল্যায়ন ঘটে তা দেখানো কঠিন। যদি প্রজননের স্বাভাবিক উপায়ের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য ক্লোনিং নীতিগতভাবে আপত্তিকর হয় তাহলে IVF পদ্ধতি এবং কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার একই যুক্তিতে আপত্তিকর হবে। এই যুক্তিকে কিছুটা প্রসারিত করে কেউ বলতে পারেন, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য কৃত্রিম ইনসুলিন ব্যবহার করাও নীতিগতভাবে আপত্তিকর হবে। এখানে সেই অপ্রাকৃতিক পদ্ধতি যা মানবতাকে বিপন্ন করে এবং যা করে না তার মধ্যে সীমারেখাটা কোথায় টানা হবে তা স্পষ্ট নয়।

মানবিক মর্যাদা লঙঘন সংক্রান্ত ভাবনাও বিপথগামী মনে হয়। কেননা এই ভাবনা যে সব জীবতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জন্মলাভ করি তাদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেয়। আমরা স্বতন্ত্র ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং তাই আমরা মানুষ হিসাবে মর্যাদা বহন করি। এই বিষয়টি জীবতত্ত্ব নির্ভর নয়। এটা সত্য

যে আমাদের দেহ এবং মস্তিষ্ক আমাদের মানসিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু আমাদের মনোজগতের যে সব গুণগত বৈশিষ্ট্য আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠন করে জীববিজ্ঞান তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। ক্লোনিং-এর মতো অযৌন পদ্ধতিতে জাত বা স্বাভাবিক যৌন-পদ্ধতিতে জাত এই বিষয়টি একজন ব্যক্তির আত্মসম্মান বা ব্যক্তিত্ব গঠনের সঙ্গে খুব বেশী সম্পর্কিত নয়। তাই ক্লোনিং মানবতা তথা মর্যাদা লঙঘন করে — এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। প্রজননগত ক্লোনিং নিষিদ্ধ করার একমাত্র বাধ্যকারী যুক্তি হল, এই প্রক্রিয়ায় ক্লোনড্ ব্যক্তির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

২.৭ সিদ্ধান্ত :

এই পাঠ-এককে আমরা ভ্রূণনাশের অনুমোদনযোগ্যতা, বিকল্প গর্ভধারণ, লিঙ্গ-নির্বাচন এবং ক্লোনিং-এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি বিচার করেছি। এই যুক্তিগুলির মধ্যে কিছু কিছু যুক্তি মানুষের ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা সম্পর্কিত প্রশ্নের উপর দাঁড়িয়ে আছে। 'রো বনাম ওয়েড'-এর বিতর্কের সময়কাল থেকে ৩৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং প্রজনন প্রযুক্তিতে এর মধ্যে ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। তাই এই ধরনের বিতর্কগুলি নিজের দেহের নিয়ন্ত্রণের অধিকার বা ভ্রূণ তথা ফিটাসের জীবনের অধিকার আছে কিনা এইসবের মধ্যেই বিতর্ক থেমে নেই, ভবিষ্যতে এইসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে যে সব মানুষের জন্ম হবে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে কিনা বা তারা এর থেকে উপকৃত হবে, নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হবে - এইসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

২.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is abortion? Can it be defended on moral grounds? Discuss.
2. Define abortion. State and explain the conservative and the liberal views on this issue. Is it morally right to extend the argument for the permissibility of abortion to infanticide? Give a reasoned answer.
3. Distinguish between an embryo and a fetus. Determine the moral status of embryos.
4. What is surrogate motherhood? Distinguish in this connection between genetic mother, gestational mother and social mother. Whose claim to the child carries more moral weight?
5. What is surogate pregnancy? What are the main ethical questions regarding surrogate pregnancy? Discuss.
6. What is sex selection? When is a sex selection morally permissible? State the cases when it is not morelly defensible.
7. What is cloning? Distinguish between therapeutic cloning and reproductive cloning. On what grounds is therapeutic cloning admissible?

8. What is reproductive cloning? Is it morally defensible? Discuss.
9. Write short notes :

a) Sex selection and discrimination aganist women

b) Sanctity of human life

c) Marquis' arguments against abortion

d) Davis vs. Davis case regarding IVF

২.৯ গ্রন্থ নির্দেশ :

Recommended Text Book : Walter Glannon : Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2005 (Chapter-4) পাঠ্য

এছাড়া Helgn Kuhse and Peter Singer (eds) : Bioethics : An Anthology, Blackwell, 2006 (Article Nos. 2, 3, 4, 7, 8, 14 and 17) পাঠ্য।

পাঠ একক-৩

জিনতত্ত্ব ও নৈতিকতা

বিষয় সংকেত

৩.০ : উদ্দেশ্য

৩.১ : প্রাকক্থন

৩.২ : জিনগত পরীক্ষা ও ক্লোনিং

৩.৩ : প্রি-ইমপ্লান্টটেশন জেনেটিক ডায়াগ্নোসিস্

৩.৪ : জিন-থেরাপি

৩.৫ : জেনেটিক এনহ্যানসমেন্ট

৩.৬ : ইউজেনিকস্

৩.৭ : সারসংক্ষেপ

৩.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৯ : গ্রন্থনির্দেশ

জিনতত্ত্ব ও নৈতিকতা (Genetics and Morality)

৩.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ-এককে আমরা জিনতত্ত্বের সমকালীন উন্নতির সাথে সাথে যে সব নৈতিক প্রশ্নগুলি সামনে এসেছে সেগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। আমরা জিনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জিন থেরাপি, জেনেটিক এনহ্যান্স্মেন্ট, ইউজেনিক্স্ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নৈতিক প্রশ্নগুলির মীমাংসা করার চেষ্টা করব।

৩.১ প্রাক্কথন :

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রীক যখন DNA-র আণবিক গঠন আবিষ্কার করলেন

তখন থেকেই স্বাস্থ্য এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে জিনের অভূতপূর্ব সম্ভাবনার ইঙ্গিত মানুষকে অভিভূত করেছিল। মানুষের যাবতীয় জিনের ম্যাপিং এবং সিকোয়েন্সিং-এর উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট' গৃহীত হয়। এই প্রজেক্টের একটা অংশ ছিল জিনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণার নৈতিক, আইনগত ও সামাজিক অনুষঙ্গ ও তদ্‌গত প্রশ্নগুলি বিচার করা। এই সূত্র ধরেই প্রি-সিমটোম্যাটিক জেনেটিক টেস্টিং, জেনেটিক স্ক্রিনিং, ভ্রূণের প্রি-ইমপ্ল্যানটেশন জেনেটিক ডায়গ্‌নোসিস এবং জিন থেরাপির বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নৈতিক ইস্যুগুলি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। জিন হল DNA তন্তুর অনেকগুলি নিউক্লিয়টাইড বেস পেয়ারের একটি ক্রম (Genes are streatches of nucleotide base pairs along strands of the DNA molecule); জিনে প্রতিটি ক্রোমোজমের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেসব প্রোটিন আমাদের দেহের শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই জিনই সেই প্রোটিনগুলির অ্যামাইনো এ্যাসিডের ক্রমকে নির্দিষ্ট করে। ২০০০ সালে জুন মাসে 'হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টে'র গবেষকরা ঘোষণা করেন যে তারা সমগ্র হিউম্যান জিনোমের 'ম্যাপিং এবং সিকোয়েন্সিং,-এর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। অন্যতম গবেষক ফ্রান্সিস কলিন্স দাবী করেন যে এই সাফল্য মানুষের রোগ-ব্যাধির ব্যাপারে জিনের ভূমিকাকে নতুনভাবে বুঝতে সাহায্য করবে এবং তার ভিত্তিতে রোগের ফিনোটাইপগুলি আটকাতে বা সেগুলিকে ন্যূনতম করতে যুক্তিযুক্ত কর্মপন্থা উদ্‌ভাবনে সাহায্য করবে। এই দাবী এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে জিনোটাইপ এবং রোগের ফিনোটাইপের মধ্যে একটি সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ক আছে।

জিনগত কারণে যেসব রোগ-ব্যাধি হয় সেগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : মনোজেনিক, পলিজেনিক ও মাল্টিফ্যাক্টরিয়াল। প্রথম ধরনের রোগ একটিমাত্র জিনের বিভাজন বা পরিবর্তনের দ্বারা ঘটে থাকে। সিস্টিক ফাইব্রোসিস, হান্টিংটন্স ডিজিজ ইত্যাদি মনোজেনিক রোগের দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় ধরনের রোগ একাধিক জিনের মধ্যে পরিবর্তন বা বিভাজনের কারণে সংঘঠিত হয়। তৃতীয় ধরনের রোগ বিভিন্ন জিনগত পরিবর্তন এবং পরিবেশগত শর্তের কারণে ঘটে। যাই হোক, নীতিতত্ত্বের দিক থেকে যে প্রশ্নগুলি এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল হাই পেনিট্রেন্স জেনেটিক মিউটেশন, যার কারণে পরবর্ত্তী জীবনে এমন রোগের সূচনা হতে পারে যার কোনো চিকিৎসা নেই, সেই ধরনের রোগের কথা মাথায় রেখে ব্যক্তিদের জিন পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত কি? আমাদের কি সেইসব ভ্রূণ, যাদের মধ্যে গঠনগত বা বৈশিষ্ট্যগত কোন পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন রোগ বা অঙ্গ হানি ঘটে সেগুলির বিরুদ্ধে নির্বাচন করা উচিত? যদি এই ধরনের ভ্রূণগুলি মারাত্মক রোগের সূচনা করে তাহলে সেগুলিকে নষ্ট করে দিতে আমরা কি নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ? যদি মস্তিস্কের মধ্যে জিন ঢুকিয়ে মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতা বাড়ানো যায় তাহলে আমাদের কি তা করা উচিত? শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রি-সিম্‌টোম্যাটিক জিন-পরীক্ষা, জিন থেরাপি, জিনের ক্ষমতাবৃদ্ধি বা ইউজেনিক্স (Eugenics) কি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য? এই সব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এখানে।

৩.২ জিনগত পরীক্ষা ও স্ক্রিনিং (Genetic Testing and Screening) :

জিনগত পরীক্ষা সেইসব ব্যক্তিদের জন্য করা হয় যাদের মধ্যে বংশ-পরম্পরায় জিনগত অসুখের বড় ধরনের ঝুঁকি আছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, জেনেটিক স্ক্রিনিং কোনো একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে

কোনো এক অসুখের সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে সেই জনগোষ্ঠীর সব সদস্যদের জিন পরীক্ষা করা হয়। এই টেস্টিং এবং স্ক্রিনিং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রি-সিমটোম্যাটিক হয় এই অর্থে যে উপসর্গগুলি প্রকাশের আগেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর এই পরীক্ষা করা হয়। কিছু পরীক্ষা ক্লিনিক্যাল ডায়গ্‌নোসিসের জন্য। তবে এই সব পরীক্ষার উদ্দেশ্য হল কিছু মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনে জিনগত রোগের প্রাদুর্ভাবের ঘটনাকে আটকানো। রোগ ব্যাধি সহ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা তার ভালভাবে বাঁচার স্বার্থকে পরাভূত করে। তাই আমরা আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে পারি কিনা এটাই এখানে বিচার্য্য হয়। তবে এখানে উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বেশ কিছু বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যক্তির জিনগত প্রবণতা জানার জন্য পরীক্ষা করার অন্যতম বিপদ হল ইন্‌স্যুরেন্স কোম্পানি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিয়োগকর্তা জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের প্রতি বৈষম্যগত আচরণ করতে পারে। বীমাকৃত ব্যক্তির রোগ-ব্যাধি হওয়ার সম্ভাবনা এবং তৎজনিত মৃত্যুর কথা মাথায় রেখে কোম্পানি বীমাব্যবসা চালিয়ে যায়। এখন, বীমা কোম্পানী যদি জানতে পারে যে একজন ব্যক্তির একটি বিশেষ ধরনের জিনগত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে সেই ব্যক্তিকে বীমার সুযোগ দিতে অস্বীকার করতে পারে। অন্য দিকে, যদি জিনগত তথ্যপ্রমাণ নিয়োগকর্তার হাতে পৌঁছায় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভবিষ্যৎ রোগের কথা মাথায় রেখে তাকে নিয়োগপত্র দিতে বা তার চাকরী স্থায়ী করতে অস্বীকার করবে। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার যে কোনো একটি বিশেষ রোগ হওয়ার প্রবণতা থাকা মানেই ভবিষ্যতে সেই রোগটি হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। জিনগত পরিবর্তনের কারণে রোগ-ব্যাধির কিছু ঝুঁকি থাকে সত্য। কিন্তু এর মানে এই নয় তা আবশ্যিকভাবে রোগটিকে ঘটাবে। জিনগত পরিবর্তন বা রোগের সম্ভাবনার এ ধরনের অনিশ্চয়তার বিষয়টি মাথায় রাখলে এসব ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিশেষ যৌক্তিকতা থাকে না। কোনো কোনো দেশে এই ব্যাপারে আইন তৈরী হয়েছে যা বীমা-কর্তা তথা নিয়োগকর্তাদের এক অর্থে অনিশ্চিত জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য করতে নিষেধ করে। তৎসত্ত্বেও নিয়োগকর্তা এবং বীমাকর্তাদের আগ্রহ থাকে এটা জানতে যে কোনো ব্যক্তির কোনো বড় ধরনের রোগের সম্ভাবনা আছে কিনা। তবে সেক্ষেত্রে জিনগত তথ্য দ্ব্যর্থক বা সংশয়াচ্ছন্ন হলে চলবে না। সাধারণভাবে জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য করা নৈতিক দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে যদি এটা নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বড় ধরনের রোগ হতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা বা বীমাকোম্পানী বিশেষ ব্যবস্থা নিলে কিছু বলার থাকে না।

জিনগত পরীক্ষার পক্ষে মূল যুক্তি হল এই ধরনের পদ্ধতি মানসিক ও শারীরিক ক্ষতি থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি যার হান্টিংটন'স ডিজিজের পারিবারিক ইতিহাস আছে। সেক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কিছু দৈহিক খেঁচুনী বা আক্ষেপের পরে সেই রোগটি দেখা দেবে। একটি মাত্র জিনের পরিবর্তন এই ধরনের মারাত্মক রোগের কারণ হতে পারে। এই রোগীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় হতে থাকে, যার কোনো চিকিৎসা নেই এবং একই সঙ্গে রোগী যথেষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে। এই হান্টিংটন'স রোগযুক্ত কোনো ব্যক্তির জিনগত পরিবর্তন ও তজ্জনিত রোগ তার পরবর্ত্তী প্রজন্মের অর্ধেকের মধ্যে প্রবাহিত হতে পারে। এখন, উপসর্গ শুরু হওয়ার আগেই বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে যা কোনো ব্যক্তির ঐ বিশেষ ধরনের জিনগত সমস্যা আছে কিনা তা জানিয়ে দিতে পারে। এখন, জিনগত পরীক্ষার ভবিষ্যৎবাণী করার ক্ষমতার কথা মাথায় রেখে আমাদের দৃষ্টান্তের এই ব্যক্তির পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে কি আমরা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ যখন সে জানে যে এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই?

তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই যে ঐ ব্যক্তির উপসর্গ এবং পারিবারিক ইতিহাস জোরালোভাবে হান্টিংটন'স রোগের সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে। ঐ ব্যক্তি যদি জানে কিভাবে এই জিনগত পরিবর্তন সে জন্মসূত্রে পেয়েছে এবং এই রোগের মারাত্মক প্রকৃতির কথা মাথায় রাখে তাহলে সে এই পরীক্ষা করাতে দায়বদ্ধ, এবং তার ফলাফল তার ছেলেমেয়েদের সে জানাবে। পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ধারিত হবে এবং তার প্রতিটি সন্তানের ঐ ধরনের রোগ হওয়ার ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে তা পরিষ্কার হবে। আমরা যদি ঐ শিশুদের দিক থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করি তাহলে ০ শতাংশ ঝুঁকি এবং ৫০ শতাংশ ঝুঁকির মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পছন্দ গ্রহণে প্রভাবিত করবে। এখানে পিতা-মাতা পরীক্ষা করাতে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ এবং সেই তথ্য তাঁর ছেলে মেয়েদের জানানো এ কারণে জরুরী যে এই তথ্য ভবিষ্যৎ ক্ষতি আটকাতে দুই রকমভাবে সাহায্য করবে। প্রথমতঃ, ঝুঁকি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য ছেলে মেয়েদের হস্তগত হওয়ায় তারা তাদের সন্তান না নেওয়া স্থির করতে পারে। এর ফলে বাড়তি মানুষের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে। দ্বিতীয়ত, এই তথ্য ছেলেমেয়েদের জীবনকে অন্যভাবে পরিকল্পনায় সাহায্য করবে।

জিনগত স্ক্রিনিং-এর একটা দৃষ্টান্তের আমরা উল্লেখ করব, যেখানে একটি জন গোষ্ঠীর প্রি-কনসেপসন্স জেনেটিক স্ক্রিনিং-এর যৌক্তিকতাকে সমর্থন করে। যেসব দম্পতি সন্তান নিতে ইচ্ছুক তাদেরই এই স্ক্রিনিং-এর আওতায় আনার প্রস্তাব হয়েছে। অ্যাশকেনাজি ইহুদি জন গোষ্ঠীর মধ্যে জিন-ঘটিত ট্যে-স্যাখ্স্ (Tay-Sachs) রোগের অনেক ঘটনা দেখা যায়। এই রোগাক্রান্ত নবজাতকদের জন্মের সময় স্বাভাবিক বলেই মনে হয়, কিন্তু জীবনের প্রথম বছরের মধ্যেই তাদের স্নায়ুতন্ত্র ক্ষয় হতে শুরু করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুরা তিন-চার বছর বয়সকালের মধ্যেই মারা যায়। ট্যে-স্যাখ্স্ এক ধরনের রিসেসিভ ব্যাধি যেখানে আক্রান্ত শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে একটি করে পরিবর্তিত জিন জন্মসূত্রে পায়। এখানে পিতামাতা কেবল এই জিনের বাহক, তাদের ঐ রোগ নেই। জিনগত স্ক্রিনিং-এর বেশ কিছু কর্মসূচি নেওয়ার ফলে আশকেনাজি ইহুদি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই রোগের ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমানো গেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বাহক নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করে, বাহক মায়ের প্রি-ন্যাটাল টেস্টিং ও তার পরবর্ত্তী পর্যায়ে ভ্রূণনাশ করে, ডোনার গ্যামেট ব্যবহার করে এবং দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে। যাদের মধ্যে এই স্ক্রিনিং করা হয়েছিল তাদের একটা বড় অংশই ছিল যৌবন-উন্মুখ কিশোর। এটি একটি বিচক্ষণ কাজ এবং এর নৈতিক তাৎপর্য আছে। অল্প বয়সে স্ক্রিনিং-এর সাহায্য নেওয়ার এইসব যুবকেরা তাদের বিবাহ এবং তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ অনুসারে পরিবার-পরিকল্পনা করার যথেষ্ট সময় পায়।

পরিশেষে, আমরা জেনেটিক স্ক্রিনিং-এর সব থেকে বাধ্যকারী দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করব। এই অসুখটির নন-জেনেটিক উপায়ে চিকিৎসা সম্ভব। রোগটির নাম ফেনাইলকেটোনুরিয়া (Phenylketonuria : PKU। এটি একটি রিসেসিভ বিপাকীয় ডিসঅর্ডার যা দেহের অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফেনাইলঅ্যালানিন বিপাকে সমস্যা তৈরী করে। এর ফলে সংক্রামিত শিশুরা সাংঘাতিক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়। এই অবস্থা এমন একটি খাদ্যতালিকার মধ্য দিয়ে এড়ানো যেতে পারে যার মধ্যে ফেনাইল অ্যালানিন ইনটেক্‌কে সীমার মধ্যে রাখা যায়। নবজাতকের জেনেটিক স্ক্রিনিং সংশ্লিষ্ট পিতামাতাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। বলা বাহুল্য, শিশুর ক্ষতি হওয়া থেকে ভাবী শিশুরোগীদের আটকানোর এটি তুলনামূলক সহজ পন্থা।

৩.৩ প্রি-ইমপ্লান্টটেশন জেনেটিক ডায়াগ্‌নোসিস্ (Preimplantation Genetic Diagnosis [PIGD]) :

সিস্‌টিক্ ফাইব্রোসিসের মতো এমন অনেক জিনগত রোগ আছে যা ভ্রূণের কোষ-পরীক্ষার মাধ্যমে আগে থেকেই জানা যায়। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে IVF -ভ্রূণ থেকে জন্মলাভ করবে সেই সব মানুষজনের কি ধরনের জিনগত রোগ ভবিষ্যতে হতে পারে তার আভাস পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ভ্রূণগুলিকে তাই জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করার আগেই তাদের জিনের পরীক্ষা করানো হয়। PIGD পরীক্ষার মাধ্যমে ভাবী পিতামাতারা জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ভ্রূণ থেকে নির্বাচন করে নিতে পারে এবং ভ্রূণের জিনগত অবস্থানের উপর ভিত্তি করে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান সন্তান লাভ করতে পারে। বিভিন্ন মারাত্মক জিনগত রোগের এখনও পর্যন্ত কার্যকরী চিকিৎসা নেই — এই তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ভাবী পিতামাতারা সেই ভ্রূণগুলোকেই নির্বাচন করবে যেগুলির মধ্যে এই ধরনের মারাত্মক রোগ সৃষ্টিকারী জিনগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। এখানে যাদের রোগ হতে পারে তাদের জন্মকে বাধা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ করা হয়। এই ধরনের কাজ, অপরের ক্ষতি না করা (non-maleficence) এবং ন্যায়পরতা (justice) চিকিৎসা-নীতিতত্ত্বের এই দুটি নীতির দ্বারা সমর্থিত হতে পারে। ক্ষতি না করার নীতি এই দাবী করে যে আমরা সাংঘাতিক ধরনের দুঃখ-যন্ত্রণার সম্ভাবনা তৈরী করে মানুষের ক্ষতি করব না। ন্যায়পরতার নীতি দাবী করে যেখানে ভাল থাকার সমান সুযোগ আছে সেখানে আমরা সেই সুযোগ থেকে কোন মানুষকে বঞ্চিত করতে পারি না। এই দুটি নীতি একসঙ্গে এটাই ইঙ্গিত করে যে যেখানে রোগব্যাধি ছাড়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির জন্ম দেওয়া সম্ভব সেখানে বড় ধরনের রোগব্যাধির সম্ভাবনা আছে সেরকম শিশুর জন্ম দেওয়া নীতিগতভাবে অন্যায়।

এখানে অবশ্য এটা জানিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে পিতামাতারা ছেলেমেয়েদের সম্ভাব্য সর্বোৎকৃষ্ট জীবনের ব্যবস্থা করতে নীতিগতভাবে দায়বদ্ধ নয়। তাদের দায়বদ্ধতা শুধু এটুকু নিশ্চিত করা যে তাদের ছেলেমেয়েরা ন্যূনতম মাত্রার একটি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন পাবে, যেখানে উন্নতি করার জন্য উপযুক্ত সুযোগসুবিধা থাকবে। এই দায় পূর্ণতাবাদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং ক্ষতি না করা এবং ন্যায়পরতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন প্রশ্ন হল, যে সব ভ্রূণের মধ্যে হান্টিংটন'স্ বা অ্যালজাইমারস্-এর মতো জীবনের অনেক পরের দিকে ঘটবে এমন জিনগত রোগের সম্ভাবনা আছে যেরূপ ভ্রূণ নির্বাচন না করতে ভাবী পিতামাতারা কি দায়বদ্ধ? এইসব বিষয় জিনগত তথ্যের ভিত্তিতে জীবনকে বাধা দিতে আমরা দায়বদ্ধ কিনা এই বৃহত্তর প্রশ্নকে সামনে তুলে আনে, এবং এই প্রশ্ন নীতিগতভাবে আরো বেশী বিতর্কিত। বিতর্কিত এই কারণে যে আগে থেকে শুরু হওয়া রোগ-ব্যাধি যেখানে ব্যক্তির প্রায় সমগ্র জীবন ক্ষতিগ্রস্ত করে সেখানে জীবনের অনেক পরের দিকে সংঘটিত হবে এমন ধরনের সম্ভাবনাযুক্ত ব্যক্তি রোগের উপসর্গ সামনে আসার আগে বহু বছর স্বাস্থ্যকর স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

হান্টিংটন্'স্ রোগের উপসর্গ ৩০ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে দেখা দেয়। এই রোগে রোগীর পেশির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ কমে যায় এবং স্মৃতিভ্রংশের ঘটনা ঘটে। প্রথম উপসর্গের পর থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই সাধারণত রোগী মারা যায়। রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বহুবছর উন্নতমানের বৌদ্ধিক

এবং শারীরিক সক্রিয়তার সঙ্গে জীবনযাপন করে। সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন সার্থক যাপনযোগ্য কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে সবপর্যায়ে তাদের জীবনের গুণগতমানের মূল্যায়ন করা দরকার। সুখ-দুঃখের উপস্থিতি, বৌদ্ধিক, শারীরিক এবং আবেগীয় সামর্থ্যের বিচারে জীবনের গুণগত মানের বিচার করা হয়। যদিও এই নিরূপণ অনেকাংশেই ব্যক্তিগত, কে কিভাবে জীবনকে দেখে তার উপরে নির্ভর করে, তথাপি জীবনের একটা ন্যূনতম ভাল থাকার মান আছে যার নীচে বেঁচে থাকাকে সার্থক জীবন বলা যায় না। জীবৎকালে পরের দিকে সংঘটিত হয় হান্টিংটন'সের মতো এমন ধরনের রোগের ক্ষেত্রে রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেকার জীবন এবং রোগাক্রান্ত পরবর্তী জীবনের মধ্যেকার তুলনা তাদের জীবনের গুণগত মানকে পরিমাপ করতে সমস্যার সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তির ৩৫ বছর বয়সে হান্টিংটন্‌স্‌ রোগ শুরু হয়েছে এবং ৫৫ বছর বয়সে যে মারা গেছে তার শেষ কুড়ি বছরের জীবনের যে দুঃখযন্ত্রণা তা প্রথম ৩৫ বছরের ভালো থাকাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। আমরা অবশ্য অনেক সময় ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে জীবনের গুণগত মান মূল্যায়ন করি। ভবিষ্যতে কি অভিজ্ঞতা হবে সেটা নিয়ে আমরা বেশী চিন্তান্বিত থাকি, অতীতে কি ঘটে গেছে সেই স্মৃতিরোমন্থনের তুলনায়। যাই হোক, জীবনের শেষ পর্যায়ে দীর্ঘায়িত কষ্টকর জীবনের সম্ভাবনা মোটের উপর ভালভাবে বেঁচে থাকার সামগ্রিক হিসাব নিকাশকে গুরুত্বহীন করে দেয়। তাই যখন কোন ভ্রূণের PIGD-র মাধ্যমে কোন রোগের সম্ভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যায় তখন সংশ্লিষ্ট ভাবী পিতামাতার সন্তান-লাভের জন্য এই ধরনের ভ্রূণ নির্বাচন না করাই নীতিগতভাবে যথোচিত হয়। যে ব্যক্তির জীবন সাংঘাতিক রোগের দ্বারা বিড়ম্বিত হবে তাকে ভ্রূণ-অবস্থায় প্রতিরোধ করতে আমরা দায়বদ্ধ।

এখানে অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম কষ্টদায়ক রোগ বা অসমর্থ জীবনকে আহ্বান করার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে পারে। তখন প্রশ্নটি দাঁড়াবে, জিনগত পরিবর্তনের সমস্যাযুক্ত এমন কোন ভ্রূণকে স্বেচ্ছায় নির্বাচন করা অনুমোদনযোগ্য হবে কিনা, যে ভ্রূণ থেকে অল্পমাত্রায় অসমর্থ ব্যক্তির জন্ম হবে। ধরা যাক, একজন বধির পিতামাতা সন্তান চাইছেন, যে সন্তানও বধির হবে বলে জানা গেছে। IVF- পদ্ধতিতে অনেকগুলি ভ্রূণ তৈরী করে তাদের সামনে রাখা হল এবং তারা ভবিষ্যতে বধিরতার সমস্যা দেখা দিতে পারে এমন জিনগত সমস্যাযুক্ত একটি ভ্রূণকে নির্বাচন সে করল। তাদের সিদ্ধান্ত এই ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত যে পরিবার একটি সংহত একক এবং শিশুর স্বার্থকে পরিবারের স্বার্থ থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। বধিরতা যেহেতু জীবন-মরণের সমস্যা নয়, বা তা প্রচণ্ড কষ্টদায়ক জীবনও নয়, তাই অনেকেই এই নির্বাচনের পক্ষে রায় দিয়ে পারে। তথাপি মনে রাখতে হবে, বধিরতা একজন ব্যক্তির জীবনে অনেক সুযোগ-সুবিধাকে সীমায়িত করে। ছেলেমেয়েদের জন্য উপযুক্ত অবস্থা তথা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে বাবা-মা দায়বদ্ধ। কিন্তু ইচ্ছা করে এই সুযোগ-সুবিধাকে সংকুচিত করা নীতিগতভাবে আপত্তিকর। পিতামাতার স্বাধীনতা আছে তাদের পরিবারের মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করা, কিন্তু তা চূড়ান্ত নয়। তাদের এই স্বাধীনতা নেই যে তারা এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে যা শিশুর সমগ্র জীবনের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধাকে আপনাআপনি আটকে দিতে পারে। শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সর্বদা বাবা-মায়ের ভাবনাচিন্তার ভাষায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না।

৩.৪ জিন-থেরাপি (Gene Therapy) :

সোম্যাটিক সেলের জিন থেরাপি বলতে দেহকোষের কোনো একটি পরিবর্তিত বা ক্ষতিগ্রস্ত জিনের সংশোধন করার লক্ষ্যে একটি স্বাভাবিক অতিরিক্ত জিন যেখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে বোঝায়। এর

উদ্দেশ্য বর্তমান মানুষের জিন-ঘটিত রোগের চিকিৎসা করা। বিপরীতে, জার্ম-লাইন জেনেটিক অল্টারেশন পদ্ধতিতে শুক্রাণু বা ডিম্বাণুরূপ গ্যামেটের জিনের মানোন্নয়ের জন্য পরিবর্তন ঘটানো হয়। এই দ্বিতীয় ধরনের জিনগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য যেসব জিন বংশানুক্রমে পরিবাহিত হবে সেগুলোকে সম্ভবস্থলে পরিবর্তন করা বা সম্পূর্ণ বহিষ্কার করে দেওয়া। এই দিক থেকে দেখলে জার্ম-লাইন জেনেটিক অলটারেশ্ন রোগ প্রতিরোধের একটি ব্যবস্থা, ঠিক থেরাপি বা চিকিৎসা নয়। সব ধরনের জিনগত রোগের চিকিৎসা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। এর অবশ্য বিভিন্ন কারণ আছে। জিনথেরাপি প্রাথমিকভাবে সিঙ্গল জিনরোগব্যাধির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, কার্যকরীও। ক্যান্সারের মতো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল রোগসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য জিনের সঙ্গে পরিবেশগত শর্তগুলি সংশ্লিষ্ট থাকে। উপরন্তু, ডাউন্স সিনড্রোম এবং ফ্রাগাইল-X সিনড্রোমস্-এর মতো ক্রোমোজম ঘটিত রোগগুলি, যা মানসিক প্রতিবন্ধকতা ঘটায় এবং যেগুলি DNA-এর ব্যাপক অংশের সঙ্গে যুক্ত, সেগুলিকে তাই পরিবর্তন করা কঠিন। সিঙ্গল জিনরোগ, যেগুলি নীতিগতভাবে জিন থেরাপিতে সাড়া দেয়, সেগুলি প্রচ্ছন্ন জিন, প্রকট জিন নয়। প্রচ্ছন্ন জিনগতরোগ চিকিৎসায় সারানো যেতে পারে, কেননা ক্ষতিগ্রস্ত কোষের একটি স্বাভাবিক জিন ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাতে কোষ যথাযথভাবে কাজ করতে পারে। প্রকট জিনগত রোগের চিকিৎসা হয় পরিবর্তিত জিনটিকে স্বাভাবিক জিনের দ্বারা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমেই। একটি ক্ষতিগ্রস্ত জিনকে পুনঃস্থাপন করা একটি স্বাভাবিক জিন যোগ করার তুলনায় উন্নতমানের, কেননা এর মধ্যে পরিবর্তনকে সংশোধন করার যে সম্ভাবনা তা প্রচ্ছন্ন ও প্রকট - দুই ধরনের উপসর্গেরই প্রতিরোধ করতে পারে। দুর্ভাগ্যের কথা হল, কোষের সব পরিবর্তন সংশোধন করা এখনও সম্ভবপর হয় নি। আমরা যা পারি তা হল ক্ষতিগ্রস্ত জিনের মধ্যে একখণ্ড স্বাভাবিক জিন ঢুকিয়ে দিতে। এটি করা গেলেও এখনও পর্যন্ত খুব কম জিনগত রোগীকে এই ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সারানো গেছে।

তাত্ত্বিকভাবে সিস্টিক ফাইব্রোসিসের মতো প্রচ্ছন্ন জিনগত রোগের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কোষটির সমস্যাকারী জিনের মধ্যে একটি স্বাভাবিক জিন ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ইহা অগ্নাশয়কে খাদ্য-পরিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরী করাকে এবং ব্রাঙ্কিয়্যাল টিউবের গাত্রে গ্রন্থিগুলিকে ঠিকমতো কাজ করানোকে নিশ্চিত করবে। হিমোফিলিয়ার মতো জিনঘটিত রোগের ক্ষেত্রে ব্লাড ক্লট-কে নিয়ন্ত্রণ করে যে প্রোটিন সেই জিনের একটি স্বাভাবিক কপি ইঞ্জেকসনের মাধ্যমে দেহকোষে ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বাস্তবে গবেষকরা এমন কোনো উপযুক্ত ভেক্টার খুঁজে পাননি যার মধ্য দিয়ে কোষের মধ্যে চিকিৎসার জন্য জিন সরবরাহ করা যাবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো ভাইরাসকে ভেক্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে DNA-র অংশগুলিকে যে ভাইরাস নিয়ে যেতে পারে তাহল নিষ্ক্রিয় অ্যাডিনোভাইরাস। কিন্তু এই পদ্ধতি সফল হয় নি। কিছু ভাইরাস জিনের সম্পূর্ণ প্রোটিন বহন করার ব্যাপারে যথেষ্ট দীর্ঘ নয়। অবশ্য রেট্রোভাইরাসের ভেক্টর অনেক বেশী কার্যকরী হতে পারে।

তবে জিন থেরাপি করাতে গিয়ে ব্যক্তিজীবনে যে বেশ ঝুঁকি থাকে তা রেট্রোভাইরাসের প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে মৃত্যুর যেসব ঘটনা তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। জেস্ গেলসিঙ্গারে আর্নিথিং ট্রান্সকার্বমাইলেজ (OTC) স্বল্পতার মৃদু উপসর্গ ছিল। এই রোগের ক্ষেত্রে লিভার খাদ্য থেকে জাত ক্ষতিকারক অ্যামোনিয়াকে প্রসেস্ করতে পারে না। রেট্রোভাইরাল ভেক্টর ব্যবহার করে ইউনিভার্সিটি অফ্ পেন্সিলভ্যানিয়াতে

যখন তার চিকিৎসা চলছিল তখন ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে সে মারা যায়। প্রায় একইসময়ে ভাসকুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর (VEGF) সংশ্লিষ্ট জিনগত চিকিৎসা চলাকালীন আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এইসব মৃত্যুর দৃষ্টান্তের প্রতি ইঙ্গিত করে কিছু চিকিৎসক, গবেষক ও নীতিবিজ্ঞানী যতদিন না এইপদ্ধতির ঝুঁকি কমানো যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত জিন থেরাপি বন্ধ রাখার কথা বলেন।

রেট্রোভাইরাস ব্যবহার করে সিভিয়ার কমবাইন্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি (SCID) সমস্যা যুক্ত শিশুদের জিন থেরাপি কিছু সাফল্যের মুখ দেখেছে। কিন্তু এই চিকিৎসাতেও ঝুঁকি রয়েছে। দুজন ফরাসী শিশুকে ২০০০ সালে এই SCID -র জন্য জিন থেরাপি দেওয়া হয় যাদের মধ্যে লিউকেমিয়ার মতো সমস্যা তৈরী হয়েছে। জিন থেরাপি অনেক ক্ষেত্রে আবার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। তাই আমেরিকার একটি অ্যাডভাইসোরি প্যানেল জিন থেরাপির সময় ক্লোজ মনিটারিং সহ বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যুক্তি হল, এই পদ্ধতি মারাত্মক প্রতিরোধ-ক্ষমতাহীন এবং অন্যান্য জিনগত সমস্যাযুক্ত শিশুদের কাছে আশার আলো দেখাতে পারে। সাধারণভাবে বললে, শুধু মনোজেনিক অসুখ নয়, হার্টডিজিজ ও বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসার ব্যাপারে জিন থেরাপির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তাই জিন থেরাপি একেবারে বন্ধ করে না দিয়ে আরো নিরাপদ ভাইরাস ভেক্টার তৈরী করাতে গবেষকদের মনোযোগী হতে হবে। যথাযথ বৈজ্ঞানিক তথা নৈতিক দূরদৃষ্টির মাধ্যমে জিন থেরাপির ঝুঁকিগুলিকে কমিয়ে আমরা এর উপকারের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করতে পারি।

আমাদের মঙ্গলসাধনের নীতি জিন থেরাপি সংক্রান্ত গবেষণার প্রতি তখনই দায়বদ্ধ করে যখন এটি ঝুঁকি ন্যূনতম করার বাধ্যবাধকতা তথা কারোর ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার নীতির দ্বারা বৈধতা পায়। যদি গবেষণাধীন রোগী বা ব্যক্তি ন্যূনতম ঝুঁকির অতিরিক্ত ঝুঁকির মুখোমুখি না হয় তাহলে এই অনুমোদন (যাকে আমরা অনুমোদনযোগ্য ঝুঁকি বলি তার সঙ্গে) সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অনেক মানুষজন যারা বিভিন্ন রোগে ভুগছে তারা জিন থেরাপি থেকে উপকৃত হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যান্সারের কথা বলা যেতে পারে, যার মধ্যে পরিবর্তিত টিউমার সাপ্রেসার জিন সংশ্লিষ্ট আছে। এই জিনকে স্বাভাবিক একটি জিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে টিউমার সেলের বৃদ্ধি আটকানো যায়। যদি এই পদ্ধতিকে ঠিকমতো প্রয়োগ করা যায় তাহলে কোষ-বিভাজনের হারকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করা যায়। অধিকন্তু, এই জিন থেরাপি সংক্রান্ত গবেষণা HIV-AIDS-এর মতো ভাইরাল সংক্রমণকে প্রতিরোধ করার ভ্যাকসিন তৈরীতে সাহায্য করতে পারে।

সোমাটিক সেল জিন থেরাপির তুলনায় জার্ম-লাইন জিন থেরাপি বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। জার্ম-সেলের মধ্যে কোন বিকারকে সংশোধন করলে বা সেটিকে বাদ দিতে পারলে সেই ধরনের জিনগত বিকৃতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মে পরিবাহিত হওয়াকে প্রতিরোধ করা যায়। এই ভাবে কিছু জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিকৃতি সম্পূর্ণ আটকানো যায়। রোগ সারানোর ব্যাপারে জার্মলাইন ইনটারভেন্শন্ বিভিন্ন জিনগত রোগের সংঘটনকে আটকাতে পারে। তবে বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জার্ম-লাইন ইন্টারভেন্শন্ বাঞ্ছিত নাও হতে পারে। কেননা কিছু জিনগত পরিবর্তন পরিবর্তিত পরিবেশে প্রজাতির খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। তাই কোনো রোগের উপসর্গ-সংশোধন করতে গিয়ে জিনের পরিবর্তন সাধন করা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নতুন ধরনের সমস্যা তৈরী করতে পারে। অবাঞ্ছিত কোন পরিণাম ব্যক্তির দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, পরবর্তী প্রজন্মে সেগুলি

পরিবাহিত হবে। অবশ্য আমরা এখনও পর্যন্ত জানতে পারি নি জিনের উপর জার্ম-লাইন ইনটারভেন্‌শন্ কি ধরনের প্রভাব তৈরী করে। এই ইনটারভেনশনের কারণে যদি কোন পর্যায়ে কিছু ভুল-ত্রুটি হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে তা আরো নতুন রোগের সূচনা করবে। এই সম্ভাবনার আলোকে বিষয়টিকে বিবেচনা করলে মনে হয়, যতদিন পর্যন্ত এই ধরনের জেনেটিক মেকানিজমের সব কিছু তথ্য আমাদের সামনে না আসছে ততদিন পর্যন্ত এই ধরণের ইনটারভেনশন স্থগিত রাখাই বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে যুক্তিযুক্ত হবে। তবে কোন রোগের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার নীতি উপকৃত হওয়ার নীতির তুলনায় বেশী গুরুত্ব পায় — এই যুক্তি সব ধরনের জার্ম-লাইন গবেষণা নিষিদ্ধকরণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হয় না।

৩.৫ জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট (Genetic Enhancement) :

জিন থেরাপি জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট থেকে আলাদা। ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক সক্রিয়তাকে উপযুক্ত স্তরে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে জিন-থেরাপি করা হয়। জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট স্বাভাবিক সক্রিয়তাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক ক্রিয়া ও সামর্থ্যকে আরো বাড়িয়ে তোলার লক্ষ্য থাকে। শরীর-মনে যথোপযুক্ত ক্রিয়াবত্তাকে সচল রাখা এবং তা নিশ্চিত করা চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। এবং এই বিচারে জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিধির মধ্যে পড়ে না, যেহেতু এর উদ্দেশ্য শরীর-মনের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা নয়, তাকে আরো উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়া।

তবে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে জিনগত চিকিৎসা এবং জেনেটিক এনহ্যান্‌স্‌মেন্টের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। কেননা জেনেটিক এনহান্‌স্‌মেন্টের কিছু কিছু প্রকার রোগ-প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিষেধাত্মক টীকা দেওয়ার পর তার যে 'বুস্টিং' ডোজ দেওয়া হয় তা জেনেটিক এনহানস্‌মেন্টের দৃষ্টান্ত বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু প্রতিরোধকারী টীকার উদ্দেশ্য যেহেতু রোগ-প্রতিরোধ করা, তাই কঠোর অর্থে একে জেনেটিক এন্‌হানস্‌মেন্ট বলা যায় না। তবে এর মানে এই নয় যে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করা এবং জিনগত ক্ষমতা বাড়ানো এই দুয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এটা স্বীকার করতে হবে যে এ দুয়ের মধ্যে একটা ধূসর ক্ষেত্র রয়েছে। তাই কখনো কখনো কারোর সক্রিয়তাকে বেস লাইনে উন্নত করাটা সাধারণ চিকিৎসা মনে হতে পারে। কিন্তু বেস লাইনের উপরে কারোর সক্ষমতাকে তুলে নিয়ে যাওয়াকে অবশ্যই জেনেটিক এনহান্‌স্‌মেন্ট বলা হবে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক এ্যাথ্‌লিট্ যখন এরিথ্রোপোয়েটিন (EPO) নামক হরমোন গ্রহণ করে শারীরিক সক্ষমতাকে আরো বাড়ানোর জন্য, প্রতিযোগিতায় আরো ভাল ফল করার জন্য, তখন তাকে এনহ্যানস্‌মেন্ট বলতেই হয়। এখানে যে বিষয়টি নৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এটি কিছু মানুষকে সৌন্দর্য, বুদ্ধি, সক্ষমতা ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্য তথা ক্ষমতার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় অন্যায়ভাবে বেশী সুযোগ পাইয়ে দেয়। যারা এই ধরনের প্রযুক্তির সুযোগ নেওয়ার জন্য অর্থব্যয় করতে পারবে তারাই এই এনহ্যানস্‌মেন্টের সুযোগ পাবে। যাদের এই অর্থ খরচ করার সামর্থ্য নেই তারা এই সুযোগ পাবে না, যদিও অর্থ-স্বাচ্ছল্য না থাকাটা তাদের নিজেদের দোষ নয়। যারা এই ধরনের প্রযুক্তির সাহায্য নিতে পারবে না তারা বিশেষ ধরনের সক্ষমতার প্রশ্নে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে। এজন্য প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত নয়। জিন থেরাপি মানুষের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে করা হয়। কিন্তু জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট

মানুষের পছন্দ ও তার সুযোগ নেওয়ার আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিকর দিকটি হল ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এই প্রযুক্তি বৈষম্যের সৃষ্টি করে।

তবে এই জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্টের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত হলে এই নীতিহীনতার প্রশ্ন উঠবে কি? বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি তখন সবার কাছে সমানভাবে লভ্য হবে। কিন্তু সমস্যা হল, এতে পূর্ণ সাম্য আসবে না। কোন পিতামাতার শিক্ষার মতো সামাজিক পণ্যের প্রতি কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আছে তার উপর নির্ভর করবে এই বৌদ্ধিক ক্ষমতার কিরূপ ব্যবহার হবে। কিছু বাবা-মা অপেক্ষাকৃত ভাল স্কুলে তাদের ছেলে-মেয়েদের পাঠানোর ব্যাপারে মনোযোগী হবে; অন্যেরা দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে এ ব্যাপারে প্রভাবিত নাও হতে পারে। এর থেকে যা বেরিয়ে আসে তাহল জেনেটিক এনহ্যানসমেন্ট সকলের জন্য উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা হলেও বিভিন্ন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে এর পরিণাম বিষম হবে। কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন, এইভাবে প্রতিযোগিতামূলক পণ্যগুলিকে আমরা যদি সবার জন্য উন্মুক্ত করতে পারি, তাহলে সমষ্টিগত স্তরে তা আত্মঘাতী হবে। প্রত্যেক শিশুর বৌদ্ধিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার একটি সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হল ব্রেন ড্যামেজ। কিছু কিছু শিশুর ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধকতা তখন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করার যে সামাজিক ব্যয় তা তার থেকে প্রাপ্ত সামাজিক সুবিধাকে ছাপিয়ে যাবে। তখন কোন শিশু অন্যদের তুলনায় বৌদ্ধিকভাবে উন্নততর হবে না, বরং কিছু শিশু এই পদ্ধতির মধ্যে আসার আগে যে অবস্থায় ছিল তার চেয়ে বৌদ্ধিকভাবে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই যে নিট সামাজিক ব্যয় বা অপকারিতা তা সকলের জন্য জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্ট-এর কর্মসূচীকে নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি হিসাবে কাজ করে। তবে রলসের ন্যায়তত্ত্বের সূত্র ধরে কেউ বলতে পারে, জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলি যখন মিটিয়ে ফেলা গেছে তখন সভ্যভব্য ন্যূনতম জীবন স্তরের উপরে যারা আছে তাদের মধ্যে কিছু বৈষম্য সূচনা করা অন্যায় হবে না। এই বিচারে কিছু মানুষকে অন্য কিছু মানুষের তুলনায় বৌদ্ধিকভাবে বা শারীরিকভাবে উন্নত করবে এমন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন নীতিগত আপত্তি থাকতে পারে না। সর্বোপরি, এনহ্যানস্‌মেন্ট প্রক্রিয়ায় যার স্বাভাবিক সক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য আছে তাকেই উন্নীত করে। তাই এ্যানহান্‌স্‌মেন্ট প্রযুক্তির সুযোগ নিতে না পারা মানুষজন যখন স্বাভাবিক বৌদ্ধিক ও শারীরিক সক্ষমতার বেস লাইনের মধ্যে থাকে তখন এনহান্‌স্‌মেন্টের সুবিধা নেওয়া বা না নেওয়া তাদের পছন্দের উপর নির্ভর করবে, প্রয়োজনের উপর নয়। এই ধরনের দাবীতে তাই কোন নৈতিক জোর নাই।

এতদসত্ত্বেও, এই সব কিছু স্বাস্থ্যের চূড়ান্ত পরিমাপকের ভাষায় সর্বোত্তম স্বাস্থ্যে বোধব্য কিনা এ প্রশ্ন উঠুক বা না উঠুক, সমতার গুরুত্বে আমাদের বিশ্বাসকে তা আঘাত করবেই। সমতা আত্ম-সম্মানের অন্যতম সামাজিক ভিত্তি। সামাজিক সৌহার্দ্য এবং স্থায়িত্বের জন্য যা প্রয়োজন। এনহান্‌স্‌মেন্ট প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে বৈষম্যকে অনুমোদন করা এই সামাজিক ভিত্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। যদিও পরিমাণের ভাষায় সামাজিক সৌহার্দ্য বা সুস্থিতিকে বোঝান কঠিন তথাপি এই ধরনের সামাজিক ক্ষতি জেনেটিক এনহ্যানসমেন্ট এর প্রযুক্তিকে নিষিদ্ধ করার অন্য একটি যুক্তি হতে পারে।

ধরা যাক্, এই পদ্ধতির সাহায্যে পরার্থপরতা, উদারতা, সহানুভূতি ইত্যাদি অ-প্রতিযোগিতামূলক সদ্‌গুণগুলিকে বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা হল। নিশ্চিতভাবে এই ব্যবস্থা সামাজিক সৌহার্দ্য ও সুস্থিতির পক্ষে যাবে। এই কর্মসূচি রোগ-প্রতিরোধ বা রোগের চিকিৎসার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ হবে না। তথাপি ইহা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করবে যা নৈতিক কর্তা হিসাবে, আমাদের পক্ষে আবশ্যিক, বস্তুত এটি আছে বলেই আমরা প্রশংসা বা নিন্দা, পুরস্কার বা শাস্তির পাত্র হই। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই সামর্থ্যই আমাদের কোন কাজের দায়িত্ব

নিতে সমর্থ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই গুরুত্বকে সামনে রাখলে জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্টের মাধ্যমে সদ্‌গুণ বাড়ানোর কর্মসূচি সমর্থনযোগ্য হয় না, কেননা ইহা যেহেতু বাহ্যিক শর্ত বা সূত্র থেকে আসে তাই আমাদের স্বাতন্ত্র্য বা নৈতিক কর্তৃত্বের অবমূল্যায়ন ঘটায়। এইসব যুক্তি জেনেটিক এনহ্যানস্‌মেন্টকে সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। কিন্তু একে অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারকে নিশ্চিতভাবে সমস্যাকীর্ণ করে তোলে।

৩.৬ ইউজেনিকস্ (Eugenics) :

জেনেটিক ইনটারভেনশনের মাধ্যমে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সামর্থ্য তথা বৈশিষ্ট্যকে উন্নীত করার প্রচেষ্টা থেকে যে শাস্ত্রের জন্ম হয়েছে তাকে ইউজেনিকস্ বলা হয়। আক্ষরিকভাবে ইউজেনিকসের অর্থ হল 'উত্তম সৃষ্টি'। আমরা যে অর্থে সম্প্রতি 'ইউজেনিকস্' কথাটি ব্যবহার করি তাকে হিউম্যান জিনোমকে উন্নীত করতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে বোঝায় (the use of biological science and technology to improve human genome)। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উন্নত মানুষ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে কখনোই ভাল চোখে দেখা হয় না। এটা মূলতঃ এই কারণে যে নাৎসী জার্মানিতে মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে এই বিষয়টির অনুষঙ্গ আছে। তবে ইউজেনিকসের একটি ব্যাপকতর অর্থ আছে যাতে মানব প্রজাতিকে উন্নীত করার মতো বিকর্ষণকারী ব্যঞ্জনা নেই। এরজন্য অবশ্য নেগেটিভ ইউজেনিকস্ এবং পজেটিভ ইউজেনিকসের মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। জিনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা জিনথেরাপির লক্ষ্য যখন রোগবালাই প্রতিরোধ করা বা নিয়ন্ত্রণ করা তখন এগুলিকে আমরা নেগেটিভ ইউজেনিকস্ বলতে পারি। অন্যদিকে, জেনেটিক এন্‌হ্যানস্‌মেন্টের উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বা সামর্থ্যকে উন্নত করা বা বাড়ানো তাই একে আমরা পজেটিভ ইউজেনিকস্ বলব। রোগ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে আমরা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ -এই মর্মে যদি সিদ্ধান্তকারী যুক্তি থাকে তাহলে আমরা নেগেটিভ ইউজেনিকস অনুশীলন করতে দায়বদ্ধ। অন্য দিকে, আমাদের স্বাভাবিক ক্ষমতার উন্নতি সাধনের পক্ষে যদি কোন সিদ্ধান্তকারী যুক্তি না থাকে তাহলে পজেটিভ ইউজেনিকস্ অনুশীলন করতে আমরা নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ নই। বাস্তবিক অনেকেই পজেটিভ ইউজেনিকস্‌কে নিষিদ্ধ করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন।

সরাসরি জেনেটিক ইনটারভেনশন্-এর ব্যাপার নেই এমন ধরনের ইউজেনিকসের দু-একটি প্রকার বহু প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্লেটোর আদর্শ সমাজে 'judicious mating' -কে উৎসাহিত করার প্রস্তাব ছিল। তিনি Republic-এ শাসকশ্রেণীর সঙ্গে ব্যবসায়শ্রেণীর মানুষজনের মেলামেশাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। যেসব মানুষজন সর্বোৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন উপযোগী বলে ভাবা হত তাদের মধ্যেই মেলামেশাকেই উৎসাহিত করা হত এবং এইক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত। সদর্থক ইউজেনিকসের এই দৃষ্টান্ত নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে আপত্তিকর এবং তা এই কারণে যে এখানে সামাজিক শ্রেণীর ভিত্তিতে বৈষম্য করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও আজকালকার অনেক মানুষজন সেই ধরনের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করে যাদের সঙ্গে মিলিত হলে উন্নত শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যসম্পন্ন শিশুর জন্ম হবে বলে তারা বিশ্বাস করে। এটিও সদর্থক ইউজেনিকসের একটি প্রকার, যদিও এর মধ্যে জেনেটিক ইনটারভেনশনের কোন ব্যাপার নেই।

সর্বোৎকৃষ্ট সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার মধ্যে স্বরূপতঃ এমন কিছু নেই যাকে নীতিগতভাবে আপত্তিকর বলা যায়, যদি এটি সরকার ব্যবস্থিত কর্মসূচি না হয়। এর মধ্যে যদি কোন বাধ্য করার ব্যাপার না থাকে এবং সন্তানলাভের ব্যাপারে কাউকে অন্যের তুলনায় অন্যায়ভাবে সুবিধা পাইয়ে না দেয়, তাহলে একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষে কোন যুক্তি থাকে না। আমরা পিতামাতার স্বাতন্ত্র্য নীতির ভিত্তিতে এটিকে সমর্থন করতে পারি। আবার এই ব্যবস্থা কারোর কোন ক্ষতি করে না। তাই 'অন্যের ক্ষতি করো না' (non-maleficence) এই নীতিও এখানে সম্পূরিত হয়। তাছাড়া, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে জিনগত বৈশিষ্ট্য পরিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তার কারণে আগে থেকে নির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না শিশুটি তার বাবা-মার কাছ থেকে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য জন্মসূত্রে পেতে চলেছে।

যাই হোক, প্রতিবন্ধীদের অধিকারের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা সদর্থক ইউজেনিকস্ ও নঞর্থক ইউজেনিকসের মধ্যেকার পার্থক্যকে গুরুত্ব দিতে রাজী নন। তাঁরা এরকম যুক্তি দেন যে PIGD, জিন থেরাপি এবং জেনেটিক এন্হ্যান্স্মেন্ট-এগুলো সবই ইউজেনিকসের বিভিন্ন প্রকার যা অসমর্থ মানুষজনের জীবনের অবমূল্যায়ন করে। PIGD -তে জিনগত বিকৃতি বা পরিবর্তনযুক্ত ভ্রূণগুলির বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচন করি যা প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে। ফলতঃ বিভিন্ন ধরনের অসামর্থ্য নিয়ে যেসব মানুষ বেঁচে আছে তাদের জন্য জনসাধারণের সমর্থন ক্রমশঃ কমে যাবে এবং প্রতিবন্ধীদের বিরুদ্ধে আরো এক দফা সামাজিক বৈষম্যের সূচনা হবে। এই যুক্তির প্রতিক্রিয়ায় কেউ বলতে পারেন, অক্ষম বা প্রতিবন্ধী মানুষকে নয়, আমরা অসামর্থ্যকে অবমূল্যায়ন করছি। এতে অবশ্য প্রতিবন্ধী মানুষজন, যারা শারীরিক অক্ষমতাকে নিজের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে, তারা বলবে এ দুটোর মধ্যে যথার্থ পার্থক্য করা যায় না।

এই বক্তব্য গুরুত্ব হারায় যদি আমরা একটি ভ্রূণ যা অসুস্থ ও অসমর্থ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন করব কিনা তার চিন্তা করি। একটি ভ্রূণের বৈশিষ্ট্য এবং একটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এতটাই পরস্পর স্বতন্ত্র সে এটা মনে করা সঙ্গত হয় না যে তারা একই ব্যক্তির পূর্বের ও পরের অবস্থা। বিশেষ করে বলার কথা, ভ্রূণের সেই জীবতাত্ত্বিক গঠনের অভাব আছে যা ব্যক্তিত্বের জন্য আবশ্যিক মানসিক ক্ষমতাকে প্রতিপাদন করতে পারে। আবার ভ্রূণের সেই ধরনের সম্ভাবনা নেই যা নিজে নিজেই এই ধরনের জীবতাত্ত্বিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে। তাই ভ্রূণ সম্পর্কিত কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত ব্যক্তি পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় না। ভ্রূণের কোন অক্ষমতা আছে এরকম বলা অর্থপূর্ণ নয়। কিন্তু ব্যক্তির অক্ষমতা আছে বলা সার্থক। যেহেতু ভ্রূণ আর ব্যক্তি এক নয় এবং যেহেতু ব্যক্তি কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, সেহেতু কোন ভ্রূণের বিরুদ্ধে নির্বাচন করা বা ভ্রূণটিকে বিনষ্ট করলে কারোর ক্ষতি হয় না। অন্য দিকে কোন ভ্রূণের যদি জিনগত কোন অস্বাভাবিকতা থাকে যা ভবিষ্যতে মারাত্মক অক্ষমতার সূচনা করবে তাহলে তার বিরুদ্ধে নির্বাচন সেই ব্যক্তির অস্তিত্বকে প্রতিরোধ করে তার ক্ষতি হওয়া আটকাবে। অ-ক্ষতির নীতি এবং ন্যায়পরতার নীতি দ্বারা এটি সমর্থিত হয়। আলেন বুখানন্ যথার্থ বলেছেন, 'We devalue disabilities because we value the opportunities and welfare of the people who have them – and it is because we value people, all people, that we care about limitations on their welfare and opportunities.'

বিভিন্ন দেশে প্রতিবন্ধী মানুষজন তাদের অধিকারের আইন স্বীকৃতি আদায় করেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে

যেসব মানুষজন প্রতিবন্ধী হতে পারে তাদের অস্তিত্বকে প্রতিরোধ করার কর্মনীতি যেসব ব্যক্তির ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরনের অক্ষমতা ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই ধারণার মধ্যে কিছু একটা গোলমাল আছে। এটি ইঙ্গিত করে যে অসমর্থ যে সব ব্যক্তির জন্ম হয়েছে তারা অন্যের উদ্দেশ্য সাধনে নিছক উপায় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু নৈতিক যুক্তিতে এই বক্তব্যকে প্রতিপাদন করা কঠিন। উপরন্তু, কেউ যুক্তি দিতে পারে যে প্রতিবন্ধী মানুষজনের সংখ্যা যত কম হবে সমাজ তাদের প্রয়োজন মেটাতে তত বেশী সমর্থ হবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, প্রতিবন্ধী মানুষের জন্ম হতে পারে এমন ধরনের ভ্রূণের বিরুদ্ধে নির্বাচন করার কোন নৈতিক দায় আমাদের নেই। তথাপি এর থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে এইসব ভ্রূণগুলিকে তার মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠতে দিতে আমাদের কোন দায় আছে। সত্যি কথা হল, এমন কি জিনগতভাবে স্বাভাবিক ভ্রূণগুলিকে মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠার অনুমতি দিতে আমাদের কোন দায় নেই। এর কারণ হল এইভাবে বা অন্য কোনভাবে আমরা ভ্রূণের কোন সুবিধা করে দিতে বা ভাল করে দিতে পারি না।

৩.৭ সারসংক্ষেপ :

এই পাঠ-এককে জিনতত্ত্ব তথা জিন-প্রযুক্তির সমকালীন বিকাশের ফলশ্রুতিতে চিকিৎসা ও প্রজনন-সংক্রান্ত যেসব পদ্ধতি-প্রকরণ সামনে এসেছে তাদের নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা প্রি-সিম্পটোম্যাটিক জেনেটিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছি, এবং একই সঙ্গে এইসব পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে কিভাবে কখন ব্যবহার করা উচিত সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে যদি আগে থেকে PIGD-এর মাধ্যমে জানা যায় যে কোন ভ্রূণের মধ্যে ভবিষ্যতে মারাত্মক রোগসৃষ্টিকারী জিনগত উপাদান আছে তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করা বাঞ্ছনীয়। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকির প্রশ্ন আছে তথাপি ভবিষ্যত মানুষের কথা ভেবে জিন থেরাপি সম্পর্কিত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া উচিত। তবে সদর্থক জার্ম-লাইন জিনথেরাপি যে নৈতিকভাবে সমস্যাকীর্ণ তার উল্লেখ করেছি। ইউজেনিকস্‌ের মতো সংবেদনশীল বিষয় সম্পর্কে আশঙ্কাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত, যতদিন পর্যন্ত না যাবতীয় ঝুঁকি নির্মূল করা যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ইউজেনিক্‌স-এর গবেষণা বন্ধ রাখা উচিত।

৩.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. What is genetics? Distinguish between genetic testing and genetic screening. Discuss the moral issues involved herein.
2. What is pre-implantation genetic diagnosis? Is this method morally sound? Discuss.
3. Define gene therapy. Why is germ-line gene therapy much more problematic than somatic cell gene therapy? Explain.

4. Distinguish between gene therapy and genetic enhancement. Why is the technology of genetic enhancement morally problematic? Discuss.
5. Define eugenies. Distinguish between negative and positive eugenics. What is morally objectionable in positive eugenics? Discuss.

৩.৯ গ্রন্থ-নির্দেশ :

অনুমোদিত টেক্সট্‌বুক : Walter Glannon : Biomedical Ethics, Oxford University Press, 2005 (Chapter-5) পাঠ্য

এছাড়া Helga Kuhse and Peter Singer (eds) : Biomedical Ethics : An Anthology, Blackwell, 2006 (Articles Nos. 11, 19, 20, 21, 24) পাঠ্য।

দ্রষ্টব্য : সন্তোষ কুমার পালের ফলিত নীতিশাস্ত্র : প্রথম খণ্ড, লেভান্ত বুকস, কলকাতা, ২০১২।

পাঠ একক - ৪

দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা-সামগ্রী বণ্টন

বিষয় সংকেত

৪.০ : উদ্দেশ্য

৪.১ : প্রাক্‌কথন

৪.২ : অগ্রাধিকার নির্দিষ্টকরণ

৪.৩ : গুণ-সমন্বিত জীবন-বর্ষ

৪.৪ : বয়স-ভিত্তিক বরাদ্দ-ব্যবস্থা

৪.৫ : অঙ্গ-প্রতিস্থাপন

৪.৬ : দ্বি-স্তরীয়

৪.৭ : সারসংক্ষেপ

৪.৮ : নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৯ : গ্রন্থনির্দেশ

দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা-সামগ্রী বণ্টন (Allocating Scarce Medical Resources)

৪.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ-এককে আমরা দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা ও চিকিৎসা-সামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রে যেসব নৈতিক বিষয় উত্থাপিত হয় তার বিচার করব। উন্নত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাস্তব অপ্রতুলতা যেগুলি যথাযথ বণ্টনের ক্ষেত্রে নানাবিধ নৈতিক ইস্যু উত্থাপন করে এই পাঠ-এককে সেগুলি মুক্ত মনে নৈতিক বিচার করব।

৪.১ প্রাক্‌কথন :

স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়া এক জিনিস, আর তার জন্য অর্থ-ব্যয় করা আরেক জিনিস। স্বাস্থ্য-পরিষেবার খরচ ইদানীং অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেছে। এর কারণ বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। এর সঙ্গে যুক্ত আছে কিছু-কিছু চিকিৎসা-সামগ্রীর দুষ্প্রাপতা। এখন, যেহেতু সব মানুষের চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর মতো যথেষ্ট চিকিৎসা-সামগ্রী বাস্তবে নেই,

সেহেতু এইসব সামগ্রী সকলের মধ্যে যতটা সম্ভব ন্যায্য বন্টনের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা প্রয়োজন। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থা মানুষের ন্যূনতম চিকিৎসা-পরিষেবাকে নিশ্চিত করবে। দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা বিতরণের ক্ষেত্রে সমতা (equality) এবং ন্যায়পরতা (justice) নীতি মেনে চলতে হবে। এখানে যে নৈতিক প্রশ্নগুলি ওঠে সেগুলি হ'ল, পরিষেবার সকলের সমান সুযোগের নীতির উপর কতটা নৈতিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত? গবেষণা ও চিকিৎসার তুলনায় রোগ- প্রতিরোধের ব্যাপারটিকে কি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত? সেখানে পরিষেবা বা সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা আছে সেখানে বয়সের ভিত্তিতে বৃদ্ধদের তুলনায় কম-বয়েসীদের আগে সুযোগ দেওয়া কি নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য হবে? অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে কোন একজন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা গুরুত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অগ্রাধিকারকে সপ্রমাণ করে কি? কোন ব্যক্তির বিশেষ জীবন-যাপনরীতি (যেমন, মদ্যপান) অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের মতো পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার অগ্রাধিকারের দাবীকে খণ্ডন করে কি? দ্বি-স্তরীয় স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থা কোন্ যুক্তিতে সমর্থনযোগ্য হবে? এই ধরনের বিভিন্ন নৈতিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা হবে এই পাঠ-এককে।

৪.২ অগ্রাধিকার নির্দিষ্টকরণ (Setting Priorities) :

চিকিৎসা-সামগ্রী কিভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা ঠিক করতে গেলে আমাদের বণ্টনমূলক ন্যায়ের কোন একটি তত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। যার যা প্রাপ্য, বিশেষ করে সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে, তা নিশ্চিত করাই ন্যায়পরতা। বন্টনমূলক ন্যায় স্বাস্থ্য-পরিষেবার মতো সামাজিক সম্পদকে কিভাবে সকল মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে তা ঠিক করে। বন্টনমূলক ন্যায়ের মোটামুটি চার ধরনের তত্ত্ব আমাদের চোখে পড়ে : উপযোগিতাবাদী বা পরিণামবাদী ন্যায়তত্ত্ব (Utilitarian or Consequentialist Theory), ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ন্যায়তত্ত্ব (Libertarian Theory), সম্প্রদায়-নির্ভর ন্যায়তত্ত্ব (Communitarian Theory), সমতাবাদী ন্যায়তত্ত্ব (Egalitarian Theory)।

উপযোগবাদী বা পরিণামবাদী ন্যায়তত্ত্ব উপযোগিতা-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বের সমর্থকরা মনে করেন, কোন কর্মসূচীকে তখনই ন্যায্য বলা হবে যখন তা সামগ্রিক উপযোগিতার সর্বোচ্চায়ন ঘটায় বা সামগ্রিকভাবে মন্দের তুলনায় বেশী ভাল ফল বা পরিণাম উৎপন্ন করে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ন্যায়তত্ত্ব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অধিকারের উপর আলোকপাত করে। এবং সেই কর্মপন্থাকেই ন্যায্য বলে যা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে নিশ্চিত করে। সম্প্রদায়-নির্ভর নীতিতত্ত্ব একটি সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর বহুদিন ধরে গড়ে ওঠা আচার-আচরণ তথা রীতি-নীতির উপর নির্ভর করে। সমতাবাদী নীতিতত্ত্ব অনুসারে একটি সামাজিক কর্মসূচীকে তখনই ন্যায্য বলা হবে যখন কিছু সামাজিক সম্পদ-প্রাপ্তির ব্যাপারে সকলের সমানাধিকার থাকবে।

আমেরিকার মতো পুঁজিবাদী দেশে স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে মুক্ত বাজারের নীতির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। কিভাবে চিকিৎসা-পরিষেবা বণ্টন করা হবে তা বাজারই ঠিক করে। এখানে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য আমাদের অর্থ ব্যয় করতে হবে - এই ধারণার উপর এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। বলা বাহুল্য, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী ন্যায়তত্ত্বের ওপর এই ব্যবস্থা নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া আমাদের অধিকার নয়। স্বাস্থ্য-পরিষেবা একটি পণ্য যা আমাদের অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনমতো ক্রয় করতে পারি। এই ব্যবস্থার অসুবিধা হল, যারা বাজার-মূল্যে পরিষেবা কিনতে পারবে না তারা স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো জরুরী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেকে মনে করেন স্বাস্থ্য-পরিষেবার ক্ষেত্রে বাজার-নীতি প্রয়োগ করা উচিত নয়, কেননা সুস্বাস্থ্য অমূল্য সম্পদ। সম্পদায়-

নির্ভর নীতিতত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তথা বাজার-নির্ভর ব্যবস্থা একটি সম্ভাব্য সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে। বয়স-নির্ভর রেশনিং-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রচলিত রীতি-নীতি তথা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা করা যেতে পারে। তবে স্বাস্থ্য-পরিষেবায় সকলের সমান সুযোগ এবং এই সব পরিষেবার বাস্তব ফলাফলই যেহেতু পরিষেবা বণ্টনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই সমতাবাদী এবং পরিণামবাদী ন্যায়তত্ত্বই আমাদের আলোচনায় সব থেকে বেশী কার্যকরী হবে বলে মনে হয়।

সমতাবাদী ন্যায়তত্ত্বে সব থেকে পরিচিত তাত্ত্বিক হলেন জন্ রলস্। তাঁর মতে, যা নায্য- তাকে যা প্রতিপাদন করে তাই ন্যায়পরতা। তাঁর তত্ত্বকে তাই বলা হয় 'Justice as Fairness'। রলসের মতে, কোন সম্পদের বিতরণ তখনই ন্যায্য হয় যখন তা মানুষের প্রয়োজনের দাবীকে মেটাতে পারে। এখানে যাদের প্রয়োজন যত বেশী তাদের দাবীকে তত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে এটা ইঙ্গিত করে যে রলস্ শুধুমাত্র সমতার জন্য সমতা-র কথা ভাবছেন না, তিনি অগ্রাধিকারের উপরও সমান গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আমরা জন্ রলসের পার্থক্যের নীতি (the principle of difference) স্মরণ করতে পারি : 'All social values - liberty and opportunity, income and wealth, and bases of self-respect – are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all of these values is to everyone's advantage.' এই নীতির উদ্দেশ্য সব থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের, অপেক্ষাকৃত সুস্থ স্বাভাবিক মানুষজনের কাছে উন্মুক্ত যে সাধারণ জীবৎকালীন সুযোগ-সুবিধা, তার সমান সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। এজন্য যাদের চিকিৎসাগত প্রয়োজন মেটান যায় নি তাদেরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে। পরিণামবাদীরা সমান চিকিৎসা-পরিষেবা পাওয়ার জন্য সকলের প্রবেশাধিকার নিয়ে চিন্তিত নয়, তাদের লক্ষ্য এই সব পরিষেবার ভাল ফলের সর্বোচ্চায়ন। বোঝাই যাচ্ছে, এই তত্ত্ব স্বাস্থ্যের মতো সম্পদের সামগ্রিক উন্নতি নিয়ে ভাবিত, ব্যক্তিমানুষের অধিকার বা স্বাস্থ্য নিয়ে নয়। আমরা এখন সমতাবাদী এবং পরিণামবাদী যুক্তির ভিত্তিতে চিকিৎসা-পরিষেবা বণ্টনের ব্যাপারে অগ্রাধিকারের কয়েকটি ক্ষেত্র বিবেচনা করব।

বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসায় জিনগত গবেষণা যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ। অধিকাংশ রোগেরই একটা জিনগত দিক আছে। এইসব রোগের জেনেটিক মেকানিজমের উপর গবেষণা ক্যান্সার, হার্ট ডিজিজ সহ বিভিন্ন রোগের নিয়ন্ত্রণ তথা নিরাময়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। এইসব গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে অনেক মানুষজন উপকৃত হতে পারে। বর্তমানে প্রি-ন্যাটাল কেয়ার, উন্নততর স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, খাদ্যতালিকা এবং জীবনযাপন প্রণালীর মতো প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা থেকে আরো অনেক মানুষ উপকৃত হতে পারে। এইসব ব্যবস্থা বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের সংঘটনকে কমায় এবং সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেতে সাহায্য করে। এর থেকে এটাই উঠে আসে যে গবেষণা ও চিকিৎসা-পরিষেবার তুলনায় আমাদের রোগ-প্রতিরোধের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জীবনের শুরু থেকেই মানুষের চিকিৎসাগত প্রয়োজন মেটানোই উদ্দেশ্য। অন্য দিকে, গবেষণা ও চিকিৎসার উদ্দেশ্য মানুষের জীবনে বিভিন্ন সময় যেসব বিভিন্ন চিকিৎসাগত প্রয়োজন দেখা দেয় সেগুলিকে মেটানো। যদি গবেষণা ও চিকিৎসার তুলনায় প্রতিরোধ-ব্যবস্থায় বেশি মানুষের উপকার হয় তাহলে প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তবে এই অগ্রাধিকার চূড়ান্ত নয় এবং তা এটা প্রমাণ করে না যে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসাগত প্রয়োজনের যে দাবী তার কোন মূল্য নেই। তবে প্রতিরোধের পক্ষে যুক্তি, গবেষণা ও চিকিৎসার পক্ষে যুক্তির তুলনায় বেশি শক্তিশালী। এই যুক্তি সমতাবাদী

এবং পরিণামবাদী উভয়ই হতে পারে। রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করে এবং একইসঙ্গে সুযোগ-সুবিধার সর্বোচ্চায়ন ঘটায় এবং ক্ষতি ন্যূনতম করে। একই ধরনের যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যখন রোগের চিকিৎসা, নাকি গবেষণা — কোনটির অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত সে প্রসঙ্গ ওঠে। যেহেতু অনেক মানুষজন উপকৃত হয় তাই টিউবারকিউলেসিস এবং ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগের চিকিৎসাকে সিস্টিক ফাইব্রোসিস-এর মতো জেনেটিক রোগের উপর গবেষণার তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও জিনগত গবেষণার উপরে উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসার সম্ভাবনা নিহিত আছে।

এখন আমরা রুগ্ন ও স্বাস্থ্যবান — এই দুজনের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবার ব্যাপারে কাকে অগ্রাধিকার দেব সেই প্রশ্নটি বিচার করব। অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামান্য সুযোগ একজন অন্যরূপে স্বাস্থ্যবান (otherwise healthy) ব্যক্তির বৃহত্তর সুযোগের তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন পরিস্থিতি আছে যেখানে এই দাবীকে সমর্থন করা যায় না। যখন এমন এক পরিস্থিতির আর্বিভাব ঘটে যেখানে অন্যরূপে স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ-সুবিধা না দিলে তার অবস্থা বর্তমানে অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থার তুলনায় আরও খারাপ হবে, তখন আমাদের কথিত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির সুযোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাই অপেক্ষাকৃত খারাপ রোগীর পক্ষে অগ্রাধিকারের নীতিটি চূড়ান্ত নয়। অধিকন্তু, যখন অপেক্ষাকৃত বেশী অসুস্থ কোন ব্যক্তি চিকিৎসা পরিষেবা থেকে কোন লাভ উঠাতে পারে না এবং যেখানে তাকে পরিষেবা দিতে গেলে অন্য একজন ব্যক্তি, যে অসুস্থ নয়, অথচ তার থেকে উপকৃত হতে পারে, তখন অপেক্ষাকৃত অসুস্থ ব্যক্তির অগ্রাধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব হারায়। এই শেষোক্ত অভিমতের পক্ষে আমরা ICU (Intensive Care Unit) - পরিষেবার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। সমতাবাদীরা বলবেন, প্রতিটি রোগী যাদের জীবন-সংশয় আছে তাদের প্রত্যেকেই ICU সুবিধা পাওয়ার সমান অধিকার আছে। কিন্তু ICU পরিষেবা ব্যবস্থাটি সীমিত, তাই সকলকে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। যাঁরা সব থেকে খারাপ রোগীর অগ্রাধিকার দেওয়ার কঠোর নীতিতে বিশ্বাস করেন, তাঁরা বলবেন সব থেকে খারাপ অবস্থা যে রোগীর তাকেই সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু এতে যে পরিণাম বা ফলাফল ঘটবে তা মেনে নেওয়া যায় না। যদি কোন রোগী এতটাই অসুস্থ হয় যে অন্য রোগীর তুলনায় তার চিকিৎসার অগ্রাধিকার দেওয়া হোক বা না হোক সে বাঁচবে না তাহলে সেই রোগীকে অগ্রাধিকার দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। এখানে অগ্রাধিকার দেওয়া বা রেশনিং-এর ব্যবস্থা করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের ব্যাপারটি সরিয়ে রেখেও আমরা বলতে পারি সীমিত ICU পরিষেবা রোগীদের স্বাস্থ্যের সর্বোচ্চায়নের জন্যই ব্যবহার করা উচিত। এই লক্ষ্য নিছক রোগীকে বেঁচে থাকতে সক্ষম করার মাধ্যমেই অর্জিত হবে তা নয়, তাদেরকে স্বাভাবিক সক্ষমতা পর্যায়ে ধরে রাখাও লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে। যে রোগী চিকিৎসা থেকে উপকৃত হতে পারে তারই সুযোগ পাওয়া উচিত, আর যার কোন উপকার পাওয়ার আশা নেই তার সুযোগ না পাওয়াই উচিত। ইহা যেকোন সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ রোগীর ICU পরিষেবার চূড়ান্ত অধিকার আছে - এই দাবীকে দুর্বল করে দেয়। যখন আমরা বলি কোন রোগীর পরিষেবার সুযোগ পাওয়া উচিত তখন আমরা অস্পষ্টভাবে হলেও ধরে নিই যে এই পরিষেবা থেকে সে অন্ততঃ কিছুটা উপকৃত হবে। কিন্তু যেখানে কোনরূপ উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা নেই যেখানে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি গুরুত্ব হারায়। এ প্রসঙ্গে আমরা রবার্ট ট্রুগ (Robert Truog) -এর বক্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি, 'A strategy that seeks to maximize the health benifits available from scarce ICU

resources may therefore be justified in overriding the right of the individuals to demand unlimited access to resources from which they are very unlikely to benefit.'

এখানে সব মানুষের এক শোভন ন্যূনতম মাত্রার পরিষেবা (a decent minimum of care) পাওয়া উচিত, যা তাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতাকে নিশ্চিত করবে - এই ধরণাটি সমতাবাদী ন্যায়তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থার যাবতীয় মৌলিক সুযোগ, অ্যান্টিবায়োটিকস্, জরুরী পরিষেবা, শল্য-চিকিৎসা পরিষেবা এবং কোনো সাধারণ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা-পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ রোগীদেরকে সুস্বাস্থ্য একটি যুক্তিযুক্ত স্তরে রাখতে সমর্থ করবে। তথাপি, কিছু শর্ত আছে যা মানুষ-জনকে এই শোভন ন্যূনতম পরিষেবা পাওয়া থেকে বিরত করে। যেসব ব্যক্তিদের কোনো ধরনের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে বা কোন বিশেষভাবে অসমর্থ মানুষজন এই নূন্যতম পরিষেবা পেতে সমর্থ হয় না, আবার অতি-বৃদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক সক্ষমতা থাকে না। তবে এই দুই দলের মানুষজনই দুঃখ-কষ্ট উপশমকারী চিকিৎসা থেকে উপকৃত হতে পারে।

যখন বিভিন্ন দলের মানুষজনের ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা প্রয়োজন হয় তখন পরিষেবা বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখানে কোনো কোনো জায়গায় চিকিৎসার সম্ভাব্য সুফলের ভিত্তিতে রোগীদের মধ্যে র‍্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়। প্রাথমিক পরিষেবার অতিরিক্ত পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসা না করানোর তুলনায় চিকিৎসা পরিষেবা দিলে যে উন্নতি ঘটবে তার নিরিখে এই র‍্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই র‍্যাঙ্কিং জীবনের বিস্তৃতিকাল এবং জীবনের গুণগতমান, যা চিকিৎসা পরিষেবা থেকে পাওয়া যেতে পারে, তার ভিত্তিতে করা হয়। রোগীদের জীবন বাঁচানো এবং তাদেরকে স্বাভাবিক সক্ষমতার পর্যায়ে রাখার পদ্ধতি প্রকরণগুলি র‍্যাঙ্কিং-এর প্রথম দিকে রাখা হয় এবং যে পদ্ধতি প্রকরণগুলি কেবল নামমাত্র উপকার দেয় সেগুলোকে র‍্যাঙ্কিং-এর নীচের দিকে রাখা হয়। তবে এখানে পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং বিচারের ন্যায্যতা সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

তবে কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, এই ধরনের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক এবং অসমর্থদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে, যেহেতু বয়স্করা অনেকদিন বেঁচে আছে এবং তাদের কম-বয়সীদের তুলনায় বেশি চিকিৎসার প্রয়োজন, তাদের চিকিৎসার নীট উপকার কম বয়সীদের চিকিৎসার নীট উপকারের তুলনায় কম হয়। সাধারণভাবে চিকিৎসার দৌলতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত জীবৎকালের পরিমাণ ও গুণ বৃদ্ধদের তুলনায় কম-বয়সীদের অনেক বেশি। একই রকমভাবে প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের তুলনায় কম দিন বাঁচে। কেউ কেউ অবশ্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত মানুষজনের জীবনের গুণগত মানের কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র অর্থ করার পক্ষপাতী। এসব ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার স্থির করার জন্য যে মানদণ্ডটি ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় গুণ-সমন্বিত জীবন-বর্ষ (Quality Adjusted Life-Years)।

৪.৩ গুণ-সমন্বিত জীবন-বর্ষ (Quality Adjusted Life-Years : QALYs) :

অর্থনীতিবিদরা বিগত শতাব্দীর আটের দশকে গুণ-সমন্বিত জীবন-বর্ষ, সংক্ষেপে QALYs, এর ধারণার অবতারণা করেন। চিকিৎসার মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করার খরচের তুলনায় কার্যকারিতা (cost-effectiveness) পরিমাপ করার জন্য। QALYs চিকিৎসার মাধ্যমে পাওয়া অতিরিক্ত জীবন-বর্ষের

মূল্য নিরূপণ করে, অবশ্যই গুণগত মানের কথা মাথায় রেখে। একটি গুণ-সমন্বিত জীবন-বর্ষ বলতে বোঝায় স্বাস্থ্যকর জীবন-প্রত্যাশার একটি বছর, যার সংখ্যাগত মূল্য হবে ১। কিন্তু অ-স্বাস্থ্যকর জীবন-প্রত্যাশা একটি বছরের সংখ্যাগত মূল হবে ১-এর কম (< ১)। একজন অসুস্থ মানুষের জীবনের গুণগত মান যত খারাপ হবে, একটি QALY-এর মূল্য তত কম হবে। নীতিগতভাবে একটি QALY নঞর্থক হতে পারে এই অর্থে যে কারোর জীবনের গুণগতমান তার মারা যাওয়ার তুলনায় আরো খারাপ হতে পারে। করোনারী আর্টারির বাইপাস সার্জারী হয়েছে এমন ব্যক্তি স্বাভাবিক কর্মক্ষম থাকতে পারেন, তাঁর উচ্চমানের QALY আছে। এই সার্জারী একজন ব্যক্তির জীবন রক্ষা করে এবং বেশ কয়েক বছর গুণমানযুক্ত জীবৎ-কাল নিশ্চিত করে। বিপরীতে সেরিব্রাল অ্যানিউরিজম (Cerebral aneurysm) -এর জন্য নিউরো-সার্জারী, সাংঘাতিক বৌদ্ধিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, তা সংশ্লিষ্ট রোগীকে গুণমানের দিক থেকে নঞর্থক জীবন-বর্ষ সরবরাহ করে। প্রথম ক্ষেত্রে QALY বেশী হবে যদি রোগী কম বয়সী হয়, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোগী যদি কম বয়সী হয় তাহলে QALY কম হবে।

জন হ্যারিস যুক্তি দিয়েছেন যে QALYs -এর ধারণাটি বৃদ্ধদের প্রতি পক্ষপাত করে, যেহেতু কমবয়সী মানুষজন চিকিৎসার ফলে অনেক বেশী বছর বাঁচার সম্ভাবনা তৈরী হয়। প্রতিবন্ধী মানুষজনও একই ধরনের অভিযোগ তুলতে পারে। গড়পড়তা তাদের জীবন কমবয়সী স্বাস্থ্যবান মানুষের তুলনায় সংক্ষিপ্ত ও কষ্টকর হয়। শুধু তাই নয়, QALYs এই বিষয়টি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয় যে জীবনের গুণগত মানের হিসাব-নিকাশ মানুষে মানুষে আলাদা হতে পারে। তারা জীবনের গুণগত মানের মধ্যে যে একটি আবশ্যিক ব্যক্তিগত উপাদান আছে সেটিকে অবহেলা করে। একজন প্রতিবন্ধী মানুষ বলতে পারেন তার জীবনের গুণগত মান খুবই ভাল, যদিও একজন স্বাস্থ্যবান মানুষ তার বিচারের সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। এই বিষয়টি আমাদের প্রত্যাশিত উপকারের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য-পরিষেবার ব্যাপারে অগ্রাধিকার স্থির করার ধারণায় ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যদি কোনো চিকিৎসা QALYs কম হয় এই অর্থে যে চিকিৎসার নীট উপকার খুবই কম এবং তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাস্থকর জীবন প্রত্যাশার শোভন নূন্যতম পর্যায় তুলে আনবে না, তাহলে সেই চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার না দেওয়াই উচিত। কিন্তু এই বিচারে বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একইসঙ্গে যে ধরনের চিকিৎসা কেবল দুঃখ-কষ্ট কমায়, ক্রিয়াশীলতা নগণ্য মাত্রায় বাড়ায় সেগুলি QALYs মাপকাঠিতে বিশেষ গুরুত্ব পায় না। কিন্তু বয়স্ক প্রতিবন্ধীরা এই চিকিৎসাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে পারেন। এই সব বিষয়গুলির কথা মাথায় রেখে তাই এখানে হ্যারিস 'দ্বিমুখী বিপদ' ('double jeopardy') -এর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে, QALYs এই নির্দেশ দেয় যে যেহেতু কোনো ব্যক্তি একবার কোনো বড় বিপর্যয়ের শিকার হয়েছে, সেহেতু আমরা তার দ্বিতীয়, সম্ভবত আরো বড় ধরনের, দুর্ভাগ্যের ব্যবস্থা করব। প্রথম বিপর্যয়ে তার জীবনের মান অনেক নিম্নগামী হয়েছে এবং এখন QALYs এর মাপকাঠি অনুসারে সে জীবনদায়ী চিকিৎসা পাবার যোগ্য হবে না। ফলতঃ সে দ্বিমুখী বিপর্যয়ের মুখে পরে। হ্যারিসের ভাষায় "The first disaster leaves her with a poor quality of life and QALYs then require that, in virtue of this, she be ruled out as a candidate for life-saving treatment, or at lest,

that she be given little or no chance of benefiting from what little amelioration her condition admits of." স্পষ্টতই QALYs এর এই ধারণা অন্ততঃ দুই-দলের মানুষজনের (বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের) প্রয়োজন এবং জীবনের মূল্যকে উপযুক্তভাবে বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিকল্প হিসাবে আমরা অক্ষমতা-সমন্বিত জীবন-বর্ষ (Disability - Adjusted Life-Years : DALYs) -এর ধারণা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এখানে উন্নত গুণমানের জীবন-বর্ষের সংখ্যা বাড়ানোটা উদ্দেশ্য হয় না, উদ্দেশ্য হয় চিকিৎসা ছাড়া একজনের যে অক্ষমতা যুক্ত জীবন-বর্ষ তৈরী হতে পারে তার সংখ্যা কমানো। তবে চিকিৎসার পরেও যাদের অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হবে না সেইসব রোগীর ক্ষেত্রে DALYs স্পষ্টতই কোনো কাজে আসে না।

এখানে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া উচিত তা হল অগ্রাধিকারের নীতিটি শর্তাধীন, চূড়ান্ত নীতি নয়। এটা নির্ভর করে এই ব্যবস্থা রোগীদের কতটা উপকার করবে শুধু তার উপরেই নয়, তাদের জন্য যে স্বাস্থ্য-সম্পদ ব্যবহার করা হবে তা সেইসব ব্যক্তি, যাদেরকে শোভন ন্যূনতম স্বাস্থ্যে উন্নীত করা যায় তাদের জন্য ব্যবহার্য পরিষেবাকে সীমায়িত করে কিনা তার উপরেও। চিকিৎসার লক্ষ্য এবং প্রয়োজন অনুসারে আমাদের চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে পার্থক্য করা উচিত, এবং তার ভিত্তিতে পরিস্থিতি বিচার করে তা বণ্টনের ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু যেহেতু আমাদের স্বাস্থ্য সম্পদ বা পরিষেবা সীমিত, তাই কোন্ লক্ষ্য বা প্রয়োজনকে লাভ করা বা মেটানো সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি নির্দিষ্ট করে অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা ওয়াল্টার গ্লাননকে উদ্ধৃত করে অগ্রাধিকার সংক্রান্ত আলোচনা এখানেই ইতি টানছি: "Ideally, an allocation system could be devised in which we could both ensure a decent minimum of health care for all people and meet the special needs of the elderly and disabled."

৪.৪ বয়স-ভিত্তিক বরাদ্দ-ব্যবস্থা (Age-Based Rationing) :

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখেছি বয়স্কদের তুলনায় কমবয়সীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে। এই ভাবনার পেছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে তা হল একজন বৃদ্ধ এ পর্যন্ত যত বছর বেঁচেছেন একজন যুবককে অন্ততঃ তত বছর সুষ্ঠুভাবে বাঁচার সুযোগ দেওয়া উচিত। ন্যায্য বিচার দাবী করে যে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তির তুলনায় চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়ার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে, যাতে করে সে প্রথম ব্যক্তির সমানজীবনকাল পূর্ণ করতে পারে। এই ভাবনা সমগ্র জীবৎকালের প্রেক্ষিতে মানুষের প্রয়োজন (একটি বিশেষ সময় বা জীবনের কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ের প্রয়োজনের তুলনায়) বণ্টনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কালগত পরিকাঠামো সরবরাহ করে। ওয়াল্টার গ্লানন (Walter Glannon) -এর ভাষায়, "This view is based on the belief that people's needs over an entire lifetime, rather than at particular times or stages of their lines, should provide the temporal framework for allocation decisions."

নরম্যান ড্যানিয়েলস্ 'বিচক্ষণ জীবন-কাল হিসাব' (prudential lifespan account) এর প্রস্তাব করেছেন যার মধ্য দিয়ে কমবয়েসী এবং বৃদ্ধদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পদ তথা পরিষেবার ন্যায্য বন্টনের একটি নীতি পাওয়া যাবে। ড্যানিয়েলসের মতে, ন্যায্যতার নীতি কোনো এক বিশেষ জীবন-পর্বে প্রযোজ্য নয়, সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি আমাদেরকে এমন একজন বিচক্ষণ নির্বাচকের কল্পনা করতে বলেছেন যিনি তার সারা জীবনের স্বাস্থ্য-বাজেটের চিন্তা করতে বসেছেন। ধরে নেওয়া যাক, তিনি তাঁর বর্তমান বয়স, লিঙ্গ, মূল্যবোধ এবং নিজের সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ কোন তথ্য জানেন না। তিনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য বাজেটটাকে কিভাবে বণ্টন করবেন! বিচক্ষণতা দাবী করে যে একজন ব্যক্তি তার জীবনকে একটি কালগত সমগ্র হিসেবে ভাবুক। স্বাস্থ্য-পরিষেবা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হবে - সেই প্রশ্নটি তখন একজনের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য বরাদ্দ বাজেটকে কিভাবে বণ্টন করা যাবে - এই প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়।

ড্যানিয়েলের এই বিবরণে অন্ততঃ দুটি সমস্যা দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমত, সব ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বাঁচবেন না, তাই যে বিচার-ধারায় জীবনের সব পর্যায়কে সমান গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় সেই বিতরণ কর্মসূচী যাঁরা আগে মারা যাবেন তাঁদের কাছে অদূরদর্শী মনে হবে। তাঁরা স্বাস্থ্যের জন্য যে অর্থ জমিয়েছেন তা খরচ করতে সমর্থ হবেন না। দ্বিতীয়ত, বিচক্ষণতা সমগ্র জীবৎকালে ভালো-থাকাকে সর্বোচ্চায়নের চেষ্টা করে। যখন রুগ্ন স্বাস্থ্য সামগ্রিক জীবৎকালীন ভালো থাকাকে নষ্ট করতে পারে তখন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের তুলনায় তা খরচ করতে আমাদের বেশি প্রণোদিত করে। ধরা যাক, একজন ব্যক্তি জীবনের নিম্ন গুণগতমান নিয়ে বহু বছর অসুখে ভুগছেন। আর একজন ব্যক্তি ঐ একই বছরগুলিতে সুস্থ সবল রয়েছেন। দুজনই তীব্র শারীরিক কষ্ট নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এলেন। বিচক্ষণ জীবৎকাল হিসাব অনুযায়ী যার জীবনের গুণগত মান নিম্নস্তরের তার চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই সিদ্ধান্ত আপত্তিকর মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের বর্তমান অবস্থাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়া যথোচিত মনে হয় না। আসলে জীবনের একটা বিশেষ পর্যায়ে চিকিৎসার প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত-এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই সমস্যা আছে।

ড্যানিয়েল কালাহান (Daniel Callahan) এই সমস্যার সমাধান কল্পে দুই ধরনের চিকিৎসাগত পরিষেবার মধ্যে পার্থক্য করার প্রস্তাব দিয়েছেন। কম বয়েসিদের প্রয়োজন এবং বৃদ্ধদের প্রয়োজন এই দুই ধরনের প্রয়োজনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কালাহান প্রশ্ন তুলেছেন, বিভিন্ন এই দুই গ্রুপের মানুষজনের চিকিৎসাগত সুযোগ পাওয়ার দাবী কতটা যুক্তিযুক্ত। এই প্রশ্নটি, আমাদের আরও বৃহত্তর, স্বাস্থ্য-পরিষেবা কিভাবে সমাজে কল্যাণবিধান করে? - এই প্রশ্নে পৌঁছে দেয়। কালাহান বয়োবৃদ্ধির একটি সংশোধিত বিচারধারার পক্ষে মত প্রকাশ করেন, যে বিচারধারা বৃদ্ধ এবং কমবয়েসি উভয়েরই উপকার করবে। বৃদ্ধদের প্রতি আমাদের সামাজিক দায় হল ৭৫ থেকে ৮০ বছরের সাধারণ জীবৎকাল যাতে সুস্থভাবে কাটাতে পারেন তার ব্যবস্থা করা। এই সময় কালের অতিরিক্ত সময়ে স্বাস্থ্যপরিষেবার উদ্দেশ্য থাকবে কেবল কষ্ট লাঘব করা, জীবনকে আরও বিস্তৃত করা নয়। এরজন্য বাড়িতে রেখে যত্ন নেওয়া, কষ্ট-উপশমকারী ওষুধ প্রয়োগ করা এবং উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। বৃদ্ধদের জন্য এরকম স্বাস্থ্য-পরিষেবা রেশনিং করার ফলে যে অর্থ জমবে তা কিশোর-তরুণদের একইরকম স্বাভাবিক জীবৎকাল পূর্ণ করতে পারে তার জন্য স্বাস্থ্য-পরিষেবা খরচ করা যেতে পারে।

ধরা যাক, দু'জন ব্যক্তির প্রত্যেকেরই জীবন-মরণের সমস্যা, প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ঔষধাদি প্রয়োজন, কিন্তু একজনকে বাঁচানোর মতোই যথেষ্ট ঔষধ আছে। একজন রোগীর বয়স ৫০, আরেকজনের বয়স ৪৫। আমরা তর্ক করতে পারি ৪৫ বছরের বয়স্ক ব্যক্তি ৫০ বছরের বয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় ৫ বছর কম জীবন উপভোগ করেছে, তাই তারই এই জীবনদায়ী ঔষধাদি প্রাপ্য। আমরা 'ফেয়ার-ইনিংস' - যুক্তির সূত্র ধরে এই দাবীকে সমর্থন করতে পারি। এই যুক্তিটি কালহানের প্রস্তাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। এই যুক্তি অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তি একটি স্বাভাবিক জীবৎকাল সম্পূর্ণ করার সমান দাবী থাকা উচিত। কম বয়েসিরা বৃদ্ধদের তুলনায় কম বছর জীবন উপভোগ করেছে, তাই এক্ষেত্রে কমবয়েসিরা বয়স্কদের তুলনায় চিকিৎসা-পরিষেবায় অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু ধরা যাক বৃদ্ধব্যক্তির কম বয়েসিদের মতোই বেঁচে থাকার তীব্র ইচ্ছা রয়েছে। তার এই ইচ্ছা যদি পূরণ করা না হয়, তাহলে ৪৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তির বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে যদি সুযোগ না দিলে হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় এই বৃদ্ধব্যক্তিও সেই একই রকমভাবে কষ্ট পাবে। ওষুধে প্রত্যেক রোগীরই সমান কাজ হবে, এদের কেউ-ই সাধারণ জীবৎকাল পূর্ণ করে নি, এদের মধ্যেকার বয়সের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয় — এইসব বিষয় ধরে নিলে ফেয়ার-ইনিংস যুক্তিটি এক্ষেত্রে তার গুরুত্ব হারায়।

বয়স্কব্যক্তির জীবতাত্ত্বিক বয়স (biological age) তার পঞ্জিকানির্দিষ্ট বয়স (chronological age) -এর তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেশী হতে পারে, যা কমবয়েসি ব্যক্তিদের পক্ষে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিকে সমর্থন করে। তৎসত্ত্বেও এটি চিকিৎসার সম্ভাব্য পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি পরিণামবাদী বিচার। চিকিৎসা-পরিষেবা ন্যায়সঙ্গত বণ্টনে পঞ্জিকা-নির্দিষ্ট বয়স একটি শর্ত হবে কি না — এই সমতাবাদী নীতির উপর বর্তমান কর্মনীতিটি ভিত্তিশীল হবে না। বয়স্কলোকেরা বেশীদিন জীবন উপভোগ করেছে, কমবয়েসিরা কম দিন, যখন বয়সের পার্থক্যটা তাৎপর্যপূর্ণ তখন অপেক্ষাকৃত কম বয়েসিদের অগ্রাধিকার দেওয়া ন্যায়সঙ্গত হবে। বয়সের পার্থক্য যে সব পরিকল্পনা জীবনে ভাল থাকার একটা যুক্তিসঙ্গত স্তরে পৌছতে সমর্থ করে সেইসব সুযোগ-সুবিধা পাওয়া তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যকে ইঙ্গিত করে। নিছক ৭৫ বা ৮০ বছর বাঁচাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল এই সব বছরের মধ্যে ব্যক্তি যেসব সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে সেটাই এখানে গুরুত্ব পায়। সেখানে বয়সের পার্থক্য খুবই কম সেখানে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। কিন্তু এটা স্পষ্ট নয় একজন অন্যের তুলনায় ৫ বছর বেশী বেঁচেছে বলে সে বেশী সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। যদি দুটি ব্যক্তির বয়সের দিক থেকে পার্থক্য খুব কম হয় (যেমন আলোচ্য ক্ষেত্রে) তখন অন্যসব বিষয় সমান হলেও চিকিৎসার জন্য একজনকে বাদ দিয়ে অন্য জনকে নির্বাচন করার মধ্যে কোন সিদ্ধান্তকারী যুক্তি নেই।

৪.৫ অঙ্গ-প্রতিস্থাপন (Organ Transplantation) :

অঙ্গ-প্রতিস্থাপন বোধ হয় সব থেকে স্পষ্ট একটি দৃষ্টান্ত যা দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা সম্পদের একটি ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকরী বরাদ্দনীতির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের জন্য উপযুক্ত অঙ্গ পাওয়া খুবই কঠিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি হিসাব অনুসারে ২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে ৮৩,৪৭২ জন মানুষ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করছিল। ২০০৩ সালের জানুয়ারী থেকে অক্টোবরের মধ্যে ১৯,১০১ জনের অঙ্গ প্রতিস্থাপন

সম্পন্ন হয়েছিল। এই একই ১০ মাস সময়কালের মধ্যে জীবিত এবং সদ্যোমৃত দাতার কাছ থেকে ৯,৮৪৫ টি অঙ্গ সংগৃহীত হয়েছিল। চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই ফারাকের কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মার্কিন নাগরিক অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের জন্য অপেক্ষা করে মারা যায়।

এই সমস্যাটি সামাল দেওয়ার জন্য ইউনাইটেড নেটওয়ার্ক ফর অর্গান শেয়ারিং (UNOS) এক বরাদ্দ-ব্যবস্থা চালু করেছে, যা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কার্যকারিতা ও ন্যায্যতার নীতির উপর ভিত্তিশীল। এর উদ্দেশ্য মানুষের অঙ্গের প্রয়োজনের দাবীকে সম্মান জানান এবং একইসঙ্গে অঙ্গ -প্রতিস্থাপনে সুফল যাতে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা। ন্যায়পরতার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যারা সব থেকে বেশী অসুস্থ এবং নতুন অঙ্গ-প্রতিস্থাপন ব্যতিরেকে যারা অতি শীঘ্র মারা যাবে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কেননা তাদের প্রয়োজনই সব থেকে জরুরী। সব থেকে অসুস্থ রোগীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিটি সমতাবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এমন কি এখানেও আমাদের হঠাৎ এক সময়ে অসুস্থ হয়ে যাওয়া রোগী এবং অনেক দিন ধরে অসুস্থ থাকা রোগীর মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। যে ব্যক্তি বহুদিন ধরে অসুস্থ আছে সে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে যে হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছে সেই রোগীর তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। এখন-অসুস্থ-হয়ে-পড়া রোগীর তুলনায় যে বহুদিন ধরে অসুস্থ আছে, যার অবস্থা এতই খারাপ যে অতি সত্তর তা মারাত্মক হয়ে যেতে পারে প্রয়োজনীয় অঙ্গ প্রতিস্থাপন না হলে, সেখানে প্রথম ব্যক্তি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে। তবে কোন্ রোগী অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাবে তা শুধুমাত্র জরুরী প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে না, রোগীর অবস্থা এবং অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্য ফলাফল এখানে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোন রোগীর ক্ষেত্রে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্য ফলাফল খুবই সদর্থক হতে পারে, যেখানে অন্য জনের ঐ চিকিৎসা সফল হবে কিনা সে সম্পর্কে সংশয় আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কার্যকারিতার বিবেচনায় প্রথম ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, দাতার রক্ত ও দেহকলা (টিস্যু)-র টাইপ যদি গ্রহীতার রক্ত এবং টিস্যু-টাইপের সাথে মেলে তবেই সেই প্রতিস্থাপন বাস্তবিক কার্যকরী হবে। এর থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে প্রয়োজনই এখানে একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিবেচনার বিষয় নয়। একজন রোগীর অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের খুবই প্রয়োজন এবং এই অঙ্গ -প্রতিস্থাপন করতে না পারলে অন্য রোগীর তুলনায় সে আগে মারা যাবে। এখন, যে অঙ্গ দাতার কাছ থেকে পাওয়া গেছে তা হয়ত বেশি প্রয়োজনযুক্ত রোগীর রক্ত বা টিস্যুর টাইপের সাথে মেলে না, যদিও দ্বিতীয় রোগীর সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়জনকে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যদিও বিভিন্ন গবেষণার দৌলতে বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহার করে রক্ত ও টিস্যু মাচিং-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে অনেকে দাবী করেন, তথাপি এই ম্যাচিং এখনও পর্যন্ত অঙ্গ-প্রতিস্থাপনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বলেই মনে করা হয়। আবার কোন রোগীর যদি দুটি অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়ে তাহলে অন্য একজন রোগী যার একটিমাত্র অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন তার তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে। একজন রোগী যার হৃৎপিণ্ড ও যকৃৎ দুটোরই প্রতিস্থাপনের দরকার সে ওয়েটিং লিস্টে অন্যদের তুলনায় পরের দিকে থাকলেও সে অগ্রাধিকার পাবে অন্য দুইজন রোগীর তুলনায়, যাদের কেবল হৃৎপিণ্ড বা একটি লিভারের প্রতিস্থাপন প্রয়োজন। এই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এই যুক্তিতে যে দ্বিতীয়োক্ত দু'জন রোগীর তুলনায় প্রথমজনের অঙ্গ-প্রতিস্থাপন না হলে সে অনেক আগে মারা যাবে। এখানে প্রথমোক্ত রোগীটির প্রয়োজন দ্বিতীয়োক্ত দুই রোগীর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক

বেশি জরুরী। যদিও পরিণামবাদী যুক্তিতে দুজনের পরিবর্তে একজনকে বাঁচানোর যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তথাপি এই রোগীকে অগ্রাধিকারের পক্ষে সমতাবাদী বিবেচনাটি হল অঙ্গ-প্রতিস্থাপন ছাড়া সে অন্য দুইজন রোগীর আগেই তাড়াতাড়ি মারা যাবে।

একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৯৩ সালে পেনসিলভ্যানিয়ার গভর্ণর রবার্ট ক্যাসির ক্ষেত্রে। অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের এই দৃষ্টান্তটি বিতর্কিত। অনেকে মনে করেন গভর্ণর ক্যাসি তার সামাজিক মর্যাদার দৌলতে ওয়েটিং লিস্টে থাকা অন্যান্য রোগীদের পিছনে ফেলে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সুযোগ নিয়েছেন। ক্যাসি অ্যামাইলোইডোসিস (Amyloidosis) নামক বংশগতভাবে প্রাপ্ত একপ্রকার হার্টের রোগে ভুগছিলেন। এই রোগে লিভারে একটা প্রোটিন তৈরী হয় যা অন্য অঙ্গগুলিকে দুর্বল করে দেয় এবং একই সঙ্গে হৃদপিণ্ডের দেওয়ালে তা আটকে গিয়ে হার্ট-ফেলিওরের অবস্থা সৃষ্টি করে। ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর হার্ট-অ্যাটাক হয় এবং এর জন্য চারবার বাইপাস সার্জারী করা হয়। ১৯৯৩ সালে তাঁর অবস্থা এতটাই খারাপ হয় হার্ট-লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য ওয়েটিং লিস্টে তাঁর নাম ঢোকানো হয়। ক্যাসির আগে একই ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে তালিকায় হার্ট-প্রতিস্থাপনের জন্য ছ'জন এবং লিভার প্রতিস্থাপনের জন্য দুইজন রোগী ছিলেন। তথাপি ক্যাসি অন্যদের টপকে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের সুযোগ পান। ওয়েটিং লিস্টে থাকা অন্য রোগীদের অবস্থা ক্যাসির মতো সংকটজনক না থাকায় এবং প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের জন্য পরবর্তী সময় পর্যন্ত তিনি হয়ত বেঁচে থাকবে না - এই দুই বিবেচনায় তাকে আগে সুযোগ দেওয়া কর্তৃপক্ষ অন্যায় মনে করেন নি।

তবে, কোনো এক জরুরী চিকিৎসা পরিষেবার জন্য একজন ব্যক্তিকে বারবার সুযোগ দেওয়া অন্যায় হবে, যদি তা অন্য ব্যক্তিদের একবার সুযোগ পাওয়াকে অসম্ভব করে তোলে। কেউ এই দাবীকে সমর্থন করতে পারেন এই বলে যে প্রথম বার প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছে এমন ব্যক্তি, এবং অনেক বার প্রতিস্থাপনের সুযোগ পাচ্ছে এমন ব্যক্তি, একই নৈতিক অবস্থানে থাকবে কেবল যদি একজন মানুষের চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনকে একটা নির্দিষ্ট সময়-কালের প্রয়োজন হিসাবে বিচার করা হয়। এই বিচারে প্রয়োজনের আগেকার দাবী এবং এই দাবী মেটানোর আগেকার প্রচেষ্টাগুলি এখানে নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক নয়।

যাই হোক, গভর্ণর ক্যাসি অগ্রাধিকার পেয়েছিলেন যে বরাদ্দ-নীতির সূত্র ধরে তা এক বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য যাঁরা প্রতিস্থাপনের দাবীদার ছিলেন তাঁরাও ঐ একই ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে ক্যাসি-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছিলেন। এখন, বরাদ্দ-ব্যবস্থাটি যদি জাতীয় স্তরের হ'ত তাহলে তিনি হয়ত এত তাড়াতাড়ি অঙ্গ পেতেন না। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল প্রাক্তন বেসবল প্লেয়ার মিকি ম্যান্টেল-এর ক্ষেত্রে। ম্যান্টেল ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখানো মাত্রই এই সুযোগ পান। এটা সম্ভব হয়েছিল, কারণ ডালাস অঞ্চলে যে যকৃত-বণ্টনের ব্যবস্থা ছিল তা ছিল অঞ্চল ভিত্তিক। ম্যান্টেল-এর ব্লাড-টাইপ, তাঁর অসুস্থতার গুরুত্ব এবং ঐ অঞ্চলে লিভার প্রতিস্থাপনের সীমিত সংখ্যা — এইসব কিছু মিলিয়ে তিনি সবার আগে সুযোগ পেয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর আগে সুযোগ পাওয়াটা অন্যায় ছিল না। তবে নীতিতাত্ত্বিকরা মনে করেন, অন্যান্য অঞ্চল থেকে অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের দাবীদার রোগীদেরকে টপকে এখানে স্থানীয় রোগীকে অগ্রাধিকার দেওয়া যথোচিত নয়। একজন রোগী কোথায় বাস করে তা রোগীর শারীরিক অবস্থা তথা চিকিৎসার প্রয়োজনের প্রশ্নে প্রাসঙ্গিক নয়। তাই চিকিৎসাগত প্রয়োজনের নিরিখেই অগ্রাধিকার স্থির করা বাঞ্ছনীয়।

গভর্ণর ক্যাসি বা মিকি ম্যান্টেলের মতো কারোর সামাজিক মর্যাদা অঙ্গ-পাওয়ার ব্যাপারে নির্ণায়ক শর্ত হওয়া উচিত নয়। সাধারণভাবে এটা স্পষ্ট নয় যে, কোনো ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করে বা সম্মান করে মানেই তাকে রক্ষা করা জরুরী। তবে এমন কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র আছে যেখানে ব্যক্তির সামাজিক মূল্য অঙ্গ-বিতরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। তবে, সেক্ষেত্রগুলি নৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক হবে তখনই যখন একজন ব্যক্তির বেঁচে থাকার উপরে অনেক মানুষজনের বাঁচা-মরা নির্ভর করে। নেলসন ম্যাণ্ডেলার যকৃৎ প্রতিস্থাপনের দৃষ্টান্তটি এই সূত্রে বিচার্য হতে পারে। ১৯৯২ সালে ম্যাণ্ডেলার লিভার প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এটা এমন একটা অবস্থা ছিল যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে তিনি দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গণতন্ত্রের পথে এই যাত্রা ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ, কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই উদ্বায়ী। সেই সময় সামাজিক সুস্থিতির জন্য ম্যাণ্ডেলার উপস্থিতি ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। এই সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার কথা মাথায় রেখে একজন কমবয়সী রোগীকে টপ্‌কে ম্যাণ্ডেলাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ম্যাণ্ডেলার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং তৎকালীন পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখলে কমবয়সী এক যুবককে টপকে ম্যান্ডেলার অঙ্গপ্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করাটা নীতিবিরুদ্ধ হয় না।

অঙ্গ-প্রতিস্থাপন সম্পর্কিত আরও একটি বিতর্কিত বিষয় হল, প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন যেখানে লাইফ-স্টাইল পছন্দ থেকে উদ্ভূত হয়, যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই দায়ী, সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার না দেওয়াটা কি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো ব্যক্তির মদ্যপানজনিত নেশার কারণে যকৃত নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে ঐ ব্যক্তি স্বয়ং এর জন্য দায়ী। তিনি যদি তার লাইফ-স্টাইল পরিবর্তন করতেন তাহলে তাঁর এ অবস্থা হত না। যদি কেউ স্বয়ং দায়ী হয়, তাহলে যকৃত প্রতিস্থাপনের ব্যাপারে অন্যদের (যারা এই ঘটনার জন্য নিজেরা দায়ী নয়) তুলনায় অগ্রাধিকার পাবে না — এই ভাবনাটি স্বাস্থ্য পরিষেবার 'বিচক্ষণ জীবৎ-কাল বিবরণে'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যখন আমরা জীবনের সব পর্যায়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজন পরিকল্পনা করার ব্যাপারে দায়বদ্ধ তখন আগেকার কর্মের জন্য পরবর্ত্তীকালে তার পরিণামের জন্য দায়ী থাকি। মদের নেশা থেকে জীবনের শেষ পর্যায়ে লিভারের অসুখ এমন একটি ঘটনা যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেই দায়ী। যদি কেউ তার অবস্থার জন্য নিজেই দায়ী হয় তাহলে যকৃত প্রতিস্থাপনসহ স্বাস্থ্য-সম্পদের সুযোগ পাওয়ার ব্যাপারে ঐ ব্যক্তির দাবী দুর্বল হবে। তবে নিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বের প্রশ্নটি এখানে চূড়ান্ত বিবেচনা করা ঠিক নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো অঙ্গের বৈকল্যের জন্য দায়ী হন তাহলে ঐ অঙ্গ-প্রতিস্থাপনের জন্য দাবী অগ্রাধিকার না পেতে পারে, কিন্তু তাকে বিবেচনা থেকে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

এই অবস্থানের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ হল, আমাদের স্বাস্থ্য বংশগতি বা সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো শর্তের উপর নির্ভর করে, যার উপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। কেউ কেউ বলতে পারেন, কারোর মধ্যে মদ্যপানের জিনগত প্রবণতা থাকতে পারে। আবার কেউ অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ তথা অভাবের কারণে মদ্যপানে আসক্ত হয়েছে। যেসব ব্যক্তি এই ধরনের অবস্থার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে তাদের এই ধরনের লাইফ-স্টাইলগত রোগ হওয়ার সম্ভাবনা যারা অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশ তথা জেনেটিক মেকাপ-যুক্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের তুলনায় বেশী। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, ব্যক্তি সর্বতোভাবে বাহ্যিক শর্তনির্ভর, নিজের স্বাস্থ্যের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এই ধরনের রোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অন্ততঃ কিছু

পরিমাণে যে দায়ী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই এই ধরনের রোগের চিকিৎসা পাওয়ার ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় তাদের দাবী কম গুরুত্ব পাবে - এই বিচার অমূলক নয়।

এতৎ সত্ত্বেও এইসব ব্যক্তিরা যখন চিকিৎসার প্রয়োজনে হাসপাতালে আসে তখন তাদের চিকিৎসাগত প্রয়োজনকে সমান গুরুত্ব না দেওয়াটা এক ধরনের শাস্তিদান বলেই মনে হয়। কিভাবে তাদের রোগ সংঘটিত হয়েছে এ ব্যপারটি পাশে সরিয়ে রেখে তাদের নির্দিষ্ট প্রয়োজনে আমাদের সাড়া দেওয়াটাই নীতিগতভাবে যথোচিত বলে অনেকে মনে করেন। সেটা না করাটা তাদের 'দ্বিমুখী বিপদ' (double jeopardy)-এর মধ্যে ফেলে দেওয়া।

তবে চিকিৎসা-সম্পদ তথা পরিষেবা যদি দুষ্প্রাপ্য না হত এবং তার জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থার প্রয়োজন না হত তাহলে অগ্রাধিকারের প্রশ্নটি উঠত না। কিন্তু যেহেতু সত্যি সত্যি এই ধরনের সম্পদ খুবই দুষ্প্রাপ্য, সেই জন্য আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দায়িত্বের মতো বিষয়গুলিকেও ন্যায়সংগত বরাদ্দ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োগ করতে হয়।

৪.৬ দ্বিস্তরীয় স্বাস্থ্য-পরিষেবা (Two-tierd Health Care) :

এক ভদ্রস্থ ন্যূনতম স্বাস্থ্যপরিষেবার এবং স্বাস্থ্য-পরিষেবার সকলের সমান সুযোগের অধিকার সমতাবাদী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণকে মৌলিক পরিষেবা দিতে অস্বীকার করা এবং সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনের সুযোগ না দেওয়াটা অন্যায়, কেননা এর অর্থ জনসাধারণের মৌলিক চাহিদাকে পূরণ না করা। তবে উপযুক্ত পরিষেবার অতিরিক্ত সেবার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার বিষয়টি তত বেশী গুরুত্ব পায় না। ন্যায্যতা বা সুবিচার নির্ভর করে অপেক্ষাকৃত জোরালো দাবীগুলির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া। তথাপি ভদ্রস্থ ন্যূনতম প্রয়োজনের উপরে জনসাধারণের চাহিদার ক্ষেত্রে ন্যায্যতার গুরুত্ব কমে যায়। আমরা যদি এটাকে মেনে নিই তাহলে ভদ্রস্থ ন্যূনতম পরিষেবার অতিরিক্ত উন্নতমানের পরিষেবা কিনতে জনসাধারণকে অনুমতি দেওয়া নৈতিকভাবে আপত্তিকর হবে না। ভদ্রস্থ নূন্যতম পরিষেবার ক্ষেত্রেই ন্যায্যতার নীতি কার্যকরী। সর্বাপেক্ষা উন্নত পরিষেবার ক্ষেত্রে এই নীতি না মানলেও চলে। তাই কিছু মানুষকে সব থেকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ দিতে অনুমতি দেওয়া সেইসব ব্যক্তি যাদের কেবল ন্যূনতম পরিষেবায় প্রবেশাধিকার আছে তাদের প্রতি অবিচার করা নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাধারণ ও উন্নত এই দুইস্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করাটা নীতিগতভাবে আপত্তিকর হবে না।

সাধারণ স্তরের পরিষেবা ব্যবস্থা সরকারী বা জনসাধারণের অর্থে করা যেতে পারে, এবং এর মধ্যে সব মানুষেরই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মৌলিক প্রয়োজনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্য দিকে, উচ্চস্তরীয় ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা থাকবে যা অর্থের বিনিময়ে ক্রয়যোগ্য। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ব্যবস্থাটি স্বাস্থ্য-পরিষেবার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা থেকে আলাদা, যেহেতু এই ধারণায় এমন কি সাধারণ বা নিম্নস্তরীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাও বাজার-নির্ভর হবে এবং মানুষকে তা অর্থের বিনিময়ে কিনতে হবে। জনসাধারণ এই সুবিধা পেতে অধিকারী নয়।

এই দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হল যাদের বেশী অর্থ খরচ করার সামর্থ্য আছে তারা অতি সত্বর উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পাবে। কিছু মানুষ অর্থনৈতিকভাবে অন্যদের তুলনায় দুর্বল এবং এই দুর্বলতা যেহেতু তাদের নিজের জন্য নয়, তাই ব্যয় করার সামর্থ্যের উপর স্বাস্থ্য-পরিষেবাকে ভিত্তিশীল করা অন্যায়। কিন্তু উন্নততর দামী পরিষেবা যাঁরা নিতে পারবেন না তাঁদের মৌলিক চাহিদা পূরণে যদি নূন্যতম ব্যবস্থা থাকে তাহলে সর্বোন্নত মানের চিকিৎসা অর্থের বিনিময়ে পাওয়ার ব্যাপারে যে অভিযোগ তার নৈতিক জোর কমে যায়। এটা নিশ্চিত যে দ্বিস্তরীয় স্বাস্থ্য-পরিষেবা ব্যবস্থায় ব্যয় করার সামর্থ্যের উপর ভিত্তিশীল এক বৈষম্য সংশ্লিষ্ট রয়েছে। যে প্রশ্নটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, এই বৈষম্য কি যারা সর্বোচ্চ মানের দ্রুত পরিষেবা পেতে সমর্থ নয় তাদের প্রতি অবিচার করে? যারা আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল তাদের প্রয়োজনের দাবীকে আমাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এই বিচারে যে ভদ্রস্থ নূন্যতম স্বাস্থ্য-পরিষেবায় তারা কতটা সুবিধা পেতে পারে, যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তাদের সঙ্গে তুলনা করে নয়। যদি জনসাধারণ এই নূন্যতম স্তরে পৌঁছে যায় তাহলে যারা অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে সর্বোন্নত মানের পরিষেবা কিনবে সেই সুযোগ না দেওয়ার পক্ষে কোন নৈতিক যুক্তি থাকতে পারে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্য-পরিষেবা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে। যেসব মানুষ অর্থ ব্যয় করতে পারে না তারা উপযুক্ত প্রাথমিক প্রযত্ন পায় না (যদিও সকলেই জরুরী পরিষেবা পায়)। স্বাস্থ্য-পরিষেবার স্তরীকরণ তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন প্রত্যেকের জন্য নূন্যতম পরিষেবার ব্যবস্থা উন্মুক্ত থাকবে। কানাডায় স্বাস্থ্য পরিষেবা রেশনিং হয় ক্রমানুযায়ী। জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত এই সীমিত পরিষেবা পাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়। এখানে কেউ যুক্তি দিতে পারেন, কোনো ব্যক্তিকে পরিষেবার জন্য অর্থের বিনিময়ে অপেক্ষা-কাল কমানোর অনুমতি দেওয়া হয়। তাহলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। অধিকন্তু, যে দ্রুত পরিষেবা পাওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারবে না সে ক্রমের এক কদম উপরে এগিয়ে যাবে। এইভাবে অপেক্ষা-কাল কমলে পরিষেবার গুণগতমান এবং ফলাফল সকলের জন্যই উন্নত হবে। অন্য দিকে, কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে উন্নত-স্তরীয় পরিষেবা ব্যবস্থা সাধারণ বা নিম্নস্তরীয় পরিষেবার ক্রমশ অবনতি ঘটাবে এবং তার ফলে স্বাস্থ্য-পরিষেবার ভদ্রস্থ নূন্যতম মানের ধারণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর্থিক সুবিধার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চিকিৎসকেরা উন্নত-স্তরীয় পরিষেবায় বেশি মনোযোগী হবে। এর ফলে সাধারণ নিম্নস্তরীয় পরিষেবা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উচ্চস্তরের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থার আবির্ভাব যদি ভদ্রস্থ নূন্যতম পরিষেবাকে এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাহলে স্তরীকরণ ব্যবস্থা অন্যায় এবং নীতিগতভাবে আপত্তিকর। নিম্নস্তরের পরিষেবায় যারা আছে তাদের মৌলিক প্রয়োজন যথাযথ মেটানো হবে কিনা - এই আশঙ্কা থাকে। কিন্তু পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে দুই দলের মধ্যে বৈষম্য হচ্ছে বলেই স্তরীকরণ ব্যবস্থা অন্যায্য হবে - এরকম নয়।

আবার সাধারণ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানকারী পেশাদার ব্যক্তির দুষ্প্রাপ্যতা বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। ধরা যাক, কিছু ব্যক্তিকে হিপ্-রিপ্লেসমেন্ট সার্জারীর জন্য একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে অর্থ জমা করতে অনুমতি দেওয়া হল এবং তার মধ্য দিয়ে সাধারণের যে লম্বা লাইন তার থেকে তারা এগিয়ে গেল। এই ব্যবস্থা সার্জারীর জন্য তাদের অপেক্ষা-কাল তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমিয়ে দেয়। অন্য মানুষজন যাদের অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য নেই তারাও সারির প্রথম দিকে এগিয়ে যায় এবং তাদেরও অপেক্ষা-কাল এভাবে

কমে যায়। এটা এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কেউ কেউ উপকৃত হয় কিন্তু কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কেউ কিছু ব্যক্তিকে অর্থ ব্যয় করতে অনুমতি দেওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে ক্রম টপকাতে অনুমতি দেওয়া আপত্তিকর, যেহেতু এতে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। আর যে কোনো ধরনের বৈষম্য স্বগতভাবে মন্দ এবং তাই নৈতিকভাবে অনুমোদনযোগ্য নয়। কিন্তু এই অভিযোগকারীদের কঠোর সমতাবাদের বিরুদ্ধে 'লেভেলিং ডাউন' (leveling down) অভিযোগের উত্তর দিতে হবে। এক কদম বৈষম্য কমানো যারা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে আছে তাদের ক্ষতি করে, কিন্তু যারা খারাপ অবস্থানে আছে তাদের কোনো লাভ দেয় না। এই ব্যবস্থা এমন এক পরিস্থিতি যেখানে কেউ লাভবান হয় না, কিন্তু কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই অবস্থাকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করে। এটা এই নির্দেশ করে যে যদি হিপ-রিপ্লেস্‌মেন্টের জন্য কিছু মানুষকে বহু দিন অপেক্ষা করতে হয় তাহলে প্রত্যেকেরই এভাবে অপেক্ষা করা উচিত। যেকোনো বিচারে কিছু মানুষকে দ্রুততর পরিষেবার সুযোগ দিতে অনুমতি দেওয়া সব মানুষকে সমমানের পরিষেবা পাওয়ার জন্য অযৌক্তিকভাবে অনেক দিন অপেক্ষা করানোর তুলনায় শ্রেয়স্কর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সব মানুষের জন্য যদি এক ভদ্রস্থ ন্যূনতম চিকিৎসা-পরিষেবার সময়পোযোগী ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় তাহলে এই সাধারণস্তরের উর্দ্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নত পরিষেবার কারণে যে বৈষম্যের সূচনা হয় তা অন্যায় নয়। ন্যায্যতা আর সমতা সম্পূর্ণ এক বিষয় নয়। জন রলসের পৃথকীকরণ নীতি এই সত্যকেই তুলে ধরে।

৪.৭ সারসংক্ষেপ :

চিকিৎসা পরিষেবা তথা চিকিৎসা-সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য, তাই তার বণ্টন ন্যায্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং দেখতে হবে একই সঙ্গে তা যেন কার্যকরী হয়। এই পাঠ-এককে বিভিন্ন ধরনের রেশনিং-ব্যবস্থা তথা অগ্রাধিকারের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করেছি। আমরা দ্বি-স্তরীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছি। রলসের পার্থক্যনীতি অনুসরণ করে সকলের জন্য ন্যূনতম সভ্যভব্য একটা পরিষেবা ব্যবস্থা চালু রেখে আর এক ধরনের উন্নত পরিষেবার প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছি। আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি এই ব্যবস্থা ন্যায়-নীতিকে লঙঘন করে না। বয়স্কদের রেশনিং এর বিষয়টিকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা উচিত, যদিও ন্যায়-নীতির বিচারে তরুণেরা বৃদ্ধদের থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পরিষেবায় অগ্রাধিকার পাবে। আমরা গ্রন্থকার ওয়াল্টার গ্লাননকে উদ্ধৃত করে শেষ করছি : "Medical rationing that strikes a reasonable balance between fairness and efficiency is the only way for a health care system to be sustainable and to meet people's needs the best it can."

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What are the different theories of distributive justice? Which theory is most effective in allocating scarce medical resources? Discuss.
2. Discuss the moral issues involved in setting priorities for medical resource distribution.

3. What do you mean by QALYs? What are the shortcomings of this concept? Discuss.
4. What are the moral issues involved in age-based rationing? Discuss.
5. What is organ transplantation? What ethical policy should we adopt to implement a fair and efficient rationing for scarce organs?
6. Explain the moral justifiability of a two-tier health care system.
7. Write short notes :

a) DALYs

b) Organ transplatation and social status

c) Prudential life-span account

d) Medical resource distribution and life-style choices.

e) Double jeoparday

f) UNOS

৪.৯ গ্রন্থ-নির্দেশ :

মূলগ্রন্থ Walter Glannon এর Biomedical Ethics (Ch. 7) পড়তে হবে। এর সঙ্গে Helga Kuhse and Peter Singer সম্পাদিত Bioethics : An Anthology এর Part-V পড়তে হবে।

Glossary

Allele

Any of the alternative forms of a gene that may occur at a given locus

Amniocentasis

A procedure for obtaining aminotic fluid from a pregnant woman, then chemical contents of the fluid are studied directly for diagnosis of some diseases. Cells are cultured and metaphase chromosomes are examined for irregularities

Autosome

Any chromosome that is not a sex chromosome

Clone

All the individuals derived by vegetative propagation from a single original individual. In molecular biology, it means a population of identical DNA-molecules, all carrying a particular DNA-sequence.

DNA

Deoxyribonucleic acid, the information-carrying genetic materials that comprise the gene.

Embryo

An organism in the early stages of development in humans, the first two months in the uterus.

Eugenics

The application of the principles of genetics to the improvement of humankind.

Fertilization

The fusion of a male gamete (sperm) with female gamete (egg) to form a zygote.

Fetus

Between the embryonic stage and the time of birth, in human, approximately the last seven months.

Gene
A hereditary determinant of a specific biological function, a unit of inheritance (DNA) located in a fixed position on a chromosome

Gene pool
The sum total of all different alleles in the breeding members of a population

Genome
A complete set (n) of chromosomes (hence, of gene) inherited as a unit from a parent

Germ cell
A reproductive cell capable and mature of being fertilized and reproducing an entire organism

Homophilia
A bleeder's disease, tendency to bleed freely from even a slight wound, hereditary condition dependent on a sex-linked recessive gene

HIV
Human Immunodeficiency Virus

Human Genome Project
A huge international effort to map and sequence the entire human genome

In vitro
From Latin meaning 'within glass' the biological process made to occur experimentally outside the organism, e.g., in the test tube or other container

Mapping
The arrangement of genes on a chromosome, the regions of the chromosomes where the gene reside

Meiosis
The process by which the chromosome number of a reproductive cell becomes reduced to half the diploid (2n) or somatic number, results in the formation of gametes in animals or spores in plants, important source of viability through recombination

Mitosis
Disjunction of duplicated chromosomes and division of the cytoplasm to produce two genetically daughter cell

Metabolism
Sum total of all chemical process in living cells by which energy is provided and used

Mutation
A change in the DNA at a particular location in an organism, the term used loosely to include point mutations involving a single gene change as well as a chromosomal change

Nucleus
The part of a eukaryotic cell that contains the chromosomes, separated from the cytoplasm by a membrane

Nucleotide
A subunit of DNA and RNA molecules containing a phosphate group, a sugar and a nitrogen-containing organic base

Penetrance
The percentage of individuals that show a particular phenotype among the capable of showing it

Phenotype
The observable characteristics of an organism

Phenylketonuria
The metabolic disorder (e.g. incapacity of processing ammonia, etc) resulting in mental retardation, transmitted as a recessive and treated in early childhood by special diet.

Polygene
One of many genes involved in quantitative inheritance

Recessive
A term applied to one member of an allelic pair lacking the ability to manifest itself when the other dominant member is present

SCID

Sever combined immuno deficiency syndrome, a group of diseases characterized by the inability to mount an immune response either humoral or cellular

Sequencing

To determine the sequence of chemical constituents (as amino-acid residues or nucleic-acid bases) in genes, to determine the nucleotide sequence of all 24 human chromosomes

Stem cell

A mitotically active somatic cell from which other cells arise by differentiation

Totipotent cell

An undifferentiated cell such as a blastomere that when isolated or suitably transplanted can develop into a complete embryo

Vector

A plasmid or viral chromosome that may be used to construct recombitant DNA molecules for introduction into living cells

Zygote

The cell produced by the union of two mature sex cells (gametes) in reproduction, the individual developed from such a cell

পরিভাষা-পরিচয়

অ্যালিল (allele)

সমসংস্থ ক্রোমোজমের একই আধারে অবস্থিত সম ও বিষম বৈশিষ্ট্য-নিয়ন্ত্রক উপাদানসমূহের এক একটিকে পরস্পরের অ্যালিল বলা হয়।

অ্যালজাইমারস্ (Alzheimer's)

বয়সকালের একটি সাধারণ রোগ। এতে স্মৃতিভ্রংশ হয় এবং মানসিক সামর্থ্যসমূহ ক্রমশ কমতে থাকে। এর কোন চিকিৎসা নেই। জার্মান নিউরোপ্যাথলজিস্ট অ্যালোইস অ্যালজাইমার রোগটিকে সনাক্ত করেন। তাই তাঁর নামেই রোগটি পরিচিত।

অ্যাম্জাইমারস্(amniocenesis)

এক ধরনের প্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষা, যাতে গর্ভবতী মায়ের দেহ থেকে অ্যামনিওটিক্ তরল সংগ্রহ করে তার পরীক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমে গর্ভস্থ ফিটাসের ক্রোমজোম-ঘটিত কোন রোগ বা অস্বাভিকতা আছে কিনা তা জানা যায়।

অ্যাটোজোম(autosome)

লিঙ্গ-নির্ধারক ক্রোমোজোম ব্যতীত বাকী দেহকোষে যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোম মানুষের দেহগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অটোজোম বলে।

সিস্টিক ফাইব্রোসিস (cystic fibrosis)

এটি অটোজোমের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জিনগত অস্বাভাবিকতা বা ব্যাধি, যা ফুসফুস, প্যাংক্রিয়াস, যকৃৎ এবং ক্ষুদ্রান্ত্র সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জিনের এক ধরনের পরিবর্তন অর্থাৎ মিউটেশন এর জন্য দায়ী।

ক্লোনিং(cloning)

যে পদ্ধতিতে যৌন-জননের মাধ্যমে উৎপন্ন কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ দেহকোষ থেকে অযৌন জননের মাধ্যমে হুবুহু একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ তৈরি করাকে ক্লোনিং বলে। এই পদ্ধতিতে জাত ক্লোনগুলিতে একই ধরনের জিনের সজ্জারীতি পরিলক্ষিত হয়, যা মূল প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহকোষ থেকে পাওয়া।

কন্ট্রোল গ্রুপ(control group) ও ইন্টারভেনশন গ্রুপ(intervention group)

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিঙ্গ, বয়স, সংখ্যাদি সমবৈশিষ্ট্য বা সমচরিত্রযুক্ত ইন্টারভেনশনবা এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপের সমান যে একটি গ্রুপ (বা দল) তুলনার জন্য তৈরী করা হয়, যারা কোন বিশেষ ট্রিটমেন্ট, যেমন স্বাস্থ্যপরিষেবা, পায় না তাদের কন্ট্রোল গ্রুপ বলে। অন্য দিকে যারা এরূপ কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাত্র হিসাবে বিশেষ ধরনের ট্রিটমেন্ট বা স্বাস্থ্য-পরিষেবা পায় তাদের ইনটারভেন্শন গ্রুপ বলে।

ডি এন এ (DNA) ও আর এন এ(RNA)

সজীব কোষের মধ্যস্থ স্বপ্রজননশীল যে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড সকল প্রকার দেহগত কার্যের নিয়ন্ত্রক ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক তাই (**DNA**)। অন্যদিকে, সজীব কোষের প্রোটিন সংশ্লেষে সহায়ক এবং কিছু জীবের ক্ষেত্রে বংশগতি বৈশিষ্ট্যের বাহক যে বাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড তাই আর এন্ এ।

ডুচেন মাসকুলার ডিসট্রফি (Duchenne muscular dystrophy)

X-ক্রোমোজোম বহনকারী যে প্রচ্ছন্ন (রিসেসিভ) জিনগত ব্যাধি যা পেশীর মধ্যে ক্ষয় সংঘটিত করে। ফলে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির হাঁটা-চলা ও শ্বাস নেওয়া সহ বিভিন্ন দরনের সমস্যা হয়। (X)-ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা ডিসট্রফিন জিনে পরিবর্তনে (**mutation**)-র জন্য এটি হয়। ফরাসী স্নায়ুবিজ্ঞানী গুলামে বেঞ্জামিন আমন্দ ডুচেন এই ব্যাধিটি যথাযথভাবে সনাক্ত তাঁর নামেই এই ব্যাধিটি পরিচিত।

ভ্রূণ(embryo)

মাতৃগর্ভে বিকাশমান প্রথম দুই মাসের সজীব দেহপিণ্ডকে ভ্রূণ বলে।

ইউজেনিকস্ (engenics)

মানুষের বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষায়নের উদ্দেশ্যের জিনতত্ত্বের নিয়মনীতি তথা প্রযুক্তির ব্যবহারকে ইউজেনিকস্ বলে।

নিষেক(fertilization)

পুরুষ গ্যামেট অর্থাৎ শুক্রানুর সঙ্গে স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোট তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে নিষেক বলা হয়।

ফিটাস (fetus)

ভ্রূণাবস্থা থেকে মাতৃগর্ভের বাইরে আসা, অর্থাৎ জন্মের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, মোটামুটি শেষ সাত মাসের (প্রথম দুই মাসের পর) প্রাণবান মানবদেহকে ফিটাস বলা হয়।

জিন (gene)

ক্রোমোজোমের মধ্যস্থ DNA বা RNA অণুর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের যে বিশেষ পরম্পরা যা প্রোটিন তৈরির মাধ্যমে বংশগতির বৈশিষ্ট্যসমূহকে ধারণ ও বহন করে, তাই জিন।

জিনপুল (gene pool)

কোন জনগোষ্ঠী জননক্ষম সদস্যদের জিনের সমষ্টিকে জিনপুল বলা হয়।

জেনম (genome)

পিতা বা মাতা কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোজোম বা জিনের এক একটি সম্পূর্ণ সেট (n)-কে জোনাম বলে।

জার্ম সেল (Germ cell)

ভ্রূণাবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ গ্যামেট তৈরী হওয়া পর্যন্ত সময়কালের জনন-কোষকে জার্ম-সেল বলে।

হিমোফিলিয়া (Hemophilia)

এটি রক্তের X-ক্রোমোজম সংযোজিত জিনঘটিত রোগ, যাতে রক্তের তঞ্চন ব্যাহত হয়। ফলে সামান্য ক্ষত থেকেই প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।

এইচ আই ভি (HIV)

হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, যা আমাদের দেহে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ফলে বিভিন্ন রোগের সূত্রপাত হয়। এর আক্রমণেই AIDS রোগ হয়।

হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট (Human Genome Project)

মানুষের সমস্ত জিনের পর্যায়ক্রম (ম্যাপিং) ও সজ্জারীতি (সিকোয়েনশিং)-এর জন্য ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলা যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রকল্প তাকে 'হিউম্যান জেনোম প্রজেক্ট' বলা হয়।

ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In vitro fertilization)

ল্যাটিন 'ইন ভিট্রো' শব্দটির অর্থ 'কাঁচের পাত্রের মধ্যে'। বস্তুত, এটি দেহের বাইরে টেস্টটিউব বা অন্যান্য পাত্রের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে নিষেক ঘটানোর জীবতাত্ত্বিক যে প্রক্রিয়া তাই-ই ইন ভিট্রো নিষেক।

ইক্যুইপয়েজ (Equipoise)

এমন এক অনিশ্চিত সাম্যাবস্থা যেখানে পরীক্ষক বা চিকিৎসক বিশ্বাস করেন যে বিকল্প দুটি চিকিৎসা-ব্যবস্থার যে কোন একটি অন্যটির তুলনায় উন্নততর হতে পারে।

ম্যাপিং (Mapping)

ক্রোমোজোমের মধ্যে জিনের আপেক্ষিক অবস্থান নির্দিষ্ট করার প্রক্রিয়াকে পর্যায়ক্রম নিরূপণ বা ম্যাপিং বলে।

মিয়োসিস (Meiosis)

যে বিশেষ কোষ-বিভাজন জনন মাতৃকোষের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে হ্রাস-বিভাজন ও পরে সমবিভাজন পদ্ধতিতে পর পর দুবার বিভাজিত হয়ে জনন-মাতৃকোষের অর্ধেক ক্রোমোজমসহ চারটি অপত্য-কোষ (গ্যামেট) সৃষ্টি হয় সেই প্রক্রিয়াকে মিয়োসিস বলে।

মাইটোসিস্ (Mitosis)

যে কোষ-বিভাজন পদ্ধতিতে একটি মাতৃকোষ থেকে সম আকৃতির ও সমগুণসম্পন্ন সমসংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দুটি অপত্যকোষের সৃষ্টি হয় তাকে মাইটোসিস বলে।

বিপাক (Metabolism)

প্রাণধারণের জন্য প্রতিটি সজীব কোষ যে গঠনমূলক ও ভাঙনমূলক রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ ঘটে চলেছে তাদেরকে একত্রে বিপাক বলে। এই প্রক্রিয়ায় এক দিকে যেমন শক্তি উৎপন্ন হয়, অন্যদিকে তেমনই শক্তি ব্যবহৃত হয়। যে প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদিত হয় তাকে উপচিতি (anabolism) এবং সে প্রক্রিয়ায় শক্তি ব্যবহৃত হয় তাকে অপচিতি (catabolism) বলে।

মিউটেশন (Mutation)

কোষের DNA-এর কোন একটি নিউক্লিওটাইডের আকস্মিক পরিবর্তনকে মিউটেসন বলে। এর ফলে জিনের কার্যক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে।

নিউক্লিয়াস (Nucleus)

ইউক্যারিওটিক কোষের প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, পাতলা পদার্থবিশিষ্ট, প্রায় গোলাকার যে অংশ জীবনদায়ী যাবতীয় কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একইসঙ্গে DNA-কে বহন করে তাকে নিউক্লিয়াস বলে।

নিউক্লিওটাইড (Nucleotide)

DNA বা RNA-র গঠন তথা কার্যগত একক যার মধ্যে একটি ফসফেট গ্রুপ, একটি ৫- কার্বনযুক্ত শর্করা ও নাইট্রোজেন বেস একত্রে অবস্থান করে।

পারকিনসন্স (Perkinson's)

কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের এক ধরনের অস্বাভাবিকতা বা ব্যাধি। মধ্যমস্তিষ্কে সাবস্টেনসিয়া নাইগ্রা নামে এক বিশেষ স্থানে ডোপামামিন সৃষ্টিকারী কোষগুলির মৃত্যু ঘটায়। সাধারণত এই রোগের ফলে কাঁপুনি, পেশীর চলনসংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণতঃ ৬০ বঠর বয়সের পরে এই রোগ দেয়, যদিও তার আগেও এই অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। ইংরেজ ডাক্তার জেমস্ পারকিনসন্স এই রোগটিকে চিহ্নিত করেন। তার নামে এই রোগের নাম।

পেনিট্রেন্স (Penetrance)

কোন জনগোষ্ঠীর বিশেষ ফিনোটাইপ প্রদর্শন করতে সক্ষম এরূপ অপত্য-ব্যক্তির শতকরা হিসাব বা মাত্রাকে পেনিট্রেন্স বলে।

ফিনোটাইপ (Phenotype)

কোন জীবের চারিত্রির বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক প্রকাশকে ফিনোটাইপ বলে।

ফিনাইলকিটোনুরিয়া (Phenylketonuria)

একধরনের বিপাকীয় ত্রুটি বা ব্যাধি, যাতে ফিনাইল অ্যালানিন নামক অ্যামিনো মূলকের বিপাক বাধাপ্রাপ্ত

হয়। এর ফলে মানসিক প্রতিবন্ধীকতা দেখা দেয় এবং মূত্রে ফিনালি কিটোন রেচিত হয়। প্রচ্ছন্ন (রিসেসিভ) জিন হিসাবে এটি বংশানুক্রমে বাহিত হয়। শৈশব অবস্থায় থেকে বিশেষ খাদ্যতালিকার মাধ্যমে এর চিকিৎসা করা যেতে পারে।

প্লেসিবো (Placebo)

এটি আপাতদৃষ্টিতে তরল ওষুধ বা বাড়ি যার মধ্যে বাস্তবিক কোন ঔষধিক উপাদান নেই। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, কোন দ্রব্য বা পদ্ধতি যার যে অবস্থার চিকিৎসার প্রয়োজন তার জন্য বিশেষ কোন কার্যকারিতা নেই তাকেই প্লেসিবো বলে। গবেষণার স্বার্থে তথা চিকিৎসায় কার্যকারিতা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে ইনটারভেনশন গ্রুপের সঙ্গে তুলনা করার জন্য কন্ট্রোল গ্রুপের সদস্যদের এই প্লেসিবো দেওয়া হয়।

পলিজিন (Polygene)

অ্যালিল নয় এমন কতিপয় জিন যারা এমনভাবে কোন বৈশিষ্ট্যের অংশ-বিশেষ প্রকাশ করলেও সমষ্টিগতভাবে পুরো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এইরূপ জিনসমষ্টির প্রতিটিকে পলিজিন বলে।

র‍্যানডেমাইজেশন (Randomisation)

নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার কোন একটি দলে পরীক্ষণ-পাত্রদের অন্ধভাবে, এলোপাতারি ভাগ করে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে র‍্যানেডামাইজেশন বলে। এলোপাতারি এই বিভাজন এমন ভাবে করা হয় যাতে যারা পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তারা। কেউই জানতে পারে না কিভাবে এই বন্টন করা হয়েছে বা কন্ট্রোল — কোন গ্রুপে তাদের রাখা হয়েছে।

প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive Character)

দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশুদ্ধ জীবের মধ্যে পরনিষেক ঘটালে প্রথম তপত্য বংশে এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যটিপ্রকাশ পায় না, অর্থাৎ সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে।

সিকোয়েন্সিং (Sequening)

প্রোটিনের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড বা জিনের মধ্যে নিউক্লিওটাইডের যে গঠনগত অংশ তাদের সজ্জা বা ক্রম নিরূপণ করাকে সিকোয়েন্সিং বলে। এই পদ্ধতিতে মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমে নিউক্লিওটাইডের সজ্জা পরম্পরাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ধারণ করা হয়।

সিকেল সেল অ্যনিমিয়া (Sickle cell anemia)

জন্মসূত্রে প্রাপ্ত রক্তের একধরনের ব্যাধি। একধরনের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থেকে এই রোগ হয়। এই অস্বাভাবিকতার জন্য লোহিত রক্তকণিকাগুলির কাস্তের মতো আকার ধারণ করে এবং ক্রমশ সেগুলি যায়, যার ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

স্টেম সেল (Stem cell)

সম-বিভাজনে সক্ষম যে দেহকোষ বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত কোষ তৈরি করতে পারে তাকে স্টেমসেল বলে।

ট্যে-স্যাখস্ ডিজিজ্ (Tay-Sachs disease)

এটি দেহকোষের প্রচ্ছন্ন (রিসেসিভ) একটি জিনগত ব্যাধি। এর ফলে প্রায় ৬ মাস বয়স থেকে শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা নষ্ট হতে শুরু করে। চার বছরের মধ্যে শিশু মারা যায়। মস্তিষ্কের মধ্যে স্নায়ুকোষের পর্দায় গ্যাংলিওসাইট নামক স্নেহপদার্থ যখন ক্ষতি কারক মাত্রায় জমা হতে থাকে তখনই এই রোগ দেখা যায়। মূলত পূর্ব ইউরোপে অ্যাশকোনাজি ইহুদী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই এই রোগ দেখা যায়। এর কোন চিকিৎসা নেই। ব্রিটিশ চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ওয়ারেন ট্যে এবং আমেরিকার স্নায়ুরোগবিশেষজ্ঞ বার্নাড স্যাক্স এই কোগকে চিহ্নিত করেন বলে তাদের দুজনের নামে এই রোগের নামকরণ হয়েছে।

টোটিপোটেন্ট সেল (Totipotent cell)

আন-ডিফারেন্সিয়েটেড (অর্থাৎ যার বৈশিষ্ট্যয়ন হয় নি) এরূপ কোষ (যেমন, জাইগোট থেকে ব্লাস্টোমিয়ার দশা পর্যন্ত) যাদেরকে প্রয়োজনে আলাদা করে নিয়ে অন্যত্র প্রতিস্থাপন করা হলে যদি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সম্পূর্ণ ভ্রূণ বা জীব তৈরি করতে পারে তাকে টোটিপোটেন্ট সেল বলে।

ভেক্টর (Vector)

রিকম্বিট্যান্ট ডি এন এ অণু তৈরির উদ্দেশ্যে যখন কোন জাবাণুর প্লাজমিড বা ভাইরাল ব্যবহার করা হয় তাকে ভেক্টর বলে।

জাইগোট (Zygote)

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে যে ডিপ্লয়েড কোষ (2n) তৈরি হয় তাই জাইগোট। এই জাইগোট একটি পূর্ণাঙ্গ জীব সৃষ্টি করতে পারে।

দ্বিতীয় অর্ধ

সোশিও-পলিটিক্যাল এথিকস্

অধ্যাপক সুনীল রায়

সহযোগী অধ্যাপক প্রশান্ত সরকার

দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠ একক - ১

বিভাগ - ক

সন্ত্রাসবাদ ও নৈতিকতা

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ প্রসঙ্গে

১.৩ বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসবাদ

১.৪ সন্ত্রাসবাদ, গেরিলা যুদ্ধ, সাধারণ অপরাধ ও যুদ্ধ

১.৫ সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে যুক্তি

১.৬ সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে উত্থাপিত যুক্তি খণ্ডন

১.৭ সন্ত্রাসবাদের নৈতিক সমর্থন প্রসঙ্গে

১.৮ সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার উপায়

১.৯ সন্ত্রাস প্রতিহত করতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ

১.১০ সিদ্ধান্ত অনুগ পর্যবেক্ষণ

১.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.১২ নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

১.০ উদ্দেশ্য

ফলিত নীতিবিজ্ঞানে আজকাল সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক নানা প্রসঙ্গই আলোচিত হয়। সে-সকল প্রসঙ্গের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ একটি অন্যতম প্রসঙ্গ। পাঠ-এককটির এই বিভাগটিতে সে-প্রসঙ্গই আলোচিত হবে।

১.১ প্রস্তাবনা

বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ একটি ভয়াবহ সমস্যা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অলি-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ও গুপ্ত সংগঠনগুলি একের পর এক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এসকল সংগঠনের মধ্যে — Al-Queda, LTTE, NSCN, TNLA, MNF, ALFA, ULFA, NNC, ALMA উল্লেখযোগ্য। কখনও ধর্মীয় মৌলবাদ, কখনও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ও হতাশাকে অবলম্বন করে সন্ত্রাসবাদীরা নেমে পড়েছে এক পৈশাচিক উন্মত্ততায়। এসমস্যার প্রকোপে মানবজাতির অস্তিত্বই আজ বিপন্ন হতে চলেছে। সন্ত্রাসবাদের লেলিহান শিখা আজ দাউ দাউ করে জ্বলছে। সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার করার আগে সে আর থামতে চাইছে না। তাতে ইন্ধন জোগাবার লোকেরও অভাব নেই। এই অবস্থায় সন্ত্রাসবাদ বুদ্ধিজীবী মহলকেও কতকগুলি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। মানবসভ্যতা কি জঞ্জাল যে তাকে পুড়িয়ে শেষ করতে হবে? নিশ্চয়ই নয়। তবে সন্ত্রাসবাদের এই লেলিহান শিখার কবল থেকে তাকে কীভাবে রক্ষা করা যাবে? সংক্ষেপে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় আমাদের কী করণীয়?

১.২ সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ প্রসঙ্গে

প্রাগুক্ত প্রশ্নটির কোনো চট্‌জলদি উত্তর কারো জানা নেই। তবে এপ্রসঙ্গে অনুপ্রবেশের আগে একটি গোড়ার প্রশ্ন হচ্ছে — সন্ত্রাসবাদ বলতে কী বোঝায়? তবে 'সন্ত্রাসবাদ' অভিধায় 'বাদ' শব্দটি যুক্ত থাকলেও সন্ত্রাসবাদ কোনো মতবাদ নয়। তবুও সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের মধ্যে কম-বেশি মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটে। সম্ভবত সেই সূত্র অনুসারেই 'সন্ত্রাসবাদ' অভিধাটির প্রয়োগ চালু হয়। The World Book Encyclopaedia অনুসারে কোনো রাজনৈতিক কারণে বা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য হিংসার আশ্রয় নিয়ে জনমানসে ভীতি-প্রদর্শনের সঙঘবদ্ধ প্রয়াসই সন্ত্রাসবাদ। এর থেকে সন্ত্রাসবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একে সন্ত্রাসবাদের লক্ষণরূপে স্বীকার করা যায় না। কারণ ডাকাতি, রাহাজানি, মস্তানি প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের দ্বারাও অনেকসময় একটি জনগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু এসব ক্রিয়াকলাপের মূলে কোনো আদর্শ থাকে না। সন্ত্রাসবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতাদর্শগত। কোনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় কারণের উপস্থিতি সন্ত্রাসবাদের উৎপত্তির প্রাক্‌শর্ত বলে গণ্য হয়। অনেক সময় একাধিক পূর্বশর্তও কিছু মানুষকে কোন এক বা একাধিক জনগোষ্ঠী বা শাসকশ্রেণির উপর ধারাবাহিক আক্রমণে উৎসাহিত করে। এই আক্রমণ চলে কখনও সরাসরি, কখনও পরোক্ষে, গোপনে। তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় 'Kill one, frighten thousand.'

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞাদানের প্রয়াস একটি নয়, অসংখ্য। এ.পি.স্মিড (A. P. Schmid) ১০৯টি সংজ্ঞার একটি তালিকা তৈরি করেছেন। সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, সন্ত্রাসবাদের শতকরা ৮৩.৫টি

সংজ্ঞায় আছে হিংসা বা বলপ্রয়োগের কথা, শতকরা ৬৫টি সংজ্ঞায় 'রাজনৈতিক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। শতকরা ৪১টি সংজ্ঞায় 'মনস্তাত্ত্বিক পরিণাম ও সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছে, শতকরা ৩৭ এর কিঞ্চিদধিক সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়েছে 'লক্ষ্য ও শিকারের মধ্যে অসঙ্গতি'-র কথা। আসলে সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তনশীল চরিত্র এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অ-পূর্বাভাসযোগ্যতা এর সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ। এসকল অসুবিধার কথা মনে রেখে আজকাল অনেক গবেষক সন্ত্রাসবাদের গূঢ়ার্থ নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন। এসকল প্রয়াসীর মধ্যে হাইগ খাতচাদৌরিয়ান (Haig Khatchadourian) অন্যতম। খাতচাদৌরিয়ানের মতে সন্ত্রাসবাদের বর্ণনায় সাধারণভাবে বিদ্যমান কয়েকটি উপাদান নিম্নরূপ :

(এক) কোনো আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক মূল কারণ সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করে। যেমন, স্বভূমি থেকে উৎখাত।

(দুই) এক আশু, অন্তর্বর্তীকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী চূড়ান্ত লক্ষ্যের ধারণা,

(তিন) বলপ্রয়োগের পদ্ধতি ও প্রকরণ,

(চার) সাংগঠনিক কাঠামো ও সমর্থক স্পন্সরের উপস্থিতি, এবং

(পাঁচ) নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক বা সামরিক পরিস্থিতি যাতে সন্ত্রাসবাদ বাস্তবায়িত হয়।

এসকল উপাদানের সঙ্গে আরেকটি উপাদান সংযোজনীয় এবং তা হচ্ছে — সন্ত্রাসের সর্বাধিক সাফল্য লাভের লক্ষ্যে প্রচারমাধ্যম ও প্রযুক্তির ব্যবহার।

১.৩ বিভিন্ন প্রকার সন্ত্রাসবাদ

উৎপত্তির কারণ, লক্ষ্য, পদ্ধতি প্রভৃতির তারতম্য ভেদে সন্ত্রাসবাদ পাঁচ প্রকার : লুণ্ঠনমূলক সন্ত্রাসবাদ (Predatory terrorism), প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসবাদ (Retaliatory terrorism), নীতিবাদী সন্ত্রাসবাদ (Moralistic terrorism), রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ (Political terrorism) এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ (Revolutionary terrorism)। নিছক মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী বা অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সংঘটিত সন্ত্রাসকে বলে লুণ্ঠনমূলক সন্ত্রাসবাদ। হিংসার বদলা নেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় তাকে বলে প্রতিশোধমূলক সন্ত্রাসবাদ। প্রচলিত কোনো ধর্মীয়, নৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংঘটিত সন্ত্রাস নীতিবাদী সন্ত্রাসবাদ। ধর্মান্ধতা, নৈতিক অধঃপতন বা সংস্কৃতির অবক্ষয়ই এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ। কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য লাভের জন্য সংঘটিত সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বলে। আর বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ বলতে যা বোঝায় তা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ থেকে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা নয়। কোনো রাষ্ট্রের সামগ্রিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয় তাকে বলে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ। তুলনায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপকতা অনেক কম। এতে কেবল স্বল্পতম মাত্রায় রাজনৈতিক সুবিধা লাভের প্রয়াস দেখা যায়।

সন্ত্রাসবাদের এসকল প্রকারভেদ কিন্তু এক তরফা অন্য এক তরফা। সন্ত্রাসবাদ আছে। এ সন্ত্রাসবাদ

অবশ্য রাষ্ট্রমুখী নয়। রাষ্ট্র থেকেই নেমে আসে এই সন্ত্রাসবাদ। একে লোকেও তাই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ (state terrorism) বলেই চেনে। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র। রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কোনো শক্তি বা সংগঠনের সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের প্রেক্ষিতে কঠোর দমন-পীড়ন নীতি অনুসরণ করে দেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও নাগরিক অধিকার সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কর্তৃক সংঘটিত এরকম সন্ত্রাসবাদই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। স্তালিনের আমলে এবং পরে ব্রেজনেভের আমলে সোভিয়েত রাশিয়ায় যেকোনো সরকার-বিরোধী শক্তি বা আন্দোলনকে কঠোরভাবে দমন করা হতো। পলপট-শাসিত কম্বোডিয়ায় রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন নৃশংসতম আকার নেয়। তাছাড়া LTTE-এর সদস্যদের দমনে শ্রীলঙ্কা সরকারের, ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ব টিমোরের স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ইন্দোনেশিয়া সরকারের, আয়ারল্যান্ডে সিন্‌ফেইনের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ড সরকারের কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ভুক্ত।

অনেক সময় কোনো রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদত দেয়। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাতে মদতদানকারী রাষ্ট্র অর্থ, প্রযুক্তি, অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করে। কখনও কখনও প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কর্মরত জঙ্গি সংগঠনগুলির সদস্যদের নিরাপদ আশ্রয় ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। রাষ্ট্রের তরফে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী কাজে ইন্ধন জোগানো এক ধরনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। অনেক সময় এই ধরনের সন্ত্রাসকে সীমান্ত পারের সন্ত্রাস (cross-border terrorism) আখ্যা দেওয়া হয়। পাক সরকারের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও আফগানিস্তানে এই ধরনের সীমান্ত অতিক্রমকারী সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। ইজরাইল সরকারের মদত পেয়ে ইজরাইলি জিওনিস্ট প্যালেস্তিনীয় অঞ্চলে নিয়মিত সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। এই ধরনের সন্ত্রাসের অন্যতম লক্ষ্য ধারাবাহিকভাবে সন্ত্রাসমূলক কাজে সাহায্য করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা।

আবার কখনও বা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের লক্ষ্য থাকে অন্য কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইনানুগ সরকারকে কৌশলে উচ্ছেদ করে তার বদলে নিজের অনুগত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে আসা। এই ধরনের কাজে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধহস্ত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত দেশগুলিতে বৈধ সরকারকে উচ্ছেদ করে তার বশংবদ স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। ১৯৭৩ সালে চিলিতে সমাজতন্ত্রী নেতা আলেন্দেকে হত্যা করে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অনুগত গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় বসায়। কিউবার কমিউনিস্ট সরকারকে উচ্ছেদ করতে আমেরিকা কমিউনিস্ট কিউবার জন্মলগ্ন থেকে এখনো পর্যন্ত নানা অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

১.৪ সন্ত্রাসবাদ, গেরিলাযুদ্ধ, সাধারণ অপরাধ ও যুদ্ধ

আমরা উল্লেখ করেছি ডাকাতি, রাহাজানি, মস্তানি প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের দ্বারা একটি জনগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হলেও এগুলি সন্ত্রাসবাদ নয়। এরকম আরো কিছু বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ সন্ত্রাসমূলক হলেও সেগুলিও সন্ত্রাসবাদ নয়। প্রথমত গেরিলাযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবাদ এক নয়। গেরিলাবাহিনী সামরিক বাহিনীর মতো সুসংগঠিত। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সাধারণ নাগরিক নয়, সামরিক বাহিনী। তারা বিরোধী পক্ষের সামরিকবাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে তোলে এবং এলাকা দখল করে সেখানকার জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার

চেষ্টা করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এলাকা দখল বা নিয়ন্ত্রণ-আরোপের কোনো পরিকল্পনা থাকে না।

সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সাধারণ অপরাধীদেরও পার্থক্য আছে। একজন সাধারণ অপরাধী অর্থ উপার্জনের জন্য বা অন্য কোন আত্ম-স্বার্থ পূরণের জন্য হিংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়। তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য থাকে না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা অনেক সময় কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হিংসাত্মক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়। তাদের ক্রিয়াকলাপ আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক নয়।

সন্ত্রাসবাদ ও যুদ্ধের মধ্যেও পার্থক্য আছে। যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি আছে। যুদ্ধরত পক্ষগুলিকে সেই সকল নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা সাধারণত কোনো নিয়মনীতি মানে না। এরকম নিয়মের বিরোধিতা করাই যেন তাদের উদ্দেশ্য। তাছাড়া, যুদ্ধ হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনসমূহ বৈধ বলে স্বীকৃত নয়, অবৈধ।

১.৫ সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে যুক্তি :

নৈতিক বিচার মানুষের আচরণের বিচার, মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিচার, সে আচরণ ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীগত যাই হোক না কেন। সন্ত্রাসবাদী আচরণ দল বা গোষ্ঠীগত। প্রশ্ন হল : এ-আচরণ নীতিসম্মত, না নীতিনিন্দ্য? সাধারণ নৈতিক প্রজ্ঞা সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না। তবে সন্ত্রাসবাদী নেতা যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মর্যাদা পান তখন আমাদের প্রচলিত নীতিবোধ ধাক্কা খায়। একই সঙ্গে অনেক সময় সন্ত্রাসবাদী আচরণ নৈতিক অনুমোদনও লাভ করে। সন্ত্রাসবাদীরাও বলে থাকেন, যুগযুগান্ত সঞ্চিত অন্যায় ও বৈষম্য উচ্ছেদের অন্য উপায় না পেয়ে তারা সন্ত্রাসের পথকেই বেছে নেন। 'উদ্দেশ্য উপায়ের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে' ('The end justifies the means.') — এই নীতি আমাদের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমকে পুনর্বিচারে বাধ্য করে। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা ঠিক একথাই বলে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতই আজকাল সন্ত্রাসবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে উত্থাপিত যুক্তিগুলি ব্যবহারিক নীতিবিদ্যার অঙ্গনে বহুল আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাসবাদের পক্ষে উত্থাপিত যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

(ক) ন্যায়যুদ্ধ ভিত্তিক যুক্তি : সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে এ-যুক্তির অবতারকদের মধ্যে আছেন Sergius Stepniak, Vincent Ferraro, Hugo Grotius প্রমুখ। এমন কি ধর্মতাত্ত্বিক তথা দার্শনিক St. Thomas Aquinas-ও ন্যায়যুদ্ধ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করেছেন। তবে তাঁর মতে কতকগুলি শর্ত মেনে ন্যায়যুদ্ধ অনুমোদনীয় — আইনানুগ কর্তৃত্বের দ্বারা যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া চাই, যুদ্ধযাত্রার ন্যায্য কারণ থাকতে হবে এবং যুদ্ধ সংঘটিত হবে যথাবিহিত উপায়ে। এসকল শর্ত মানলে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সংঘটিত যুদ্ধকে ন্যায়যুদ্ধ বলা যাবে না। আবার ন্যায়যুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতি বা অপরিমিত বলপ্রয়োগ করা চলবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন রুশ বিপ্লবী হলেন Sergius Stepniak। তাঁর কথায়, "... the terrorist is noble, terrible, irresistibly fascinating (uniting) the two sublimities of human grandeur – the martyr and the hero." আর সপ্তদশ শতকের একজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ হলেন Hugo Grotius। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ On the Law of War and Peace। এই গ্রন্থে Grotius

দেখিয়েছেন যে, অধিকার আদায়ের জন্য সংঘটিত যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ। সোজা কথা — সামাজিক বৈষম্য যেখানে সহনশীলতার সীমা ছাড়িয়েছে, অহিংসার পথ যেখানে কর্তৃপক্ষের টনক নড়াতে ব্যর্থ, সেখানে ন্যায়যুদ্ধের মতো সন্ত্রাসবাদও সমর্থনীয়।

P. E. Devine এবং R. J. Rafalco — এই দুই চিন্তানায়কের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ "On Terror"। The Annals-এর ৪৬৩ নং সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধে সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে তাঁরা তিনটি যুক্তি দিয়েছেন — The Economy of Scale Argument, The Consciousness-Raising Argument এবং The Collective Guilt Argument।

(খ) ক্ষয়ক্ষতির ন্যূনতম মাত্রা বিষয়ক যুক্তি (The Economy of Scale Argument) : নির্মম শাসককুলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনে ব্যর্থ হয় তখন ব্যাপক ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের বিকল্প হিসেবে শেষ অবলম্বন রূপে সন্ত্রাসের পথ গৃহীত হয়। প্রচলিত যুদ্ধ বা বিপ্লবে যে পরিমাণ সম্পদ নষ্ট হয় বা যে পরিমাণ প্রাণহানি ঘটে তার তুলনায় গোপন সন্ত্রাস কম ক্ষতির সংগ্রাম, এবং সে কারণে সমর্থনীয়। সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাকসকুলের উপর চাপ সৃষ্টি করে সন্ত্রাসবাদীদের দাবি মেনে নিতে, তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের প্রতি মনোযোগী হতে।

(গ) সচেতনতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত যুক্তি (The Consciousness-Raising Argument) : সন্ত্রাসবাদীদের মতে সন্ত্রাস নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সংঘটিত হলে তা প্রাতিষ্ঠানিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তোলে। তাই আমজনতাকে সচেতন করে তুলতে সন্ত্রাস সৃষ্টি জরুরি। সন্ত্রাস মূঢ় মানুষের রাজনৈতিক চেতনা মুহূর্তে বাড়িয়ে তোলে।

(ঘ) সমষ্টিগত অপরাধ সম্পর্কিত যুক্তি (The Collective Guilt Agrument) : এই যুক্তি অনুসারে অনেকসময় জনসাধারণ নীরব থেকে সব কিছু অন্যায়-অত্যাচার মেনে নেয়। প্রতিবাদ করে না, যা তাদের উচিত ছিল। এজন্য তারা কেউই নিরপরাধ নয়। রাষ্ট্র বা শাসকবর্গের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ-মুখর হয় না। এমন কি যারা অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদে সোচ্চার এবং কর্মতৎপর জনসাধারণ তাদের পক্ষেও অনেক সময় থাকে না। তার অর্থ, পরোক্ষে সরকারের পক্ষেই থাকা। তাই সন্ত্রাসবাদীরা মনে করেন যে সাধারণ মানুষজনকে তাদের ঔদাসীন্য ও নীরবতার কারণে শাস্তিদান যুক্তিযুক্ত। ব্যবহারিক নীতিবিজ্ঞানীরা এই কথাটা বলেন দু'টি অভিধার সাহায্যে — 'acts of commission' এবং 'acts of omission' এর সাহায্যে। তাঁদের কথায়, "The public is guilty ... not for committing anything but for acts of omission."। অর্থাৎ 'acts of commission' এর জন্য নয়, 'acts of omission' এর জন্য সাধারণ মানুষ দোষী।

(ঙ) শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বভিত্তিক মার্কস-এঙ্গেলসের যুক্তি (The Class Struggle Agrument): সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যক্রম সমর্থনে মার্কস-এঙ্গেলস্ প্রণীত শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্বকে ব্যবহার করে। তারা মনে করে যে মার্কস-এঙ্গেলস্ যে শ্রেণিসংগ্রামের কথা বলেছেন তার থেকে হিংসাকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না। বরং হিংসা বা সন্ত্রাস অনেক সময় সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। শোষক বুর্জোয়া

শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণির বিরুদ্ধে যে-কোনো হাতিয়ারই ব্যবহার করে। শোষকশ্রেণির এই অত্যাচার-নিপীড়নের মোকাবিলা করা নিছক অহিংস পদ্ধতিতে সম্ভব হয় না। দেখা যায়, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণি হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এরকম পরিস্থিতিতে হিংসা বা সন্ত্রাসের সাফল্য তাদের উজ্জীবিত করে তোলে। তাই বুর্জোয়া রাষ্ট্রকাঠামোর উচ্ছেদ করে শ্রেণিহীন সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে যে হিংসা বা সন্ত্রাস সংঘটিত হয়, তা মুক্তিসংগ্রামেরই অঙ্গ এবং সমর্থনীয়।

অবশ্য একথা সত্য যে মার্কস তাঁর জীবনের শেষ দিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হিংসার পথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগ পদ্ধতিতে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এমন কি, মার্কস-এঙ্গেলস্ উভয়েই মাইকেল বুকানিন এবং যোহান মোস্টের সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিন্দাই করেছেন। শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করতে মোস্ট তাঁর অনুগামীদের চাপ দিয়েছিলেন। প্রয়োজনে তিনি তাদের নাইট্রোগ্লিসারিন, বোমা এবং বিষ প্রয়োগ করতেও নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কস এই প্রবণতাকে ভয়ংকর মনে করে অনুমোদন করেন নি। তাঁর মতে, যথার্থ বৈপ্লবিক আদর্শ আগেভাগেই পন্থার যৌক্তিকতা বিচার করে।

(চ) প্রতিবাদের উপায় নির্বাচনের অধিকার বিষয়ক যুক্তি (The Right of Choice of Means of Protest Argument) : সন্ত্রাসবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের বা গোষ্ঠীর প্রতিবাদের উপায় নির্বাচনের অধিকার আছে। সকলেরই এই নিয়ম মেনে চলা উচিত। ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই নীতি অনুযায়ী নিপীড়িত জনসাধারণেরও অধিকার আছে নিজেদের সুবিধা ও পছন্দমতো প্রতিবাদের উপায় নির্বাচন করার।

(ছ) ঔপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ (Terrorism is a Revolt against Colonialism and Imperialism) : অনেকে ঔপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে থাকে। তাদের মতে, ঔপনিবেশিক শাসন আত্মনিয়ন্ত্রণের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে। তাই এরূপ শাসনের বিরুদ্ধে তার অবসানকল্পে হিংসার আশ্রয় নেওয়া আইনবিরুদ্ধ হলেও অন্যায় হতে পারে না, যদি সেই রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক উপায়ে সমস্যা সমাধানের সকল রাস্তাই বন্ধ থাকে।

(জ) বিপন্ন অবস্থায় সন্ত্রাসবাদই প্রতিকারের শেষ অস্ত্র (Terrorism is the Last Resort in Desperate Circumstances) : এযুক্তির প্রসিদ্ধ অবতারক হলেন জাঁ পল সার্ত্র (Jean Paul Sartre) এবং সিমোঁ দ্য বোভোয়া (Simone de Beauvoir)। যুগ-যুগান্ত ধরে যারা নিপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার হয়েছেন তারা যদি সেই নিপীড়ন ও বঞ্চনা থেকে মুক্ত হবার অন্য কোনো পথ না পেয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেন তবে সেই পথের ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন সার্ত্র। সার্ত্র এবং বোভোয়া উভয়েই মনে করেন যে, এই পৃথিবী নানা রকম অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও বঞ্চনায় পূর্ণ। তাঁদের মতে এই পৃথিবীতে এটা আশা করা অবাস্তব যে, অত্যাচারী শাসকশ্রেণি অহিংসার পথে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য ও শৃঙ্খলা আনবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির স্বাধীনতা আনতে তাদের স্বাধীনতার অপহারকদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করেন সার্ত্র। নিপীড়ক শ্রেণির স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ তাই ন্যায্য আচরণ।

(ঝ) "Are There Any Absolute Right?" Alan Gewirth-এর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে Gewirth সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে একটি নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিটিকে বলা হয় 'Principle of the Intervening Action'। সন্ত্রাসবাদী অবস্থানের সমর্থনে এই নীতিটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ২০০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রটি এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রধান কার্যালয় পেন্টাগন একটি জঙ্গিগোষ্ঠীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হয়। এই বিশ্বায়িত সন্ত্রাসের ভরকেন্দ্রে ছিল দুই পক্ষ — একদিকে ইসলামিক মৌলবাদী ওসামা বিন লাদেন এবং তার সন্ত্রাসবাদী সংগঠন Al-Queda এবং অপরদিকে তাদের প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং পাল্টা-সন্ত্রাসে বিশ্বাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওসামা বিন লাদেনকে এই আক্রমণের জন্য নৈতিকভাবে দায়ী করা হয়। তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধে ইসলামধর্ম প্রচার করেছেন। 'Principle of Intervening Action' অনুসারে লাদেন-বিরোধীরাও নীতিগতভাবে দায়ী, কারণ তাদের অনৈতিক হস্তক্ষেপই ওই আক্রমণের একটি পর্যাপ্ত শর্ত।

যাইহোক, এখন প্রশ্ন হলো : যুক্তিগুলি কি নৈতিক বিচারে গ্রহণীয়? আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিগুলি গ্রহণীয় মনে হলেও সেগুলি নৈতিক বিচারে যথোচিত নয়। যুক্তিগুলি নিম্নলিখিত উপায়ে খণ্ডিত হতে পারে।

১.৬ সন্ত্রাসবাদের সপক্ষে উত্থাপিত যুক্তিগুলি খণ্ডন

(এক) ন্যায়যুদ্ধের ধারণাকে যুক্ত করে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের পক্ষে যে যুক্তি দেওয়া হয় তার নৈতিক উপযুক্ততা নির্ভর করে ন্যায়যুদ্ধের তত্ত্বের যথার্থ্যের উপর। কিন্তু ন্যায়যুদ্ধের যে শর্তাবলী তা বাস্তবে সম্পূরিত হতে দেখা যায় না। তাই এযাবৎ বাস্তবে সংঘটিত কোনো যুদ্ধই ন্যায়যুদ্ধ হয়নি। ফলত, ন্যায়যুদ্ধভিত্তিক যে যুক্তি সন্ত্রাসবাদের সমর্থনে দেওয়া হয় তা নৈতিক বিচারে যথোচিত নয়। (ন্যায়যুদ্ধের সবিচার আলোচনার জন্য গ্রন্থপঞ্জিতে উল্লেখিত সন্তোষকুমার পালের প্রবন্ধটি দেখতে পারেন।)

(দুই) রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বা সার্বিক বিপ্লবের তুলনায় গোপন সন্ত্রাস উদ্দেশ্য সিদ্ধির সবচেয়ে সস্তা সংগ্রাম — এই যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা কোনো মানুষকে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে কার্যসিদ্ধির ব্যাপারটি বিচক্ষণতার পরিচায়ক হতে পারে। কিন্তু তা কখনই নীতিবোধের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া, সন্ত্রাসবাদীর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রতিপক্ষের ক্ষমতা ও রণকৌশলের উপরেও নির্ভর করে। আসলে সন্ত্রাসবাদীর যাত্রা এক অনির্দেশ্য পথে যাত্রা। কোথায়, কীভাবে তার অবসান ঘটবে তা আগে থেকে বলা যায় না।

(তিন) নিপীড়িত জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির যুক্তিও সঙ্গত নয়। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির অসংখ্য উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। তার জন্য সন্ত্রাস বা খুনের সাহায্য নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া নিজেদের আদর্শ প্রচারের জন্য নিরীহ মানুষকে খুন করা নীতিসম্মত নয়, নীতিনিন্দ্য। বরং নীতিশাস্ত্র বলে "Act in such a way that you always treat humanity, whether in your own person or in the preson of any other, never simply as a means, but always as an end."। (Immanuel Kant)

(চার) সমষ্টিগত অপরাধের যুক্তিটিরও নানা অসঙ্গতি আছে। যাঁরা ইজরায়েলের নিরীহ জনগণের উপর বোমা বর্ষণ করেন তাঁরা দাবি করেন যে, প্যালেস্টাইনের নিপীড়নের জন্য ওই জনগণই দায়ী। তারা এই দাবিও করতে পারেন যে ইজরায়েলের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ আদমের পাপের উত্তরাধিকার। কাজেই তাঁরা পাপী, পাপের উপযুক্ত শাস্তিই তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু প্যালেস্টাইনের নিপীড়নের ক্ষেত্রে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকাই নেই। তাই সমষ্টিগত অপরাধের এই যুক্তিটি অসঙ্গত।

তাছাড়া, Wall Street Journal -এর একজন সাংবাদিক ছিলেন ডেনিয়েল পার্ল। ২০০২ সালে তিনি করাচি থেকে অপহৃত হন। সন্ত্রাসবাদীরা এই অপহরণের মাধ্যমে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের মুক্তির জন্য আমেরিকার সঙ্গে একটা রফা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আলোচনার আগেই পার্লকে হত্যা করা হয়। পার্লের অপরাধ — তিনি আমেরিকার নাগরিক। প্রশ্ন হলো — এই যুক্তি ন্যায্য হলে যে সকল প্যালেস্টিনীয় কোনো-না-কোনোভাবে ইজরায়েলে কর্মরত তাদের কী হবে? ইজরায়েলের অর্থনীতিকে পুষ্ট করায় ওই প্যালেস্টিনীয়দেরও সমষ্টিগত অপরাধের দায় বহন করতে হবে। সমষ্টিগত অপরাধের যুক্তিটিতে এরকম নানা অসঙ্গতিই আছে।

(পাঁচ) বিপন্ন মানুষের শেষ অবলম্বন হিসেবে সন্ত্রাসের ন্যায্যতা দাবি করা হয়। প্রশ্ন এখানেও — বাস্তবে কি প্রতিবাদের সকল গণতান্ত্রিক উপায় ব্যর্থ হলে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বিত হয়? সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির কার্যক্রম লক্ষ করলে এ-প্রশ্নের নঞর্থক উত্তর দিতে হয়। সন্ত্রাসবাদীরা পূর্ব-পরিকল্পনা নিয়ে সুচিন্তিত হিংসাত্মক উপায়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধগম্য হবে। ২০০৮ সালে মুম্বাই সন্ত্রাসকাণ্ডে ধৃত একমাত্র সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভ। কাসভ জানায় যে, তারা পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত। সেখানকার একাধিক অঞ্চলে প্রশিক্ষণ শিবিরে অত্যাধুনিক অস্ত্রের ব্যবহার শেখানো হয়। বহুদেশের বহু যুবকই অর্থাভাবে বা অন্য কোনভাবে বাধ্য হয়ে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে। কাজেই একথা বলা যায় না যে সন্ত্রাসবাদ বিপন্ন মানুষের শেষ অবলম্বন।

এমন কি মাদকদ্রব্য সরবরাহ থেকে শুরু করে আধুনিক অস্ত্র পাচার অবধি নানারকম লাভজনক অথচ অবৈধ কর্মের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির যোগ থাকে। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। আত্মঘাতীমূলক আক্রমণে অংশগ্রহণকারী সন্ত্রাসবাদী তার সংগঠন থেকে এককালীন মোটা অঙ্কের অর্থ অনুদান পান তার পরিবারের জন্য। আসলে বিপন্নতার অছিলায় সন্ত্রাসবাদী তার অমানবিক স্বরূপই উন্মোচন করে থাকেন।

(ছয়) আত্মরক্ষার অধিকারের প্রস্তাবও বাতিলযোগ্য। তার কারণ দু'টি। গবেষিকা সানুশ্রী ভট্টাচার্যের কথায়, যাদের থেকে আত্মরক্ষা করা হবে আক্রমণ কেবল তাদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যারা কারও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের রক্ষা করার অধিকার হারায়, এবং সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য কেউ যদি হিংসার আশ্রয় নেয় তাহলে তা অন্যায্য হয় না। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা নির্বিচার হিংসা চালায়, যেখানে নিরপরাধ ও অ-যুযুধান মানুষ নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রত্যেক মানুষ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকাঠামোর মধ্যে পরিবার-বন্ধুসহ নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করতে চায়। সন্ত্রাসবাদের এই অতর্কিত ও নির্বিচার আক্রমণ তাই তাদের শঙ্কিত করে তোলে, এবং এই কারণেই সন্ত্রাসবাদের আত্মরক্ষার যুক্তি অবৈধ হয়ে যায়।

কিছু মানুষ তাদের আত্মরক্ষার জন্য বহু সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় আনতে পারে কি ? এবং (ii) আত্মরক্ষার অজুহাতে সন্ত্রাসবাদী বাস্তবিকপক্ষে এক প্রকার হত্যালীলা চালায়, যা সর্বতোভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ। সন্ত্রাসবাদীরা যে নিরীহ মানুষদের হত্যা করেন তারা কোনোভাবেই প্রতি-আক্রমণ করতে পারে না, এবং নির্বিচার ধ্বংসলীলার মধ্যে বেঘোরে প্রাণ হারায়। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ যেসব যাত্রী মুম্বই ছত্রপতি শিবাজী টার্মিনাসে উপস্থিত ছিলেন বা যেসব মানুষ কার্যসূত্রে তাজ হোটেলে ও ট্রাইডান্ট হোটেল অবস্থান করেছিলেন তারা কিভাবে কিছু পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীর জীবন বিপন্ন করে তুলেছিলেন তা বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা কিভাবে তাদের আত্মরক্ষার যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করবে?" এই দুই কারণেই ভট্টাচার্য মহাশয়া আত্মরক্ষার অধিকারমূলক যুক্তিটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না।

(সাত) পরিশেষে যে যুক্তিতে সন্ত্রাসবাদকে ঔপনিবেশিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে সমর্থন দেবার কথা বলা হয়েছে, সেই যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়। একটি অপরাধ দমন করতে আরেকটি অপরাধ মঞ্জুর করলে শাস্তিবিষয়ক প্রতিশোধাত্মক মতবাদ গ্রহণ করতে হয়। এই তত্ত্বের মূল কথা 'চোখের বদলে চোখ', 'দাঁতের বদলে দাঁত'। কিন্তু বর্তমান সভ্য সমাজ এই তত্ত্ব অনুমোদন করে না।

এতক্ষণ আমরা সন্ত্রাসবাদের লক্ষণ (marks), উপাদান (content), প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। সন্ত্রাসবাদ যে গেরিলাযুদ্ধ, সাধারণ অপরাধ বা যুদ্ধ নয় তাও আমরা দেখিয়েছি। সন্ত্রাসবাদীর নিজেদের সন্ত্রাসবাদী বলে মনে করেন না, তারা নিজেদের স্বাধীনতা সংগ্রামী বলেই ভাবেন। তাদের কার্যক্রমের সমর্থনে কিছু কিছু যুক্তিও আছে। আমরা সে যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করেছি। যুক্তিগুলির দুর্বলতাও আছে। সেই দুর্বলতা উল্লেখ করে উক্ত যুক্তিগুলি খণ্ডন নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এবারে প্রশ্ন — সন্ত্রাসবাদ নৈতিকভাবে সমর্থনীয় কি না ?

১.৭ সন্ত্রাসবাদের নৈতিক সমর্থন প্রসঙ্গে

নীতিশাস্ত্র আজ বহুধা পল্লবায়িত। এ-শাস্ত্রের বহুধা পল্লবায়নের ফলে আমরা এখন নৈতিক বিচারের দুরকম তত্ত্ব পেয়ে থাকি : ফলমুখী (Consequentialist Moral Theories) বা সোদ্দেশ্যমুখী তত্ত্ব (Teleological Moral Theories) এবং ফলনিরপেক্ষ তত্ত্ব (Deontological Theories)। উপযোগবাদ ও সুখবাদ প্রথম প্রকার তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। আর কান্ট - প্রণীত শর্তহীন অনুজ্ঞার তত্ত্বকে বলা যায় দ্বিতীয় প্রকারের তত্ত্ব। উপযোগবাদের মূলনীতি — সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ তথা সুখ। এমতে বাস্তব তথা সম্ভাব্য কল্যাণ বা সুখের মাপকাঠিতে মানুষের আচরণের নৈতিকতা বিচার করা উচিত। বলা বাহুল্য, এই মতবাদ লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে নৈতিক ক্রিয়ার মূল্যায়ন করে থাকে।

অপর পক্ষে, কান্ট বলেন শর্তহীন অনুজ্ঞা (The Categorical Imperative) পালন করার কথা, 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' পালনের কথা। এই নীতিতত্ত্ব তাঁর তন্ত্রে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কান্টের মতে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার নিয়ম মেনে আচরণই বিধেয়। তিনি বলেন, একমাত্র সদিচ্ছাই সকল অবস্থায় শর্ত নিরপেক্ষভাবে কল্যাণকর। তাঁর এই মতবাদ লক্ষ্য পূরণের উপায় হিসেবে আচরণের মূল্যায়ন করে না, কারণ লক্ষ্য তাঁর কাছে স্বতঃমূল্যবান নয়। কান্ট উপায়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে সদিচ্ছায় কৃত কর্মই ন্যায়সঙ্গত।

ভট্টাচার্য মহাশয়া দেখিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদ উপরিউক্ত কোনো রকম নীতিতত্ত্ব দ্বারাই সমর্থিত হতে পারে না। আমরা জানি — উপযোগবাদ সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ বা সুখ সাধন করার কথা বলে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের উদ্দেশ্য নির্বিচার হিংসার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষের ক্ষতিসাধন। তাই মঙ্গল বা সুখের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সংঘটিত অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে গণ্য করা হলেও প্রশ্ন হবে — সন্ত্রাসবাদ কি ওই অমঙ্গলের তুলনায় কম অমঙ্গল সাধন করতে পারে? বাস্তবে কিন্তু তা হয় না। সন্ত্রাসবাদ উপযোগবাদের নীতি অনুসরণ করে না। আবার সুখবাদ সুখের নিরিখে কোনো কাজের মূল্যায়ন করে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা সুখলাভের জন্য হিংসাত্মক কর্ম করে না। তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের উপর প্রভাব ফেলতে। তাদের ক্রিয়াকলাপের সাথে সুখের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

সন্ত্রাসবাদীরা নাশকতামূলক যে কর্মকাণ্ড চালায় তার মূলে কোনো কর্তব্যবোধ থাকে না। তারা সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম চালায় কোনো-না-কোনো লক্ষ্য পূরণের জন্য। কান্ট তাঁর নীতিতত্ত্বে ব্যবহারিক প্রজ্ঞার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের নির্বাচিত পদ্ধতিতে তার কোনো গুরুত্বই নেই। উপরন্তু, কান্ট বলেন, কখনও কোনো মানুষকে উপায়রূপে ব্যবহার করা উচিত নয়। মানুষ স্বতঃমূল্যবান। মানুষ কেবল সকল কার্যের লক্ষ্যই হতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীরা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে মানুষকে উপায়রূপে ব্যবহার করে। কাজেই সন্ত্রাসবাদ কান্টীয় নীতিতত্ত্ব দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদ যে কেবল নীতির দ্বারা সমর্থনীয় নয়, তাই নয়, সন্ত্রাসবাদ নীতিনিন্দ্য। নীতিদার্শনিকেরা নীতিনিন্দ্য এ সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার কথাই বলেছেন।

১.৮ সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার উপায়

সন্ত্রাস প্রতিহত করার দু'প্রকার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয় — সন্ত্রাস-বিরোধিতা এবং প্রতিসন্ত্রাস। প্রথম প্রক্রিয়াটি আত্মরক্ষামূলক, দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি আক্রমণমূলক। সন্ত্রাস-বিরোধিতা বলতে বোঝায় এমন আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতির প্রয়োগ যার দ্বারা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও সম্পদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুনঃসুনিশ্চিত করা সম্ভব। অপর পক্ষে, প্রতিসন্ত্রাস হলো সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার জন্য গৃহীত যাবতীয় আক্রমণমূলক পদ্ধতি। সন্ত্রাসবাদী প্রশিক্ষণ শিবির ধ্বংস এই আক্রমণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের একটি অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করার অর্থ সন্ত্রাসবাদীদের হত্যা করা নয়। এর অর্থ, সন্ত্রাসের মূলোচ্ছেদে যত্নবান হওয়া।

১.৯ সন্ত্রাস প্রতিহত করতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ

সন্ত্রাস প্রতিহত করতে বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও বিভিন্ন প্রান্তে নানা রকম উদ্যোগ ও কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথ মোর্চা গঠন করেছে, রাশিয়া ও চীন এই উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস-বিরোধী মঞ্চ তৈরি করেছে, সার্কভুক্ত দেশগুলিও সন্ত্রাসদমনে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনে আঞ্চলিক উদ্যোগও কম নয়। ASEAN Regional Forum-এ ASEAN ও USA-এর মধ্যে সন্ত্রাসবাদ দমনে সহযোগিতা, ইউরোপের ট্রাসবুর্গে European Convention of the Suppression of Terrorism, আমেরিকা মহাদেশীয় আঞ্চলিক সংগঠন OAU-এর Convention of Prevent and Punish Acts প্রভৃতি আঞ্চলিক উদ্যোগ খুব প্রশংসনীয়।

আজকের দিনে সন্ত্রাসবাদ একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। এর মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের তরফে প্রথম পদক্ষেপ ১৯৭২ সালে একটি বিশেষ কমিটি গঠন। জাতিপুঞ্জের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হচ্ছে ১৯৯৪ সালে সাধারণ সভায় একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণ। এই সভায় যে-কোনো প্রকার সন্ত্রাসকেই অপরাধমূলক এবং অযৌক্তিক বলে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দা করা হয়। এই সভা সন্ত্রাস দমনে যা যা করণীয় বলে মনে করে তা নিম্নরূপ :

(ক) যে কোনো সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে অর্থসাহায্য, উৎসাহ ও পরামর্শদান থেকে বিরত থাকা,

(খ) নিজ নিজ ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া,

(গ) সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অপরাধীদের আটক, বিচার ও শাস্তিপ্রদান,

(ঘ) সন্ত্রাসবাদ দমনে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে চুক্তি সম্পাদন,

(ঙ) আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাস প্রতিহত করতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি,

(চ) প্রচলিত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলিকে জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করা, এবং

(ছ) সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় আশ্রয় না দেওয়া।

১.১০ সিদ্ধান্ত অনুগ পর্যবেক্ষণ

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গৃহীত এই সকল উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তবে এখনও যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সংঘটিত হচ্ছে তা সকলেই প্রত্যক্ষ করছেন। সন্ত্রাসবাদ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। আবার রাষ্ট্র যখন সন্ত্রাস মোকাবিলায় সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয় তাতেও মানবতার অবমাননা হয়। বস্তুত সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় সকল দেশ সমানভাবে তৎপর নয়, সকল দেশের স্বার্থও সমান নয়। সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এ-ব্যাধি দূর করতে সকল দেশের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে।

১.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is terroism? Discuss the arguments in favour of terrorism.
2. What, according to Haig Khatchadourian, are the five aspects of terrorism? In this connection, distunguish between terrorism and war.
3. Explain the several types of terrorism with suitable examples.
4. Distinguish between terrorism and guerrilla war. Consider whether the arguments advanced in favour of terrorism are morally commendable.

১.১২ নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

পাঠ-এককটির এই বিভাগটির জন্য পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ Haig Khatchadourian-এর "Terrorism and Morality"। প্রবন্ধটি Applied Philosophy : Morals and Metaphysics in

Contemporary Debates, eds. Brenda Almond & Donald Hill (Routledge, 1992)-এ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি অবশ্যই পাঠ্য।

এছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থ-প্রবন্ধাদিও সহায়ক :

১. Sanu Bhattacharya, Terrorism and Moral Questions (Sarat Book Distributors, Kolkata, 2007)

২. Terroriam : Concepts and Problems, ed., Debnarayan Modak (Progressive Publishers, Kolkata, 2009).

৩. ড. প্রণব কুমার দালাল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (সুজিত সরকার, বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা, ২০০৯)

৪. সানুশ্রী ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ ''সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে''। প্রবন্ধটি অনুষ্টুপ-এর ৪৭ নং সংখ্যা, ২০১২-য় প্রকাশিত হয়।

৫. ড. সন্তোষ কুমার পালের প্রবন্ধ ''সন্ত্রাসবাদ ও নৈতিকতা''। প্রবন্ধটি অর্য্যমা, ভল্যুম ৬, নং ২ - এ প্রকাশিত হয়।

৬. Ram Ahuja, Social Problems in India (Rawat Publications, Jaipur, 2009).

বিভাগ - খ

।। যুদ্ধ বিষয়ক আচরণবিধি ।।

১.১৩	উদ্দেশ্য
১.১৪	প্রস্তাবনা
১.১৫	ন্যায়যুদ্ধের শর্তাবলী
১.১৬	অ্যাকুইনাস প্রদত্ত শর্তসমূহের সমালোচনা
১.১৭	অ্যাকুইনাস প্রদত্ত শর্তসমূহের পরিপূরক শর্তাবলী
১.১৮	যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে ধরনের আচরণ সমর্থনীয়
১.১৮.১	সমানুপাতের নীতি
১.১৮.২	পৃথকীকরণের নীতি
১.১৮.৩	যুগ্ম ফললাভের নীতি/তত্ত্ব
১.১৮.৪	স্বাভাবিক অধিকার বিবেচনার নীতি ও কান্টের নীতি
১.১৮.৫	সামাজিক চুক্তি এবং উপযোগবাদী নীতি
১.১৯	যুদ্ধবিষয়ক আচরণ বিধি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ
১.২০	সমসাময়িক কালে যুদ্ধের সমর্থনে
১.২১	সিদ্ধান্ত
১.২২	নমুনা প্রশ্নাবলী
১.২৩	নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

১.১৩ উদ্দেশ্য

ফলিত নীতিবিজ্ঞানে একটি বহুল আলোচিত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যা সন্ত্রাসবাদ। সে-সমস্যার স্বরূপ, তার পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি, সন্ত্রাসবাদের নৈতিক সমর্থনের প্রসঙ্গ, তা প্রতিহত করার উপায়, তা প্রতিহত করতে গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে এই পাঠ এককটির পূর্ববর্তী বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের মতো যুদ্ধও এ-ধরনের আরেকটি সমস্যা। বরং যুদ্ধের ভয়াবহতা ও নাশকতা সন্ত্রাসবাদের চেয়ে অনেক বেশি, কেননা যুদ্ধ চলে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে। যুদ্ধের মোকাবিলায় কী করণীয়? পাঠ এককটির বর্তমান বিভাগটিতে তা নিয়েই আলোচনা করা হবে।

১. ১৪ ভূমিকা

প্রাচীনকালে বহু সমাজে গণহত্যার প্রচলন ছিল। তাতে নৈতিকতা নিয়ে কোনো উদ্বেগের প্রশ্ন উঠতো না। তখন যোদ্ধা বা সৈনিককে 'বীর' আখ্যা দেওয়া হতো। কিন্তু মধ্যযুগ থেকেই দার্শনিকেরা যুদ্ধ সম্পর্কে নানা বিষয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেন। যুদ্ধ ও নৈতিকতা বিষয়ক এরকম চিন্তাভাবনা আজো অব্যাহত। দার্শনিকদের চিন্তাভাবনা মূলত দুই রকম শর্তকে কেন্দ্র করে — (এক) যুদ্ধ যাত্রায় পালনীয় শর্তাবলী এবং (দুই) যুদ্ধ কালীন আচরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী। যুদ্ধকালীন আচরণ সম্পর্কে যেসব বিধি আরোপ করা হয় তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন অনেকে। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধকে সমর্থন করেছেন অনেকে। বর্তমান পাঠটিতে এসকল প্রসঙ্গই আলোচিত হবে।

১.১৫ ন্যায়যুদ্ধের শর্তাবলী

St. Thomas Aquinas ন্যায় যুদ্ধের তিনটি শর্তের কথা বলেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর এই শর্তগুলিকে কেন্দ্র করে ন্যায়যুদ্ধের ধ্রুপদী তত্ত্ব গড়ে ওঠে। প্রথম শর্ত দু'টিকে ন্যায়যুদ্ধের কারণিক শর্ত বলা যায় (conditions for 'jus ad bellum')।

প্রথমত যুদ্ধ কোনো বেসরকারী ব্যক্তির দ্বারা ঘোষিত হলে চলবে না। যুদ্ধ ঘোষিত হবে বৈধভাবে সরকারী কর্তৃপক্ষের শাসক বা শাসক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুসারে। Judith Wagner De Cew মনে করেন, এই শর্তটি সামন্ত প্রভুদের সামরিক ক্রিয়াকাণ্ডের রাশ টানতে সহায়তা করে। আজকাল এই শর্তটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত কারণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। সরকারীভাবে যুদ্ধঘোষণার ক্ষেত্রেও এই শর্তটির গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। Judith Wagner De Cew বলেন, "A formal declaration of war gives clear notice to the enemy of military action, serves as an ultimatum that may be a last means of persuasion short of force itself, and may heighten accountability by minimizing large-scale covert governmental action".

দ্বিতীয়ত Aquinas-এর মতে যুদ্ধ সংঘটিত হবে ন্যায়-সংগত কারণে। প্রশ্ন হলো — ন্যায়-সংগত কারণে যুদ্ধ সংগঠিত হওয়া বলতে কী বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে Aquinas দুই রকম যুদ্ধ-সংঘটনের কথা বলেছেন — রক্ষণাত্মক (defensive) এবং আক্রমণাত্মক (offensive)। রক্ষণাত্মকভাবে যুদ্ধ-সংঘটনের

ক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যে আগ্রাসনমূলক কার্যকলাপ দেশের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। আর আক্রমণাত্মকভাবে যুদ্ধ-সংঘটিত হওয়া ন্যায়-সংগত হতে পারে দু'টি শর্ত মেনে। Judith Wagner De Cew বলেন, "Two moral justifications that have been suggested to distinguish offensive warfare with a just cause include war undertaken to reestablish a social order that will promote justice and war undertaken to bring about peace".

তৃতীয়ত, Aquinas বলেন, যুদ্ধ-সংঘটিত হবে ন্যায়-সংগত উপায়ে। স্পষ্টতই এই শর্তটি যুদ্ধের উপায় সংক্রান্ত। ন্যায়সংগতভাবে যুদ্ধ-সংঘটনের কথা বলতে গিয়ে Aquinas জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে যে ন্যূনতম হিংসা বা বর্বতার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন তার কথা বলেছেন। তিনি মাত্রাতিরিক্ত বর্বর আচরণের বিরোধিতা করেছেন।

১.১৬ অ্যাকুইনাস প্রদত্ত শর্তের সমালোচনা

শুরুতে একটি বিষয় লক্ষণীয়। অ্যাকুইনাস কর্তৃক প্রদত্ত ন্যায়যুদ্ধের শর্তাবলীর মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শর্তটি সমস্যাজনক। আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সংঘটন আপাত দৃষ্টিতে যুক্তি-সংগত মনে হতে পারে। তবে আত্ম-সংরক্ষণের অধিকার চরম অধিকার নয়। একমাত্র প্রতিকারের কোনো উপায় না থাকলে আত্মসংরক্ষণের উপায় হিসেবে যুদ্ধ-সংঘটন গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তাছাড়া, ন্যায় সংগত উপায়ের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও সন্দেহের অবকাশ আছে। বলা বাহুল্য, ন্যায়সংগত কারণ প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধকে সমর্থন করে বলে দাবি করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যুদ্ধ-সংঘটনের ক্ষেত্রে অপর একটি ভূখণ্ড বা দেশের অবিচারের অবসানের কথা বলা হয়। কিন্তু প্রতিরোধাত্মক আক্রমণমূলক আচরণের নৈতিক মূল্যায়নের ব্যাপারটি বিতর্কমূলক। অ্যাকুইনাসের তৃতীয় শর্তটি উপায় সংক্রান্ত। এই শর্তে বলা হয় — উপায় হবে নরমপন্থী। যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত করতে যে ন্যূনতম হিংসা বা বর্বরতার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন আমরা তার চেয়ে অধিক বর্বর আচরণ করতে পারি না। কিন্তু উপায় এবং উপেয়র মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। ন্যায়সংগত উপায়ের মূল্যায়ন বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে।

Judidth Wagner De Cew অ্যাকুইনাস - প্রদত্ত শর্তাবলীর একটি সাধারণ সমালোচনা উপস্থাপন করেছেন। এই সমালোচনায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে, শর্ত তিনটি ন্যায় যুদ্ধ-সংঘটনের অপর্যাপ্ততা সূচিত করে। যুদ্ধ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ঘোষিত হতে পারে, যুদ্ধ সংঘটনের ন্যায়-সংগত কারণ থাকতে পারে, যুদ্ধে নরমপন্থী উপায় অবলম্বিত হতে পারে। তবুও যুদ্ধকালীন আচরণ অপরিহার্য না হলে যুদ্ধকে অপরিহার্য বলা চলবে না, যুদ্ধকে সমর্থন করা যাবে না। De Cew-এর কথায়, "Clearly, Aquinas' conditions must be revised and expanded to provide an adequate theory of just war".

১.১৭ অ্যাকুইনাস প্রদত্ত শর্তসমূহের পরিপূরক শর্তাবলী

শুধু সমালোচনাই নয়, অ্যাকুইনাস প্রদত্ত শর্তসমূহের পরিপূরক কয়েকটি শর্তও ওই সমালোচনা থেকে সঞ্জাত হয়েছে। পরিপূরক শর্তাবলী নিম্নরূপ :

(এক) প্রতিকারের শেষ অস্ত্র : যারা ন্যায়যুদ্ধকে প্রতিকারের উপায় বলে মনে করেন তাদের মতে 'a just war is one in which hostilities have been initiated only as a last resort'। এই মতে যুদ্ধ অসংগত হবে যদি তার ফল লাভ হয়ে থাকে অসংগত উপায়ে। একথার তাৎপর্য — পারস্পরিক বোঝা-পরা, মধ্যস্থতা, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়গুলির সহায়তাই প্রথমে গ্রহণীয়। এমনকি কূটনীতিক উপায়েও অনেক সময় যুদ্ধের মতন ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলা সম্ভব।

(দুই) বাস্তব ও অমোঘ বিপদ-সংকেত : অনেক তাত্ত্বিক এই অভিমত পোষণ করেন যে বিদেশের মাটিতে ভবিষ্যৎ আক্রমণের সম্ভাবনা যুদ্ধকালীন আচরণের যথার্থ্য প্রতিপাদন করে না। যে ক্ষতের নিবারণে যুদ্ধের মোকাবিলা তা বাস্তব ও অমোঘ হতে পারে।

(তিন) যুক্তিসংগত সাফল্যের আশা : সাফল্যের আশা যুক্তিসংগত না হলে যুদ্ধযাত্রা ন্যায় সংগত হতে পারে না। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হলে, পারস্পরিক শত্রুতা কেবল ব্যয় বৃদ্ধি করে। তাতে লাভের আশা থাকে না, দেশের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়, অবিচার সংশোধনের আশাও প্রতিহত হয়।

(চার) সঠিক অভিপ্রায় : Aquinas-এর আলোচনার পক্ষে ঝুঁকে অনেক সময় এ-দাবি করা হয় যে যুদ্ধ ন্যায়সংগত হতে পারে কেবল যখন দায়ী পক্ষের অভিপ্রায় ভালো হয়ে থাকে। Aquinas আপাত এই সত্য মেনে নিয়েছিলেন যে শুভ লাভে এবং অশুভ পরিহারের উদ্দেশ্য সৎ হওয়া চাই। Aquinas-এর একথার অর্থ — যুদ্ধরত পক্ষকে উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে Joseph Mc Kenna তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "A war which is otherwise just becomes immoral if it is waged out of hatred. A war of self-defense becomes immoral if, in its course, it becomes an instrument of expansion. A war to vindicate justice becomes immoral if, as it goes on, it becomes a means of aggrandizement. The facility with which nations rationalize their resort to war is a commonplace of diplomatic history."। তবে, Aquinas-এর শর্তটি স্পষ্ট নয়। তা অভিপ্রায়ের অস্পষ্টতা সূচনা করে। তাছাড়া, যুদ্ধকালীন অবস্থায় অভিপ্রায়ের পরিবর্তনও ঘটতে পারে।

১.১৮ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যে ধরনের আচরণ সমর্থনীয়

সাধারণ পরিস্থিতিতে যুদ্ধযাত্রা নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয়। তবুও কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি আছে। সেখানে কিছু বিশেষ বিধি মেনে যুদ্ধে নিরত হওয়া নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন পেতে পারে। বলা বাহুল্য, এটাই ন্যায়যুদ্ধের মূল কথা। অ্যাকুইনাসের তৃতীয় শর্তটি এরকম মঞ্জুরযোগ্য আচরণ বিষয়ক।

প্রসঙ্গত যে সকল শর্ত মেনে যুদ্ধযাত্রা সমর্থনীয় সেগুলিকে বলে 'Jus ad bellum' এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় অবশ্য পালনীয় শর্তগুলিকে বলে 'Jus in bello'। 'Jus ad bellum' সংক্রান্ত শর্তগুলি আলোচিত হয়েছে। এবারে 'Jus in bello' সংক্রান্ত শর্তাবলী আলোচ্য। 'Jus in bello' সংক্রান্ত শর্ত / নীতি পাঁচটি — (১) সমানুপাতের নীতি (the principle of proportionality), (২) পৃথকীকরণের নীতি (the principle of discrimination), (৩) যুগ্ম

ফললাভের নীতি/তত্ত্ব (the doctrine of double effect), (৪) স্বাভাবিক অধিকার বিবেচনার নীতি ও কান্টের নীতিতত্ত্ব (natural rights considerations and Kant's principles) এবং (৫) সামাজিক চুক্তি এবং উপযোগবাদী নীতি।

১.১৮.১ সমানুপাতের নীতি

সমানুপাতের নীতি অনুসারে যে-সকল ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ন্যায্য সে-সকল ক্ষেত্রেও বৈধভাবে বলপ্রয়োগের একটা সীমারেখা আছে। অবিচারের প্রতিবাদে যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু সে-যুদ্ধ সংঘটনে বলপ্রয়োগের পরিমাণ অভিনব ও বৃহত্তর অবিচারের জনক হলে সে-যুদ্ধকে কখনই ন্যায়যুদ্ধ বলা যাবে না। যুদ্ধে প্রযুক্ত বল হবে লক্ষ্যের সমানুপাতী।

সমানুপাতের এই নীতির একজন বড়ো সমালোচক হলেন Judith Wagner De Cew। তাঁর মতে তত্ত্বগতভাবে এই নীতিটি যতই গ্রহণযোগ্য হোক না কেন, বাস্তবে এ-নীতি মানার কয়েকটি অসুবিধা আছে। প্রথমত, লক্ষ্যের বিবেচনায় দু'প্রকার লক্ষ্যের ধারণা পাওয়া যেতে পারে — আশু সামরিক লক্ষ্য এবং সাধারণ রাজনৈতিক লক্ষ্য। এই দুই লক্ষ্যের গুরুত্ব বা আয়তন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। ফলে বলপ্রয়োগ ও লক্ষ্যের মধ্যে সমানুপাত নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়ত - কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য লাভ হবে অথচ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষতি সাধন হবে না — এমন উপায় নির্বাচন-পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। তৃতীয়ত লক্ষ্য ও সাধিত ক্ষতির মূল্যায়নের জন্য সমানুপাতের নীতি অনুযায়ী এক বিকল্প অস্ত্র-সম্ভারের কথা বলা যেতে পারে। নাপাম বোমার ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। De Cew বলেন, "But in practice it has been extremely uncommon for any existing weapons systems, especially those that are highly effective, to have been viewed as disproportionate."।

১.১৮.২ পৃথকীকরণের নীতি

পৃথকীকরণের নীতি সমরকাণ্ডের লক্ষ্যবস্তু চিহ্নিত করার কথা বলে। De Cew-এর কথায়, "The principle of discrimination usually prohibits intentional attacks on noncombatants, or, more generally, prohibits attacks on nonmilitary targets. Discrimination thus restricts appropriate targets in war to combatants and military installations."। De Cew-এর বক্তব্য সহজবোধ্য। যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয়, তাদের উপর সরাসরি ইচ্ছাপূর্বক আক্রমণ করা চলবে না। পৃথকীকরণের এই নীতি যারা যুদ্ধে লিপ্ত কেবল তাদের উপরেই সামরিক আক্রমণ কেন্দ্রিভূত করার কথা বলে।

পৃথকীকরণের এই নীতি মেনে নেবার প্রধান অসুবিধা দেখা দেয় — কারা যুদ্ধে লিপ্ত এবং কারা যুদ্ধে নির্লিপ্ত — এই দুই দলের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। এরই সঙ্গে De Cew-এর সংযোজন — "It is not obvious, for example, whether or not nonuniformed support personnel should be viewed as combatants."। এমন কি সাবেকী যুদ্ধ-বিগ্রহের বেলায় যুদ্ধে নির্লিপ্ত ব্যক্তিদের সনাক্ত করা গেলেও, আধুনিক রণকৌশলের ক্ষেত্রে তাদের সনাক্ত করার ব্যাপারটা আদৌ সহজ নয়।

১.১৮.৩ যুগ্ম ফল সম্পর্কিত নীতি/তত্ত্ব (The Doctrine of Double Effect)

St. Thomas Aquinas-প্রদত্ত নৈতিক বিচারের একটি সাধারণ মানদণ্ডকে যুগ্ম ফললাভের নীতি/তত্ত্বের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। মানদণ্ডটি এই — "... moral acts take their species according to what

is intended and not according to what is beside the intention, since this is accidental." (Summa Theologica)। যুগ্ম ফললাভের নীতি অনুসারে কোনো অন্যায্য ফলকেও মেনে নিতে হবে যদি তা অনভিপ্রেত হয়, অথচ তার মূলে নীতিগতভাবে ভালো ফল উৎপাদনের অভিপ্রায় থেকে থাকে। এই অর্থে নিরীহ মানুষের ক্ষতি সাধন করার কাজকে নীতিসম্মত কাজ বলতে হবে যদি সে কাজ অপরাধ দমনের সহায়ক হয়ে থাকে।

এই নীতি বা তত্ত্বটি মেনে নেবার অসুবিধা এই যে এখানে অভিপ্রায়কে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবে সম্ভব নয়। অবশ্য অভিপ্রেত কর্মের অনভিপ্রেত ফল ফলতেই পারে। তাছাড়া, 'অভিপ্রায়' শব্দটি এই তত্ত্বে যে ব্যঞ্জনা পেয়েছে তাতে ভালো অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়ে কেউ কোনো খুন-খারাপির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে।

১.১৮.৪ স্বাভাবিক অধিকার বিবেচনার নীতি এবং কান্টের নীতি

i) স্বাভাবিক অধিকার বিবেচনার নীতিতে যুদ্ধকালীন আচরণের ক্ষেত্রে কতকগুলি নিষেধ মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধ কোনো অধিকার লঙঘন করতে পারে না — এ নীতি মেনে চলা কাঠিন; কেননা যুদ্ধের হত্যালীলা জীবনের স্বাভাবিক অধিকার লঙঘন করে। এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন যে, যুদ্ধে লিপ্ত ব্যক্তিরা বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধিকার মেনে চলার বিধি-নিয়মগুলিকে খতিয়ে দেখার প্রশ্ন ওঠে। এ-নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ভাবনা শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। সে-সকল বিধি নিয়েও যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। হগ এবং জেনেভা সম্মেলনে গৃহীত সে-সকল বিধি সাধারণ চুক্তির আকারে নথিভুক্ত হয়েছে।

ii) কান্ট-প্রণীত শর্তহীন অনুজ্ঞাতেও যুদ্ধকালীন আচরণ মূল্যায়নের কথা আছে। শর্তহীন অনুজ্ঞা কাকে বলে? মানুষের ইচ্ছাকৃত কর্ম উচিত বা অনুচিত বলে গণ্য হয়। মানুষের ইচ্ছা যে নিয়মে চললে কোনো নিয়মনিষ্ঠ কর্মকে সমুচিত বলা যায় তাকে কান্ট সর্বজনীন ও অপরিহার্য নিয়ম বলেছেন। কান্ট-প্রণীত শর্তহীন অনুজ্ঞা এ-রকম একটি সর্বজনীন নৈতিক বিধান। এ বিধান বলে — "শুধু এমন ব্যক্তিগত নীতিনিষ্ঠ হয়ে কাজ করো যা সর্বজনীন নিয়মরূপেও গণ্য হতে পারে।" এ-বিধানে কোনো 'যদি-তবে' — এর উল্লেখ থাকে না। আর এখানেই শর্তাধীন বিধানের সঙ্গে শর্তহীন অনুজ্ঞার প্রভেদ। শর্তাধীন বিধান সবার বেলায় খাটে না। যেমন, 'বার্ধক্যে যদি সমৃদ্ধিময় জীবনযাপন করতে চাও, তবে যৌবনে অর্থ সঞ্চয় করো' — এই বিধানটি। শর্তহীন বিধান মানলে (ক) মানুষকে কেবল উদ্দেশ্যরূপেই বিচার করতে হবে, (খ) তাকে নিছক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়রূপে দেখা চলবে না। শেষের বিধিটি ব্যবহার করে যুদ্ধে-লিপ্ত ব্যক্তিদের হত্যাকে ন্যায়সঙ্গত মনে করার একটি কারণ আছে। বলা যায় — ওই ব্যক্তিরা যুদ্ধে অংশগ্রহণকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে। এই অর্থে তারা আর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে না।

"Perpetual Peace" প্রবন্ধে কান্ট আরেকটি নীতি সমর্থন করেছেন। তাঁর সমর্থিত এই নীতিটি হচ্ছে — "এমন কোনো সম্পাদিত শান্তি-চুক্তিকে বৈধ বলে গণ্য করা চলবে না যে চুক্তিতে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ লুকিয়ে থাকে।" এ-নীতির সঙ্গে আরেকটি নীতি সংযুক্ত করেছেন কান্ট এবং তা হচ্ছে — "যুদ্ধরত দেশগুলি

এমন আচরণ করবে না যাতে ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসের বাতাবরণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।'' নিষিদ্ধ আচরণ বলতে তিনি বিষপ্রয়োগ, গুপ্তহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঘৃণ্য রণকৌশল অবলম্বন প্রভৃতি বুঝিয়েছেন। কান্ট প্রণীত এ-নীতিগুলি যুদ্ধকালীন সর্বজনীন আচরণ বিধি — একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবুও নীতিগুলি এত সাধারণ (general) যে 'they are unlikely to yield uncontroversial substantive details about acceptable conduct in war.'।

১.১৮.৫ সামাজিক চুক্তি এবং উপযোগবাদী নীতি

যুদ্ধকালীন আচরণবিধি নিয়ে সামাজিক চুক্তির বক্তব্য সমানুপাতের নীতির বক্তব্যের অনুরূপ। আর উপযোগবাদী নীতিতে সমানুপাতের নীতির প্রতিফলন ঘটলেও এর কিছুটা অভিনবত্ব অনস্বীকার্য। যুদ্ধকালীন আচরণের নৈতিক মূল্যায়নের উপযোগী সূত্র প্রণয়ন করেছেন Henry Sidgwick। যুদ্ধে ক্ষতির রাশ টেনে ধরার কথা বলেছেন তিনি — সে ক্ষতি যে ধরনেরই হোক না কেন। বলা বাহুল্য, Sidgwick-এর কথায়ও সমানুপাতের নীতির প্রতিফলন আছে।

১.১৯ যুদ্ধ বিষয়ক আচরণ বিধি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

সাম্প্রতিক কালে যুদ্ধ বিষয়ক আচরণ বিধিগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মূলত তিনটি দৃষ্টি-কোণ থেকে এরকম চ্যালেঞ্জ এসেছে — শান্তিবাদী দৃষ্টিকোণ, রাষ্ট্রনৈতিক এবং নৈতিক দৃষ্টি-কোণ, এবং নারীবাদী দৃষ্টি-কোণ।

১.১৯.১ শান্তিবাদী দৃষ্টিকোণ

'শান্তিবাদ' হচ্ছে 'Pacifism' এর বাংলা। এই তত্ত্ব অনুসারে যুদ্ধ কখনই ন্যায্য হয় না। 'ন্যায়যুদ্ধ' তাই অযথা নামমাত্র। ন্যায়যুদ্ধের তত্ত্বের বিরুদ্ধে এ-তত্ত্বের চ্যালেঞ্জ — যুদ্ধের কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। তাছাড়া, যুদ্ধকালীন আচরণও সহিংস আচরণ।

১.১৯.২ রাষ্ট্রনৈতিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ

রাষ্ট্রনৈতিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে একটি সংঘাত বা বিরোধ লক্ষ করেছেন Thomas Nagel। রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তা রাষ্ট্রনৈতিক; আবার জীবন রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বও বহন করতে হয় আমাদের। প্রথমটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফললাভের জন্য গৃহীত উপায়ের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে, পরেরটি চরম লক্ষ্য লাভের জন্য কী করণীয় সে-রকম ক্ষেত্রে চরম সীমা আরোপ করার কথা বলে। Nagel এই দুই দাবির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো কথাই বলতে পারেন নি। আত্মরক্ষার্থে সমরাঙ্গনে সেনা-শত্রু নিধনকে তিনি সমর্থন করেছেন। তবুও বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এলাকা উড়িয়ে দেবার মতো ঘটনা নিন্দনীয় অপরাধ বলেই মনে হয়েছে তাঁর কাছে; কারণ এ-জাতীয় ঘটনা মনুষ্যত্বের পক্ষে অবমাননাকর।

১.১৯.৩ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ

বিগত বেশ কয়েক দশক ধরে নারীবাদীদেরও যুদ্ধ ও রণনীতির নিন্দায় মুখর হতে দেখা গেছে। নারীবাদীরা যুদ্ধ, হিংসা তথা সন্ত্রাসকে পুরুষতন্ত্র (patiarchy)-র সাথে সম্পৃক্ত করে বোঝেন। তাঁদের মতে লিঙ্গ (gender), হিংসা (violence) এবং যুদ্ধ (war) — এ তিনের মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁরা পুরুষালি যৌনতা এবং কথিত বীরত্বের সঙ্গে হিংসা মনুষ্যত্ব ও পুরুষাভিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ, এবং বলপূর্বক দুর্বল, নিরীহ মানুষজন ও বিশেষ করে নারীকে পদদলিত করার সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের কর্তৃত্ববাদের মধ্যেকার অনুষঙ্গের কথা বলেছেন। এই ব্যাখ্যানুসারে লিঙ্গবাদ ও সমরবাদ সমাজে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমরবাদের যুদ্ধ যাত্রায় যে অত্যুৎসাহ তার উৎস রয়েছে কিছু পুরুষালি বৈশিষ্ট্যে, যেমন প্রতিযোগিতাপ্রিয়তা ও আগ্রাসী মানসিকতা, ইত্যাদির মধ্যে। বস্তুতঃ সমরবাদের মতাদর্শ নারীবাদীর সাম্যের আদর্শ ও শান্তিবাদের পরিপন্থী। নারীবাদীরা বলতে চেয়েছেন পুরুষতন্ত্রের যে মতাদর্শ তার মধ্যে প্রভুত্বকামিতার এক যুক্তিধারা (the logic of domination) আছে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-ধর্ষণ ইত্যাদি তারই এক একটি বহিঃপ্রকাশ। প্রভুত্বজ্ঞাপক এই যুক্তিধারাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে, বা অন্যভাবে বললে, মেয়েলি গুণ বলে উপেক্ষিত সহযোগিতা ও পারস্পরিকতার নীতিতে স্থিত হলে পরই যুদ্ধের সম্ভাবনা নির্মূল হতে পারে।

যাই হোক, লিঙ্গবাদ ও সমরবাদ পরস্পর-সম্পর্কিত হলেও ন্যায়যুদ্ধের তত্ত্ব সরাসরি খারিজ হয়ে যায় না। কোন কোন নারীবাদী হয়ত চূড়ান্ত অর্থে শান্তিবাদ (absolute pacifism)-এর সমর্থক। কিন্তু নারীবাদের পক্ষে এটা স্বীকার করা অসম্ভব নয় যে শান্তিপ্রক্রিয়া চালু রাখার জন্য সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। বসনিয়ার মতো বিভিন্ন স্থানে যে বীভৎসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে তাকে প্রতিহত করার জন্য একটা সামরিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা যদি সত্য হয় তাহলে যুদ্ধের আচরণবিধির প্রয়োজন থেকেই যায়।

১.২০ সমসাময়িক কালে যুদ্ধের সমর্থনে

সমসাময়িক কালে যারা যুদ্ধের সপক্ষে সওয়াল করে থাকেন তাদের মধ্যে Michael Walzer অন্যতম। Walzer যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ন্যায় ও অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে প্রভেদ করেছেন। এসকল অংশগ্রহণকারীর মধ্যে কেবল রণক্ষেত্রে নিযুক্ত সৈনিকই নয়, যুদ্ধের পরামর্শদাতা ও পরিকল্পনারচয়িতারাও আছেন। অংশগ্রহণকারীদের দেওয়া বিবরণের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিষয়ক আচরণের মূল্যায়ন করেছেন Walzer। তাঁর এ-মূল্যায়নকে বলা যায় 'a comprehensive view of war as a human activity and a more or less systematic moral doetrine.'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর মূল্যায়নে 'Jus ad bellum' এবং 'Jus in bello' উভয়বিধ শর্তেরই আলোচনা আছে।

১.২১ সিদ্ধান্ত

যুদ্ধ দু'প্রকার — ন্যায় ও অন্যায়। অন্যায় যুদ্ধ নীতিনিন্দ্য। নীতিবিজ্ঞানীদের অনেকে তাই কিছু শর্ত মেনে ন্যায় যুদ্ধ সংঘটনের ধুয়ো তুলেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় যে, সেখানেও ধ্বংস অনিবার্য। যুদ্ধে লিপ্ত মানুষজন (combatant) নিধন ন্যায়যুদ্ধে ধ্বংসের কবল-মুক্ত নয়। এতে যুদ্ধ ঘোষক ও পরামর্শদাতারা রেহাই পেলেও লক্ষ-লক্ষ সেনা প্রাণ হারায়। যুদ্ধে সৈন্যদের প্রাণহানির কারণে দেশে-দেশে তাদের পরিবারদের আর্থিক অনুদানের

রীতিও চালু আছে। কিন্তু আর্থিক অনুদানের অঙ্ক যতো বড়োই হোক না কেন তাতে প্রাণের ক্ষতি পূরণ হয় কি? স্বেচ্ছায় সেনাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য সেনাদের প্রাণ কেড়ে নেওয়া সমর্থনীয় হলেও যাদের নির্দেশনা ও পরামর্শক্রমে তা ঘটে থাকে তারাই বা বহালতবিয়তে থাকেন কি করে? মোদ্দা কথা — যুদ্ধ অন্যায়, 'ন্যায়যুদ্ধ' কেবল নামেই। যুদ্ধকবিরা সে-কথা বহু আগেই রাষ্ট্রনায়কদের স্মরণে এনেছেন। দার্শনিকেরাও এ-ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাই যুদ্ধকে আজ আর নির্বোধের কাণ্ড-কারখানা বলা যায় না, এটা শয়তানের প্ররোচনা, R. Southey-এর কথায় 'a very wicked thing'।

১.২২ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. "Clearly, Aquinas' conditions must be revised and expanded to provide an adequate theory of just war".
   a) Explain the conditions referred to here.
   b) How will those conditions be revised?
   c) How will they be expanded?
2. Discuss the several principles regarding the morality of conduct in war.
3. Explain the several types of challenges to codes of warfare. How does Michael Walzer arive at the conclusion that 'the restraint of war is the beginning of peace'?
4. a) Distinguish between the conditions for 'jus ad bellum' and 'jus in bello'.
   b) Explain Aquinas' first two conditions as conditions for 'jus ad bellum'.

১.২৩ নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত প্রবন্ধ Judith Wagner De Cew-এর "Codes of Warfare"। প্রবন্ধটি Encyclopaedia of Applied Ethics, Volume 4 (Academic Press, 1998)-এ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি অবশ্যই পাঠ্য। এছাড়া সহায়ক গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি নিম্নরূপ :

1. G.E.M. Anscombe, 1962. "War and Murder". In W. Steen (ed.), Nuclear Weapons : A Catholic Response (pp. 43-62), New York : Sheed and Ward.

2. V. Held (1993), Feminist Morality, Chicago : University of Chicago Press.

3. T. Nagel (1972, " War and Massacre", Philosophy and Public Affairs, 1, 123-144.

4. J. Narveson (1965), "Pacifism : A Philosophical Analysis", Ethics 75, 259-271.

5. Immanuel Kant : Perpetual Peace - A Philosophical Essay, tr. and ed. M. Campbell Smith (London : George Allen and Unwin Ltd., 3rd Imp., 1917)

6. Sunil Roy, 2004, "Permanent Cessation of War" : A Study in Kant's Politico-moral Philosophy", in The Journal of the Indian Academy of Philosophy pp. 89-97, Kolkata, Indian Academy of Philosophy.

পাঠ একক - ২

সমতা ও তার তাৎপর্য

(Equality and its implications)

গঠন একক :

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ বর্ণবাদী বা জাতিবাদী ও লিঙ্গবাদী সমতার ধারণার বিরুদ্ধ পক্ষীয় মত

২.৩ জন রলস (John Rawls) -এর মত

২.৪ বর্ণবাদ বা জাতিবাদ ও লিঙ্গবাদ নিষিদ্ধকরণে সমতা নীতির বাস্তব ভিত্তি বিষয়ক আর একটি যুক্তি

২.৫ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি

২.৬ স্বার্থের বিবেচনায় বর্ণ বা জাতির একবর্ণের অপ্রাসঙ্গিকতা

২.৭ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটির প্রকৃতি

২.৮ সমতা এবং জিনগত বা বংশগত বিভিন্নতা

২.৯ বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্য এবং বর্ণ বা জাতিগত সমতা

২.১০ সংরক্ষণের সদর্থক কর্মসূচি

২.১১ সমতা ও প্রতিবন্ধীত্ব

২.১২ সিদ্ধান্ত

২.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.১৪ নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

২.০ উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দৌলতে আজ যেমন কম্পিউটার-বিদ্যা একটি স্বতন্ত্র শাখারূপে প্রচলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে পঠিত হচ্ছে, তেমনি দর্শনও পিছিয়ে নেই। দর্শনের একটি শাখা নীতিবিদ্যা। নীতিবিদ্যাও আজ বহুধা পল্লবায়িত। এর বহুধা পল্লবায়নে ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা আজ স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের যেসকল সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন এরকম বহু সমস্যাই এর অঙ্গনে। সেগুলি নিয়ে বিতর্কও কম নয়। এরকমই একটি সমস্যা সমতা নীতি (the principle of equality) সম্পর্কিত সমস্যা। সমতা বলতে আজ আর কেবল অর্থনৈতিক সমতা বোঝায় না। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ প্রভৃতি মাত্রাও সমতার ধারণার সাথে যুক্ত হয়েছে। পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত বহুমাত্রিক এই ধারণাটি নিয়েই এই পাঠ এককটিতে আলোচনা করা হবে।

২.১ প্রস্তাবনা

বিগত শতাব্দী নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। এ পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনও বিতর্কিত। পঞ্চাশ বছর পূর্বে গর্ভপাত নিষিদ্ধ ছিল। এখন তা আইনসিদ্ধ। বিবাহবন্ধন বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক, সমকামিতা, পর্ণোগ্রাফি, কৃপাহত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তনের কথা সত্য। সমতার ক্ষেত্রটি এমনই একটি ক্ষেত্র। তবে অনেকের মতে সমতার ক্ষেত্রে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অতটা নাটকীয় নয়। ১৯৮৭ সালে Rudyard Kipling বর্ণবিদ্বেষের উপর ভিত্তি করে 'ইতরজন' সম্পর্কে লিখে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তবে এখন কোন লেখক বর্ণবিদ্বেষ সমর্থন করে সুনাম বৃদ্ধি করতে পারবেন না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে এখন বর্ণ-বিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ নেই। এখন লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে হলে বর্ণগত বিদ্বেষ বা জাতি-বিদ্বেষ গোপন করতে হবে।

২.২ বর্ণ বা জাতিবাদী ও লিঙ্গবাদী সমতার ধারণার বিরুদ্ধ পক্ষীয় মত

বর্ণবাদী, লিঙ্গবাদী এবং সমতার ধারণার প্রতিপক্ষীয়গণ মনে করেন যে সকল মানুষ সমান — এই ধারণাটি কোনোভাবেই সত্য নয়। জগতে কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ সাহিত্যে কুশলী, কেউ সাহিত্যে অপটু; কেউ মানবেতর প্রাণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করতে চান না, কেউ আবার সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়ে মানুষও খুন করে থাকে। এরকম প্রচুর উদাহরণ দেওয়া যায়। সহজ সত্যটি হচ্ছে — মানুষের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর পার্থক্যগুলি এমন সব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাতে মনে হয়, সমতার নীতিটিকে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হতাশাব্যঞ্জক।

২.৩ জন রলস্ (John Rawls) -এর তত্ত্ব

জন রলসের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে A Theory of Justice। গ্রন্থটিতে রলস্ এক প্রকার গুণের কথা বলেছেন — পরিবৃত্তীয় গুণ (range property)। রলস্ বলেন, পরিবৃত্তীয় গুণ নির্বাচন করতে পারলে সমতাকে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। পরিবৃত্তীয় গুণ কাকে বলে? উদাহরণস্বরূপ, একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে সব বিন্দুই হচ্ছে পরিবৃত্তীয়। বৃত্তের অভ্যন্তরীণ বিন্দু সমূহের কিছু কিছু বিন্দু কেন্দ্রের নিকটবর্তী, কিছু কিছু বিন্দু প্রান্তের নিকটবর্তী। তবুও সব বিন্দুই বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ, সব বিন্দুই পরিবৃত্তীয়। অনুরূপভাবে রলস্ বলেন যে, নৈতিক ব্যক্তিত্ব সব মানুষের আছে। রলস্ 'নৈতিক' শব্দটিকে 'নৈতিক বহির্ভূত' পদের বিরুদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে একজন নৈতিক ব্যক্তির অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা বোধ থাকতে হবে। নৈতিক ব্যক্তি এমন একজন ব্যক্তি যার নিকট নৈতিক আবেদন যত্ন সহকারে বিবেচিত হয়ে থাকে। রলস্ নৈতিক ব্যক্তিত্বকে মানুষের সমতার ভিত্তি বলে মনে করেন।

পিটার সিঙ্গারের মতে রলস্ -এর নৈতিক ব্যক্তিত্বের ধারণাটি তাঁর ন্যায়পরায়ণতার চুক্তি সঞ্জাত। চুক্তিপ্রথা নৈতিকতাকে পারস্পরিক উপকার করার ঐক্যমত্য হিসেবে বিবেচনা করে। দুজন এভাবে ঐক্যমত্যে আসতে পারেন — 'আমি তোমাকে আঘাত করবো না, এবং তুমিও আমাকে আঘাত করবে না।' যারা এরকম উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে কেবল তারাই নীতিবিদ্যার পরিসরের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন হল — নৈতিক ব্যক্তিত্বকে সমতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা যায় কিনা?

সিঙ্গার নৈতিক ব্যক্তিত্বকে সমতার ভিত্তি হিসেবে দেখার কতকগুলি সমস্যার উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নৈতিক ব্যক্তিত্ব একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে বিন্দু থাকার মতো বিষয় নয়। নৈতিক ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটি একটি মাত্রাগত ব্যাপার। কোনো কোনো মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ন্যায়পরায়ণ। তারা নীতিবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি সম্বন্ধেও বেশ সচেতন। কিন্তু অনেকের মধ্যে এই সচেনতার বড্ড অভাব। তাছাড়া, রলসের মতে, সমতা নীতির পরিসরভুক্ত হতে হলে একজন মানুষকে নৈতিকব্যক্তি হতে হবে। কিন্তু সিঙ্গার বলেন যে রলস্-এর এই প্রস্তাব থেকে ন্যূনতম নৈতিকতার রেখাটি কোথায় টানা হবে তা স্পষ্ট হয় না। নৈতিক ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটি এতো গুরুত্বপূর্ণ হলে নৈতিক মর্যাদার স্তরবিন্যাস থাকা উচিত। এই স্তরবিন্যাসে অধিকার ও কর্তব্যের মাত্রা নির্ধারিত হবে নৈতিক চেতনার অনুশীলনের মাধ্যমে। কিন্তু রলস্-এর প্রস্তাব থেকে এজাতীয় কোনো সিদ্ধান্ত টানা যায় না। দ্বিতীয়ত, একটি অভিযোগ হচ্ছে এই যে, ন্যূনতম অর্থে একথা সত্য নয় যে সকল মানুষ নৈতিক ব্যক্তি। শিশু এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে নায়পরায়ণতার বোধের অভাব রয়েছে। ছোটো শিশু এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের কথা বাদ দিলেও একথা বলা যায় না যে সব মানুষই সমান। সাধারণভাবে সমতার নীতির দ্বারা যা বোঝায় রলসের কথায় তা বোঝা যায় না। যদি সমতার সংশোধিত নীতিটি এই ইঙ্গিত দেয় যে , যে দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা শিশু বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থ উপেক্ষা করতে পারি সেই দৃষ্টিকোণটি ভুল প্রমাণিত হবে যদি তারা আরো বয়স্ক বা বুদ্ধিমান হয়। তখন নীতিটি গ্রহণের বেলায় আমাদের উৎসাহ করতে আরো শক্তিশালী যুক্তির প্রয়োজন হবে। রলস্ সমতার নীতির আওতায় প্রকৃত নৈতিক ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের সঙ্গে সুপ্ত নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে শিশু এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটিকে সিঙ্গার একটি সাময়িক কৌশল বলে মনে করেন। সিঙ্গার মনে করেন যে, ইচ্ছাকৃতভাবে গঠিত এই কৌশলে রলস্ তাঁর মতের সমর্থনে কোনো স্বতন্ত্র যুক্তি না দিয়ে আমাদের সাধারণ নৈতিক স্বজ্ঞাবাদের আলোচনায় তাঁর মতবাদ যুক্ত করেছেন। সিঙ্গার আরো বলেন যে রলস্ স্বীকার করেন যে, স্থায়ীভাবে মানসিক প্রতিবন্ধীগণ একটি সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনো প্রস্তাব তাঁর নেই।

এই সকল সমস্যা বা অভিযোগের ভিত্তিতে সিঙ্গারের সিদ্ধান্ত — "So the possession of 'moral personality' does not provide a satisfactory basis for the principle that all humans are equal"। অর্থাৎ সিঙ্গারের মতে, নৈতিক ব্যক্তিত্ব থাকাটাই সমতার নীতিটির কোনো সন্তোষজনক ভিত্তি প্রদান করে না। যে কোনো প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য — তা 'পরিবৃত্তীয় গুণ' বা আর যাই হোক না কেন — তা সমতার নীতির ভিত্তি নয়। এক কথায়, নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এমন কোনো গুণ নেই যা সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান।

২.৪ বর্ণবাদ তথা জাতিবাদ ও লিঙ্গবাদ নিষিদ্ধকরণে সমতা নীতির বাস্তব ভিত্তি বিষয়ক আরেকটি যুক্তি

বর্ণবাদ (racism) ও লিঙ্গবাদ (sexism) নিষিদ্ধকরণে রলস্-এর মত সমতা নীতির বাস্তব ভিত্তি সংক্রান্ত এক রকম যুক্তি উপস্থাপন করে। সমতা নীতির বাস্তব ভিত্তি সংক্রান্ত আরেক প্রকার যুক্তিও আছে। ব্যক্তি হিসেবে মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে — একথা সত্য। কিন্তু জাতিতে জাতিতে, শ্বেতাঙ্গে-কৃষ্ণাঙ্গে বা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য নেই। একথার অর্থ — কেউ শ্বেতকায় বা কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ

পুরুষ বা কেউ স্ত্রী — তা জানা সত্ত্বেও এই বিষয়গুলি তাদের বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতাবোধ, অনুভূতির গভীরতা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় কোনো সাহায্য করে না। অন্য কথায়, উল্লিখিত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অসম হিসেবে বিবেচনা করতে আমাদের বাধ্য করে না। এক কথায়, বুদ্ধি, ন্যায়পরায়ণতাবোধ, অনুভূতির গভীরতা প্রভৃতি যোগ্যতাবলে শ্বেতকায় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ— বর্ণবাদীদের এই দাবি যথার্থ নয়। কোনো কৃষ্ণকায় ব্যক্তিও শ্বেতকায় ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ-হতে পারে। অনুরূপ কথা লিঙ্গবাদী যুক্তির ক্ষেত্রেও সত্য। লিঙ্গবাদীগণ পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের অধিক আবেগপ্রবণ, কম যুক্তিবাদী, কম উদ্যমী ও কম সাহসী বলে মনে করেন। এই দাবিটি সকল স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে সত্য নয়। কিছু কিছু স্ত্রীলোক পুরুষের চেয়ে কম আবেগপ্রবণ, বেশি যুক্তিবাদী, বেশি উদ্যমী ও বেশি সাহসী।

সিঙ্গারের মতে এই প্রকার যুক্তি সমতার নীতির কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নয়। অন্যদিকে এই প্রকার যুক্তি কট্টর বর্ণবাদী বা লিঙ্গবাদীর চেয়ে অধিকতর মার্জিত সমতানীতির বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে স্বপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত নয়। ধরা যাক, বুদ্ধির পরীক্ষার সাহায্যে মানুষকে উচ্চতর বা নিম্নতর শ্রেণিভুক্ত করা হবে। পরীক্ষায় যাদের বুদ্ধ্যাঙ্ক ১২৫-এর উপর থাকবে তাদের দাস-মালিক শ্রেণিভুক্ত করা হবে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ থেকে ১২৫-এর মধ্যে হবে তারা হবে মুক্ত নাগরিক। আর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-এর নীচে তারা দাস বলে গণ্য হবে। কিন্তু সিঙ্গার বলেন, "A hierarchical society of this kind seems as abhorrent as one based on race or sex ..."। আবার সিঙ্গারের মতে সমতার নীতিকে তথ্যগত ভিত্তিতে সমর্থনেরও অসুবিধা আছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যের ব্যাপারটি বর্ণ, জাতি বা লিঙ্গের সীমা অতিক্রম করে যায়। তখন অসমতাবাদীদের বিরোধিতা করার কোনো ভিত্তি আমাদের থাকে না।

২.৫ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি (The Principle of Equal Consideration of Interests)

নৈতিক অবধারণ গঠন কতকগুলি নীতি-নির্ভর। এরকম অবধারণ গঠনকালে আমরা খণ্ডিত বা ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে থাকি। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বার্থ বিবেচনা করে থাকি। এর অর্থ — আমরা স্বার্থের মূল্য দিয়ে থাকি। আমরা স্বার্থগুলিকে স্বার্থ হিসেবেই বিবেচনা করে থাকি। স্বার্থ কার তা বড়ো কথা নয়। স্বার্থবিবেচনার এই মৌলিক নীতিটিকে বলা হয় স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি।

Practical Ethics বইতে সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই নীতির মর্মার্থ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে একটি কাজ দ্বারা যদি শুধু ক এবং খ-এর প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা থাকে, এবং খ-এর লাভবান হবার চেয়ে ক-এর অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে তবে কাজটি না করাই অধিকতর ভালো। এর অর্থ — একটি স্বার্থ স্বার্থই, তা যার স্বার্থই হোক না কেন।

একটি বিশেষ স্বার্থ বিবেচনার মাধ্যমে সিঙ্গার বিষয়টি আরো বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে সিঙ্গার বেদনা উপশমের ক্ষেত্রে আমাদের স্বার্থের বিবেচনা করেছেন। ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নৈতিক যুক্তিটি হচ্ছে শুধু ব্যথার অকাম্যতাকে দূর করা। শুধু ক-এর ব্যথার অকাম্যতাকে দূর করা নয়, যা খ-এর ব্যথার অকাম্যতার চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। অবশ্য, খ-এর ব্যথার চেয়ে ক-এর ব্যথা অধিকতর অকাম্য হতে পারে; হতে

পারে তা অধিকতর বেদনাদায়ক। এক্ষেত্রে সমবিবেচনার নীতিটি ক-এর ব্যথা উপশমের উপর অধিক গুরুত্ব দেবে। আবার ব্যথার পরিমাণ সমান হলে এবং অন্যান্য ব্যক্তির যদি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় অন্যান্য বিষয়ও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। যদি ভূকম্পের ফলে একজন ডাক্তার আহত হন তবে আমরা তার ব্যথা উপশমের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেবো কারণ তিনি সুস্থ হলে অন্যান্য ব্যক্তির চিকিৎসা করতে পারবেন।

২.৬ স্বার্থের বিবেচনায় বর্ণ বা জাতির প্রকরণের অপ্রাসঙ্গিকতা

স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি অনুসারে বর্ণ বা জাতি (race)-এর প্রকরণটি অপ্রাসঙ্গিক, কেননা এক্ষেত্রে শুধু স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা যদি কোনো বেদনাকে এই বলে সমগুরুত্ব দেই যে তা একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়েছিল তবে তা একটি স্বেচ্ছাচারমূলক পার্থক্য সৃষ্টি করবে। সিঙ্গার আলোচ্য ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। কেন বর্ণ বা জাতির প্রশ্নটি আদৌ বাছাই করা হয়? যে ব্যক্তিটি লীপ ইয়ারে জন্ম গ্রহণ করেছিল তাকে কেন বেছে নেওয়া হয় না? যার ডাকনামে একাধিক স্বরবর্ণ রয়েছে তাকে বাছা হয় না কেন? সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রশ্নগুলি ব্যথার অকাম্যতার ক্ষেত্রে সমভাবে অপ্রাসঙ্গিক। সুতরাং স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি কেন নাৎসিবাদের মতো সবচেয়ে অবাঞ্ছিত বর্ণবাদ বা জাতিবাদের রূপটি ভুল তা সরাসরি প্রতিপন্ন করে। কারণ নাৎসিরা শুধু আর্যজাতির কল্যাণ নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিল। ইহুদি জিপসি এবং স্লাব জাতির দুঃখ-দুর্দশায় তাদের কোনো উদ্বেগ ছিল না।

মানুষের সামর্থ্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বার্থের তারতম্য ঘটতে পারে। তবে মানুষের স্বার্থ সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে আমরা বুঝতে পারি না স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে। কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ছেলেমেয়েদের সহজাত পারদর্শিতা লক্ষ করে আমরা তাদের খুব অল্প বয়স থেকেই তাদের ওই শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ করে তোলার জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারি। কিন্তু তাতে মৌলিক উপাদানটি বা স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্ময়কর ও আপাতদৃষ্টিতে সত্য নয় বলে প্রতীয়মান বিশ্বাসগুলি ব্যতীত বুদ্ধি পরীক্ষায় একটি বিশেষ সীমার নীচে সাফল্যাঙ্কলাভকারী ব্যক্তিদের ক্রীতদাস করার বিষয়টি স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। মানুষের অনেক স্বার্থের সঙ্গেই বুদ্ধির করণীয় কিছু নেই। যেমন, ব্যথা পাওয়া এড়িয়ে চলার স্বার্থ, একজনের সামর্থ্য উন্নত করার স্বার্থ, খাদ্য ও আশ্রয়ের মতো মৌলিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করার স্বার্থ, অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার স্বার্থ, অন্যের অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ ব্যতীত একজনের স্বাধীনভাবে প্রকল্প পরিচালনা করার স্বার্থ প্রভৃতি। ক্রীতদাসত্ব ক্রীতদাসদের এসব স্বার্থ পূরণ করা থেকে বিরত রাখে। এটি দাসমালিকদের যেসব সুবিধা প্রদান করে এবং ক্রীতদাসদের যে ক্ষতিসাধন করে গুরুত্বের দিক থেকে তা কদাচিৎ তুলনাযোগ্য। সিঙ্গার যে সিদ্ধান্ত টেনেছেন — "So the principle of equal consideration of interests is strong enough to rule out an intelligence-based slave society as well as cruder forms of racism and sexism"। অর্থাৎ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি বুদ্ধি পরীক্ষার ভিত্তিতে গঠিত দাসসমাজ এবং বর্ণবাদ বা জাতিবাদ ও লিঙ্গবাদের স্থূলতর রূপগুলিকে বাতিল করতে যথেষ্ট শক্তিশালী।

২.৭ স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির প্রকৃতি

স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি সব সময় সম আচরণ নির্দেশ করে না। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ধরা যাক, ভূকম্পে দু'জন ব্যক্তি আহত। এদের একজন গুরুতর আহত। অপর জন সামান্য চোট পেয়েছে। আমাদের দুটি মরফিন্ ইনজেকশন আছে। সম আচরণ প্রত্যেক আহত ব্যক্তিকে একটি করে ইনজেকশন দেবার কথা বলবে। কিন্তু একটি ইনজেকশনে গুরুতর আহত ব্যক্তির ব্যথার তেমন উপশম হবে না। অল্প আহত ব্যক্তির চেয়ে তার বেশি ব্যথা থেকেই যাবে। এরকম ক্ষেত্রে গুরুতর আহত ব্যক্তিকেই দ্বিতীয় ইনজেকশনটি দেওয়া হবে। তাতে সামান্য আহত ব্যক্তির চেয়ে তার ব্যথার অনেক উপশম ঘটবে। মনে হতে পারে — স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি অসম ফলদায়ক।

স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটির একটি বিতর্কিত অসমতার তাৎপর্যও রয়েছে। স্বার্থের সমবিবেচনা অসম আচরণে উপনীত করলেও সেই অসম আচরণ সমফল প্রদানেরই এক প্রয়াস। গুরুতরভাবে আহত ব্যক্তিকে দু'টি ইনজেকশন দেবার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে দুজন আহত ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত কষ্টের মাত্রাগত পার্থক্য কম। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি করে ইন্‌জেকশন দিলে কষ্টের এই মাত্রাগত পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা একজনকে বেশি ব্যথা এবং অন্য ব্যক্তিকে কোন ব্যথার মধ্যে না রেখে ঘটনাটি শেষ করতাম।

সিঙ্গার মনে করেন, স্বার্থের সমবিবেচনার এই নীতিটি অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নীতি অনুসারে একটি লোকের কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য অধিক প্রয়োজনীয় হবে যদি সেই লোকটির কাছে সেই দ্রব্য কম পরিমাণে থাকে। দুজন লোকের একজনের প্রতিদিনের বরাদ্দ ২০০ গ্রাম চাল, অন্য জনের প্রতিদিনের বরাদ্দ ১ কেজি চাল। সেক্ষেত্রে প্রথম জনকে ৫০ গ্রাম চাল অতিরিক্ত বরাদ্দ করলে, দ্বিতীয় জনকে ওই পরিমাণ অতিরিক্ত চাল বরাদ্দ করার চেয়ে অধিক কার্যকর হবে। সিঙ্গার স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটির প্রয়োজনের বেলায় এই কার্যকারিতার দিকে নজর দিতে বলেছেন। তাঁর মতে ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটির চাহিদা আছে।

২.৮ সমতা এবং বংশগতি বা জিনগত বিভিন্নতা (Equality and Genetic Diversity)

১৯৬৯ সালে Harvard Education Review-তে Jensen-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল — ''আমরা বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানার্জনে কতটা উন্নতি সাধন করতে পারি?'' প্রবন্ধটির একটি পরিচ্ছেদে একটি ঘটনার সম্ভাব্য কারণ আলোচিত হয়। ঘটনাটি হচ্ছে —গড়পড়তাভাবে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানগণ বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষায় শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের মতো ভালো সাফল্যাঙ্ক অর্জন করে না। Jensen আলোচিত বিষয়ের সারাংশ নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন :

"All we are left with are various lines of evidence, no one of which is definitive alone, but which, viewed altogether, make it a not unreasonable hypothesis that genetic factors are strongly implicated in the average negro-white intelligence difference. The preponderance of evidence is, in my opinion, less consistent with a strictly

environmental hypothesis than with a genetic hypothesis, which, of course, does not exclude the inflence of environment or its interaction with genetic factors".

"অবশেষে আমাদের কাছে প্রমাণের বিভিন্ন দিকগুলো থেকে যায়, যার কোনোটিই এককভাবে চূড়ান্ত নয়। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি কোনো অযৌক্তিক প্রকল্প নয় যে, গড়পড়তা নিগ্রো-শ্বেতকায় ব্যক্তির বুদ্ধির পার্থক্যের ক্ষেত্রে বংশগত উপাদানগুলো সুস্পষ্টভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মতে, প্রমাণের গুরুত্বটি বংশগত প্রকল্পের চেয়ে সুস্পষ্টভাবে পরিবেশগত প্রকল্পের সঙ্গে কম সঙ্গতিপূর্ণ, যা অবশ্য পরিবেশের প্রভাব বা বংশগত উপাদানগুলোর সঙ্গে পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়াকে বাদ দেয় না।" (তর্জমা ড. প্রদীপ কুমার রায়ের)

বর্ণবাদকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে Jensen-এর এই বক্তব্য বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। Jensen-কে বর্ণবাদ (racism) প্রচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে তাঁর বহিষ্কারের দাবি তোলে।

সিঙ্গারের মতে, বর্ণগত বা জাতিগত পার্থক্যের উল্লিখিত জিনগত বা বংশগতিগত ব্যাখ্যার বিরোধিতার মানে সামাজিকভাবে অন্যান্য সংবেদনশীল ঘটনার জিনগত ব্যাখ্যার অতি সাধারণ বিরোধিতার কেবল একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুরুষজাতির কর্তৃত্বের পিছনে জৈবিক উপাদান বর্তমান — এই নারী-বিদ্বেষপ্রসূত ধারণার সঙ্গে উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি বেশ সঙ্গতিপূর্ণ। আচরণ বিষয়ক আলোচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে নারীবাদী ধারণাটির একটি সম্পর্ক প্রকটিত। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আচরণের এই আলোচনা 'সমাজ-জীববিজ্ঞান' নামে পরিচিত।

অবশ্য, সিঙ্গার এ-কথা মনে করেন না যে মানুষের আচরণের জৈবিক ব্যাখ্যার, বিশেষ করে জাতিগত বা লিঙ্গগত পার্থক্যের গুণাবলি মূল্যায়নের চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে সঙ্গত। তাঁর অনুরাগ বরং সমতার আদর্শের জন্য এই রকম মতের তাৎপর্য নিয়ে। তিনি ধরে নিচ্ছেন যে Jensen-এর বক্তব্য সঠিক। তাঁর প্রশ্ন — এর দ্বারাই কি প্রমাণিত হয় যে, বর্ণবাদ সমর্থনীয় এবং সমতার নীতিটিকে বাতিল করতে হবে? তাঁর মতে বিভিন্ন লিঙ্গের মতো জৈবিক পার্থক্য সংক্রান্ত মতবাদগুলোর তাৎপর্য নিয়েও এরকম প্রশ্ন তোলা যায়। কিন্তু তাতে প্রমাণিত হয় না যে মতগুলি নির্ভরযোগ্য। প্রশ্নগুলিকে অবজ্ঞা করা, সিঙ্গার-এর মতে, দুর্ভাগ্যজনক হবে। তাছাড়া, কোনো অপ্রত্যাশিত প্রমাণ মতগুলিকে স্বীকৃতি দিলে তার পরিমাণ হবে আরো হতাশাব্যঞ্জক। কৃষ্ণকায় এবং শ্বেতকায় ব্যক্তিদের মধ্যে গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য আছে; এবং এই পার্থক্যের অন্তত একটি অংশের জন্য বংশগত উপাদানগুলিকেই দায়ী মনে করেন তিনি।

২.৯ বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্য এবং বর্ণজাতিগত সমতা (Racial Differences and Racial Equality)

আমরা জানি — বর্তমানে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির মধ্যে, বিশেষ করে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ এবং আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে কথিত কর্মক্ষমতার জিনগত পার্থক্যের প্রায় সব আলোচনাই বুদ্ধির পার্থক্য-ভিত্তিক। সিঙ্গার এই বিষয়টির উপর সমধিক গুরুত্ব দিয়েই বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্য এবং বর্ণগত তথা জাতিগত সমতার

আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। আলোচনার শুরুতে তিনি একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেবার কথা বলেছেন। IQ সংক্ষিপ্ত নাম, যার পুরো নাম Intelligence Quetient। IQ-এর বাংলা তর্জমা বুদ্ধ্যঙ্ক। যখন দু'টি বর্ণ বা জাতির মধ্যে বুদ্ধিগত পার্থক্যের কথা বলা হয় তখন প্রকৃতপক্ষে আদর্শ বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষার ভিত্তিতেই তাদের মধ্যে সাফল্যাঙ্কের পার্থক্য বোঝানো হয়। বুদ্ধি বলতে সাধারণভাবে যা বোঝায় বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় ঠিক তা পরিমিত হয় না। তবে বুদ্ধি ও বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধিমান হিসেবে বিবেচিত ছাত্রেরা স্বাভাবিক বুদ্ধিসীমার নীচে বিবেচিত ছাত্রদের চেয়ে বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় ভালো সাফল্যাঙ্ক অর্জন না করলে বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষাগুলি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এ-থেকে তাদের সম্পর্ক বোঝা যায় না। বুদ্ধি সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অস্পষ্ট। অনেক মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় যা পরিমিত হয় তাকেই বুদ্ধি বলে অভিহিত করেন। তাতে কেবল বুদ্ধি-বিষয়ক একটা নতুন ধারণা গড়ে ওঠে।

বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষায় অর্জিত সাফল্যাঙ্কের পার্থক্য থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন — বুদ্ধ্যঙ্ক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। 'বুদ্ধ্যঙ্ক ও বুদ্ধি অভিন্ন' এই মতের বিপরীত ওই সিদ্ধান্তটি। সিঙ্গার এই সিদ্ধান্তটিকে ভ্রান্ত বলেই মনে করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, সমাজে বুদ্ধ্যঙ্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পেশাগত পদমর্যাদা, আয় বা সামাজিক মর্যাদা উন্নতির জন্য বুদ্ধ্যঙ্ক একটি নির্ধারক। বর্ণগত বা জাতিগতভাবে বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্যের ক্ষেত্রে জিন বা বংশগত উপাদান বর্তমান থাকলে বর্ণগতভাবে পেশাগত পদমর্যাদা, আয় এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রেও জিন বা বংশগত উপাদান থাকবে। তাই সিঙ্গার-এর মতে, সমতায় আগ্রহী হলে বুদ্ধ্যঙ্ককে উপেক্ষা করা চলে না।

যখন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় তখন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের উচ্চতর সাফল্যাঙ্ক পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষা অনুসারে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের গড়পড়তা সাফল্যাঙ্ক ১০০, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের প্রায় ৮৫। আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে ওই ফলাফল সীমিত থাকলেও তাকে বিতর্কিত ব্যাপার বলে মনে করেন না সিঙ্গার। তাঁর কাছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের বিষয় সেটি হচ্ছে — এই পার্থক্যটিকে পরিবেশ, না জিন বা বংশগতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে? অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিই সামাজিক ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনার কারণেই কি এই পার্থক্য?

Practical Ethics গ্রন্থে আমরা দেখি সিঙ্গার জিন বা বংশগতির প্রকল্পটির তাৎপর্য অনুসন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন। সেই প্রয়াসে তিনি ওই প্রকল্পটিকে পূর্বানুমানরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন — সেক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে জিন বা বংশগতভাবে ১০-১৫ পয়েন্টের গড় পার্থক্যের তাৎপর্যটি কী হবে? তাঁর বিশ্বাস — এই অনুমানের তাৎপর্যটিকে সাধারণত যেভাবে দেখা হয়, তা ঠিক নয়। তিনি মনে করেন — এই তাৎপর্য প্রকৃত বর্ণবাদীদের কোনো সান্ত্বনা প্রদান করেনা। তাঁর এই মতের সমর্থনে তিনি তিনটি যুক্তি দিয়েছেন।

প্রথমত, বংশগতি প্রকল্পটিকে সঠিক বলে ধরে নিলেও আমাদের প্রয়াস এমন কোনো অবস্থার সৃষ্টি করে না যেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্ক সমান। এমন কি সকল পরিবেশগত অসুবিধা দূর করা সম্ভব হলেও গড়পড়তাভাবে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির চেয়ে গড়পড়তাভাবে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক ১০ পয়েন্টের উপরে থাকবে। অবশ্য বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্তের জন্যও কেউ খুব ভালো যুক্তি দিতে পারেন — যদি বুদ্ধ্যঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিরা যে পরিবেশগত অসুবিধা থেকে জীবন যাপন শুরু করে তা পরিপূরণের জন্য তাদের উন্নততর পরিবেশ পাওয়া উচিত।

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের গড় বুদ্ধ্যঙ্কের চেয়ে শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের গড় বুদ্ধ্যঙ্ক ১৫ পয়েন্টে উচ্চতর হওয়ায় কারোও একথা বলার সুযোগ থাকে না যে — সকল কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির চেয়ে সকল শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক উচ্চ — একথা মিথ্যা। অথবা, যেকোনো বিশেষ কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তির চেয়ে যেকোনো বিশেষ শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির উচ্চতর বুদ্ধ্যঙ্ক আছে — এই কথাটাও প্রায়ই মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। আসলে সংখ্যাগুলি গড়সংখ্যা। এগুলি বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো মত প্রকাশ করে না। অনেক কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের গড় সাফল্যাঙ্কের চেয়ে উচ্চতর সাফল্যাঙ্ক অর্জন করে থাকেন। অনেক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের গড় সাফল্যাঙ্কের চেয়ে নিম্নতর সাফল্যাঙ্ক অর্জন করে থাকেন। তাই গড়পড়তা বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্যের যেকোনো কারণ শিক্ষা বা যেকোনো ক্ষেত্রে বর্ণ বা জাতিবাদী পৃথকীকরণের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে না। বর্ণ বা জাতিনির্বিশেষে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের ব্যক্তি হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়ত, বংশগত প্রকল্পটি জাতিবাদের সমর্থনে কোনো যুক্তি প্রদান করে না। সাধারণভাবে সমতার নীতিটি প্রকৃত সমতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল মানুষ প্রকৃত সমতা সমভাবে ভোগ করে না। সমতা নীতির একমাত্র সমর্থনীয় ভিত্তিটি হচ্ছে স্বার্থের সমবিবেচনা। মানুষের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসমূহ বুদ্ধির পার্থক্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। যেমন, যন্ত্রণা এড়িয়ে যাওয়া, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি মৌল অভাবগুলির পূরণ, উষ্ণ ব্যক্তিগত সম্পর্ক উপভোগ প্রভৃতি বিষয় বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য দ্বারা প্রভাবিত নয়। Thomas Jefferson একথা জানতেন। তিনিই আমেরিকায় সমতার একটি খসড়া তৈরি করেছিলেন। নিগ্রোদের বুদ্ধির অভাব আছে — এই মত খণ্ডনে তিনি লিখেছিলেন,

"Be assured that no preson living wishes more sincerely than I do, to see a complete refutation of the doubts I have myself entertained and expressed on the grade of understanding allotted to them by nature, and to find that they are on a par with ourselves ... but whatever be their degree of talent, it is no measure of their rights. Because Sir Isaac Newton was superior to others in understanding, he was not therefore lord of the property or person of others".

''এই মর্মে আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে, নিগ্রোদের প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধিমত্তার স্তর এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাদের সমতা বিষয়ে আমি যেসব সংশয় প্রকাশ করেছি সেগুলো খণ্ডন হয়ে যাক তা কোনো মানুষ আমার চেয়ে বেশি আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করে না ... কিন্তু তাদের মেধার মাত্রা যাই হোক না কেন সেই মানদণ্ডে তাদের পরিমাপ করা চলে না। কারণ স্যার আইজ্যাক নিউটন (Isaac Newton) বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে অন্যান্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাই বলে তিনি অন্যান্য মানুষের সম্পত্তি বা মানুষের মালিক ছিলেন না। (তর্জমা ড. প্রদীপ কুমার রায়ের)

সিঙ্গার-এর মতে Jefferson-এর বক্তব্য সঠিক। বংশগতির কারণে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদের মতো বুদ্ধ্যঙ্ক অভীক্ষায় ভালো সাফল্যাঙ্ক অর্জন না করার দাবি — সকল মানুষ সমান — এই নৈতিক নীতিটি প্রত্যাখ্যানের ভিত্তি প্রদান করে না।

২.১০ সংরক্ষণের সদর্থক কর্মসূচি (Affirmative Action)

একটি অধিকতর সমতাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা নৈতিকভাবে কাম্য হলেও তা বাস্তবায়িত করা কঠিন। তবে আমরা অন্ততপক্ষে এটুকু আশা করতে পারি যে আয়, পদমর্যাদা এবং ক্ষমতার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমাজে স্ত্রীজাতি এবং বর্ণ বা জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ অর্থনৈতিকভাবে খুব খারাপ অবস্থায় থাকবে না। প্রশ্ন হলো — কীভাবে একটি অসমতাভিত্তিক সমাজে বর্ণ বা জাতিগত বা লিঙ্গগত সমতা অর্জন করা যাবে? সুযোগের সমতা বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব। এমন কি তা বাস্তবায়ন করা গেলেও তাতে সমাজে উচ্চ স্তরের সদস্য নির্ধারণে অন্যায়ভাবে আক্রমণাত্মক মনোভাব বা বুদ্ধ্যঙ্কের সহজাত পার্থক্যকে স্বীকার করে নিতে হবে। সিঙ্গার-এর মতে এরকম বাধা দূর করার একটি পথ হচ্ছে সুযোগের সমতার নীতিটিকে অতিক্রম করা এবং অনগ্রসর গোষ্ঠীর সদস্যদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুযোগ প্রদান করা। একেই বলা হয় সদর্থক কর্মসূচি বা সংরক্ষণ। সিঙ্গার-এর ভাষায় 'It may be the best hope of reducing long-standing inequalities ...''। অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে জিইয়ে রাখা অসমতা হ্রাস করার এটাই সবচেয়ে উত্তম আশা। তবুও সমতা নীতির নিয়ম লঙঘন করে বলে এটিও একটি বিতর্কিত কর্মসূচি।

সিঙ্গার লক্ষ করেছেন যে শিক্ষা ও চাকুরির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের পথ অনুসৃত হয়ে থাকে। এনিয়ে মামলাও কম হয় নি। সিঙ্গার-এরকমই একটি মামলার কথা উপস্থাপন করেছেন। মামলাটি 'Regents of the University of California *versus* Bakke' নামে প্রসিদ্ধ। Alan Bakke ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগে ভর্ত্তির জন্য আবেদন করেন। সেখানে ভর্তির পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতি ১০০টি আসনের মধ্যে ১৬টি আসন অনগ্রসর সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছিল। এই সংরক্ষণ আসন ব্যতীত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্ররা বেশি সংখ্যক আসন লাভ করতে পারতো না। অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষিত থাকায় সেখানে কম সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ভর্তি হয়। কিছু শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ভর্ত্তি করতে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু তারা যদি কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র হতো তাহলে নির্বাচনী পরীক্ষায় তারা যে নম্বর পেয়েছিল নিশ্চয়ই তাদের সেই আসনগুলি দেওয়া হতো। Bakke ছিলেন এমনই এক শ্বেতাঙ্গ ছাত্র যার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভর্ত্তি বাতিল হয়। Bakke বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা রুজু করেন। সিঙ্গার এই মামলাটিকে সদর্থক সংরক্ষণ কর্মসূচি তথা বিপরীত বৈষম্যের একটি প্রামাণিক মামলা বলে মনে করেন। তাঁর প্রশ্ন — মামলার রায় কি সমর্থনীয়? সিঙ্গার-এর মতে এ-প্রশ্নের উত্তর নিম্নরূপ।

ধরা যাক, জনসংখ্যার শতকরা ১৬জন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। সেই জনসংখ্যার শতকরা ২ জন ডাক্তার। তাহলে সিঙ্গার-এর মতে এটাই পর্যাপ্ত প্রমাণ যে কোনো-না-কোনোভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। ঘটনাটি এমনও হতে পারে যে ডাক্তার হবার জন্য একজন মানুষের যে ধরনের পড়াশোনা প্রয়োজন সেই তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রগণ গড়পড়তাভাবে কম সহজাত গুণসম্পন্ন। সুতরাং অনুপাতহীনভাবে কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারের সংখ্যা কম হওয়াটাই কৃষ্ণকায়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রমাণ নয়। অবশ্য অন্য প্রমাণ থাকার সম্ভাবনাও অস্বীকার করেন না সিঙ্গার। তিনি একথা স্বীকার করেন যে অন্য প্রমাণ থেকে এমনও ইঙ্গিত মিলতে পারে যে,

কৃষ্ণাঙ্গ ডাক্তারদের কম সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে বৈষম্যেরই ফল। তবে এ-বিষয়টিকে প্রমাণ-সাপেক্ষ বলেই তিনি মনে করেন। কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের সদর্থক প্রমাণ-ব্যতিরেকে এটি শুধু সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের ভারসাম্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে — এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে সংরক্ষণের ন্যায্যতা প্রমাণ করা সম্ভব নয় বলেই মত প্রকাশ করেছেন সিঙ্গার।

ভর্ত্তির পরীক্ষায় বেশি নম্বর অর্জনকারী একজন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের চেয়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একজন কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রকে ভর্ত্তি করার সিদ্ধান্তকে ভিন্নভাবেও সমর্থন করা যেতে পারে বলে মনে করেন সিঙ্গার। এই সমর্থনের পক্ষে এ-যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে অনগ্রসর অবস্থায় বসবাসকারী কোনো ছাত্র আদর্শ মানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তা তার সামর্থ্যের সঠিক নির্দেশক হয় না। বলা বাহুল্য, সুযোগের সমতা অর্জনের অসম্ভাব্যতা বিষয়ক যে যুক্তি প্রদান করা হয়, এ-যুক্তিটি তার অনুরূপ। শিক্ষা, গৃহ, পরিবেশ নির্বাচনী পরীক্ষায় ফলাফলকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনী পরীক্ষায় শতকরা ৭০ নম্বর পেয়ে আসা যেকোনো ছাত্রের চেয়ে শতকরা ৫৫ নম্বর পাওয়া অধিকার বঞ্চিত পটভূমি থেকে আসা একজন ছাত্রের সর্বনিম্ন সময়ে স্নাতক হবার অধিকতর ভালো সম্ভাবনা থাকতে পারে। এর ভিত্তিতে নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়ের অর্থ অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের চেয়ে অনগ্রসর সংখ্যালঘু শ্রেণির ছাত্রদের অগ্রাধিকার স্বীকার নয়। এতে বরং এই সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটে যে অনগ্রসর ছাত্রেরা অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন। এটা কোনো বর্ণগত বা জাতিগত বৈষম্য নয়।

সিঙ্গার বলেন — সকল মানুষ সমান — এই দাবির একমাত্র সম্ভাব্য ভিত্তি হচ্ছে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি। এই নীতিটি বর্ণ বা জাতিগত ও লিঙ্গগত বৈষম্যের বিভিন্ন রূপকে আইনের আওতা থেকে বাইরে রাখে। এ-ধরনের বৈষম্য যাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয় তাদের স্বার্থের প্রতি কম গুরুত্ব প্রদান করে। Bakke কি দাবি করতে পারেন যে, তার আবেদনপত্রটি বাতিল করায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিভাগ সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রদের চেয়ে তার স্বার্থের উপর কম গুরুত্ব দিয়েছিল? বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি সাধারণত প্রতিটি ছাত্রের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে করা হয় না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি চলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে রচিত মানদণ্ড অনুসারে ছাত্রদের প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। সেক্ষেত্রে অসফল ছাত্ররা অভিযোগ আনতে পারেন — উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারীদের চেয়ে তাদের স্বার্থকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ বলতে পারেন — ভর্ত্তি-প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের স্বার্থ-আদৌ বিবেচিত হয় না। সেক্ষেত্রে সিঙ্গার-এর প্রশ্ন — তারা কেন বুদ্ধিমত্তাকে ভর্ত্তির মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের সম্ভাব্য উত্তর দু'টি। প্রথমত, স্নাতক ডিগ্রীর জন্য যেসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রয়োজন তাতে উচ্চস্তরের বুদ্ধির প্রয়োজন। অক্ষম ছাত্রদের ভর্ত্তি করার কোনো যুক্তি নেই; কারণ তারা স্নাতক ডিগ্রী লাভে সম্ভব হবে না। তারা তাদের নিজস্ব সময় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ অপচয় করবে। দ্বিতীয়ত, স্নাতক ডিগ্রীধারী ছাত্রদের বুদ্ধি যতো উচ্চ স্তরের হবে, সমাজের জন্য তারা ততো বেশি উপযোগী হয়ে উঠবে। ডাক্তাররা যতো বেশ বুদ্ধিমান হবে রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের জন্য তারা ততো বেশি উপযুক্ত হবে। সুতরাং, একটি চিকিৎসা বিভাগ ভর্ত্তির জন্য যতো বেশি বুদ্ধিমান ছাত্র নির্বাচন করবে, চিকিৎসায় ব্যয়িত অর্থের বিনিময়ে সমাজ ততো

ভালো প্রতিদান পাবে।

সিঙ্গার ভর্ত্তির এই প্রক্রিয়াটিকে একপেশে বলে মনে করেন। একজন ডাক্তারের বুদ্ধির মাত্রার পাশাপাশি অতিরিক্ত অন্যান্য গুণও থাকতে পারে। ভর্ত্তির ক্ষেত্রে জাতিকে একটি মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে যে আপত্তি ওঠে, বুদ্ধিকে ভর্ত্তির মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করতে সেই আপত্তি ওঠে না। অর্থাৎ বুদ্ধিকে ভর্ত্তির মানদণ্ডরূপে গ্রহণের ব্যাপারটা অনেক নিরাপদ। তবুও সংরক্ষণ বা অন্য ভাষায় বিপরীত বৈষম্যের মাধ্যমে ভর্ত্তিকৃত ছাত্রদের চেয়ে বুদ্ধি-পরীক্ষার ভিত্তিতে উচ্চতর বুদ্ধিসম্পন্ন ভর্ত্তিকৃত ছাত্রদের ভর্ত্তির ব্যাপারে কোনো সহজাত অধিকার নেই। আমাদের সমাজে অনেক ভালো জিনিস আছে। তাদের ন্যায্যতার দাবির সাথে উচ্চতর বুদ্ধির কোনো সম্পর্কই নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের ভর্ত্তি করে না। ছাত্রদের ভর্ত্তি হবার অধিকারের ভিত্তিতেও তারা তাদের ভর্ত্তি করে না। এই ভর্ত্তির প্রক্রিয়ায় তাদের লক্ষ্যসমূহের প্রতি বিশ্বাসের অগ্রগতি সাধিত হবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাদের লক্ষ্য সমূহের অগ্রগতি সাধনের জন্য নতুন লক্ষ্য গ্রহণ ক'রে সংরক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে, তাহলে পুরনো প্রক্রিয়ায় ভর্ত্তিকৃত ছাত্রগণ এ-দাবি করতে পারে না যে নতুন প্রক্রিয়াটি তাদের ভর্ত্তির অধিকার লঙঘন করে, তাদের প্রতি কম সম্মানজনক আচরণ করে। কারণ ভর্ত্তি হবার জন্য তাদের কোনো বিশেষ দাবি ছিল না। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন নীতির সুযোগলাভকারী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। এই নীতি অন্যদের সুযোগ পরিবর্তন করেছে, তাদের নয়। সিঙ্গার মনে করেন, যদি এই নীতিটিকে অন্যায্য মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা পুরনো নীতি মানতে অভ্যস্ত।

তাঁর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তির আবেদনকারীদের ভর্ত্তির অধিকার লঙঘন করে, বা তাদের প্রতি আচরণে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের সমান সুযোগ দেয় না — এই ভিত্তির উপর সংরক্ষণের কর্মসূচীকে ন্যায়ত বাতিল করা যায় না। ভর্ত্তি হবার কোনো সহজাত অধিকার নেই। সাধারণভাবে ভর্ত্তি-পরীক্ষাগুলিতে আবেদনকারীদের স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি জড়িত নয়। সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তা একারণেই যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা যে অগ্রগতি সাধন করতে চায় তা খারাপ কিম্বা ইহা বিপরীত বৈষম্যের জন্ম দেয়, যা প্রকৃতপক্ষে ইপ্সিত সমতার লক্ষ্যে একধাপ এগিয়ে দেয় না।

সামাজিক সমতার লক্ষ্যে ও পেশাগত পদে অধিকতর সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিপক্ষীগণ কোনো আপত্তি তোলেন না। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নীতির কারণে স্বার্থের সমবিবেচনার নীতিটি সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সমর্থন করে। এর কারণ যখন অন্য কোনো একটি বর্ণ বা লিঙ্গের সদস্যগণ সবসময় খারাপ অবস্থায় থাকে তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের আশাহীন হীনমন্যতা থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি তাদের আশাহীন হীনমন্যতার অনুভূতি দূর করে। তাছাড়া, অনেক সময় বিভিন্ন জাতির মধ্যে চরম অসমতা বর্ণ বা জাতিগত উত্তেজনা নিয়ে একটি শ্রেণিবিভক্ত সম্প্রদায় নির্দেশ করে। সংরক্ষণের নীতিটি এরকম অবস্থা দূর করতেও সাহায্য করে।

সিঙ্গার-এর মতে সামাজিক সমতার সার্বিক লক্ষ্যে আইন ও চিকিৎসার পেশাগুলিতে অধিক পরিমাণে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব কাম্য। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যগণ তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই কাজ করতে বেশি আগ্রহ বোধ করে। তার ফলে যেসব অনুন্নত এলাকায় অনগ্রসর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস সেসব এলাকায়

ডাক্তার ও উকিলের অভাব পূরণে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিই কাম্য। এমন কি অনগ্রসর জনগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেসব সমস্যা সম্পর্কে বহিরাগত ব্যক্তিদের চেয়ে তাদের অধিকতর ভালো ধারণা থাকবে। পরিশেষে যদি শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ছাত্রদের ডাক্তার ও আইনজীবী সতীর্থরা ওইসব কৃষ্ণাঙ্গ সদস্যদের সতীর্থ হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে তারা নিজেরাই কৃষ্ণাঙ্গ ও মহিলাদের দৃষ্টভঙ্গি বিষয়ে অধিকতর জানতে পারবে। এভাবে অধিকতর ভালো ডাক্তার ও আইনজীবী তৈরি হবে।

সংরক্ষণের এই ব্যবস্থা সমতার অগ্রগতি সাধনে সহায়ক নয় — এই যুক্তি বেশ জোরালো। Bakke-এর মামলায় বিচারক তাই বলেছিলেন,

"Preferential programs may only reinforce common stereotypes holding that certain groups are unable to achieve success without special protection."

"অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কর্মসূচি সাধারণ বাধা-ধরা বিষয়গুলোকে পুনঃশক্তি প্রদান করতে পারে শুধু এই অর্থে যে, বিশেষ সংরক্ষণব্যবস্থা ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায় সাফল্য অর্জনে অক্ষম।" (তর্জমা ড. প্রদীপ কুমার রায়ের)

তবে প্রকৃত সমতা অর্জনের বেলায় সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ ও মহিলাদের মেধার ভিত্তিতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

সংরক্ষণের এই কর্মসূচির বিরুদ্ধে একটি দীর্ঘ-মেয়াদি আপত্তিও আছে। সিঙ্গার-এর মতে, বর্তমান সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই বিশ্বাস করতে পারি যে বর্ণ বা জাতিকে শুধু সংখ্যালঘু অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উপকারের জন্য বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তাতে বর্তমান সামাজিক অবস্থা টিকবে না। না টিকুক। কিন্তু সংরক্ষিত আসনের প্রতি আমাদের অনুমোদন বর্তমানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার সহজতর করে তুলবে। তাছাড়া, বর্ণ বা জাতিবাদী পার্থক্য দূরীকরণের লক্ষ্যটির অগ্রগতি সাধনে আমরা বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্যের প্রবর্তন আশা করতে পারি না। Bakke-এর মামলায় এসব প্রসঙ্গ উঠেছিল। কিন্তু তথ্যগত বিষয়ের ভিত্তিতে রায়দানে সংশ্লিষ্ট বিচারকেরা রায়দানে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলেন। Bakke এই মামলায় জয়লাভ করেছিলেন মূলত এই যুক্তিতে যে ১৯৬৪ সালে পাস করা U.S.Civil Rights Act অনুসারে বর্ণ জাতি বা জাতিগত উৎপত্তির কারণে ফেডারেল আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তিকে কোনো প্রকার কাজ থেকে বাদ দিতে পারে না। বিচারকদের প্রায় সকলেই এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে সকল প্রকার বৈষম্যই বর্জনীয়। যুক্তরাষ্ট্রে এখনও সেটিই আইন হিসেবে প্রচলিত।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে যে আইনই প্রচলিত থাকুক না কেন, নৈতিক দৃষ্টিতে সিঙ্গার-এর কাছে বিভিন্নভাবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সদস্যদের অগ্রাধিকার দানের ব্যাপারটা কম গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কাছে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা হচ্ছে — কোটা পদ্ধতি বা অন্য যেকোনো পদ্ধতি অনুসারেই হোক না সংরক্ষণ যেকোনো সুপ্রতিষ্ঠিত সমতানীতির বিরোধী নয়। এর দ্বারা বাতিলকৃত ছাত্রদের কোনো অধিকারই লঙ্ঘিত হয় না। যথার্থ প্রয়োগে এরূপ বিপরীত বৈষম্য স্বার্থের সমবিবেচনার নীতির সঙ্গে, বিশেষ করে এর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এখানে সন্দেহ — এটি বাস্তবে কার্যকর হবে কি না। তবে অধিকতর প্রতিশ্রুতিশীল বিকল্পের অনুপস্থিতিতে এটিকেই বাস্তবে কার্যকর

করার প্রয়াস চালিয়ে যাবার পক্ষে মত দিয়েছেন সিঙ্গার। কিন্তু অনেক রাষ্ট্র এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে, যেটা উদ্বেগের।

২.১১ সমতা ও বিকলাঙ্গতা (Equlity and Disability)

সিঙ্গার বলেন, "Perhaps the clearest way of seeing the irrelevance of IQ, or specific abilities, to the moral principle of equality, is to consider the situation of people with disabilities, whether physical or intellectual"। অর্থাৎ IQ যে সমতার নৈতিক নীতির ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক তা দেখার উৎকৃষ্ট পন্থা হলো বিকলাঙ্গ মানুষজনদের পরিস্থিতি বিবেচনা — তা সে-বিকলতা শারীরিক বা মানসিক যে প্রকারেরই হোক না কেন। একজন সুস্থ-সবল ব্যক্তি-মানুষের মতো সকল ক্ষমতা বিকলাঙ্গজনের থাকে না। বিকলতার কারণেই মাঝে মাঝে যে দাবিটি ওঠে তা এই — অন্যদের থেকে ভিন্নভাবে বিকলাঙ্গদের দেখা উচিত। প্রশ্ন হলো — এ-দাবির ন্যায্যতা কতখানি?

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমাজপতিদের কুসংস্কারের কবলে পড়ে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ-নির্যাতন অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের নির্যাতনের সঙ্গে তুলনীয়। অতীতে মানসিকপ্রতিবন্ধীদের জেল-বন্দি করে রাখা হতো। সেখানে তাদের অবস্থা ছিল ভয়ংকর। কোনো কোনো প্রতিবন্ধী দাসত্ব করতো, কেউ বা বিভিন্ন জায়গায় সস্তায় শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হতো। নাৎসীরা 'euthanasia program' এর কর্মসূচি নাম দিয়ে প্রায় দশ হাজার মানসিক প্রতিবন্ধীকে খুন করেন। এখনও দেখা যায় — হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী কাউকে কাজে নেওয়া হয় না, যদিও সংশ্লিষ্ট কাজের সামর্থ্য তার আছে, এবং তার কাজের সামর্থ্য একজন সুস্থ-সবল ব্যক্তির তুলনায় বিন্দুমাত্রও কম নয়।

সিঙ্গার প্রাগুক্ত প্রশ্নটির উত্তর দেবার আগে আমাদের দু'টি কথা মনে রাখতে বলেন। (এক) কোনো বিশেষ অসামর্থ্য কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কাউকে বিবেচনার বাইরে রাখতে পারে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থকে অন্যদের স্বার্থ অপেক্ষা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (দুই) নিয়োগ বা চাকুরির সকল ক্ষেত্রে এ-ধরনের আচরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে না।

প্রতিবন্ধীদের প্রতি যে অবিচার হয়েছে তা বিবেচনা করে সিঙ্গার দেখতে চান তাদেরও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত করা যায় কি না। যেহেতু প্রতিবন্ধীরা অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ লোকদের থেকে আলাদা সেহেতু তাদের প্রতি ভিন্ন আচরণ বৈষম্যমূলক নয়। তবে যদি বিকলতা কোনো বিশেষ চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক না হয়, তাহলে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ প্রভৃতি বৈষম্য বিরোধী যেমন আইনী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তেমন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ বিকলতার ক্ষেত্রেও নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

বর্ণ বা জাতিগত বা লিঙ্গগতভাবে অনগ্রসর শ্রেণির বেলায় সংরক্ষণের যে যুক্তিগুলি খাটে সেই যুক্তিগুলি বিকলাঙ্গদের ক্ষেত্রে আরো বেশি খাটে। যে পরিস্থিতিতে একজন প্রতিবন্ধী কিছুতেই সুস্থ-সবল মানুষের সমকক্ষ হতে পারে না, সেখানে সুযোগের সমতা নীতির সীমাবদ্ধতাই প্রকটিত হয়। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে সিঁড়ি বেয়ে উপর তলায় যেতে হয় সেখানে ভর্ত্তির বেলায় সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া কাজে আসে না। অনেক প্রতিবন্ধী শিশু সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে বিদ্যালাভ করতে পারলেও তাদের সে সুযোগ দেওয়া হয়

না; কারণ তাদের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে যে জিনিসগুলি দরকার বিদ্যালয়গুলিতে সেগুলির অভাব। সমবিবেচনার নীতি সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের গৌণ দাবিগুলি পূরণের চেয়ে প্রতিবন্ধীদের বিশেষ বিশেষ চাহিদা পূরণের দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দেয়; কারণ বেঁচে থাকার জন্য তাদের ওই জিনিসগুলি বেশি প্রয়োজন। এই কারণে প্রতিবন্ধীদের জন্য খরচ বেশি হলে তা অন্যায় নয়। তবে সে-খরচের পরিমাণ কত বেশি হবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। তবে অনেক প্রতিবন্ধীদের প্রতি এই দায় স্বীকারটাকে ভালো চোখে দেখা হয় না। তাদের মতে এ-দায় স্বীকার অন্যায়। তারা এ-দায় স্বীকার এবং গুরুতরভাবে প্রতিবন্ধী শিশুহত্যার সমর্থক যুক্তির মধ্যে স্ববিরোধিতার আভাস পান। প্রতিবন্ধীদের জন্য যদি বেশি খরচ ন্যায় হয় তবে আর প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা কেন? সিঙ্গারের মতে এ-যুক্তির মূলে আছে একটা প্রাক্‌স্বীকৃতি — বিকলাঙ্গ জীবনের চেয়ে বিকলাঙ্গহীন জীবনই বেশি কাম্য। সিঙ্গার মনে করেন বিকলাঙ্গহীন লোকদের এই প্রাক্‌স্বীকৃতি একটা সংস্কারমাত্র। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ বা নারী হয়ে জন্মাবার চেয়ে ইউরোপীয় সাহেব হয়ে জন্মানোর আশাও অনুরূপ সংস্কার। তবে সিঙ্গারের মতে প্রতিবন্ধীদের প্রতি দায় স্বীকারের যুক্তি এবং বিকলাঙ্গহীন সুস্থ-সবল শিশু কামনার যুক্তি — এই দু'টি যুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। যেসকল প্রতিবন্ধী লোকেরা বেঁচে থাকতে চান তাদের সমস্ত রকম সহায়তা দান করার কথা বলা হয় প্রথমোক্ত যুক্তিতে। আর আমরা নির্বাচন করার অবস্থায় থাকলে আমাদের পরবর্তী শিশুটি বিকলাঙ্গ হবে না সবলাঙ্গ হবে — এই দুই বিকল্পের মধ্যে পরের বিকল্পের কামনা একটা সংস্কার। সিঙ্গার এই দুই যুক্তির মধ্যে কোনো স্ববিরোধ আছে বলে মনে করেন না।

২.১২ সিদ্ধান্ত

এই পাঠ এককটিতে এই অবধি আমরা সমতা নীতির নৈতিক ভিত্তি অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে নানা বিষয় আলোচনা করেছি। আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে Rawls-এর তত্ত্ব, স্বার্থের সমবিবেচনার নীতি, বংশগত প্রকল্প অন্যতম। মানুষে মানুষে তফাৎ নানা রকম। বর্ণ-লিঙ্গ-জাতি বিশিষ্ট এ-তফাৎগুলি। তবুও সমতায় বিশ্বাসী নীতিবিজ্ঞানীদের প্রয়াস থেমে নেই। সমতা বিষয়ক আদর্শ নীতি গড়ে ওঠার আগে বিপরীত বৈষম্যের পথ অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে। তাতে কিছুটা অনিবার্য সুফলের আশাও আছে। Practical Ethics গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সিঙ্গার সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২.১৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. a) What does John Rawls mean by 'moral personality'?
   b) Does the possession of 'moral personality' provide any satisfactory basis for the principle that all humans are equal? Discuss after Peter Singer.
2. a) What is affirmative action?
   b) How does Peter Singer argue that affirmative action seems worthy a try in the absence of more promising alternatives?
   c) Why is it called 'reverse discrimination'?

3. Write notes on the following:

a) Difference between intelligence and IQ

b) Equality and genetic diversity

4. a) What is racism?

b) How does Peter Singer argue in favour of his view that the genetic hypothesis gives no support for racism?

২.১৪ নির্দেশিত গ্রন্থপঞ্জি

এই পাঠ এককটিতে — The Meaning and Basis of Equality, Equality and Genetic Diversity, Racism and Equality, Affirmative Action, Equality and Disability এই Topic-গুলি আলোচিত হয়েছে। এর জন্য আকর গ্রন্থ Peter Singer-এর Practical Ethics (Oxford University Press, 2002)। Topic-গুলির আলোচনা পাওয়া যাবে গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আছে। অনুবাদক ড. প্রদীপ কুমার রায়। ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা নামে তাঁর অনূদিত গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। দু'টি গ্রন্থই অবশ্য পাঠ্য। জিজ্ঞাসু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রইল নিম্নলিখিত তালিকাটিও।

1. M. Cohen, T. Nagel, and T. Scanlon, Equality and Preferential Treatment (Princeton, 1976)
2. N.J.Block and G.Dworkin, The IQ Controversy (New York, 1976)
3. A.R.Jensen, Genetics and Education (London, 1972)
4. J. Fishkin, Justice, Equal Opportunity and the Family (New Haven, 1983)

পাঠ একক -৩

নারীবাদী-নীতিশাস্ত্র

৩.০ : উদ্দেশ্য

৩.১ : সূচনা

৩.২ : নারীবাদী নাতিশাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয়

- ৩.২.১ : নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিবীক্ষণ
- ৩.২.২ : প্রযত্নের নাতিতত্ত্বের প্রকরণ

৩.৩ : মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নীতিবীক্ষণ

৩.৪ : রাজানৈতিতক নারীবাদী নীতিবীক্ষণ

- ৩.৪.১ : উদারনৈতিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.২ : মার্কসীয় নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৩ : চরমপন্থী নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৪ : সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৫ : মিশ্রসাংস্কৃতিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৬ : বিশ্বায়িত সার্বিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৭ : বাস্তুনারীবাদী নীতিতত্ত্ব
- ৩.৪.৮ : অস্তিবাদী নারীবাদী নীতিভাবনা
- ৩.৪.৯ : মনঃসমীক্ষনবাদী নারীবাদী নীতিভাবনা
- ৩.৪.১০ : আধুনিকোত্তর নারীবাদী নীতিভাবনা

৩.৫ : সমকামী নারীবাদী নীতিতত্ত্ব

৩.৬ : নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ

৩.৭ : সারসংক্ষেপ

৩.৮ : পাঠ নির্দেশ

৩.৯ : নমুনা প্রশ্নাবলী

পাঠ একক - ৩

নারীবাদী নীতিশাস্ত্র

(Feminist Ethics)

৩.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ-এককে নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের একটা পরিচয় দেব এবং এই নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব। একইসঙ্গে এই নীতিভাবনা বাস্তবে কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে তার একটা দিক নির্দেশ করার প্রচেষ্টা আমাদের থাকবে।

৩.১ সূচনা :

এই পাঠ এককে আমরা রোজমেরী টং-এর 'Feminist Ethics' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে নারীবাদী-নীতিশাস্ত্রের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করব। সমকালীন নারীবাদী বিশ্ববীক্ষার প্রভাবে সাবেকি পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যার পুনর্নিরীক্ষণ ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যে নতুন নীতিভাবনার সূত্রপাত ঘটেছে তাই নারীবাদী নীতিশাস্ত্র। নারীবাদ দেখিয়েছে যে সাবেকি নীতিবিদ্যায় নারীর অভিজ্ঞতা তথা স্বার্থকে পুরুষের স্বার্থের তুলনায় খুবই কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের জন্ম।

৩.২ নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের প্রাথমিক পরিচয় :

সাধারণভাবে মনে করা হয় নীতিশাস্ত্রের কাজ হল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের আচার-আচরণের নৈতিক বিচার করা। নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা অ্যালিসন জাগর (Alison Jaggar) সাবেকি নীতিবিদ্যার কমবেশি পাঁচটি সীমাবদ্ধতা তথা ত্রুটির কথা বলেছেন : (১) সাবেকি নীতিবিদ্যায় পুরুষের তুলনায় নারীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় চূড়ান্ত অবহেলা দেখিয়েছে। (২) ব্যক্তিগত, পারিবারিক স্তরে রান্না-বান্না, শিশু ও অসুস্থদের যত্নআত্তিসহ বিভিন্ন ধরনের গৃহস্থালি কাজকর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলিকে নৈতিকভাবে গুরুত্বহীন হিসাবে বাতিল করেছে। (৩) নারী পুরুষের মতো নৈতিকভাবে পরিপক্ক (morally developed) নয় — সাবেকি নীতিবিদ্যায় এরকম ভাবা হয়েছে। (৪) এই নীতিচর্চার স্বাতন্ত্র্য, মন, যুক্তিবুদ্ধি, স্বাতিক্রান্তি প্রভৃতি কথিত পুরুষালি বৈশিষ্ট্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পরস্পর নির্ভরতা, সম্প্রদায়-প্রীতি, দেহ, আবেগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যকে মেয়েলি বলে হতশ্রদ্ধা করা হয়েছে। (৫) এতদিন ধরে চলে আসা পুরুষসুলভ নীতিবিচার — যা নিয়মনীতি, সার্বিকতা, নিরপেক্ষতা, ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — তার গুণগান করা হয়েছে। বিপরীতে, নারীর নীতিভাবনা, যার মধ্যে আন্তর্সম্পর্ক, আবেগ, বিশেষত্ব, এমন কি কখনো কখনো পক্ষপাতও গুরুত্ব পায়, তাকে বাঁকা চোখে দেখা হয়েছে।

অ্যালিসন জাগর নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "On the practical level [the goals of feminist ethics] are : first, to articulate moral critiques of actions and

practices that perpetuate women's subordination; second, to prescribe morally justifiable ways of resisting such actions and practices; and, third, to envision morally desirable alternatives that will promote women's emancipation ... On the metaethical level, the goal of feminist ethics is to develop theoretical understandings of the nature of morality that treat women's moral experience respectfully but not uncritically."

নারীবাদী নীতিবিদরা নীতিবিদ্যায় বিভিন্ন ধরনের নীতিভাবনা তথা পদক্ষেপের সূচনা করেছেন, যেমন - নারীসুলভ (feminine approach), মাতৃসুলভ (maternal approach), রাজনৈতিক (political approach) এবং সমকামী (lesbian approach) ইত্যাদি। এই ধরনের নীতিভাবনাগুলি নীতিবিদ্যায় নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক, সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের উপর আলোকপাত করে। ব্যক্তিগত কিংবা বাহ্যজগতের বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার বিচারের পথনির্দেশ এই নারীবাদী নীতিদর্শনে পাওয়া যায়। এগুলি শুধুই নারীর বর্তমান অবদমনের অবস্থার কথাই মনে করায় না, যেসব নৈতিক উপাদান এই অবদমনকে স্থায়িত্ব দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার কথা বলে। এক কথায়, নারীবাদী নীতিদর্শনের লক্ষ্য হল লিঙ্গসমতাযুক্ত (gender equal) নীতিবিদ্যার সূচনা করা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের সেইসব প্রকরণ যা নারীর নৈতিক অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেছে তার পুনর্বিচার এবং পুনঃসংশোধনের জন্যই এই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের কোনো সর্বসম্মত একক ভাষ্য নেই। সমস্যাগুলি বিভিন্ন নারীবাদী বিভিন্নভাবে দেখেছেন এবং তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সমাধান খোঁজার ভিন্নতার কারণে ভাষ্যকারেরা নারীবাদী নীতিশাস্ত্রকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করেছেন : নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য-ভিত্তিক নীতিতত্ত্ব (Feminine ethics), মাতৃসুলভ-বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নীতিতত্ত্ব (Maternal ethics) ও রাজনৈতিক বা যথার্থ নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Political or feminist ethics)। আবার এই রাজনৈতিক ও যথার্থ নারীবাদী নীতিতত্ত্বের মধ্যে মার্ক্সীয় নারীবাদী নীতিতত্ত্ব, ফ্রয়েডীয় নীতিভাবনা, অস্তিবাদী নারীবাদী নীতিবিদ্যা, সমকামী নীতিতত্ত্ব ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এইসব নীতিভাবনার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব এই পাঠ এককে।

৩.২.১ নারীসুলভবৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিভাবনা (Feminine approaches to ethics) : নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিভাবনার মধ্যে প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব (Care ethics) এবং সম্পর্কের নীতিতত্ত্ব (Kinship ethics) গুরুত্বপূর্ণ, যদিও দ্বিতীয়োক্ত ধরনের নীতিতত্ত্বের আলোচনা ততটা পরিপক্কতা লাভ করেনি। স্থানাভাবের কারণে আমরা এখানে কেবল প্রযত্নের নীতিশাস্ত্রের পর্যালোচনা করব।

প্রযত্নের নীতিতত্ত্ব (Care ethics) :

নারী ও পুরুষের জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক তারতম্যের ভিত্তি হল নারী ও পুরুষের স্বতন্ত্র নীতিবোধ, আচরণ এবং পরিচয়। নারী ও পুরুষের মধ্যেকার এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিদর্শন গড়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক তথা নীতিবিদ্ ক্যারোল গিলিগান (Carol Gilligan) দেখিয়েছেন যে সাবেকি কায়দায়

নারীরা শুধুই অন্যের প্রয়োজনে লাগে — সেদিকেই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি নারীর এক বিশেষ ধরনের ভাষার আবিষ্কার করেছেন যাকে প্রযত্ন বা দরদের ভাষা বলা হয়। তিনি আরও দাবি করেন, এই ধরনের দরদের ভাষা মানবীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক বেশি যত্নশীল হয়। বিপরীতে, পুরুষ নিজেকে বাহ্যজগতের জন্য ক্রিয়াকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করে। যেমন, ব্যবসায়, চিকিৎসায়, আইনে ইত্যাদি। এই পুরুষের আবিষ্কৃত ভাষা হল ন্যায়নীতির ভাষা (language of justice), যা শুধুই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানানসই সহমতের উপর জোর দেয়। গিলিগ্যান নৈতিক উৎকর্ষতার বিভিন্ন মাত্রার কথাও উল্লেখ করেছেন। অন্য দিকে লরেন্স কোলবার্গ (Lawrence Kohlberg) নৈতিক উৎকর্ষের ছয়টি মাত্রার কথা বলেন, যেখানে শুধু ন্যায়পরতার রাজ চলে, দরদের কোন স্থান নেই। সেই কারণে প্রাথমিকভাবে নারীরা কোলবার্গের যে নৈতিক উৎকর্ষের তৃতীয় মাত্রা বা স্তর পর্যন্ত উঠতে পারে। অন্যদিকে, পুরুষরা যারা ন্যায়পরতার ভাষায় কথা বলে তারা কোলবার্গের পঞ্চম স্তর। এমন কি ষষ্ঠ বা সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্তও পৌঁছতে সক্ষম হয়।

বিষয়টি একটু বিশদে করে বলা যাক। ১৯৮৩ সালে একটি সমীক্ষা যুগ্মভাবে করেন গিলিগান ও লরেন্স কোলবার্গ। সমীক্ষাটি হয়েছিল কিছু সংখ্যক বয়ঃসন্ধিকালীন (অ্যাডোলেসেন্ট) ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের একটা সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর দেওয়া সমাধানের ভিত্তিতে তাদের নৈতিক বিচার কতটা পরিণত তা মূল্যায়ন করে দেখা হয়। এখানে কোলবার্গের সঙ্গে গিলিগানের মূল্যায়নের অনেক তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। কোলবার্গের বিচারে ছাত্ররা এগিয়ে; আর গিলিগানের বিচারে ছাত্রীরা এগিয়ে। আসলে এই দু'জন দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া সমাধানের নৈতিক বিচার করেছেন। কোলবার্গের বিচারধারা ছিল বিমূর্ত তাত্ত্বিক, যাতে ছাত্ররা এগিয়ে। অন্যদিকে গিলিগান বিচারধারার ভিত্তি হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন দরদের ভাষা, যাতে করে ছাত্রীরা অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। তাই, নৈতিক বিচারের মানদণ্ড হিসেবে যদি বিমূর্ত তাত্ত্বিকতাকে একমাত্র পরিণত মানদন্ড মনে না করা হয়, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের করা নৈতিক বিচারকে সমান গুরুত্বপূর্ণ বলতে হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্যাটির সমাধান করতে দেওয়া হয়েছিল তা হল : হাইন্‌জ নামে একজন ব্যক্তির স্ত্রী অসুস্থ। কিন্তু তাঁর ঔষধ কেনার সামর্থ্য নেই, অথচ ঐ ঔষধটা না পেলে হাইনজের স্ত্রী হয়তো মারা যাবে। এমত অবস্থায় প্রশ্ন হল, হাইনজের কি দোকান থেকে ঔষুধ চুরি করা ঠিক কাজ হবে? এইরকম সমস্যার সমাধানে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া জানায়। দেখা যায়, ছাত্ররা এই সমস্যাটিকে একটা বিশেষ সমস্যা হিসাবে না ভেবে তারা সমস্যাটি কোন্ কোন্ নৈতিক আদর্শের সংঘাতের ফলে দেখা দিচ্ছে তা খুঁজতে তৎপর হয়। নৈতিক আদর্শগুলি হল : 'চুরি করো না', 'জীবহত্যা করো না', 'মানুষের জীবন রক্ষা করবে', ইত্যাদি। এর মধ্যে 'সৎপথে চলা' ও 'জীবন রক্ষা করা' এই দুই নৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্বের ফলেই উক্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে তারা মনে করে। সব শেষে তারা 'জীবনরক্ষা করার' দায়িত্বকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করল এবং সমাধান দিল 'হাইনজের চুরি করাটা অনৈতিক হবে না'। অন্য দিকে, ছাত্রীদের দেওয়া সমাধানগুলি এমন নির্দিষ্ট ছিল না। কেউ জানাল, হাইনজ ঔষধ চুরির দায়ে যদি হাজতে যায় তাহলে তার অসুস্থ স্ত্রীর পাশে কেউ থাকবে না, তাই ঔষধের দাম কমানোর জন্য ঔষধের দোকানের মালিককে পুনরায় অনুরোধ করা যেতে পারে। কেউ প্রস্তাব করল সকলের কাছে চাঁদা তুলে ঔষুধের খরচ মেটানোর, ইত্যাদি। এখানে ছাত্রীরা সমস্যাটি নির্দিষ্ট কোনো

একটি সমাধান দিল না। কোলবার্গের মতে, ছাত্রীরা ছাত্রদের তুলনায় পরিণত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারছে না। আর এখানেই কোলবার্গের সঙ্গে গিলিগানের মত-বিরোধ। কোলবার্গের মূল্যায়নে গিলিগান বিষয়টি নতুন উদ্যমে ভাবতে শুরু করেন।

গিলিগানের মনে হল ছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকে ছাত্রদের মূল্যায়নের তুলনায় ছোটো করে দেখা উচিত নয়। তাঁর মতে, বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক বিচারের প্রবণতার ভিন্ন ধারা বর্তমান। ছাত্রদের বিচার ধারার মধ্যে বিমূর্ত তাত্ত্বিকতার বীজ নিহিত; আর ছাত্রীদের বিচারধারার মধ্যে নিহিত রয়েছে মাতৃসুলভ বা নারীসুলভ যত্ন বা দরদের বোধ, যা সমস্যাগুলিকে আরো ব্যক্তিগত পর্যায়ে ভাবতে প্রণোদিত করে। ছাত্রীরা নিছক কতকগুলি নৈর্ব্যক্তিক নীতিতে ততটা আগ্রহী নয়।
বলা বাহুল্য, সমস্যাকে একটা মাত্র তত্ত্ব কাঠামোর আলোকে বিচার করলে ব্যক্তিগত ও পারস্পরিক সম্পর্কের স্তরে তা হয়ে যায় অনেক বেশি কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। নৈতিক সমস্যা যেখানে জীবন্ত সম্পর্ক-নির্ভর, সেখানে এক বিমূর্ত তাত্ত্বিকতার স্তরে সমাধান খুঁজলে তা কখনোই উপযুক্ত হয় না।

গিলিগানের দরদের নীতিশাস্ত্র নারীবাদী এই কারণে যে তিনি নারীর দরদের নীতিতত্ত্বকে পুরুষের ন্যায়পরায়ণতার নীতির চেয়ে কোনোভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ বলেন নি। সব মনুষ্যসত্তারই যত্নবান হওয়া উচিত। গিলিগান মনে করেন, পরস্পর বিপরীত লিঙ্গের নৈতিক মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে নারীরা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

নেল নোডিংস গিলিগানের তুলনায় অন্য মত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, নীতিবিদ্যা হল দুই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে প্রযত্ন বা দরদের সম্পর্ক (caring relationships between individuals)। তিনি বলেন, যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুই পক্ষ থাকে। একপক্ষ বা যাদের একজন দরদ দেখায়, যত্ন নেয়, অন্যব্যক্তি যত্ন পায়। আর যত্ন নেওয়া মানেই তো একটা মানসিক অনুভূতি বা কারোর প্রতি সহানুভূতি দেখানো বা মনে মনে আগ্রহ দেখানো। এরকম বলা যাবে না যে আমি যেমন আমার নিজের সন্তানদের যত্ন নিই সেরকমই আমি জাপানের শিশুদের প্রতি যত্নবান হই। শুধুমাত্র শুভ অভিপ্রায়ের মাধ্যমেই দরদ দেখানো বা যত্ন নেওয়া হয় না। নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্কে সম্পর্কিত হলে পরই যত্ন নেওয়ার বা দরদ দেখানোর প্রশ্ন ওঠে। সত্যিকারের দরদ দেখানো সেখানেই সম্ভব যেখানে যিনি দরদ দেখান তিনি ব্যক্তি হিসেবে দরদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে গভীরভাবে মিশে যান। অন্য দিকে, দরদপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি দরদ দেখাচ্ছেন তার প্রতি স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানান। যদিও এখানে উভয় পক্ষই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সান্নিধ্যে আসে তবেই তা প্রকৃত যত্ন বা দরদ হয়।

নোডিংসের দরদের নীতিতত্ত্ব নারীবাদী এই কারণে যে এটা নারী ও পুরুষের নৈতিক বিচার করার সক্ষমতার পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে না। যদিও একথা স্বীকার করা চলে যে পুরুষের মতো নারীরাও অবরোহাত্মক আদর্শনিষ্ঠ যুক্তিবিচার করতে সক্ষম। নোডিংস দাবি করেন যে, পুরুষের তুলনায় নারীরা অনেক বেশি তাদের অনুভূতি, চাহিদা, আবেগ এবং ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা, ইত্যাদি অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, বিশেষ করে, তাঁরা যখন কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়। নোডিংসের দরদের

নীতিতত্ত্বকে নারীবাদী হিসেবে দেখার আর একটি কারণ হল তাঁর এই নীতিতত্ত্ব অনেক পথনির্দেশ দেয়, যেগুলির সাহায্যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো বিষয় যেমন - বাচ্চা শিশুদের যত্ন নেওয়া, প্রাণী উদ্ভিদকুল, সম্পদ এবং বিভিন্ন ধ্যানধারণা সম্পর্কে আরো সজাগ হই।

৩.২.২ প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের প্রকরণ (Elements of care ethics) :

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোনো ব্যক্তি নিছক কারোর যত্ন নিলেই সেই ব্যক্তি স্বতঃসিদ্ধভাবেই নীতিবান হয়ে যাবেন। জোয়ান ট্রোন্‌টো এই প্রসঙ্গে প্রযত্ন তথা দরদের চারটি উপাদানের কথা বলেছেন : মনযোগীত্ব (attentiveness), দায়িত্ববত্তা (responsibility), সামর্থ্য (competence) এবং প্রতিবেদনশীলতা (responsiveness)। আমরা জোয়ান ট্রোন্‌টোর 'An Ethic of Care' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে এই উপাদানগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ করব।

মনোযোগীত্ব (attentiveness) : যেহেতু প্রযত্নের পশ্চাতে এক নির্দিষ্ট প্রয়োজন থাকে তাই প্রযত্নের প্রথম নৈতিক উপাদান বা স্তর হল মনযোগীত্ব। আমরা যদি অপরের প্রয়োজনের প্রতি যথার্থ মনযোগী না হই তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রসঙ্গই ওঠে না। এই মানদণ্ড অনুসারে অন্যকে অবহেলা করা এক ধরনের নৈতিক অমঙ্গল বা পাপ। আজকের সমাজে অন্যদের সম্পর্কে জানার এক অতুলনীয় ক্ষমতা আমাদের রয়েছে, তৎসত্ত্বেও অন্যদের অবহেলা করা, অন্যের প্রতি মনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের ওপরই যাবতীয় চিন্তাকর্মকে কেন্দ্রিভূত করার প্রবণতা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আমাদের চারপাশের মানুষজনের প্রয়োজনকে স্বীকার করা, যাকে মনোযোগীত্ব শিরোনামে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, এক কঠিন কাজ। তবে বাস্তবিকই তা করতে পারাটাই নৈতিকতা।

এই মনোযোগীত্বের অভাব এবং এতজ্জনিত নৈতিক স্খলন লক্ষ করেছেন অনেক চিন্তাবিদ। বিশেষ করে সেইসব লেখকেরা যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত পৈশাচিকতার দিকে নজর দিয়েছেন। অন্যের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যে একটি নৈতিক প্রকরণ তা অতিসুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন দার্শনিক সাইমন উইল (Simone Weil), যিনি বিশ্বস করেন যে এই ধরনের মনোযোগ সামর্থ্য যথার্থ মানবিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। উইল বিশ্বাস করেন যে আমাদের শিক্ষাচর্চায় মনোযোগিতার উদ্বোধনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রযত্নের মতোই মনোযোগও অন্যনিষ্ঠ। উইলের ভাষায় "Attention consists in suspending thought, leaving it available, empty and ready to be entered by its objects ... thought must be empty, waiting, seeking nothing, but ready to receive in its naked truth the object that is about to penetrate it." ফলিতার্থ, অপরের জন্য মনোযোগ দিতে গেলে স্বার্থকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনাকে অন্ততঃ সাময়িককালের জন্য হলেও স্থগিত রাখতে হবে। মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় বলা যায়, আমাদের মনোজগতে মুক্ত স্থান (free space) এর সুযোগ তৈরি করতে হবে, যাতে করে অন্যের প্রতি মনোযোগী হওয়ার উপযুক্ত সামর্থ্য ও পরিস্থিতি তৈরি হয়।

দায়িত্ববত্তা (responsibility) : প্রযত্ন বা দরদের দ্বিতীয় স্তর তথা প্রকরণটি হল দায়িত্ববত্তা। অন্যের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে স্বীকার করা হল নৈতিকতার অন্যতম প্রকরণ। অধ্যাপক ট্রোনটো অবশ্য এরকম দাবি

করছেন না যে অন্যান্য নীতিতত্ত্বে দায়িত্বের প্রশ্নটি আলোচিত হয় নি। তিনি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চান তা হল প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে দায়িত্ববত্তার বিষয়টি অবিরাম পূনর্মূল্যায়ন দাবি করে, এদিক থেকে বিচার করলে, এই নীতিতত্ত্বে দায়িত্ববত্তার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয় অন্যান্য সমকালীন নৈতিক তথা রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাধারণভাবে, বাধ্যতাবোধকে স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তাকেই (the need to conform to obligation) দায়িত্ববত্তা হিসাবে ভাবা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বসমূহে কিভাবে এই বাধ্যতাবোধ গড়ে ওঠে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে আমাদের পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতির থেকেই বড় ধরনের বাধ্যতাবোধের উদ্ভব ঘটে।

বাধ্যতাবোধের তুলনায় দায়িত্ববত্তার একটি ভিন্ন ব্যঞ্জনা এবং একটি ভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দায়িত্ববত্তার ধারণাটি যতটা না রাষ্ট্রনৈতিক বা দার্শনিক তার তুলনায় বেশি সমাজতাত্ত্বিক বা নৃতাত্ত্বিক। দায়িত্ববত্তা একগুচ্ছ আকারগত নিয়ম বা প্রতিশ্রুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের একগুচ্ছ অব্যক্ত বিষয়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকে। তৎসত্ত্বেও দায়িত্ববত্তা যেহেতু সাধারণের বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকে তাই এর মধ্যে রাজনৈতিক উপাদানও রয়েছে। যাই হোক, প্রযত্নের প্রসঙ্গে দায়িত্ববত্তা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যদি ছেলে-মেয়ের পিতামাতা হই তাহলে পিতা-মাতা হওয়ার কারণেই আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের যত্ন নিতে হবে। পরিবারের সদস্য হিসেবে বয়োজেষ্ঠ্য আত্মীয়স্বজনের প্রতি আমরা দায়িত্ব বোধ অনুভব করি। একটু গভীরে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে আমরা তখনই দায়িত্ববান হতে চেষ্টা করি যখন আমরা প্রযত্নের প্রয়োজন স্বীকার করি, এবং ভাবি যে এই নির্দিষ্ট প্রয়োজন অন্য কোনোভাবেই পূরণ হবার নয়। ঠিক এই কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছু ইওরোপবাসী গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন যে কেবল মানুষ হওয়ার দরুণই তাদের দায়িত্ব আছে নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে ইহুদী ও অন্যান্যদের উদ্ধার করা। অধ্যাপক ট্রোন্টোর ভাষায় আমরা বলতে পারি "[W]e are better served by focusing on a flexible notion of responsibility than we are by continuing to use obligation as the basis for understanding what people should do for each other."

সামর্থ্য (Competence) : প্রযত্নের তৃতীয় স্তর তথা প্রকরণটি হল সামর্থ্য। এর অর্থ হল শুধু মনোযোগী হওয়া বা দায়িত্ব অনুভব করাই যথেষ্ট নয়, প্রযত্নরূপ নৈতিকগুণের আর একটি উপাদান হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যত্ন দিতে উপযুক্তভাবে সমর্থ হওয়া। প্রযত্ন দেওয়ার ইচ্ছা বা তৎসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব স্বীকার করলাম, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রযত্ন দিতে পারলাম না — সেক্ষেত্রে শেষমেষ যা দাঁড়াবে তা হল প্রযত্নের প্রয়োজন মেটাতে না পারা। কখনো কখনো প্রযত্ন অপ্রতুল হতে পারে যখন প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা সম্পদের অভাব ঘটে। এই দক্ষতা বা প্রয়োজনীয় সম্পদের অপ্রতুলতার প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে আমাদের সামর্থ্যের ধারণাটিকে বুঝতে হবে। শুধু দায়সারা গোছের দেখভাল করা যথেষ্ট নয়, প্রযত্ন দেওয়ার কাজটি এমনভাবে সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়, যাতে করে প্রযত্ন সত্যিকারের সাফল্যের মুখ দেখতে পায়।

প্রযত্নরূপ পরিষেবা দেওয়ার সামর্থ্যের প্রশ্নটি অবশ্য পেশাগত নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। পেশাদাররাও প্রযত্নরূপ পরিষেবা দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রযত্নের নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে বিষয়টিকে দেখলে দেখা যাবে কোনো ব্যক্তিকে কোনো আচরণবিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত — এই যুক্তিতে তার অসামর্থ্যজনিত দায়িত্ববত্তাকে এড়িয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

প্রতিবেদনশীলতা (Responsiveness) : প্রযত্নের নীতিতত্ত্বে চতুর্থ ধাপ তথা প্রকরণটি হল প্রযত্নের প্রতি গ্রহীতার প্রযত্ন তথা দাতার প্রতি প্রতিবেদনশীলতা। অর্থাৎ যিনি প্রযত্নের পরিষেবা পাচ্ছেন তিনি পরিষেবা তথা পরিষেবা-দানকারীর প্রতি সদর্থক প্রতিক্রিয়া করবেন — এবং এর মধ্য দিয়েই প্রযত্ন সার্থক হবে। অধ্যাপক ট্রোন্টো আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই প্রতিবেদনশীলতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক সমস্যা রয়েছে : প্রকৃতিগতভাবে প্রযত্ন ক্ষতি-প্রবণতা (ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা ব্যাপার) (vulnerability) এবং অসাম্য (inequality)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রযত্নের বর্তমান ধারণাটি প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র এবং স্ব-সমর্থিত — এই ধারণার প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। যে পরিস্থিতিতে একজনের প্রযত্নের প্রয়োজন হয় সেইরূপ পরিস্থিতিতে পড়ার অর্থ হল কোনো একপ্রকারভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণ হওয়া। আকর্ষণীয় ঘটনা হল আমরা সবসময় এই অর্থে প্রযত্নকে ভাবি না। একজন আধিকারিক তার ঝাড়ুদারের প্রতি এইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণতা অনুভব করেন না, যে ঝাড়ুদার প্রতিদিন অপিস ঘরের নোংরা সরিয়ে সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। যখন ঝাড়ুদারের এই পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায় তখনই আধিকারিকের ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণতা প্রকাশ্যে আসে। বিভিন্ন ধরনের প্রযত্নের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণতার ধরন বা স্তরগুলি ভিন্ন ভিন্ন হয়। শিশুরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণ, যারা অন্যের সাহায্য ছাড়া মৌলিক প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারে না। অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অবস্থাও একই রকম। এই ক্ষতিগ্রস্ত প্রবণতাই আমাদের এই ভাবনাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে যে আমরা সর্বতোভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সমান। বলার অপেক্ষা থাকে না যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এমন কিছু পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলে যেখানে ক্ষতিগ্রস্তপ্রবণতা এবং পর-নির্ভরতা প্রকট হয়। যে নীতিশাস্ত্র বা রাষ্ট্রনীতি এটা ধরে নেয় যে মানুষ স্বরূপগতভাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, তারা মানবীয় অভিজ্ঞতার অনেকখানি 'মিস্' করে। অন্যদিকে, আমরা যতই সমতার কথা বলি না কেন, আমাদের স্বীকার করতে হয় সব মানুষ সর্বতোভাবে সমান হতে পারে না। এবং ঠিক এই কারণেই অপরের কাছ থেকে প্রযত্ন গ্রহণ করার প্রয়োজন থাকে। এই প্রযত্ন তখনই সার্থকতা লাভ করে যখন প্রযত্ন-প্রদানকারী এবং প্রযত্নগ্রহীতা উভয়েরই প্রয়োজন মেটানো হয়। এর অর্থ এই নয় যে এখানে নিছক পারস্পরিকতা (reciprocity)-র কথা বলা হচ্ছে। প্রতিবেদনশীলতা পারস্পরিকতার তুলনায় আরো গভীর। এই প্রসঙ্গে আমরা কোলবার্গের নৈতিকতার বিকাশতত্ত্বের পারস্পরিকতার ধারণা-র কেন্দ্রিকতাকে বিচার করি। কোলবার্গ বিশ্বাস করতেন যে পারস্পরিকতা ব্যতীত নৈতিক বিকাশ সম্ভব নয়। প্রতিবেদনশীলতা অপরের প্রয়োজনকে বোঝার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করে, যা কেবল অপরের অবস্থানে নিজেকে স্থাপন করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাস্তবিক এই প্রকরণটি ইঙ্গিত করে যে অপর ব্যক্তি যেমনভাবে প্রকাশ করে ঠিক সেইভাবেই তাদের অবস্থানকে আমরা বুঝবো। তাই, একজন অন্যজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই আছে, কিন্তু সে ধরে নিচ্ছে না যে অপরব্যক্তি হুবহু আমার মতো। প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের এই প্রেক্ষাপটে আমরা অপরত্বের প্রশ্নগুলোকে আরো উপযুক্তভাবে বুঝতে পারি।

বলা বাহুল্য, যথোপযুক্ত প্রতিবেদনশীলতা আবার মনোযোগীত্বের দাবি করে। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে এখানে প্রযত্নের যে প্রকরণগুলির কথা বলা হল তা একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। সত্যিকারের প্রযত্নে আলোচ্য চারটি পর্যায় বা প্রকরণকে একে অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সংবদ্ধ হয়। অধ্যাপক ট্রোন্টো তাই বলেছেন "[T]o act properly in accordance with an ethic of care requires that the four moral elements of care, attentiveness, responsibility, competence, and responsiveness, be intregrated into an appropriate whole".

৩.৩ মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নীতিবীক্ষণ (Maternal approaches to ethics) :

নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আর এক ধরনের যে নীতি ভাবনার সৃষ্টি হয় তাকে মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক নীতিবীক্ষণ বলা হয়। অনেক চিন্তাবিদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে দিয়ে এই নীতিতত্ত্বের জন্ম হয়েছে এরমধ্যে ভার্জিনিয়া হেল্ড (Virginia Held), সারা রুডিক (Sara Ruddick), এবং ক্যারোলিন হুইটবিক (Caroline Whitbeak) -এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা বলেন যে সব নৈতিক কর্তার (moral agent) উচিত আমাদের সন্তানদের পালনের ক্ষেত্রে মায়েদের যে ভূমিকা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেসব ধারণা, উপমা, রূপকল্প ইত্যাদি রয়েছে তার ব্যবহার করা। তাঁরা আরও দাবি করেন যে, যে মাতৃসুলভ ভাবনাচিন্তা দিয়ে মায়েরা তাঁদের সন্তানসন্ততিদের লালনপালন করেন, সেই মাতৃসুলভ ভাবনার আলোকেই মনুষ্য-নৈতিক বিচারকে সবচেয়ে ভালভাবে বোঝা যায়। রুডিকের পরিসংখ্যান হল শিশুদের এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে আমরা যদি সকলে মায়েদের মতো ভাবনা গ্রহণ করি তাহলে সর্বসাধারণের প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্বের যে জগৎ তাকে অনেকখানি ভারসাম্যযুক্ত ও পরস্পরের ব্যবহারের অনুকূল করে তুলতে পারি।

মাতৃসুলভবৈশিষ্ট্যভিত্তিক যে নীতিদর্শন তা শুধু এই কারণে নারীবাদী নয় যে তা শুধুই মাতৃসুলভ ভাবনাচিন্তার উপর অধিক মূল্য আরোপ করে, বরং এই কারণে যে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা যা ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পরিমণ্ডলের আমরা সম্মুখীন হই সেইগুলি বিবেচনার জন্য এই মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য কিছু কর্মনীতির সন্ধান দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গৃহের অন্দরমহলে যেসব শারীরিক এবং মানসিক হিংসার শিকার হতে হয় নারীদেরকে তা কিভাবে এড়ানো যায় — এ বিষয়ে এই নীতিদর্শন পথ নির্দেশ দেয়। যদিও এটা খুব স্পষ্ট নয় যে, মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক যে পদক্ষেপ তা কতটা তথাকথিত নারী অবদমনের ভাবনাকে ধ্বংস করতে পারে। রুডিক নিজে অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে তাঁর মাতৃত্বের নীতিভাবনা একদিকে যেমন সারধর্মবাদের অভিযোগকে সামনে আনে, তেমনি আবার সন্তান-পালিকার ভূমিকাকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে তা নারীকে আবার অন্দরমহলেই ফিরিয়ে দিতে চায়। এই তত্ত্বের সমর্থকেরা এই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 'মাতৃত্ব' এই পদটির অভিনব প্রয়োগের ব্যাপারে যদি না এরা খুব যত্নশীল হয়, তাহলে সমগ্র মানবজাতিকে, কেবল নারী ছাড়া, সুসংহত নৈতিক পথ নির্দেশ তো করা সম্ভব হবেই না, বরং তাদেরকে আরও বেশি অন্ধকারের দিকে এগিয়ে দেবে।

৩.৪ রাজনৈতিক নারীবাদী নীতিবীক্ষণ (Political or feminist approaches to ethics) :

নারীসুলভ ও মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যভিত্তিক যে নীতিদর্শন তার তুলনায় রাজনৈতিক নারীবাদী নীতিদর্শন অনেক বেশি সক্রিয় কর্মপন্থার সন্ধান দেয়। এই রাজনৈতিক নীতিদর্শনের লক্ষ্য হল নারীর অধীনতার বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন করা। উল্লেখ্য, এখানে 'রাজনীতি' বলতে যেখানেই ক্ষমতার বিষম বিন্যাস সেখানেই রাজনীতি — এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। উদারনৈতিক (liberal), মার্কসবাদী (Marxist), আমূল পরিবর্তনকামী বা চরমপন্থী (radical), সমাজবাদী (socialist), মিশ্রসংস্কৃতিবাদী (multicultural), সার্বিক (global) এবং বাস্তুনারীবাদী (ecological feminist) লেখকেরা নারীর বর্তমান অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। একইরকমভাবে, অস্তিবাদীরা, মনস্তাত্ত্বিকরা, সাংস্কৃতিক

এবং উত্তর-আধুনিক (post modern) নারীবাদীরাও নারীর এই বর্তমান অধীনতার অবস্থার কথা তুলে ধরেন। স্বাভাবিকভাবেই এইরকম ভাবনার মধ্যে দিয়ে নীতিভাবনার জগতে বৈচিত্র্য এসেছে। এই রাজনৈতিক ভাবধারায় পুষ্ট বিভিন্ন ধারার নারীবাদীদের নীতিভাবনার পর্যালোচনা হল নিম্নরূপ :

৩.৪.১ উদারনৈতিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Liberal feminist ethics) : উদারনৈতিক নারীবাদীরা দাবি করেন নারীর অবদমনের অবস্থার পিছনে মূল কারণ হল বেশ কিছু নিয়ম-নীতি, আইনকানুন, প্রথা-ঐতিহ্য যা বাহ্যিক জগতে নারীর প্রবেশাধিকার ও সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। শিক্ষানিকেতনে, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী নিজের অন্তঃস্থিত সুপ্ত বাসনাকে প্রকাশ করতে পারে নি। নারীরা পুরুষের সমকক্ষ হবে না যদি না সমাজ নারীকে পুরুষের সমান শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকারের সুযোগ দেয়।

৩.৪.২ মার্ক্সীয় নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Marxist feminist ethics) : মার্ক্সীয় নারীবাদীরা উদারনৈতিক নারীবাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে না। এরা মনে করেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নারীর পক্ষে ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। নারীর উপর পুরুষের এই অবদমনের অবস্থাকে ঠিক ঠিক ভাবে বোঝা যাবে যদি আমরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে পারি এবং সেই স্থলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় নারী ও পুরুষ একইভাবে সমাজে অবস্থান করে এবং উভয়েই সর্বতোভাবে সমান মজুরী এবং সুযোগ সুবিধা পাবে। নারী যদি পুরুষের মতো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও রাজনৈতিক সমানাধিকার লাভ করে তাহলে তারা পুরুষের সমান হতে পারবে; অত্যাচার নিপীড়ন, প্রভুত্ব শেষ হবে। এ মতে তাই বর্তমান কাঠামোকে পরিবর্তন করার পক্ষে এবং সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতিতত্ত্বের পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

৩.৪.৩ চরমপন্থী নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Radical feminist ethics) : মার্ক্সীয় ও উদারনৈতিক নারীবাদীদের সঙ্গে চরমপন্থী নারীবাদের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। চরমপন্থীরা মনে করেন নারীর অবদমনের মুখ্য কারণ হল নারীর যৌনতা ও সন্তান-উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার দায়দায়িত্ব, ভূমিকা ইত্যাদি। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলস্রোত থেকে নারীর বিচ্ছিন্নতা এবং বিষমযৌনতা এবং দেহ ও সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে তার অধিকারহীনতা। এঁরা আরো দাবি করেন যে সেই সব ধরনের তন্ত্রের অবসান ঘটানো উচিত যেগুলি নারীর যৌনতা বিষয়ে পছন্দ বা সন্তান জন্মদাত্রীর স্বাধীন নির্বাচনের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সন্তান নেওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা পুরুষকে ভালবাসার ক্ষেত্রে, যদি না নারীরা সম্পূর্ণ স্বনির্ভর বা স্বাধীন হয় তাহলে নারীরা চিরদিনই পুরুষের অধীনে থেকে যাবে।

৩.৪.৪ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Socialist feminist ethics) : চরমপন্থী ও মার্ক্সীয় উভয় নারীবাদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীরা এই দুই ভিন্ন ভাবনাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুলিয়েট মিচেল (Juliet Mitchell) তাঁর 'Women's Estate' -এ যুক্তি দিয়েছেন যে মূলত চারটি কাঠামো নারীকে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলি হল : (১) সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা (production) (২) সন্তানের জন্মদান (reproduction) (৩) যৌনতা (sexuality) ও (৪) শিশুদের সামাজিকীকরণ (the socialization of child)। এইসব কাঠামোগুলোর মধ্যে নারীর চিরাচরিত কাঠামো ও

চিন্তাধারার পরিবর্তন না আনলে নারী কখনোই পুরুষের সমকক্ষ হতে পারবে না। অধিকন্তু, মিচেল তাঁর 'Psychoanalysis and Feminism' গ্রন্থে আরো বলেন, নারীর অন্তর্জগত এবং তার চিরাচরিত মানসিক অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করা দরকার : '... for unless a women is convinced of her own value, no change in her exterior world can totally liberate her.'

৩.৪.৫ মিশ্রসাংস্কৃতিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Multicultural feminist ethics) : সাধারণভাবে যদিও মিশ্রসাংস্কৃতিক নারীবাদীরা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের ভাবনাচিন্তাকে সমর্থন করেন, তবুও তাঁরা বিশ্বাস করেন এটা বর্ণ (race) এবং জাতিসত্তা (ethnicity)-র ব্যাপারে তত আগ্রহী নয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা উল্লেখ করেন যে মার্কিনী শ্বেতাঙ্গ সংস্কৃতি আফ্রিকা বা এশিয়া নারীর দেহের আর্ষণীয়তাকে প্রশংসা করে না, আফ্রিকান বংশোদ্ভূত আমেরিকান যে কৃষ্ণবর্ণের মুখশ্রী এবং দেহ, যা কিনা প্রকৃতিজাত, তার বৈধতাদানে আগ্রহী নয়। বরং তারা লম্বা কেশযুক্ত, হাল্কা বাদামী চামড়ার এবং মেদহীন শ্বেতাঙ্গীয় দেহধারীদের প্রশংসা করে। তাই এই নারীবাদীরা আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদেরকে দুইভাবে অবমূল্যায়ন করে। লিঙ্গগত বৈষম্যের (gender discrimination) সাথে সাথে জাতিগত বৈষম্যের (racial discrimination) নিরিখে আফ্রিকান আমেরিকান মহিলারা নিগৃহীত হয়।

৩.৪.৬ বিশ্বায়িত সার্বিক নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Global feminist ethics) : যে কৌশলে মিশ্রসংস্কৃতির নারীবাদীরা সমাজতান্ত্রিক নারীবাদীদের ভাবনাচিন্তাকে সম্প্রসারণ করেন সেই পথ বা কৌশলগুলিকে সার্বিক নারীবাদীরা প্রশংসা করেন, যদিও সার্বিক নারীবাদীরা মনে করেন, নারীর অবদমনের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয়। তাঁরা এক সার্বিক নারীবাদের পক্ষে সওয়াল করেন। কিন্তু বেশিরভাগ নারীবাদী এই একক নারীবাদের বিপক্ষেই মত দিয়ে চলেছেন।

৩.৪.৭ বাস্তুনারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Eco-feminist ethics) : বাস্তুনারীবাদীরা মনে করেন নারীর উপর পুরুষের প্রভুত্ব এবং প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব এই দুইয়ের মধ্যে মিল রয়েছে। বাস্তুনারীবাদী দার্শনিক কারেন জে ওয়ারেণ মনে করেন যে এই প্রভুত্ব বা নিপীড়ণমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে : (১) মূল্যবিন্যাসগত চিন্তা (value hierarchical thinking) অর্থাৎ উচ্চ-নীচ চিন্তা, যা মূল্যমানের উপরের দিকে অবস্থান করে তাকে বেশি মূল্যবান বলে মনে করা হয়। আর যা তুলনায় নিচের দিকে অবস্থান করে তাকে কম মূল্যবান বলে মনে করা হয়। (২) মূল্যগত দ্বৈতবাদ (value-dualism) অর্থাৎ যেখানে বৈকল্পিক যুগলকে পরস্পর-বিরোধী ভাবা হয়, যেখানে একটি বিকল্পকে অধিকতর মূল্যবান মনে করা হয়। (৩) প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিতন্ত্র (the logic of domination) অর্থাৎ এমন এক যুক্তি কাঠামো যা অবদমন প্রতিপাদনে সহায়ক হয়।

ওয়ারেণ দেখাচ্ছেন যে মানুষ কর্তৃক প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব এবং নারীর উপর প্রভুত্ব একই যুক্তি-কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি আরো মনে করেন প্রকৃতির অবদমনের ঘটনা নারীর অবদমনের ঘটনার চেয়ে পূর্বগামী। তাই, পরিবেশ ধ্বংস ও লিঙ্গবাদ অবসানের কর্মসূচি ধারণাগতভাবে সম্পর্কিত। আসলে বাস্তুনারীবাদী নীতিভাবনায় যেটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয় তাহল নারীর অবদমনের ন্যায্যতা প্রতিপাদনের জন্য যে যুক্তি-কাঠামো রয়েছে তা ভ্রান্ত।

৩.৪.৮ অস্তিবাদী নারীবাদী নীতিভাবনা (Existential feminist ethics) : অস্তিবাদী নারীবাদীরা নারীর অবদমনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। এঁরা বলতে চান, প্রতিটি ব্যক্তি আপন গভীরে একা নিঃসঙ্গ এবং ব্যক্তিতে এক মৌলিক বিরোধ রয়েছে। নারীবাদী দার্শনিক সিমন দ্য বোভেয়ার (Simone de Beauvior) তাঁর The Second Sex গ্রন্থে বলেছেন, সামাজিক পরিবেশের কারণেই শুরু থেকে পুরুষ নিজেকে আত্ম পরিচয় (the self) এবং নারী নিজেকে অপর পরিচয় (the other) হিসেবে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। উল্লেখ্য, অস্তিবাদী সার্ত্রীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী অপর ব্যক্তিসত্তা আমার কাছে বাধাস্বরূপ, ভয়-উদ্বেগের কারণ। যদি অপর সত্তা আমিরূপ ব্যক্তিসত্তার কাছে বাধা হয় তাহলে নারী পুরুষের কাছে বাধা স্বরূপ, ভয়-উদ্বেগের কারণ হয়। পুরুষ যদি নিজেকে স্বাধীন রাখতে আগ্রহী হয়, তাহলে তাকে নারীকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং যৌনভাবে তার অধীনস্থ করতে হবে। শুধু তাই নয়, একইরকমভাবে নারীকে বোঝাতে হবে যে তারা এর চেয়ে ভাল ব্যবহার আশা করতে পারে না। তাই নারীকে যদি আমি-সত্ত্বরূপ ব্যক্তিসত্তায় উপনীত হতে হয় তাহলে তারা নিজেদেরকে নৈতিক কর্তা হিসাবে মনে করুক, যারা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জগতেই নয়, বরং বহির্জগতে ও তাদের কর্ম বা বুদ্ধির পরিচয় দিতে সক্ষম হবে। স্পষ্টতই, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকা সব ব্যক্তিসত্তাকেই উপযুক্ত বা স্বাধীন করে গড়ে তুলতে হবে যাতে অন্যেরা তার উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে না পারে। অস্তিবাদী নারীবাদীরা নিজেকে গড়ে তোলার এই সুদৃঢ় আদর্শ কর্মপন্থার কাজে নারীকে যোগ্য হিসাবে গড়ে তোলার অনুকূল নীতিভাবনার কথা বলে।

৩.৪.৯ মনঃ সমীক্ষণবাদী নারীবাদী নীতিভাবনা (Psycho-analytic feminist ethics) : অস্তিবাদী নারীবাদীদের মতো মনস্তাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক নারীবাদীরাও নারীর অবদমনের অবস্থার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে নারীর মানসিক গঠনের কথা তুলে ধরেন। তাঁদের মতে প্রায় সব শিশুরাই ব্যতিক্রমহীনভাবে নারীর প্রযত্নে বেড়ে ওঠে। কিন্তু পুরুষ শিশু এবং নারী শিশুর মানসিক গঠন ও সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা ধারা পরিলক্ষিত হয়। পুরুষ শিশুরা নিজেদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে গড়ে তোলে। শুধু তাই নয়, পুরুষ শিশুরা মা এবং বোনেদের ভাবনাবোধের থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত হয়। বিপরীতে, নারী শিশুরা তাদের মায়েদের আচার-আচরণকে অনুসরণ করেই বেড়ে ওঠে এবং তাদের সঙ্গে একাত্ম থাকতে চায়। অধিকন্তু, ঘরের অন্দরমহলে এবং বাইরের জগতে পিতৃতন্ত্রের সমর্থন পাওয়ার কারণে পুরুষ শিশুরা এবং নারী শিশুরা ন্যায্যতা, যুক্তিবত্তা, ইত্যাদি পুরুষালি বৈশিষ্ট্যগুলিকে সত্যিকারের মানবীয় বলে মনে করে। আর যত্ন, দয়ামায়া, ক্ষমতা, ইত্যাদি মাতৃসুলভ গুণগুলি, যা ঘরের অন্দরমহলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলিকে এতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করে। এই ধরনের ভ্রান্তভাবনার সমাধানের জন্য মনঃসমীক্ষণবাদী ও সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক নারীবাদীরা শিশুকে 'মানুষ' করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মা-বাবা উভয়ের সমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া দরকার বলে মনে করেন। সেক্ষেত্রে যদি পিতা পুত্রের সাথে আরো বেশি সময় কাটায় এবং বাইরের জগতে মেয়েরা বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে সক্রিয় ভূমিকা নেয় তাহলে শিশুরা এই ভ্রান্তভাবনা থেকে ক্রমশ মুক্ত হতে পারে। প্রথম থেকেই আমরা যদি শিশুর মনস্তত্ত্ব গঠনে নিজেদেরকে অনেকটা উদার মনের পরিচয় দিতে পারি ও সাবধানী হই তাহলে নারীর অবদমন নিপীড়নের অবস্থা ক্রমশ দূর হয়ে যাবে।

৩.৪.১০ আধুনিকোত্তর নারীবাদী নীতিভাবনা (Post-modern feminist ethics) : নারী অবদমনের কারণ খুঁজতে গিয়ে আধুনিকোত্তর নারীবাদীরা লক্ষ করেছেন যে কোন একটি মাত্র ব্যাখ্যা নারীর অবদমনের যাবতীয় প্রকরণকে যথেষ্টভাবে তুলে ধরতে পারে না। একটি মাত্র ব্যাখ্যা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নারীবাদীরা যে শুধু ব্যর্থই হয়েছেন তা নয়, তা যথোচিতও হয়নি। যেহেতু 'নারী' অভিধায় কোন একটি নির্দিষ্টমাত্র সত্তা নেই তাই নারীর অবদমনের একটি মাত্র স্তর নির্দিষ্ট করতে নারীবাদীরা ব্যর্থ হবেন। নারীরা এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা তথা অনুপম নারীসত্তা। প্রত্যেক নারীর জীবন অভিজ্ঞতার ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী আছে। সেগুলিকে অনুধাবন করার প্রয়োজন আছে। তাই, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, নারীর অবদমনকে কোনো একটি মাত্র ব্যাখ্যা বা মাপকাঠি দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আধুনিকোত্তর নীতিশাস্ত্রে তাই প্রত্যেক নারীর স্বাতন্ত্র্য, পৃথক সত্তাকে স্বীকৃতি জানাতে হয় : "Women must, in the estimation of post-modern feminists, reveal their differences to each other so that they can better resist the patriarchal tendency to center, conceal, and cement thought into a rigid "truth" that always was, is, and forever will be."

৩.৫ সমকামী নারীবাদী নীতিতত্ত্ব (Lesbian approaches to ethics) :

আমূল পরিবর্তনকামী নীতি-ভাবনার সূত্র ধরে আর এক চরমপন্থী নীতিভাবনার জন্ম হয়েছে যা সমকামী নারীবাদী নীতিতত্ত্ব নামে পরিচিত। এই সমকামী নারীবাদী নীতিভাবনা একদিকে যেমন নারীসুলভ এবং মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক নীতিভাবনা থেকে আলাদা তেমনি আবার রাজনৈতিক নীতিভাবনা থেকেও আলাদা। সমকামী নারীবাদী নীতিবিদ সারা লুসিয়া হোগল্যান্ড (Sarah Lucia Hoagland) মনে করেন যে নারীসুলভ ও মাতৃসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি, যা প্রধানত প্রযত্ন বা দরদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নারীর অবদমনকে স্থায়িত্ব দেয়। তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে সমকামীরা সেই ধরনের প্রযত্ন বা দরদে নিমগ্ন রাখবেন, যা নারীর কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা থেকে তাদেরকে কখনোই দূরে সরিয়ে রাখবে না। আবার নারীদের কোনো কাজে উন্নীত হতে বাধা হবে না। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক নারীবাদী নীতিভাবনায় বিশেষ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেভাবে বিষমকামী (heterosexual) সম্বন্ধকে যথার্থ নৈতিক রূপ গ্রহণ করে, সমকামী নীতিবিদরা বিষমকামী সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে চায় না। তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এটা দেখেন, যেখানে কেবলমাত্র কাজের বিচারে পুরুষ থেকে নারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, যেসব নারীরা নিজেদেরকে স্বাধীন নৈতিক কর্তা হিসাবে প্রকাশ করতে চায়।

যদিও সমকামী নীতিবিদদের বিশ্বাস যে বিষমকামী নারী ও পুরুষের সমকামী নীতিতত্ত্ব থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত, তবুও তাঁরা একথা মনে করেন না যে বিষমকামী নারী ও পুরুষের মধ্যে এই নীতি শিক্ষার স্ফুরণ ঘটাতে তাঁরা দায়বদ্ধ। বিষমকামী ব্যতিরেকে সমকামীদের যে এক স্বতন্ত্র নৈতিক ভাষা বা মূল্যবোধ আছে তা প্রতিষ্ঠা করাই এঁদের আশু লক্ষ্য।

সাবেকি নীতিশাস্ত্রের মতো সমকামী নীতিশাস্ত্রকে এক সম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র বললে ভুল হবে। সমকামী নীতিবিদ্যা আসলে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সার্থক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নারীকে

প্রকাশ করার নীতিশাস্ত্র। বিষমকামিতার নীতিভাবনা, যার পিছনে পুরুষতন্ত্র কাজ করছে তা নারীকে স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি যোগাতে পারে না। তাই পুরুষের সঙ্গে নারীর পার্থক্যকে স্বীকৃতি জানিয়ে পুরুষের কোনরূপ সাহায্য ছাড়াই নারীকে পূর্ণ মানব হিসাবে গড়ে তুলতে পারে কিনা — সমকামী নীতিশাস্ত্র তারই একটি পরীক্ষণ। হোগল্যান্ডের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আমরা আলোচনা শেষ করতে পারি : 'Lesbian ethics is an envisioning and discussion of possibilities, given lesbian lives, for a transformation of values."

৩.৬ নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ (Applications of Feminist Ethics) :

দৈনন্দিন জীবনে নারীরা যেসব নৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন তার সমাধানকল্পে নারীবাদী নীতিবিদরা একই সুরে কথা বলেন না। অবশ্য কয়েকটি ধারণাগত উপকরণ (key concept) অধিকাংশ নারীবাদী নীতিশাস্ত্রকারেরাই প্রয়োগ করে থাকেন। যৌনতা ও যৌন সম্পর্ক বিষয়ে পছন্দ, সন্তানের জন্মদান, পরিবার কাঠামো, কিংবা কাজকর্ম ইত্যাদি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য তাঁরা পছন্দ (choice), নিয়ন্ত্রণ (control), কিংবা যোগসূত্র (connection) — এদের কোনো একটির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

(ক) যৌনতা ও যৌন সম্পর্ক বিষয়ক পছন্দ (Sexuality and Sexual Preference) : অনেক নারীবাদী দাবি করেন যে পুরুষের বাহবা বা সমর্থন পাওয়ার তাগিদে নারী সৌন্দর্যের পুরুষকেন্দ্রিক আদর্শে পৌঁছতে নারী প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহারের ফলে ক্ষুধাহীনতা (anorexia) ও বুলিমিয়া (bulimia) রোগের শিকার হচ্ছে তারা। আবার স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়েও তারা সৌন্দর্যবর্ধক বিভিন্ন রকমের শল্য চিকিৎসার সাহায্য নেয়। মায়েরাও আবার এইসব কাজে মেয়েদের সহযোগী হন। যেমন, কন্যাদের পা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা, তিমির চোয়ালের নমনীয় তরুণাস্থি দিয়ে তাদের পাঁজর ভেঙ্গে কাঁচুলি পড়ানো, কিংবা তাদের জননেন্দ্রিয়ে কেটে বাদ দেওয়া — এসব কিছুই চলে পুরুষের যৌনতৃপ্তির কথা মাথায় রেখে। যেভাবে মেয়েরা পুরুষের যৌন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে নিজেদের তথা পরস্পরের ক্ষতি করে তা দেখে নারীবাদীরা মহিলাদের প্রকৃতিদত্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বিনষ্ট না করতে উপদেশ করেছেন।

অন্য কিছু নারীবাদী অবশ্য মনে করেন সৌন্দর্য সংস্কৃতির আদর্শ আবশ্যিকভাবে পুরুষকেন্দ্রিক নয়। কিছু নারীর নিয়ন্ত্রিত আহার করা, সাজগোজ করা, চেহারার শ্রীবৃদ্ধি করা মানেই নারীর টপ-মডেল হতে চাওয়া নয়। একজন নারী নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্যও এই ধরনের উপায়গুলি গ্রহণ করতে পারে। নিজে নিজের জন্যই সুন্দর করে তুলতে গিয়ে যদি সে নিজেকে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে না তোলে, তাহলে এগুলি না করার কোনো কারণ নেই। রূপচর্চায় এরূপ আগ্রহী নারীদের অবশ্য এই অনুভব থাকা চাই যে তারা স্বাধীন; তবেই এতে তাদের আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

দেহের আকর্ষনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে নারীরা যেসব শল্য চিকিৎসা, ইত্যাদি করান তা কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে নারীবাদীদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে নারীর প্রতি পুরুষের যৌন আক্রমণ যে পুরুষের ক্ষমতা প্রকাশের একটা ক্ষেত্র বিশেষ — এ বিষয়ে নারীবাদীরা একমত পোষণ করেন। এই যৌন আক্রমণের নানারকম ব্যাখ্যা আছে। তৎসত্ত্বেও নারীর প্রতি পুরুষের যৌন হিংসার বিষয়টি প্রকৃত কি এবং কিভাবে তা প্রতিরোধ করা

যায় তা সম্পর্কে নারীবাদীরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, অনেক নারীবাদী মনে করেন, যেসব ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষায়তনে পদাধিকারে দুর্বল বা অধস্তন তাদের সঙ্গে পদাধিকারে শীর্ষে অবস্থানকারী কর্মকর্তার যৌনপ্রস্তাব যৌন হেনস্থারই নামান্তর। ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নপদাধিকারী মহিলাকর্মীকে এটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে তাকে উচ্চপদাধিকারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকতে হবে। নারীবাদীরা মনে করেন যে যৌন-হেনস্থা ও যৌন-আকর্ষণীয়তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি কখনো কখনো গুলিয়ে যায়। সত্যিকারের কিছু প্রেমের ঘটনা অসম ক্ষমতাবান বা অসম পদাধিকারের মধ্যে যে ঘটে না তা জোরের সাথে বলা যায় না।

আবার, ধর্ষণ (rape)-এর প্রকৃত অর্থ নিরূপণে নারীবাদীদের মধ্যে মতবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নারীবাদীরা মনে করেন এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পরিচিত ব্যক্তির যৌন আক্রমণকে আইনের ভাষায় 'ধর্ষণ' আখ্যা দেওয়া যায় না, বিশেষ করে প্রেমঘটিত মিলন বা ডেটিং-এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পুরুষের কাজ ধর্ষণের মতো হলেও তাদেরকে ঠিক ধর্ষণকারী বিচার করা হয় না। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হল নারী তার ধর্ষণকারীকে জানে বা চেনে, বা খাদ্য পানীয় গ্রহণ করে, কিংবা সঙ্গের পুরুষটিকে দেহ ব্যবহারের কিছু স্বাধীনতা দিয়ে থাকে — সেইসব ক্ষেত্রে ঘটনাগুলিকে আইনের অঙ্গনে নিয়ে আসা নারীবাদীদের অন্যতম লক্ষ্য।

নারীবাদী বিশ্ববীক্ষা তথা নীতিশাস্ত্র বিষম-কামিতা (heterosexuality)-এর এতদিন ধরে চলে আসা 'মহান' যৌন সম্পর্ক বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে। এতদিন ধরে মনে করা হয়েছে যে নারী-পুরুষের বিষমকামিতার যৌন সম্পর্ক নারীরই স্বার্থ রক্ষা করে। অনেক নারীবাদী এই 'মিথ'-কে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেন বিষমকামিতা এমন এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ যা পুরুষকে শুধু নারীদেহ ভোগেরই অধিকার দেয় না, নারীদের সমকামী হবার সম্ভাবনা থেকেও দূরে সরিয়ে রাখে। এঁরা মনে করেন, মা-মেয়ের গভীর আবেগের সম্পর্ক বা নারীর সঙ্গে নারীর আবেগের বন্ধন রূপ বিকল্প যৌনতাকে স্বীকার করা প্রয়োজন। নারীদেরকে যদি সবার আগে নিজেদের পছন্দমতো প্রেম নিবেদন করতে সুযোগ দেওয়া হতো, তাহলে অনেক নারীই হয়তো নারীকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিত। যথার্থ নারীবাদী হতে হলে একজন নারীকে অবশ্যই সমকামী হতে হবে, তা যদি কোনো নারী প্রকৃতিগত স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণীয় দেহের অধিকারী নাও হয়। অবশ্য অন্যান্য নারীবাদী এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, বিষমকামিতা নারীবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, শুধু দেখতে হবে মহিলারা নিজেদের ইচ্ছা পছন্দ বা এককথায় নিজেদের শর্তে, বিষমকামী সম্পর্কে প্রবেশ করছে কিনা। এদের মতে আজকের দিনে অনেক পুরুষসঙ্গী তাদের স্ত্রীদের পূর্ণব্যক্তি হিসেবেই বিচার করে, শুধু সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সমান বিবেচনাই করে না তাদের যৌন চাহিদা ও ইচ্ছা অনিচ্ছাকে পুরুষ নিজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

(খ) সন্তানের জন্মদান (Reproduction) : নারীবাদীরা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি সমূহকে সম্যকভাবে ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গর্ভনিরোধক বড়ি বা কন্ডোম, বন্ধ্যাত্বকরণ ও গর্ভপাত ইত্যাদি বিষয় এবং জন্মদান সহায়ককারী সমকালীন উপায়সমূহ, যেমন কৃত্রিমভাবে গর্ভসঞ্চার, ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (In vitro Fertilisation), বিকল্প মাতৃত্ব (surrogate motherhood) ইত্যাদির বিকল্পের ব্যাপারে নারীবাদীরা উপযুক্ত মনোযোগ দিয়ে থাকেন। নারীবাদী নীতিশাস্ত্র শিখিয়েছে যে একজন নারী যদি সন্তানের জন্মদানের কথিত 'মিথ' সম্পর্কে যথার্থ সচেতন না হয় তা হলে সে কখনই পুরুষের মতো ব্যক্তিজীবনে ও কর্মজগতে নিজেকে সফল করতে সক্ষম হবে না। তাই যখন আইন প্রণয়ন করে যে গর্ভনিরোধক প্রযুক্তি বা

গর্ভপাতের মতো উপায়গুলিকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে তখন তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, যেসব আইন-কানুনের মাধ্যমে এই উপায়গুলির প্রবেশ বাজারে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে সেগুলিকে অবশ্যই চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। নারীকে সচেতন করাতে হবে যে তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ করা বা গর্ভপাত করানোর নিজস্ব অধিকার আছে। সন্তান জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ ব্যবহার করে অনেক নারীই উপকৃত হয়েছেন - একথা স্বীকার করে নিয়েও অনেক নারীবাদীরা উল্লেখ করেছেন যে সংশ্লিষ্ট উপায়গুলি সমসংখ্যক নারীর ক্ষতি সাধনও করেছে। একজন নারী যেহেতু বাচ্চা জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি আগ্রহ দেখায়, কিন্তু সে গর্ভপাতের সময় নিজের অধিকারকে জাহির করতে পারে না। এবং তার পছন্দ (choice) গুরুত্ব পায় না। আবার বাজারে এমন কিছু গর্ভনিরোধক ঔষধ রয়েছে যা শারীরিক ও মানসিকভাবে নারীর পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। এসব ব্যাপারে সমাজ ও রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করাতে হবে।

আবার সন্তানের জন্মদানে সহায়ককারী উপায়সমূহের ব্যবহার সম্পর্কে নারীবাদীরা সহমত পোষণ করেন না। অনেক নারীবাদীরা এই পদ্ধতিগুলি জন্মদানে নারীর পছন্দবর্ধক বলে মনে করেন, আবার তা লাভজনকও। তাঁরা উল্লেখ করেন, নারীদের এইসব পদ্ধতিগুলির ব্যবহারের ভাল-মন্দ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়, বিশেষ করে যারা সন্তানহীন নারী, তাদের জননকোষ প্রদানকারী মা ও গর্ভধাত্রী মা সম্পর্কে অনেক বেশি উদার হতে হবে। গর্ভধান ও ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেসন ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতির ব্যবহারে কার্পণ্য করাও উচিত নয়।

জন্মদানের সহায়ককারী নতুন পদ্ধতিগুলিকে অনেক নারীবাদীরা আবার ক্ষতিকারক বলে মনে করেন। জন্মদানকে তাঁরা আর পাঁচটা দ্রব্যের উৎপাদনের মতো বিচার করেন। একজন নারী ডিম্বাণুর জোগান দেন; আর একজন নারী গর্ভে ভ্রূণ ধারন করেন, অন্য আর একজন নারী সেই নবজাতক শিশুকে লালন পালন করে বড় করে তোলেন। অর্থের বিনিময়ে এই ব্যবস্থা নারীর মর্যাদার হানি ঘটায়।

(গ) পারিবারিক কাঠামো (Family Structure) : এক পিতা, এক মাতা ও এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে গঠিত সাবেকি পরিবার কাঠামো সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। রান্না করা, ঘর পরিষ্কার ও সন্তানের যত্নআত্তি, ইত্যাদি কেবল গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা নারীরা পরিবারে আবদ্ধ বলে নারীবাদীরা মনে করেন। এইরকমের পরিবার কাঠামো পুরুষদের তাদের শিশুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। পুরুষদেরকে শিশু শিক্ষায়তন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়। আবার নারীদের বাহ্যজগৎ, যেমন চিকিৎসা, আইন, ব্যবস্যা, শিক্ষা ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা হয়। এতে করে পুরুষ ও নারী কেউই পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারে না, অর্ধ-ব্যক্তি (half-person) হয়েই থেকে যায়। নারীদের বৌদ্ধিক দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে যেমন উৎসাহিত করা হয় না, তেমনি আবেগজনিত দক্ষতার উন্নতির জন্যও পুরুষদের উৎসাহিত করা হয় না। তাই, আমাদের সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যাতে করে ফলপ্রসূভাবে নারী ও পুরুষ উভয়কেই পূর্ণমানবে পরিণত করা সম্ভব। এর জন্য পুরুষতান্ত্রিক সাবেকি পারিবারিক কাঠামোর উচ্ছেদ প্রয়োজন। অনেক নারীবাদীরা অবশ্য এই চিরাচরিত পারিবারিক কাঠামো, যাকে নিউক্লিয়ার পরিবার (nuclear family) বলে, পরিবর্তনের কথা বলে থাকে। নিউক্লিয়ার পরিবার এক বিষমকামী দম্পতি ও তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত হয়। এঁরা প্রস্তাব দিয়েছেন পরিবার-কাঠামোকে রক্ষা করার জন্য সামাজিকভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এক পিতা-মাতার পরিবার (বিশেষ করে যেখানে

গৃহকর্ত্রী প্রধান পরিবার), সমকামী মহিলা পরিবার (lesbians), সমকামীযুক্ত পুরুষ পরিবার (gays) এবং একান্নবর্তী পরিবার এইসব বিকল্পগুলি উন্মুক্ত থাকা দরকার যাতে করে বংশগতভাবে বহুপ্রজন্মে সম্পর্কিত সকল প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুরা একসঙ্গে বসবাস করার সুযোগ পায়।

আবার এই ধরনের পারিবারিক কাঠামোকে অনেক নারীবাদী নিউক্লিয়ার পরিবারের পরিপূরক বলতে রাজি নন, কেননা তা চিরাচরিত একক পরিবারের মূল্যবোধকেই প্রতিফলিত করে। এঁদের প্রস্তাবিত পারিবারিক কাঠামো হল গোষ্ঠী-পরিবার, যেখানে বেশ কিছু প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি থাকবে, যাদের মধ্যে সমকামী ও অসমকামী, বিবাহিত ও অবিবাহিত, সন্তানযুক্ত ও সন্তানহীন সকলেই থাকবে এবং তারা এমন জীবন অতিবাহিত করবে যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সন্তান প্রতিপালনের অসাম্য থাকবে না, লিঙ্গভেদে কাজের ভাগ থাকবে না, দম্পতির স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, এবং বাবা-মায়ের সন্তানের প্রতি আধিপত্য থাকবে না। অন্য দিকে, বাচ্চাদেরও পূর্ণবয়স্কদের মতো ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকবে, সমকামীদেরও বিষমকামীদের মতো যৌন স্বাধীনতা থাকবে, কৃষ্ণকায় মানুষরা শ্বেতকায় মানুষদের মতোই সম্মান ও প্রতিপত্তি পাবে এবং প্রত্যেকে অর্থনৈতিক সম্পদকে সকলেই প্রয়োজন মতো ব্যবহার করবে।

চিরাচরিত নিউক্লিয়ার পরিবার সংস্কারযোগ্য নয় বলে মনে করে না একদল নারীবাদী। তাঁরা উল্লেখ করেন যে দুইয়ের কম পিতা-মাতা একটি শিশুর যত্নের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তাদের দাবি লিঙ্গ সমতা (gender equality) প্রতিষ্ঠা যদি নারীবাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে একজন নারী ও একজন পুরুষ উভয়ের সান্নিধ্যেই ছেলে-মেয়েদের বেড়ে ওঠা উচিত। তাঁরা আরো বলেন যে দুইয়ের বেশি পিতা-মাতার সান্নিধ্যে সন্তানের প্রতিপালন সঠিক নয়, যেমন একটা পালিত বাচ্চা কিংবা একটি সৎ সন্তানের প্রতিপালন যেরকমটা হয়। এই নারীবাদীদের বক্তব্য এই যে গভীর আবেগপূর্ণ পিতা-মাতা সন্তানের সম্পর্ক পরবর্ত্তী পর্যায়ে বৃহৎ শক্তির উৎস হতে পারে। সবশেষে, নারীবাদীরা আরো বলেন, বিশেষ করে বিবাহের মধ্যে একক যৌনসম্পর্ক নারীর স্বার্থকে আরো ভালভাবে সম্পূরিত করে যৌনতার তুলনায়।

(ঘ) কাজকর্ম (Work) : কর্মজগতে নারীর সাফল্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীবাদীদের মিশ্র অভিজ্ঞতা আছে। অনেক নারীবাদীরা গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে সদর্থক কর্মনীতি (অর্থাৎ নারীর জন্য শিক্ষা ও কর্মজগতে সংরক্ষণ বা অগ্রাধিকারের ব্যবস্থা) এক বৃহৎ সংখ্যক নারীদেরকে পুরুষ আধিপত্যগামী কর্মজগত ও পেশার জগতে প্রবেশ করায়। অন্য একদল নারীবাদীরা মনে করেন যে নারীরা, যারা বাহ্যজগতে ভাল কাজ করে, তারা পুরুষ প্রভুত্বের জগতেও ভাল করে। কারণ, সে পুরুষের আদবকায়দা ভাবনা চিন্তায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তাই, নারীবাদীরা নারীর এই পুরুষ হয়ে ওঠার ভাবনায় চিন্তিত হন। অন্য দিকে, কিছু নারীবাদীর পর্যবেক্ষণ হল নারীর বাইরের কর্মজগতে প্রবেশ করা যথেষ্ট নয়। পুরুষকে গৃহস্থালী ও পরিবারের মধ্যে মায়ের দায়িত্ব পালনেও এগিয়ে আসতে হবে। গৃহস্থালী ও সন্তান মানুষ করা ইত্যাদি কাজের জন্য পুরুষসঙ্গীর সাহায্য বা বাড়ির কাজের লোকের সাহায্য ছাড়া কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়া প্রায় অসম্ভব। ঘরে বাইরে সাফল্য অর্জন করতে চেয়ে অনেক মহিলা বিধ্বস্ত হয়ে পরে। তাই এখানে পারস্পরিক দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

অপর একদল নারীবাদী এই বিষয়ে জোর দেন যে সব নারীরা বাহ্যজগতে কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ

করেন না। এঁদের মতে, বিভিন্ন নারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কাজের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। খুব ধনী ও ভাল লেখাপড়া জানা মহিলার ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কিংবা ক্ষমতার উৎস-সংক্রান্ত কাজ গ্রহণযোগ্য হতে পারে, এতে করে সে পরিবারের মধ্যে থাকার চেয়ে বড় সামাজিক কাজের মধ্যে নিজেকে বেশি সন্তুষ্ট রাখতে পারে। আবার গরীব নারী, যাকে দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়, তার ক্ষেত্রে কলকারখানার কাজ উপযুক্ত হতে পারে। আবার যেসব মহিলারা গ্রাম্য অঞ্চলে বা গৃহে স্ত্রী হিসেবে কাটাতে চায়, যেমন তাদের শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলো করে কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করে, তাদেরও সুযোগ থাকার প্রয়োজন। অধিকন্তু, নারীকে যারা আলাদা করে দেখে না, তাদের কাছে বাড়ির কাজ, বিশেষ করে শিশুর যত্নআত্তির মতো কাজকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে করেন, এবং এর জন্য দিনের পূর্ণ সময়টা অন্তত একজন পিতা বা মাতাকে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে। এইসব দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক নারীদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। মূলকথা, তাদের পছন্দটা সবসময় যাতে গুরুত্ব পায় তা দেখতে হবে। যাই হোক, যদিও নারীবাদী নীতিদর্শন নারীকেন্দ্রিক, তবুও নীতিশাস্ত্রের একটিমাত্র আদর্শগত মাপকাঠির কথা নারীবাদীরা বলেন না, তাঁরা বিভিন্ন মানদণ্ডের কথা বলেন, যা নারীর নৈতিক অভিজ্ঞতাকে পর্যাপ্তভাবে ব্যক্ত করতে পারে। যেভাবে নারীর নৈতিকমূল্যের ক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা বলেন তা সবই সাবেকি ধারণা নারীসুলভ (feminine) আখ্যায় ভূষিত হয়। উপরন্তু, তারা নারীকে কিছু পথ নির্দেশিকা প্রদান করেন যা তাকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে যেটা নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের অপরিহার্য লক্ষ্য লিঙ্গ গত অসাম্য দূর করা।

ইচ্ছা ও আবেগ সংক্রান্ত পছন্দের ক্ষেত্রে নারীবাদীরা যে ব্যাখ্যা দেন, যা বৈধ ও অবৈধ নিয়ন্ত্রণ অনুশীলনের প্রস্তাব দেয়, বৌদ্ধিক ও নৈতিক গোষ্ঠীর সুসম্পর্কের কথা বলে। এঁরা মনে করেন যে নারীবাদ কোনো একটা ভাবাদর্শগত স্তম্ভ নয়, যা পৃথিবীর সব নারীর জন্য একটিমাত্র পথ নির্দেশ দেয়। রাজনৈতিক চিন্তার বৈচিত্র্য নারীবাদীদের কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কোনো এক নৈতিক বিচার্য বিষয়ের নারীবাদী ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সবাইকে একই আলোচনার টেবিলে (policy table) হাজির হতে হবে — এমন নয়, আদর্শ এক নারীবাদী নীতিতত্ত্বের সম্ভাবনা সংশয়াচ্ছন্ন। তৎসত্ত্বেও, যদি নারীবাদীদের মৌলিক নৈতিক বিচার্য বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নীতিগত অবস্থান না থাকে, তাহলে ঐ শূন্যস্থান এমন কোন একটি নীতির মাধ্যমে পূরণ করার চেষ্টা হতে পারে, যা সত্যিকারের নারীর স্বার্থের যথার্থ অনুকূল নয়। এখানে এটা জোর দিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে কোন একটা নীতি যেমন একদিকে একশ্রেণির নারীকে উপকৃত করে, তেমনি ঐ নীতিটিই আবার অন্য এক শ্রেণীর নারীর ক্ষতির কারণ হতে পারে। নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিককে এমন কিছু নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যাতে এক বৃহৎ অংশে নারীর সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রক্ষিত হয়। সেই কারণে অনেক নারীবাদী নীতিদার্শনিক মনে করেন যে সমস্ত রকমের ভিন্নতার কথা মাথায় রেখেও লিঙ্গগত অসাম্য দূর করাই নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের ন্যূনতম লক্ষ্য হিসেবে কাজ করবে। একইসঙ্গে নারীবাদীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার এমন এক পদ্ধতিতত্ত্ব আবিস্কার করতে হবে যা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করবে, যাতে করে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি সমাধানে কোনো এক নির্দিষ্ট অবস্থান নেওয়া সম্ভব হয়। নারীবাদীদের একটা নৈতিক দায়বদ্ধতা আছে একে অন্যের কথা শোনার, এবং তারপর ন্যূনতম সম্মতির ভিত্তিতে কর্মনীতির সুপারিশ করার।

৩.৭ সারসংক্ষেপ :

এই পাঠ এককে নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের একটা পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং এই নীতিশাস্ত্রের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে জোয়ান ট্রোন্‌টোর 'An Ethic of Care' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে আমরা প্রযত্নের নীতিতত্ত্বের চারটি উপাদানের আলোচনা করেছি যার উপর নারীবাদী নীতিশাস্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। সবশেষে, এই নীতিভাবনা বাস্তবে কিভাবে প্রয়োজ্য হতে পারে তার একটা দিকনির্দেশ করা হয়েছে।

৩.৮ পাঠ-নির্দেশ :

সিলেবাসে নির্দিষ্ট প্রবন্ধদুটির সঙ্গে Virginia Held-এর 'The Ethics of Care' পুস্তকটি পাঠ্য।

৩.৯ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is feminist ethics? How does it differ from traditional main-stream ethics? Discuss.
2. What are the different approaches of feminist ethics? Explain in this connection the theory of maternal ethics?
3. Define feminist ethics vis-a-vis feminine ethics. Give in this connection accounts of radical and lesbian ethics.
4. What is care ethics? What are its main constituents? Explain the basic ideas and principles of Gilligan's care ethics.
5. Write short notes on :
   a) Liberal feminist ethics
   b) Postmodern feminist ethics
   c) Exsitential feminist ethics
   d) Ecofeminist ethics.

পাঠ একক - ৪

গণমাধ্যম - নীতিশাস্ত্র

৪.০ : ভূমিকা

৪.১ : গণমাধ্যমের গুনমানের অনুসন্ধান

৪.২ : বিশ্বায়িত পেক্ষাপট

৪.৩ : গুণগতমানের নিয়ন্ত্রন : আইন অথবা নীতিশাস্ত্র

৪.৪ : আচরণ বিধি ও নীতিশাস্ত্র

৪.৫ : গণমাধ্যমের গুণমান ও সম্মানের পুনরুদ্ধার

৪.৬ : সারসংক্ষেপ

৪.৭ : পাঠনির্দেশ

৪.৮ : নমুনাপ্রশ্নাবলী

পাঠ একক -৪

গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র

(Media Ethics)

৪.০ ভূমিকা : গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র বলতে আমরা ফলিত (বা ব্যবহারিক) নীতিশাস্ত্রের সেই উপবিভাগকে বুঝি যা সংবাদ-প্রসারণ, মুদ্রণ, ইন্টারনেট প্রভৃতি বৈদ্যুতিন মাধ্যম, নাটক, চলচ্চিত্র, শিল্পকলা ইত্যাদি মাধ্যমে কর্মরত পেশাদার ব্যক্তি তথা গোষ্ঠীর আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-নিষেধ, নৈতিক মান ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করে। গণমাধ্যমের এই নীতিশাস্ত্র মূলত আদর্শনিষ্ঠ (normative), যদিও এর বর্ণনাত্মক আলোচনাও অনেকক্ষেত্রে সংবদ্ধ হয়।

ইহা সর্বজনস্বীকৃত যে নীতিনিষ্ঠ শক্তিশালী গণমাধ্যম গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম শর্ত। অনেক সময় একে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভও বলা হয়, আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগের পরেই যার স্থান। আধুনিক গণতন্ত্রে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি কোটি কোটি নাগরিকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। এই প্রতিনিধিরা যাতে সঠিকভাবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত থাকে, জনগণের কাছে যথার্থ দায়বদ্ধ থাকে এবং সরকারের বিভিন্ন কাজকর্মে স্বচ্ছতা বিরাজ করে তার জন্য গণমাধ্যম অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করে। গণমাধ্যম, বিশেষ করে প্রসারণ (টি ভি, রেডিও ইত্যাদি) এবং মুদ্রণ (বা প্রকাশন) মাধ্যম ছাড়া, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে না। এই প্রায় অপরিহার্য গণমাধ্যম যদি গুণগতমান বজায় রেখে এবং নৈতিক নিয়ম-নীতি ও আচরণ-বিধি অনুসারে কাজ না করে তাহলে সমূহ বিপদ। তাই গণমাধ্যমের নৈতিকতার বিষয়টি, অন্য ভাষায় গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র, অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে যার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ : (ক) যথার্থ তথ্য তথা সংবাদ যথোচিতভাবে পরিবেশন করা, তথ্যকে বিকৃত না করা গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্রের প্রধান বিবেচনার বিষয়। সংকীর্ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে গণমাধ্যমের কোনো পেশাদার তথ্য বা সংবাদকে বিকৃত করে প্রচার না করতে পারে তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। (খ) সত্যকে যথোপযুক্তভাবে তুলে ধরা, অন্যরূপ বিশেষ কারণের অনুপস্থিতিতে, ঘটনা যা তাকে ঠিক সেইভাবে প্রকাশ করা গণমাধ্যমের কাজ। জনস্বার্থ, সামাজিক রুচি, প্রাইভেসি ইত্যাদি কারণে, অনেক সময় সামরিক তথ্য হুবহু প্রকাশ করা যায় না। আবার আইনগত কারণে অনেক সময় সত্যকে তাৎক্ষণিক প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তবে এই সবকিছুই গণমাধ্যমের নীতিশাস্ত্র অনুসারে হবে। (গ) তথ্য তথা সংবাদের গুণগতমান বজায় রাখা এবং তথ্যকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা গণমাধ্যমের কর্মী তথা সাংবাদিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। (ঘ) গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকদের সততা অনুশীলন করতে হবে। সংবাদ-সংগ্রহের ব্যাপারে তাদের সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিতে হবে। (ঙ) তথ্য তথা সংবাদের নৈর্ব্যক্তিকতা সুনিশ্চিত করতে হবে। মনগড়া তথা ব্যক্তিগত অভিমতকে সংবাদ হিসাবে প্রচার করা অনুচিত। এই সবকিছুই আমরা সংবাদ মাধ্যম বা গণমাধ্যমের 'গুণগত মান' (quality) এই একক শিরোনামে বুঝতে পারি।

তবে এর অর্থ এই নয় যে গণমাধ্যম-নীতিশাস্ত্র মানেই শুধু একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা। (আসলে নীতিশাস্ত্র মাত্রেই স্বেচ্ছারোপিত নিয়ন্ত্রণবিধি অনুশীলন।) সাধারণ নিয়ম-নীতি গণমাধ্যমের বিশেষক্ষেত্রে কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, কোন্ নৈতিক আদর্শ-নীতি মেনে আচরণ-বিধি তৈরি হবে তা স্থির করাও এই নীতিশাস্ত্রের কাজ। উপযোগবাদ, কর্তব্যবাদ বা সদ্‌গুণের নীতিশাস্ত্র — কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণমাধ্যম সংক্রান্ত কোন্ বিষয় কিভাবে বিবেচিত হবে তাও আলোচিত হয় এখানে।

৪.১ গণমাধ্যমের গুণমানের অনুসন্ধান (The quest for quality of the media) :

গণমাধ্যমের গুণগত মান সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা পাঠ্যসূচি নির্দিষ্ট অ্যান্ড্রু বেলসী এবং রুথ চাডউইক (যুগ্মভাবে) লিখিত **Ethics and Politics of the Media : the Quest for Quality** প্রবন্ধটি অনুসরণ করব। প্রবন্ধকারদ্বয় এই বলে শুরু করেছেন যে গণমাধ্যমের সাংবাদিকতা এক সম্মানজনক পেশা, যদিও এর জন্য যাদের যত্ন নেওয়া উচিত ছিল (যাদের মধ্যে পেশাদার সাংবাদিক নিজেরাও রয়েছেন) তারাই এর সম্মানহানি করে চলেছেন। প্রায় সব মতাদর্শের সরকারই একে নিয়ন্ত্রণ করেছে সাফল্যের সঙ্গে, যখন তাদের কৃত্য ছিল সংবাদ মাধ্যমের সম্মান-বর্ধন। সংবাদ-মাধ্যমের মালিকেরা নিজেদের ক্ষমতা ও আর্থিক সম্পদ আহরণের উপায় হিসাবে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করছেন। আর সাংবাদিকদের সম্পর্কে একটা কথা চালুই হয়ে গেছে যে 'নীতিগর্হিত আচরণ করানোর জন্য তাদের ঘুস দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না!' অন্য দিকে, সংবাদমাধ্যমের গ্রাহকরা ছোটোখাটো তুচ্ছ বিষয়, অভিমত নিয়েই মেতে আছেন। এই মাধ্যমের এই অধঃপতনকে তাঁরা প্রায় স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছেন।

এতৎসত্ত্বেও গণমাধ্যম বা সাংবাদিকতা এক সম্মানজনক পেশা হিসাবেই আছে এবং থাকবে, যেহেতু এর উদ্দেশ্য মহৎ : খবরাখবর, মন্তব্য, অভিমত সহ তথ্যের সংবহন বা প্রকাশ। এটি একটি সম্মানজনক উদ্দেশ্য এই কারণে যে গণতন্ত্রের প্রতি ন্যূনতম মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল যেকোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও গতিময়তা এর উপর নির্ভর করে। একথা বলার অর্থ এই নয় যে সাংবাদিকতা সংবাদ-পরিবেশনের অতিরিক্ত অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। বিনোদন, ইত্যাদি সাংবাদিকতার মধ্যেই পড়ে। তবে ইহা স্বীকার্য যে তথ্য-পরিবেশনের সার্বিক উদ্দেশ্যের অধীন হবে এইসব অনুষঙ্গ। যাই হোক, প্রবন্ধকারদ্বয় এখানে যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাইছেন তাহল আজকের বিশ্বায়নের যুগে সাংবাদিকতাকে তার সম্মানের জায়গায় ফিরিয়ে আনা যায় কি না। তাঁরা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে সাংবাদিকতাকে সম্মানের জায়গায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব, এবং তা করতে গেলে আমাদের এর গুণগত মানের (quality) বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

৪.২ বিশ্বায়িত প্রেক্ষাপট (The Global Context) :

বিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকেই বিশ্বব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে যা গণ-মাধ্যমের সামনে একদিকে যেমন বিরাট সুযোগের সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে তা অনেক সমস্যাকে আবাহন করেছে। বিশ্বায়িত এই পৃথিবীতে মানুষ প্রজাতি হিসাবে তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে প্রতি মুহূর্তে যাচাই করে নিতে চায়, এবং তাই গণমাধ্যম তথা সংবাদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববাজার। মানুষ আজ নিজের শহর, রাজ্য, দেশ অতিক্রম করে বিশ্বের সাথে নিজেকে, কখনও জ্ঞাতসারে কখনও অজ্ঞাতসারে, জড়িয়ে ফেলেছে। তাই পৃথিবীর কোনো এক

কোণে ওজোন-স্তরের ক্ষয়ের সংবাদকে সে আর উপেক্ষা করতে পারে না। কেননা সে জেনেছে এই পৃথিবীটা একটি 'ইনসিউলেটেড' সমগ্র। তাই মেরুপ্রদেশের কোনো একস্থানে ওজোনস্তরের বিলুপ্তি তাকে স্পর্শ করে। অন্য দিকে, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আর কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিকে উৎসাহিত করা হয় না। আর এর বিকল্প হল গণতন্ত্র, যার জন্য স্বাধীন সংবাদ-মাধ্যম অপরিহার্য। সংবাদ-মাধ্যম ছাড়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ভাবাই যায় না।

বলা হয়, গোটা বিশ্ব আজ একটি 'গ্লোবাল ভিলেজে' পরিণত হয়েছে, এবং এই 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর প্রধান সমস্যাগুলি আমাদের প্রত্যেকের সমস্যা। নিজের ঘরটুকু পরিষ্কার রাখলে সব কিছু ঠিক থাকবে — ব্যাপারটা এরকম নয়। তাই এই বিশ্বের যাবতীয় সমস্যা আমাদের সকলের সমস্যা। তাই যে গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে এই সমস্যাগুলি প্রতিটি বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছায় সেই গণমাধ্যমের সংবাদ বা তথ্যের গুণগত মান সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের মানুষ যেসব বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনীতি ও বিজ্ঞানের মিশ্রণ। প্রথমত, পরিবেশ, সম্পদ এবং জনসংখ্যা — এই বিশ্বের সব থেকে বড় সমস্যা। এই সমস্যার একাধিক অভিমুখ রয়েছে। এই সমস্যার অন্যতম দিক হল পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি এখনকার খাদ্য-সম্পদকে যথাযথভাবে ও ন্যায্যভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন করা যায়। কিন্তু তার পরেও সমস্যা থেকে যায় : জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান মাত্রা বর্তমানের খাদ্য-সম্পদের উৎসগুলির উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। একই সঙ্গে তা পরিবেশের ধ্বংস ও দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে। এসবের অতিরিক্ত রয়েছে জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা সম্পদের মালিকানা-কেন্দ্রিক। অবশ্য এই জাতিগত শত্রুতা অনেক সময় স্বাজাত্যাভিমান, মতাদর্শগত ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে জটিল রূপ ধারণ করে। এর ফলে তৃতীয় এক বিশ্বযুদ্ধের ভীতি আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই অস্থিরতা আরো জটিল হয়েছে কথিত দ্বিতীয় বিশ্ব (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সহযোগী সমাজতান্ত্রিক দেশ)-এর পশ্চাদপসারণের ফলে। এই সব কিছুই তথ্যের আদানপ্রদানকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

আরো একটি অনুস্যূত সমস্যা বিজ্ঞান নিজেই। বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছুর প্রতিশ্রুতি দেয়; তার থেকে বেশি সন্ত্রস্তও করে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পগুলিতে এই তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগই বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সমস্যা হল, বিজ্ঞান নিজেই আজ একটি পণ্যে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানীদের নীতিহীন ও লোভাতুর আচরণ পৃথিবীকে আজ এক নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পুঁজিবাদের দ্বারা অভিভূত বিজ্ঞান আজ ভোগবাদের দাসত্ব করছে। এমন সব কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে চলেছে, যার যেন এখনই পূরণ করা প্রয়োজন!

সমকালীন বিশ্বের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করে তথ্যের প্রসারণ ও আলাপ-আলোচনা আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক বোঝাপড়া ও সম্মতির ভিত্তিতে সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তথ্যের প্রসারণ ও আদান-প্রদানের কোনো বিকল্প নাই। শান্তি, সমৃদ্ধি এবং প্রগতির রথকে গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সংবাদ বা তথ্যের ভূমিকা সমকালীন গণমাধ্যমের সামনে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, গণমাধ্যম এইসব ক্ষেত্রে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে কি?

আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি তাহলে বুঝতে পারব, উৎপাদন সম্পর্কে সাবেকি প্রশ্নটি আজ তথ্য এবং তার আদান-প্রদানের প্রশ্নে রূপান্তরিত হয়েছে। সন্দেহ নেই, তথ্যের এই আদানপ্রদান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বেড়েছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো বাড়বে। কিন্তু সেখানে একই প্রশ্ন : তথ্যের উৎপাদন, বণ্টন এবং উপভোগ একইসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। এখানে এরকম মনে করা ভুল হবে যে এই বিশ্বের তথ্য ও যোগাযোগ সংক্রান্ত সম্পদগুলি জগতের খাদ্য ও খনিজ সম্পদের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ।

বেলসী এবং চাড্‌উইকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, 'All the different questions about information can be brought into focus on the issue of **quality**'. আজকের সমস্যাগুলির আলোকে যদি আমরা কোনো এক আমেরিকান টেলিভিশন চ্যানেল বা ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের দৈনন্দিন বিষয়বস্তুগুলি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব সেগুলি খুবই হতাশাজনক, লজ্জাজনকও। এটি এমন একটি সময়ে ঘটছে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত যেখানে মুক্ত সংবাদমাধ্যমের ঐতিহ্য ছিল না সেখানেও গণমাধ্যম আরও উন্নততর পরিষেবা দিতে পারে এবং গণতন্ত্রের অগ্রগমনকে সুনিশ্চিত করতে পারে। পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি যখন পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তাদের গণমাধ্যমকে আরও উন্নত করতে, ঠিক সেই সময় উন্নত বিশ্বের দেশগুলির সংবাদ-মাধ্যমের বিষয়ের এই মান আমাদের হতাশ করে। প্রবন্ধকারদ্বয়ের মতে, কতিপয় বহুজাতিক পুঁজির হাতে সংবাদ-মাধ্যম চলে যাওয়ার ফলেই মাধ্যমগুলি মানবস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। গুরুত্বহীন, তুচ্ছ ও চটকদার তথ্যের রমরমা এবং ভোগবাদী বিনোদনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব গণমাধ্যমের সম্মানকে ভূলুন্ঠিত করছে।

যাই হোক, বাজারের দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত সংবাদ-মাধ্যমগুলি কেবল তথ্যের স্বাধীন এবং যথোচিত প্রবাহকেই ব্যাহত করছে তা নয়, অনেক দেশের সরকারও স্বাধীন সংবাদ-প্রবাহকে বিভিন্ন অছিলায় নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে। ১৯৯১ সালে 'ইসলামিক স্যালভাশেন ফ্রন্ট' আলজেরিয়ার নির্বাচনে প্রথম রাউন্ডে জিতে স্বাধীন প্রাণবন্ত গণমাধ্যমকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা সফল হয়নি। সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, সাংবাদিককে জেলে পোড়া যেতে পারে, কিন্তু আন্ডার-গ্রাউন্ড প্রেসকে চেপে রাখা তখনও সম্ভব হয় নি। কিন্তু এসব ছিল পুরানো প্রযুক্তি। আজকের যুগে কোনো কর্তৃত্ববাদী শাসক ইচ্ছা করলে, এই কাজে সফল হতে চাইলে এক টেকনো-সেন্সারশিপ চালু করতে হবে। প্রবন্ধকার এখানে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বর্ণ-বিদ্বেষী শাসনে বহুদিন ধরে একটি টেলিভিশন নেটওয়ার্কের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রেখেছিল এই যুক্তিতে যে ঐ মাধ্যম জনগণের নৈতিক চরিত্রকে নষ্ট করে দিচ্ছে। বর্ণ-বিদ্বেষী সরকারের আসল লক্ষ্য ছিল কিন্তু সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ-শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানো এই টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে সেন্সার করা। যখন সরকার শেষ পর্যন্ত ওই টেলিভিশনের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হল তখন অনেকেই ভেবেছিল বর্ণ-বৈষম্যের দিন এবার শেষ হয়ে এসেছে। তাদের পূর্বাভাস সঠিক ছিল। তবে এই দুইয়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল — একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্য স্বাধীন গণমাধ্যম সব সমস্যার সমাধান করে দেবে এমন ভাবাও বোধ হয় যথার্থ নয়। বহুজাতিক পুঁজির নিয়ন্ত্রণ যেমন নিষ্ক্রিয় ভোগবাদের সূচনা করে, স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলিও তেমনি নির্বিচার স্বাজ্যাত্যাভিমান ও বিদ্বেষপূর্ণ জাতীয়তাবাদকে লালন করতে পারে। কিন্তু গণমাধ্যমের কাঠামো বা নিয়ন্ত্রণ যেমনই হোক না কেন, যে বিষয়টি এখানে কেন্দ্রীয়ভাবে বিবেচ্য তা হল তাদের প্রস্তুত করা তথ্যের গুণগতমান (quality)।

আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্ববাসী হিসাবে মানুষকে তার ভূমিকা পালনের জন্য সমর্থ করতে তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদী, এবং তাই আজকে গণমাধ্যমের সামনে প্রভূত সুযোগ তৈরী রয়েছে। কিন্তু এর বাইরে, যেহেতু গণমাধ্যমের রাজনীতি এবং প্রযুক্তি অতি দ্রুত এবং অপূর্বাভাসযোগ্যরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে তাতে মাধ্যমগুলি যাকে সিদ্ধান্ত হিসাবে ইঙ্গিত করে তা উত্তরের চেয়ে আরও অনেক প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। আমরা জানি না, ভবিষ্যতে কে সংবাদ সংগ্রহ করবে, কে সম্পাদনা করবে, আর কেই বা তথ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে, বা বণ্টন করবে। যদি সংশ্লিষ্ট মাধ্যমটি স্থানীয় নেটওয়ার্ক হয় তাহলে প্রশ্ন, কিভাবে তা প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরবে? আর সেটি যদি বহুজাতিক একচেটিয়া গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে লভ্যাংশ-গণনার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব-পালনে কিভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে? আবার, গণমাধ্যম জাতীয় আদর্শগত ও অন্যান্য ধরনের বিরোধিতাকে পাশ কাটিয়ে কেবল মানবতার সাধারণ সমস্যাগুলোকেই গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করতে পারে, বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলির দিকে উপযুক্ত নজর না দিয়ে? আমাদের মনে হয়, এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে গুণমাণের আদর্শকে সামনে রেখে।

এইসব প্রশ্ন আরও একটি প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেয় : লাভ বা ক্ষমতার সাধনা গণ-মাধ্যমের গুণগত মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। এই প্রশ্নটি আবার আমাদের সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টি সামনে আনে : স্বাধীন সংবাদ-মাধ্যম বলতে কি বোঝায়? এটি কি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের প্রস্তাব করার বা প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা? এটা কি বড় বড় কর্পোরেশন বা ব্যক্তি-মালিকদের গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ কিনে নিয়ে তাদের নিজের মতো করে সংবাদ 'নির্মাণ' করে বাজারে ছাড়ার স্বাধীনতা? না কি, এটা কি সাধারণ নাগরিকের তাদের জীবনে বা স্বার্থকে প্রভাবিত করতে পারে এমন সব বিষয়ে সম্পূর্ণ এবং যথাযথ তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা? এইসব প্রশ্ন সংবাদ-মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ কিসের দ্বারা হবে — আইন, না কি নীতিশাস্ত্রের মাধ্যমে?

৪.৩ গুণগতমানের নিয়ন্ত্রণ : আইন অথবা নীতিশাস্ত্র? (Quality Control : Law or Ethics?)

পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে স্বাধীন ও প্রাণবন্ত গণমাধ্যম গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য উপাদান (প্রবন্ধকারদ্বায় এখানে 'Vigorous' শব্দটি যোগ করেছেন এই কারণে যে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও কোনো মাধ্যম ভীরু বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে)। মানবাধিকার-সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি, সনদ তথা কনভেনশনে সংবাদ-মাধ্যমের এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধনের প্রথম প্রয়োজনটি দেখা দিয়েছিল গণমাধ্যমকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নে। বিপরীতে, ব্রিটেনে অন্যান্য যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় ক্রিমিনাল এবং সিভিল — এই দুই প্রকার আইনের মাধ্যমে গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, সংবাদ-মাধ্যমের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারটি কি আইনের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত, না কি শুধু নীতিশাস্ত্রের হাতে? আমরা যদি বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো বিভিন্ন দেশে আইনের দ্বারা গণমাধ্যম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার অনেক দেশেই একইসঙ্গে সাংবাদিকদের জন্য নৈতিক আচরণ-বিধিও তৈরি করা হয়েছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম অফিসিয়াল গোপনীয়তা, অশ্লীলতা, ধর্মীয় নিন্দা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিমিনাল আইনের দ্বারা যেমন সংবাদ-মাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি কুৎসা, সম্মানহানি এবং বিশ্বাসভঙ্গে

র সিভিল আইনের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। কখনো কখনো বিচারকদের দ্বারা বিধিবদ্ধ আদালত অবমাননা সংক্রান্ত আইনের দ্বারাও গণমাধ্যম শাসিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিচারব্যবস্থা স্বাধীন সংবাদ-মাধ্যম এবং তথ্যের প্রসারণের স্বাধীনতার ব্যাপারে সংবেদনশীল হয় না। তাই ব্রিটেনের মতো অনেক দেশে সংবাদ আদান-প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনি ব্যবস্থায় যা অসম্ভব।

এই দুই দেশের ভিন্ন অবস্থার জন্য ভিন্ন ধরনের সংবিধান যেমন দায়ী, তেমনি রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিক থেকেও এই দুই দেশের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ব্রিটেন নাগরিক মণ্ডলীর সাধারণতন্ত্র (a republic of citizens) নয়, ইহা প্রজাদের রাজতন্ত্র (a monarchy of subjects)। যদিও ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পার্লামেন্টই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধরে, তথাপি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে হলেও ব্রিটেনে রাজা বা রাণী কখনো কখনো তাঁর বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য, প্রজাদের নাগরিকদের মতো অধিকার থাকতে পারে না এবং এজন্যই মানবাধিকার সংক্রান্ত 'ইউরোপিয়ান কনভেনশনে'র মর্মবস্তুকে ব্রিটিশ সংবিধান আত্মস্থ করতে হোঁচট খায়। একই রকমভাবে সংবাদ-মাধ্যমের স্বাধীনতাকে স্বীকার করতেও এই সংবিধান কুন্ঠিত। ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবন-যাপন জানার প্রয়োজন নীতি (the need-to-know principle) -এর দ্বারা পরিচালিত। ফলত, ব্রিটিশ প্রজাদের সব কিছু স্বাধীনভাবে জানার অধিকার সেভাবে স্বীকৃত নয়।

দেশের সাধারণ আইনকানুন এবং সংবিধানের এই বিশেষ চরিত্রই ব্রিটিশ গণমাধ্যমের একমাত্র নিয়ন্ত্রক এরকম ভাবা ভুল। ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন কমিশন, রেডিও অথরিটি, ব্রডকাস্টিং কমপ্লেইন্টস্ কমিশন এবং ব্রডকাটিং স্ট্যান্ডার্স্ কাউন্সিল, ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারাও ব্রিটিশ গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রণের এইসব ব্যবস্থা বিভিন্ন কারণে সমালোচিত হয়ে থাকে। কেউ কেউ অভিযোগ তুলেছেন, এইসব সংস্থার এক্তিয়ার বা কার্যক্ষেত্র সুস্পষ্ট নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রডকাস্টিং কমপ্লেইন্টস্ কমিশনের তথ্যের বিষয়, উপস্থাপনের নায্যতা, গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিযোগের বিচার করার কথা। অন্য দিকে, ব্রডকাস্টিংস্ স্ট্যান্ডার্ড কাউন্সিল যৌনতা, হিংসা, ভাষা, দুর্যোগের মোকাবিলা ইত্যাদি সম্পর্কে ওঠা রুচি এবং শালীনতা সম্পর্কিত অভিযোগের বিচার করে থাকে। কিন্তু সংবাদ-প্রেরণের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা লক্ষ্য করেছেন যে এইসব কমিশন বা কাউন্সিল সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা সম্পর্কিত দাবির প্রতি শুধু অ-সংবেদনশীলই নয়, এগুলির এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে খবরদারি করার প্রবণতাও আছে।

এখানে মূল প্রশ্নটি হল, ব্রিটিশ গণমাধ্যমের গুণগত মান উন্নয়নের ব্যাপারে এইসব কমিশন বাস্তবিক কি করেছে, আর কী-ই বা করতে পারে? বলার অপেক্ষা থাকে না, বেশি কিছু করার সুযোগই এখানে নেই। কেননা এখানে গুরুত্ব পেয়েছে নিষেধাজ্ঞা আরোপের উপর, নঞর্থকতার উপর, মিডিয়া কি করতে পারবে না সেইসব বিষয়ে। পর্দার এবং কাগজের পাতায় যেসব বিষয় ফুটে ওঠে তাদের গুণগত মান উন্নয়নে এইসব সংস্থাগুলি যত্নশীল বা আগ্রহী নয়। ব্রিটিশ ব্যবস্থায় এটা যেন ভুলে যাওয়া হয়েছে যে সংবাদ-মাধ্যমের গুণগত মান উন্নয়নের সদর্থক ব্যবস্থা নেওয়াও যথার্থ গণতন্ত্রের দাবি।

ব্রিটিশ এই ঐতিহ্য অনুসারে এটাই কি তাহলে বলা হবে যে সংবাদ-মাধ্যমের আত্মরক্ষা এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তারা কেবল নীতিবিদ্যার দিকেই তাকিয়ে থাকবে? স্পষ্টতই, এমনকি যদি অধিকাংশ আইনগত

বাধানিষেধ উঠিয়ে দেওয়াও হয় সাংবাদিকতার মধ্যে নৈতিকতার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হবে। নীতিশাস্ত্রে এই নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছারোপিত, যেখানে নিছক আইনগত নিয়ন্ত্রণ উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণরাজের রমরমা নেই সেখানে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার এবং একাডেমিশিয়ানদের মধ্যে নৈতিক তর্ক-বিতর্ক খুবই প্রাণবন্তভাবে ঘটে এবং সুদূরপ্রসারী এইসব বিতর্কগুলিকে স্বাভাবিক বলেই মার্কিনীরা মনে করেন। আমাদের মনে হয় আইনের শাসন অবশ্যই থাকতে পারে। কিন্তু সেটাই সব নয়, বা নঞর্থক আইনি ব্যবস্থায়ই একমাত্র বিকল্প নয়। নৈতিক বিচার আলাপ-আলোচনা আইনের মর্মবস্তুকে ক্ষুন্ন না করেও সংবাদ মাধ্যমের গুণগত মান উদ্ধারে সাহায্য করতে পারে। যেখানে তথ্য-বিকৃতি, মিথ্যাচার, পক্ষপাত, বৈষম্য, ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্র-হনন, বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থের বিনিময়ে সংবাদ নির্মাণ — এসব বিষয় রয়েছে সেখানে নীতিশাস্ত্রের উপস্থিতি অপরিহার্য। তবে নৈতিক বিধির যদি 'আইনী দাঁত' (legal teeth) না থাকে তাহলে নৈতিকতা খুব বেশি কাজে আসে বলে মনে হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতই আমাদের আইনের সঙ্গে নৈতিকতার সম্পর্কের আলোচনার দিকে ঠেলে দেয়।

৪.৪ আচরণ-বিধি ও নীতিশাস্ত্র (Codes and Ethics) :

অন্যান্য পেশার মতো সাংবাদিকতা-পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জন্য আচরণ-বিধি নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। এই আচরণ-বিধি আইনকানুনের মাধ্যমে বলবৎ করা হলেও এর পিছনে থাকে নৈতিকতার ভিত্তি। তাই আচরণ-বিধির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক নিরূপণ করা জরুরি। আমরা যদি গণমাধ্যমের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব অনেক প্রকাশনা-মাধ্যম এবং প্রসারণ-মাধ্যম আছে যেগুলিকে তথ্যের বিকৃতি, পক্ষপাত, রুচিহীনতা ইত্যাদি মানদণ্ডের নিরিখে খুবই নিম্নমানের বলে আমরা মনে করি, যদিও জনগণের চোখে এই নিম্নমান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে না। তবে এইসব ঘটনা ইঙ্গিত করে যে আচরণবিধি বলবৎকরণের মাধ্যমে গণমাধ্যমের গুণগতমান সংরক্ষণের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। এই আচরণবিধি সাংবাদিকদের বিভিন্ন ধরণের অসদাচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং একইসঙ্গে তাদেরকে এই মাধ্যমের উদ্দেশ্য লক্ষ্যের প্রতি দায়িত্বশীল করবে।

অনেকক্ষেত্রে আচরণবিধি লঙঘন করলে সংশ্লিষ্ট পেশাদারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেওয়া হয় এবং সেই পেশায় অনুশীলন করা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। কিন্তু এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, সব পেশাকে একই চোখে দেখা যথোচিত নয়। চিকিৎসক এবং নার্সিংস্টাফের জন্য যদিবা এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া যায়, তথাপি, প্রবন্ধকারদ্বয়ের মতে, সেখানেও কি ধরনের ক্ষতি চিকিৎসক বা নার্স করেছেন তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আর সাংবাদিকতার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি স্বাস্থ্যপরিষেবা প্রদানকারীর অসদাচরণ রোগীর মৃত্যুরও কারণ হতে পারে, যেখানে একজন সাংবাদিকের কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তা লঙঘন করা রূপ ঘটনা সাধারণত এতটা মারাত্মক হয় না। (যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা বা বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।) এতৎসত্ত্বেও সাংবাদিকদের জন্য অনুমতি পত্রের ব্যবস্থা করা এবং কোনো আচরণবিধির লঙঘন ঘটলে তাকে ঐ পেশা থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়, প্রবন্ধকারদ্বয়ের ভাষায়, '[S]urely too draconian and antidemocratic a solution to the problem of media malpractice.'

আচরণ-বিধির সঙ্গে যে ধরনেরই শাস্তির ব্যবস্থাই যুক্ত থাকুক না কেন এই আচরণ-বিধি সংশ্লিষ্ট পেশার গুণমান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। যাই হোক, আচরণ-বিধি বিষয়বস্তু কিরূপ হবে, বিধিগুলি সাধারণ বা বিস্তৃত কয়েকটি নীতির দ্বারা ব্যক্ত হবে, না কি প্রত্যেকটি বিষয়কে নিখুঁতভাবে বিস্তৃত করে সংজ্ঞায়িত করা হবে — এইসব বিষয় নিয়ে ভিন্ন সত্য অস্বাভাবিক নয়। ভবিষ্যৎ ঘটনাক্রম সম্পর্কে আমরা আগে থেকে আভাস পাই না, তাই সবকিছু একটি আচরণ-বিধির মধ্যে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে, আচরণ-বিধি কতটা নীতিশাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল হবে, আর কতটাই বা আইনিভাবে বিধিবদ্ধ হবে এসব বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা বিতর্ক চলতেই থাকবে। প্রবন্ধকারদ্বয় ব্যাখ্যাকল্পে এখানে সাংবাদিকতার সততা (honesty) -এর প্রসঙ্গ বিচার করেছেন। তাঁদের মতে, এ ব্যাপারে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই যে সাংবাদিকেরা তাদের কর্ম সম্পাদনে সততার অনুশীলন করবে, তা সে ঘটনার অনুসন্ধানই হোক বা রিপোর্টিং-এর ক্ষেত্রেই হোক, কিন্তু অনেক সময় সাংবাদিক বন্ধুকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যেখানে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। আইনকানুনের মাধ্যমে বা সাংবাদিকতার স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে যখন এক বিরাট দুর্নীতি নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না তখন বৃহত্তর জনস্বার্থে কোনো সাংবাদিক যদি দুর্নীতির সঙ্গে আপোসকামী বা খদ্দের হিসেবে বা সহযোগীর বেশ ধরে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে পৌঁছায় তাহলে ঐ সাংবাদিককে অসৎ আচরণের জন্য তাড়িয়ে দেওয়া কি যথোচিত হবে? আবার, যুদ্ধ বিগ্রহ বা বড় ধরনের সামরিক দুর্নীতিকে জনসমক্ষে আনতে কোনো সাংবাদিক যদি কোনোরূপ কথিত অসততার সাহায্য নেয় তাহলে তা নিশ্চয় ক্ষমাসুন্দর চোখে বিচার্য হওয়া উচিত। প্রবন্ধকারদ্বয় আবার গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলেছেন। সাংবাদিকরা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের প্রতি যত্নবান হবেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি দাবি করতে পারেন, দুর্নীতিগ্রস্ত কোনো এক রাজনীতিক সম্পর্কে কোনো তথ্য এই অধিকারে সংরক্ষণ পাওয়ার যোগ্য নয়। ঠিক তেমনি সন্ত্রাসবাদ-সম্পর্কিত সংবাদ প্রসারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিবা এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমর্থিত হয়ও তথাপি সত্যিকারের ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞাকে কখনো কখনো সঙ্কুচিত করাও বাঞ্ছনীয়। এখানে মূল প্রশ্নটি তাই দাঁড়ায়, ঠিক কোন্‌খানে লাইনটি টানা হবে? যদি আচরণবিধির মধ্য দিয়ে এই লাইন টানা হয় তাহলে ব্যক্তি সাংবাদিক বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নৈতিক দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হবে এবং সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককেই নৈতিক পছন্দ বেছে নিতে হবে। আর এটি বলা বাহুল্য, কোনো নিয়মবিধি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব পরিস্থিতিকে আগে থেকে কল্পনা করতে পারে না!

আচরণ-বিধি সম্পর্কিত আলোচনার আর একটি বিচার্য বিষয় হল এই নিয়মবিধিগুলি 'এটা কোরো না', 'ওটা কোরো না' - এই ধরনের নঞর্থক অনুজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্ত হবে, নাকি নৈতিক আচরণের উন্নয়নের সদর্থক ভাষায় লিপিবদ্ধ হবে। অবশ্য কেউ বলতে পারেন যেভাবেই বলা হোক না কেন বিষয়টি আসলে একই মুদ্রার এপিট ওপিট মাত্র। কিন্তু প্রবন্ধকারদ্বয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'মিথ্যা কথা বলো না' আর 'সত্য কথা বলো' এই দুটি সমার্থক নয়। মিথ্যাচারকে নীরবতা, অস্পষ্টতা বা প্রসঙ্গ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এড়িয়ে চলা যায়, যেমন আমরা দৈনন্দিন জীবনে হামেশাই দেখতে পাই। এর অর্থ হল মিথ্যাচার না করা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সাংবাদিকতায় উভয়ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত নৈতিক বিধি। কোনো সংবাদপত্র বাড়তি চাপ এড়িয়ে চলার জন্য কোনো তথ্য সম্পর্কে নীরব থাকতে পারে। কিন্তু 'সত্য কথা বলো' এই অনুজ্ঞার তাৎপর্য কিঞ্চিৎ ভিন্ন। যাই

হোক, একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে সত্য-ভাষণের অনুজ্ঞার মধ্যেও কিছু সমস্যা আছে : সত্য সীমাহীন, অখণ্ড; কিন্তু সময় ও উপকরণ সীমিত। তাই নির্বাচনের ব্যাপার এখানেও থেকেই যায়। যা সম্ভাবনায় অনন্ত তার থেকে আমাদের কিছু কিছু বিষয় বা দিক বেছে নিতে হয়, কিন্তু একে তো পূর্ণাঙ্গ সত্য বলা চলে না! অবশ্য নির্বাচন করার সময় আমাদের 'fair and balanced' হতে হবে কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন 'Where do you draw the line?'

শেষ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রবন্ধকারদ্বয় উত্থাপন করেছেন তা হল নৈতিক আচরণ-বিধির ভিত্তি (the basis of an ethical code of conduct) সম্পর্কিত। নীতিশাস্ত্র নিছক কতকগুলি সদর্থক বা নঞর্থক আচরণ-বিধির সমষ্টি নয়, আবার অনুসরণযোগ্য নিছক কয়েকটি নিয়ম-নীতির ব্যাপারও নয়। নীতিশাস্ত্রকে মানুষের আচরণের ভালত্ব-মন্দত্ব, ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়, তাকে যুক্তিযুক্ত তাত্ত্বিক ভিত্তির অনুসন্ধান করতে হয় যেগুলিকে আমরা বস্তুগতভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারি। এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে আচরণবিধির বিষয়গুলিকে বিচার করতে না পারলে নির্বিচার নির্দেশনামার সঙ্গে নৈতিক নিয়মবিধির কোনো পার্থক্যই থাকবে না। বস্তুগততা, নিরপেক্ষতা, সর্বজনীনতা, যুক্তিবত্তা ইত্যাদি মাপকাঠির মধ্য দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে নৈতিক নিয়ম-নীতি পূর্ব-নির্দিষ্ট ও চিরন্তন। প্রবন্ধকারদ্বয় জোনাথন গ্লোভারকে অনুসরণ করে মত-প্রকাশ করেছেন যে নৈতিক নীতিগুলি কিছুটা পরিমাণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনুরূপ : সেগুলি কর্তৃত্বের মাধ্যমে অনুবর্তন করে এরকম নয়। আমাদের যুক্তিবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা এসবের যথার্থ প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেগুলি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা যেমন বিজ্ঞানের জগতে মহামূল্যবান সত্যে পৌঁছাই তেমনি নীতিশাস্ত্রে আমরা যথার্থ নৈতিক নিয়ম সূত্রবদ্ধ করতে সমর্থ হই। কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যেহেতু এক মানবীয় প্রক্রিয়া, তাই একে একবারে অভ্রান্ত বলা যায় না।

যাই হোক, আমরা বুঝতে পারছি যেকোনো আচরণবিধিরই একটি যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তির প্রয়োজন হয়। তাই আমাদের এখন বিচার্য হওয়া উচিত এই আচরণবিধির যৌক্তিকতা আমরা কিভাবে প্রতিপাদন করতে পারি। প্রবন্ধকারদ্বয় প্রথমে কর্তব্যবাদী দৃষ্টিকোণ (deontological perspective) থেকে, অন্যভাবে বললে, অধিকারের ভাষায় এই যৌক্তিকতা প্রতিপাদনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। অধিকারের কথা বলার যথেষ্ট রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু এই অধিকার-দাবির পক্ষে যদি না তাত্ত্বিক যৌক্তিকতা সংবদ্ধ হয় তাহলে এর গ্রহণযোগ্যতা ও নৈতিকবল তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যায়। যাই হোক, এ ধরনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন যদি সম্ভব হয় তাহলে তার থেকে আমরা কোথায় সীমারেখা টানব — এই সমস্যারও একটা সমাধান সূত্র বেড়িয়ে আসতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি জনসাধারণের প্রতারিত না হওয়ার অধিকার থাকে তাহলে এমনকি জনস্বার্থে মঙ্গলকারী ফলাফল লাভের জন্যও অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় প্রতারণা কোনোভাবেই অনুমোদিত হবে না। কিন্তু এই সমাধানসূত্র গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্য দিকে জনসাধারণের যেমন প্রতারিত না হওয়ার অধিকার আছে, তেমনি প্রবঞ্চিত না হওয়ারও অধিকার আছে। তাই যে প্রবঞ্চনা বা দুর্নীতি কেবল ছলনার মধ্য দিয়েই জনসমক্ষে আনা সম্ভব সেখানে কোন্ অধিকারটি বেশি গুরুত্ব পাবে? বলা বাহুল্য, অধিকারভিত্তিক তত্ত্বসমূহ, বা এক কথায় কর্তব্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। এইসব প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর পাওয়া যায় না।

বিকল্প আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল উপযোগবাদের দৃষ্টিভঙ্গি (utilitarian approach)। সাধারণভাবে আমরা সেই আদর্শ-নিষ্ঠ নীতিতত্ত্বকে বুঝি, যদনুসারে যে অনুপাতে সংখ্যাগুরু মানুষের সর্বোচ্চ আনন্দবর্ধনে সহায়ক সেই কাজ সেই অনুপাতে ভাল। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই আদর্শ-তত্ত্বের অর্থ দাঁড়ায় যাদের উদ্দেশ্যে সাধনে গণমাধ্যম নিয়োজিত সেই জনসাধারণের স্বার্থের পরিতৃপ্তির সর্বোচ্চায়ন। আরো নির্দিষ্ট করে বললে, কোনো সংবাদ বা তথ্য পরিবেশিত হলে যেসব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রভাবিত হবে তাদের স্বার্থের সর্বোচ্চায়ন ঘটানো। এই নীতিতত্ত্বে গণতন্ত্র, ন্যায় এবং জনস্বার্থকে সর্বোচ্চমাত্রায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা থাকে। আচরণবিধি তৈরি করার সময় মন্দের তুলনায় ভাল ফল উৎপন্ন করার এই আদর্শকে মাথায় রাখা হয়। কখনো কখনো একাধিক বিকল্পের সামনে পড়ে সাংবাদিক। তখন এই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সাংবাদিক সেই কার্যক্রমকে নির্বাচন করবে যা অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ভাল ফল উৎপন্ন করবে। কিন্তু এখানেও ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে, এবং নিছক উপযোগিতার ভাষায় এই দ্বন্দ্বকে সম্যক বোঝা সম্ভব নাও হতে পারে।

আর একটি বিকল্প হল সদ্‌গুণের নীতিতত্ত্ব (virtue ethics)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গণমাধ্যমের কর্মীদের সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, ন্যায্যতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি সদ্‌গুণের পরিচয় দিতে হবে। আচরণবিধি তৈরি করার সময় কথিত সাধারণ সদ্‌গুণ এবং সাংবাদিকতা পেশা-নির্দিষ্ট সদ্‌গুণ সমূহে যাতে বাস্তব প্রতিফলন ঘটে তার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। গণমাধ্যম নীতিতত্ত্বে এই দৃষ্টিভঙ্গির গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করেও প্রবন্ধকারদ্বয় দুটি মন্তব্য করেছেন। প্রথমত, সাধারণ সদ্‌গুণের সঙ্গে পেশাভিত্তিক সদ্‌গুণের সম্মিলন ঘটানো সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তাই সদ্‌গুণের সাধারণ তাত্ত্বিক পরিকাঠামোর মধ্যে সাংবাদিকতার পেশা নির্দিষ্ট। সদ্‌গুণসমূহকে এই নির্দিষ্ট পেশায় সংবদ্ধ করার ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে। দ্বিতীয়ত, সদ্‌গুণের সাধারণ ধারণা বাস্তবিক মৌলিক ধারণা কিনা — এই প্রশ্ন তোলা যায়। আমরা সদ্‌গুণকে অধিকার বা কর্তব্যের ভাষায় যেমন ব্যাখ্যা করতে পারি, ঠিক তেমনি সাধারণ জনস্বার্থে সর্বোচ্চায়নের ভাষায়ও বুঝতে পারি।

উপরের এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সাংবাদিকতার আচরণবিধির জন্য যুক্তিসিদ্ধ নৈতিক ভিত্তি প্রদান করার বিষয়টি সহজ নয়, এখানে ঐক্যমত্যে পৌঁছনো কঠিন। তাই বিতর্কের সুযোগ থেকেই যায়। গুরুত্বপূর্ণ হল, যুক্তিগ্রাহ্য বিতর্ক তথা আলোচনাকে চলমান রাখা।

৪.৫ গণমাধ্যমের গুণমান ও সম্মানের পুনরুদ্ধার (Quality and the Restoration of the honour of Journalism) :

যদিও সাংবাদিকতার পেশা চিকিৎসা বা স্বাস্থ্য পরিষেবার পেশার মতো 'এক-এক পেশাদার-মক্কেল সম্পর্ক' নয়, তথাপি এর গুণগতমানকে রক্ষা করা এবং তাকে আরো উন্নীত করার আবশ্যিকতা সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য থাকার কথা নয়। আমরা যদি যথোপযুক্ত নীতিতত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে উপযুক্ত ধরনের আচরণবিধি নির্দিষ্ট করতে পারি এবং সাংবাদিকদের তার প্রতি সম্যক দায়বদ্ধ করতে পারি তাহলে সাংবাদিকতার গুণমান বজায় থাকবে এবং একই সঙ্গে হৃতগৌরব তথা সম্মান পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

তাই মূল পেশাগুলির নৈতিক ভিত্তি সম্পর্কে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সাধারণ নৈতিক নিয়মকে কিভাবে পেশাগুলিতে প্রয়োগ করা যাবে সেই পদ্ধতিতত্ত্বের নজর থাকবে। বাস্তব প্রয়োজন বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কিভাবে সাধারণ নৈতিক নিয়মকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। কখনো এটা ভুলে গেলে চলবে না যে যে কোনো পেশায় পরিষেবা গুণমানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই তা মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হবেই। তাই নৈতিক আচরণবিধি তৈরি করার সময় যথার্থ নৈতিকমূল্য যাতে অন্তর্ভুক্ত হয় তার প্রতি নজর রাখতে হবে।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই আচরণবিধির মধ্যে দুটি বিস্তৃত দিক অন্তর্লীন থাকে : তথ্য সংগ্রহ, যাকে আমরা কমপিউটারের পরিভাষায় 'ইনপুট' বলতে পারি এবং তথ্য বা সংবাদ-উৎপাদন, যাকে আমরা পরিভাষায় 'আউটপুট' বলতে পারি। দ্বিতীয়োক্ত বিষয়টি সেইসব রিপোর্ট, প্রবন্ধ বা অনুষ্ঠানকে বোঝায় যা সাংবাদিকরা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নীতিমূল্যটি হবে সত্যভাষণ (truth-telling)। পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে সত্যভাষণের বিষয়টি যতটা সহজ মনে হয় বাস্তবে তা নয়। পূর্ণ সত্যকে আমরা পাই না, তাই সত্যের কোন্ কোন্ অংশ বা দিকগুলি প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক তা নির্বাচন করার কিছু নীতির আশ্রয় নিতে হয়। সেক্ষেত্রে ন্যায্যতা, জনস্বার্থ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পক্ষপাতশূন্যতা বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে, সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা মৌলিক নীতিমূল্যটি হবে সততা (honesty)। কিন্তু এই সততার অনুশীলন ততটা সহজ নয় এবং তাই অন্যান্য নীতিমূল্যকেও প্রয়োজনে আবাহন করতে হয়।

যদিও নৈতিক আচরণের পিছনে আলোচিত মৌলিক নীতিমূল্যগুলি সম্পর্কে কমবেশি ঐক্যমত্য সম্ভব, তথাপি এগুলি নিজে নিজেই একটি আচরণবিধি গঠন করে না বা পেশাদারদের আচরণ-বিধি সম্পর্কিত সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। এর কারণ অংশত আচরণ-বিধির মধ্যে মূল্যের মিথস্ক্রিয়া এবং অংশ আচরণবিধির পরিবর্তনশীলতা। সাধারণ নীতিতাত্ত্বিক আলোচনা যেমন চলতেই থাকে, পদ্ধতিতত্ত্বের নতুন নতুন নির্দেশনা সামনে আসে। তাই কোনো একটি আচরণবিধিকে স্থায়ী বা চূড়ান্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না। আচরণবিধির পুনর্নির্মাণ বা পরিমার্জন চলতেই থাকে। তবে লক্ষ রাখতে হবে গণতন্ত্রের আদর্শ ও যুক্তির মাপকাঠি থেকে সাংবাদিকরা যেন বিচ্যুত না হয়। এইসব কারণেই অবশ্য অনেকক্ষেত্রে পেশাদার সংস্থাগুলি নিজেদের আচরণবিধি নিজেরাই তৈরি করার ব্যাপারে ইতস্তত করেন। অন্যান্য কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায় তারা। এক্ষেত্রে আমরা ভারতবর্ষের কথা বলতে পারি, যেখানে প্রেস কাউন্সিল নিজেদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আচরণবিধি তৈরি করতে খুব একটা আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। উচ্চতর সংস্থা তথা বিচার-ব্যবস্থার উপরে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতি তারা।

যাই হোক, যে কোনো পেশার জন্য নৈতিক আচরণবিধি থাকাটা প্রয়োজনীয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুণমান রক্ষার জন্য এই আচরণবিধি আরো বেশি প্রয়োজনীয়। আবার সাংবাদিকতার সম্মান ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের প্রশ্নে আচরণবিধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে গুণমান বজায় রেখে চলার কাজটি যে সহজ নয় তা সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। সম্মান পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকে সাফল্যের অভিমুখী করতে হলে অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে। এখানে সংবাদ-পরিবেশনের দিকটিই বেশি বাধার সম্মুখীন হয়। ব্রিটেনে সংবাদ-পরিবেশনের স্বাধীনতা আইনগত বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সাংবাদিককে স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে। তবে এই

বাধা নিছক সরকারি বা আইনগত বাধাই নয়, এটি আরো গভীরতর। এটি হল যথার্থ গণতান্ত্রিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ সমাজগঠনে গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে স্বীকার করে নিতে না পারার মানসিকতা। মনে রাখতে হবে, সংবাদ প্রভূত ক্ষমতা ধরে এবং তাই এই ক্ষমতার বিষম বণ্টন গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই সরকার, রাজনৈতিক দল, বিচারব্যবস্থা, বণিকসভা, গণমাধ্যমের মালিক এবং নিয়ন্ত্রক এবং সাধারণ মানুষ সকলকেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। যাই হোক, জাতীয় স্তরে যা সত্য আন্তর্জাতিক স্তরেও তা মান্য। আজকের এই সমস্যাদীর্ণ অশান্ত পৃথিবীতে সংবাদের গুণগতমান এবং সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করেই আমরা উন্নততর বিশ্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। অন্যথায় আমরা আরো পিছিয়ে পড়ব।

৪.৬ সারসংক্ষেপ :

এই পাঠ এককে আমরা গণমাধ্যমের নীতিশাস্ত্র বলতে কি বোঝায় তার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সিলেবাস নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি অনুসরণ করে গণমাধ্যমের নীতিতত্ত্বের মূল কয়েকটি বিষয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সংবাদ মাধ্যমের গুণমানের মাপকাঠিকে সামনে রেখে আইন, না কি নীতিশাস্ত্র — কোন্‌টি গুণমান নিয়ন্ত্রণে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার আলোচনা করা হয়েছে। সাংবাদিকদের আচরণবিধির সঙ্গে নীতিতত্ত্বগুলির সম্পর্ক নিরূপণেরও চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। সব শেষে সাংবাদিকতা পেশার সম্মান পুনরুদ্ধারে গুণমান বজায় রাখা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরা হয়েছে।

৪.৭ পাঠনির্দেশ :

সিলেবাস নির্দিষ্ট প্রবন্ধটি ছাড়া নাইজেল জি. ই. হ্যারিস-এর প্রবন্ধ 'Code of Conduct for gournalists' (দ্রষ্টব্য : Ethical Issues in Journalism and the Media, 1992, pp.63-76) এবং জুডিথ লিচটেনবার্গ-এর Media Ethics (দ্রষ্টব্য : A Companion to Applied Ethics, Blackwell Publishing, 2005, pp. 597-607)

৪.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is media ethics? How can the honour of media and journalism be restored? Discuss.
2. What is meant by the quality of journalism? Discuss how the quality of journalism can be assured.
3. How should the quality of the media be controlled, by law or by ethics?
4. What is a code of conduct? How are codes of conduct related to ethical theories? Discuss.
5. How is ethics and politics related to media? Discuss with special reference to British media and the USA media.

Philosophy 5th Paper spl Part 1

ORIGINALITY REPORT

1%	1%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	wbsesa.org Internet Source	<1%
2	archive.org Internet Source	<1%
3	www.fao.org Internet Source	<1%
4	stanford.library.sydney.edu.au Internet Source	<1%
5	eacharya.inflibnet.ac.in Internet Source	<1%
6	frontierweekly.com Internet Source	<1%
7	Submitted to University of Maryland, University College Student Paper	<1%
8	dde-online.buruniv.ac.in Internet Source	<1%
9	emilkirkegaard.dk Internet Source	<1%

10	Naumann, Felix. "Quality-driven Query answering for Integrated Information Systems ", Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, 2002. Publication	<1 %
11	J. Wagner DeCew. "Warfare, Codes of", Elsevier BV, 2012 Publication	<1 %
12	Submitted to University of Oklahoma Student Paper	<1 %
13	estudogeral.sib.uc.pt Internet Source	<1 %
14	www.cambridge.org Internet Source	<1 %
15	sparindia.org Internet Source	<1 %
16	Submitted to Drexel University Student Paper	<1 %
17	www.marshall.edu Internet Source	<1 %
18	www.bipulsaha.com Internet Source	<1 %
19	Michael Haus. "Chapter 4 Grundzüge der politischen Philosophie: Gemeinschaft,	<1 %

	Liberalismus, Demokratie", Springer Science and Business Media LLC, 2000 Publication	
20	www.ijiras.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Bonn International School Student Paper	<1 %
22	Submitted to Liberty University Student Paper	<1 %
23	Submitted to Macquarie University Student Paper	<1 %
24	ikee.lib.auth.gr Internet Source	<1 %
25	qdoc.tips Internet Source	<1 %
26	Christensen. Encyclopedia of Community Publication	<1 %
27	www.merriam-webster.com Internet Source	<1 %
28	Vaughn, Lewis. "Bioethics", Oxford University Press Publication	<1 %
29	journals.latrobe.edu.au Internet Source	<1 %
	worldwidescience.org	

30	Internet Source	<1%
31	J.T. Ives, R.F. Gesteland, T.G. Stockham. "An automated film reader for DNA sequencing based on homomorphic deconvolution", IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 1994 Publication	<1%
32	site.iugaza.edu.ps Internet Source	<1%
33	Submitted to Don Bosco Technical Institute Student Paper	<1%
34	Schwarz, Thorsten. "Kritisches Verhalten dünner ferromagnetischer La0.7Sr0.3CoO3-Schichten", Forschungszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, 2007. Publication	<1%
35	dk.fdv.uni-lj.si Internet Source	<1%
36	Langhoff, Tom-Alexander. "Kontinuumsmechanische Modellierung der chemischen Gasphaseninfiltration pyrolytischen Kohlenstoffs [online].", Universität Karlsruhe, 2007. Publication	<1%
37	www.jmi.ac.in Internet Source	<1%

38	www.scribd.com Internet Source	<1%
39	Submitted to Albany Creek State High School Student Paper	<1%
40	Norman, Ian, Ryrie, Iain. "The Art and Science of Mental Health Nursing: Principles and Practice", The Art and Science of Mental Health Nursing: Principles and Practice, 2018 Publication	<1%
41	Ragg, Thomas. "Problemlösung durch Komitees neuronaler Netze [online].", Universität Karlsruhe, 2007. Publication	<1%
42	Schlücker, Sebastian. "Lineare und nichtlineare Raman-Spektroskopie an biologisch relevanten Modellystemen", Universität Würzburg, 2002. Publication	<1%
43	Siebert, Karsten. "Optoelektronische Erzeugung und Detektion kohärenter Dauerstrich-THz-Strahlung für bildgebende Anwendungen", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	<1%
44	christopherhurtado.com Internet Source	<1%

45	etd.library.scu.edu.tw Internet Source	<1 %
46	minority-health.pitt.edu Internet Source	<1 %
47	siliguriswo.org Internet Source	<1 %
48	wethepeople-barakvalley.com Internet Source	<1 %
49	www.onthewing.org Internet Source	<1 %
50	www.phil.ucalgary.ca Internet Source	<1 %
51	"Artificial Neural Networks — ICANN 2002", Springer Science and Business Media LLC, 2002 Publication	<1 %
52	Kant-Gesellschaft e.V.. "Law and Peace in Kant's Philosophy", Walter de Gruyter GmbH, 2008 Publication	<1 %
53	Norma Huss. "Chapter 56-1 Ethische Spannungsfelder – Globale Verantwortung, Nachhaltigkeit und Hygieneparadigmen", Springer Science and Business Media LLC, 2021 Publication	<1 %

54	P A Zyla, R M Barnett, J Beringer, O Dahl et al. "Review of Particle Physics", Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2020 Publication	<1 %
55	osms.wbsed.gov.in Internet Source	<1 %
56	James R. Flynn. "Reflections about intelligence over 40 years", Intelligence, 2018 Publication	<1 %
57	"Theoretische Physik 2", Springer Nature, 2005 Publication	<1 %
58	www.bristol.ac.uk Internet Source	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		